*

চতুর্থ খণ্ড।

ভারতবর্ষ।

(প্রাচীন ভারতবর্ষ।)

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত।

প্রকাশক,

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী।

"পৃথিবীর ইতিহাস" কার্য্যালয়, হাওড়া (কলিকাতা)।

এই চতুর্থ খণ্ড "পৃথিবীর ইতিহাসের" ৮—৩৩৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত, কর্ম্মযোগ প্রিণ্টিং
ওয়ার্কস, ৪নং তেলকল ঘাট রোড হাওড়া, হইতে শ্রীযুক্ত যুগলকৃষ্ণ সিংহ
কর্ত্তৃক মুদ্রিত। অবশিষ্ট সমস্ত অংশ "পৃথিবীর ইতিহাস প্রিণ্টিং
ওয়য়ার্কস" প্রেস, ২নং অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন,
হাওড়া, হইতে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

রায় শ্রীযুক্ত জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায় বাহাদুর।
Rai Jyotkumar Mukerjea Bahadur.

Engraved & Printed by K. v. Seyne & Bros.

শ্রীশ্রীহরিঃ—শরণং

উৎসর্গ।

— * —

সকল সদনুষ্ঠানে-উৎসাহশীল অশেষ গুণসম্পন্ন,

মাননীয় সুহৃদ্বর রায় শ্রীযুক্ত জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায়

বাহাদুর সমীপে।

মহোদয়,

দেশের সকল সদনুষ্ঠানেই আপনি মুক্তহস্ত। দেশের মধ্যে যেখানে যে শুভানুষ্ঠান হয়, সকল অনুষ্ঠানেই আপনি যথাসামর্থ্য সহায়তা করেন। আপনি ধীর, স্থির, সুবিজ্ঞ, বিদ্যাবিনয়াদিগুণসম্পন্ন। আমার প্রতি আপনার অকৃত্রিম স্নেহানুরাগের পরিচয় পাই। হাওড়া-সহরে সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে, আমারই অনুরোধে, আপনি এককালীন পঞ্চবিংশ সহস্র মুদ্রা দান করিলেন। সে কৃতজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। পুনশ্চ, আপনি আমার "পৃথিবীর ইতিহাসের" এই খণ্ড প্রকাশের ব্যয়ভার বহন করিতে সম্মত হইয়া, আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রাখিলেন। আপনার এ বদান্যতায় বঙ্গসাহিত্যের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ প্রকাশ পাইল এবং আমার প্রতিও যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করা হইল। আপনি সুখস্বাস্থ্য সহ দীর্ঘজীবী হউন, ভগবৎসমীপে ইহাই আমার আন্তরিক কামনা। ইতি—

হাওড়া,
২রা আশ্বিন, ১৩২১ সাল।

স্নেহানুগত,
শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।

সূচনা।

মানুষের ধ্যান-ধারণা সীমাবদ্ধ, সুতরাং ইতিহাস সঙ্কুচিত। ঘটনা যতই পুরাতন হয়, বিস্মৃতির আঁধারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। শেষে দূরে—অতি দূরে পিছাইয়া পড়িলে, প্রগাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া পুরাতন তত্ত্ব আর সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। অতীতের সম্বন্ধে চিরদিনই এইরূপ ঘটিয়া আসিতেছে, চিরদিনই এইরূপ ঘটিবে। যে স্তর অতি দূরে মৃত্তিকাভ্যন্তরে বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহার সন্ধানে অতি অল্প জনেই প্রবৃত্ত হন; আর, সন্ধান করিয়া তাহার অস্তিত্ব-খ্যাপনে কৃতকার্য্যতার আশাও অতি অল্প। প্রাচীন ভারতের পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধানে এখন ঠিক সেই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। স্তরের পর স্তর পড়িয়াছে, পুরাতনের উপর কত নূতন স্তর সঞ্চিত হইয়াছে; আবার সে সকল স্তরও পুরাতন হইয়া গিয়াছে, তাহার উপর আবার নূতন স্তর সঞ্চিত হইয়াছে। সুতরাং অতি দূর অতীতের সন্ধান কিছু পাওয়ার পক্ষে পদে পদেই বিঘ্ন ঘটিতেছে। পুরাতনের দশা এমনই ঘটিয়া থাকে!

অতীতের অন্তরায়।

ভারতবর্ষের সভ্যতা—অতি দূর অতীতের সভ্যতা। সুতরাং অন্ধকারের অতি প্রগাঢ় ব্যবধানের মধ্যে সে সভ্যতার ইতিহাস বিলুপ্ত হইয়া আছে। আবছায়ার মত দেখা যায়, আবার দেখা যায় না; ক্ষীণ রশ্মিরেখার মত এক এক বার দৃষ্টিগোচর হয়, আবার পরক্ষণেই দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া পড়ে। যে রীতি-পদ্ধতির অনুসরণে অধুনা ইতিহাস-গ্রন্থসমূহ লিখিত ও প্রচারিত হইয়া থাকে, সে পদ্ধতির অনুসরণ করিতে গেলে, ভারতবর্ষের পুরাতন পরিচয়-চিহ্ন কিছুই প্রকাশ করিবার সম্ভাবনা থাকে না। সে নিয়মের অনুবর্ত্তী হইলে বলিতে হয়,—পুরাকালে ভারতবর্ষের অস্তিত্বই ছিল না, অথবা উহা মনুষ্যবাসের অযোগ্য জলজঙ্গলপূর্ণ শ্বাপদসঙ্কুল স্থান মধ্যে পরিগণিত ছিল। কিন্তু সে সিদ্ধান্তেও কেহ উপনীত হইতে পারিতেছেন না; অথচ, ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরবের বিষয় একেবারে অস্বীকার করিতে কাহারও সাহসে কুলাইতেছে না! কারণ, পৃথিবীর কোনও সভ্যজাতির আদি-তত্ত্ব নিরূপণ করিতে হইলেই ভারতবর্ষের প্রতি টান পড়িয়া যায়; তখন আর ভারতবর্ষের প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিলে চলে না! পুত্র দেখিয়া যেমন পিতার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইতে হয়; সেইরূপ পৃথিবীর কোনও জাতির সভ্যতার আদি তত্ত্ব নিরূপণ করার আবশ্যক হইলে, ভারতবর্ষের প্রভাবের কথা আর অস্বীকার করিবার উপায় থাকে না। তাই অন্য দেশের সভ্যতার ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে গিয়াই এখন ভারতবর্ষের সম্বন্ধ-তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে। দূর অতীতের ভারতের ইতিহাস উদ্ধার করিবার পক্ষে সেই বিচ্ছিন্ন বিবরণ ভিন্ন অন্য উপাদানে বড় কেহ আস্থা স্থাপন করিতে চাহেন না।

অতীত ইতিহাসের বিচ্ছিন্ন উপাদান।

বিচ্ছিন্ন উপাদান কোথায় কি পাওয়া যায়, দুই একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। ভারতে কোনও পরিচয়-চিহ্ন নাই; কিন্তু চীন-দেশের অতি প্রাচীন কালের ইতিহাসে লিখিত আছে,—চীন-সম্রাট টে-সুং, তিব্বতীয়গণের সহিত যুদ্ধে ভারতবর্ষের নিকট সৈন্য-সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কুমার নামধেয় পূর্ব্ব-ভারতের এক নৃপতি আর এক সময়ে চীনাদিগকে যুদ্ধে সহায়তা করেন, ভারতবর্ষ পাঁচ বিভাগে বিভক্ত ছিল এবং ভারতবর্ষ হইতে চীন-সম্রাটের দরবারে রাজদূতগণ গতিবিধি করিতেন ও চীন-সম্রাটের দূতগণও ভারতের রাজদরবারে আসিয়া উপঢৌকনাদি প্রদান করিতেন;—এ সকল বিবরণ চীনের ইতিহাসেই দেখিতে পাই; * কিন্তু ভারতের ইতিহাসে এ সকল বিষয় লিখিত নাই। খৃষ্টজন্মের পূর্ব্ববর্ত্তিকাল হইতে মুসলমানগণের ভারত-প্রবেশের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বৈদেশিকগণের সহিত ভারতের সম্বন্ধ-সংশ্রবের এবং তাহাতে ভারতবর্ষের প্রভাবের এইরূপ আরও বিবিধ পরিচয় বৈদেশিকগণের ইতিহাসেই দেখিতে পাই। পারস্যের ইতিহাসে এবং গ্রীসদেশীয় ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের বর্ণনায় প্রতিপন্ন হয়, গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রায় পারস্য-সম্রাট জারাক্সেস ভারতবর্ষ হইতে সৈন্যদলের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ ঘটনা খৃষ্ট-জন্মের ৪৮০ বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল। সুতরাং ভারতের ইতিহাস নাই বলিয়া প্রাচীন ভারতের সভ্যতার স্মৃতি মুছিয়া ফেলিবার উপায় দেখি না। প্রাচ্যে যেমন চীনের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্বন্ধের পরিচয় পাই, পাশ্চাত্যে রোম-সাম্রাজ্যের সহিত ভারতের সেইরূপ সম্বন্ধের বিবরণই প্রাপ্ত হই। রোম-সাম্রাজ্য যখন উন্নতির উচ্চ-চূড়ায় সমারূঢ়, সেই সময়ে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক প্লিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন,—বাণিজ্য-ব্যাপারে রোমের কত অর্থই ভারতের উদর পূরণে শোষণ হইতেছে! † অর্থাৎ, এখন যেমন বিদেশী বণিকগণ ভারতের অর্থ শোষণ করিতেছেন বলিয়া রব উঠে, এক সময়ে ভারতের সম্বন্ধে রোম-সামাজ্যে সেইরূপ চীৎকার-ধ্বনি শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল। ভারতবর্ষের বাণিজ্যের প্রভাব এইরূপ দুই একটী দৃষ্টান্তে বেশ উপলব্ধি হয়। ভারতের ইতিহাসে এ পরিচয় খুঁজিয়া পাই না; কিন্তু পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক-গণের গ্রন্থপত্রে এ নিদর্শন আজিও লোপ পায় নাই। এইরূপ, পারস্যে, আরবে, গ্রীসে, মিশরে, এমন কি নূতন মহাদেশ বলিয়া পরিচিত সুদূর আমেরিকায় পর্য্যন্ত বিচ্ছিন্ন-ভাবে ভারতের এ সকল পরিচয় দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং সেই দূর অতীতের ধারাবাহিক ইতিহাস সংগৃহীত নাই হউক, বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত ভারতের গৌরবগাথা সংগৃহীত হইলেও প্রাচীন ভারতের প্রতিষ্ঠার বিষয় বেশ উপলব্ধি হইতে পারে।

বিচ্ছিন্নভাবে গৌরব-গাথা।

আধুনিক ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসের চারিটী স্তর নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তদনুসারে, প্রথম স্তর উপাখ্যান-মূলক। সে স্তরের সকলই অপ্রামাণ্য—উপকথায় পূর্ণ; দ্বিতীয় স্তর—অর্দ্ধ-ঐতিহাসিক; ঐ স্তরের ঐতিহাসিক উপাদান-সমূহের অধিকাংশই কাল্পনিক; তবে কতকগুলি সমসাময়িক কীর্ত্তি-স্মৃতি দ্বারা উহার কিছু কিছু অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়। তৃতীয় স্তর—ঐতিহাসিক স্তর বটে; তবে উহার মধ্যেও কতক অসত্য মিশিয়া আছে এবং উহা একদেশদর্শিতা-দোষদুষ্ট। চতুর্থ স্তর—অর্থাৎ বর্ত্তমান কালের প্রমাণ-পরম্পরা-সমন্বিত যে ইতিহাস, উহাই প্রকৃত ইতিহাস নামে অভিহিত হইবার

ইতিহাসের স্তর-বিভাগে।

উপযুক্ত। এ লক্ষণ অনুসারে বিচার করিতে গেলে, পুরাবৃত্ত দিনদিনই মলিন হইয়া পড়ে। আজ যাহা সম্ভব, কাল তাহা অসম্ভব বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে; এরূপ ব্যাপার আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি। এমন সকল ঘটনাকে তাহা হইলে মিথ্যা বলিয়া উপেক্ষা করিতে হয়। আওরঙ্গজেবের দরবারে রাঠোর সর্দার মুকুন্দদাসের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। সম্রাট আদেশ দেন,—'মুকুন্দদাসকে ভীষণ-দর্শন ব্যাঘ্রের পিঞ্জর মধ্যে নিক্ষেপ করা হউক।' কেহ মনে করে নাই, সে বুভুক্ষু ব্যাঘ্রের কবল হইতে মুকুন্দদাস মুক্তিলাভ করিবে। সম্রাট এবং সভাসদ্‌গণ সকলে দূরে দণ্ডায়মান; মুকুন্দদাস নিঃসহায় নিরস্ত্র অবস্থায় সেই ব্যাঘ্রের পিঞ্জরে প্রবেশ করিলেন। পিঞ্জরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই মুকুন্দদাস আপনার স্বভাবসিদ্ধ অবজ্ঞার স্বরে ব্যাঘ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—'মিঞার ব্যাঘ্র! এস, একবার যশোবন্ত সিংহের ব্যাঘ্রের সম্মুখীন হও।' মুকুন্দদাসের ক্রোধদীপ্ত রক্তচক্ষু ব্যাঘ্রের প্রতি ন্যস্ত হইল। মুকুন্দদাসের ভীষণ-দর্শন বিঘূর্ণিত লোচন সন্দর্শন করিয়া ব্যাঘ্র ভয়চকিত স্তম্ভিত হইল, মস্তক অবনত করিল এবং পশ্চাৎ ফিরিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। রাঠোর-বীর তখন উচ্চকণ্ঠে কহিলেন,—'যে শত্রু পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে—পশ্চাৎপদ হয়, রাজপুত কখনও তাহাকে আক্রমণ করে না।' আওরঙ্গজেব রাঠোর-বীরের এবম্বিধ সাহসিকতা প্রত্যক্ষ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে মুক্তিদান করিলেন, যথোচিত উপঢৌকন দিলেন এবং তাঁহার ন্যায় নির্ভীক তাঁহার কোনও সন্তান-সন্ততি আছে কি না—জানিতে চাহিলেন। আর এই হইতে মুকুন্দদাস 'নাহারখান' বা ব্যাঘ্রবিজয়ী উপাধি প্রাপ্ত হইলেন।‡ এ সাহসিকতা—এ বীরত্ব আজিকালিকার দিনে বিরল। সুতরাং ঐরূপ ঘটনার উল্লেখ, ঐতিহাসিকের বিশ্বাসযোগ্য না হওয়াই সম্ভব। কিন্তু তাই বলিয়া মোগল-দরবারে প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট এই ব্যাপার উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে কি? এইরূপ বিচার করিয়া দেখিতে গেলে, প্রাচীন-ভারতের গৌরব-গরিমার বিবরণ (আধুনিক ঐতিহাসিকগণ যাহাতে আস্থা-স্থাপন করেন না) উপেক্ষা করিতে পারা যায় না। সুতরাং ইতিহাস-প্রকটনে পূর্ব্বোক্ত স্তর-নির্দ্দেশ কখনই সমীচীন বলিয়া মনে করি না।

অতি-দূরের ইতিহাসের ধারাবাহিক সূত্র ছিন্ন হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া সকল গৌরব-বিভব—ইতিহাসের আলোচ্য শৌর্য্য, বীর্য্য, বিদ্যা, বাণিজ্য প্রভৃতি—কখনই লোপ পাইতে পারে না। জলমধ্যস্থিত তৈল-পদার্থের ন্যায় তাহা আপনিই উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে;—কেহই তাহা রোধ করিতে পারিবে না। ইতিহাসের কি উদ্দেশ্য? একের বিলয়ে অন্যের অভ্যুদয়ে গৌরব-গরিমার গতি প্রত্যক্ষীভূত করাই কি ইতিহাসের উদ্দেশ্য নয়? হুমায়ুনের পর সিংহাসন কে পাইয়াছিলেন, অথবা আকবরের বা আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারী কে ছিলেন,—কেবল ইহাই

ইতিহাসের মুখ্য লক্ষ্য।

* এই খণ্ড পৃথিবীর ইতিহাসের ১০৬ম ও ১০৭ম প্রভৃতি পৃষ্ঠায় এবং কর্ণেল হেনরি ইউল প্রণীত "ক্যাথে এণ্ড দি ওয়ে থিদার" (*Cathay and the Way Thither*, by Col. Henry Yule) গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

† বৈদেশিক বাণিজ্যে বিদেশের অর্থ-শোষণ সম্বন্ধে ভারতের প্রতি অভিযোগ বিষয়ে এই খণ্ডের ৬৬ম পৃষ্ঠা প্রভৃতি এবং প্লিনির 'প্রাকৃতিক ইতিহাস' (*Historia Naturalis*;—Pliny) প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

‡ *Vide*, Tod's *Rajasthan*, Vol. II.

কণ্ঠস্থ করা ইতিহাসের উদ্দেশ্য নয়। ইতিহাসের মুখ্য উদ্দেশ্য— প্রধান শিক্ষা—কোন্ জাতি বা কোন্ সম্প্রদায় কোন্ গুণে বরণীয় আসন লাভ করিয়াছিলেন! ধারাবাহিক শৃঙ্খলা-সূত্র-রক্ষা—সে কেবল উহার আনুষঙ্গিক। জাতির শ্রেষ্ঠত্ব মহত্ব কিরূপে কোথায় প্রতিভাত দেখি?—অথবা, কোন্ পথে চলিলে -কোন্ নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইলে, শ্রেষ্ঠত্ব মহত্ব অধিগত হয়?—প্রাচীন কোন্ জাতি কি ভাবে শ্রেষ্ঠত্বের মহত্বের উচ্চ আসনে সমাসীন হইয়াছিলেন?—তাহা স্মরণ করিতে করিতেই তথ্য অবগত হওয়া যায়। আর, তাহা স্মরণ করাইবার জন্যই ইতিহাস। ধর্ম্মে সেই শ্রেষ্ঠত্বের মহত্বের পরিচয় আছে, সমাজ বন্ধনে সেই শ্রেষ্ঠত্বের মহত্বের পরিচয় আছে, সাহিত্যে সেই শ্রেষ্ঠত্বের মহত্বের পরিচয় আছে, কলাবিদ্যায় সেই শ্রেষ্ঠত্বের মহত্বের পরিচয় আছে, চরিত্রকথায় সেই শ্রেষ্ঠত্বের মহত্বের পরিচয় আছে। কেবল ধারাবাহিক সম্বন্ধসূত্র অনুসন্ধান করিয়া কি ফললাভ হইবে? যদি সন্ধান করিতে হয়, সন্ধান করিয়া দেখ,—ধর্ম্মপ্রাণতায় কি সুখ আছে, বিবিধ বিদ্যার উৎকর্ষ-সাধনে কি সুখ আছে,—আর অতীত ইতিহাসের বরণীয়গণ কেমন করিয়া সে সুখ আয়ত্ত করিয়াছিলেন! সেই সন্ধানের দৃষ্টি প্রখর করিবার জন্য -সেই সন্ধানের পথ প্রশস্ত করিবার উদ্দেশ্যেই—ইতিহাসের আবশ্যকতা। সেই লক্ষ্য রাখিয়াই—সেই অনুপ্রাণনায় অনুপ্রাণিত হইয়াই—"পৃথিবীর ইতিহাস" প্রণয়নের কল্পনায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছি। সাধারণ ইতিহাসে যাহা আছে, মুসলমান-রাজত্বের পর ইংরেজ রাজত্বের ইতিহাস অন্যত্র যাহা পরিবর্ণিত হইয়াছে, সে ইতিহাস তো সহজেই বিবৃত করা যাইবে। কিন্তু যাহা বিচ্ছিন্নভাবে আছে, অথচ যাহা প্রকৃত ইতিহাসের প্রকৃত উপাদান, প্রধানতঃ আমরা তাহাই অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেছি। তাই আমাদের এ ইতিহাস একটু অভিনব পদ্ধতিতে সংগ্রথিত হইতেছে।

"পৃথিবীর ইতিহাস" এই যে চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হইল, এক হিসাবে ইহাও তাই ইতিহাসের ভূমিকা মাত্র। আমরা যাঁহাদের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেই, তাঁহারা কত গুণে গুণবান ছিলেন, কি গুণে বরেণ্য শরণ্য হইয়া আছেন, তাহা স্মরণ করাইবার জন্যই আমাদের এই সূচনা। শ্রবণে, স্মরণে, মননে, তাঁহাদের গুণ সঞ্চারিত হয়। তাই পুনঃপুনঃ স্মরণীয় আলেখ্য নয়ন-সমক্ষে উপস্থাপিত করিবার প্রয়াস পাইতেছি। শ্রীভগবানের করুণায় শুভসঙ্কল্প সিদ্ধ হউক, জ্ঞানের জ্যোতিঃতে হৃদয় জ্যোতিষ্মান্ হউক, বিদ্যার আলোকে দেশ উদ্ভাসিত হউক। গ্রন্থপ্রণয়নে, গ্রন্থগ্রহণে যাঁহারা উৎসাহ দিতেছেন, যাঁহাদের গ্রন্থের সহায়তা পাইতেছি, তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ আছি। এই গ্রন্থ-প্রকাশে বাঙ্গালার গুণী জ্ঞানী বিদ্যোৎসাহী জনের উৎসাহদান কখনই ভুলিবার নহে। অপিচ, এই গ্রন্থ প্রণয়নে শ্রীমান্ প্রমথনাথ সান্যালের সহায়তার বিষয় পূর্ব্ববৎ উল্লেখযোগ্য। রচনায়, শৃঙ্খলা রক্ষায় ও প্রকাশ পক্ষে তাঁহার যত্ন অধ্যবসায় অতুলনীয়। এই গ্রন্থের সহিত তাঁহার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইতি—

উপসংহার।

হাওড়া,
২রা আশ্বিন, ১৩২১ সাল।

নিবেদক,
শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।

ভারতবর্ষ।

সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র।

ভারতবর্ষ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রাচীন-ভারতের ইতিহাস।

[আকাঙ্ক্ষা—সাযুজ্য লাভ,—চিন্তার নিদর্শন,—প্রার্থনায় পরিস্ফুট,—প্রাচীন ভারতের গৌরবের পরিচয়,—ভারতের ইতিহাস—ভগবন্মহিমা ঘোষণা,—যুগ ও অবতার—ভারতের ইতিহাসের স্তর পর্য্যায়,—বৈষম্যে সাম্য-স্থাপন,—ভারতের ইতিহাসের মেরুদণ্ড,—ইতিহাসের শেষ স্মৃতি,—অষ্টাত্রিংশ লক্ষাধিক বর্ষের বিষয়,—সাম্য-বৈষম্যের সংঘর্ষ তত্ত্ব,—বৈষম্যে সাম্য-স্থাপনের বা বিপ্লব-বিদূরণের ইতিহাসই ভারতের ইতিহাস।]

"উদ্বয়ং তমসস্পরি জ্যোতিষ্পশ্যন্ত উত্তরং।
দেবং দেবত্রা সূর্য্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমং॥"

'হে অন্ধকারাতীত! হে জ্যোতির্ম্ময়! হে উৎকৃষ্টতর! হে দেবদেব! আপনার উপাসনায় যেন আপনার উত্তম জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হই।' মন্ত্রে ঋষি পরমাত্মাকে সূর্য্যদেব নামে অভিহিত করিতেছেন; আর তাঁহার সহিত সম্মিলনের প্রার্থনা জানাইতেছেন। প্রার্থনা জানাইয়া বলিতেছেন,—'হে সূর্য্যদেব! আপনার উপাসনা করিয়া আমি যেন আপনার উত্তম জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হই, অর্থাৎ আপনার সাযুজ্য লাভ করি।'

চিন্তার নিদর্শন।

প্রাচীন ভারতের মনীষিগণ এই মন্ত্রেরই উপাসক ছিলেন। শ্রুতি বলিয়াছেন,—"তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি।' যিনি যেরূপ প্রার্থনা করেন, তিনি সেইরূপ সাফল্য প্রাপ্ত হন। শ্রুতি-বাক্যে বিশ্বাসবান্ হইয়া, তাঁহারা কেবল ঐ এক ভাবনায় বিভোর ছিলেন। কি করিলে অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হয়, কি করিলে দিব্যজ্যোতিঃ লাভ করা যায়, কি করিলে জ্যোতিঃরূপে জ্যোতির্ম্ময়ের সহিত সম্মিলিত হইতে পারেন, কি করিলে আর জন্মজরামৃত্যুর অধীন হইতে হয় না,—এ ভিন্ন অন্য কোনও চিন্তা কখনও তাঁহাদের হৃদয় অধিকার করে নাই। প্রাচীন ভারতের পরিচয় দিবার সামগ্রী যে কিছু স্মৃতি-চিহ্ন অবশিষ্ট আছে, সকলই তাঁহাদের সেই চিন্তার নিদর্শন বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

প্রাচীন-ভারতের গৌরবের-ঐশ্বর্য্যের প্রকৃষ্ট পরিচয়—তাহার সাহিত্য। কিন্তু সে সাহিত্যে সেই স্মৃতিই উজ্জ্বল নহে কি? ভারতের অতীত সাহিত্যের অভ্যন্তরে ঐ যে কোটি-সূর্য্যের জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইতেছে, তাহাতে অন্ধজনেরও দৃষ্টি-শক্তি বিকাশ-প্রাপ্ত হয়। স্মৃতির বহির্ভূত দূর অতীতের ইতিহাস দিবা-মান-দণ্ডের গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ করা কখনই সম্ভবপর নহে। কাল অনন্ত; কাল-সমুদ্রের অনন্ত-বক্ষে অনন্ত বিক্ষোভ অহর্নিশ সমুত্থিত হইতেছে। সংসারে এমন কোনও অদ্বিতীয় ধী-শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন নাই, যিনি সেই অনন্ত-বিক্ষোভের অনন্ত-লীলা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে সমর্থ হন। সহস্রাধিক বর্ষের বিক্ষোভের বিষয় লিপিবদ্ধ করিতেই ইতিহাস পর্য্যুদস্ত; অনন্ত-কোটি কল্পের অনন্ত-কোটি বিক্ষোভ-কাহিনী কে লিপিবদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে? সীমাবদ্ধ ধ্যান-ধারণার গণ্ডীর মধ্যে অসীম অনন্তকে ধারণা করিতে অসমর্থ হইয়াই, ঐতিহাসিকগণ 'ভারতের ইতিহাস নাই' বলিয়া মনে করেন।

গৌরবের পরিচয়।

কিন্তু সত্যই কি প্রাচীন ভারতের ইতিহাস নাই? ভক্ত বলিয়াছেন,—'আকাশ যদি পত্র হয়, সমুদ্র যদি মসীপাত্র হয়, তাহা হইলেও ভগবানের মহিমা লিখিয়া শেষ করা যায় না।' ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধেও অনেকটা সেই উক্তিই প্রযোজ্য। ভারতের ইতিহাস কি? ভারতের ইতিহাসই তো—ভগবন্মহিমা-ঘোষণা! যখনই ধর্ম্মের গ্লানি হইয়াছে, যখনই অধর্ম্মের অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে, আর যখনই শ্রীভগবান ধর্ম্মরক্ষার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন, তখনই ভারতের সাহিত্যে ভারতের ইতিহাস বিকাশ পাইয়াছে। আধুনিক সাহিত্যে যে সকল ইতিহাস বিকাশ-প্রাপ্ত হইতেছে, তৎসমুদায়ও প্রধানতঃ বিপ্লবের ইতিহাস—সংঘর্ষের ইতিহাস। তবে পার্থক্য—এখন রাজা, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য লইয়া দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ উপস্থিত হয়; কিন্তু প্রাচীন-ভারতের ইতিহাসে সে দ্বন্দ্ব—ধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপন ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্য—বেদের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন; দেখিবেন—ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সংঘর্ষে ধর্ম্মের বিজয়-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে! ব্রাহ্মণে, আরণ্যকে, উপনিষদে—সর্ব্বত্রই সেই দুন্দুভি-নিনাদ! মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণে যে বীণা-ধ্বনির ঝঙ্কার তুলিয়াছেন, তাহাতেই বা কি মূর্চ্ছনায় কি স্বর-লহরী উত্থিত হইয়াছে? শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় হৃষীকেশ পাঞ্চজন্য-নিনাদে ব্যোম প্রতিধ্বনিত করিয়া কি বাণী ঘোষণা করিতেছেন? তন্ত্রে, পুরাণে, মহাভারতে—প্রাচীন ভারতের আর আর প্রাচীন ইতিহাসে—কি নিদর্শন প্রকটিত রহিয়াছে? সকলেরই লক্ষ্য,—অধর্ম্মের বিক্ষোভ-বিদূরণে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা-স্থাপন। তাহাই কি ভারতের ইতিহাস নহে?

ভারতের ইতিহাস কি?

সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি—যুগ-চতুষ্টয়-বিভাগ—কি শিক্ষা প্রদান করে? সত্যে মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহ-নৃসিংহ-বামন, ত্রেতায় ভার্গব-শ্রীরাম, দ্বাপরে নরনারায়ণ বাসুদেব, কলিযুগে বুদ্ধ-কল্কি প্রভৃতি যে অবতার-সমূহের বিবরণ শাস্ত্র-গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহাতেই বা কি বুঝিতে পারি? বুঝিতে পারি না কি—ভারতের ইতিহাসের এক একটি স্তর—সেই এক একটি অবতার-তত্ত্বে প্রকটিত। অবতার-তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে, আমরা বুঝিতে পারি,—সংসার যখন

যুগ ও অবতার।

'আমিত্বে' আত্মহারা হয়, স্বরূপ-তত্ত্ব ভুলিয়া যায়, বিভ্রান্ত-পথের অনুসরণ করে; তখন দিব্যজ্ঞান প্রদান জন্য, সুপথে পরিচালিত করিবার অভিপ্রায়ে, পতিতপাবন ভগবানের আবির্ভাব ঘটে। মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতার-পঞ্চকের কার্য্যকারিতা * বিষয়ে মতান্তর থাকিতে পারে; কিন্তু ত্রেতায়, দ্বাপরে ও কলিযুগে যে সকল অবতারের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহাদের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে কাহারও মনে কোনরূপ দ্বিধা উপস্থিত হইতে পারে না। সসাগরা ধরিত্রীর আধিপত্য লাভ করিয়া, ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বে গরীয়ান্ হইয়া, লঙ্কেশ্বর রাবণ নিদারুণ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অত্যাচার-প্রভাবে ধর্ম্মকর্ম্ম লোপ পাইতে বসিয়াছিল; যাগযজ্ঞ পণ্ড হইতেছিল;—ভগবৎ-সন্নিকর্ষ-লাভের জন্য সংসার যে পথে অগ্রসর হইয়াছিল, যে পথ অবরুদ্ধ হইতে চলিয়াছিল; ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে সংসার আচ্ছন্ন করিতেছিল। শ্রীরামচন্দ্র-রূপ জ্যোতির্ম্ময়ের আবির্ভাবে সে অজ্ঞান-আঁধার দূরীভূত হয়; অত্যাচার দূরে যায়;—গন্তব্য পথ মুক্ত হয়;—যাগ-যজ্ঞাদির বিঘ্ন বিদূরিত হয়। রামায়ণ মহাকাব্যে ভারতের ইতিহাসের এই এক অভিনব স্তর প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে ও মহাভারতে—এবম্বিধ নানা স্তর-পর্য্যায় পরিদৃশ্যমান। পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় প্রদান বাহুল্য-মাত্র। তুলনায় সে দিনের যে গৌতম-বুদ্ধ—তাঁহার আবির্ভাব-তিরোভাবকেও তদ্রূপ একটি স্তর-পর্য্যায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি।

সাম্যে—সৃষ্টি-রক্ষা; বৈষম্যে—বিনাশ। প্রকৃতি-রাজ্যে সাম্য-বৈষম্যের চির-সংগ্রাম চলিয়াছে। একারে বৈষম্য ঘটিতেছে; প্রকৃতি প্রতিনিয়ত সাম্যরক্ষার প্রয়াস পাইতেছেন।

সাম্য ও বৈষম্য।

প্রচণ্ড রৌদ্রের খরকরতাপে সংসার দগ্ধীভূত হইবার উপক্রম হইয়াছিল; বারিবর্ষণে তাহার তপ্ত-প্রাণ শীতল হইল। বর্ষার প্রবল-প্রবাহে পৃথিবী পরিমগ্ন হইতে চলিয়াছিল; দিনমণি উষ্ণ-নিশ্বাসে তাহা শোষণ করিয়া লইলেন। নিসর্গের এই রীতি নরদেহে নিত্য-প্রত্যক্ষীভূত। আয়ুর্ব্বেদ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন,—বায়ু-পিত্ত-কফ তিনের সমতায় মানব-জীবন; একের অত্যধিক প্রাবল্যে জীবন-ভার দুর্ব্বহ হইয়া পড়ে। দেখিতেও পাই,—দেহের মধ্যে সমতা-রক্ষার জন্য নিয়ত একটা সংঘর্ষ চলিয়াছে। সমতা-ভঙ্গ হইলেই সৃষ্টি-নাশের আশঙ্কা; তাই বুঝি প্রকৃতি প্রতিনিয়ত সমতা-রক্ষার জন্য প্রয়াসী রহিয়াছেন। শাস্ত্র-গ্রন্থাদির মধ্যে ভারতের যে ইতিহাস বিচ্ছিন্ন-ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে, সাম্য-স্থাপনের দৃষ্টান্তই তাহার সর্ব্বত্র প্রকট পরিদৃশ্যমান্। মহাভারতে শ্রীভগবান যে নীতি-তত্ত্ব প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সাম্য-রক্ষাই তাহার মূল লক্ষ্য নহে কি? অধর্ম্মের উদ্বেল তরঙ্গে ভারতবর্ষ ধ্বংসের অতল-তলে নিমজ্জিত হইতেছিল,—ধর্ম্মসংস্থাপন-রূপ সমতা-রক্ষায় শ্রীভগবান তাহার উদ্ধার-সাধন করেন। "সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্"—অতি-বৃদ্ধি কোনও বিষয়েই সমীচীন নহে। দান-ধর্ম্ম সর্ব্বজন-শ্লাঘনীয়। কিন্তু রাজচক্রবর্ত্তী বলি, ঐশ্বর্য্য-মদে মত্ত হইয়া, পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া, ক্ষমতা-অক্ষমতার বিষয় না ভাবিয়া, পরিমাণের পর্য্যায় না বুঝিয়া, আত্ম-

* নির্ঘণ্টানুসরণে, "পৃথিবীর ইতিহাসের" বিভিন্ন স্থানে, অবতার শব্দের আলোচনায়, সে সকল তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবেন।

প্রাধান্য খ্যাপনোদ্দেশ্যে দান-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। ফল হইল—তাঁহার পাতাল-বাস। শ্রীভগবান বুঝাইয়া দিলেন,—"সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্।" বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের বিষয় আলোচনা করিলে, এই তত্ত্ব বিশদ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। যজ্ঞকার্য্যে পশুবলি শ্রেয়ঃসাধক বলিয়া শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু সে বলি কেমন বলি—কি অবস্থায় কি ভাবে সে বলি সম্পন্ন হয়, তৎপ্রতি কেহই দৃষ্টি রাখিলেন না; যজ্ঞার্থে পশুবলির প্রকৃত তাৎপর্য্য কালবশে মানুষ ভুলিয়া গেল; পরন্তু মোহবশে পশুহননকে—পশুহনন হইতে নরবলি পর্য্যন্তকে—ধর্ম্ম-কর্ম্ম বলিয়া মনে করিল। * দেশব্যাপী আর্ত্তনাদ উঠিল। ভগবানের আসন টলিল। পশুহনন-নরবলি-নিবারণোদ্দেশ্যে তিনি 'অহিংসা পরমো ধর্ম্ম' মহাবাক্য প্রচার করিতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। স্রোত ফিরিল; সমতা রক্ষা হইল। ধর্ম্মের নামে যে অধর্ম্মের অনুষ্ঠান চলিয়াছিল, তাহা আর অব্যাহত রহিল না। কিন্তু কালক্রমে আবার হিতে বিপরীত ফল ফলিল। মহাপুরুষ যে উদ্দেশ্যে যে মহাবাণী প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন, সংসার তাহা ভুলিয়া গেল। তাহারা তখন অহিংসা-মাত্রকেই শ্রেয়ঃধর্ম্ম বলিয়া মনে করিল। ফলে, বিপরীত ব্যাপার সংঘটিত হইতে লাগিল; অহিংসার প্রশ্রয় দিতে গিয়া প্রকারান্তরে হিংসা-বৃত্তিই পরিপুষ্টি-লাভ করিল। মানুষ দুগ্ধদানে সর্পপোষণের নীতির অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। জীবের জীবন-রক্ষার জন্য যে ধর্ম্মমতের প্রচার হইয়াছিল, সেই ধর্ম্মমতের প্রভাবে মৎকুণ-জাতীয় জীবের দ্বারা মানুষ মানুষের রক্ত শোষণ করাইতে সঙ্কোচ বোধ করিল না। আবার শ্রীভগবানের আসন টলিল। লুপ্তপ্রায় ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের উদ্ধার-সাধন উদ্দেশ্যে তিনি 'শিবোঽহং' শঙ্করাচার্য্য-রূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন।

বৈষম্যে সাম্য-স্থাপন-জনিত এবম্বিধ সংঘর্ষ-কাহিনীই ভারতের লুপ্ত-ইতিহাসের শেষ স্মৃতি। শাস্ত্র-সমূহ সেই স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন; আর তাহারই মধ্য দিয়া প্রাচীন ভারতের ঐশ্বর্য্য-সম্পদের গৌরব-বিভবের রশ্মি-রেখা বিকাশ পাইতেছে। বলিয়াছি তো, রাবণের অত্যাচারে অধর্ম্ম-রূপ অনল-প্রবাহে সংসার দগ্ধীভূত হইতে বসিয়াছিল; শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাবে, ধর্ম্ম-রক্ষারূপ শান্তি-বারি-নিষেকে, সমাজ-শরীর নবজীবন লাভ করে। বৈষম্যে সাম্য-স্থাপনের এই চিত্র রামায়ণে প্রকটিত আছে। তাহারই অনুষঙ্গে তাৎকালিক, সমাজ, ধর্ম্ম, রীতি-

ইতিহাসের শেষ-স্মৃতি।

* পশুবলি, নরবলি প্রভৃতি শব্দে দ্বিবিধ অর্থ সূচিত হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি হিংস্র-পশুর উপদ্রবে সমাজ-শরীর নিয়ত উদ্বেলিত। সে ক্ষেত্রে পশুবলি শব্দের তাৎপর্য্য—ঐ সকল রিপুর সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া ভগবচ্চরণে আত্ম-সমর্পণ। মানুষ যখন রিপুর সংশ্রব পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়, তখনই সে ভগবানের নিকট পশু-বলিদানে সমর্থ হইয়া থাকে। দেবোদ্দেশ্যে পশু-বলিদানের ইহাই প্রকৃষ্ট তাৎপর্য্য। নরবলি শব্দের তাৎপর্য্য—সম্পূর্ণরূপে ভগবৎ-পাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণ। তার পর, যজ্ঞার্থে পশুবলি হইত বলিলে যদি বুঝি,—সত্যসত্যই ছাগাদি জীবন্ত পশুকে দেবোদ্দেশ্যে হনন করা হইত, তাহা হইলেও সে হনন—হনন নহে। কারণ, বলিপ্রদত্ত জীব নবজীবন লাভ করিত,—শাস্ত্রে ইহাই উল্লেখ আছে। নরমেধ যজ্ঞে শুনঃশেফ প্রাণদান করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। সুতরাং নরবলি শব্দে যে নর-হনন বুঝাইত, তাহা নহে। যাঁহাদের প্রাণদানের ক্ষমতা ছিল, তাঁহারাই সে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। যাঁহারা প্রাণদানে অপারক, মাংস আশে যাঁহারা পশুবলির প্রশ্রয় দেন, তাঁহাদের বলি—বলি নয়, সে বলি—হনন মাত্র। অর্থ বিপর্য্যয়ে এক হইতে আর এক ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে।

নীতি, আচার-ব্যবহার প্রভৃতির চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। মহাভারতেও তাহাই। পুরাণ-পরম্পরায়ও তাহাই। মুখ্য-ঘটনা ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা—সাম্য-রক্ষা; অনুষঙ্গে—অন্যান্য কথা। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, পুরাতত্ত্বের গভীর গহ্বরে যতই দূরে প্রবেশ করা যায়, সাধারণ ঘটনা-পরম্পরা বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়, অসাধারণ মাত্র দৃষ্টি-সীমার অন্তর্ভুক্ত থাকে। কল্পান্তরের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া যদি বর্ত্তমান মন্বন্তরের মাত্র অষ্টাবিংশতিতম চতুর্যুগের প্রসঙ্গ আলোচনা করি, তাহা হইলেও প্রায় ৪৩ লক্ষ ২০ সহস্র বৎসরের সাধারণ ইতিহাস বলিতে হয়। কলির অনাগত বর্ষ-সমূহ বাদ দিলেও ৩৮ লক্ষ ৯৩ হাজার ১৪ বৎসরের বিষয় বলার প্রয়োজন। অধুনা যাহা পুরাতত্ত্ব বা ইতিহাস বলিয়া প্রচারিত, দুই তিন সহস্র বৎসরের অন্তর্গত ইতিবৃত্তের অনুসন্ধান করিতে গিয়াই তৎসমুদায় পর্য্যুদস্ত। তাহাতে সপ্রমাণ হয়,—অল্পায়ু অল্প-বুদ্ধি জনের পক্ষে অতি-পূর্ব্বের গবেষণায় প্রবৃত্ত হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক-গণের মধ্যে যাঁহারা প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অতি-অনুসন্ধিৎসু যিনি, তিনিও মাসিডনাধিপতি আলেকজাণ্ডারের ভারতবর্ষে আগমনের পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও তথ্যই নিরূপণ করিতে অগ্রসর নহেন। ঐতিহাসিক-গণের অনেকেই আমাদিগের শাস্ত্র-কথিত বিষয়-সমূহের কাল-নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ হইয়া, বলিতে বাধ্য হইয়াছেন,—'যাহার কাল-নির্দ্দেশ করা যায় না, যাহার পৌর্ব্বাপর্য্য অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না, তাহা ইতিহাস পদবাচ্য নহে।' * বলা বাহুল্য, এ মত স্বতঃসিদ্ধরূপে গৃহীত হইতে পারে না। ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে;—তাহার নিদর্শনও আছে। কিন্তু নিশ্চয়রূপে তাহার কাল-নির্দ্দেশ হইতেছে না বলিয়া, অথবা তাহার কাল-নির্দ্দেশে অসমর্থ হইয়া, যাহা ঘটিয়াছে তাহা 'ঘটে নাই' বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় কি? আমাদের শাস্ত্র-বর্ণিত ব্যাপার-সমূহের কাল—শাস্ত্রই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অনুসন্ধান করিয়া সে কাল-পরিমাণ উদ্ধার করিতে না পারিলে, ত্রুটি অস্মদ্-পক্ষেরই মানিয়া লইতে হইবে।

---

* ভিন্সেণ্ট স্মিথ প্রাচীন ভারতের ইতিহাস লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহার মত,—"Facts to which dates cannot be assigned, although they may be invaluable for the purpose of Ethnology, Philology and other sciences, are of no use to the historian."—*The Early History of India*, by Vincent A. Smith." ভিন্সেণ্ট স্মিথ এই হেতুবাদে আলেকজাণ্ডারের ভারত আগমনের সময় হইতে ভারতবর্ষের ইতিহাস আরম্ভ করিয়াছেন। আধুনিক পাশ্চাত্য-জাতির সহিত সংস্রব ঘটে নাই বলিয়াই যে অস্তিত্বাভাব ঘটিবে, তাহার কোনও কারণ নাই। ভূমধ্য-সাগরের উপকূল-ভাগে সভ্যতার প্রথম বিকাশ হয় বলিয়া পাশ্চাত্য-জাতির ধারণা। কিন্তু তথাকথিত সভ্য-জাতিদিগের মধ্যে ভারতের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল,—ইহা আমরা পুনঃপুনঃ প্রমাণ করিয়াছি। সে প্রমাণ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যাঁহারা অস্বীকার করেন, তাঁহা-দিগকেও বলিতে হইয়াছে,—সে সময়েও ভারতবর্ষের নাম অপরিজ্ঞাত ছিল না। হেন্‌রি বিভারিজ ভারতবর্ষের ইতিহাস-লেখকগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠান্বিত। তাঁহার লিখিত ইতিহাসের ভূমিকায় প্রথমেই তাঁহাকে প্রকারান্তরে এ কথা স্বীকার করিতে হইয়াছে। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—"Long after the name of India had become familiar in the earliest seats of civilisation in the Mediterranean, little more was known of the country designated by it than that it was a region of vast extent situated in the far east, near the outermost verge of the known world."—*A Comprehensive History of India* by Henry Beveridge.

কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে গণনা করিবার অবসর অনেকেই পাইয়াছেন। তবে অর্থ-নির্ণয় পক্ষে বিভ্রান্ত হওয়ায়, নানা জনের মত নানা প্রকার দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এইরূপ বিভ্রমের কারণ, আমাদের মনে হয়, দৃষ্টি-শক্তির অসম্পূর্ণতা। দৃষ্টি-শক্তির অসম্পূর্ণতা-হেতু মানুষ এক পদার্থ অন্যরূপে দর্শন করিয়া থাকে। মানুষ রজ্জুতে সর্প দর্শন করে; বৃক্ষছায়ায় জীব-জন্তুর মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করে। এবম্বিধ দৃষ্টি-বিভ্রমের-দৃষ্টান্তের অবধি নাই। তাই দর্শন-শাস্ত্র-মতে প্রত্যক্ষ প্রমাণও অনেক স্থলে অপ্রমাণের মধ্যে গণ্য হয়। যাঁহারা পাশ্চাত্য-দৃষ্টিতে শাস্ত্র-বর্ণিত ঘটনাবলীর অনুসন্ধানে প্রয়াস পান, দৃষ্টি-বিভ্রমই স্বরূপ-তত্ত্ব-নির্ণয়ের পথে অন্তরায় আনয়ন করে। তাঁহাদিগকে তাই অনেক স্থলেই বিফল-মনোরথ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয়। গ্রীসের অভ্যুদয়ে পাশ্চাত্য জাতিরা প্রধানতঃ ভারত-বর্ষের সহিত যে দিন পরিচিত হন, সেই দিন হইতেই তাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস গণনা করিয়া আসিতেছেন। তাহার পূর্ব্বের ইতিহাসে লক্ষ্য করিবার অবসর তাঁহাদের ঘটে নাই। তাই ভারতের ইতিহাস নাই অথবা ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ভারতবর্ষে সংঘটিত হয় নাই,—এই বলিয়া তাঁহারা নিরস্ত।

শাস্ত্র-বর্ণিত বৈষম্যে সাম্য-স্থাপন-জনিত সংঘর্ষ-কাহিনীর মধ্যে ভারতের যে ইতিহাস রহিয়াছে, তৎপ্রতি ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টি প্রায়ই আকৃষ্ট নয়। প্রাচীন-ভারতের পুরাবৃত্ত আলোচনা করিতে হইলে, সাম্য-বৈষম্যের সেই সংঘর্ষ-তত্ত্ব আলোচনাই প্রধান আবশ্যক। তাহারই মধ্যে ইতিহাসের সকল উপাদান নিহিত আছে। মহাভারতে কুরু-পাণ্ডবের সংঘর্ষ-বর্ণন-ব্যপদেশে তাঁহাদের পূর্ব্বের ও পরের অনেক কথাই পরিবর্ণিত রহিয়াছে। পুরাণ-পরম্পরাও সেই স্মৃতিই বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। সুতরাং যদি প্রমাণ করিতে পারি,—পাঁচ-সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের মহাসমর সংঘটিত হইয়াছিল (সে প্রমাণ আমরা পূর্ব্বেই করিয়াছি), তাহার পূর্ব্বের ও পরের দুই চারি সহস্র বর্ষের ইতিহাসও অনায়াসে সংগৃহীত হইতে পারে। কাল অনন্ত; ইতিহাসের উপাদানও অনন্ত। সেই অনন্ত উপাদানের মধ্যে ধর্ম্মের সহিত যাহা সংস্রবযুক্ত হইয়া আছে, তাহাই আছে; অবশিষ্ট যাহা, তাহা বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। ভারতের ইতিহাস—ধর্ম্মের ইতিহাস। যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে, তখনই ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থ শ্রীভগবানের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, তখনই ভারতের ইতিহাস উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। শৌর্য্য-বীর্য্যের ও সভ্যতার যে কিছু চিত্র দেখিতে চাও, সেই ঔজ্জ্বল্যের মধ্যেই প্রস্ফুট দেখিবে। এক একটী ধর্ম্ম-বিপ্লবের ইতিহাস আলোচনা করিলেই ভারতের এক এক যুগের ইতিহাস অধিগত হইবে। সূচনায় ঋষি-বাক্যে বুঝিয়াছি, শ্রীভগবানের সাযুজ্য-লাভই পরম ধর্ম্ম। * ঋগ্বেদের সূক্তে দেখাইয়াছি, ঋষি জ্যোতিঃ-রূপে

সাম্য-বৈষম্যের সংঘর্ষ-তত্ত্ব।

---

* কেহ কেহ বলিতে পারেন, ঋষি সূর্য্যদেবকে সম্বোধন করিয়া যে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহার অর্থ—'সাযুজ্য লাভ' নহে। বেদান্তের নিগূঢ় তত্ত্ব আদিকালের মনুষ্যের ধ্যান-ধারণার অতীত। ঋগ্বেদের ঋষিগণ জল, বায়ু, বহ্নি, সূর্য্য, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি যে পদার্থেই একটু আশ্চর্য্য গুণের সমাবেশ দেখিয়াছেন, দেবত্বজ্ঞানে তাঁহারই পূজায় ব্রতী হইয়াছেন। সে হিসাবে, পূর্ব্বোক্ত ঋকে প্রকৃত ঋষি পরিদৃশ্যমান্ সূর্য্যরূপ জড়পিণ্ডেরই

জ্যোতির্ম্ময়ে সম্মিলিত হইবার জন্য প্রার্থনা জানাইতেছেন। সে প্রার্থনায়—সে অনুষ্ঠানে যে বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহাই অধর্ম্ম। সেই বিঘ্নই বিপ্লব। সেই বিপ্লব-বিদূরণের ইতিহাসই—প্রাচীন ভারতের ইতিহাস। সাম্য-বৈষম্যের সংঘর্ষেই সে ইতিহাস পরিস্ফুট।

উপাসনা করিতেছেন,—অধিকাংশ পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী পণ্ডিতই এই মতের পরিপোষক। কিন্তু কেহ যদি একটু গভীর-ভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন, নিগূঢ় তত্ত্বের অনুসন্ধান জন্য সত্যসত্যই ব্যাকুল হন, তাঁহার নিকট কিছুই অপরিজ্ঞাত থাকিবে না। তিনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন,—সেই মহাপ্রাণ মহর্ষিগণের সর্ব্বত্রই সোঽহং ভাব ছিল। তাঁহারা জল-স্থল-মরুদ্ব্যোম-নদ-নদী বৃক্ষ-পর্ব্বত,—যাহারই উদ্দেশ্যে মস্তক অবনত করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহারা পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন। ঋগ্বেদের যে সূক্তে বিশ্বামিত্র ঋষি পূষা, সবিতা, মিত্র, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি নানা নামে পরমাত্মাকে আহ্বান করিতেছেন, সেই সূক্তেরই মধ্যে ব্রাহ্মণের নিত্য-ধ্যেয় গায়ত্রী-মন্ত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। এই দেখিয়া—পূষা, মিত্র, বরুণ প্রভৃতির সঙ্গে সবিতৃদেবের নাম সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে দেখিয়া—স্থূল-দৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ গায়ত্রী মন্ত্র জড়পিণ্ডের উদ্দেশে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যায়,—যেই বরুণ, সেই সূর্য্য, সেই ইন্দ্র, সেই পূষা, সেই সবিতা,—সেই সব, ঋষিগণ এই ভাবে বিভোর হইয়াই তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইতে চাহিতেছেন,—ভেদজ্ঞান তাঁহাদের মধ্যে আদৌ নাই। নাম রূপে পরব্রহ্মকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। তাই যত নাম—যত রূপ সংসারে আছে, সকল নামে সকল রূপেই তাঁহারা পরব্রহ্মের বন্দনা করিয়া গিয়াছেন। সে তাঁহাদের 'গাছ-পাথর-পুতুল-পূজা' নয়,—সে তাঁহাদের বিশ্বেশ্বরের বিশ্বরূপ দর্শন। গায়ত্রীর ব্যাখ্যাতেই কথাটা বিশদ করিতেছি। স্মার্ত্তপ্রধান রঘুনন্দন তাঁহার আহ্নিক-তত্ত্বে গায়ত্রীর কি ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, একটু প্রণিধান করিয়া দেখুন। রঘুনন্দন লিখিতেছেন,—'গায়ত্র্যা অর্থমাহ যোগী যাজ্ঞবল্ক্যঃ। দেবস্য সবিতুর্ব্বর্চ্চো ভর্গমন্তর্গতং বিভুং। ব্রহ্মবাদিন এবাহুর্ব্বরেণ্যঞ্চাস্য ধীমহি। চিন্তয়ামো বয়ং ভর্গং ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুনঃপুনঃ। বুদ্ধেশ্চোদয়িতা যস্তু চিদাত্মা পুরুষো বিরাট। বরেণ্যং বরণীয়ঞ্চ জন্মসংসারভীরুভিঃ। আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ ভর্গাখ্যং তন্মুমুক্ষুভিঃ। জন্মমৃত্যু বিনাশায় দুঃখস্য ত্রিবিধস্য চ। ধ্যানেন পুরুষো যশ্চ দ্রষ্টব্যঃ সূর্য্যমণ্ডলে। মন্ত্রার্থমপিচৈবায়ং জ্ঞাপয়ত্যেবমেবহি। তেন গায়ত্র্যা অয়মর্থঃ। দেবস্য সবিতুর্ভর্গস্বরূপান্তর্যামি ব্রহ্ম বরেণ্যং বরণীয়ং জন্মমৃত্যুভীরুভিঃ তদ্বিনাশায় উপাসনীয়ং। ধীমহি প্রাগুক্তেন সোঽহমস্মীত্যনেন চিন্তয়ামঃ, যো ভর্গঃ সর্ব্বান্তর্যামীশ্বরো নোঽস্মাকং সর্ব্বেষাং সংসারিণাং ধিয়ো বুদ্ধীঃ প্রচোদয়াৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু প্রেরয়তি। তথাচ ভগবদ্গীতায়াং। ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া। ঈশ্বরোঽন্তর্যামী হৃদ্দেশে অন্তঃকরণে ভ্রাময়ন্ তত্তৎকর্ম্মসু প্রেরয়ন্ যন্ত্রারূঢ়ানি দারুযন্ত্রপুত্তল্যশরীরারূঢ়ানি ভূতানি প্রাণিনো জীবানিতি যাবৎ মায়য়া অঘটনঘটনপটীয়স্যা নিজশক্ত্যা। তথাচাশ্বতরাণাং মন্ত্রঃ। একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষাৎ চেতঃ কেবলো নির্গুণশ্চ।" ইহার তাৎপর্য্য,—জ্যোতিঃ-স্বরূপ পরব্রহ্মে লয়-কামনা ভিন্ন অন্য আর কি হইতে পারে? জন্ম-মৃত্যু-জরার অধীন থাকিতে না হয়, ত্রিবিধ সংসার তাপ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারা যায়,—প্রার্থনায় সেই আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইতেছে না কি? ফলতঃ, মহান্ চিন্তা—মহান্ ভাব বুঝাইবার জন্য যে কোনও প্রসঙ্গ অধুনা উত্থাপিত হয়, সে চিন্তার সে ভাবের দ্যোতনা বেদে পুরাণে সর্ব্বত্রই পরিদৃশ্যমান্। শব্দ-তত্ত্বের মূল তথ্য অনুসন্ধান করিলেও প্রতিপন্ন হয়, একই বস্তু বুঝাইতে অসংখ্য শব্দ প্রযুক্ত হইত। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ 'গো' শব্দের উল্লেখ করিতে পারি। গো-শব্দের পশু, বৃষ, ঋষিবিশেষ, যজ্ঞবিশেষ, স্বর্গ, বাণ, কিরণ, জল, ইন্দ্রিয়, স্বর্গ, চক্ষু, বজ্র, কেশ, দৃষ্টি, ধেনু, দিক, বাক্য, বাগেশ্বরী, পৃথিবী, মাতা, গায়ত্রী, জ্যোতিঃ প্রভৃতি অর্থ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ঋষিগণ কোন্ অর্থে কখন গো শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা না বুঝিলেই ভ্রান্তি অনিবার্য্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভাষা ও সাহিত্য।

[সাহিত্যের মধ্যেই প্রাচীন জাতির ইতিহাস,—পৃথিবীর আদি-গ্রন্থ-সমূহ ধর্ম্মের সহিত সংশ্রবযুক্ত,—'সাহিত্য'-শব্দের ব্যুৎপত্তি-তত্ত্ব;—সংস্কৃত-সাহিত্যের পৃথিবী-ব্যাপী প্রভাব,—বিভিন্ন জনপদে ভারতের আধিপত্য ও উপনিবেশ স্থাপনের প্রসঙ্গ;—ভাষা ও সাহিত্যের অভ্যুদয়,—সাহিত্যে সর্ব্ববিদ্যার স্ফূর্ত্তির পরিচয়,—ইতিহাসের বিবিধ উপাদান,—সংস্কৃত-সাহিত্যের ও প্রাদেশিক সাহিত্যের প্রসঙ্গ,—দ্রাবিড়ের সভ্যতা,- -বঙ্গের প্রভাব,—রাজভাষার শ্রেষ্ঠত্ব,—বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজভাষার প্রসঙ্গ,—সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্য-খ্যাপন,—প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত,—তদ্বিষয়ে নানা বিচার-বিতর্ক।]

সাহিত্যে ইতিহাস।

ভারতের সাহিত্যই ভারতের ইতিহাস। কেবল ভারতেরই বা বলি কেন, যে দেশের যে জাতির সাহিত্য আছে, সে দেশের সে জাতির তাহাই ইতিহাস। সাহিত্যের উন্নতি-পরিপুষ্টি জাতির উন্নতি-পরিপুষ্টির পরিচয় প্রদান করে। প্রাচীন মিশর, প্রাচীন গ্রীস, প্রাচীন রোম, পারস্য, আরব, বাবিলন, ফিনিসীয়া,—যে দেশের প্রতিই দৃষ্টিপাত করি না কেন, সকল দেশের সকল জাতির সম্বন্ধেই সেই উক্তি প্রযোজ্য। এই যে ইংরেজ-জাতি আজি গৌরবের সম্ভ্রমের উচ্চ-আসন লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সাহিত্যই তাহার পরিচয় দিতেছে। এই ভারতবর্ষ যে এক সময়ে উন্নতির উচ্চ-চূড়ায় সমারূঢ় ছিল, ভারতের প্রাচীন সাহিত্যই তাহার নিদর্শন।

ধর্ম্মে সাহিত্য।

সাহিত্য—ভাষায় নিবদ্ধ। ভাষা—শব্দমূলক; সুতরাং অসংখ্য। * সকল ভাষার সাহিত্য নাই। যে ভাষায় সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা, সেই ভাষাই গৌরবান্বিত। ইতিহাস আলোচনা করিতে হইলে, গৌরবান্বিত সাহিত্যেরই সহায়তা প্রধানতঃ আবশ্যক হয়। সেই সাহিত্যই গৌরবান্বিত—যে সাহিত্য ধর্ম্মের সহিত সংশ্রব-যুক্ত। প্রাচীন কালের কোনও পরিচয় লইতে হইলে সেই সাহিত্যেরই আশ্রয় লইতে হয়। কিবা প্রাচ্যের, কিবা প্রতীচ্যের,—যে দেশের প্রাচীন সাহিত্যের

* উচ্চারণের তারতম্যে নব নব ভাষার অভ্যুদয় হয়। এক 'অস্মদ' শব্দের প্রথমার একবচনে সংস্কৃত 'অহম্', হিন্দীতে 'হাম্', গুজরাটীতে 'হম', তামিলে 'নাং', প্রভৃতি পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেই এ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। ("পৃথিবীর ইতিহাস" দ্বিতীয় খণ্ডে, 'ভারতের ভাষা' পরিচ্ছেদে, এ বিষয়ের বিশদ দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করুন)। প্রবাদ এই—প্রতি বার ক্রোশ অন্তর ভাষার পরিবর্ত্তন। কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিলে শব্দোচ্চারণের তারতম্য সুতরাং ভাষার স্বাতন্ত্র্য অতি নিকটেই লক্ষিত হয়। এক বাঙ্গালা দেশের মধ্যেই কত উচ্চারণ কত রকম ভাষা দেখিতে পাই। আমরা বলি—'কোনও,' চট্টগ্রাম অঞ্চলে বলে 'ওগ্‌গা', মানভূমে বলে 'য়্যাহক', আসামে বলে 'এজন'। এক কলিকাতা সহরেরই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাঙ্গালীর মধ্যে বিভিন্নরূপ শব্দোচ্চারণ দেখিতে পাই। কেহ বলেন,—গেলাম, কেহ বলেন,—গেলুম, কেহ বলেন—গেমু, কেহ বলেন,—গেলেম, কেহ বলেন—যাইলাম। তবে যত দূরে যাইবে, ভাষার পার্থক্য ততই পরিস্ফুট হইবে। সাহিত্য—ভাষার পার্থক্যে বাধা-প্রদানের প্রয়াস। যে সাহিত্য যত অধিকদূর পর্য্যন্ত সে পার্থক্যে বাধা প্রদান করিতে পারিয়াছে, সেই সাহিত্যের প্রসার তত অধিক।

প্রভৃতিই দৃষ্টিপাত করি না কেন, যে সাহিত্য কালের কষাঘাত সহ্য করিয়াও অব্যাহত আছে, সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই,—তাহার মূলে ধর্ম্মের প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। পৃথিবীর আদি-গ্রন্থ যাহা কিছু, সকলই ধর্ম্মমূলক। প্রাচ্যের বেদ-পুরাণাদি-শাস্ত্রগ্রন্থ-সমূহ, পাশ্চাত্যের বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি,—যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, সকলই ধর্ম্মের সহিত সংশ্রবযুক্ত। সাহিত্য শব্দের অর্থই, আমাদের তাই মনে হয়,—যাহা ধর্ম্মের সহিত সংশ্রবযুক্ত হইয়া বিদ্যমান আছে, তাহাই সাহিত্য। বৈয়াকরণ 'সাহিত্য' শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশ করেন,—"সহিতস্য ভাবঃ ইত্যর্থে ষ্ণ্য প্রত্যয়েন নিষ্পন্নম্।" অভিধানে 'সাহিত্য' শব্দের অর্থ লিখিত আছে,—'সংসর্গ', 'মিলন' ইত্যাদি। কিন্তু কিসের সংসর্গ—কিসের মিলন? আমরা বলি—ধর্ম্মের সংসর্গ, ধর্ম্মের মিলন। অভিধান 'সাহিত্য' শব্দের আর যে এক ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশ করেন (সম—হিত+ষ্ণ্য), তাহাও ঐ অর্থদ্যোতক। তাহার অর্থ—যাহা দ্বারা সম্যক্ হিত সাধিত হয়, তাহাই সাহিত্য। সম্যক্ হিতসাধনে সমর্থ—ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য আর কি হইতে পারে? সুতরাং যাহা ধর্ম্মের সহিত সংশ্রবযুক্ত, যাহা ধর্ম্মের সহিত সম্মিলিত, তাহাই সাহিত্য,—তাহাই স্থায়ী সাহিত্য। আর যাহা কিছু সাহিত্য নামে অভিহিত হয়, প্রায়ই তাহা লোপ পাইয়া যায়। কিন্তু যাহা ধর্ম্মের সহিত সংশ্রবযুক্ত হইয়া থাকিতে পারে, তাহাই চিরদিন অব্যাহত থাকে।

সাহিত্যের প্রসার-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাতির প্রতিষ্ঠার পরিচয় দেদীপ্যমান। বিশেষ বিশেষ কারণে মনুষ্য-সমাজকে বিশেষ বিশেষ ভাষার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইতে হয়। যে ভাষা রাজভাষা, প্রজামাত্রেই সে ভাষার অনুশাসনাধীন। আবার যে রাজার গৌরব-সম্ভ্রম অতি-মাত্রায় বৃদ্ধি পায়, সে রাজার ভাষা বাণিজ্য-সৌকর্য্য প্রভৃতি বিবিধ কারণে অন্য রাজার রাজ্য-মধ্যেও প্রাধান্য লাভ করিতে পারে। এ দৃষ্টান্ত-ক্ষেত্রেও ইংরেজী-ভাষার প্রসার-প্রতিপত্তির বিষয় উল্লেখ করিতে পারি। ইংরেজ-জাতির অর্দ্ধ-পৃথিবীর আধিপত্য-লাভের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী ভাষা অর্দ্ধ-পৃথিবীতে বিস্তৃতি-লাভ করিয়াছে। অধিকন্তু, ইংরেজ-জাতির সহিত সম্বন্ধ-রক্ষার জন্য অন্যান্য স্বাধীন-রাজ্যেও ইংরেজী ভাষার প্রচার ও প্রসার দেখিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত ভাষার বিস্তৃতির বিষয় অনুধাবন করিলেও, সংস্কৃত-ভাষা এক সময়ে যে পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, সংস্কৃত-সাহিত্যের আলোচনা এক সময়ে যে সভ্য-দেশ মাত্রেই অব্যাহত ছিল, সে পরিচয় নানামতেই প্রাপ্ত হই। বিভিন্ন ভাষার শব্দ-সমষ্টি লইয়া গবেষণা করিলে আমরা নিশ্চয়ই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। যে 'পিতৃ' শব্দ সংস্কৃত ভাষার প্রথমার একবচনে 'পিতরঃ', উচ্চারণের বিকৃতি-হেতু তাহাই আবার জেন্দ-ভাষায় 'পদর', লাটিনে 'পেটর', গ্রীকে 'পাটর', জর্ম্মাণে 'ফাতের', ইংরেজীতে 'ফাদার'। * এই সাদৃশ্য-তত্ত্ব পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণই নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই সাদৃশ্য-তত্ত্বের আলোচনায় আমরা কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি? ইহাতে বুঝিতে

পৃথিবীব্যাপী প্রভাব।

* "পৃথিবীর ইতিহাস" দ্বিতীয় খণ্ডে 'ভাষা' প্রসঙ্গে এবং তৃতীয় খণ্ডে 'হিন্দু ও পারসিক' প্রসঙ্গে এই সাদৃশ্য-তত্ত্বের আলোচনা দেখুন।

পারা যায় না। কি,—এক সময়ে সংস্কৃত ভাষা পৃথিবীর সকল দেশেই আপনার প্রাধান্য-বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিল এবং অধিকাংশ সভ্য-দেশের অধিবাসীরাই সংস্কৃত ভাষার গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন ?—আর তাহারই ভগ্নাবশেষরূপে এখন সংস্কৃত-সাহিত্যের শব্দ-পরম্পরা বিকৃত-ভাবে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে ? এই ভারতবর্ষেই—সংস্কৃত-সাহিত্যের অভ্যুদয়-ক্ষেত্র এই ভারতবর্ষেই—এবম্বিধ বিকৃতির অসম্ভাব নাই। দূরদেশে সে বিকৃতি কতদূর প্রকট হওয়া সম্ভবপর, সহজেই বুঝা যাইতে পারে। * যাহা হউক, সংস্কৃত-সাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রাচীন ভারতের পৃথিবী-ব্যাপী প্রভাবের বিষয় যে অবগত হইতে পারা যায়, তাহাতে আদৌ সংশয় নাই।

আধিপত্য ও উপনিবেশ।

বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ, তন্ত্র, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির মধ্যে ভারতের ঐশ্বর্য্য-গৌরবের যে পরিচয়-চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার কিছু কিছু আভাস আমরা পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছি। তাহাতে দেখিয়াছি,—এই ভারতবর্ষই এক সময়ে সসাগরা ধরিত্রীর আধিপত্য-লাভ করিয়াছিল। রাজর্ষি প্রিয়ব্রত পৃথিবীকে সপ্তধা বিভক্ত করিয়াছিলেন। মহানুভব মনুর প্রাধান্য সর্ব্বদেশেই পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। যে দেশ—যে রাজ্য আপনার প্রাচীনত্বের গৌরব-গাথা ঘোষণা করে, সে রাজ্যের—সে দেশের প্রাচীন ইতিহাসে, সে রাজ্যের আদি-নৃপতির কি পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া থাকি ? মিশর, চীন, বাবিলন প্রভৃতি সকল প্রাচীন-দেশের আদি-নৃপতিকে সূর্য্যতনয় বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। আমেরিকার প্রাচীন অধিবাসীরা তাহাদের আদি-নৃপতিকে সূর্য্য-পুত্র বলিয়া অভিহিত করিত। উচ্চারণের বিকৃতি-ক্রমে মহর্ষি মনু বা মনুবংশধর কেহ কি মিশরে 'মেনেস' নামে অভিহিত হন নাই ? মনুর আধিপত্য কোন্ দেশে না বিস্তৃত ছিল। যেমন সূর্য্যদেব সকল দেশেই—পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রভাব বিস্তার করেন, ভারতের মনুর প্রভাবও তদ্রূপ দেশে বিদেশে দিকে দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সসাগরা ধরিত্রীর আধিপত্য লাভ করায়, ভারতীয় এক নৃপতির উপাধিই হইয়াছিল—সগর। † রাজচক্রবর্ত্তী সগরের পুত্রগণ পাতালে গমন করিয়াছিলেন ; অর্থাৎ, ভূপৃষ্ঠের যে অংশে ভারতবর্ষ তাহার বিপরীত অংশে (আমেরিকা মহাদেশ প্রভৃতিতে) গমন করিয়া, তাঁহারা তথায় আপনাদের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। সগর-রাজার অশ্বমেধ-যজ্ঞের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাঁহার

---

* সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রাধান্য-লোপের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার ও সাহিত্যের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। সেই সকল প্রাদেশিক ভাষার ও সাহিত্যের মধ্যে সংস্কৃত শব্দ বিকৃত ও অবিকৃত ভাবে যে কত প্রকারে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। যে দেশে উপনিষদের মধ্যে অল্লোপনিষৎ স্থান-লাভের চেষ্টা পায়, এবং যে দেশে "ইল্লাকবর ইল্লাকবর ইল্লোল্লেতি" ইত্যাদি উপনিষদের মন্ত্র মধ্যে স্থান পাইবার চেষ্টা করে, (প্রথম খণ্ড, পৃথিবীর ইতিহাস, ৬৬শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) সে দেশের শিক্ষিত জনের সমক্ষে দৃষ্টান্ত-প্রদর্শন বাহুল্য মাত্র।

† সগর নামের উৎপত্তির অপর অর্থও নির্দ্দিষ্ট হয়। (পৃথিবীর ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ২৪শ পরিচ্ছেদ, ৩৩৩শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু তাঁহার প্রাধান্যের বিষয় স্মরণ করিয়া সাগরাধিপত্য হেতু তাঁহার 'সগর' নাম হওয়াও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া অনেকে স্বীকার করেন।

আধিপত্য-বিস্তারের পরিচয় পাই। প্রাচীন রোম-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল,—শ্রীরামচন্দ্রের বংশোদ্ভব বা অনুগত কোনও বীরপুরুষ কর্তৃক। শব্দতত্ত্ববিদ্গণ রোম-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতৃগণের নামের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের নামের সাদৃশ্য-বিচার করিয়াই এতাদৃশ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র আধিপত্য-বিস্তারের বিষয় যেরূপ অবগত হইতে পারি; প্রাচীন গ্রন্থাদির আলোচনায়, পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদে ভারতবর্ষের উপনিবেশ-স্থাপনের দৃষ্টান্তও সেইরূপ পরিদৃশ্যমান। তৎপ্রসঙ্গেও আমরা দেখিয়াছি,—ভারত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে, আমেরিকা-মহাদেশের অভ্যন্তরে, আফ্রিকার ও ইউরোপের বিভিন্ন জনপদে এক সময়ে ভারতবাসীরা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। তখন ভারতের সনাতন বেদবিহিত ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য ধর্ম্মের অভ্যুদয় হয় নাই; ধর্ম্ম-নাশের—জাতিনাশের আশঙ্কায় আর্য্যগণকে অভিভূত করে নাই; সুতরাং আধিপত্য-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নানা স্থানে তাঁহাদের উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। মিশরের বিভিন্ন অংশে 'ফালাস' দেবের মন্দিরে লিঙ্গ-মূর্ত্তির উপাসনা দেখিয়া, ঐতিহাসিক-গণের অনেকেই এখন ঐ সকল প্রদেশে শৈব-ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের বিষয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন। * আমেরিকার পেরু ও মেক্সিকো-প্রদেশে রাম-সীতার পূজা-পদ্ধতি ও গণপতি প্রভৃতির মূর্ত্তি দেখিয়াও তত্তদ্দেশে ভারতীয়-গণের উপনিবেশ-স্থাপনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতেছে। তখন সমুদ্র-গমন দোষাবহ ছিল না; সুতরাং অর্ণবযানাদির প্রচলন ছিল। ঋগ্বেদে দেখিতে পাই,—রাজর্ষি তুগ্র আপন পুত্র ভুজ্যুকে সসৈন্যে সমুদ্র-পথে দিগ্বিজয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বণিকগণ সমুদ্র-পথে অর্ণবপোত-পরিচালনে বাণিজ্য দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিতেন,—ঋগ্বেদে এরূপ প্রমাণ-পরম্পরারও অসদ্ভাব নাই। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণ পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে পরিভ্রমণ করিয়া আপনাদের সত্য-ধর্ম্মের মহিমা ঘোষণা করিতেন। পৃথিবীর অধিকাংশ নরনারী আজিও যে বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী, বিভিন্ন দেশে ভারতীয় ভিক্ষু-গণের গতিবিধি এবং ভারতের আধিপত্য-বিস্তারই তাহার কারণ নহে কি?

এইরূপে দেখা যায়,—স্মরণাতীত কাল পূর্ব্ব হইতে খৃষ্ট-জন্মের পরবর্ত্তী কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্তও ভারতবর্ষ দেশ-বিদেশে আপনার প্রভাব-প্রতিপত্তির পরিচয় দিয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি,—ভারতের ভাষাই পৃথিবীর আদি-ভাষা; ভারতের সাহিত্যই পৃথিবীর আদি-সাহিত্য; আর সেই সাহিত্যের অভ্যন্তরেই ভারতে যে সভ্য-সমুন্নত সমাজের আদর্শ-স্থানীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহারও পরিচয় বিদ্যমান রহিয়াছে। ভাষার ও সাহিত্যের আধার-স্থানীয় যে বর্ণমালা;—সেই বর্ণমালার উৎপত্তি-তত্ত্বের আলোচনায় আমরা কি দেখিয়াছি? দেখিয়াছি—ফিনিসীয়ায় নয়, বাবিলোনিয়ায় নয়, মিশরে নয়, ইথিওপীয়ায় নয়;—বর্ণমালার আদি-উৎপত্তি-স্থান এই ভারতবর্ষ। পৃথিবীর আদিগ্রন্থ ঋগ্বেদের মধ্যেই ভারতে বর্ণমালার আদি-অস্তিত্বের প্রমাণ রহিয়াছে। ঋগ্বেদের বিভিন্ন স্থানে কি ভাবে বর্ণমালার অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, সে আভাস পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছি। বর্ণমালার প্রতিবাক্য 'অক্ষর' শব্দটী

সাহিত্যে প্রতিষ্ঠার পরিচয়।

২ 'পৃথিবীর ইতিহাস', তৃতীয় খণ্ড, ১৯৬ম—১৯৭ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ও তাহার ব্যবহারের বিষয় পর্য্যন্ত ঋগ্বেদে লিখিত আছে। প্রমাণ-স্বরূপ, ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের চতুঃষষ্ঠ্যধিক শততম সূক্তের চতুর্ব্বিংশতিতম ঋকটী নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি ; যথা,—

"গায়ত্রেণ প্রতিং মিমীতে অর্কমর্কেণ সাম ত্রৈষ্টুভেন বাকম্।
বাকেন বাকং দ্বিপদা চতুষ্পদাক্ষরেণ মিমতে সপ্ত বাণীঃ॥"

"গায়ত্রী-ছন্দ দ্বারা অর্ক অর্থাৎ অর্চ্চনা-মন্ত্র রচনা করেন ; অর্ক দ্বারা সাম রচনা করেন, ত্রিষ্টুভ দ্বারা বাক্ নির্ম্মাণ করেন, দ্বিপাদ ও চতুষ্পাদ বাক্ দ্বারা অনুবাক রচনা করেন এবং অক্ষর-যোজনা দ্বারা সপ্ত ছন্দ রচনা করেন।" এই বর্ণমালার প্রসঙ্গেই ত্রিষ্টুভাদি ছন্দের ও কাব্যের পরিচয় পাওয়া গেল। কেবল ছন্দের বা কাব্যের কথা নহে ; সাহিত্য-ভাণ্ডার যে যে সম্পদে পরিপূর্ণ থাকিলে, জাতির শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপন করে, ভারতের সাহিত্যে সে সকল সম্পদই পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। আয়ুর্ব্বেদ আলোচনায় দেখিয়াছি, ভারতে বিজ্ঞানের পূর্ণ-স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল ;—শারীর-বিদ্যা, প্রাণি-বিদ্যা, উদ্ভিদ-বিদ্যা, খনিজ-বিদ্যা, শস্ত্র-বিদ্যা, অস্ত্র-বিদ্যা,—সকল বিদ্যার সকল অঙ্গই ভারতে পরিপুষ্টি-লাভ করিয়াছিল। ব্যোমযান, অর্ণবযান, বাষ্পীয় রথ,—প্রভৃতির অস্তিত্ব-অনুসন্ধানে বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষের বিষয় অবগত হওয়া যায়। সৌরজগৎ সম্বন্ধে ভারতের প্রাচীন মনীষিগণের কি অভিজ্ঞতা ছিল, জ্যোতিষ-তত্ত্বের আলোচনায় তাহা বুঝিতে পারি। ধর্ম্মনীতি, সমাজ-নীতি, রাজনীতি প্রভৃতির যে কিছু শ্রেষ্ঠ আদর্শ,—ভারতের সাহিত্যে তাহা দেদীপ্যমান রহিয়াছে। শ্রেষ্ঠ-সমাজে যে সকল শ্রেষ্ঠ-সাহিত্য বিকাশ-প্রাপ্ত হয়, তাহাও জাজ্বল্যমান দেখিতে পাইতেছি। শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদির ন্যায় সর্ব্বজনের উপযোগী ধর্ম্মগ্রন্থ পৃথিবীর অন্য আর কোথায় আছে? গণনায় শেষ হয় না—এত অধিক ধর্ম্মগ্রন্থ পৃথিবীর কোন্ দেশের কোন্ ভাষায় বর্ত্তমান? আমরা যে পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে সাহিত্য ধর্ম্মের সহিত সংশ্রবযুক্ত, সেই সাহিত্যই স্থায়ী হয়। ভারতের অসংখ্য ধর্ম্ম-গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সেই সিদ্ধান্তই পরিস্ফুট দেখি। বিপ্লবের সহস্র-বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়া, ভারতীয় সাহিত্য আজিও যে পৃথিবীর সকল সাহিত্যের মধ্যে উন্নত-শীর্ষ দণ্ডায়মান, ধর্ম্মপ্রাণতাই তাহার কারণ নহে কি?

এই ভারতের অতুলনীয় সম্পদ দুই মহাকাব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন ; রামায়ণ-মহাভারতের ন্যায় মহাকাব্য পৃথিবীর কোনও দেশের কোনও ভাষায় সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া পরিচয় পাইয়াছেন কি? নাট্য-সাহিত্যেও ভারতবর্ষের খ্যাতি অপরিসীম। দেবসভায় এবং অতি প্রাচীন-কালে যে সকল দৃশ্য-কাব্যের অভিনয় হইত, সর্ব্ব-বিধ্বংসী কালের কবলে তৎসমুদায় নিপতিত হইলেও তাহাদের স্মৃতি আজিও লোপ পায় নাই। বেদে, পুরাণে—অনেক স্থলেই প্রাচীন-ভারতের নাট্যাভিনয়ের উল্লেখ রহিয়াছে। বিস্মৃতির অন্ধতম গর্ভে বিলুপ্তপ্রায় সে প্রসঙ্গের উত্থাপন না করিয়াও, এখনও যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহার বিষয়ে যদি গবেষণা করি, তাহাতেই বা কি দেখিতে পাই? প্রতিভার মধ্যাহ্ন-তপন কালিদাস নাট্য-কাব্যের যে জ্যোতিঃ বিচ্ছুরণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার নিকট কোন্ দেশের কোন্ কবি না হীনপ্রভ? "একচন্দ্রস্তমোহন্তি ন চ তারাগণৈরপি।" পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন নাট্য-কাব্যের তুলনায়

ইতিহাসের বিবিধ উপাদান।

এ উপমাও যথা-বিন্যস্ত বলিয়া মনে হয় না। যদি কখনও পৃথিবীর প্রধান প্রধান নাটকের সহিত কালিদাসের নাটকের তুলনায় সমালোচনার অবসর পাই, দেখাইব—কালিদাস কত মহান্—কত গরীয়ান্! পরবর্ত্তি-কালের ভারতের প্রাদেশিক সাহিত্যের আলোচনায়ও ভারতের কত গৌরব-গরিমার নিদর্শন পাই। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে পালিভাষার মধ্য দিয়া সাহিত্যে যে অনুপম রত্নরাজি সজ্জিত হইয়াছে, তাহারই বা তুলনা কোথায়? সে সাহিত্যের মধ্যেও ভারতের পৃথিবী-ব্যাপী গৌরবের—ঐশ্বর্য্যের—প্রভাবের স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে। সুদূর দাক্ষিণাত্যকে সাধারণতঃ প্রাচীন-কালের অসভ্য বর্ব্বর দেশ বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, প্রাচীন দ্রাবিড়ী ভাষার অনুশীলন করিলে, সে দেশের মহীয়সী মহিমার নিকট মস্তক অবনত করিতে হয়। আজিকালি দ্রাবিড়ী সাহিত্যের আলোচনায় কেহ কেহ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন,—'ভারতের সভ্যতার আদি-স্থান—হয় তো বা দ্রাবিড় ছিল।' খৃষ্ট-জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে দ্রাবিড়-দেশীয় বণিকগণ পৃথিবীর নানা স্থানে বাণিজ্য-ব্যপদেশে গতিবিধি করিতেন। শাস্ত্রে পঞ্চ-গৌড় ও পঞ্চ-দ্রাবিড় নামের উল্লেখ আছে। পঞ্চ-গৌড় আর্য্যাবর্ত্তে এবং পঞ্চ-দ্রাবিড় দাক্ষিণাত্যে প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছিল। সে ঘটনা কত কাল পূর্ব্বে সংঘটিত হয়, তাহা নির্ণয় করিতে অনুসন্ধিৎসুগণের অনুসন্ধান প্রায়শঃই পর্য্যুদস্ত হইয়াছে। মধ্য-ভারতের বা আর্য্যাবর্ত্তের সহিত বৈদেশিকগণের বাণিজ্য-সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে, বহুদিন পর্য্যন্ত দ্রাবিড়-দেশে বৈদেশিক বাণিজ্যের সংশ্রব ছিল। বাইবেলোক্ত সলোমন রাজার রাজত্বকালে ফিনিসীয় বণিকগণ দ্রাবিড়-দেশে বাণিজ্য করিতে আসিতেন। সেই নিদর্শনের অনুসন্ধান পাইয়া পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ অনেকেই সমস্যা-সাগরে ভাসমান হইয়াছেন। ফলে, আর্য্যাবর্ত্তের সভ্যতার বিষয় বিস্মৃত হইয়া তাঁহারা এখন দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়-দেশকে ভারতীয় সভ্যতার আদিক্ষেত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছেন। কোন্ প্রদেশের কথা কহিব? এই বঙ্গ-দেশের পূর্ব্ব-গৌরবের কাহিনী যদি স্মরণ করি, তাহা হইলেই বা কি দেখিতে পাই? কেহ হয় তো বলিবেন,—'বঙ্গদেশ সেদিন মাত্র সাগর-গর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে; এ অপবিত্র দেশে আগমন করিলে প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হইত; এ দেশের আবার গৌরব-গাথা কি আছে?' * কিন্তু পুরাতত্ত্বের গবেষণায় এ উক্তি সমর্থিত হয় না। এই বঙ্গ-দেশ অপবিত্র, এ নির্দ্দেশ শাস্ত্রকারগণ কখনই করেন নাই। যে স্থানে এরূপ বাক্যের সমাবেশ আছে, সে স্থান প্রক্ষিপ্ত বলিয়াও মনে হয়; অথবা সে বঙ্গ এ বঙ্গ নহে। হয় তো অন্য কোনও জনপদ বঙ্গাধিপের প্রাধান্যে অন্যত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া 'বঙ্গ' নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহর্ষি মনু আর্য্যাবর্ত্তের যে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, সে বর্ণনা-ক্রমে এক দিকে হিমালয় ও অন্য দিকে বিন্ধ্যাচল—এই দুই সমান্তরাল রেখা অবলম্বন করিয়া পূর্ব্ব-পশ্চিমে সমুদ্র পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলে, বঙ্গ-দেশ কখনই সে গণ্ডীর বাহিরে পড়ে না। যে বঙ্গদেশ পরিপ্লাবিত করিয়া কলুষনাশিনী ভাগীরথী প্রবহমানা, সে বঙ্গ কখনই পাপজনক হইতে পারে না। যে বঙ্গভূমে পীঠস্থান-সমূহ বিদ্যমান,

* বঙ্গদেশের অপবিত্রতার বিষয় ও তাহার কারণ সম্বন্ধে "পৃথিবীর ইতিহাস" দ্বিতীয় খণ্ডে (২৪১ম পৃষ্ঠায়) আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহাও এতৎপ্রসঙ্গে বিচার করিয়া দেখা উচিত।

সে বঙ্গ কি কখনও কলুষপ্রদ হইতে পারে? বঙ্গের প্রাধান্য দেখিয়া ঈর্ষাপর হইয়া যাঁহারা শাস্ত্রগ্রন্থ মধ্যে বঙ্গের কলুষকাহিনী প্রক্ষিপ্ত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সমদর্শিতায় স্বতঃই সন্দেহ আসিয়া পড়িবে। বঙ্গের অতীত প্রাধান্যের বিষয় স্মরণ করিলে ভারতের অস্তগমনোন্মুখ গৌরবের দিনেও বঙ্গের গৌরব কি উজ্জ্বল ছিল, দেখিতে পাইবেন। বৈদেশিকগণ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ আক্রান্ত ও অধিকৃত হওয়ার সময় বঙ্গদেশ অনেক দিন পর্য্যন্ত আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল। বঙ্গাধিপতি বল্লালসেনের এবং তদীয় পুত্র রাজচক্রবর্ত্তী লক্ষ্মণ-সেনের রাজ্যসীমা কতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল, অনুসন্ধিৎসু-গণের তাহা অবিদিত নাই। খৃষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে যুবরাজ বিজয়সিংহ সিংহল-দ্বীপে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যের নানা স্থানে তাঁহার আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। বঙ্গের অন্যতম প্রাচীন নগরী তাম্রলিপ্ত ব্যবসা-বাণিজ্যে কিরূপ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল, বৈদেশিক-গণের সাক্ষ্যেই তাহা সপ্রমাণ হয়। † ভারতের এক এক প্রদেশ এক এক সময় মস্তক উত্তোলন করিয়াছিল। কখনও বঙ্গদেশ, কখনও বিহার প্রদেশ, কখনও রাজপুতানা, কখনও পঞ্চনদ;—যেখানেই যখন প্রধান রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যে প্রদেশেরই যখন অভ্যুদয় ঘটিয়াছে, ভারতের সাহিত্যে তাহারই গৌরব-নিশান উড্ডীন রহিয়াছে। ভারতের সাহিত্যের অভ্যন্তরে প্রাদেশিক সাহিত্যের শিরায় শিরায় সেই গৌরবের প্রবাহ প্রবহমান। ভারতের ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে হইলে, শাস্ত্রগ্রন্থের অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে তাই প্রাদেশিক সাহিত্যের অনুশীলনও একান্ত আবশ্যক হয়। বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন ভাষার সৃষ্টি-পরিপুষ্টির ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ইতিহাস বিজড়িত হইয়া আছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে দেশে সাহিত্য আছে এবং যে দেশের সাহিত্যের গণ্ডীর মধ্যে অধিকাংশ দেশ আবদ্ধ রহিয়াছে, সে দেশের প্রাধান্য অবিসম্বাদিত। সে হিসাবে, প্রতি প্রাদেশিক ভাষার প্রাধান্যে তত্তৎ-প্রদেশের প্রাধান্য সূচিত হয়। এক সময়ে বঙ্গের প্রাধান্য যে দাক্ষিণাত্যে, দ্রাবিড় দেশে

---

* বিজয়সিংহ বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া প্রথমে দ্রাবিড়-দেশে কৃষ্ণা-নদীর তীরে উপনীত হন। সেখানে তিনি যে নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা 'বিজয়বাড়ী' বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল। সেই 'বিজয়বাড়ী' শব্দই উচ্চারণের বিপর্য্যয়ে এখন 'বেজোয়ারা' নাম পরিগ্রহ করিয়াছে।

† তাম্রলিপ্ত হইতে বণিকগণ নানা স্থানে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। আঠার শত বৎসর পূর্ব্বের তামিল (*Tamil—Eighteen Hundred Years Ago*) নামক গ্রন্থে অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিত কনকসভই পিলে লিখিয়া গিয়াছেন,—"Most of the Mongolian tribes emigrated to Southern India from Tamalitti, the great emporium of trade at the mouth of the Ganges and this accounts for the name 'Tamils' by which they were collectively known among the most ancient inhabitants of Deccan. The name Tamil appears to be therefore only an abbreviation of the word Tamalitti. The Tamraliptas are alluded to, along with the Kosalas and Odras as inhabitants of Bengal and adjoining sea-coast in the Vayu and Vishnu Purans···They were known as Tamils most probably because they had emigrated from Tamilitti (Tramralipti), the great sea-port at the mouth of the Ganges." তাম্রলিপ্তী পালিভাষায় 'তামলিপ্টী' রূপ পরিগ্রহ করে। তামিল শব্দও তাহা হইতেই উৎপন্ন। এই তামিল-দেশের অধিবাসীদিগকে কোনও কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত আজিকালি ভারতের আদি-সভ্যজাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু বঙ্গদেশ যে তামিল দেশের সভ্যতার আদিভূত, একটু অনুসন্ধান করিলেই তাহা বুঝা যায়। খৃষ্ট-পূর্ব্ব শতাব্দীতে তামিলগণ যে ইউরোপের বিভিন্ন জনপদে বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই সপ্রমাণ করিয়াছি। পৃথিবীর ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৪৩৬ম পৃষ্ঠায় ইহার আভাস পাইবেন।

বিস্তৃত হইয়াছিল ;—দ্রাবিড়ী ভাষার মধ্যে বঙ্গ-ভাষার শব্দ-সমূহ প্রবেশ করিয়াছে দেখিয়া, অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণ সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছেন। * ফলতঃ, জাতীয় অভ্যুদয়ের সকল পরিচয়-চিহ্ন লোপ পাইতে পারে ; কিন্তু যদি তাহার সাহিত্য থাকে, আর সেই সাহিত্য যদি ধর্মের সহিত সংশ্রব-যুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার গৌরবের পরিচয় কখনই লোপ পায় না। ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানে দেশের ভাষার ও সাহিত্যের অনুসন্ধান তাই একান্ত প্রয়োজনীয়। ভাষা ও সাহিত্যের যতই প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন হইবে, দেশের ইতিহাসও তত প্রাচীন-কালের সংগৃহীত হইতে পারিবে। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি হইতে যেমন ইতিহাসের উপাদান প্রাপ্ত হওয়া যায়, প্রাদেশিক সাহিত্যের অভ্যন্তরেও সেইরূপ ইতিহাসের অভিনব উপাদান নিহিত আছে।

বর্ত্তমান-কালে ভারতবর্ষে যে সকল ভাষা সাহিত্যে নিবদ্ধ আছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী ভাষা প্রসিদ্ধ ;—(১) সংস্কৃত, (২) পালি, (৩) প্রাকৃত, (৪) হিন্দী, (৫) বাঙ্গালা, (৬) উড়িয়া, (৭) গুজরাটী, (৭) মহারাষ্ট্রী, (৮) তামিল, (৯) তেলেগু, (১০) মলয়ালম্ প্রভৃতি। † ভারতীয় প্রায় সকল ভাষার মধ্যে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব অবিসম্বাদিত। সংস্কৃত ভাষা সময়ে সময়ে সকল ভাষার উপর—কেবল ভারতের বলিয়া নহে, পৃথিবীর সকল ভাষার উপর—প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল। সংস্কৃতের পর পালি-ভাষার নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। পালিভাষা প্রাদেশিক ভাষা হইলেও—একমাত্র মগধ-প্রদেশ উহার কেন্দ্রস্থল হইলেও—বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ঐ ভাষাও দেশে-বিদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সিংহলে, তিব্বতে, চীনে, পালি-ভাষার প্রভাবের নিদর্শন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। যে ভাষা যখনই রাজভাষা মধ্যে পরিগণিত হয়, সেই ভাষাই তখন অপরাপর ভাষার উপর প্রাধান্য লাভ করে। বৌদ্ধ-নৃপতিগণের একচ্ছত্র-প্রভাবে পালি-ভাষা বিভিন্ন দেশে আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বঙ্গভাষা যখন রাজভাষা মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল, তখন দিকে দিকে বঙ্গ-ভাষার প্রাধান্য বিস্তৃত হয়। এইরূপ যে প্রদেশের যে ভাষার বিষয়ই আলোচনা করি না কেন, এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হই। সময় সময় প্রাদেশিক-ভাষা রাজভাষার মধ্যে গণ্য হইলেও, সংস্কৃত-ভাষাই প্রধানতঃ রাজভাষা ছিল। সুতরাং ভারতের অধিকাংশ সম্পৎ সংস্কৃত-ভাষায়ই নিবদ্ধ রহিয়াছে। মন্বাদির রাজত্বকালে সংস্কৃত-ভাষাই রাজভাষা ছিল। অযোধ্যার রাজন্যবর্গের ভাষা—সংস্কৃত-ভাষা। রাজর্ষি জনকের রাজধানীতে সংস্কৃত-ভাষা প্রচলিত ছিল। হস্তিনায়, ইন্দ্রপ্রস্থে, ব্রজধামে, মথুরায়, দ্বারকায় সংস্কৃত-ভাষার প্রচলনই দেখিতে পাই। বৌদ্ধ-নৃপতিগণের শাসনকালে তাঁহারা পালি-ভাষাকেই রাজভাষা রূপে গ্রহণ

রাজভাষার শ্রেষ্ঠত্ব।

* বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত দাড়ি, নাড়ী, ভুঁড়ী, হাঁড়ী প্রভৃতি শব্দ অদ্যাপিও তামিল ভাষার মধ্যে স্থান পাইয়া আছে। কুমার (কুমারয়), মানুষ (মনুষ) প্রভৃতি বাঙ্গালা শব্দও কেমন ভাবে তামিল ভাষায় স্থান লাভ করিয়াছে, ভারতের ভাষা প্রসঙ্গে "পৃথিবীর ইতিহাস" দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৮৯ম পৃষ্ঠায় তাহা দ্রষ্টব্য।

† এই সকল ভাষার কোন্ ভাষায় বর্ণমালা ও সাহিত্য আছে, "পৃথিবীর ইতিহাসের" দ্বিতীয় খণ্ডে 'ভারতের ভাষা' প্রসঙ্গে ৩৮৫ম—৩৮৭ম পৃষ্ঠায় ও বর্ণমালা প্রসঙ্গে ৪৩৫ম—৪৩৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

করেন। সুতরাং সে সময়ে পালি-ভাষার প্রাধান্য বিস্তৃত হয়। কিন্তু পরিশেষে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবে আবার ভারতে সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজ-চক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্য সংস্কৃত-ভাষাকেই রাজভাষা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তুলনায় সেদিনের নবদ্বীপ-রাজ্যে, বঙ্গভাষার প্রচলন থাকিলেও, সংস্কৃত-ভাষারই প্রাধান্য খ্যাপন হইত। কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবীড়, নবদ্বীপ, মিথিলা প্রভৃতি স্থানে রাজ-সম্মান লাভ করিয়া যে সকল পণ্ডিত যশস্বী হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সংস্কৃত-সাহিত্যের সেবক ছিলেন। সুতরাং সংস্কৃত-সাহিত্যের মধ্যে যেরূপ শ্রেষ্ঠ সম্পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, অপরাপর সাহিত্যে তাহা বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ঐতিহাসিকগণ নির্দ্দেশ করেন, ভারতের ইতিহাসের চতুর্ব্বিধ উপাদান প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথম—কিংবদন্তী; দেশের সাহিত্যের মধ্যে এই কিংবদন্তী নিহিত আছে। দ্বিতীয়—বৈদেশিক ভ্রমণকারীর ও ঐতিহাসিকগণের রচনায় ভারতের প্রসঙ্গোল্লেখ।

ইতিহাসের উপাদান।

তৃতীয়—প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানে; অর্থাৎ—প্রাচীন স্থাপত্যের ভগ্নাবশেষ প্রভৃতি হইতে ইতিহাসের উদ্ধার-সাধন। এই প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধান—ত্রিবিধ উপায়ে সংসাধিত হইতে পারে। স্মৃতি-সৌধাদি হইতে, খোদিত লিপি হইতে, প্রাচীন মুদ্রা ও পদকাদি হইতে। চতুর্থ—ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ প্রাদেশিক সমসাময়িক সাহিত্যের আলোচনা। দেশের ইতিহাস-সংগ্রহের পক্ষে এ সকল উপাদান যে বিশেষ মূল্যবান, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তবে এ সকল উপাদানের সাহায্যে দুই এক সহস্র বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তি-কালের ইতিবৃত্ত সংগৃহীত হইতে পারে। তাহার অধিক পূর্ব্বের ইতিহাসের উপাদান, এ সকল হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হয়। কারণ, কালের কঠোর কষাঘাতে এ সকল উপাদান বিধ্বস্ত হইতে পারে। একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। আর্য্যগণের মধ্য-এসিয়া-বাসের সিদ্ধান্তের যাঁহারা পোষকতা করেন, আমরা নিশ্চয়ই বলিতে পারি, তাঁহারা কেহই উল্লিখিত চতুর্ব্বিধ উপাদানের কোনও উপাদানই প্রমাণ-স্বরূপ উপস্থিত করিতে পারেন না। ভারতবর্ষেরও স্মরণাতীত-কাল পূর্ব্বের ইতিহাসের উপাদান-রূপে ঐ সকল সামগ্রী প্রাপ্ত হই না। অযোধ্যায়, মিথিলায় বা হস্তিনাপুরে ভগ্নস্তূপের মধ্যে রামায়ণ-মহাভারতের কথিত জনপদের স্মৃতি-চিহ্ন কি আছে? রামচন্দ্রের মুদ্রা বলিয়া প্রচারিত মুদ্রাখণ্ড দেখিলেও শ্রীরামচন্দ্রের বা তাঁহার সমসাময়িক স্মৃতি চিত্রপটে উদ্ভাসিত হয় না। ঋগ্বেদে সহস্র-স্তম্ভযুক্ত অট্টালিকাদির বর্ণনা আছে। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু তাহার কি কোনও স্মৃতিচিহ্ন অনুসন্ধান করিয়া পান? তবেই বুঝা যায়, সর্ব্ববিধ্বংসী কালের করাল গ্রাসে এ সকল উপাদান বিলুপ্ত হয়;—সুতরাং এ সকল উপাদানের অনুসন্ধানে প্রাচীনতম কালের ইতিহাস সংগৃহীত হয় না। তবে কি উপায়ে সে ইতিহাস সংগ্রহ হওয়া সম্ভবপর? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পুনঃপুনঃ বলিতেছি, ধর্ম্ম-সংশ্রবযুক্ত সাহিত্য ভিন্ন সে উপাদান অন্যত্র কোথাও অনুসন্ধান করিয়া পাইবেন না। ধর্ম্মগ্রন্থ-সমূহই সে ইতিহাস বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। ধর্ম্মগ্রন্থের আলোচনা হইতেই সে ইতিহাসের উদ্ধার হওয়া সম্ভবপর। আমরা তাই সেই অনুসন্ধানের অনুসরণেই ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহের চেষ্টা পাইতেছি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বেদের আদি-তত্ত্ব।

[বেদ—পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ ;—বেদের আদি-তত্ত্ব নির্ণয় হয় না ;—বেদের কাল নির্ণয়ে সাঙ্খ্য দর্শনের মত ;—তদ্বিষয়ে মীমাংসকগণের সিদ্ধান্ত ,—মীমাংসকের ও নৈয়ায়িকের বিতর্ক ;—বেদ-বিষয়ে বেদান্ত;—বেদ-বিষয়ে নৈয়ায়িকগণের সিদ্ধান্ত ,—বেদ-বিষয়ে বৈশেষিকের মত ,—বেদ বিষয়ে স্মৃতি-পুরাণাদি ;—বেদ কি ?—জ্ঞান।]

বুঝিলাম,—ধর্ম্ম-সংশ্রবযুক্ত সাহিত্যই দেশের প্রাচীন ইতিহাসের প্রকৃষ্ট উপাদান। আরও বুঝিলাম,—যে দেশের সাহিত্য যত প্রাচীন, সে দেশের তত দূর-অতীতের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করা যাইতে পারে। ভারতের শাস্ত্রগ্রন্থ-সমূহের প্রাচীনত্ব অবিসম্বাদিত। সুতরাং অনুসন্ধিৎসু জন তাহারই মধ্যে প্রাচীন ভারতের প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পারেন। শাস্ত্রগ্রন্থ-সমূহের মধ্যে আবার বেদ প্রাচীনতম। সুতরাং বেদের মধ্যে যে ইতিহাস নিহিত আছে, তাহার প্রাচীনত্বের তুলনা নাই। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ যদিও বেদের কাল-নির্ণয় পক্ষে প্রয়াস পাইয়াছেন ; কিন্তু তাঁহাদিগের সকলকেই স্বীকার করিতে হইয়াছে,—বেদের তুল্য প্রাচীনতম গ্রন্থ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই।

প্রাচীনতম সাহিত্য।

বেদ কত কাল পূর্ব্বের ?—অনুসন্ধানে তাহার মীমাংসা হয় না। ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণের গবেষণাও অনেক সময় সে তত্ত্ব নিরূপণে বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ, পুরাণ, তন্ত্র—সকলই বেদের নিত্যত্ব বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক—বেদের অংশ ; উপনিষৎ—বেদের সার। বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভাগ হৃদয়ের সামগ্রী,—বিশ্বাসের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু উপনিষৎ—বিচার-বিতর্কের নিদর্শন। উপনিষৎ হইতেই দর্শন-শাস্ত্রের উৎপত্তি। যাঁহাদের মন সংশয়-দোলায় দোদুল্যমান হইল, একমাত্র বিশ্বাসের ভিত্তির উপর যাঁহাদের চিত্ত দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইল না, বিচার-বিতর্ক দ্বারা দর্শন-শাস্ত্র তাঁহাদিগকে সত্য তত্ত্ব অবগত করাইল। বেদ-বিষয়ে বা ঈশ্বর-সম্বন্ধে যে সংশয়-সন্দেহ উপস্থিত হইতেছিল, দর্শনের আলোকে তাহা তিরোহিত হইল।

বেদ—কত পূর্ব্বের ?

প্রশ্ন উঠিল—বেদ কত পূর্ব্বের ? বেদ ঈশ্বরের সৃষ্ট কি মনুষ্যের কৃত ? সাঙ্খ্যকার ঈশ্বর স্বীকার করিলেন না ; বলিলেন,—প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে সৃষ্টি-কার্য্য সমাহিত হইতেছে। পুরুষ নিষ্ক্রিয় ; প্রকৃতি ক্রিয়মানা। উভয়ের মিলনে জগতের উৎপত্তি। সুতরাং সাঙ্খ্যকার বেদকে ঈশ্বর-কৃত বলিয়া স্বীকার করিলেন না। আবার মনুষ্যকৃত বলিতেও সাহসী হইলেন না। তিনি বলিলেন,—বেদ পৌরুষেয়ও নহে, অপৌরুষেয়ও নহে। "যাহা দেখিলে বোধ হয় যে, বুদ্ধি-পূর্ব্বক উহা কৃত হইয়াছে, তাহা পৌরুষেয় অর্থাৎ পুরুষ-নির্ম্মিত। বেদ পৌরুষেয় হইতে পারে না ; যেহেতু, তৎকর্ত্তা পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি

বেদ-বিষয়ে সাঙ্খ্য-মত।

সেই পুরুষ মুক্ত হয়েন, তবে তাঁহার কোনও বিষয়ে ইচ্ছাই হইতে পারে না। কারণ, ইচ্ছার অধীন হইলে আর তাঁহাকে মুক্ত বলা যাইতে পারে না। যদ্যপি তাঁহার বেদ-রচনা বিষয়ে ইচ্ছা না হয়, তবে তিনি কিরূপে বেদ রচনা করিবেন? সকল প্রকার কার্য্য করিবার পূর্ব্বেই মনে তদ্বিষয়ের ইচ্ছা হইয়া থাকে। কিন্তু মুক্ত-পুরুষের সে ইচ্ছা হইবে না। আর যদি তিনি বদ্ধ হয়েন, তবে তাঁহার ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ। সুতরাং তিনি বেদকর্ত্তা হইবার অযোগ্য; কারণ, কোনও পরিমিত-শক্তিসম্পন্ন পুরুষ বেদ-রচনা করিতে পারেন না। বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-প্রধান সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরও বেদ রচনা করিতে পারেন না; কারণ, তিনি বীতরাগ এবং ইচ্ছার অধীন নহেন। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার সকাশ হইতে অদৃষ্টবশতঃ নিশ্বাসের ন্যায় বেদ সকল স্বয়ং উৎপন্ন হইয়াছে। নিজ শক্তির প্রকাশ দ্বারা বেদই স্বয়ং বেদের প্রমাণ; প্রমাণান্তরের অপেক্ষা নাই। বেদ নিত্যও হইতে পারে না; যেহেতু, ইহা পুরুষ হইতে উচ্চারিত এবং কার্য্য বলিয়া পরিগণিত। যাহা কার্য্য, তাহা নিত্য হইতে পারে না। পুরুষ হইতে উচ্চারিত হইলেই পৌরুষেয় হইল না। বুদ্ধিপূর্ব্বক উচ্চারিত হইলেই পৌরুষেয় বলা যাইতে পারে। সুষুপ্তি-কালে নিশ্বাস-প্রশ্বাস পৌরুষেয় বলিয়া ব্যবহার হয় না; কারণ, তাহা বুদ্ধিপূর্ব্বক নহে। অতএব স্থির হইল যে, বেদ পৌরুষেয়ও নহে, অপৌরুষেয় অর্থাৎ নিত্যও নহে। এ বিধায় বেদ কোথা হইতে হইল? সাঙ্খ্যকার বলেন যে, বেদ অনাদি, বীজাঙ্কুরবৎ। যেরূপ বীজ হইতে অঙ্কুর, কি অঙ্কুর হইতে বীজ; অঙ্কুর বীজের কারণ, কি বীজ অঙ্কুরের কারণ, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব; তদ্রূপ বেদের আদি নির্ণয় করা অসম্ভব।" বেদ-বিষয়ে মহর্ষি কপিলের এবম্বিধ বিতর্কের বিষয় আলোচনা করিলে বেশ প্রতীয়মান্ হয়,—এখনও যেমন বেদের কাল-নির্ণয়ে গবেষণা পর্য্যুদস্ত, মহর্ষি কপিলের সময়েও সেই অবস্থা ঘটিয়াছিল। বেদ কত কালের?—এখনও যে প্রশ্ন চলিয়াছে, তখনও সেই প্রশ্নই চলিয়াছিল। সাঙ্খ্য-মতের আলোচনায় তাহাই উপলব্ধি হইল। বুঝিলাম,—বেদের কাল-নির্ণয়ে সাঙ্খ্যের গবেষণা পরাভূত।

বেদ-বিষয়ে মীমাংসকগণ।

মীমাংসকগণ, নৈয়ায়িকগণ, বৈদান্তিকগণ বেদ-বিষয়ে যে গবেষণা করিয়া গিয়াছেন, তাহা বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। মীমাংসা-দর্শনের মতাবলম্বিগণ—মীমাংসক নামে অভিহিত। বেদের মীমাংসা আছে বলিয়াই ঐ দর্শনের নাম—মীমাংসা-দর্শন। মহর্ষি জৈমিনি কর্ত্তৃক ঐ দর্শন প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়া উহার অপর নাম—জৈমিনি-দর্শন। পণ্ডিতগণ বলেন,—"এই দর্শন শ্রুতি-স্মৃতির বিরোধভঞ্জক মধ্যস্থ-স্বরূপ, ধর্ম্ম-দর্শনের আদর্শ-স্বরূপ এবং দুর্গম নিগম মার্গে সুখ-সঞ্চলনের বাষ্পীয় রথ-স্বরূপ। বেদ ও স্মৃতি-শাস্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ-নিশ্চয় এবং বিরোধভঞ্জন নিমিত্ত মীমাংসা-দর্শন অতীব উপযোগী।" মীমাংসা-দর্শন শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করেন। তদনুসারে মীমাংসকগণ বেদের নিত্যত্ব প্রমাণ করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে নৈয়ায়িকগণের সহিত মীমাংসকগণের ঘোর বিতর্ক উপস্থিত হয়। শব্দের নিত্যত্ব-নিত্যত্ব লইয়া সে বিতর্ক। সে বিতর্কের একটু আভাস প্রদান করিতেছি। "শব্দ এবং

অর্থ উৎপত্তি হইলে পর তাহাদিগের মধ্যে অমুক শব্দে অমুক অর্থ বোধ হয়, এইরূপ সঙ্কেতাত্মক সম্বন্ধ (অর্থাৎ বোধ্য-বোধক ভাব) কল্পিত হইয়া থাকে। সেই লোক-কল্পিত সম্বন্ধ-জ্ঞানের উপরই শব্দের ব্যবহার নির্ভর করে। অতএব শব্দ এবং অর্থের সম্বন্ধ কল্পিত বলিয়া যেরূপ শুক্তিকাদিতে রজতাদির প্রত্যক্ষ জ্ঞান ভ্রান্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ শব্দে সত্য-ব্যভিচার সম্ভব হইতে পারে। তাহা হইলে বেদবাক্য-সকল কল্পিত ও সঙ্কেতাত্মক শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ হেতু অপ্রমাণ এবং নিরর্থক হইয়া পড়ে। এই আপত্তি খণ্ডন করিবার নিমিত্ত মীমাংসকগণ বক্ষ্যমাণ সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন,—

'ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্য অর্থেন সহ সম্বন্ধস্তস্য জ্ঞানমুপদেশঃ
অব্যতিরেকশ্চ অর্থে অনুপলব্ধে তৎপ্রমাণং বাদরায়ণস্য।' ১।১।৫

শব্দস্য নিত্যবেদঘটকপদস্য অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকাম ইত্যাদেরর্থেন সম্বন্ধঃ ঔৎপত্তিকঃ স্বাভাবিকো নিত্য ইতি যাবৎ। অতস্তস্য ধর্ম্মস্য ইতি শেষঃ। জ্ঞানমত্র করণে ল্যুট জ্ঞপ্তেযথার্থজ্ঞানস্য করণং উপদেশঃ অর্থপ্রতিপাদনং। অব্যতিরেকঃ অব্যভিচারী দৃশ্যতে। অনুপলব্ধে প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণৈরজ্ঞাতে অর্থে তৎ বিধিঘটিতবাক্যং ধর্ম্মে প্রমাণ বাদরায়ণাচার্য্যস্য সম্মতমিতি ভাষ্যং।

শব্দ এবং অর্থের পরস্পর সম্বন্ধ অর্থাৎ বোধ্য-বোধক ভাব স্বাভাবিক ও নিত্য। অতএব বেদবাক্য-সমূহ ধর্ম্মজ্ঞান বিষয়ে এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-নিরপেক্ষ অজ্ঞাত বিষয়ে অভ্রান্ত উপদেশ প্রদান করে। সুতরাং বেদ প্রমাণ এবং নিত্য।"

কিন্তু নৈয়ায়িকগণ এ যুক্তিতে আস্থা স্থাপন করেন না। শব্দের অনিত্যত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা যুক্তি-পরম্পরা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে ন্যায়-শাস্ত্রের কয়েকটী সূত্র,—

মীমাংসকের ও নৈয়ায়িকের বিতর্ক।

"(১) 'কর্ম্ম একে তত্র দর্শনাৎ।' শব্দ প্রযত্ন করিলে উৎপন্ন হয়, সুতরাং শব্দ প্রযত্ন-সাপেক্ষ এবং কর্ম্ম। অতএব শব্দ নিত্য হইতে পারে না। যেহেতু যাহা নিত্য হয়, তাহা সর্ব্বকালে বিদ্যমান থাকে এবং প্রযত্ন দ্বারা উৎপন্ন হইতে পারে না। (২) 'অস্থানাৎ'। শব্দ ক্ষণস্থায়ী; একক্ষণে উৎপন্ন হয় এবং পরক্ষণে বিনষ্ট হয়; সুতরাং শব্দ নিত্য হইতে পারে না। (৩) 'করোতি-শব্দাৎ।' 'শব্দং করোতি' শব্দ করে—এরূপ ব্যবহার হয় বলিয়া শব্দ নিত্য হইতে পারে না; কারণ ইহা কৃত। (৪) 'সত্ত্বান্তরে যৌগপদ্যাৎ'। এককালীন নিকটস্থ এবং দূরস্থ বহু ব্যক্তির কর্ণগোচর হইয়া থাকে; সুতরাং শব্দ এক ও নিত্য কিরূপে হইবে? (৫) 'প্রকৃতিবিকৃত্যোশ্চ।' যে পদার্থ পরিবর্ত্তনশীল, তাহা নিত্য হইতে পারে না। শব্দেরও প্রকৃতি-বিকৃতি ভাব দৃষ্ট হয়। যথা,—দধি অত্র এবং দধ্যত্র। সুতরাং শব্দ নিত্য নহে। (৬) 'বৃদ্ধিশ্চকর্ত্তৃভূম্নাস্য।' শব্দকর্ত্তার সংখ্যাভেদে শব্দের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। দশ ব্যক্তি যদি এককালীন 'গো' শব্দ উচ্চারণ করেন, তবে দশটী 'গো' শব্দ উৎপন্ন হইল। সুতরাং মীমাংসকদিগের নিত্যত্ব স্বীকার নিষ্ফল।" নৈয়ায়িকগণের এবম্বিধ আপত্তির উত্তরে মীমাংসকগণ আবার বলেন,—"(১) 'সতঃ পরমদর্শনং বিষয়ানাগমাৎ।' শব্দ নিত্য হইলেও যে সর্ব্বকালে উপলব্ধ হয় না—তাহার হেতু এই যে, সর্ব্বসময়ে উচ্চারণ-কারী ব্যক্তির সহিত শব্দের সন্নিকর্ষ থাকে না। 'গকার' এই শব্দ উচ্চারণ করিলেই আমাদিগের এইরূপ বুদ্ধি হয় যে, সর্ব্বদা আমরা যে 'গকার' শ্রবণ করিয়া থাকি, ইহাও

সেই গকার, তদ্ভিন্ন স্বতন্ত্র নহে। (২) 'প্রয়োগস্য পরমং'। 'শব্দং করোতি'—এই বাক্যের অর্থ শব্দ-নির্ম্মাণ নহে; শব্দের উচ্চারণ মাত্র। (৩) 'আদিত্যবৎ যৌগপদ্যং।' যেরূপ এক সূর্য্য নিকটস্থ এবং দূরস্থ সকল লোকেরই দৃশ্য হইতেছে, তদ্রূপ এক শব্দ বহু ব্যক্তির শ্রব্য হইতে পারে। (৪) 'বর্ণান্তরমবিকারঃ।' বর্ণান্তরকে বিকার বলা উচিত নহে। যেহেতু 'ই'-কার স্থানে 'য'-কার হইলে বর্ণান্তর প্রয়োগ হইল; 'ই'-কারের কোনও বিকার হইল না। (৫) 'নাদবৃদ্ধিঃ পরা।' দশ ব্যক্তি এক 'গো' শব্দ উচ্চারণ করিলে দশটী 'গো' শব্দ আবির্ভূত হইল বটে; কিন্তু তাহা কেবল নাদ অর্থাৎ গোলমাল বৃদ্ধি মাত্র, শব্দ-বৃদ্ধি নহে। এক গো শব্দ একই রহিল; তবে দশ বার উচ্চারিত হইল বলিয়া গোলমাল অধিক হইল। অতএব কোনপ্রকারেই শব্দের একত্ব এবং নিত্যত্ব হানি হইতে পারে না। সুতরাং শব্দের নিত্যত্ব সুস্থির রহিল।" এইরূপে নৈয়ায়িকগণের যুক্তি খণ্ডন করিয়া মীমাংসকগণ শব্দের নিত্যত্ব প্রমাণ সম্বন্ধে আরও কয়েকটী সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। যথা,—"(১) 'নিত্যস্তু স্যাৎ দর্শনস্য পরার্থত্বাৎ।' যেহেতু শব্দ উচ্চারিত হইলেই অন্য ব্যক্তি ঐ শব্দের অর্থগ্রহ করিতে পারেন; অতএব অবশ্য শব্দ নিত্য হইবে। যদি শব্দ নিত্য না হইত, তাহা হইলে কেহই শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিত না। কারণ, শব্দ উচ্চারণ মাত্র বিনষ্ট হইবে। নচেৎ, বিষম দোষ ঘটে। এইরূপ শব্দের স্থিতি মানিলেই শব্দের নিত্যত্ব স্বতঃপ্রমাণ হইল। (২) 'সর্ব্বত্র যৌগপদ্যাৎ।' ভিন্ন ভিন্ন পুরুষেরা এককালে এক শব্দের সমভাবে এবং অভ্রান্তরূপে প্রত্যভিজ্ঞা করিতে পারেন। যেহেতু শব্দ নিত্য এবং একস্বরূপ। (৩) 'সংখ্যাভাবাৎ।' শব্দের সংখ্যা বৃদ্ধি নাই। একটী 'গো' শব্দের বারংবার উচ্চারণ করিলে, ঐ পুনঃপুনঃ-উচ্চারিত শব্দগুলি সংখ্যাবচ্ছেদে পরস্পর বিভিন্ন নহে। (৪) 'অনপেক্ষত্বাৎ।' শব্দের বিনাশ অনুমান করিবার কোনও কারণ বা অবলম্বন নাই। সুতরাং শব্দ অনিত্য কেন হইবে? (৫) 'লিঙ্গদর্শনাৎ চ।' বেদসংহিতাতেও শব্দের নিত্যত্ব পরিস্ফুট রহিয়াছে। যথা,—'তস্মৈ নূনং অভিদ্যবে বাচা বিরূপ নিত্যয়া বৃষ্ণে চোদস্ব সুষ্টুতিং।' (৮।৬৪।৬) হে বিরূপ নিত্য শব্দের দ্বারা সর্ব্বগামী এবং কামবর্ষিতা অগ্নিকে শোভন স্তোত্র প্রেরণ কর।" এবম্বিধ নানা যুক্তির অবতারণায় মীমাংসকগণ শব্দের নিত্যত্ব প্রমাণ করেন। বেদ শব্দ-সমষ্টি; শব্দ নিত্য; সুতরাং বেদ নিত্য। ইহাই মীমাসকগণের সিদ্ধান্ত। সুতরাং বুঝা গেল,—এখনও যেমন বেদের কাল-নির্ণয় লইয়া বিতণ্ডা চলিয়াছে, ন্যায়-দর্শন ও মীমাংসা-দর্শনের সময়ও সেই বিতণ্ডা—সেই বিতর্ক চলিয়াছিল। তবেই বুঝুন,—বেদ কত কালের!

বেদান্ত-দর্শন অন্যভাবে বেদ-তত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন। বেদান্ত-দর্শনের সূত্র-সমূহ সম্যক্ পরিস্ফুট নহে; সুতরাং সে সূত্রে সে তত্ত্ব অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হয় না। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য 'শারীরক ভাষ্যে' সে তত্ত্ব উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন। বেদান্ত-দর্শনের প্রতিপাদ্য—ব্রহ্ম সত্য, আর সমুদায় মিথ্যা; ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তি; অন্যথা মুক্তি সম্ভবে না। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য শ্রুতি-স্মৃতি-তন্ত্র-পুরাণাদির সাহায্যে বেদান্তের ঐ মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। "ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এই বর্ণত্রয় মাত্র ব্রহ্ম-

বেদ-বিষয়ে বেদান্ত।

জ্ঞানের উপযুক্ত স্থির করিয়া, দর্শনকার দেবগণের মোক্ষেচ্ছা এবং বিগ্রহ-ধারণ-শক্তি প্রতিপাদন করিয়াছেন। যদ্যপি দেবগণ শরীরযুক্ত হইলেন, তাহা হইলে বহুসংখ্যক যজ্ঞে এককালে তাঁহাদের গমন অসম্ভব হইবে। যেহেতু এক ইন্দ্র ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞে এককালে সশরীরে গমন করিতে পারেন না। এ আপত্তির দুই প্রকার উত্তর হইতে পারে। যথা,—প্রথমতঃ, দেবগণ ভিন্ন ভিন্ন শরীর ধারণ করিতে পারেন এবং সশরীরে ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উপস্থিত হইতে সমর্থ। উত্তরনৈষধচরিতে যখন ইন্দ্র নলরাজকে বর প্রদান করেন, তিনি বলিয়াছিলেন,—'হে নল! তুমি যদি যজ্ঞ কর, তাহা হইলে আমি সশরীরে সে যজ্ঞস্থলে গমন পূর্ব্বক তোমার প্রদত্ত আহুতি গ্রহণ করিয়া, নাস্তিকদিগের দর্প চূর্ণ করিব।' দ্বিতীয়তঃ, যেহেতু দেবগণের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তখন অনেক ব্যক্তি এককালে এক দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া আহুতি দিতে পারেন, তাহাতে কোনও দোষ ঘটিতে পারে না। একজন ব্রাহ্মণকে এককালে বহুসংখ্যক ব্যক্তি প্রণাম করিতে পারেন। অতএব দেবগণের শরীর ধারণ বিষয়ে কোনও আপত্তি ঘটিতে পারে না। বেদান্ত-দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের দ্বিতীয় সূত্রে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এই বাক্য দ্বারা সমস্ত জগতের ব্রহ্মা হইতে উৎপত্তি নির্ণীত হইয়াছে এবং তৃতীয় পাদের অষ্টাবিংশ সূত্রে 'অতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং'—এ উক্তি দ্বারা বৈদিক শব্দ হইতে দেবগণ উৎপন্ন হইয়াছেন, পরিস্ফুট হইল। আবার রুদ্র, আদিত্য, ইন্দ্র, মরুৎ প্রভৃতি দেবতার নাম বেদে দৃষ্ট হয়। কোনও বিষয়ের উৎপত্তি না হইলে কি তাহার নাম হইতে পারে? দেবদত্তের পুত্র না জন্মিলে কি তাহার নাম যজ্ঞদত্ত হইতে পারে? সুতরাং দেবগণ উৎপত্তিযুক্ত এবং অনিত্য; তৎসংযোগে বেদও অনিত্য এবং অপ্রমাণ হউক। এ বিষয়ে দর্শনকার এবম্বিধ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আকৃতি (Species) এবং ব্যক্তি (Individual) দুইটী বিভিন্ন পদার্থ। ব্যক্তি অনিত্য, যথা—গবাদি; এবং আকৃতি নিত্য, যথা—গোজাতি। দেবজাতি নিত্য; কিন্তু ইন্দ্র-আদিত্যাদি দেবগণ ব্যক্তি মাত্র এবং অনিত্য। বেদে আকৃতির কথা উক্ত হইয়াছে, ব্যক্তির কথা নাই; সুতরাং কোনও বিরোধ হইবার সম্ভাবনা নাই। ব্রহ্মা হইতে বেদের উৎপত্তি; বেদ ব্রহ্মকার্য্য। 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' এই সূত্রে ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রের সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—'মহৎ ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রের প্রদীপের ন্যায় সর্ব্বার্থ-ভাসকতা শক্তি দৃষ্ট হয়।' ইহা বিবিধ বিদ্যা দ্বারা বর্দ্ধিত এবং সর্ব্বজ্ঞকল্প। ঈদৃশ শাস্ত্রের সর্ব্বজ্ঞগুণবিশিষ্ট সর্ব্ববিৎ ঈশ্বর ব্যতীত অন্য প্রণেতা কি সম্ভবে? সুতরাং বেদশাস্ত্র ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।' মীমাংসা-দর্শনের মত হইতে বেদান্ত-দর্শনের মত এই পর্য্যন্ত বিভিন্ন যে, মীমাংসা-দর্শনে ব্রহ্মা হইতে বেদের উৎপত্তি বিষয়ে কোনও উল্লেখ নাই। কিন্তু বেদান্ত-দর্শনের উহাই প্রতিপাদ্য। মীমাংসা বলেন,—শব্দ নিত্য বলিয়া শব্দরাশি বেদ নিত্য। কিন্তু বেদান্ত বলেন,—ব্রহ্মোৎপন্ন বলিয়া বেদ নিত্য এবং প্রমাণ। সায়ণাচার্য্যের মতে বেদের নিত্যত্ব কেবলমাত্র এককল্পস্থায়ী, চিরকাল নহে।" ফলে, বেদান্তও বেদকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করিলেন; বেদান্তও বেদের কাল-নির্দ্দেশে সমর্থ হইলেন না।

মীমাংসকগণের সহিত নৈয়ায়িকগণের বেদ-বিষয়ে বিতর্কের আভাস পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছি। কিন্তু ন্যায়দর্শনের প্রবর্ত্তক মহর্ষি গোতম বেদ-বিষয়ে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে তদ্বিষয়েই বা কি অভিজ্ঞতা লাভ করি? "ন্যায়দর্শনের মতে জীবাত্মাতিরিক্ত একজন পরমেশ্বর আছেন; তাঁহার ভোগসাধন শরীর, সুখ-দুঃখ-দ্বেষাদি কিছুই নাই। কেবল নিত্য-জ্ঞান, ইচ্ছা ও যত্নাদি কয়েকটী গুণ আছে। তিনি অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ও সমস্ত জগতের কর্ত্তা। এতদ্বিষয়ের প্রমাণ—বেদাদি শাস্ত্র এবং অনুমান। নৈয়ায়িকেরা শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। সুতরাং মীমাংসকদিগের ন্যায় বেদের প্রামাণ্য গ্রাহ্য করিতে পারেন না। যে সমস্ত যুক্তি দ্বারা তাঁহারা শব্দ অনিত্য বলিয়া প্রমাণ করেন, তাহার কতকগুলি ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।" বেদ-বিষয়ে গোতম আর আর যে তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন, এবং পরিশেষে যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন,—এস্থলে তাহার আভাস দিতেছি। তিনি তর্ক আরম্ভ করিয়াছেন,—"তদপ্রামাণ্যম্ অনৃতব্যাঘাতপুনরুক্তদোষেভ্যঃ।" বেদ অনিত্য ও অপ্রমাণ; যেহেতু, ইহাতে অনৃত, ব্যাঘাত এবং পুনরুক্তি দোষ দৃষ্ট হয়। বৃত্তিকার লিখিতেছেন,—'অদৃষ্টার্থক শব্দ বেদ অপ্রমাণ; কারণ, ইহাতে দোষত্রয় লক্ষিত হয়। প্রথম,—অনৃত অর্থাৎ মিথ্যাকথন; যথা,—পুত্রেষ্টি যাগাদিতে অনেক সময় ফলের উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। তদ্ধেতু বেদ-বাক্যের অযথার্থ-কথন। দ্বিতীয়,—ব্যাঘাত অর্থাৎ পূর্ব্বাপরবিরোধ। যথা,—উদিত কালে হোম করিবে না, এবং অনুদিত কালে হোম করিবে না। তৃতীয়,—পুনরুক্তি দোষ; অর্থাৎ—এক কথার বারংবার কথন। অতএব বেদ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।' গোতম সূত্রত্রয়ের উক্ত দোষত্রয় নিরাকরণ করিয়াছেন। প্রথমতঃ, কর্ম্মকর্ত্তার অযথা-বিধি কর্ম্মকরণ প্রভৃতি বৈগুণ্য-প্রযুক্ত যাগ-ফলের অনুপপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, অনুদিত কালে হোম করিব অথবা উদিত-কালে হোম করিব,—এইরূপ স্বীকার করিয়া, যে ব্যক্তি তদ্বিপরীত কার্য্য করে অর্থাৎ উদিত-কালে হোম করে অথবা অনুদিত-কালে হোম করে, তাহার পক্ষে উক্ত নিষেধ, সাধারণের পক্ষে নহে। তৃতীয়তঃ, পুনরুক্তি দোষ নহে; বরং গুণবিশেষ। কারণ, অনেক বিষয় দুই তিন বার না বলিলে, শ্রোতৃবর্গ তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারেন না। তজ্জন্য পুনরুক্তি স্থলবিশেষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সুতরাং বেদের প্রামাণ্য কোনও প্রকারেই ব্যাহত হইল না। এইরূপ দোষত্রয় প্রত্যাদেশ করিয়া গোতম স্বমত প্রতিপন্ন করিয়াছেন। 'মন্ত্রায়ুর্ব্বেদবৎ চ তৎপ্রামাণ্যং আপ্ত প্রামাণ্যাৎ।' বৃত্তিকার ব্যাখ্যা করিতেছেন,—'আপ্তস্য বেদকর্ত্তুঃ প্রামাণ্যাৎ যথার্থোপদেশকত্বাৎ বেদস্য তদুক্তত্বমর্থাৎলব্ধং। তেন হেতুনা বেদস্য প্রামাণ্যমনুমেয়ং। তত্র দৃষ্টান্তমাহ। মন্ত্রো বিষাদিনাশকঃ। আয়ুর্ব্বেদভাগশ্চ বেদস্য এব। তত্র সংবাদেন প্রামাণ্যগ্রহাৎ তদ্দৃষ্টান্তেন বেদত্বাবচ্ছেদেন প্রামাণ্যমনুমেয়ং।" যেরূপ প্রণেতার উপদেশ যথার্থ বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ প্রমাণ, তদ্রূপ বেদকর্ত্তা যথার্থবাদী বলিয়া বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে। বাৎস্যায়ন ভট্টাচার্য্য তাঁহার বৃত্তিতে এই সূত্রের অতি সরল ভাষায় পরিস্ফুট অর্থ

বেদ-বিষয়ে নৈয়ায়িকগণ।

করিয়াছেন। উপসংহারস্থলে তিনি বলিয়াছেন,—'মন্বন্তর যুগান্তরেষু চ অতীতানাগতেষু সম্প্রদায়াভ্যাসপ্রয়োগাবিচ্ছেদো বেদানাং নিত্যত্বং। আপ্তপ্রামাণ্যাৎ চ প্রামাণ্যং। লৌকিকেষু শব্দেষু চৈতৎ সমানং।' অর্থাৎ,—অতীত এবং ভবিষ্যৎ মন্বন্তর ও যুগান্তর সময়ে বেদের সম্প্রদায়, অভ্যাস এবং প্রয়োগ অবিচ্ছিন্ন থাকে, এজন্য বেদ নিত্য। আর যথার্থবাদী প্রণেতার যথার্থ উপদেশ, এই হেতু বেদের প্রামাণ্য। লৌকিক বাক্যেও এই নিয়ম। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, নৈয়ায়িকেরা বহুকাল প্রচলিত আছে—এজন্য বেদের নিত্যতা এবং বেদকর্ত্তা যথার্থবাদী এজন্য বেদ প্রামাণ্য স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন,—'বেদোক্ত বিষয়ের সত্যতা আছে বলিয়া যে, বেদের নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হইবে,—এরূপ কি নিয়ম আছে? ঘট কুম্ভকার কর্ত্তৃক কৃত—এই বাক্যের যাথার্থ্য আছে বলিয়া যেমন ঐ বাক্যের অভ্রান্ত-পুরুষোক্ততা আছে, তদ্রূপ বেদ অভ্রান্ত-পুরুষ প্রণীত, এইমাত্র। নতুবা, বেদ যে কোনও ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত নহে, এমন নহে। যদি অর্থের যাথার্থ্য থাকিলেই বাক্য নিত্য হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত ঘট কুম্ভকার কৃত,—এ আধুনিক বাক্য নিত্য হইয়া উঠে। যদিও এরূপ অভ্রান্ত-পুরুষ দৃষ্ট হয় না; কিন্তু তাদৃশ অভ্রান্ত পুরুষ যে নাই, এ কথা বলা যাইতে পারে না। যেহেতু, সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বমঙ্গলনিদান, দয়াময়,জগৎকারণ ঈশ্বর সর্ব্বত্র বিরাজমান রহিয়াছেন। তিনিই সর্ব্বসাধারণের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া বেদ রচনা করিয়াছেন। সুতরাং ন্যায়-দর্শনের মতে বেদ ঈশ্বরের প্রণীত বলিয়া প্রমাণ।" ফলে ন্যায়দর্শনও বেদের কাল-নির্দ্দেশে অগ্রসর হইতে পারিলেন না।

বেদ-বিষয়ে বৈশেষিকের মত।

বৈশেষিক-দর্শন বিশেষ পদার্থের অস্তিত্বানুসন্ধানে প্রযত্নপর। বৈশেষিক মতে,—'সেই বিশেষ পদার্থ নিত্য; সেই বিশেষ পদার্থের জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান; তত্ত্বজ্ঞান-লাভে মুক্তি; বেদ সেই তত্ত্ব-জ্ঞান-লাভের উপায়।' দর্শনকার বলিতেছেন,—'তদ্বচনাৎ আম্নায়স্য প্রামাণ্যম্।' সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া বেদ প্রমাণ। তৎপরে বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধান্ত করিবার নিমিত্ত দর্শনকার আর একটী সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। যথা,—'বুদ্ধিপূর্ব্বা বাক্যকৃতির্ব্বেদে।' ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—'বাক্যকৃতিঃ বাক্যরচনা সা বুদ্ধিপূর্ব্বা বক্তৃযথার্থজ্ঞানপূর্ব্বা। নদীতীরে পঞ্চ-ফলানি সন্তীত্যস্মদাদিবাক্যরচনাবৎ। স্বর্গকামো যজেত ইত্যাদৌ ইষ্টসাধনতায়াঃ কার্য্য-তায়া বা অস্মদাদিবুদ্ধ্যগোচরত্বাৎ। তেন স্বতন্ত্রপুরুষপূর্ব্বকত্বং বেদে সিধ্যতি।' ব্যাখ্যা হইতে এই সূত্রের অর্থ নিষ্পন্ন হয়,—বেদবক্তার যথার্থ জ্ঞানপূর্ব্বক বাক্য-রচনা দেখিতে পাওয়া যায়। স্বর্গকামনা করিয়া যাগ করিবে—ইত্যাদি ইষ্টোপদেশ অস্মদ সদৃশ ব্যক্তি-দিগের বুদ্ধির অগোচর। সুতরাং স্বতন্ত্র সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর বেদ-রচনা করিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। অজ্ঞানাদি দোষবিশিষ্ট মনুষ্যেরা বেদ-রচনা করিতে অসমর্থ। যেহেতু, বেদের বহুসংখ্যক শাখা দেখিতে পাওয়া যায় এবং বেদের প্রতিপাদ্য বিষয়-সমূহও প্রত্যক্ষ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য। এত শাখাবিশিষ্ট বেদ দুর্ব্বল মনুষ্য কর্ত্তৃক প্রণীত হইতে পারে না। আর অনেক বুদ্ধিমান উপযুক্ত ব্যক্তি বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া থাকেন। যথার্থবাদী উপযুক্ত পুরুষের বাক্য না হইলে কি বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা গ্রাহ্য করেন? অতএব বেদ

ঈশ্বর-প্রণীত এবং প্রমাণ।" বৈশেষিক মতের আলোচনায় পরবর্ত্তিকালে যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে 'তর্কসংগ্রহ' এবং উদয়নাচার্য্যের 'কুসুমাঞ্জলি' বিশিষ্ট। উভয় গ্রন্থেই বেদকে ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। ফলতঃ, বৈশেষিক মতে বেদ ঈশ্বর-প্রেরিত এবং মহাজনগৃহীত, সুতরাং প্রামাণ্য। যাহা ঈশ্বর-প্রেরিত ও অভ্রান্ত, তাহার আদি কে নির্ণয় করিবে? জগৎপাতা জগদীশ্বরের যেমন আদি-নির্ণয় হয় না, বেদ-শাস্ত্রেরও আদি-তত্ত্ব তদ্রূপ অপরিজ্ঞাত। তর্কের আধার দর্শন-শাস্ত্র-সমূহ নানারূপ তর্কজাল বিস্তার করিয়া সে আদি-তত্ত্ব নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। তবেই বুঝা যায়,—বেদ কত কালের!

বেদ-বিষয়ে অন্যান্য শাস্ত্র।

যেমন দর্শন-শাস্ত্রে দেখিলাম, বেদের আদি-নির্ণয়ে দর্শন-শাস্ত্র পরাভূত হইয়াছেন, ব্রাহ্মণ আরণ্যক, উপনিষৎ— সর্ব্বত্রই সেই ভাব পরিদৃষ্ট, স্মৃতি-পুরাণাদির মধ্যেও সেই ভাবই প্রত্যক্ষীভূত। শতপথ ব্রাহ্মণের বিভিন্ন স্থানে প্রজাপতি ব্রহ্মকেই বেদের সৃষ্টি-কর্ত্তা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। "ব্রহ্ম এব প্রথমমসৃজত ত্রয়ীমেব বিদ্যাং" (৬।১।১।৪)। অর্থাৎ,—ঋক, যজুঃ, সাম—ত্রয়ী বিদ্যা ব্রহ্মই সৃজন করেন। বেদ নিত্য চিরস্থায়ী ও সর্ব্ব পদার্থের আকর,—এবম্প্রকার উক্তিও শতপথ ব্রাহ্মণে উক্ত আছে। (১০।৪।২।২১) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও দেখিতে পাই,—প্রজাপতি ব্রহ্মই বেদত্রয়ের সৃষ্টিকর্ত্তা। "তমনু ত্রয়োবেদা অসৃজ্যন্ত।" (২।৩।১০।১) উপনিষদের মধ্যে ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রজাপতিকেই বেদের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সে মতে, "অগ্নেঃ ঋচঃ বায়োর্যজুংষি সাম আদিত্যাৎ।" 'প্রজাপতি অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ এবং আদিত্য হইতে সামবেদ নিঃসৃত করেন।' ফলতঃ, সৃষ্টির আদি-কাল হইতেই বেদের বিদ্যমানতা—সকল শাস্ত্রই এক বাক্যে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। বেদার্থ স্মরণ করিয়া যে সকল শাস্ত্র-গ্রন্থ মহর্ষিগণ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাই স্মৃতি নামে অভিহিত। স্মৃতি বেদের অনুসারী। বেদের অনুসারী বলিয়াই স্মৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র। মনু-স্মৃতি সম্যক্‌রূপে বেদের অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া, সকল স্মৃতির মধ্যে মনু-স্মৃতির প্রাধান্য। মহর্ষি বৃহস্পতি সে কথা স্পষ্টই ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন;—"বেদার্থোপনিবদ্ধত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোস্মৃতং। মন্বর্থ বিপরীতা তু যা স্মৃতি সা ন শস্যতে॥" মনু-সংহিতায় চারি বেদেরই উল্লেখ আছে। মনু স্পষ্টতঃই বলিয়া গিয়াছেন,—'বেদ অপৌরুষেয়, অপ্রমেয় এবং নিত্য।' যিনি মানবগণের আদি-পুরুষ বলিয়া পরিচিত, তিনিই যখন বেদের এইরূপ প্রাধান্য খ্যাপন করিয়া গিয়াছেন,—তাঁহার সময়েই যখন বেদের আদি-নির্ণয় হয় নাই, তখন বেদ-বর্ণিত ইতিবৃত্তের অনুসন্ধান করিতে যাওয়া বা তাহার কালাকাল নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাওয়া—ধৃষ্টতার পরিচয় সন্দেহ নাই। যে দেশের সাহিত্য পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, আর যে দেশের সাহিত্যের আদিতত্ত্ব-নির্ণয়ে সকলের সকল গবেষণা পর্য্যুদস্ত হইয়া আছে, সে দেশের সভ্যতা—সে দেশের প্রাধান্য—সে দেশের ঐশ্বর্য্য-গৌরব যে কতকাল পূর্ব্বের, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

এই পরিচ্ছেদের উদ্ধৃতাংশ ৺রমানাথ সরস্বতীর ঋগ্বেদ-সংহিতা হইতে সংগৃহীত হইল।

সকল শাস্ত্রই তারস্বরে কহিলেন,—বেদ অনাদি কাল হইতে বিদ্যমান আছে। কতকাল ধরিয়া কত বিচার বিতর্ক চলিল; কতকাল ধরিয়া কত কত মহাজনের গবেষণা পর্য্যুদস্ত হইল; পরিশেষে সিদ্ধান্ত দাঁড়াইল,—বেদ অনাদি অনন্ত কাল হইতে বিদ্যমান আছে। অপিচ, সকলেই একবাক্যে বেদের অভ্রান্তত্ব ও অপৌরুষেয়তা স্বীকার করিয়া গেলেন। যে বিতর্ক-বিতণ্ডা পূর্ব্বেও চলিত, বেদ-বিষয়ে আজিও তদ্রূপ বিতর্ক-বিতণ্ডার অবধি নাই। সংসারে এমন কোন্ সামগ্রী আছে,—যাহা চিরস্থায়ী, যাহা অভ্রান্ত, যাহা অপৌরুষেয়! মানুষ সাধারণতঃ সেরূপ কোনও সামগ্রীই প্রায় সন্ধান করিয়া পায় না; সুতরাং বেদের ঐ সকল বিশেষণের সার্থকতাও দেখে না। বেদ বা বৈদিক শব্দ অধুনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। যাহা গ্রন্থাকারে প্রচারিত প্রকাশিত, তাহা মনুষ্য-কৃত সুতরাং অস্থায়ী; তাহার ভ্রম-প্রমাদ-অনিত্যত্ব অবিসম্বাদিত। এ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, বেদের অনাদিত্ব, অপৌরুষেয়ত্ব ও অভ্রান্তত্ব কোনক্রমেই স্বীকার করা যায় না। সুতরাং যে অবস্থায় বেদকে আমরা দেখিতে পাই বা প্রাপ্ত হই, এ বেদ—সে বেদ নহে। যে বেদ অনাদি, যে বেদ অভ্রান্ত, যে বেদ অপৌরুষেয়, যে বেদ নিত্য, সে বেদ—এ বেদ হইতে পারে না। তবে বেদ কি? যাহা রচনার অশক্য, যাহা মীমাংসাদি ন্যায়-নিরপেক্ষ হইয়াও অজ্ঞেয়, যাহা হইতে বর্ত্তমান অতীত এবং ভবিষ্যৎ সিদ্ধ হইয়া থাকে, যাহা দেবগণ পিতৃগণ এবং মনুষ্যগণের চক্ষু-স্বরূপ, যাহা নিত্য ও সমস্ত ভূতের ধারণ-সমর্থ,—শাস্ত্র যাহার এবম্বিধ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন,—সে বেদ তবে কি? এ সংসারে চিরস্থায়ী পদার্থ কি আছে? এক সৎপদার্থ ভিন্ন,—এক জ্ঞান ভিন্ন, অভ্রান্ত অপৌরুষেয় চিরস্থায়ী সামগ্রী কিছুই নাই, কিছুই হইতে পারে না। আমাদের তাই মনে হয়—বেদ সেই 'জ্ঞান'। জ্ঞানের অনাদিত্ব বিষয়ে কখনই সংশয়-প্রশ্ন উঠিতে পারে না; জ্ঞান যে অভ্রান্ত অপৌরুষেয়, তদ্বিষয়েও কোনও সন্দেহ আসিতে পারে না। যাহা সত্য, তাহাই জ্ঞান;—তাহা নিশ্চয়ই চিরস্থায়ী, তাহা নিশ্চয়ই অভ্রান্ত। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে,—এতকাল যাহা বেদরূপে সম্পূজিত হইয়া আসিতেছে, তাহা কি তবে মিথ্যা? মিথ্যা বলিতেছি না। সত্য-তত্ত্ব বা নিত্য-সত্য ভাষায় ব্যক্ত হইতে পারে। ভাষায় ব্যক্ত হইলে গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হওয়াও সম্ভব। যদি বলি,—'সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার নাশ হয়';—এ বাক্যের সত্যতা অবিসম্বাদিত। যখনই এ বাক্য বিঘোষিত হইবে, তখনই এ বাক্য অভ্রান্ত বলিয়া সংসার মানিয়া লইবে। যে ভাষায় যে ভাবে এ ভাব ব্যক্ত হউক না কেন, এতদ্বাক্যের অভ্রান্ততা সুতরাং নিত্যতা সম্বন্ধে কোনই সংশয় নাই। যদি কোনও ভাষা-বিশেষে উহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখি, সেই লিপিবদ্ধ অংশকে অনিত্য অস্থায়ী বলিতেই হইবে। এ দৃষ্টিতে দেখিলে, অবস্থা-বিশেষে বেদের নিত্যতা অনিত্যতা অনায়াসে বোধগম্য হইতে পারিবে। ভাষা-বিশেষে প্রকাশিত বা প্রচারিত বেদ অস্থায়ী অনিত্য এবং সময় সময় ভ্রান্তও হইতে পারে; কিন্তু যাহা জ্ঞান, যাহা সত্য,—লিপিবদ্ধ হউক বা নাই হউক,—তাহা অভ্রান্ত, সুতরাং নিত্য ও অপৌরুষেয়। বেদ সেই জ্ঞান; বেদ সেই নিত্য সত্য; সুতরাং অনাদি অপৌরুষেয়।

বেদ কি?—জ্ঞান।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বৈবস্বত মন্বন্তরের রাজন্যবর্গ।

[বৈবস্বত মন্বন্তরের রাজন্যবর্গের কাল-নির্ণয়ের প্রসঙ্গ ;—রাজচক্রবর্ত্তী মনু,—তাঁহার শাসনকালের বিবরণ ;—মনুবংশীয় নৃপতিগণ,—পৃথিবীতে ভারতীয় রাজবংশের শাখা-প্রশাখা,—শাস্ত্রমতে বিভিন্ন যুগের নৃপতিবর্গ ও তাঁহাদের শাসনাদির বিষয় ;—ভারতের ভাগ্য-বিপর্য্যয়,—কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রসঙ্গে।]

কাল-নির্ণয়ে বিফল প্রয়াস।

বৈবস্বত মন্বন্তরের প্রারম্ভে, সত্যযুগ-প্রবর্ত্তনার কালে, বৈবস্বত মনুর বিদ্যমানতার বিষয় অবগত হওয়া যায়। সে সত্যযুগ-প্রবর্ত্তনা—পূর্ব্বেই বলিয়াছি—৩৮ লক্ষ ৯৩ হাজার ১৪ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। মনুর উক্তিতে বেদের বিদ্যমানতা তাহারও পূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং বেদোক্তি যাহা কিছু অবগত হই, তৎসমুদায় রাজ-চক্রবর্ত্তী মনুর পূর্ব্ববর্ত্তী কালের বিষয়ীভূত। শাস্ত্র-বাক্য মান্য করিতে হইলে, এ বিষয়ে মনে কোনই দ্বিধা উপস্থিত হইতে পারে না। বেদোক্ত দূর অতীতের ইতিহাস অনুসন্ধানের প্রয়াস না পাইয়া, বৈবস্বত মন্বন্তরের রাজর্ষি মনুকে আদি-নৃপতি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া, তদীয় বংশলতার অনুসরণে যদি প্রাচীন-ভারতের নৃপতিগণের রাজত্ব-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে যাই, তাহা হইলেও প্রায় ৩৯ লক্ষ বৎসরের ইতিহাস বর্ণিতে হয়। কিন্তু তাহা কি সম্ভবপর ? সম্ভবপর নহে বলিয়াই নানা বিতর্ক উঠে। পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থ আলোড়ন করিয়া যে বংশলতা প্রাপ্ত হওয়া যায়, জীবন-কাল-গণনার আধুনিক পদ্ধতির অনুসরণ করিলে, তদনুসারে মনুর রাজত্ব-কাল সে দিনের ঘটনা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এখনকার দিনে গড়পরতা পঁচিশ বৎসর এক এক জনের জীবন-কাল ধরা হয়। বংশলতায় যে সকল বংশধর-গণের নাম দেখিতে পাই, গড়ে তাঁহাদিগের প্রত্যেকের জীবন-কাল পঁচিশ বৎসর করিয়া নির্দ্দেশ করিলে, রাজচক্রবর্ত্তী মনুকে সে দিনের মানুষ বলিয়া ঘোষণা করিতে আপত্তি করা যায় না। কিন্তু উক্ত গণনা-পদ্ধতি কতদূর যুক্তিযুক্ত, তাহা কি বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য নহে ? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দুই কারণে গণনায় অনৈক্য ঘটিতেছে। প্রথম কারণ,—প্রচলিত-বংশলতায় সকল বংশধরের নাম স্থান পায় নাই। বংশের মধ্যে যাঁহারা আপনাদের যশঃ-জ্যোতিতে দিক আলোকিত করিয়াছিলেন, পুরাণাদির দৃষ্টি তাঁহাদেরই প্রতি প্রধাবিত হইয়াছিল। যাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, যাঁহাদের দ্বারা সমাজের ও সংসারের প্রভূত হিতসাধন হইত, শাস্ত্র তাঁহাদেরই আদর্শ চরিত্র কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা সাধারণ মনুষ্যের মধ্যে পরিগণিত থাকিতেন, বংশের তাদৃশ জনের পরিচয়-প্রকাশ শাস্ত্রকারগণ আবশ্যক বোধ করেন নাই। চরিত্র-কথা যখন মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল, আদর্শ-চরিত্র যখন শ্রুতি-স্মৃতির অন্তর্ভুক্ত ছিল, তখন বংশের প্রখ্যাত ব্যক্তিগণের নামই স্মৃতি-

পটে উদ্ভাসিত থাকিত। যাঁহারা অল্প-প্রতিষ্ঠাপন্ন, তাঁহাদের নাম স্বতঃই বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া যায়। রঘুবংশে শ্রীরামচন্দ্রের নাম, চন্দ্রবংশে রাম, কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির প্রভৃতির নাম যাদৃশ প্রসিদ্ধিসম্পন্ন, অন্যান্য বংশধরগণের নাম তাদৃশ প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন নহে। সে সকল নাম এখনও যাহা স্মরণে আসে, কালবশে তাহাও বিলুপ্ত হইবে বলিয়া মনে করা যায়। দ্বিতীয় কারণ,—আয়ুঃ-পরিমাণ-নির্দ্ধারণে ভ্রম-প্রমাদ। শাস্ত্রে লিখিত আছে, কেহ সহস্র বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন, কেহ তাহারও অধিক কাল জীবিত ছিলেন। শাস্ত্রে লিখিত আছে,—সত্যযুগে মানুষের পরমায়ু একরূপ, ত্রেতায় অন্যরূপ, দ্বাপর ও কলিতে আবার আর এক রূপ। কিন্তু আয়ুঃ-গণনার বর্ত্তমান পদ্ধতিতে সে শাস্ত্রবাক্য অনুসরণ করা হয় না। মানুষ এক শত বর্ষের অধিক কাল বাঁচিতে পারে, এখনকার দিনে এ কথা কেহ কল্পনায়ও ধারণা করিতে পারেন না। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ সুদীর্ঘ পরমায়ুর কথা শুনিলে উপহাস করেন। কিন্তু একটু নিগূঢ় অনুসন্ধান করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? পাশ্চাত্য-দেশেরই দুই একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। ইংলণ্ডের অধিপতি দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্ব-কালে হেনরি জেঙ্কিন্স নামক এক ব্যক্তির বয়ঃক্রম ১৬৯ বৎসর হইয়াছিল। অষ্টম হেনরির রাজত্ব-কালে একাদশ বর্ষ বয়সে ফ্লোডন-রণক্ষেত্রে জেঙ্কিন্স ইংলণ্ডের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। ইংলণ্ডের সিংহাসনে পর্য্যায়ক্রমে সাত জন নৃপতিকে এবং ক্রমওয়েলকে সে রাজত্ব করিতে দেখিয়াছিল। প্রথম চার্লসের রাজত্ব-কালে টমাস পার নামক এইরূপ আর একজন দীর্ঘজীবী ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এ ব্যক্তি ১৫২ বর্ষ ৯ মাস জীবিত ছিল, এবং ১২০ বৎসর বয়সের সময় এক বিধবাকে বিবাহ করিয়াছিল। শ্রপ্সায়ারে তাহার জন্ম হয়। শেষ বয়সে লণ্ডনে আসিয়া বাস করায়, নানারূপ অত্যাচারে, তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। পূর্ব্ববৎ নিয়মে দেহ রক্ষা করিয়া আসিলে, এ ব্যক্তি আরও কিছুদিন বাঁচিতে পারিত,—চিকিৎসকগণ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের শাস্ত্র-কথিত পরমায়ু সম্বন্ধে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের ধর্ম্ম-গ্রন্থে, বাইবেলে, মহাপুরুষগণের পরমায়ু-সম্বন্ধে কি উক্তি দেখিতে পাই? আদম ৯৩০ বৎসরের অধিক কাল জীবিত ছিলেন। লুক প্রভৃতি ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকগণের কেহ ৯০০ বৎসর, কেহ ৭০০ বৎসর, কেহ ৬০০ বৎসর জীবিত ছিলেন। বাইবেলের এবম্বিধ উক্তিতে যাঁহারা আস্থাস্থাপন করেন, শাস্ত্রোক্ত বাক্যে আয়ুঃ-পরিচয়ে কেন তাঁহারা অবিশ্বাসী, বুঝিতে পারি না। আমরা বহু প্রমাণ পাইয়াছি, যোগবলে মানুষ দীর্ঘজীবী হয়। দুই একজন যোগিপুরুষের অনুসন্ধান পাইয়া জানা গিয়াছে, তাঁহারা বহু শত বর্ষ জীবিত ছিলেন। যাহা হউক, আয়ুঃ-পরিমাণ নির্দ্ধারণ-সম্বন্ধে ভ্রান্ত-মতের অনুসরণ করায় কাল-পরিমাণ-নির্দ্ধারণে যে দ্বিতীয় অন্তরায় ঘটিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। ফলতঃ, বংশলতার পর্য্যায়-ভঙ্গ ঘটিয়াছে এবং আয়ুঃকাল-নির্দ্ধারণে ভ্রান্তি ঘটিতেছে। এই দুই কারণেই আমরা মনু হইতে আরম্ভ করিয়া বংশলতার অনুসরণে পরবর্ত্তিকালের ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলন করিতে সমর্থ হইতেছি না। দূর অতীতের ইতিহাস আলোচনা করিতে হইলে, এরূপ পর্য্যায়-ভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী। পর্য্যায়-ভঙ্গ হউক, কিন্তু

যাঁহাদের স্মৃতি চিরসমুজ্জ্বল, কুজ্ঝটিকার আবরণে তাঁহাদিগকে কখনই আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না। ভারতের ইতিহাসের সূচনায় তাঁহাদের প্রসঙ্গ যদি উত্থাপিত না হয়, তাহা হইলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সুতরাং 'পৃথিবীর ইতিহাসে' যথাসম্ভব সংক্ষেপে সেই রাজচক্রবর্ত্তিগণের দুই চারিজনের পরিচয় প্রদান করিতে প্রয়াস পাইয়াছি এবং বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গেও তৎসম্বন্ধে দুই চারি কথা আলোচনার চেষ্টা পাইতেছি।

বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতিতম চতুর্যুগের প্রথম নৃপতির পরিচয় পাই—তিনি রাজচক্রবর্ত্তী মনু। তিনি মহর্ষি, রাজর্ষি, রাজচক্রবর্ত্তী—সর্ব্ব-বিশেষণে বিশেষিত। যুগ-প্রবর্ত্তনার সময়ে তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। মানবীয় বর্ষের ৩৮ লক্ষ ৯৩ হাজার ১৪ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার রাজত্বকাল সপ্রমাণ হয়। মনুজগণের আদি-পুরুষ বলিয়া, তিনি মনু নামে প্রখ্যাত। এক হিসাবে মনু তাঁহার উপাধি। প্রতি চতুর্যুগের প্রারম্ভে তাঁহার অভ্যুদয়। অথবা, প্রতি চতুর্যুগের প্রারম্ভে যিনি এই ভারতের,—কেবল ভারতেরই বা বলি কেন, সসাগরা ধরিত্রীর,—আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, তিনিই মনু নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ইন্দ্র, উপেন্দ্র, দেবেন্দ্র প্রভৃতি যেমন উপাধি, যুগে যুগে কর্ম্মবশে জীব যেমন ইন্দ্রত্বের অধিকারী হইতে পারে, কর্ম্মফল-প্রভাবে জন্মান্তরে মানুষ তেমনি মনুর আসনে সমাসীন হয় ও মনু উপাধি লাভ করে। সে হিসাবে গণনা করিতে গেলে, মনুর রাজত্ব-কাল সুদূর অতীতের কত দূরে পিছাইয়া পড়ে, নির্ণয় করা যায় না। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যে মনু রাজত্ব করিয়াছিলেন, গণনা করিতে গেলে বলিতে হয়—সে প্রায় ১৯৬ কোটী ৮ লক্ষ ৫৬ হাজার বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। ধারণায় ধরিতে পারা যায় না;—কল্পনায় কুলান হয় না;—ভারতের সে প্রত্নতত্ত্ব কে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে! বর্ত্তমান মন্বন্তরের অষ্টা-বিংশতিতম চতুর্যুগের আবির্ভূত মনুর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেই কল্পনা হারি মানিয়া যায়; তৎপূর্ব্বের তত্ত্ব কি আর অনুসন্ধান করিব? যাহা হউক, এই মনুর—বৈবস্বত মনুর—রাজত্ব কালের বিষয় আলোচনা করিলে আমরা তাঁহার কি প্রভাবের—কি গৌরবের পরিচয় পাই? প্রথম দেখি,—পৃথিবীব্যাপী জলপ্লাবন। দিকে দিকে হাহাকার উঠিয়াছে। কে কাহাকে রক্ষা করে—কে কাহার দিকে চাহিয়া দেখে? ধরণী পাপভারে ভারাক্রান্ত হইয়াছিলেন। আর সে ভার সহ্য করিতে পারিলেন না। ভারাক্রান্ত হইয়া, তিনি জলমগ্ন হইলেন। বৈষম্যের অতি-বৃদ্ধিতে সৃষ্টি-নাশের আশঙ্কা হইল। শ্রীভগবান তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বৈষম্যে সাম্য-রক্ষার জন্য আবার তাঁহাকে ভূতলে আবির্ভূত হইতে হইল। মীন-রূপেই বলুন, আর মনু-রূপেই বলুন,—প্রকৃতিপুঞ্জকে তিনি রক্ষা করিলেন। পাপের উচ্ছেদ-সাধন হইল। পুণ্যের বিজয়-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। বিচিত্র বহিত্রের সাহায্যে রাজর্ষি মনু প্রকৃতিপুঞ্জের জীবন-রক্ষা করিলেন। কেবল মনুষ্যের প্রতি নহে; পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সর্ব্বজীবের প্রতি তাঁহার করুণার ধারা বর্ষিত হইল। রাজার কর্ত্তব্য—বিপন্ন প্রজাকে আশ্রয়দান। যাহারা পাপের গুরুভারে ভারাক্রান্ত হইয়াছিল; তাহারা ভগবানের নিকট দণ্ড পাইল। যাহারা নিষ্পাপ ছিল,

রাজচক্রবর্ত্তী মনু।

রাজর্ষি মনু তাহাদিগকে আশ্রয়-স্থান করিলেন। * শ্রেষ্ঠ-ভূপতির শ্রেষ্ঠ-আদর্শ—মনুর চরিত্রে এই প্রথম পরিস্ফুট দেখিলাম। তার পর রাজ্য-প্রতিষ্ঠা করিয়া, তিনি কি প্রণালীতে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন, কি প্রণালীতে রাজবিধির প্রবর্ত্তনা করিলেন, মনু-স্মৃতির দিব্য-আলোকে তাহা প্রত্যক্ষীভূত হইল। মনু কি আদর্শ-বিধি-বিধানেরই প্রবর্ত্তনা করিয়া গিয়াছেন! দাম্ভিক অহংজ্ঞানপূর্ণ সংসার আজিও অবনত মস্তকে সে স্মৃতি মান্য করিয়া চলিয়াছে। মনুর রাজত্ব-কালে কেমন সুশৃঙ্খলায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত, প্রকৃতি-পুঞ্জ কেমন সুখ-স্বচ্ছন্দে দিনযাপন করিত, সাধু-সজ্জন স্বধর্ম্মাচরণে কেমন ধীরে ধীরে মোক্ষের পথে অগ্রসর হইতেন! আবার অন্য পক্ষে, পাপীর দণ্ডবিধানে, উচ্ছৃঙ্খলের উচ্ছৃঙ্খলা-দমনে, দস্যু-তস্করের উপদ্রব নিবারণে, সংসারে কেমন শান্তি-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল,—মনু-স্মৃতির পত্রে পত্রে তাহা প্রত্যক্ষ করুন। শ্রেষ্ঠ সমাজ, শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, শ্রেষ্ঠ রীতিনীতি, শ্রেষ্ঠ আচার-ব্যবহার—মনুর রাজত্ব তাহার আদর্শ। ভবিষ্য-বংশধরগণ কি নিয়মে রাজকার্য্য পরিচালনা করিলে সেই শ্রেষ্ঠত্ব-লাভের অধিকারী হইবেন, মনু-স্মৃতি সে আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া গেলেন।

---

*মনু ও জলপ্লাবন সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে. (পৃথিবীর ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৭শ পৃষ্ঠা এবং তৃতীয় খণ্ড, ১২৫ম পৃষ্ঠা—১৩৬ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশেই এ বিষয়ে মতান্তর দেখিতে পাই। দাক্ষিণাত্যে দ্রাবিড়-দেশের প্রত্নতত্ত্ববিদগণ পশ্চিম-ঘাট পর্ব্বতমালার মালয়-গিরিশৃঙ্গে মনুর নৌকা নিবদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া ঘোষণা করেন। সে মতে (ভূতত্ত্ববিদগণও এ মতের পরিপোষক) দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণে ভারত-মহাসাগরের বহুদূর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ বিস্তৃত ছিল; জলপ্লাবনে বা প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে সে সকল জনপদ বিধ্বস্ত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; ভারত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, এমন কি—অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি সেই বিচ্ছেদ-সমুদ্ভূত বলিয়া প্রতীত হয়। জলপ্লাবনে ভারতের ঐ অংশ একেবারে বিধ্বস্ত হইয়াছিল। তামিল ভাষার প্রাচীনতম গ্রন্থসমূহের বর্ণনার সহিত ভূতত্ত্ববিদগণের গবেষণার এবং শতপথ-ব্রাহ্মণের, মৎস্যপুরাণের, অগ্নিপুরাণের, মহাভারতের ও ভাগবতের বর্ণনার সামঞ্জস্য সাধন করিয়া, তামিল পণ্ডিতগণ অধুনা বক্ষ্যমাণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছেন। শতপথ-ব্রাহ্মণে উত্তরস্থিত পর্ব্বতে মনুর বহিত্র রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু তামিল পণ্ডিত-গণ বলিতেছেন,—'সেই উত্তরস্থিত পর্ব্বত পশ্চিমঘাট গিরিশ্রেণী। পশ্চিম-ঘাট পর্ব্বতমালার দক্ষিণাংশে সুদূর বিস্তৃত ভূখণ্ড ছিল; সুতরাং তৎকালে পশ্চিমঘাট গিরিশ্রেণী উত্তরঘাট পর্ব্বত বলিয়া অভিহিত হইত। মনুকে দ্রাবিড়ের অধিপতি বলিয়া ভাগবতপুরাণ উল্লেখ করিয়াছেন। এতদুক্তিতেও দ্রাবিড়-দেশের অন্তর্গত বা নিকট-স্থিত পর্ব্বতেই তাঁহার নৌকা রক্ষিত হইয়াছিল, বুঝিতে পারা যায়। মনুর ন্যায় আরও আটজন ঋষি বা প্রজাপতি লোকরক্ষার জন্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে পুলস্ত্য ঋষি দাক্ষিণাত্যে প্রতিষ্ঠান্বিত হন। পুলস্ত্য হইতে অগস্ত্য এবং রাবণ উৎপন্ন হন। মহর্ষি অগস্ত্য দ্রাবিড়-দেশে 'তামিল মুনি' নামে প্রসিদ্ধ। তিনি তামিল-রাজ্যের আদিভূত। রাবণ দক্ষিণদেশের আধিপত্য লাভ করেন। সে দক্ষিণদেশের অস্তিত্ব এখন লোপ-প্রাপ্ত, ভারতের সে দক্ষিণাংশ এখন সমুদ্রগর্ভে। বর্ত্তমান সিংহল বা লঙ্কা দ্বীপ তাহার অংশ হইতে পারে; কিন্তু সে বিস্তৃত জনপদ এখন আর নাই। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে,—কৃতমালা নদীর তীরে মনুর নিকট মৎস্য আসিয়া জলপ্লাবনের বিষয় বলিয়াছিল। কৃতমালার অপর নাম—'বৈগাই'। ঐ নদী 'ভেরিয়াড়ভার' নামেও প্রসিদ্ধ। ঐ নদীর তীরে মাদুরা সহর অবস্থিত। এই সকল তত্ত্ব আলোচনা করিলে দ্রাবিড়-রাজ্যেই মনুর বহিত্ররক্ষার বিষয় প্রতিপন্ন হয়।' পৃথিবীর প্রাচীন জনপদ-সমূহের পুরাতত্ত্ব আলোচনায় সর্ব্বত্রই মনুর প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। সকল প্রাচীন জাতিই প্রকারান্তরে মনুকেই আপনাদের আদিভূত বলিয়া স্বীকার করেন।

বৈবস্বত মনুর দশ পুত্র ও এক কন্যা। পুত্রগণের মধ্যে ইক্ষাকু ভারত-সাম্রাজ্যের সিংহাসন লাভ করেন। অন্যান্য পুত্রগণ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ প্রাপ্ত হন। বৈবস্বত মনুর কন্যার—নাম ইলা। চন্দ্রপুত্র বুধের সহিত তাঁহার পরিণয় হয়। ইলা হইতেই চন্দ্রবংশের প্রতিষ্ঠা। একদিকে পুত্রের বংশ সূর্য্যবংশ নামে এবং অন্যদিকে কন্যার বংশ চন্দ্রবংশ নামে অভিহিত হইয়া,রাজচক্রবর্ত্তী মনুর শাসনাধীন প্রদেশ-সমূহে আপন আপন আধিপত্য বিস্তার করেন। তখন ভারত-সাম্রাজ্যের সীমানা দূর-দূরান্তে বিস্তৃত ছিল। এখন যে নামে যে জনপদ অভিহিত হয়, তখন সে জনপদ সে নামে অভিহিত ছিল না। সুতরাং সূর্য্যবংশীয় ও চন্দ্রবংশীয় ভিন্ন ভিন্ন নৃপতিগণের কোন্ নৃপতি কোন্ সময়ে কোন্ প্রদেশ আপনার করায়ত্ত রাখিয়াছিলেন, তাহা এখন নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে বুঝিতে পারা যায়, কোনও সময়ে সূর্য্যবংশ এবং কোনও সময়ে চন্দ্রবংশ একছত্র প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এক বংশ একছত্র প্রভাব বিস্তার করিলে, অপর বংশ তাহার করদ-মিত্র রাজ্য মধ্যে পরিগণিত হইত। চন্দ্রবংশের এবং সূর্য্যবংশের শাখা-প্রশাখা পৃথিবীর নানা স্থানে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়া বিভিন্ন নামে পরিচিত হইয়াছিল। বৈবস্বত মনুর বংশধর (ইক্ষাকুব সমপর্য্যায়ভুক্ত) নরিষ্যন্ত (নরিষ্যন্) হইতে শকগণের উৎপত্তি হয়। এই শকবংশ ভারতের বহির্দ্দেশে বসবাস করিয়া পরিশেষে ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। শক, যবন, কম্বোজ, করুষ, পহ্নব (পহ্লব), খশ, পারদ প্রভৃতির উৎপত্তি-তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলেই বা কি প্রতিপন্ন হয়? এই ভারতবর্ষ হইতেই তাঁহারা অন্য দেশে গমন করিয়া প্রতিষ্ঠান্বিত হন এবং পরিশেষে বলদৃপ্ত হইয়া ভারতের প্রতি লোলুপ-দৃষ্টি সঞ্চার করেন। চন্দ্রবংশীয় নৃপতি যযাতিব পুত্র পুরু সর্ব্বপৃথ্বীপতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অপরাপর পুত্রগণ কেহ দক্ষিণ দিকে, কেহ পশ্চিম দিকে, কেহ পূর্ব্বদিকে, কেহ উত্তর দিকে প্রেরিত হন। ফলতঃ, পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদে পুরাকালে যাঁহারা যখন রাজত্ব করিয়াছেন, তাঁহারা ভারতেরই আদি-আধিবাসী ছিলেন। হয় চন্দ্রবংশ হইতে,—না হয় সূর্য্যবংশ হইতে, তাঁহারা উদ্ভূত হইয়াছিলেন। বাহ্লীক দেশের আধুনিক নাম—বাল্খ (Balkh)। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন,—উহাই সভ্যতার আদিক্ষেত্র,—উহাই আর্য্যগণের আদি-নিবাস-স্থান। কিন্তু বাহ্লীকের প্রতিষ্ঠা কত দিনের? চন্দ্রবংশে দুইজন বাহ্লীকের পরিচয় পাই। একজন জন্মেজয়ের পুত্র এবং অন্যজন প্রতীপের পুত্র বলিয়া পরিচিত। তাঁহাদের নামানুসারে বাহ্লীক-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সুতরাং যে বাহ্লীক-প্রদেশকে মানবের আদি-জন্মভূমি বলিয়া অধুনা নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে, সে বাহ্লীক-রাজ্য ভারতবর্ষেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তুলনায় সে দিনের একজন ভারতীয় নৃপতির নামানুসারে তাহার নামকরণ হইয়াছিল। হইতে পারে, বাহ্লীক কর্ত্তৃক বাহ্লীক রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর তথা হইতে ইউরোপে বা পাশ্চাত্য দেশে সভ্যতা-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষই যে সে সভ্যতার মূলীভূত, অনুসন্ধানে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। এইরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে দেখিতে পাই,—সকল প্রাচীন জনপদেরই প্রতিষ্ঠাব মূলে ভারতের প্রভাব অব্যাহত রহিয়াছে। এখন

মনুবংশীয় নৃপতিগণ।

অনেকে গ্রীকগণকে 'যবন' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। কিন্তু যবনগণের উৎপত্তির বিষয় আলোচনা করিলে, তাঁহারা যে এই ভারতবর্ষ হইতে তথায় গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়া প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। আমরা সূর্য্যবংশের এবং চন্দ্রবংশের প্রধান প্রধান নৃপতিগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় যথাস্থানে প্রদান করিয়াছি। তাহাতেই তাহা বিবৃত হইয়াছে। সে সকলের পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র। তবে কোন্ বংশের কোন্ নৃপতি কোন্ সময়ে ভারতবর্ষে তথা পৃথিবীতে একছত্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, ভারতের ইতিহাস সঙ্কলন করিতে হইলে, তাহার একটু আভাস প্রদান করা বোধ হয় আবশ্যক। কিন্তু সেই একছত্র-প্রভাবের বিষয় অনুধাবন করিবার কি পরিচয়-চিহ্ন শাস্ত্র-মধ্যে নিহিত আছে? অশ্বমেধ-রাজসূয় প্রভৃতি যজ্ঞ ভারতীয় নৃপতির একছত্র-প্রভাবের পরিচয় খ্যাপন করে। সূর্য্যবংশে দেখিতে পাই,—পৃথু, মান্ধাতা, সগর, দীলিপ, রঘু, দশরথ, শ্রীরামচন্দ্র, অম্বরীষ, নহুষ প্রভৃতি নৃপতিগণ অশ্বমেধ বা রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দিকে দিকে আপনাদের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। পৃথু পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করেন। তাঁহার নামানুসারে পৃথিবী নামের উৎপত্তি। পৃথু শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। শাস্ত্রে আছে,—তিনি গোরূপা পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ,—তিনি পৃথিবীর সকল দেশের সকল নৃপতিকে করদ নৃপতি মধ্যে গণ্য করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে কর-গ্রহণে সমর্থ হইয়াছিলেন। মান্ধাতা দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া বহু দেশ জয় করেন। সসাগরা পৃথিবী জয় করিয়া, তিনি অমরাবতীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেখানে দেবগণের চক্রান্তে লবণ শূলে আহত হইয়া মান্ধাতা প্রাণত্যাগ করেন। সগর, দীলিপ, রঘু, শ্রীরামচন্দ্র—ইঁহারা প্রত্যেকেই অশেষ প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন। রামায়ণে এবং প্রত্যেক পুরাণে ইঁহাদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। রামায়ণ-প্রসঙ্গে এতদ্বিষয় যথাসম্ভব বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি।* যেমন সূর্য্যবংশে তেমনি চন্দ্রবংশে, এক এক সময়ে এক এক জন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহারাও এক এক জন দিক্পাল-রূপে দিকে দিকে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। যযাতি, পুরু, কুরু, ভরত, যদু, যুধিষ্ঠির প্রভৃতির প্রভাব শাস্ত্র শতমুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই ভারতবর্ষ নামের প্রবর্ত্তনা—রাজ-চক্রবর্ত্তী ভরত হইতে। যুধিষ্ঠিরাদির প্রতাপের বিষয় কাহারও অবিদিত নাই। আমরা সে বিষয় মহাভারত প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি।* চন্দ্রবংশের অন্তর্গত যদুবংশেই কৃষ্ণ-বলরাম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শাস্ত্র-গ্রন্থ আলোচনা করিলে যদিও প্রতিপন্ন হয়,—চন্দ্রবংশ ও সূর্য্যবংশ দুই বংশেরই অভ্যুদয় ভারতে সমসময়ে সংঘটিত হইয়াছিল; কিন্তু সূর্য্যবংশ অর্থাৎ মনুর পুত্রগণের বংশই প্রথমে সার্ব্বভৌম সম্রাট্-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তির সময়ে চন্দ্রবংশের কোনও নৃপতি ভারতে একছত্র প্রভাব-বিস্তারে কচিৎ সমর্থ হইয়াছিলেন। ত্রেতায় সূর্য্যবংশেরই একছত্র প্রভাব ছিল। দ্বাপরের শেষভাগে চন্দ্রবংশীয়দিগের প্রতিষ্ঠার দিন উপস্থিত হয়। কলির প্রারম্ভ পর্য্যন্ত চন্দ্রবংশের শাখা-প্রশাখাই ভারতে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

* পৃথিবীর ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ঊনবিংশ ও বিংশ পরিচ্ছেদদ্বয়ে রামায়ণ ও মহাভারত প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

এইরূপে দেখা যায়, বৈবস্বত মন্বন্তরে সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর এই তিন যুগে—প্রায় ৩৮ লক্ষ ৮৮ হাজার বৎসর—ভারতে সূর্য্যবংশীয় ও চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণের প্রভাব অব্যাহত ছিল।

বৈবস্বত মনুর আবির্ভাব হইতে কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের পরবর্ত্তী কিছুকাল পর্য্যন্ত যে সকল প্রধান প্রধান নৃপতি যে কাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে একছত্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, এবং যে কাল মধ্যে যে যে অবতার অবতীর্ণ হইয়া ধরার ভার লাঘব করিয়াছিলেন, শাস্ত্রগ্রন্থে তাহার ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ আছে। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের প্রসঙ্গে সংক্ষেপে তাহা উল্লেখ করিতেছি। শাস্ত্রমতে মানবীয় বর্ষের প্রায় ৩৮ লক্ষ ৮৮ হাজার বৎসর পূর্ব্বে বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষীয় অক্ষয় তৃতীয়া দিবসে রবিবারে বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরের সত্যযুগ আরম্ভ। এই সত্যযুগের পরিমাণ—১৭ লক্ষ ২৮ হাজার বৎসর। এই যুগের অবতার-চতুষ্টয়—মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ। যে সকল নৃপতি এই সত্যযুগে পৃথিবীতে একছত্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রধান প্রধান কয়েক জনের নাম—বৈবস্বত মনু, ইক্ষাকু, বলি, পৃথু, মান্ধাতা, পুরুরবা, ধুন্ধুমার, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন। এই সকল নৃপতির নাম-দৃষ্টে বুঝিতে পারা যায়, বৈবস্বত মন্বন্তরের সত্য-যুগে সাধারণতঃ সূর্য্য-বংশীয়গণ এবং কখনও কখনও চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণ ভারতে একাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। শাস্ত্র-মতে, এই সত্যযুগে মনুষ্য লক্ষ বর্ষ পর্য্যন্ত পরমায়ু লাভ করিতে পারিতেন; মানবদেহের উচ্চতা-পরিমাণ—বিংশতি হস্ত; তখন মৃত্যু মানুষের ইচ্ছাধীন ছিল। সত্যযুগ অন্তে ত্রেতাযুগের আরম্ভ। কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে সোমবারে ত্রেতাযুগের উৎপত্তি। ত্রেতাযুগের পরিমাণ—১২ লক্ষ ৯৬ হাজার বৎসর। এই যুগের অবতারত্রয়ের নাম—বামন, পরশুরাম, শ্রীরামচন্দ্র। এই যুগের ১২ লক্ষ ৯৬ হাজার বর্ষ কাল সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণ পৃথিবীতে একছত্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। সেই সূর্য্য-বংশীয় নৃপতিগণের মধ্যে কুকুৎস্থ, ত্রিশঙ্কু, শতজিৎ, হরিশ্চন্দ্র, রোহিতাস্য, মৃত্যুঞ্জয়, উচ্চাজদ, মরুত্ত, অনরণ্য, সগর, অংশুমান, দীলিপ, ভগীরথ, অশ্বঞ্জয়, খট্টাঙ্গ, দীর্ঘবাহু, রঘু, অজ, দশরথ, শ্রীরাম, লব, কুশ প্রভৃতি বিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন। ত্রেতাযুগে মনুষ্য দশ সহস্র বর্ষ পরিমিত পরমায়ুর অধিকারী ছিলেন। মানবদেহের উচ্চতার পরিমাণ—চতুর্দ্দশ হস্ত। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় ত্রয়োদশী তিথিতে গুরুবারে দ্বাপর যুগের প্রবর্ত্তনা। উহার পরিমাণ ৮ লক্ষ ৬৪ হাজার বৎসর। এই যুগের অবতার—কৃষ্ণ-বলরাম। এই দ্বাপর যুগে যে সকল নৃপতি প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম—শাল্ব, বিরাট, হংসধ্বজ, কুশধ্বজ, ময়ূরধ্বজ, রুক্মাঙ্গদ, শান্তনু, দুর্য্যোধন, যুধিষ্ঠির, বিশ্বকৃসেন, শিশুপাল, জরাসন্ধ, উগ্রসেন, কংস। এই যুগে মানবদেহের উচ্চতা—সপ্তহস্তপরিমিত; মনুষ্যের পরমায়ুর পরিমাণ—সহস্র বর্ষ। মাঘী পূর্ণিমায় শুক্রবারে কলিযুগের উৎপত্তি। কলিযুগের পরিমাণ—৪ লক্ষ ৩২ হাজার বর্ষ। এই যুগে মনুষ্যের পরমায়ু-পরিমাণ ১২০ বর্ষ। মানবদেহ—সার্দ্ধ-ত্রিহস্ত। কলিযুগের প্রথমাংশে যুধিষ্ঠির, পরীক্ষিৎ, জন্মেজয়, শতানিক, বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি বিংশত্যধিক শতসংখ্যক চন্দ্র-বংশোদ্ভব রাজার রাজত্বকাল ছিল। এই নৃপতিগণ ৩ হাজার ৬ শত ৯৫ বৎসর ৩ মাস ১৮ দিন রাজত্ব করেন। তাহার পর ভারতে বৈদেশিকগণের আধিপত্যের সূত্রপাত হয়।

বিভিন্ন যুগের রাজন্যবর্গ।

কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে ভারতের ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের বিষবীজ প্রোথিত হয়। সূর্য্যবংশের প্রভাব তাহার পূর্ব্বেই বিলুপ্ত হইয়াছিল। তখন চন্দ্রবংশেরই শাখা-প্রশাখা পরস্পর পরস্পরের প্রতি দ্বেষান্বিত হইয়া মহাসমরে প্রবৃত্ত হন। সেই সময়ে—কুরুক্ষেত্রের কাল সময়ে—ভারতবর্ষ বীরহীন হইয়া পড়ে। ভারত-জননী আপন বীর সন্তান-দিগকে একে একে কালকবলে সমর্পণ করেন। ভারতের যে প্রদেশে যেখানে যে বীরপুরুষ ছিলেন, সকলেই সেই যুদ্ধে কোন-না-কোনও পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণ কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে জয়লাভ করিলেন বটে; কিন্তু সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, সে জয়ও পরাজয়-বিশেষ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে তাঁহারা নিশ্চয়ই হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তবে পাণ্ডবগণ যত দিন জীবিত ছিলেন, আপনাদের অদ্বিতীয় বাহুবলে আপনাদিগের প্রভাব-প্রতিপত্তি অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের তিরোধানের অল্পদিন পরেই কেন্দ্রীভূত রাজশক্তি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। তখন ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন নৃপতিগণের অভ্যুদয় হয়। তখন কেহই আর সমগ্র ভারত-সাম্রাজ্যে একছত্র প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হন না। পরন্তু যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজশক্তির অভ্যুদয় হয়, তাঁহারাও পরস্পর ঈর্ষাদ্বেষে বিবাদ-বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হন। যাদবগণ দ্বারকা-প্রদেশে এবং জরাসন্ধের পুত্রগণ মগধ-দেশে, পরীক্ষিতের বংশধরগণ হস্তিনায়,—এইরূপ নানা বংশের ধুরন্ধরগণ নানা দেশে স্বস্বপ্রধান হইয়া উঠেন। তখন দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন জনপদে বিভিন্ন রাজ-শক্তির অভ্যুদয় হয়; আর্য্যাবর্ত্তের বিভিন্ন জনপদে বিভিন্ন রাজশক্তি মস্তক উত্তোলন করেন। কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের পর কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে ভারতবর্ষ বিভক্ত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা হয় না। রাজপুতানার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, তাহার পরিচয়-চিহ্ন আজিও কিছু কিছু প্রত্যক্ষীভূত হইবে। রাজপুতানার স্বাধীন নৃপতিগণ কেহ আপনাদিগকে চন্দ্রবংশীয়, কেহ আপনাদিগকে সূর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাহাতে সেই বিচ্ছিন্নতার স্মৃতিই জাগরুক হয় না কি? মৌর্য্যবংশ, সুঙ্গবংশ, কণ্বংশ, অন্ধ্রবংশ প্রভৃতির অভ্যুদয় কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধেরই অবশ্যম্ভাবী ফল ভিন্ন অন্য আর কি নির্দ্দেশ করিতে পারি? ফলতঃ, কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের পর, অনেক দিন পর্য্যন্ত, ভারতের রাজ-শক্তি বিচ্ছিন্ন-ভাবে অবস্থিত ছিল। পরিশেষে বৌদ্ধ-নৃপতিগণের অভ্যুদয়ে আর একবার ভারত-গগন ভারতীয় নৃপতিগণের গৌরব-প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রাচীন-ভারতের গৌরব-সম্ভ্রমের তুলনায় সে যেন মেঘাচ্ছন্ন আকাশে ক্ষীণ বিদ্যুদ্বিভা-বিকাশ মাত্র। কুরুক্ষেত্র মহাসমরের পর, বিচ্ছিন্ন রাজ-শক্তির পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদের অবসর পাইয়া, বৈদেশিকগণ ভারতাভিমুখে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করেন। কিন্তু বৈদেশিকগণের ভারতাগমনের যে কোনও পরিচয়-চিহ্ন দেখিতে পাই, তাহা কুরুক্ষেত্র-মহাসমরের বহু পরবর্ত্তি-কালের ঘটনা বলিয়া বুঝিতে পারি। কুরুক্ষেত্র-মহাসমরের পর দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে সে পরিচয় কিছুই পাওয়া যায় না। এমন কি, কোনও দেশের উপকথার মধ্যেও তেমন কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় নাই।

ভারতের ভাগ্য-বিপর্য্যয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভারতে বৈদেশিক আক্রমণ।

[পাশ্চাত্যে ভারত-প্রসঙ্গ,—হেরোডোটাস, টেসিয়াস, ডায়ডোরাস প্রভৃতির উক্তিতে ভারতের কথা;—মিশরের ভারত অভিযান,—সেসোষ্ট্রিস বা সিসোষ্ট্রিস কর্তৃক ভারত-আক্রমণ-কাহিনী,—তৎকর্তৃক মিশরে প্রথম নৌবাহিনী সৃষ্টির প্রসঙ্গ,—সিসোষ্ট্রিসের ভারত-আক্রমণ বিষয়ে বাদানুবাদ;—আসিরীয়ার ভারত-আক্রমণ,—রাণী সেমিরামিস কর্তৃক ভারত-আক্রমণের চেষ্টা,—তদ্বিষয়ে বাদানুবাদ;—দারায়ুসের ভারত-আক্রমণ;—আলেকজাণ্ডারের অভিযান,—ফিনিসীয় বণিকগণ কর্তৃক ভারতে বাণিজ্য,—টায়ার রাজধানী,—আলেকজাণ্ডার কর্তৃক পারস্য-বিজয় ও ফিনিসীয়া-আক্রমণ,—ভারতবর্ষের সহিত আলেকজাণ্ডারের সম্বন্ধের সূত্রপাত।]

বৈদেশিক-গণের সহিত ভারতের সংশ্রবের বিষয় হিসাব করিয়া, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ ভারতের ইতিহাসের ভিত্তিভূমি গঠন করেন। সে পক্ষে প্রধানতঃ আলেকজাণ্ডারের ভারত-আগমনের প্রসঙ্গকেই মেরুদণ্ডরূপে গ্রহণ করা হয়। অধুনা ইউরোপীয়গণ পৃথিবীতে সমধিক প্রতিষ্ঠাপন্ন। সুতরাং ভারতের সহিত ইউরোপের সংশ্রব হইতেই ভারতের ইতিহাসের অস্তিত্ব সূচিত হইয়া থাকে। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে ইউরোপবাসীর—গ্রীকগণের—ভারতে আগমনের পূর্ব্বে অন্যান্য দেশবাসীরাও, ভারতের ঐশ্বর্য্য-গৌরবে প্রলুব্ধ হইয়া, ভারতের দিকে যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তদ্বিবরণের অসদ্ভাব নাই। গ্রীসদেশীয় ঐতিহাসিকগণের মধ্যে হেরোডোটাস প্রথমে ভারতবর্ষের উল্লেখ করেন। তিনি পাশ্চাত্যদেশের ইতিহাস-লেখকগণের আদিভূত বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার অক্ষয়-কীর্ত্তি গ্রন্থরত্ন খৃষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত হয়। ইউরোপীয়গণের গ্রন্থে ভারতের অস্তিত্ব-বিষয়ে ইহাই প্রথম উল্লেখ। হেরোডোটাসের পর 'টেসিয়াস' ভারতের বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি যদিও হেরোডোটাসের সমসাময়িক বলিয়া পরিচিত; কিন্তু পরবর্ত্তী শতাব্দীতে, খৃষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে, তাঁহার বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন হয়। তিনি ভারতবর্ষের সম্বন্ধেই একখানি গ্রন্থ লিখিয়া যান। ভারতবর্ষের বিষয় অবগত হইবার তাঁহার একটু অবসরও উপস্থিত হইয়াছিল। বন্দিভাবেই হউক আর অন্য কোনরূপেই হউক, তিনি পারস্যের রাজধানীতে উপনীত হন। তখন আর্ত্তাজারাক্সেস পারস্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। চিকিৎসা-বিদ্যায় নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া, টেসিয়াস পারস্য-রাজের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ৩৯৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের ১৭ বৎসর পূর্ব্বে (অর্থাৎ ৪১৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে) পারস্যের রাজধানীতে টেসিয়াস প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, তিনি যে গ্রন্থ রচনা করিয়া যান, তাহা এখন ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থের অংশবিশেষ অপরাপর গ্রন্থকার-গণের গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়া রক্ষিত হইতেছে। ডায়ডোরাস সিকিউলাস 'বিব্লিওথিকা'

পাশ্চাত্যে ভারত-প্রসঙ্গ।

গ্রন্থে টেসিয়াসের গ্রন্থের বিষয় নানা স্থানে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ডায়ডোরাস সিকিউলাসের 'বিব্লিওথিকা' গ্রন্থ যদিও প্রথম খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল; কিন্তু ঐ গ্রন্থ পুরাবৃত্ত বিষয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। কারণ, ঐ গ্রন্থের মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী লুপ্তপ্রায় বহু প্রাচীন গ্রন্থের সারাংশ সঙ্কলিত হইয়াছে এবং কোনও কোনও গ্রন্থের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইয়া আছে। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ মনে করেন,—হেরোডোটাসের এবং টেসিয়াসের গ্রন্থই ভারতের প্রাচীন ইতিহাস-সংগ্রহ-বিষয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ। ডায়ডোরাস ঐ দুই গ্রন্থের সার সামগ্রী আপন গ্রন্থে আহরণ করিয়া গিয়াছেন মাত্র।

একমাত্র হেরোডোটাসের গ্রন্থে আস্থা স্থাপন করিতে হইলে, খৃষ্ট-জন্মের পাঁচ শত বৎসর-পূর্ব্ববর্ত্তী কালে ভারতের সহিত বৈদেশিকগণের পরিচয় হওয়ার কোনই তথ্য নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু ডায়ডোরাসের গ্রন্থে নির্ভর করিলে (বলা বাহুল্য, ডায়ডোরাস অধিকাংশ স্থলে টেসিয়াসেরই অনুসরণ করিয়াছেন) বুঝিতে পারা যায়,—সেসোষ্ট্রিস বা সিসোষ্ট্রিস নামক জনৈক মিশরীয় নৃপতি আরও পূর্ব্বে—আলেকজাণ্ডারের ভারতাগমনের বহু পূর্ব্বে—ভারতের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সিসোষ্ট্রিসকে কেহ কেহ 'রামেসিস' বলিয়াও অভিহিত করিয়া থাকেন। সিসোষ্ট্রিস খৃষ্ট-জন্মের পনের শত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জন্মকালেই তাঁহার ভবিষ্য-প্রতিষ্ঠার লক্ষণ-সমূহ প্রকাশ পাইয়াছিল। সিসোষ্ট্রিসের ভবিষ্য-উন্নতির পথ প্রশস্ত করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার পিতা তাঁহার বহু সহচর সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। কথিত আছে, যে দিন সিসোষ্ট্রিস জন্মগ্রহণ করেন, সে দিন মিশরে আরও বহু প্রতিভাশালী কুমার জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সে দিন মিশর-রাজ্যে যত লোকের যত পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, সকলের সকল পুত্রগুলিকে রাজা রাজধানীতে লইয়া আসেন এবং আপনার পুত্রের সহিত তাহাদিগকে শিক্ষাদান ও প্রতিপালন করিতে থাকেন। সিসোষ্ট্রিসের বয়োবৃদ্ধির ও শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সঙ্গিগণও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং সুশিক্ষা লাভ করিয়াছিল। ক্রমে তাহারা সকলেই যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা সকলেই সিসোষ্ট্রিসের একান্ত অনুগত হইয়া পড়িয়াছিল। সিসোষ্ট্রিসের পিতা আপনার পুত্রের কর্ত্তৃত্বাধীনে তাঁহার সহচরগণকে সময় সময় দিগ্বিজয়ে পাঠাইয়া দিতেন। আরব-দেশ এবং লিবিয়া-রাজ্য এই সময় এই যুবক-সৈন্যগণের বাহুবলে মিশর-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। লিবিয়া এবং আরব জয় করিয়া অন্যান্য দেশ জয়ের—বিশেষতঃ ভারতবর্ষ অধিকারের—স্পৃহা সিসোষ্ট্রিসের অন্তরে জাগিয়া উঠে। পিতার মৃত্যুর পর, পিতৃ-সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া সিসোষ্ট্রিস আপনার সদ্ব্যবহারের গুণে প্রথমে প্রজাবর্গকে অনুগত করিয়া তুলেন। পরিশেষে সিসোষ্ট্রিস তাহাদিগের মধ্য হইতে সৈন্য-দল সংগ্রহ করেন এবং সেই সৈন্যদল লইয়া তিনি ভারত-আক্রমণে প্রধাবিত হন। তাঁহার সৈন্যদলে ছয় লক্ষ পদাতিক, চব্বিশ সহস্র অশ্বারোহী, সপ্তবিংশ সহস্র রথী সংগৃহীত হয়। যে সকল যুবক তাঁহার সহিত একত্রে প্রতিপালিত হইয়াছিল, তাহাদের উপর সেই বিপুল বাহিনী পরিচালনের ভার ন্যস্ত থাকে। পারিপার্শ্বিক ইথিওপিয়া প্রথমেই সিসোষ্ট্রিসের প্রভাব

মিশরের ভারত-অভিযান।

অনুভব করে। ইথিওপিয়া অধিকার-ভুক্ত হইলে, পূর্ব্বাভিমুখে ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে নৌবাহিনীর আবশ্যকতা অনুভূত হয়। মিশরের অধিবাসীরা এ পর্য্যন্ত নৌ-যানাদির ব্যবহারে অনভ্যস্ত ছিল। আপন অধ্যবসায়ের প্রভাবে সিসোষ্ট্রিস এই সময়ে নৌবাহিনীর সৃষ্টি করিলেন। তিনিই মিশরে প্রথম নৌবাহিনীর সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া প্রখ্যাত। চারি শত অর্ণবপোতে সে নৌবাহিনী সংগঠিত হইয়াছিল। আরব সাগর হইতে সেই নৌবাহিনী পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া মহাসমুদ্রে উপস্থিত হয়। সেই মহাসমুদ্র তৎকালে 'ইরিথিয়ান' সমুদ্র নামে অভিহিত হইত। ইরিথিয়ান সমুদ্র দিয়া, মহাদেশের উপকূলভাগ অনুসরণ করিয়া, সেই নৌবাহিনী ভারতবর্ষে উপনীত হয়। সৈনিকদল-সহ সিসোষ্ট্রিস ভারতবর্ষে অবতরণ করিতে পারিয়াছিলেন কিনা,তদ্বিষয়ের কোনও প্রমাণ নাই। কিন্তু ডায়ডোরাসের বর্ণনায় প্রকাশ—সিসোষ্ট্রিসেব সৈন্যদল ভারতবর্ষে অবতরণ করিয়াছিল; সমগ্র ভারতবর্ষ আপনাদের অধিকারে আনিয়াছিল; এবং সিসোষ্ট্রিস ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে আপনার বিজয়-স্তম্ভ প্রোথিত করিয়াছিলেন। সে বর্ণনায় আরও প্রকাশ,—কেবল ভারতবর্ষ নহে, সমুদ্রের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র দেশ সিসোষ্ট্রিসের অধিকারে আসিয়াছিল। সিসোষ্ট্রিস আপনার অধিকৃত দেশ-সমূহে যে বিজয়-স্তম্ভ-সমূহ প্রোথিত করিয়াছিলেন,সেই স্তম্ভ-গাত্রের খোদিত লিপিতে আপনার সৈন্যদলের বীরত্ব-কাহিনী এবং বিজিত জাতির ভীরুতার ও কাপুরুষতার বিষয় লিখিয়া রাখিয়া যান। সিসোষ্ট্রিসের এই অভিযান সম্বন্ধে নানা বাদ-প্রতিবাদ উত্থাপিত হয়। এক পক্ষ বলেন,—'ডায়ডোরাসের বর্ণনা অতিরঞ্জিত। যে সময় সিসোষ্ট্রিস যুদ্ধযাত্রা করেন, বর্ণনায় প্রকাশ,—তখন এক সহস্র সাত শত মিশরীয় যুবক সেনাপতি-পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কিন্তু মিশরের তাৎকালিক অধিবাসীর অনুপাত অনুসারে হিসাব করিতে গেলে, এক দিনে এতাধিক শিশুর জন্ম হওয়া অসম্ভব। যদি চল্লিশ বৎসর বয়সের সময় মিশরাধিপতি সিসোষ্ট্রিস ভারত-অভিযানে অগ্রসর হন, আর তাঁহার জন্মদিনে যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে যদি সতের শত ব্যক্তি জীবিত থাকে, তাহা হইলে, সাধারণ জন্ম-মৃত্যুর পরিমাণ অনুসারে হিসাব করিতে হইলে, বলিতে হয়—সিসোষ্ট্রিসের জন্মদিনে মিশরে অন্ততঃ পাঁচ সহস্র পুরুষের জন্ম হইয়াছিল। সুতরাং ঐ অনুপাতে সে দিন পাঁচ সহস্র বালিকারও জন্ম হওয়া সম্ভবপর। যে রাজ্যে এক দিনে দশ সহস্র বালক-বালিকার জন্ম হয়, সে রাজ্যের লোক-সংখ্যা চারি কোটীর কম হইতে পারে না। কিন্তু যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, সে সময়ে মিশরে চারি কোটী লোকের বসতির বিষয় কখনই বিশ্বাস করা যায় না।' এই হেতুবাদে প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের কেহ কেহ সিসোষ্ট্রিসের ভারত-আক্রমণের কাহিনী উপকথা বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু কোনও কোনও ঐতিহাসিক এ বৃত্তান্ত একেবারে অলীক বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা বলেন,—'এক ডায়ডোরাস নয়, ডায়ডোরাসের পূর্ব্ববর্ত্তী হেরোডোটাসও আপন গ্রন্থে সিসোষ্ট্রিসের দিগ্বিজয়-কাহিনীর উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।' হেরোডোটাসের বর্ণনায় স্পষ্টতঃ ভারতবর্ষের নাম উল্লিখিত হয় নাই। হেরোডোটাস লিখিয়া গিয়াছেন,—'সিসোষ্ট্রিসের নৌ-বাহিনী মহাসমুদ্র-পথে পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া যে প্রদেশে উপনীত হইয়াছিল,

সে প্রদেশের সমুদ্রের গভীরতা এতই অল্প যে, সিসোষ্ট্রিস সে সমুদ্রের মধ্য দিয়া নৌ-বাহিনী পরিচালনায় আদৌ সমর্থ হন নাই ; সুতরাং তাঁহার সৈন্যদল নিকটবর্ত্তী উপকূলে অবতরণ করিয়া তথায় আপনাদের বিজয়-স্তম্ভ প্রোথিত করেন।' সিসোষ্ট্রিস যে ঠিক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, হেরোডোটাসের বর্ণনায় তাহা বুঝা যায় না। অথবা ভারতবর্ষের সীমানায় আগমন করিলেও সমুদ্র-তীরবর্ত্তী কোনও জলাভূমিতে আসিয়াই তাঁহাকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। যাহা হউক, সিসোষ্ট্রিসের অধিকৃত দেশকে ডায়ডোরাস ভারতবর্ষ বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। হেরোডোটাসের এবং ডায়ডোরাসের এই বর্ণনা পাঠ করিয়া, এবং ঐতিহাসিকগণের এতদ্বিষয়ক গবেষণার আলোচনা করিয়া, আমরা দ্বিবিধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। প্রথম—সিসোষ্ট্রিস ভারত-মহাসাগরীয় কোনও দ্বীপপুঞ্জে উপনীত হইয়া, সেই দ্বীপপুঞ্জকেই ভারতবর্ষ মনে করিয়া, উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া, দেশে ফিরিয়া গিয়া, আপন বিজয়-বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছিলেন। বিজিত দেশের তিনি এক প্রান্তের সমুদ্র-তীর হইতে অপর প্রান্তের সমুদ্র-তীর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন, তাহাতে সেই বিজিত দেশকে ভারত-সাগরীয় কোনও দ্বীপ ভিন্ন অন্য কিছুই মনে করা যায় না। দ্বিতীয়—ভারতবর্ষের কোনও এক প্রান্তভাগে লোকালয়-শূন্য প্রদেশে উপস্থিত হইয়া, ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশের দুর্গমতা অনুভব করিয়া, সিসোষ্ট্রিসকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইয়াছিল ; স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বিজয়-কাহিনী প্রচার করা ভিন্ন তাঁহার আর উপায়ান্তর ছিল না, এরূপও মনে করা যাইতে পারে। ফলতঃ, সিসোষ্ট্রিস যে ভারতবর্ষ অধিকার করিতে পারেন নাই—ভারতবর্ষে প্রবেশ-লাভ করিতে পারেন নাই—তদ্বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। যাহা হউক, সিসোষ্ট্রিসের ভারত-অভিযান-প্রসঙ্গের আলোচনায় ভারতের ইতিহাসের কি উপাদান পাইতে পারি? বুঝিতে পারি না কি,—ভারতবর্ষ তখনও পাশ্চাত্য-জাতির চক্ষে গৌরবের ঐশ্বর্য্যের কেন্দ্রভূমি ছিল ; আর ভারতের সেই গৌরব-ঐশ্বর্য্যের আলোক-রশ্মি দূর হইতে দর্শন করিয়া, তদভিমুখে অগ্রসর হইতে পাশ্চাত্য-জাতিরা প্রায়শঃই প্রলুব্ধ হইতেন?

খৃষ্ট-জন্মের পনের শত বৎসর পূর্ব্বে সিসোষ্ট্রিস যেরূপ-ভাবে ভারত-অভিযানে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহার দুই শত বৎসর পরে, খৃষ্ট-জন্মের তের শত বৎসর পূর্ব্বে, আসিরীয়া-রাজ্য হইতে ঐরূপ আর এক অভিযানের পরিচয় পাই। টেসিয়াস সেই বিবরণ প্রথম লিপিবদ্ধ করিয়া যান। ডায়ডোরাস সিকিউলাস তাহাতে রং ফলাইয়া গিয়াছেন। আসিরীয়া-সাম্রাজ্যের বিখ্যাত রাণী সেমিরামিস এই অভিযানের অভিনেত্রী ছিলেন। পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ ধনৈশ্বর্য্যে শ্রেষ্ঠ দেশ বলিয়া তিনি জানিতে পারেন। তিনি আরও জানিতে পারেন,—তখন ভারতবর্ষে একজন ক্ষমতাশালী নৃপতি ছিলেন এবং সেই নৃপতির অসংখ্য সৈন্যদল ছিল। নৃপতির নাম—তিনি শুনিয়াছিলেন,—'ষ্টাওরবেটস'। উচ্চারণের বিকৃতি-হেতু কোন্ নৃপতির কি নাম, তাঁহার নিকট কি ভাবে পৌঁছিয়াছিল, এখন তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। পুরুর নাম যখন 'পোরাস' হইয়া দাঁড়ায়, চন্দ্রগুপ্তের নাম যখন 'সাণ্ড্রোকাট্টাস' মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, তখন

সেমিরামিসের আক্রমণ।

বৈদেশিকগণের উচ্চারণে ভারতীয় নৃপতির নাম 'ষ্টাওরবেটস' হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যাহা হউক, এখন ষ্টাওরবেটস বলিয়াই সে নৃপতির নামোল্লেখ করিতে হইতেছে। সেই ভারতীয় নৃপতির বহুসংখ্যক সুশিক্ষিত হস্তী ছিল। তিনি যখন সেই হস্তীর সাহায্যে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেন, যত বড় বিক্রমশালী শত্রুই হউন না কেন, কেহই তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারিতেন না। এই ভারতীয় নৃপতির ঐশ্বর্য্য-গৌরবের বিষয় অবগত হইয়া, রাণী সেমিরামিস তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত হন। তিন বৎসর ধরিয়া আয়োজন চলিতে থাকে। অসংখ্য সুদক্ষ শিল্পী ও কারিকর সেই যুদ্ধের উপযোগী অস্ত্রশস্ত্র এবং যানবাহনাদি প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত হয়। ইতিহাসে প্রকাশ,—সিন্ধুনদের পশ্চিমস্থিত প্রদেশ-সমূহ রাজ্ঞী সেমিরামিস অল্পদিন মধ্যেই আপন অধিকারভুক্ত করিয়া লন। কিন্তু সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হইবার সময়ই ভীষণ বাধা উপস্থিত হয়। রাজ্ঞীর সৈন্যদল কিছুতেই নদ উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয় না। নদ উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য অসংখ্য জলযানের আবশ্যক হয়। তখন নৌ-যানাদি নির্ম্মাণের জন্য ফিনিসীয়া, সিরীয়া, সাইপ্রাস্‌ প্রভৃতি স্থান হইতে সেমিরামিস পোতনির্ম্মাণকারীদিগকে আনয়ন করেন। সিন্ধুনদের উপকূল-প্রদেশে নৌ-নির্ম্মাণোপযোগী কাষ্ঠাদি পাওয়া যাইত না। সুতরাং রাজ্ঞীকে বাকৃত্রিয়া (মতান্তরে বাল্‌খ, বাহ্লীক) দেশ হইতে পোতনির্ম্মাণোপযোগী সুবৃহৎ কাষ্ঠসমূহ আনয়ন করিতে হইয়াছিল। সিন্ধুনদের পশ্চিম পার্শ্বে তাঁহার পোতনির্ম্মাণ-ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। শিল্পিগণ এরূপ সুকৌশলে পোত-সমূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল যে, আবশ্যকমত উপাদানভূত কাষ্ঠ-সমূহ বিচ্ছিন্ন-ভাবে উষ্ট্রাদি দ্বারা স্থানান্তরে সংবাহিত হইত এবং আবশ্যকানুরূপ তদ্দ্বারা পুনরায় পোতাদি সংগঠিত হইতে পারিত। রাজ্ঞী সেমিরামিস যে সৈন্যদল লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কোন্‌ শ্রেণীর সৈন্য কি পরিমাণ ছিল, টেসিয়াস তাহার একটী তালিকা প্রদান করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায়,—সেমিরারিসের দলে পাঁচ লক্ষ অশ্বারোহী, এক লক্ষ রথারোহী, এবং ত্রিশ লক্ষ পদাতিক সৈন্য ছিল। প্রতি সৈন্য ছয় ফিট দীর্ঘ তরবারি লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন। রাজ্ঞী সেমিরামিস মনে করিয়াছিলেন,—ঐ বিপুল বাহিনীর সাহায্যে তিনি অনায়াসেই ষ্টাওরবেটস্‌কে পরাজিত করিতে পারিবেন। কিন্তু রাজা যখন গজারোহী সৈন্য সহ সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন, রাজ্ঞী সেমিরামিস প্রমাদ গণনা করিলেন। গজারোহী সৈন্যদলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমর্থ হয়, রাজ্ঞীর দলে এমন সৈন্য ছিল না। সুতরাং রাজ্ঞীকে তখন উপায়ান্তর পরিগ্রহ করিতে হইল। বাকৃত্রিয়ার সেনা-নিবাসে,—বারুদখানায়—রাজ্ঞীর অসংখ্য কর্ম্মচারী সর্ব্বদা কর্ম্ম-নিরত ছিল। তিন লক্ষ কৃষ্ণ-রোমাবৃত গো-মহিষাদি পশু সেই সকল কর্ম্মচারীর আহারের জন্য হনন করা হয়। সেই সকল কৃষ্ণবর্ণ পশুচর্ম্ম দ্বারা উষ্ট্র-পৃষ্ঠ আবৃত করিয়া, তাহার মধ্যে উষ্ট্র-পরিচালক যোদ্ধাকে লুকাইয়া রাখিয়া, তাহাদিগকে রাজ্ঞী প্রথমে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইয়া দেন। সেগুলি দেখিতে কতকটা হস্তীর মতই হইয়াছিল। সেমিরামিস মনে করিয়াছিলেন, এইরূপ কৌশলজাল বিস্তার করিয়া রণ-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইলে, শত্রুসৈন্য আতঙ্কে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবে। কিন্তু রাজা ষ্টাওরবেটস্‌ তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। তাঁহার সৈন্যদল রাজ্ঞীর সৈন্যদল অপেক্ষা

সংখ্যায় অল্প ছিল না। দুর্দ্দম্য গজারোহী সৈন্য পরিবৃত হইয়া, চারি সহস্র জলযান নৌসেনায় পরিপূর্ণ করিয়া, তিনি রাজ্ঞীর বিরুদ্ধে সমরাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইলেন। উভয় পক্ষে তুমুল নৌ-যুদ্ধ আরম্ভ হইল; বহুক্ষণ কেহই জয় পরাজয় নির্ণয় করিতে সমর্থ হইলেন না। কিন্তু পরিশেষে সাইপ্রাস দ্বীপ হইতে আনীত রাজ্ঞীর নৌবাহিনীর অসাধারণ রণকৌশলে রাজ্ঞীর জয়লাভ হইল। ষ্টাওরবেট্‌স্ পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলেন। তাঁহার নৌ-বাহিনী বিচ্ছিন্ন হইল। অধিকাংশ সৈন্য সমরানলে জীবন বিসর্জ্জন দিল। রাজ্ঞী সেমিরামিস সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হইবার পথ পাইলেন। রাজ্ঞী সেমিরামিস অবিলম্বে সিন্ধু-নদের উপর সেতু নির্ম্মাণ করাইয়া লইলেন।* সিন্ধুনদ পার হইয়া রাজ্ঞীর বিপুল বাহিনী নৃপতির পশ্চাদনুসরণ করিল। কিন্তু ষ্টাওরবেট্‌স্ পরাজয় স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি আবার প্রবল বাধা প্রদান করিলেন। রাজ্ঞীর পরিচালিত কৃত্রিম গজারোহী সৈন্য-দর্শনে ভারতীয় সৈন্যগণের প্রাণে প্রথমে ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল বটে; কিন্তু অল্পক্ষণ মধ্যেই রাজ্ঞীর চতুরতা প্রকাশ হইয়া পড়িল। নৃপতির পরিচালিত গজারোহী সৈন্যগণ বিপক্ষ-সৈন্যকে বিধ্বস্ত ও বিচালিত করিল। তখন একমাত্র পলায়ন ভিন্ন রাজ্ঞী আর উপায়ান্তর দেখিলেন না। রাজ্ঞী সেমিরামিসের অধিকাংশ সৈন্যই সমরাঙ্গণে প্রাণদান করিল। ষ্টাওরবেটসের সহিত সম্মুখ সমরে পরাজিত ও আহত হইয়া, কয়েকজন শরীর-রক্ষী সৈন্য সহ রাজ্ঞী অতি কষ্টে পলায়ন করিলেন। রাজ্ঞী সেমিরামিসের ভারত-বিজয়-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল; দর্প চূর্ণ হইল। তিনি আর কখনও ভারত-বিজয়ের কল্পনা মনে স্থান দিতেও সাহসী হইলেন না। রাজ্ঞী সেমিরামিসের ভারত-অভিযান-কাহিনীকেও ঐতিহাসিকগণের কেহ কেহ অসত্য বলিয়া প্রচার গিয়াছেন। একত্র এতাদৃশ সৈন্যদলের সমাবেশ সম্ভবপর নহে,—ইহাই সেই শ্রেণীর ঐতিহাসিকগণের সিদ্ধান্ত। এই ঘটনার উল্লেখে পৃথিবীর ইতিহাস লেখক স্যর ওয়াল্টার রলে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—'প্রতি মনুষ্যের এবং প্রত্যেক পশুটীর খাদ্যের জন্য যদি মাত্র একটী করিয়া তৃণদানের ব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলেও এতাদৃশ সৈন্যের ও পশ্বাদির আহার-সঙ্কুলান কাহারও সাধ্যায়ত্ত হইত না। সুতরাং এ ব্যাপার অবিশ্বাস্য।' কেহ কেহ আবার বলেন,—'এ ব্যাপারের সকলই অতিরঞ্জিত। সেমিরামিস নামে কোনও মানুষের অস্তিত্ব ইতিহাসে অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। সেমিরামিস—আসিরীয়া-দেশের পৌরাণিক কল্পনা মাত্র।' কেহ কেহ আবার সেমিরামিস নামকে আসিরীয়া-দেশের রাজবংশের সাধারণ সংজ্ঞা বলিয়াও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ডায়ডোরাস এই ঘটনার বিষয় টেসিয়াস হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, টেসিয়াস পারসিকগণের গ্রন্থপত্র হইতে এই বিবরণ সংগ্রহ করেন। পারসিকগণের গ্রন্থাদিতে অনেক অতিরঞ্জিত ঘটনারই উল্লেখ দেখা যায়; সুতরাং এ ঘটনা অতিরঞ্জিত হওয়াই সম্ভবপর;—এ কথাও অনেকে উল্লেখ করিয়া থাকেন। দূর অতীতের ঘটনায় সন্দেহ-সংশয় অবশ্যম্ভাবী। তবে রাজ্ঞী সেমিরামিসের এই ভারত-অভিযান-ব্যাপারে এ কথা নিশ্চয়ই প্রতিপন্ন হয়,—ভারতবর্ষ সে সময়ে ধনৈশ্বর্য্যে ও বলবীর্য্যে শ্রেষ্ঠ-রাজ্য ছিল। যে গজারোহী সৈন্যের সাহায্যে যুদ্ধের বিষয় এই বৃত্তান্তে সন্নিবিষ্ট আছে, তদ্রূপ গজারোহী সৈন্য

সাহায্যে ভারতীয় নৃপতিকে যুদ্ধ করিতে পরবর্ত্তি-কালে আলেকজাণ্ডার প্রভৃতিও প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। আরও, গজারোহী, অশ্বারোহী, পদাতিক, রথী এবং নৌসেনা—সর্ব্ববিধ সৈন্য দ্বারাই যে ভারত রক্ষিত হইত, তাহাও আমরা এতৎপ্রসঙ্গে অবগত হই।

সেমিরামিসের পর ভারত-সাম্রাজ্যের প্রতি দারায়ুসের দৃষ্টি সঞ্চালিত হয়। দারায়ুস পারস্যের অধিপতি ছিলেন। পারস্যাধিপতিগণ অনেকেই দারায়ুস নামে অভিহিত হইতেন।

দারায়ুসের অভিযান।

যে দারায়ুস ভারতবর্ষে আধিপত্য-বিস্তারে অগ্রসর হন, তিনি হিষ্টাস্পেসের পুত্র বলিয়া পরিচিত। ৫২১ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ৪৮৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি পারস্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। পারস্য-সাম্রাজ্যকে তিনি কুড়িটী 'সাত্রাপি' বা প্রদেশে বিভক্ত করেন। এক এক প্রদেশের শাসন-কর্ত্তা 'সাত্রাপ' (Satrap) বা প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তা নামে অভিহিত হইতেন। সিন্ধুনদের পশ্চিম-তীরস্থিত প্রদেশ তাঁহার একটী 'সাত্রাপি' মধ্যে গণ্য ছিল। পারস্যাধিপতি 'সাইরস দি গেট' বা মহাবীর সাইরস আসিরীয়া-সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করেন। * তাহার পর হইতেই সিন্ধু-নদের পশ্চিম-তীরস্থিত ঐ প্রদেশ পারস্যের অধিকারে আসে। দারায়ুসের অধিকৃত বিংশতি প্রদেশ হইতে যে রাজকর সংগৃহীত হইত, সেই কর-সমষ্টির এক-তৃতীয়াংশ সিন্ধু-নদের পশ্চিম-তীরস্থ ঐ প্রদেশ হইতেই তিনি প্রাপ্ত হইতেন। † সুতরাং ঐ প্রদেশ কিরূপ ধনৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন এবং জনপূর্ণ ছিল, তাহা সহজেই প্রতীত হয়। দারায়ুস কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রদেশের আধিপত্য লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত ছিলেন না। হেরোডোটাস বলেন,—ভারতবর্ষের ধনৈশ্বর্য্যে প্রলুব্ধ হইয়া, দারায়ুস প্রথমে সিন্ধু-নদের মোহানা-আবিষ্কারে বদ্ধ-পরিকর হন। তদুদ্দেশ্যে কতকগুলি জলযান প্রস্তুত হয়। স্কাইলাক্স সেই জলযান পরিচালনার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি গ্রীসের কারিয়াণ্ডা নগরের অধিবাসী ছিলেন। পারস্য-সম্রাটের অভিপ্রায় অনুসারে স্কাইলাক্স জলযান-সমূহের কর্তৃত্ব-ভার গ্রহণ করিয়া সিন্ধুনদের মোহানার দিকে সমুদ্রের অভিমুখে অগ্রসর হন। গান্ধার-দেশ হইতে ঐ জলযান যাত্রা করিয়াছিল। সিন্ধু-নদের স্রোতোভিমুখে অগ্রসর হইয়া, পশ্চিম উপকূলের নানা স্থানে স্কাইলাক্সের নৌবাহিনী

* দারায়ুসের অধিকারভুক্ত 'সাত্রাপি'-সমূহের মধ্যে এরিয়া (Aria), আরাকোসিয়া (Arachocia) এবং গাণ্ডারিয়া (Gandaria) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। সিন্ধু-নদের পশ্চিম-তীরস্থিত প্রদেশ কি নামে অভিহিত ছিল, নির্ণয় করা সুকঠিন। ভিন্সেণ্ট স্মিথ বলিয়াছেন,—বর্ত্তমান হীরাট প্রদেশ তৎকালে 'এরিয়া' নামে অভিহিত হইয়াছিল। কান্দাহার—'আরাকোসিয়া' নামে এবং পঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ 'গাণ্ডারিয়া' নামে পরিচিত হইত। কিন্তু আমাদের মনে হয়, বর্ত্তমান কান্দাহার-প্রদেশ তৎকালে গান্ধার এবং অপভ্রংশে গাণ্ডারিয়া নামে অভিহিত হইয়াছিল। গান্ধার-প্রদেশ দারায়ুসের রাজ্যান্তর্ভুক্ত ছিল। ঐতিহাসিকগণ তাহাকেই ভারতের অংশ বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। সে বর্ণনা নিরর্থক বলিয়াও মনে হয় না ; কারণ, গান্ধার—কেবল গান্ধারই বা বলি কেন,—এরিয়া, আরাকোসিয়া প্রভৃতি প্রদেশও এককালে ভারত-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

† সিন্ধু-নদের পশ্চিম-তীরস্থিত প্রদেশ হইতে সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ—প্রায় দশ লক্ষ পাউণ্ড। বর্ত্তমান হিসাবে প্রায় দেড় কোটি টাকা। ভিন্সেণ্ট স্মিথ লিখিয়া গিয়াছেন,—"It paid the enormous tribute of 360 Euboic talents of gold-dust or 185 hundredweights, worth fully million sterling and constituting about one-third of the total bullion revenue of the Asiatic provinces." ট্যালেণ্টের মূল্য—৩৯৬ পাউণ্ড পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হয়।

আপন আধিপত্য বিস্তার করে। পরিশেষে নৌ-যান সমুদ্র-মধ্যে পতিত হইয়া পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইতে হইতে লোহিত-সাগরে গিয়া উপনীত হয়। ৫১৬ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে দারায়ুসের এই অভিযানের আরম্ভ। প্রায় আড়াই বৎসর এই অভিযানে অতিবাহিত হইয়াছিল। এই অভিযানের বিবরণের যে ভগ্নাংশ-সংবাদ এখন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইতে সিন্ধু-নদের পূর্ব্বোপকূলভাগে নৌ-বাহিনী যে কখনও উপনীত হইয়াছিল, তাহা বুঝা যায় না। কিন্তু হেরোডোটাসের বর্ণনায় প্রকাশ,—এই অভিযানে দারায়ুস আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের একছত্র আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, হেরোডোটাসের এ মন্তব্য ভিত্তিহীন। সমগ্র ভারতবর্ষ অধিকারভুক্ত হওয়া দূরের কথা; সিন্ধু-নদের পূর্ব্ব-তীরে দারায়ুসের নৌ-বাহিনী উপনীত হওয়ারই কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁহার অধিকারভুক্ত 'সাত্রাপি' প্রদেশ-সমূহের স্থান-নির্দ্দেশে তাঁহার ভারত-বিজয়-বৃত্তান্ত নির্ণয় করিতে হইলেও, হেরোডোটাসের এতদুক্তিতে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হয়।

আলেকজাণ্ডারের অভিযান।

সিসোষ্ট্রিস, সেমিরামিস ও দারায়ুসের ভারত-অভিযান প্রসঙ্গে খৃষ্ট-জন্মের পনের শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া, খৃষ্ট-জন্মের ৪৮৫ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময়ের ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য্য-গৌরবের আভাস পাওয়া যায়। বুঝিতে পারি, ঐ সময়ের মধ্যে মিশরের, আসিরীয়ার এবং পারস্যের নৃপতিগণ ভারতবর্ষে আধিপত্য-বিস্তারের চেষ্টা পাইয়াছিলেন; কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হন নাই। সিন্ধু-নদের পশ্চিম-তীর পর্য্যন্ত আসিয়াই তাঁহাদের শক্তি পর্য্যুদস্ত হইয়াছিল। সিন্ধু-নদের পরপারে আসিতে কাহারও সামর্থ্যে কুলায় নাই। ফিনিসীয় বণিকগণ সে পক্ষে কিয়ৎ-পরিমাণে কৃতকার্য্য হন। তাঁহারা তরবারি-সাহায্যে ভারতবর্ষে আধিপত্য-বিস্তারের কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া, বাণিজ্য-বিস্তার ব্যপদেশে ভারতবর্ষে প্রবেশাধিকার লাভ করেন। খৃষ্ট-জন্মের ৩৩২ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ফিনিসীয়-বণিকগণ ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন,—প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহারা জলপথে এবং স্থলপথে উভয় পথেই গতিবিধি করিতেন। লেভান্ত-উপসাগরের উপকূলে 'টায়ার' নামে এক বন্দর ছিল। টায়ার—ফিনিসীয়গণের রাজধানী। ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য-সূত্রে টায়ার নগর এক সময়ে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন, শক্তিশালী ও শ্রেষ্ঠপদবীতে আরোহণ করিয়াছিল। মহাবীর আলেকজাণ্ডার যখন পারস্য-সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান করেন, তখন টায়ারের অধিবাসিগণ পারস্যের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। তখন টায়ার নৌ-বলে এতই বলীয়ান ছিল যে, মাসিডন ও গ্রীসের উপকূল-প্রদেশ টায়ারের প্রাধান্যে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত। পারস্যের সহিত ফিনিসীয়গণ যোগদান করায় ফিনিসীয়ার প্রতি আলেকজাণ্ডারের প্রতি-হিংসানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। তখন, পারস্য-জয়ের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া আলেক-জাণ্ডার ফিনিসীয়া-আক্রমণে অগ্রসর হন। প্রথমে পারিপার্শ্বিক কয়েকটী নগর অধিকার করিয়া আলেকজাণ্ডার টায়ার আক্রমণ করেন। ফিনিসীয়গণ পারস্যের পক্ষাবলম্বনে আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল বলিয়াই কেবল যে আলেকজাণ্ডার টায়ার-নগর আক্রমণ করেন, তাহা নহে; ফিনিসীয়ার প্রাধান্য অব্যাহত থাকিতে তাঁহার

ভারতবর্ষ-অধিকারের ভবিষ্য-কল্পনা নিষ্ফল হইবে মনে করিয়াই প্রধানতঃ তিনি ফিনিসীয়ার রাজধানী টায়ার-নগর আক্রমণে অগ্রসর হন। ফিনিসীয়গণকে দমন করিতে না পারিলে আলেকজাণ্ডারের মিশর-অধিকারের সঙ্কল্পও বিপর্য্যস্ত হইবার আশঙ্কা ছিল। সুতরাং সকল প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে তিনি ফিনিসীয়গণকে বিপর্য্যস্ত করিবার জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ হইলেন। কিন্তু ফিনিসীয়ার রাজধানী 'টায়ার'-নগর * তখন এমনই সুরক্ষিত ছিল, এমনই নৌবলে বলীয়ান হইয়া উঠিয়াছিল যে, আলেকজাণ্ডার নৌ-যুদ্ধে টায়ার অধিকার সম্ভবপর বলিয়া মনে করিলেন না। অগত্যা টায়ার অধিকারের জন্য তাঁহাকে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইল। তিনি মৃত্তিকা-স্তূপ দ্বারা সমুদ্রের মধ্য দিয়া টায়ারে প্রবেশের একটী পথ প্রস্তুত করিয়া লইলেন। ফলে, সাত মাসের মধ্যে টায়ারের অধঃপতন সংঘটিত হইল। তখনও টায়ারের বাণিজ্য একেবারে লোপ পায় নাই। সুতরাং তাহার পুনরুত্থানের ভরসা ছিল। কিন্তু পরিশেষে আলেকজাণ্ডার যখন মিশর অধিকার করিলেন, যখন আলেকজান্দ্রিয়া মহানগরীর উদ্ভব হইল, ফিনিসীয়ার পুনরুত্থানের সকল আশা-ভরসা একেবারে লোপ পাইল। তখন আলেকজান্দ্রিয়াই—প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল-মধ্যে পরিগণিত হইল। এইরূপে ফিনিসীয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য অন্তর্হিত হইলে ফিনিসীয়া চিরতরে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। ফিনিসীয়ার অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে আলেকজান্দ্রিয়ার সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে, সেই সৌভাগ্য-সূত্রে ভারতাভিমুখে আলেকজাণ্ডারের অগ্রসর হইবার পথও অনেকটা সুগম হইয়া আসিল। এদিকে আপনার পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরাজয়ের বিষয় স্মরণ করিয়া এবং টায়ার-নগর-অধিকারে আলেকজাণ্ডারের কৃতিত্ব-দর্শন করিয়া, দারায়ুস আলেকজাণ্ডারের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। সে সন্ধিতে আলেকজাণ্ডার বিশেষ লাভবান হইতেন সত্য; কিন্তু আলেকজাণ্ডারের আশা অপরিসীম। সুতরাং তিনি দারায়ুসের সন্ধির প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলেন না। সেই সন্ধির প্রস্তাবে আলেকজাণ্ডার উত্তর দিলেন,—'হয় দারায়ুস

---

* এসিয়া-মহাদেশের অন্তর্গত তুরস্কের পশ্চিমে ভূমধ্য-সাগরের অন্তর্গত লেভান্ত উপসাগরের পূর্ব্ব-উপকূলে, ৩৩° ডিগ্রী ১২' মিনিট উত্তর-অক্ষরেখায় টায়ার অবস্থিত। এখন প্রাচীন টায়ারের ভগ্নাবশেষ মাত্র আছে। টায়ার এখন ক্ষুদ্র একখানি গ্রাম মাত্র; কতকগুলি মৎস্যজীবীর বাসস্থলী। টায়ার যখন ফিনিসীয়ার রাজধানী ছিল, পৃথিবীর মধ্যে সমৃদ্ধিশালী নগর বলিয়া পরিগণিত হইত, তখন উহার অবস্থানের অন্যরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমে টায়ার নগরী তুরস্কের (পালেস্তিন-প্রদেশের) সীমানার মধ্যেই অবস্থিত ছিল। পরিশেষে নিকটস্থ একটী দ্বীপে ঐ রাজধানী স্থাপিত হয়। তখন পালেস্তিনের অন্তর্ভুক্ত টায়ার 'পুরাতন টায়ার' এবং দ্বীপান্তর্গত টায়ার 'নূতন টায়ার' নামে পরিচিত হয়। যে সময়ে দ্বীপটীতে রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়াছিল, তখন দ্বীপটীর পরিসর অনেক অধিক ছিল। বৈদেশিক আক্রমণকারিগণ দ্বীপস্থিত রাজধানী সহজে আক্রমণ করিতে পারিবেন না বলিয়াই, দ্বীপে রাজধানী স্থানান্তর-করণের ব্যবস্থা হইয়াছিল। আলেকজাণ্ডারের নৌ-বল ছিল না। তিনি স্থলপথে অগ্রসর হইয়া পুরাতন টায়ার অনায়াসেই অধিকার করেন। কিন্তু দ্বীপমধ্যস্থিত রাজধানী আক্রমণ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। তখন তিনি পুরাতন টায়ার পর্য্যন্ত পথ প্রস্তুতের চেষ্টা পান। ঐ সমুদ্রাংশের সর্ব্বাপেক্ষা গভীরতম অংশ সাত 'ফ্যাদম' অর্থাৎ আটাইশ হাত মাত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। দ্বীপের-মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রের পরিসর প্রায় বার শত গজ অর্থাৎ প্রায় দুই তৃতীয়াংশ মাইল ছিল। পূর্ব্বরূপ গভীরতা-বিশিষ্ট ঐরূপ বিস্তৃতি-সম্পন্ন সমুদ্রাংশের উপর পথ প্রস্তুত অন্যের পক্ষে অসম্ভব হইলেও, আলেকজাণ্ডার অসম্ভব বলিয়া মনে করেন নাই। তাঁহার লোকবল অসংখ্য ছিল; সুতরাং তিনি অনায়াসেই সেতুবন্ধন করিয়া টায়ার অধিকার করিয়াছিলেন। এখন আর সে দ্বীপ নাই; আলেকজাণ্ডার কর্ত্তৃক পথ প্রস্তুত হওয়ার পর হইতেই টায়ার-দ্বীপ উপদ্বীপের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে টায়ারের পরিসরও অনেক কমিয়াছে।

সর্ব্বতোভাবে পরাজয় স্বীকার করুন; নয়—তরবারির সাহায্যে জয়-পরাজয় নির্দ্ধারিত হইবে।' অগত্যা দারায়ুসের সহিত আলেকজাণ্ডারের ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ৩৩১ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে আরাবেলার সমর-প্রাঙ্গণে পারস্তের ভাগ্যলক্ষ্মী আলেকজাণ্ডারের অঙ্কশায়িনী হইলেন। দারায়ুস পরাজিত হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে বাকৃত্রিয়ার দিকে পলায়ন করিলেন। এলবর্জ্জ-গিরিসঙ্কটের পথ দিয়া দারায়ুস বাকৃত্রিয়ায় গমন করেন। ঐ পথকে গ্রীকগণ 'কাস্পিয়ান সাগরের দ্বার' বলিয়া নির্দ্দেশ করিত। আলেকজাণ্ডার যখন দারায়ুসের অনুসরণ করেন, তিনি জানিতে পারেন,—বাকৃত্রিয়ার শাসনকর্ত্তা (সাত্রাপ) বেসাস পারস্ত-সাম্রাজ্যের অধীনতা অস্বীকার করিয়া সম্রাট দারায়ুসকে বন্দী করিয়াছেন। কতকটা দারায়ুসের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া, কতকটা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার ব্যবহারে ক্রোধান্বিত হইয়া, আলেকজাণ্ডার বাকৃত্রিয়া অভিমুখে অগ্রসর হন। কিন্তু প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা বেসাসকে আক্রমণ করিবার পূর্ব্বেই দারায়ুসের সম্বন্ধে দুঃসংবাদ আসিয়া উপস্থিত হয়। আলেকজাণ্ডারের বাকৃত্রিয়ায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই কৃতঘ্ন বেসাস সম্রাট দারায়ুসকে অস্ত্রাঘাতে বিদ্ধ করিয়া রাজপথে ফেলিয়া আসেন। দারায়ুসের উদ্ধারের জন্য আলেক-জাণ্ডারের উদ্যম ব্যর্থ হয়, এবং আলেকজাণ্ডার বাকৃত্রিয়ার অভিমুখে আর অগ্রসর না হন,—ইহাই বেসাসের অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু ফলে বিপরীত সঙ্ঘটিত হইল। আলেকজাণ্ডার যখন বাকৃত্রিয়ার পথে উপনীত হন, সেই সময় তাঁহারই সমক্ষে অস্ত্রাহত দারায়ুসের জীবন-বায়ু বহির্গত হয়। এই শোকাবহ দৃশ্য দর্শন করিয়া, বেসাসকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য, আলেকজাণ্ডার অধিকতর উৎসাহিত হন। কিন্তু আলেকজাণ্ডার ঐ প্রদেশের পথঘাট সম্পূর্ণরূপ অপরিজ্ঞাত ছিলেন। সুতরাং বেসাসের অনুসরণ করিতে কিছুদিন বিলম্ব ঘটে। আলেকজাণ্ডার যে পথে বেসাসকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে-ছিলেন, বেসাস সে পথের নগর গ্রাম বিধ্বস্ত ও ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন; সে পথ মরুভূমি মধ্যে পরিণত হয়। সুতরাং আলেকজাণ্ডার তখনকার মত বেসাসের আর অনুসরণ করিতে পারেন না। ইতিমধ্যে, ৩৩০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের শীতকালে, বেসাস পারস্তের সম্রাট বলিয়া পরিচিত হন। আলেকজাণ্ডার নিশ্চেষ্ট থাকিবার পাত্র নহেন। পর বৎসর বসন্তকালে দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া, তিনি বেসাসের রাজধানী আক্রমণ করেন। বেসাস ধৃত হন। অশেষ যন্ত্রণা দিয়া বেসাসের মুণ্ডচ্ছেদ করা হয়। এইরূপে, ফিনিসিয়ার উচ্ছেদ-সাধনে, পারস্তে আধিপত্য-বিস্তারে নিষ্কণ্টক হইয়া, আলেকজাণ্ডার অল্পকাল বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার নানা ব্যভিচারের ও দুষ্ক্রিয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সময়ের কার্য্য-পরম্পরার উল্লেখ করিয়া ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে মদ্যপ লম্পট বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, অল্পদিন পরেই আলেকজাণ্ডারের চমক ভাঙ্গে। সম্মুখে যে বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র ছিল, তৎপ্রতি তাঁহার দৃষ্টি সঞ্চালিত হয়। ইহার পরই আলেকজাণ্ডার ভারতের অভিমুখে অগ্রসর হন। আলেকজাণ্ডারের ভারতাক্রমণ ভারতের ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায়। সে অধ্যায় যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য।

[প্রাচীন ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য;—ঋগ্বেদের বিভিন্ন স্থানে সমুদ্র-পথে বাণিজ্যের প্রসঙ্গ;—স্মৃতি-পুরাণাদিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের উল্লেখ;—পিটক, জাতক প্রভৃতি বৌদ্ধ গ্রন্থে ভারতীয় বণিকগণের সমুদ্রপথে বাণিজ্য-প্রসঙ্গ,—প্রাচীন ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য সম্বন্ধে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মত;—কাল্‌ডিয়ায়, বাবিলনে, ফিনিসীয়ায়, রোমে, গ্রীসে, মিশরে ভারতীয় বণিকগণের বাণিজ্য,—বিভিন্ন দেশে তাঁহাদিগের উপনিবেশ-স্থাপন;—খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-গ্রন্থাদিতে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের কথা,—'ওফির' বন্দরের স্থান-নির্দ্দেশ,—সলোমনের ও হীরামের বাণিজ্য-পোত,—প্রাচীন ভারতের পণ্যদ্রব্যের পরিচয়,—ময়ূর, গজদন্ত প্রভৃতির সংজ্ঞার বিষয় অনুধাবনে দেশ-দেশান্তরে ঐ সকল পণ্যাদির রপ্তানির বিষয়;—ভারতের বাণিজ্যে ইউরোপের অর্থ-শোষণ প্রসঙ্গ;—ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভারতীয় বণিকগণের বাণিজ্যের পরিচয়,—হিন্দু রাজত্বে,—বৌদ্ধপ্রভাব-কালে,—মুসলমানগণের শাসন সময়ে,—ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বাণিজ্য-প্রসঙ্গ;—প্রাচীন-ভারতের বাণিজ্য-কেন্দ্র বন্দর-সমূহ;—বঙ্গদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য,—উপসংহারে বিবিধ বক্তব্য।]

বৈদেশিকগণের লিখিত গ্রন্থপত্রে বৈদেশিকগণের ভারত-অভিযান প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতের ঐশ্বর্য্য-গৌরবের যেরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, প্রাচীন ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের বিষয় অনুসন্ধান করিলেও সেই পরিচয়ই প্রাপ্ত হই। পৃথিবীর নানা-স্থানে ভারতীয় বণিকগণ বাণিজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন; ভারতীয় পণ্য-দ্রব্য সুসভ্য প্রাচীন জনপদ-সমূহে সর্ব্বদা প্রেরিত হইত;—শাস্ত্র-গ্রন্থেও এ সকল বৃত্তান্ত অনুসন্ধান করিয়া প্রাপ্ত হই, আবার প্রাচীন সভ্য-সমুন্নত পাশ্চাত্য-জাতির ইতিহাস-মধ্যেও এতদ্বিবরণের অসদ্ভাব নাই। পাশ্চাত্য-দেশের সভ্যতার ইতিহাস—তুলনায় অল্প দিনের সম্পৎ। সে ইতিহাসের মধ্যে ভারতের বাণিজ্য-সম্পদের যে উল্লেখ আছে, তাহাতে তৎকালে ভারতবর্ষ যে সভ্য-সমুন্নত ছিল, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। তাহারও পূর্ব্বের বৃত্তান্ত অনুসন্ধান করিতে হইলে, আমাদের শাস্ত্র-গ্রন্থের সাহায্য-গ্রহণ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। কারণ, শাস্ত্র-বর্ণিত কালে অন্যদেশ হয় ভারতের অন্তর্ভুক্ত, নয় অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল। সে সময়ের অন্য দেশের ইতিকথাই নাই; সুতরাং ভারতবর্ষের প্রসঙ্গই বা কি প্রকারে উল্লিখিত দেখিব? যাহা হউক, বৈদেশিক বাণিজ্য বিস্তার সম্বন্ধে ভারতের যে কৃতিত্বের পরিচয় আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থে এবং বৈদেশিকগণের ইতিহাসে অনুসন্ধান করিয়া পাই, বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দেখিতেছি। কোন্ দেশে না ভারতের বাণিজ্য-প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল? পৃথিবীর ইতিহাসে প্রাচীন কালে যে সকল জনপদ সভ্য-সমুন্নত ছিল বলিয়া পরিচয় পাই, তাহার সর্ব্বত্রই ভারতের বাণিজ্য-প্রভাব দেদীপ্যমান। ভূমধ্য-সাগরের পারিপার্শ্বিক কয়েকটী জনপদকে—মিশর, বাবিলন, ফিনিসীয়া, গ্রীস, রোম প্রভৃতিকে—পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ সভ্যতার আদিস্থান বলিয়া ঘোষণা করেন। চীন-সাম্রাজ্যও প্রাচীনকালের সভ্য-জনপদ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। কিন্তু কিবা ভূমধ্য-সাগরোপকূলস্থিত প্রতীচ্য জনপদসমূহে, কিবা প্রাচ্য চীনে,—ভারতের বাণিজ্য-প্রভাব সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হয়। এ সকল বিষয় একটু আলোচনা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন,—আলেকজাণ্ডারের ভারতাগমনকে ভিত্তিভূমি করিয়া ভারতের ইতিহাস সংগঠন করিতে হইলে, ভারতের ইতিহাসের কতটুকু অংশ মাত্র কীর্ত্তন করা হয়।

প্রাচীন-ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য।

এককালে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভারতের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল, এককালে পৃথিবীর সর্ব্বত্র বাণিজ্যাদি সূত্রে ভারতবাসীর গতিবিধি ছিল,—আমরা পুনঃপুনঃ তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছি। * ঋগ্বেদের বিভিন্ন স্থানে সমুদ্র-গমনের এবং সমুদ্র-পথে বাণিজ্য-পোত-পরিচালনের বিবরণ দেখিতে পাই। প্রথম মণ্ডলের পঞ্চবিংশ সূক্তের সপ্তম ঋকে প্রকাশ,—বরুণদেব অন্তরীক্ষ-পথে এবং সমুদ্র-পথে যান-পরিচালনে অভিজ্ঞ ছিলেন। সেই ঋকের অর্থে উপলব্ধি হয়,—তৎকালে ব্যোম-পথে ব্যোমযানাদি পরিচালিত হইত এবং সমুদ্রপথে অর্ণব-পোতাদির গতিবিধি ছিল। সেই ঋকটী এই,—"বেদা যো বীনাং পদমন্তরিক্ষেণ পততাং। বেদ নাবঃ সমুদ্রিয়ঃ ॥১।২৫।৭ ॥"

বেদাদি শাস্ত্রে বাণিজ্য-প্রসঙ্গ।

প্রথম মণ্ডলের আরও তিনটী সূক্তের তিনটী ঋকে বৈদেশিক-বাণিজ্যের উল্লেখ আছে। তাহার দুইটী ঋক (৪৬শ সূক্তের ৮ম ঋক এবং ৪৮শ সূক্তের ৩৪শ ঋক) পূর্ব্বেই আমরা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি,—ধনাভিলাষী বণিকগণ বাণিজ্যপোত সজ্জিত করিয়া কিরূপভাবে দূরদেশে গতিবিধি করিতেন। † অপর ঋকে (উক্ত প্রথম মণ্ডলের ৫৬শ সূক্তের দ্বিতীয় ঋকে) বণিক-গণের বাণিজ্য-ব্যপদেশে দিগ্‌দেশে গতিবিধির একটী উপমা আছে। ঋকটী এই,—"তং গূর্ত্তয়ো নেমন্নিষঃ পরীণসঃ সমুদ্রং ন সঞ্চরণে সনিষ্যবঃ। পতিং দক্ষস্য বিদথস্য নূ সহো গিরিং ন বেনা অধি রোহ তেজসা ॥" অর্থাৎ,—'ধনার্থী বণিকেরা যেরূপ সকল দিকে সঞ্চরণ করিয়া সমুদ্র ব্যাপিয়া থাকে, হব্যবাহী স্তোতাগণ সেইরূপ সেই ইন্দ্রকে সকল দিকে ব্যাপিয়া রহিয়া-ছেন। নারীগণ যেরূপ পুষ্পচয়নার্থ পর্ব্বতারোহণ করে, হে স্তোতা! তুমিও প্রবৃদ্ধ যজ্ঞের প্রতিপালক বলবান ইন্দ্রের নিকট একটী তেজঃপূর্ণ স্তোত্র দ্বারা সেইরূপ শীঘ্র আরোহণ কর।' এই ঋকের উপমায় বণিকগণ যে সমুদ্রের সর্ব্বত্র গতিবিধি করিতেন এবং সমুদ্রের সকল পথ যে তাঁহাদের পরিজ্ঞাত ছিল, তাহা বেশ উপলব্ধি হয়। ঐ মণ্ডলের ষোড়শাধিক শততম সূক্তের তৃতীয় ঋকোক্ত তুগ্র-পুত্র ভুজ্যুর সমুদ্র-গমন, বাণিজ্য-ব্যপদেশে সংঘটিত হইয়া-ছিল বলিয়াও অনেকে সিদ্ধান্ত করেন। সে ঋক্‌টী,—"তুগ্রো হ ভুজ্যুমশ্বিনোদমেঘে রয়িং ন কশ্চিন্মমৃর্বা অবাহাঃ। তমূহথুর্নৌভিরাত্মন্বতীভিরন্তরিক্ষপ্রুদ্ভিরপোদকাভিঃ ॥" সপ্তম মণ্ডলের দুইটী ঋকে (৮৮শ সূক্তের তৃতীয় ও চতুর্থ ঋকে) বশিষ্ঠ ও তদ্বংশীয়গণের সমুদ্র-গমনের বিষয় উল্লেখ আছে। ঋক দুইটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—"আ যদ্রুহাব বরুণশ্চ নাবং প্র যৎ সমুদ্র-মীরযাব মধ্যং। অধিযদপাং স্নুভিশ্চরাব প্র প্রেংখ ইংখয়াবহৈ শুভে কং ॥ বশিষ্ঠং হ বরুণো নাব্যাধাদৃষিং চকার স্বপা মহীভিঃ। স্তোতারং বিপ্রঃ সুদিন ত্বে অহ্নাং যান্নু দ্যাবস্ততনন্যা-দুষাসঃ ॥" অর্থাৎ,—'যখন আমি (বশিষ্ঠ) ও বরুণ উভয়ে নৌকায় আরোহণ করিয়া-ছিলাম, জলের উপরে গমনশীল নৌকায় ছিলাম, তখন শোভার্থ নৌকারূপ দোলায় ক্রীড়া করিয়াছিলাম। মেধাবী বরুণ গমনশীল দিন ও রাত্রিকে বিস্তার করতঃ দিন-সমূহের মধ্যে সুদিনে বশিষ্ঠকে নৌকায় আরোহণ করাইয়াছিলেন। তাঁহাকে রক্ষা দ্বারা সুকর্ম্মা করিয়া-

* পৃথিবীর ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ১৬শ ও ৪৬৪শ পৃষ্ঠা; দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ; তৃতীয় খণ্ড, ৪৬৮ম—৪৭০ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† "পৃথিবীর ইতিহাস", ৩য় খণ্ড, ৪৬৭ম পৃষ্ঠার ঋক দুইটী ও তাহার অর্থ দ্রষ্টব্য।

ছিলেন।' এ ঋকে যদিও বাণিজ্যের প্রসঙ্গ নাই; কিন্তু সমুদ্র-পথে গতিবিধির বিষয় বিবৃত থাকায় বৈদেশিক বাণিজ্যের পথ যে তখন প্রশস্ত ছিল, তাহা উপলব্ধি হইতেছে।

বাণিজ্য-ব্যপদেশে সমুদ্র-পথে দূরদেশে গতিবিধির উল্লেখ স্মৃতি-সংহিতার বিভিন্ন স্থানে দেখিতে পাই। মনু-সংহিতার অষ্টম অধ্যায়ে (৩৯৯ম, ৪০৬ম, ৪০৯ম প্রভৃতি শ্লোকে) এবং তৃতীয় অধ্যায়ে (১৫৮ম শ্লোকে), যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে (২৫৩ম—২৫৬ম, ২৬২ম—২৬৩ম প্রভৃতি শ্লোকে) বণিকগণের বৈদেশিক বাণিজ্যের বিবিধ পরিচয় পাওয়া যায়। * গ্রহাদির অবস্থান-বশতঃ সমুদ্র-পথে গতিবিধিতে শুভাশুভ-সংঘটনের বিষয় 'বৃহৎ-সংহিতার' বিভিন্ন স্থানে পরিদৃষ্ট হয়। † ধর্ম্মসূত্রসমূহের বিভিন্ন স্থানে সমুদ্র-পথে বাণিজ্যের উল্লেখ আছে। সমুদ্রগামী পোতাধ্যক্ষগণ নৃপতিকে কর দিতে বাধ্য ছিলেন,—বৌধায়ন-সূত্রে ও গৌতম-সূত্রে তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তবে ব্রাহ্মণের পক্ষে সমুদ্র-গমন দোষাবহ ও দণ্ডার্হ বলিয়া বৌধায়ন উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। রামায়ণে, মহাভারতে এবং পুরাণাদির বিভিন্ন স্থানে বিদেশ-গমনের ও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রমাণ-পরম্পরা বিদ্যমান। বণিকগণ বিদেশ হইতে মহামূল্য পণ্যদ্রব্য আনিয়া নৃপতিকে উপঢৌকন দিতেন, রামায়ণে এতদ্বিবরণ দেখিতে পাই। মহাভারতে দ্রোণ-পর্ব্বে, কর্ণ-পর্ব্বে এবং শান্তি-পর্ব্বে, বিভিন্ন শ্লোকে, উপমার মধ্যে, সমুদ্র-পথে বৈদেশিক-বাণিজ্যের প্রসঙ্গ উল্লিখিত আছে। যথা,—

স্মৃতি-পুরাণাদিতে বাণিজ্যের কথা।

"নিমজ্জতস্তানথ কর্ণসাগরে বিপন্নাবো বণিজো যথার্ণবাৎ।
উদ্দধ্রিরে নৌভিরিবার্ণবাদ্রথৈঃ সুকল্পিতৈ দ্রৌপদীজাঃ স্বমাতুলান্॥"

"বণিক্ যথা সমুদ্রাদ্বৈযথার্থম্ লভতে ধনম্।
তথা মর্ত্ত্যার্ন বেজন্তোঃ কর্ম্মবিজ্ঞানতো গতিঃ॥"

অর্থাৎ,—'অতল সমুদ্র-মধ্যে পড়িয়া পোত যেরূপ বিপর্য্যস্ত হয়, কৌরব-সৈন্যগণ সেইরূপ বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল। সমুদ্র-মধ্যে অর্ণবপোত নিমজ্জমান হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণীর সাহায্যে আরোহিগণ যেরূপ রক্ষা পায়, দ্রৌপদীর পুত্রগণ আপনাদের মাতুলগণকে যানাদির সাহায্যে সেইরূপভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন। সমুদ্রপথে বৈদেশিক বাণিজ্যে বণিকগণ যেরূপ লাভবান হয়, কর্ম্ম এবং জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ তদ্রূপ মুক্তিলাভ করে।' এই সকল উপমায় সমুদ্রপথে বৈদেশিক-বাণিজ্যের প্রভাবের বিষয় বেশ উপলব্ধি হয়। বায়ু-পুরাণ, মার্কণ্ডেয়-পুরাণ, বরাহ-পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতিতেও এবম্বিধ উপমার অসদ্ভাব নাই। বাণিজ্যপোত বন্ধক রাখিয়া বণিকগণের ঋণগ্রহণের প্রসঙ্গ রামায়ণে এবং সংহিতা-শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। প্রাচীন সংস্কৃত-নাটকের মধ্যে সমুদ্রযায়ী বণিকগণের উল্লেখ দেখা যায়। বণিক ধনবৃদ্ধি সমুদ্র-যাত্রায় পোতমগ্নে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন এবং বৈদেশিক-বাণিজ্যে

---

* "পৃথিবীর ইতিহাস", তৃতীয় খণ্ড, ৪৬৮ম—৪৭০ম পৃষ্ঠা।

† বৃহৎ-সংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ের ৮ম শ্লোক, সপ্তম অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোক, নবম অধ্যায়ের ৩১শ শ্লোক, দশম অধ্যায়ের ৩য় ও ১০ম শ্লোক এবং চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ের ১২শ শ্লোক প্রভৃতি আলোচনা করিলে এই সকল বিষয় অবগত হওয়া যায়।

বিপুল বিত্ত অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সমুদ্র-পথে পোতমগ্নে ধনবৃদ্ধির মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার ধনৈশ্বর্য্য রাজকোষ-ভুক্ত হয়। কালিদাসের 'শকুন্তলা' নাটকে এতদ্বিবরণ বিবৃত আছে। নল-দময়ন্তীর প্রসঙ্গেও বৈদেশিক-বাণিজ্যের আভাস পাই। শ্রীহর্ষ-বিরচিত 'রত্নাবলী' নাটকে লিখিত আছে,—'রাজা বিক্রমবাহুর কন্যা সমুদ্রমধ্যে পোতভঙ্গে জলমগ্ন হন; সমুদ্রযায়ী বণিকগণ তাঁহাকে আপনাদের পোতে উত্তোলন করিয়া কৌশাম্বী নগরে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন।' দণ্ডী-বিরচিত "দশকুমারচরিতে" বণিক রত্নোদ্ভবের প্রসঙ্গে এবং যবন-গণের অর্ণবপোতে মিত্রগুপ্তের দ্বীপান্তরে গমন ব্যপদেশে, সমুদ্রপথে ভারতীয় বণিকগণের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কবি মাঘ-বিরচিত 'শিশুপালবধ' কাব্যে বৈদেশিক-বাণিজ্যের বিবরণ প্রাপ্ত হই। শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকা হইতে হস্তিনাপুরে যাইতেছিলেন, তিনি সেই বাণিজ্যের প্রভাব দেখিতে পাইয়াছিলেন। বৈদেশিক-পণ্যে পরিপূর্ণ অর্ণবপোতের আগমন এবং ভারতীয়-পণ্যে-পরিপূর্ণ অর্ণবপোতের বহির্গমন শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যক্ষীভূত হয়। * 'কথাসরিৎসাগরে', 'হিতোপদেশে', ভর্ত্তৃহরি-প্রণীত 'নীতিশতকে' এবং কাশ্মীরের ইতিহাস 'রাজ-তরঙ্গিণীতে' বৈদেশিক-বাণিজ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।

বৌদ্ধগ্রন্থে বাণিজ্য-প্রসঙ্গ।

বৌদ্ধদিগের পিটক ও জাতক † গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানেও ভারতের সহিত বৈদেশিক বাণিজ্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। "বিনয় পিটকে" প্রকাশ,—পুন্ন নামক জনৈক হিন্দু বণিক ছয় বার সমুদ্র-পথে বাণিজ্য-ব্যপদেশে গমন করিয়াছিলেন। 'দীর্ঘনিকায়' গ্রন্থ বৈদেশিক-বাণিজ্যের এক অভিনব কাহিনী প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতীয় বণিকগণ সমুদ্র-পথে পরিভ্রমণের সময় এক শ্রেণীর পক্ষীর সাহায্য গ্রহণ করিতেন। সমুদ্রের মধ্যে কোথায় জনস্থলী বা দ্বীপ আছে, পক্ষিগণ আকাশে উড্ডীয়মান হইয়া তাহা নির্দ্ধারণ করিত। যেদিকে কোনও দ্বীপের বা জনস্থানের সন্ধান পাইত, পক্ষিগণ সেই দিকে উড়িয়া অগ্রসর হইত এবং নাবিকগণ তাহাদের অনুসরণে পোত চালাইয়া যাইতেন। উড়িতে উড়িতে নিকটে যদি কোনও দেশের সন্ধান না পাইত, পক্ষিগণ পুনরায় অর্ণবপোতে ফিরিয়া আসিত। দুই এক ক্রোশের মধ্যে দেশ বা দ্বীপ থাকিলে, তাহারা সেই দিকেই ধাবমান হইত; আর ফিরিয়া আসিত না। 'বৌদ্ধজাতক' গ্রন্থ সমূহ খৃষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে বিরচিত হইয়াছিল বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। বাবিলন-দেশে ভারতীয় বণিকগণ সর্ব্বদা গতিবিধি করিতেন,—জাতক-গ্রন্থসমূহে তাহার বিবিধ বিবরণ পরিদৃষ্ট হয়। অধ্যাপক বুলার জাতক-গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি

---

* "বিক্রীয় দিশ্যানি ধনান্যুরুণি দ্বৈপ্যানসাবুত্তমলাভভাজঃ।
তরীষু তত্রত্যমফল্গুভাণ্ডং সাংযাত্রিকানাবপতোঽভ্যনন্দৎ॥"

† বুদ্ধদেবের জন্ম-বিবরণ-বর্ণন-ব্যপদেশে 'জাতক' গ্রন্থ লিখিত। কথিত হয়, মোক্ষধর্ম্ম-প্রচারের জন্য বুদ্ধদেব ৫৫০ বার ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হন। সেই প্রতি জন্মের বিবরণ লইয়া এক এক খানি জাতক-গ্রন্থ বিরচিত হয়। তদনুসারে জাতকের সংখ্যা—অন্যূন ৫৫০। কোনও জাতক পালি-ভাষায়, কোনও জাতক সিংহলী ভাষায় লিখিত। অনেক জাতক-গ্রন্থ এখন লোপ পাইয়াছে। জাতক-গ্রন্থের মধ্যে কয়েকখানি প্রসিদ্ধ জাতকের নাম,—অগস্ত্য, অপুত্রক, অখিশযা, শ্রেষ্ঠী, আয়ো, ভদ্রবর্গীয, ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণ, বুদ্ধবোধি, চন্দ্রসূর্য্য, সুপারগ, বৃষভ, ব্যাঘ্রী, শর্তপত্র, মহাজনক, বাভেরু, বলহাস, সমুদ্র-বাণিজ্য, সাঙ্খ্য, সুসন্ধি ইত্যাদি।

বলেন,—'বাভেরু-জাতকের বিষয় পাশ্চাত্য-দেশে প্রথমে অধ্যাপক মিনেফ প্রকাশ করেন। ঐ জাতকে বর্ণিত আছে,—হিন্দু-বণিকগণ বাভেরু দেশে অর্থাৎ প্রাচীন বাবিলন-রাজ্যে ময়ূর রপ্তানি করিতেন। জাতক-গ্রন্থের কাল-নির্দ্দেশ-ব্যপদেশে প্রতীত হয়,—খৃষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বেও পারস্য-উপসাগরে এবং তৎসন্নিহিত নদ-নদীর পথে পশ্চিম-ভারতের বণিকগণের বাণিজ্য-ব্যপদেশে সর্ব্বদা গতিবিধি ছিল। জাতক-গ্রন্থে যে ভাবে ঐ সকল ব্যবসা-বাণিজ্যের বিষয় লিখিত আছে, তাহা হইতে বুঝা যায়, জাতক-গ্রন্থ-রচনার পূর্ব্বকালেও ঐরূপ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচলন ছিল। ঐ সময়ে ভারতের বাণিজ্য-বন্দর-সমূহের মধ্যে সুর্পারক, ভারাকোচা (ভরুকচ্ছ) প্রভৃতির নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ।' * এক সময়ে ভরুকচ্ছ হইতে সাত শত বণিক একখানি অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া বিদেশ-যাত্রা করেন। একজন অন্ধ নাবিক সেই অর্ণবপোত পরিচালনা করিয়াছিলেন। 'সুর্পারক-জাতকে' সেই অর্ণবপোত বিপন্ন হওয়ার এবং সেই অন্ধ-নাবিকের দক্ষতার বিষয় লিখিত আছে। কয়েকজন বণিকের সহিত জনৈক রাজপুত্র চম্পানগরী হইতে সুবর্ণ-ভূমিতে বাণিজ্য জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন। সমুদ্রপথে সেই অর্ণবপোত ভগ্ন হওয়ায় তাঁহারা বিপন্ন হন ;—'মহা-জনক জাতকে' এতদ্বিবরণ পরিদৃষ্ট হয়। জনৈক দানশীল ব্রাহ্মণ সুবর্ণদেশে ধনান্বেষণে যাত্রা করেন। ব্রাহ্মণ বারাণসীর অধিবাসী ছিলেন। তিনি প্রতিদিন ছয় লক্ষ মুদ্রা দান করিতেন। মধ্য-সমুদ্রপথে তাঁহার অর্ণবপোত বিধ্বস্ত হয়। পরীরা তাঁহাদের অলৌকিক অর্ণবপোতে ব্রাহ্মণকে রক্ষা করেন। দেশে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে তিনি স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি-মাণিক্য, হীরক-জহরত প্রভৃতিতে আপনার তরণী পূর্ণ করিয়া আনেন। 'সাঙ্খ্যজাতকে' এই ব্রাহ্মণের বাণিজ্য-যাত্রার বিবরণ পরিবর্ণিত আছে। 'সুসন্ধি-জাতকে' প্রকাশ,—ভারতের পশ্চিমোপকূলস্থিত ভরুকচ্ছ উপকূল হইতে যাত্রা করিয়া বাণিজ্য-পোত-সকল ভারত-মহা-সমুদ্র অতিক্রমান্তে সুবর্ণভূমিতে অর্থাৎ ব্রহ্মদেশে, লঙ্কাদ্বীপে এবং ভারত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে গতিবিধি করিত। অন্যান্য জাতকের বিভিন্ন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়,—ভারতীয় বণিক-গণ বারাণসী হইতে বাবিলন-রাজ্যে পক্ষী রপ্তানি করিতেন ; উত্তর-ভারত এবং সিন্ধু-প্রদেশ হইতে শত শত অশ্ব বাবিলন-দেশে প্রেরিত হইত। বৌদ্ধদিগের জাতক-সমূহ আলোড়ন করিলে প্রতীত হয়,—আরবে, মিশরে, ফিনিসীয়ায় এবং বাবিলনে ভারতীয় বণিকগণ বাণিজ্য-সূত্রে সর্ব্বদা গতিবিধি করিতেন। বারাণসী, পাটলিপুত্র, সৌবীর,

---

* "The now well-known *Baveru-Jatak,* to which Prof. Minayef first drew attention, narrates that Hindu merchants exported peacocks to Baveru .....The story indicates that the Vanias of Western India undertook trading voyages to the shores of the Persian Gulf and of its rivers in the fifth, perhaps even in the sixth century B. C. just as in our days. This trade very probably existed already in much earlier times for the *Jataks* contain several other stories, describing voyages to distant land and perilous adventures by sea in which the names of very ancient western ports of Surparaka-Supara and Bharukachha-Broach are occasionally mentioned."—Prof. Buhler, *Jatak* III, Cambridge Edition.

কচ্ছ-উপসাগরস্থিত ভরুকচ্ছ, চম্পা প্রভৃতি নগরী সেই বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। সুর্পারকের অধিবাসী পুন্নের ও তদীয় ভ্রাতা চোলপুন্নের বাণিজ্য-ব্যপদেশেও বৌদ্ধ-প্রভাবের সময় ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের বিবিধ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিন শত বণিক সহ একখানি অর্ণবপোতে যাত্রা করিয়া চোলপুন্ন বিদেশ হইতে বহুপরিমাণ রক্তচন্দন কাষ্ঠ আনয়ন করিয়াছিলেন। সুর্পারক হইতে যাত্রা করিয়া তাঁহারা সমুদ্র-পথে উত্তর-কোশলে, শ্রাবস্তী নগরে এবং অন্যান্য-দেশে সর্ব্বদা গতিবিধি করিতেন। বঙ্গদেশের তাম্রলিপ্ত হইতে সমুদ্রপথে লঙ্কাদ্বীপে বাণিজ্যের বিবরণ বৌদ্ধ-গ্রন্থ-সমূহে দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধদেবের বিদ্যমানকালে ভারতবর্ষ হইতে সমুদ্রপথে পারস্যের বন্দর-সমূহে বাণিজ্য-ব্যপদেশে ভারতীয় বণিকগণের গতিবিধির বিষয় নানারূপে প্রতিপন্ন হয়।

ভারতীয় গ্রন্থ-সমূহে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য-সম্বন্ধে যে প্রমাণ-পরম্পরা প্রাপ্ত হই, প্রাচীন বৈদেশিক গ্রন্থকার-গণের গ্রন্থপত্রেও তদ্রূপ প্রমাণের অসদ্ভাব নাই। খৃষ্ট-জন্মের তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বেও ভারতীয় বণিকগণ সমুদ্রপথে দূরদূরান্তে বাণিজ্য করিয়াছিলেন, ইউরোপীয় মনীষিগণও এ কথা এখন স্বীকার করিতেছেন। ফিনিসীয়গণের, ইহুদীগণের, মিশরীয়গণের, আসিরীয়গণের, গ্রীকগণের এবং রোমের অধিবাসিগণের সহিত প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ কিরূপ বাণিজ্য-সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত ছিল, তদ্বিষয়ে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের কতকগুলি উক্তি এতৎপ্রসঙ্গে উল্লেখ করিতেছি। ডক্টর সেস, প্রাচীন আসিরীয়া-রাজ্যের প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানের জন্য অশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। বাবিলন-রাজ্যে ধর্ম্মের অভ্যুদয় ও বিকাশ সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তিনি বিশেষ যশস্বী হন। তাঁহার সেই গ্রন্থে প্রকাশ,—খৃষ্ট-জন্মের তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতের সহিত বাবিলনের বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল। কাল্‌ডিয়া ও বাবিলন রাজ্য যখন এক-সাম্রাজ্যভুক্ত হয়, উড়-বাগাস সেই যুক্ত-সাম্রাজ্যের সিংহাসন লাভ করেন। তিনিই ঐ যুক্ত-সাম্রাজ্যের প্রথম নৃপতি। উড়-নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। উড়-নগরীর ভগ্নাবশেষ মধ্যে ভারতীয় সেগুণ-কাষ্ঠ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ছোট-নাগপুরের ভূতপূর্ব্ব কমিশনর মিষ্টার হিউয়েট আদিম জাতি-সমূহের ইতিবৃত্ত-সংগ্রহের জন্য প্রখ্যাত। তিনি সিদ্ধান্ত করেন,—'উড়' রাজধানীতে প্রাপ্ত সেগুণ-কাষ্ঠগুলি ভারত হইতে সংগৃহীত হওয়াই সম্ভবপর। ঐ কাষ্ঠ মালবর-উপকূলের কোনও বন্দর হইতে সমুদ্রপথে বাবিলন-দেশে রপ্তানি হইয়াছিল। ঐ শ্রেণীর সেগুণকাষ্ঠ মালবর-উপকূলেই উৎপন্ন হয়। মালবর-উপকূলের কোনও বন্দর হইতে প্রাচীন-কালে ঐ কাষ্ঠ বাবিলনে রপ্তানি হইত এবং সেই কাষ্ঠের ব্যবসায়ে ভারতীয় বণিকগণ বিশেষ লাভবান হইতেন।' ভারতবর্ষ হইতে বাবিলনে 'মসলিন' রপ্তানি হইত,—ডক্টর সেস তাহারও প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। বাবিলনে মসলিন-বস্ত্রের 'সিন্ধু' নামের পরিচয় পাওয়া যায়। যে সকল বস্ত্র বাবিলনে ব্যবহৃত হইত, তাহার একটী তালিকায় মসলিনের ঐ সংজ্ঞা পাওয়া গিয়াছে। মসলিনের 'সিন্ধু' নাম দেখিয়া, উহা সমুদ্র-পথে সংবাহিত হইয়াছিল বলিয়া, হিউয়েট সিদ্ধান্ত করেন। তিনি বলেন,—'যদি জেন্দ-ভাষাভাষী বণিকগণ কর্ত্তৃক স্থলপথে উহা বাবিলনে সংবাহিত হইত, তাহা হইলে উহার নাম

বাণিজ্য-বিষয়ে বৈদেশিক গ্রন্থকারগণ।

'হিন্দ' হইত। কারণ, জেন্দভাষাভাষী ব্যক্তিগণ 'স' স্থানে 'হ' উচ্চারণ করিয়া থাকেন। সুতরাং সিন্ধু-নদের তীরস্থিত বণিকেরা সমুদ্রপথে বাবিলনে মসলিনের ব্যবসায়ে নিরত ছিলেন; আর তাঁহাদের নামানুসারেই মসলিনের নাম 'সিন্ধু' হইয়া পড়িয়াছিল।' * বাবিলনের সহিত ভারতের এই বাণিজ্য-সম্বন্ধ বিষয়ে মিঃ কেনেডি † বিশেষ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মত এই যে, খৃষ্ট-পূর্ব্ব সপ্তম এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতে বাবিলনের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। প্রমাণস্বরূপ তিনি কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। সম্রাট নেবুচাডনেজারের রাজধানীতে—বিরস্-নিমরুড সহরে, মিঃ রাসাম একখানি কড়িকাঠ দেখিয়াছিলেন। সেই কাঠখণ্ড ভারতের রপ্তানি বলিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করেন। সেই কড়িকাঠখানি আজিও 'ব্রিটিস মিউজিয়মে' ইংলণ্ডের যাদুঘরে রক্ষিত আছে। নেবুচাডনেজারের রাজত্ব-কাল—৬০৪ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ৫৬২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ। সুতরাং ঐ সময়ে ভারতের কাষ্ঠাদি ঐ দেশে রপ্তানি হইত, প্রতিপন্ন হয়। উড়-সহরে চন্দ্রদেবের মন্দিরের দ্বিতল অংশ নেবুচাডনেজার ও নেবোনিদাস কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ৫৫৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ৫৩৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের মধ্যে সেই মন্দির পুনর্নির্ম্মিত হওয়ার বিষয় প্রতিপন্ন হয়। সেই মন্দিরে মিষ্টার টেলার সেগুণ-কাষ্ঠের গুঁড়ির দুইটী স্তম্ভ দেখিতে পান। নেবুচাডনেজারের প্রাসাদে যেরূপ কাঠের কড়ি রাসেমের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, ইহাও তজ্জাতীয় কাষ্ঠ। ভারতবর্ষ হইতে বাবিলনে ঐ কাঠ যে রপ্তানি হয়, তদ্বিষয়ে কেহই সন্দেহ করেন না। ভারতের বিবিধ পণ্যদ্রব্য—চাউল, ময়ূর, চন্দন-কাষ্ঠ প্রভৃতি খৃষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রীসদেশে ভারতীয় নামে পরিচিত ছিল। ভারতের পশ্চিমোপকুলস্থিত কোনও বন্দর হইতে প্রথমে সমুদ্রপথে ঐ সকল সামগ্রী বাবিলনে রপ্তানি হইত। পরিশেষে ৪৮০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে বাবিলনের সহিত ভারতের সম্বন্ধ রহিত হওয়ায়, বণিকগণ ভারতবর্ষ হইতে পণ্য-দ্রব্যাদি বরাবর গ্রীসেই লইয়া যাইতেন। চাউল এবং ময়ূর ৪৬০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ৪৭০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে গ্রীসে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হওয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। ৪৩০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে গ্রীসের রাজধানী এথেন্স নগরে ভারতীয় পণ্য-দ্রব্য সাধারণ পণ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া মিষ্টার কেনেডি বলেন,—'খৃষ্ট-পূর্ব্ব সপ্তম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে বাবিলনের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্বন্ধের বিদ্যমানতা-বিষয়ে কোনই সংশয় থাকিতে পারে না। প্রধানতঃ, দ্রাবিড়ী বণিকগণ এই বাণিজ্য-কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। উত্তর-ভারতের আর্য্যজাতি যে এই বাণিজ্য-ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, তাহা নহে। ভারতীয় বণিকগণ বাণিজ্য-ব্যপদেশে ক্রমশঃ

---

* বাবিলনের সহিত ভারতের বাণিজ্য-বিষয়ে ডক্টর সেস প্রণীত (*Hibbert Lectures* for 1887 by Dr. Sayce on "the Origin and Growth of Religion among the Babylonians") হিব্বার্ট লেকচার (১৮৮৭) এবং ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে মিঃ হিউয়েট লিখিত প্রবন্ধ (Journal of the Royal Asiatic Society, 1888) দ্রষ্টব্য।

† কেনেডির অভিমত ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে (*The Early Commerce between India and Babylon* by Mr. J. Kennedy in the Journal of the Royal Asiatic Society, 1898) বাবিলনের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সংক্রান্ত প্রবন্ধে প্রকটিত আছে।

আরবে, আফ্রিকার পূর্ব্ব-উপকূলে এবং চীনদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন। বাবিলনেও তাঁহাদের বসবাস ছিল বলিয়া প্রতীত হয়।' * মিষ্টার রিজ ডেভিডস বৌদ্ধপ্রভাব-সময়ের ভারতবর্ষ সংক্রান্ত যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন,—তাহাতেও এবম্বিধ মত পরিব্যক্ত। † খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতে এবং অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে ভারতীয় বণিকগণ অনুকূল বায়ু-প্রবাহে অর্ণবপোত পরিচালনা করিয়া পাশ্চাত্য-দেশে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। প্রথমে সৌবীর বন্দর হইতে তাঁহাদের যাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়। পরিশেষে সুর্পারক ও ভরুকচ্ছ হইতেও বাণিজ্যপোত-সমূহ বাবিলনে এবং অন্যান্য বাণিজ্যস্থানে গতিবিধি করিত। ঐ সকল ভারতীয় বণিকগণকে রিজ ডেভিডস্ দ্রাবিড়-দেশীয় বণিক বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বণিকগণ প্রধানতঃ গজদন্ত, বানর, ময়ূর এবং চাউল প্রভৃতির ব্যবসায় করিতেন। ঐ সকল সামগ্রীর সংস্কৃত বা পালিভাষার নাম—বিদেশে প্রচলিত ছিল না; তামিল ভাষার শব্দ-সংজ্ঞায় ঐ সকল সামগ্রী সংজ্ঞিত হইত। সুতরাং তামিল-ভাষাভাষী দ্রাবিড়ীগণ বৈদেশিক বাণিজ্যের নায়ক ছিলেন। ইহাই রিজ ডেভিডসের মত। 'বম্বে সিটি গেজেটিয়ার' গ্রন্থে মিষ্টার এ এস টি জ্যাক্সনও এবম্বিধ মতেরই পোষকতা করিয়া গিয়াছেন। ঐতিহাসিক এল্‌ফিন্‌ষ্টোন বলেন,—'মনুর স্মৃতি যত দিনের, তত দিন পূর্ব্ব হইতে ভারতবাসীরা সমুদ্র-পথে গতিবিধি করিতেন ও বাণিজ্যে অভ্যস্ত ছিলেন।' ‡ অধ্যাপক ম্যাক্সডঙ্কার প্রতিপন্ন করিয়াছেন,—'খৃষ্ট-জন্মের দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও প্রাচীন ভারতবর্ষ অর্ণবপোত-নির্ম্মাণে পারদর্শী ছিল। সমুদ্রপথে ভারতের বাণিজ্য দিগ্দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল।' § মিষ্টার মাণ্ডার বলেন,—'সেলিউকাইড-বংশের রাজত্ব-কালে সিরিয়ার সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্বন্ধের প্রমাণ পাওয়া যায়।' ¶ ভারতের লৌহ, রঙ্গীণ বস্ত্র এবং মূল্যবান পোষাক-পরিচ্ছদ ভারতবর্ষ হইতে অর্ণবপোত-সাহায্যে বাবিলনে ও টায়ার নগরে সর্ব্বদা রপ্তানি হইত। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন আরও লিখিয়া গিয়াছেন,—'প্রথম টলেমি-গণের রাজত্বকালে ভারতীয় বণিকগণের বাণিজ্য-প্রভাব মিশরে বিশেষভাবে বিস্তৃত হইয়াছিল।' ‖

---

* এতদ্বিষয়ে কেনেডির উক্তি,—"The evidence warrants us in the belief that maritime commerce between India and Babylon flourished in the seventh and sixth, but more specially in the sixth century B. C. It was chiefly in the hands of Dravidians although Aryans had a share in it; and as Indian traders settled afterwards in Arabia and in the coast of Africa, and as we find them settling at this very time on the coast of China, we cannot doubt that they had their settlements in Babylon also."—*Journal of the Royal Asiatic Society*, 1898.

† Rhys Davids' *Budhist India.*

‡ The Hindus navigated the ocean as early as the age of the Manu's Code,—Elphinstone's *History of India.*

§ Max Dunker's *History of Antiquity*, vol. iv.

¶ "In the reign of Seleucidæ, too, there was an active trade between India and Syria".—Maunder's *Treasury of History.*

‖ "The extent of the Indian trade under the first Ptolemies is a well-known fact in History."—Elphinstone's *History of India.*

ভারতবর্ষে যেমন মন্বাদির-সংহিতা সর্ব্বমান্য, প্রাচীন ইহুদী-জাতির মধ্যে মোজেস্-প্রবর্ত্তিত বিধিবিধান তদ্রূপ সমাদৃত। খৃষ্ট-জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী ১৪৯১ হইতে ১৪৫০ বর্ষের মধ্যে মোজেসের বিদ্যমানতার বিষয় অনেকে সপ্রমাণ করেন। সেই মোজেসের সময়ে ভারতবর্ষ হইতে বহু মূল্যবান প্রস্তর-সমূহ ইহুদী-দিগের দেশে রপ্তানী হইত। উচ্চ-পদস্থ ধর্ম্মযাজকগণ সেই সকল মূল্যবান প্রস্তর গলদেশে ধারণ করিতেন। * বাইবেলের অন্তর্গত 'জেনিসিস' গ্রন্থাংশে উল্লেখ আছে,—'একদল বণিক মিশরে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন; তাঁহাদের সঙ্গে ভারত-জাত সুগন্ধ বৃক্ষ-ত্বক, মসলা ও রঞ্জন প্রভৃতি পণ্য-দ্রব্য ছিল। জিলেড হইতে তাঁহারা উষ্ট্রপৃষ্ঠে ঐ সকল দ্রব্য মিশরে লইয়া যান।' † ভারতের পণ্য-দ্রব্য প্রাচীন সভ্য জনপদ-সমূহে কিরূপভাবে সংবাহিত হইত, বাইবেলের অন্যান্য অংশেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইজরাইলের রাজা সলোমন এবং টায়ারের রাজা হীরাম সমসাময়িক বলিয়া পরিচিত। ১০১৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে সলোমনের এবং ১০০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে হীরামের বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন হয়। তাঁহাদের রাজধানীতে ভারতবর্ষ হইতে গজদন্ত, চন্দন-কাষ্ঠ, বানর, ময়ূর, স্বর্ণ, রৌপ্য, বহুমূল্য প্রস্তর প্রভৃতি বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইত। কিছুদিন পূর্ব্বে নীলকরগণ এবং অধুনা চাকরগণ যেমন ভারতবর্ষে আসিয়া নীলের ও চায়ের চাষ-আবাদ করিয়া লাভবান হন, 'জেনিসিস্' গ্রন্থের বর্ণনায় আভাস পাই,—মিডিয়া-নাইট্ বংশের বণিকগণ এবং গোষ্ঠীপতি জেকবের বংশধরগণ ভারতবর্ষে আসিয়া দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে নানারূপ মসলার চাষ-আবাদ করিয়া লাভবান হইয়াছিলেন। ‡ টায়ারের রাজা হীরাম এবং ইজরাইলের রাজা সলোমন বাণিজ্য-ব্যপদেশে যাহাদিগকে এ দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন, ক্রমশঃ তাহারাই চাষ-আবাদ আরম্ভ করিয়া বসিয়াছিল। এদেশ

খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থে ভারতের বাণিজ্য-প্রসঙ্গ।

* "Even in the Mosaic period (1491-1450 B. C.) precious stones which were to a great extent a speciality of India and the neighbouring countries appear to have been wellknown and were already highly valued. It is probable that some of the stones in the 'breast-plate' of the high priest may have come from the far East"—The *Indian Antiquary*, 1884: *A Geologist's Contribution to the History of Ancient India*, by Professor V. Ball, M. A.

† Genesis, xxxvii, 25.

‡ Cf. *A Comparative Grammar of the Dravidian Languages* by Dr. Caldwell and the *Indian Antiquary*, vol. viii, in which the Rev. T. Foulkes writes :—"The fact is now scarcely to be doubted that the rich Oriental merchandise of the days of King Hiram and King Solomon had its starting place in the sea-ports of the Dakhan; and that with a high degree of probability some of the most esteemed spices which were carried into Egypt, by the Medianitish merchants of the *Genisis* xxxvii, 25, 28, and by the sons of patriarch Jacob (Gen. xxliii, 11.), had been cultivated in the spice gardens of the Dekhan."

হইতে যে যে দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হইত, তাহার নানা পরিচয় খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। এক সময়ে রাজা সলোমনের জন্য বণিকগণ ৪২০ ট্যালেণ্ট * স্বর্ণ ভারতবর্ষের 'ওফির' বন্দর হইতে লইয়া গিয়াছিলেন। রাজা হীরামের বাণিজ্যপোত 'ওফির' বন্দর হইতে স্বুবর্ণ ক্রয় করিয়াছিল এবং বহু পরিমাণ বৃক্ষ ও মূল্যবান প্রস্তর ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়াছিল। বাইবেলের অন্তর্গত 'প্রথম কিংস্' গ্রন্থাংশের নবম ও দশম অধ্যায়ে এতদ্বিবরণ লিখিত আছে। † 'ইজিকেল' গ্রন্থাংশে লিখিত আছে,—বণিকগণ ভারতবর্ষ হইতে বিবিধ পণ্যদ্রব্য লইয়া গিয়াছিল; সেই সকল পণ্যদ্রব্যের মধ্যে নীলবর্ণ বস্ত্র, জরির কাজ করা মূল্যবান পরিধেয়, গজদন্ত ও আবলুস্ কাষ্ঠ ছিল। ‡ ভারতের যে বন্দর হইতে ঐ সকল দ্রব্য রপ্তানি হইত, সেই বন্দরের নাম—বাইবেলের অন্তর্গত 'প্রথম কিংস'-গ্রন্থে 'ওফির' বলিয়া উল্লিখিত আছে। 'ওফিরের' বাণিজ্যে তাঁহারা বিশেষ লাভবান্ ছিলেন। ঐ বন্দর হইতে তাঁহারা কি কি পণ্য প্রাপ্ত হইতেন, ওল্ড টেষ্টামেণ্টের অন্তর্গত 'কিংস' প্রভৃতি গ্রন্থাংশেও তাহার পরিচয় পাই। এখন দেখা যাউক, ভারতের কোন্ বন্দর 'ওফির' নামে পরিচিত হওয়া সম্ভবপর? এ বিষয়ে নানা মতান্তর আছে। পূর্ব্বে কেহ কেহ আফ্রিকা-মহাদেশে 'ওফির'-বন্দরের স্থান-নির্দ্দেশ করিতেন। কিন্তু পাশ্চাত্য-পণ্ডিত-গণেরই গবেষণা-ফলে এখন সে মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ওফির-বন্দরের অবস্থান-সম্বন্ধে এখন দ্বিবিধ মত প্রচলিত। ঐ বন্দর যে ভারতবর্ষেরই একটী বন্দর,—তদ্বিষয়ে এখন আর মতান্তর নাই। তবে এক পক্ষ বলেন,—ঐ বন্দর ভারতের পশ্চিমোপকূলে অবস্থিত ছিল; অপর পক্ষের মতে—'ওফির' ভারতের পূর্ব্বোপকূলের একটী প্রসিদ্ধ বন্দর। টলেমি তাঁহার গ্রন্থে 'আভিরিয়া' নামক ভারতের এক প্রাচীন প্রদেশের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সেই প্রদেশ সিন্ধু-নদের মোহানায় অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমানে বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীতে কাথিয়াওয়াড় প্রদেশে 'আভীর' নামক জাতির বসতি আছে। টলেমি সেই আভীর জাতিকে লক্ষ্য করিয়াই তাহাদের বসতি-স্থানকে 'আভিরিয়া' বলিয়া থাকিবেন। আর সেই 'আভীর' জাতির বাসস্থানই বাইবেলে 'ওফির' নাম পরিগ্রহ করিয়া থাকিবে। অধ্যাপক লাসেন প্রকারান্তরে এই মতেরই পরিপোষক। তিনি বাইবেলোক্ত 'ওফিরকে' ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের একটি বন্দর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মিস ম্যানিঙের

* ট্যালেণ্টের (Talent) মূল্য নানারূপ নির্দ্দিষ্ট হয়। হিব্রু-গ্রন্থোক্ত টেলেণ্টের ওজন ৯৩৮০ পাউণ্ড। উহার মূল্য ৩৪০ হইতে ৩৯৬ পাউণ্ড স্বর্ণমুদ্রা। এখন পাউণ্ডের দাম পনের টাকা; সুতরাং এক টেলেণ্ট স্বর্ণের মূল্য কত হয় (৩৯৬×১৫=৫৯৪০ টাকা) বুঝিয়া দেখুন। এই হিসাবে ৪২০ টেলেণ্ট স্বর্ণে প্রায় ষোল লক্ষ মুদ্রা দাঁড়াইতে পারে। হিব্রু ট্যালেণ্ট ভিন্ন 'আটিক' ট্যালেণ্ট এক সময়ে প্রচলিত ছিল। তাহার মূল্য ২৪৩ পাউণ্ড ১৬ শিলিং।

† "And they came to Ophir, and fetched from thence gold, four hundred and twenty talents, and brought it to King Solomon. And the navy also of Hiram, that brought gold from Ophir, brought in from Ophir great plenty of almug trees and precious stones."—*Kings* ix. 26, 27, 28, x. II.

‡ "These were thy merchants in all sorts of things, in blue clothes, and broidered work, and in chests of rich apparel, bound with cords."—*Ezekiel*, xxvii, 24. They brought thee for a present horns of ivory and ebony." (*Ibid*) 15.

মতেও ঐ বন্দরের অবস্থিতি-স্থান—ভারতের পশ্চিম উপকূলে। * পশ্চিমোপকূলে 'আভীর' (ওভির) বন্দরের অবস্থিতি-সম্বন্ধে পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থেও একটী প্রমাণ পাই। সেই 'আভীর' দেশ বা বন্দর কোঙ্কণ-দেশের দক্ষিণে তাপ্তী-নদীর পশ্চিম-তীরে বিন্ধ্যশৈলান্তর্গত প্রদেশে অবস্থিত ছিল। যথা,—"শ্রীকোঙ্কণাদধোভাগে তাপীতঃ পশ্চিমে পরে। আভীর-দেশো দেবেশি বিন্ধ্যশৈল ব্যবস্থিতঃ॥" বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাই,—'আভীর' নামক এক ম্লেচ্ছ-জাতি সিন্ধু-নদের উপকূলবর্ত্তী প্রদেশে বসতি করিত। তাহারা শ্রীকৃষ্ণের রমণীদিগকে অপহরণ করে। শকগণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে সিন্ধু-প্রদেশে 'আভীর'গণ রাজত্ব করিত। তখন তাহাদের রাজধানী 'আভীর' নামে পরিচিত ছিল। এ সকল বিষয় আলোচনা করিলে 'আভীর' বা 'ওফির' বন্দরকে ভারতের পশ্চিমোপকূলের বন্দর বলিয়াই মনে হয়। যাঁহারা ভারতের পূর্ব্বোপকূলে 'ওফির' বন্দরের স্থান নির্দ্দেশ করেন, অতঃপর তাঁহাদের যুক্তি প্রদর্শন করিতেছি। সুবর্ণ এবং চন্দনকাষ্ঠ প্রভৃতি পণ্য-দ্রব্য পশ্চিমঘাট গিরিমালার অন্তর্ব্বর্ত্তী স্থানে উৎপন্ন হয় না। তামিল-রাজ্যের সীমানার মধ্যে স্মরণাতীত কাল হইতে সুবর্ণের ও চন্দন-কাষ্ঠের উৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সুবর্ণের ও চন্দন-কাষ্ঠের আকর-স্থান মলয়-পর্ব্বত—তিন্নেভেল্লি এবং ত্রাবাঙ্কুর রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। সুতরাং উহারই নিকট 'ওফির' বন্দরের অস্তিত্ব অনুসন্ধান করাই সমীচীন। 'ওভারি' (উভারি) নামে একটি প্রাচীন বন্দরের অস্তিত্ব,—তামিল-রাজ্যে অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায়। ঐ বন্দর তুতিকোরিন সহরের দক্ষিণে অবস্থিত। এখন সে বন্দর কতকগুলি জালিকের বাসস্থান বলিয়া পরিচিত। পাণ্ড্য-বংশীয় রাজগণের প্রধান নগরী 'কোরকাই'—ঐ বন্দরের অনতিদূরে অবস্থিত ছিল। 'কোরকাই' নগরীর ধ্বংসাবশেষ দর্শনে মনে হয়, 'উভারি' ঐ নগরীর সান্নিধ্য-বন্দররূপে এককালে বৈদেশিক বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। খৃষ্ট-পূর্ব্ব নবম শতাব্দীতে, মাদুরায় রাজধানী প্রতিষ্ঠা হইবার পূর্ব্বে, 'কোরকাই'—পাণ্ড্য-রাজবংশীয়গণের রাজধানী এবং দক্ষিণ-ভারতের বাণিজ্য-কেন্দ্র বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইত। তাম্রপর্ণী বা পোরুনাই নদীর তীরে বর্ত্তমান 'কোরকাই' পল্লী অবস্থিত। প্রাচীন রাজধানীর ভগ্নাবশেষ দেখিলে প্রতীত হয়,—পূর্ব্বে 'কোরকাই' সমুদ্র-তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখন সমুদ্র হইতে সাত মাইল দূরে উহা প্রাচীন গৌরবের ক্ষীণ-স্মৃতি রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। বর্ত্তমান 'উবারি' (তামিল-ভাষায় 'উবারি' শব্দের অর্থ বন্দর) সেই প্রাচীন রাজধানীর 'পাউক্' বা সান্নিধ্যে অবস্থিত ছিল। 'উবারি' বন্দরের চতুঃপার্শ্বে অজস্র বালুকা-স্তূপ দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে এই 'উবারি' বন্দরে স্বর্ণের খনি ছিল এবং সেই খনি হইতে স্বর্ণ-আহরণের জন্য জন-সমাগম হইত। আজি পর্য্যন্ত এই কিংবদন্তী ঐ প্রদেশে প্রচলিত আছে। এখনও বর্ষার সময় বালুকা-স্তূপ বর্ষার জলে বিধৌত হইতে আরম্ভ হইলে, পল্লীবাসী কৃষকেরা সুবর্ণ-আহরণ-উদ্দেশে ঐ বালুকা-ক্ষেত্রে গমন করে। সময়ে সময়ে তাহারা ঐ বালুকা-স্তূপ হইতে স্বর্ণ-রেণু-সমূহ সংগ্রহ করিতেও সমর্থ হয়। ফলতঃ, খৃষ্ট-পূর্ব্ব দশম শতাব্দীতে পাণ্ড্য-বংশীয় রাজগণ যখন দাক্ষিণাত্যে প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, সলোমনের বাণিজ্য-

---

* *Ancient and Mediæval India* vol. ii.—Mrs. Manning.

পোত সেই সময়ই 'উবারি'-বন্দরে গতিবিধি করিয়াছিল। রাজা সলোমন খৃষ্ট-পূর্ব্ব দশম শতাব্দীতে 'জুডিয়া'-প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। 'উবারি' বন্দর সেই সময়ই প্রতিষ্ঠান্বিত ছিল। সুতরাং 'উবারি' নামই বণিকগণের ভাষায় 'ওফির' রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে;—ইহাই সিদ্ধান্ত হয়। * পশ্চিম-উপকূলের এবং পূর্ব্ব-উপকূলের—উভয় উপকূলের বন্দরদ্বয়ের কোন্ বন্দর হইতে সলোমনের ও হীরামের বাণিজ্যপোত পণ্য-দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহা স্থির নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। উভয় পক্ষেরই প্রবল প্রমাণ বিদ্যমান। কিন্তু এই উপলক্ষে আমরা একটি অভিনব সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। তামিল-ভাষার 'উবারি' শব্দের অর্থের বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া, সেই সিদ্ধান্তের বিষয়ই মনে উদয় হয়। 'উবারি' শব্দের সাধারণ অর্থ—বন্দর। ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন রাজ্য ছিল, ভারতবর্ষের ধনৈশ্বর্য্যের ঔজ্জ্বল্যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ যখন মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল; তখন ভারতবর্ষের বহু বন্দর প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিল। তখন ভারতের দিকে দিকে বাণিজ্য-বন্দরের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল; তখন বিভিন্ন বন্দর হইতে বিভিন্ন দেশে পণ্য-দ্রব্য রপ্তানি হইতেছিল; তখন ভারতীয় বন্দর মাত্রই 'উভারি' এবং তাহার রূপান্তরে 'উভারি', 'উফারি' ও ক্রমশঃ 'ওফির' সংজ্ঞায় সলোমনের রাজ্যে ও হীরামের রাজ্যে পরিচিত হইয়াছিল। আমাদের তাই মনে হয়,—ভারতীয় বন্দর-মাত্রকেই হিব্রু-ভাষায় 'ওফির' বলা হইত। বাইবেলে যে 'ওফির' শব্দ আছে, তাহার অর্থ ভারতীয় বন্দর বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি। সে বন্দর—সৌবীর হইতে পারে, কচ্ছ-উপসাগরের নিকটস্থ 'আভীর' দেশও হইতে পারে, অথবা তামিল-দেশান্তর্গত 'উবারিও' হইতে পারে। ফলতঃ, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বন্দর হইতে পুরাকালে পাশ্চাত্যদেশে বিভিন্ন পণ্য-দ্রব্য রপ্তানি হইত, বাইবেলের বর্ণনায় তাহাই আমরা বুঝিতে পারি।

ভারতবর্ষ যে সকল পণ্য-দ্রব্যের উৎপত্তি-স্থান, বিদেশে রপ্তানি হইয়া সেই সকল পণ্য-দ্রব্য কি নামে পরিচিত হইয়াছিল, তদ্বিষয় আলোচনা করিলেও প্রাচীন-ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রভাবের বিষয় উপলব্ধি হইতে পারে। ভারতবর্ষ—ময়ূরের উৎপত্তি-স্থান। ভারতবর্ষ হইতে ময়ূর বিদেশে রপ্তানি হইত। সলোমন ও হীরাম ভারতবর্ষ হইতে ময়ূর লইয়া গিয়াছিলেন। তখন ময়ূর কি নামে পরিচিত হইয়াছিল? অধ্যাপক লাসেন বলেন,—ময়ূরের সংস্কৃত নাম ব্যবহৃত হইত।

পণ্য-দ্রব্যের সংজ্ঞার সাদৃশ্য।

* 'ওফির'-বন্দরের স্থান-নির্দ্দেশ-সম্বন্ধে 'তামিলিয়ান য়্যান্টিকোয়ারী' গ্রন্থে এই মত প্রকাশ পাইয়াছে। বিবিধ যুক্তি-তর্কের অবতারণার পর লেখক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—"The '*Ophir*' of the Hebrew text should be no other place than Ovari (correctly 'Uvari'), 'sea-port', now a small fishing village to the south of Tuticorin, but a sea-port, in by gone days near Korkai, the older metropolis of the Pandiyan Kings. The late Mr. Thomas Nadar, M. A., an eminent Sanskrit Scholar, has also expressed the same opinion in an article contributed by him to the *Christian College Magazine*, (Vol xii, No. 9,) Korkai 'long the emporium of South Indian trade' was the capital of the Pandiyan dynesty till the 9th century B. C, when Madura was built."—*The Tamilian Antiquary, No 1.*

অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার প্রভৃতিও সেই মতের পরিপোষক। * দ্রাবিড়ী-ভাষার ব্যাকরণ গ্রন্থে ডক্টর কল্ডওয়েল যদিও অন্তমত প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু হিব্রু-ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদিতে ব্যবহৃত ময়ূরের প্রতিশব্দ যে ভারতীয় শব্দের রূপান্তর, তাহা তিনি একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কল্ডওয়েল বলেন,—হিব্রুভাষায় লিখিত 'কিংস' এবং 'ক্রনিকেল্‌স্' গ্রন্থে ময়ূরের প্রতিশব্দে 'টুকি' (Tuki) শব্দ দৃষ্ট হয়। 'তামিল মলয়ালম' ভাষায় ময়ূরের নাম—'টোকে' (Tokei)। ঐ 'টোকে' শব্দ হইতেই যে হিব্রু-ভাষার 'টুকি' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, সহজেই উপলব্ধি হয়। ডক্টর কল্ডওয়েল এইরূপ আরও কয়েকটী শব্দের সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন। অগুরু-চন্দনের উৎপত্তি-স্থান—ভারতবর্ষের মালবর-উপকূল। তামিল-মলয়ালম ভাষায় উহার নাম—'আঘিল'। হিব্রুভাষায় লিখিত বাইবেলে ঐ অগুরু-চন্দন 'আহালিম', 'আহালোৎ' প্রভৃতি শব্দে ব্যক্ত হইয়াছে। কল্ডওয়েলের মতে,—'আঘিল' শব্দ হইতেই 'আহালিম', 'আহালোৎ' প্রভৃতি শব্দের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। সংস্কৃত 'কর্পূর' শব্দ—তামিল-মলয়ালম ভাষায় 'করুপ্পা' অথবা 'কাপূ'' রূপ পরিগ্রহ করিয়া আছে। টেসিয়াসের 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থে কর্পূরের নাম—'কার্পিয়ন' দেখিতে পাই। কেহ কেহ বলেন,—সংস্কৃত 'কর্পূর' হইতে 'কার্পিয়ন' শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু কল্ডওয়েল বলেন,—'করুপ্পা বা কাপূ'' হইতেই 'কার্পিয়ন' নামের উৎপত্তি। দারুচিনির হিব্রু নাম—'কিনামন'। টেসিয়াস 'দারুচিনির' ঐ প্রতিশব্দই ব্যবহার করেন। ঐ হিব্রু-শব্দও যে তামিল-মলয়ালম শব্দের রূপান্তর, তাহাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। প্রাচীন গ্রীসে এবং মিশরে গজদন্তের প্রচলন ছিল। কিন্তু একটু অনুসন্ধান করিলে প্রতীত হয়,—গজ-দন্তের আদিভূত এই ভারতবর্ষ। গজদন্তের নাম—সংস্কৃত-ভাষায় 'ইভ'। মিশরে ঐ নাম—'এবু' রূপে উচ্চারিত হয়। অধ্যাপক লাসেন নির্দ্ধারণ করেন,—সংস্কৃত ভাষার 'ইভ' শব্দ মিশরে গিয়া 'ইবু' মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। † গ্রীস্-দেশে গ্রীক-ভাষায় সেই 'ইভ' শব্দ রূপান্তরে আবার 'ইলেফাস' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আরাবেলার যুদ্ধের পূর্ব্বে, গজারোহী সৈন্য সহ দারায়ুসকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, গ্রীকগণ হস্তী দেখিয়াছিলেন কি না—প্রমাণ নাই। অথচ গ্রীসে তখন গজদন্ত প্রচলিত ছিল। ভারতীয় বণিকগণ মিশরে গজ-দন্তের ব্যবসায় চালাইতেন। আফ্রিকার

---

* "The word for peacock in Hebrew is universally admitted to be foreign; and Gesenius, Sir Emerson Tennant, and Prof. Max Muller appear to agree with Prof. Lassen in holding that this word as written in *Kings* and *Chronicles* is derived from the *Sanskrit* Language"—Mrs. Manning's *Ancient and Mediæval India.*

† "The Sanskrit name for a domestic elephant is *ibha* and in the bazars of India *ibha* was the name by which the elephant's tusks were sold."..." In ancient Egypt, ivory was known by *Ebu.* Professor Lassen thinks that the Sanskrit name *iva* might easily have reached Egypt through Tyre, and become the Egyptian *Ebu.* It is believed that by this name, or by words derived from it, ivory must have been introduced into Egypt and Greece. Although by what process *iva* was changed into the Greek *elephas,* is not satisfactorily explained." Cf. *Ancient and Mediæval India,* vol II, *Alterthumkunde* vol. I and *Hindu Superiority.*

অরণ্য-মধ্যে হস্তী বিদ্যমান থাকিলেও মিশরীয়গণ হস্তীকে কখনও পোষ মানাইতে পারেন নাই। প্রাচীন-মিশরে হস্তীর ব্যবহার কেহই জানিত না ; অন্ততঃ তদ্বিষয়ের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। * সুতরাং পাশ্চাত্য-দেশে গজদন্তের প্রবর্ত্তনা—ভারতবর্ষ হইতেই হইয়াছিল বলিতে হয়। তামিল-ভাষায় গজদন্তের প্রতিশব্দ 'সেন-হাব্বিম' ; ঐ শব্দ যে হিব্রু-ভাষায় 'সেন-আ-হিব্বিম' রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহাও মনে করা যাইতে পারে। সংস্কৃত 'ইভ' শব্দের রূপান্তরেও 'হিব্বিম' হওয়া অসম্ভব নহে। ইংরাজীর 'আইভরি'—সেই রূপান্তরের চরম অবস্থা। সংস্কৃতে 'কপি' শব্দে বানর বুঝায়। হিব্রু-ভাষায় দাঁড়াইয়াছে—'কোফ'। তাহারই চরম পরিণতি—'এপ'। † কোন্ দেশের কত দৃষ্টান্ত দেখাইব? ডক্টর রয়েল প্রাচীন হিন্দু-গণের ভৈষজ্য-তত্ত্ব গ্রন্থে ‡ মিশরে ভারতের বাণিজ্য-বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ভারতের 'বলা' বা 'বেলেড়া' গুল্ম-বিশেষ হইতে রঞ্জন প্রস্তুত হয়। মিশরে রঞ্জনের নাম—'বল'। 'বলা' নামই যে মিশরে 'বল'-রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে,—ডক্টর রয়েলের ইহাই সিদ্ধান্ত। তামিল-ভাষায় 'উড়' শব্দের অর্থ—'নগর', রাজধানী। কাল্‌ডীয়-গণ আপনাদের রাজধানীর নাম রাখিয়াছিল—উড়। ব্যাবিলন যুক্ত-রাজ্যের রাজধানীর নামও ছিল—'উড়'। রোম-রাজ্যের নগর বা রাজধানীর সংজ্ঞা—উর্ব্‌স্' (Urbs)। এতদ্বিষয় আলোচনা করিলেও ঐ সকল দেশে তামিল-দেশের প্রভাব প্রতিপন্ন হয়। গ্রীক-ভাষায় চাউল, দারুচিনি, আদা প্রভৃতির যে প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয়, তৎসমুদায়ও তামিল শব্দের রূপান্তর বলিয়া মনে হইতে পারে। গ্রীক-ভাষায় চাউলের প্রতিশব্দ—'ওরিজা' (Oryza), দারুচিনির প্রতিশব্দ—'কার্পিয়ন' (Karpyon), আদার প্রতিশব্দ—'জিঞ্জিবার' (Zingiber) ; তামিল-ভাষায় চাউল—'ওরিচি', দারুচিনি—'কারাপা', আদা—'ইঞ্চিবার' প্রভৃতি রূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষোৎপন্ন নীল পর্ত্তুগালে 'ওনীল' এবং আরবে 'নীল' নাম পরিগ্রহ করিয়া আছে। পিপ্পলী বা পিপুলের লাটিন নাম—'পিপার' (Piper)। থিওফ্রেষ্টাসের সময়ে প্রচুর পরিমাণে পিপ্পলী পারস্যের মধ্য দিয়া ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি হইত ;—পিপার নামে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। 'ওল্ড টেষ্টামেণ্টের' অন্তর্গত 'বুক-অব-এস্থার' গ্রন্থে দেখিতে পাই,—'পার্শিপোলিস্' প্রাসাদে শ্বেত-বর্ণের ও নীল-বর্ণের পর্দা ব্যবহৃত হইত। ঐ পর্দা কাপাস-বস্ত্রের নির্ম্মিত। 'এস্থার' গ্রন্থে 'কার্পাস' (Karpas) শব্দের ব্যবহার আছে। ঐ হিব্রুশব্দ যে সংস্কৃত-মূলক, তাহা

---

* Mrs. Manning's *Ancient and, Mediæval India*, vol. II.

† অনুসন্ধিৎসু পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণই আজিকালি এ সকল তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিতেছেন। যথা,—"The Hebrew words are evidently of foreign, and probably of Indian, origin ; thus *Kof*, 'ape', seems to be the Sanskrit *Kapi* ; *thukki*, a peacock, is probably the Tamil *tokei*, and *shen-habbim*, 'ivory', is explained by Gesenius as a contraction for *shen-a-hibbim*, the latter part being the Sanskrit *ibha*, 'an elephant', with the Hebrew article prefixed".—Prof. E. B. Cowells' Note in *Elphinstone's History of India*.

‡ Dr. Royle's *Ancient Hindu Medicine*, "Myrrh."

বলাই বাহুল্য। ভারতবর্ষোৎপন্ন দ্রব্যের সংজ্ঞার এইরূপ সাদৃশ্য অনুধাবন করিয়া, ঐ সকল সামগ্রী বিদেশে রপ্তানি হইয়া ভারতীয় নাম রূপান্তরে পরিগ্রহ করিয়া আছে বলিয়া অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন।

বাবিলন, ফিনিসীয়া, মিশর, গ্রীস, রোম প্রভৃতি জনপদ-সমূহে ভারত হইতে নানা পণ্য-দ্রব্য রপ্তানি হইত। সেগুণ প্রভৃতি বিবিধ মূল্যবান কাষ্ঠ, চাউল প্রভৃতি খাদ্য-শস্য, নানাবিধ মশ্‌লা, স্বর্ণ-রৌপ্য প্রভৃতি ধাতব পদার্থ, নানা শ্রেণীর মূল্যবান বস্ত্র ও সুগন্ধ দ্রব্য—সেই সকল পণ্যদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভারতজাত রেশমী-বস্ত্র তৎকালে পাশ্চাত্য-দেশে বিশেষ সমাদরে পরিগৃহীত হইত। রোম-নগরী যখন ইউরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্রভূমি, রোমের রমণীগণের নিকট তখন ভারতজাত রেশমী-বস্ত্রের আদরের ইয়ত্তা ছিল না। তৎকালে রোম-নগরে সুবর্ণের ওজনে রেশমীবস্ত্র বিক্রীত হইত। * এখন যেমন বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতের অর্থ-শোষণ হইতেছে বলিয়া অনেকে অনুযোগ করেন, রোমের অর্থ ভারতে চলিয়া যাইতেছে বলিয়া রোমের হিতাকাঙ্ক্ষিগণ এক সময়ে সেইরূপ অনুযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক প্লিনি এতদ্বিষয়ে বিশেষ ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি দুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন,—'বস্ত্রক্রয়ে, অলঙ্কার ক্রয়ে, সুগন্ধ-দ্রব্য ক্রয়ে, রোমের ধনকুবেরগণ কত অর্থই অনর্থক ভারতের উদর-পূরণে ব্যয় করিতেছেন! এমন একটি বৎসর যায় না—যে বৎসর ভারতবর্ষ রোম-সাম্রাজ্য হইতে দশ কোটী সেস্‌টার্স † মুদ্রা অপহরণ না করে।' ‡ রোম-সাম্রাজ্য হইতে প্রতি বৎসর চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ডের (এখনকার হিসাবে ছয় লক্ষ টাকার) ভারতীয় পণ্য ক্রয় করা হইত,—ঐতিহাসিক-গণের গ্রন্থে এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। টলেমিগণের রাজত্বকালে এক সময়ে ভারতীয় বন্দর-সমূহে বিদেশে রপ্তানীর জন্য এক শত পঁচিশ-খানি অর্ণবপোত গতিবিধি করিত; সেই সকল পোত হইতে মিশর, সিরীয়া ও রোম-রাজ্য ভারতের উৎপন্ন সামগ্রী প্রাপ্ত হইত। ¶ ভারতের যে সকল পণ্য-দ্রব্য রোম-সাম্রাজ্যে সমাদৃত হইত, তাহার মধ্যে মশলা, সুগন্ধ দ্রব্য, মূল্যবান প্রস্তর, মুক্তা, রেশমী বস্ত্র, মস্‌লিন্ ও

বৈদেশিক বাণিজ্যে বিদেশের অর্থ-শোষণ।

---

* "It so allured Roman ladies that it sold for its weight in gold"—*Encyclopædia Britannica*, Vol. ii.

† সেস্‌টার্স (sesterce, sestertious) রোমদেশের প্রাচীন মুদ্রা-বিশেষ। সাধারণতঃ উহার মূল্য দুই পেন্স; এখনকার হিসাবে দুই আনা। রোম-সাম্রাজ্যের প্রদেশ-সমূহের বৃত্তান্ত-লেখক মোমসেন বলেন,—'বৈদেশিক বাণিজ্যে রোম-সাম্রাজ্য হইতে এই সময় দশ লক্ষ পাউণ্ড (এখনকার হিসাবে দেড় কোটী টাকা) বৎসর বৎসর বিদেশে রপ্তানি হইত। সেই টাকার মধ্যে ছয় লক্ষ পাউণ্ড (প্রায় নব্বই লক্ষ টাকা) ভারতে এবং চারি লক্ষ পাউণ্ড (প্রায় ষাট লক্ষ টাকা) আরবে যাইত।—Mommsen's *Provinces of the Roman Empire*, Vol. II.

‡ Pliny complained "that vast sums of money were annualy absorbed by commerce with India and that there was no year in which India did not drain the Roman Empire of a hundred million Sesterces."—Pliny, *Historia Naturalis*.

¶ *Vide*, Guthrie's *Life in Western India*.

ঢুলার কাপড় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় এবং ধর্ম্মালয়ে উপাসনাদির সময়, রোম-রাজ্যে যে সকল সুগন্ধ-দ্রব্য ব্যবহৃত হইত, তাহার সমস্তই ভারতবর্ষজাত। প্রতি উপাসনার সময়ে ধর্ম্মালয়ে ধূপাদি প্রজ্বলিত হইত। 'সাইলা'র * অন্ত্যেষ্টিকালে চিতার উপরে দুই শত দশ মোট সুগন্ধ মশলা নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। রোম-সম্রাট নীরো, তাঁহার পত্নী 'পোপোয়া'র অন্ত্যেষ্টি-সময়ে এক বৎসরের উৎপন্ন দারুচিনি ও সুগন্ধ মশলা ভস্মসাৎ করিয়া-ছিলেন। এই সকল মশলা ভারতবর্ষ হইতে লইয়া গিয়া আরব-দেশের বণিক-গণ সম্রাটকে সরবরাহ করেন। পিপ্পল ও আদা এক সময়ে রোমে বহু মূল্যে বিক্রীত হইত। প্লিনির গ্রন্থে প্রকাশ,—সোণা-রূপার ওজনে তিনি পিপুল ও আদা বিক্রয় হইতে দেখিয়াছিলেন। ভারতের প্রেরিত মূল্যবান প্রস্তর, মুক্তা, ধাতব পদার্থ রোম-রাজ্যে বিশেষ সমাদর প্রাপ্ত হইত। প্রস্তরের মধ্যে পান্নার মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। কোয়েম্বাটুর জেলার পাদিউর পল্লীতে পান্নার খনি আছে। সেই খনিতে উৎপন্ন পান্নাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সালেম-জেলায় বানিয়ামবাদি পল্লীতেও উৎকৃষ্ট পান্না পাওয়া যায়। ঐ সকল স্থানে প্রাচীন রোম-সাম্রাজ্যের বিভিন্ন সময়ের মুদ্রা-সমূহ সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয়। † মুক্তার আকর—দক্ষিণ-সমুদ্র। কতকাল হইতে দক্ষিণ-সমুদ্রে মুক্তা উত্তোলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আজিও ঐ অঞ্চলে মুক্তার ব্যবসায় অব্যাহত রহিয়াছে। এই সকল কারণে, পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, দ্রাবিড়ী বণিকগণই এই বৈদেশিক বাণিজ্যের নেতৃস্থান অধিকার করিয়া-ছিলেন। ‡ দ্রাবিড়-দেশোৎপন্ন পণ্যদ্রব্য-সকল বিদেশে, তামিল ভাষার শব্দে পরিচিত হওয়ায়, বিশেষতঃ দ্রাবিড়-দেশের সীমানার মধ্যেই অধিক-সংখ্যক রোমদেশীয় মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়ায়, বৈদেশিক বাণিজ্যে দ্রাবিড়-দেশের প্রাধান্য সর্ব্বদা কীর্ত্তিত হয়। প্রাচীন রোম-

---

* সাইলা (Sylla) রোমের জনৈক অত্যাচারী রাজপুরুষ।

† ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে 'রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে' রোমের মুদ্রা-সম্বন্ধে রবার্ট সিওয়েল একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধের নাম—ভারতে প্রাপ্ত রোম-দেশীয় মুদ্রা (Roman coins found in India)। প্রধানতঃ কোয়েম্বাটুরে এবং মাদুরা-জেলায় অনুসন্ধানে ঐ সকল মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। পঞ্চান্ন বার চেষ্টার ফলে ঐ সকল মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়। ৬১২টি স্বর্ণমুদ্রার ও ১১৮৭টী রৌপ্য-মুদ্রার প্রথমে পরিচয় দিয়া প্রবন্ধ-লেখক বলিয়াছেন,—পাঁচ জন কুলির বহনোপযোগী স্বর্ণমুদ্রা ঐ সকল স্থানে পাওয়া গিয়াছে; রৌপ্যমুদ্রা অনেক। সেই সকল মুদ্রা রোম-সম্রাট অগাষ্টাসের সময় হইতে নীরোর সময়ে প্রচলিত ছিল।—*Journal of the Royal Asiatic Society*, 1904. এতদ্ভিন্ন কানানোরে অনেক স্বর্ণ-মুদ্রা পাওয়া যায়। সে সমুদায় স্বর্ণমুদ্রা জুলিয়াস ক্লডিয়াসের সময়ের স্বর্ণমুদ্রা। সুগন্ধ মসলার বিনিময়ে ঐ সকল স্বর্ণমুদ্রা এদেশে আসিয়াছিল,—ইহাই সিদ্ধান্ত।—Mommsen's *Provinces of the Roman Empire*, Vol II.

‡ "Tamil land had the good fortune to possess three precious commodities not procurable elsewhere; namely, pepper, pearls, and beryls...The Tamil States maintained powerful navies, and were visited freely by ships both East and West, which brought merchants of various places eager to buy the pearls, pepper, beryls and other choice commodities of India and to pay for them with the gold, silver and art-ware of Europe,"—Mr. Vincent A. Smith: *Early History of India.*

সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হইতে ৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রোমের সহিত ভারতের বাণিজ্য প্রবল ছিল। ঐ সময় হইতে ২১৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে (সম্রাট নীরোর ও কারাকোলার রাজত্ব-কাল মধ্যে) রোম-সাম্রাজ্যে ভারতীয় বাণিজ্যের প্রভাব হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া আসে। পরিশেষে রোম-সাম্রাজ্যে অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হইলে, রোমক বণিকগণ ভারতবর্ষে আসিয়া, দাক্ষিণাত্যের উপকূল-প্রদেশে উপনিবেশ-স্থাপনে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। তখন বহুসংখ্যক যবন (বা রোমদেশীয় বীরপুরুষ) ভারতীয় হিন্দু-নৃপতিগণের সৈনিকদলে কর্ম্ম করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তামিল-ভাষার বহু গ্রন্থে সেই সকল সৈনিক-কর্ম্মচারীর কর্ম্ম-দক্ষতার ও বিশ্বস্ততার পরিচয় পাওয়া যায়। কেবল চাকুরী বলিয়া নহে;—এ দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া, এ দেশের অধিবাসীর মধ্যে পরিগণিত হইয়া, পরিশেষে তাঁহারা দেশে-বিদেশে বাণিজ্য-কার্য্যেও ব্রতী হইয়াছিলেন। ভারতে উপনিবিষ্ট এই সকল বৈদেশিকগণ এবং ভারতীয় অপরাপর বণিকগণ পরবর্ত্তিকালে যে বৈদেশিক বাণিজ্যে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ইতিহাসে সে প্রমাণের অসদ্ভাব নাই। যাহা হউক, ভারতবর্ষ যে এককালে বহির্বাণিজ্যে নানাপ্রকারে বিদেশের অর্থ-শোষণ করিয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

অর্থ-শোষণের দৃষ্টান্ত।

সে দিনের ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর শাসন-সময়ের অবস্থা স্মরণ করিয়া দেখুন; তখনও ভারতীয় বস্ত্র-শিল্প পাশ্চাত্য-দেশকে কিরূপভাবে গ্রাস করিয়া বসিয়াছিল, বুঝিতে পারিবেন। ভারতীয় পণ্যদ্রব্য কিরূপভাবে পাশ্চাত্য-দেশের অর্থ শোষণ করিয়া আনিত, আর কি প্রকারে তাহার সে প্রভাব খর্ব্ব হয়, ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে। কয়েকটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ন্যূনাধিক সাড়ে তের হাজার গাঁইট কার্পাস-বস্ত্র ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপে রপ্তানি হইয়াছিল। পরবর্ত্তী আটাইস বৎসরের মধ্যে সেই রপ্তানির পরিমাণ ২৪৮ গাঁইটে দাঁড়াইয়াছিল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে মাত্র ২৪৮ গাঁইট কার্পাস-বস্ত্র ভারতবর্ষ হইতে আমেরিকায় রপ্তানি হয়। ১৮০০

---

* এ সম্বন্ধে ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ লিখিয়াছেন,—"There is good reason to believe that considerable colonies of Roman subjects engaged in trade were settled in Southern India, during the first two centuries of our era, and that European soldiers, described as powerful 'Yavanas' as dumb *Mlecchas* (barbarians) clad in complete armour, acted as body-guards to Tamil kings, while the beautiful large ships of the 'Yavans' lay off Muzirs (Cranganore) to receive the cargaos of pepper paid for by Roman gold."—*Early History of India* by Vincent A. Smith. এ সম্বন্ধে কনকসবাই পিলে তৎপ্রণীত '১৮০০ শত বৎসর পূর্ব্বের তামিল' গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও প্রণিধান-যোগ্য। যথা,—"Roman soldiers were enlisted in the service of the Pandyas and other Tamil kings."—*The Tamils Eighteen Hundred Years Ago.* তামিল-ভাষার প্রাচীন কাব্য-গ্রন্থাদির নানা স্থানে একপ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 'চিলাপাত্তিকরম্' গ্রন্থে লিখিত আছে;—'পাণ্ড্যবংশীয় রাজা চেলিয়ানের রাজত্ব-কালে মাদুরা-সহরের দুর্গ রক্ষার জন্য রোমক সৈন্যগণ প্রহরী নিযুক্ত ছিল।' 'মুল্লাইপাড্ডু' নামক কাব্যে তামিল নৃপতির শিবিরের বর্ণনা আছে। কিরূপভাবে লৌহ-শৃঙ্খলে শিবির বেষ্টিত থাকিত, কিরূপভাবে যন্ত্রের দ্বারা সেই শৃঙ্খল ঘিরিয়া শিবির প্রস্তুত হইত, আর সেই শিবির রক্ষার জন্য কিরূপভাবে যবন-সৈন্যগণ (ম্লেচ্ছগণ) প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত, তাহার বিশদ বর্ণনা সেই কাব্যে দৃষ্ট হয়।

খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রতি বৎসরে ন্যূনকল্পে ১৫০০ গাঁইট কার্পাস-বস্ত্র ভারতবর্ষ হইতে ডেনমার্ক-রাজ্যে রপ্তানি হইতেছিল। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ঐ রপ্তানির পরিমাণ ১৫০ গাঁইটে দাঁড়াইয়াছিল। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ পর্তুগাল-রাজ্যে ৯৭১৪ গাঁইট কার্পাস-বস্ত্র রপ্তানি করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ঐ রপ্তানির পরিমাণ এক হাজার গাঁইটে পর্য্যবসিত হয়। কমিয়া কমিয়া ১৮২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রপ্তানির পরিমাণ চারি হাজার হইতে সাত হাজার গাঁইট পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ সকলই লোপ পাইয়া আসে। এক ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধের বিষয় আলোচনা করিলে, এ বিষয় বিশেষরূপ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে একমাত্র কলিকাতা-বন্দর হইতে বিশ লক্ষ পাউণ্ড (ষ্টার্লিং) মূল্যের (এখনকার হিসাবে প্রায় তিন কোটী টাকার) কার্পাস-বস্ত্রাদি ইংলণ্ডে রপ্তানি হইয়াছিল। সাতাইস বৎসরের মধ্যে বিপরীত ব্যাপার সংঘটিত হয়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার রপ্তানি বন্ধ হইয়া যায়, এবং বিশ লক্ষ পাউণ্ড (ষ্টার্লিং) মূল্যের (প্রায় তিন কোটী টাকার) কার্পাস-বস্ত্রাদি ইংলণ্ড হইতে ভারতে আমদানি হয়। দুই কারণে ভারতের বাণিজ্যে অন্তরায় ঘটিয়াছিল। ইংলণ্ডের বিপণী-সমূহে ভারতীয় পণ্য যাহাতে আদর না পায়, ইংলণ্ড তৎপক্ষে স্বতঃপরতঃ চেষ্টা করিয়াছিল ; অধিকন্তু ভারতীয় পণ্যের উপর অত্যধিক পরিমাণে বাণিজ্য-শুল্ক নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিল। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় পণ্য-দ্রব্যের উপর ইংলণ্ড কি পরিমাণ বাণিজ্য-শুল্ক নির্দ্ধারণ করে, তদ্বিষয় অনুসন্ধান করিলেই এ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। তখন মসলিন্-বস্ত্রের উপর শতকরা ৩৭॥০ টাকা, কেলিকো অর্থাৎ সাদা ও রঙিন কার্পাস-বস্ত্রের উপর শতকরা ৬৭॥০ টাকা এবং অন্যান্য তন্তশিল্পের উপর শতকরা ৫০৲ টাকা শুল্ক নির্দ্ধারিত হয়। ভারতের ইতিহাস লেখক মিষ্টার মিল এ সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন,—'১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ভারত-জাত কার্পাস-বস্ত্র ও রেশমী-বস্ত্র ইংলণ্ডের বিপণীতে ইংলণ্ডজাত দ্রব্যাদি অপেক্ষা শতকরা ৫৬৲ টাকা হইতে ৬০৲ টাকা কম মূল্যে বিক্রীত হইত। ভারতের এই বাণিজ্যস্রোত রুদ্ধ করিবার জন্য ভারতীয় পণ্যের উপর ইংলণ্ড শতকরা ৭০৲ টাকা হইতে ৯০৲ টাকা পর্য্যন্ত বাণিজ্য-শুল্ক নির্দ্ধারণ করেন। এইরূপ অত্যধিক বাণিজ্য-শুল্কের প্রবর্ত্তনায় ভারতীয় বাণিজ্যের পথ রুদ্ধ না হইলে, পইশলের ও মাঞ্চেষ্টারের কারখানা-সমূহ প্রারম্ভেই বন্ধ হইয়া যাইত এবং কলের দ্বারা পরিচালিত হইলেও কখনই তাহা স্থায়িত্ব-লাভ করিতে পারিত না। ভারতের বাণিজ্যের ধ্বংস করিয়াই তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠান্বিত করা হইয়াছে।' * জর্ম্মণদেশীয় প্রসিদ্ধ অর্থশাস্ত্রবিৎ রাজনীতিজ্ঞ ফ্রেডরিক লিষ্ট এতৎসম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাও এ

* "It was stated in evidence (in 1813) that the cotton and silk goods of India up to the period could be sold for a profit in British market at a price from 56 to 60 percent lower than those fabricated in England. It consequently became necessary to protect the latter by duties of 70 and 90 percent on their value or by positive prohibition. Had this not been the case, had not such prohibitory duties and decrees existed, the mills of Paisley and Manchester would have been stopped in the outset, and could scarcely have been again set in motion, even by the power of steam. They were created by the sacrifice of Indian manufacture."—Mill's *History of India*.

প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি লিখিয়াছেন,—'ইংলণ্ড যদি ভারতজাত কার্পাস-বস্ত্রের ও রেশমী-বস্ত্রের অবাধ আমদানি অব্যাহত রাখিতেন, তাহা হইলে এতদিন ইংলণ্ডে তন্তু-শিল্পের অবসান হইত। ভারতবর্ষে পারিশ্রমিকের হার সুলভ, বস্ত্রাদি নির্ম্মাণোপযোগী দ্রব্যাদিও পর্য্যাপ্ত-পরিমাণে পাওয়া যায়। এ সকল সুবিধা তো আছেই; অধিকন্তু ভারতবাসীরা স্মরণাতীত কাল হইতে শিল্পকার্য্যে অভ্যস্ত, সুদক্ষ ও বহুদর্শী। যদি অবাধ-প্রতিযোগিতার সুবিধা পাইত, তাহা হইলে ভারতবাসীকে কেহই বাণিজ্য-ব্যাপারে পরাভূত করিতে পারিত না।' * এই উপলক্ষে ফ্রেডরিক লিষ্ট আরও অনেক কথাই কহিয়াছেন। ইংলণ্ড শিল্পসম্পদে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য ও অপরাপর অধিকৃত দেশসমূহকে কৃষিকার্য্যে নিরত রাখিবার উদ্দেশ্যে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। অন্য দেশ শস্যোৎপন্ন করুক, ইংলণ্ড শিল্পজাত দ্রব্যের বিনিময়ে তৎসমুদায় অধিকার করুন,—ইহাই ইংলণ্ডের আন্তরিক কামনা। এই কামনা সিদ্ধির জন্যই ইংলণ্ড ভারতীয় শিল্পের অনিষ্ট-সাধন করিয়াছেন। ফ্রেডরিক লিষ্টের উক্তির ইহাই মর্ম্ম। † ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর আমলে অথবা পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনকর্ত্তাদিগের শাসনকালে, এ সকল ব্যাপার ঘটিতে পারে; কিন্তু সুখের বিষয়, এখন আর সে দিন—সে আশঙ্কা নাই। সমদর্শী

---

* Had they (the English) sanctioned the free importation into England of Indian cotton and silk goods the English cotton and silk manufactories must of necessity have soon come to a stand. India had not only the advantage of cheaper labour and raw material, but also the experience, the skill and the practice of centuries. The effect of these advantages could not fail to tell under a system of free competition."—*Vide*, Friedrich List, *National System of Political Economy*.

† "But England was unwilling to found settlements in Asia in order to become subservient to Asia in manufacturing industry. She strove for commercial supremacy, and felt that of the two countries maintaining free trade between one another, that one would be supreme which sold manufactured goods, while that one would be subservient which could only sale agricultural produce. In her North American colonies England had already acted on these principles in disallowing the manufacture in those colonies of even single a horse-shoe nail, and still more, no horse-shoe made there should be imported to England. How could it be expected of her that she would give up her own market for manufactures, the basis of her future greatness, to a people so numerous, so thrifty, so experienced and perfect in the old system of manufacture as the Hindus ? Accordingly England prohibited the import of the goods dealt in by her own factories, the Indian cotton and silk fabric. The prohibition was complete and peremptory. She would have none of these beautiful and cheap fabrics, but preferred to consume her own inferior and more costly stuffs. Was England a fool in so acting. The English Ministers cared not for the acquisition of low-priced and perishable articles of manufacture, but for that of a more costly but enduring *manufacturing power*."—Friedrich List, *National System of Political Economy*.

ব্রিটিশ-গবরমেণ্ট, ভারতীয় শিল্পের উন্নতির পথে বাধা-প্রদান দূরের কথা, এখন ভারতীয় শিল্পের উন্নতির পক্ষে স্বতঃপরতঃ উৎসাহ-দানই করিতেছেন। ভারতীয় শিল্পের উন্নতি-সাধনে গবরমেণ্টের সে উৎসাহ-দান-দর্শনে এখন বরং মনে হয়,—আবার ভারতের সেই গৌরবের দিন ফিরিয়া আসিবে। যাহা হউক, ভারতীয় বাণিজ্যের পুরাতন ইতিহাস আলোচনা করিলে, পাশ্চাত্য লেখকগণের ইতিহাস হইতেই প্রতিপন্ন হয়,—ভারতের বাণিজ্য প্রাচীন রোম-সাম্রাজ্যের অর্থ শোষণ করিয়া আনিত এবং সেদিনের ইংলণ্ড পর্য্যন্ত সে বাণিজ্যের প্রভাবে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভারতীয় বণিকগণের বাণিজ্যের পরিচয় দেদীপ্যমান। পৃথিবীর সভ্যজনপদমাত্রেই ভারতবর্ষ বাণিজ্য-সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত ছিল। তখন, স্থলপথে ও জলপথে নানাদিকে ভারতের বাণিজ্য বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রতীচ্যে যেমন রোমে, গ্রীসে, মিশরে, বাবিলোনিয়ায়, ফিনিসীয়ায়, ভারতের বাণিজ্যের প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়; প্রাচ্য মহাদেশে সেইরূপ যবদ্বীপ, সুমাত্রাদ্বীপ প্রভৃতি ভারত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে এবং সুদূর চীনদেশে ও এসিয়ার পূর্ব্বোত্তর-প্রান্তে ভারতের বাণিজ্যের প্রভাব দেখিতে পাই। টলেমি ও টেসিয়াস * "তখ্‌তে সুলেমান" অর্থাৎ প্রস্তর-ভবন নামক একটি মিলনস্থানের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বিভিন্ন স্থান হইতে যাত্রা করিয়া হিন্দু-বণিকগণ প্রথমে ঐ স্থানে মিলিত হইতেন; পরে তথা হইতে বাণিজ্য-ব্যপদেশে তাঁহারা দিগ্দেশে গতিবিধি করিতেন। চীনদেশে যাইতে হইলেও তাঁহারা ঐ মিলন-স্থানে প্রস্তর-ভবনে সমবেত হইতেন। মধ্য-এসিয়ায় এবং এসিয়ার উত্তর-সীমানায় গমন-পক্ষেও ঐ মিলন-স্থানই প্রশস্ত ছিল। গোবি মরুভূমিকে টলেমি 'ইদেস্ত' অর্থাৎ সুবর্ণ-রেণুময় মরুভূমি বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মিলন-স্থানে প্রস্তর-ভবনে এক সহস্র দুই সহস্র বণিক একত্র মিলিত হইলে, বণিকগণ 'ইদেস্ত' পার হইতেন। 'ইদেস্ত' পার হইয়া এসিয়া-মহাদেশের উত্তর-প্রান্তস্থিত জনপদ-সমূহে বাণিজ্য করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে, বণিকগণের প্রায় তিন চারি বৎসর সময় অতিবাহিত হইত। পূর্ব্বোক্ত "তখ্‌তে সুলেমান" প্রস্তর-ভবনের বিষয় আলোচনা করিয়া অধ্যাপক হীরেণ, হিন্দু-বণিকগণের স্থলপথে চীনদেশে গতিবিধির বিষয় সপ্রমাণ করিয়াছেন। কোন্ পথে বণিকগণ চীনদেশে বাণিজ্য করিতে যাইতেন, তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া হীরেণ বলিয়াছেন—'যদি আমরা কাবুলে অথবা বাক্ট্রিয়ায় বণিকগণের প্রথম মিলন-স্থান 'তখ্‌তে সুলেমান' ভবনের স্থান নির্দ্দেশ করি, তাহা হইলে বুঝিতে পারি,—বণিকগণ উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিয়া উত্তর-অক্ষরেখার ৪১° ডিগ্রীর অন্তবর্ত্তী স্থানে প্রথমে মিলিত হইতেন; আর, তাহা হইলে, তাঁহাদিগকে প্রথমে পর্ব্বতের উপর আরোহণ

স্থলপথে ও জলপথে বাণিজ্য।

---

* টলেমি (Ptolemy); টেসিয়াস (Ctesias);—দুই জনই সুবিখ্যাত। টলেমি—মিশর-দেশীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ ও ভৌগোলিক। ১৩৯ খৃষ্টাব্দে আলেকজান্ড্রিয়া-সহরে তাঁহার বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন হয়। টেসিয়াস—গ্রীসের প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎ। ৪১৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে তিনি বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার 'ইণ্ডিকা' (Indica) গ্রন্থই গ্রীক-ভাষায় ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত প্রথম গ্রন্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

করিতে হইত এবং 'হোসান' বা 'ঔস' নামক ভীষণ অরণ্যানীসঙ্কুল প্রদেশ অতিক্রম করিয়া সম্মিলন-ক্ষেত্রে পৌঁছিতে হইত। সেখান হইতে পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া, তাঁহারা 'কাসগড়ে' যাইতেন এবং তথা হইতে গোবি-মরুভূমির প্রান্তসীমায় উপনীত হইতেন। এ পথে তাঁহাদিগকে 'খোটান' ও অকৃস্নু (টলেমি এই দুই স্থানকে কাসিয়া ও অক্সাজিয়া বলিয়া নির্দ্দেশ করেন) প্রভৃতির মধ্য দিয়া গতিবিধি করিতে হইত, তাহা সহজেই প্রতীত হয়। এই সকল প্রাচীন সহর হইতে 'কেশোটে' নগরের মধ্য দিয়া 'সে-যৌ' পর্য্যন্ত একটি পথ আছে। 'সে-যৌ'—চীনরাজ্যের সীমান্ত নগর। সে-যৌ হইতে বণিকগণ 'সেরিকা' প্রদেশের প্রধান নগরে পৌঁছিতেন। টলেমির গ্রন্থোক্ত সেই প্রধান নগরকে যদি পিকিন-নগর বলিয়া স্থির করিয়া লই, তাহা হইলে আর কোনই সংশয়ের কারণ থাকে না। পিকিন—অতি প্রাচীন নগর। এতৎপ্রসঙ্গে সেই নগরেই হিন্দু-বণিকগণের গতি-বিধির ও বাণিজ্যের বিষয় বুঝিতে পারা যায়। দুই সহস্র পাঁচ শত মাইল পথ অতিক্রম করিয়া এইরূপে হিন্দু-বণিকগণ ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে বাণিজ্য করিতে যাইতেন।' অধ্যাপক হীরেণের ইহাই সিদ্ধান্ত। * যেমন প্রাচ্য-দেশে, তেমনি প্রতীচ্যেও বণিকগণের স্থল-পথে গতিবিধির প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে সাধারণতঃ দুইটি পথের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। একটি পথ—হিমালয় অতিক্রম করিয়া, অক্সাস-পর্ব্বত পার হইয়া, কাস্পিয়ান হ্রদের তীরদেশ দিয়া ইউরোপে পৌঁছিয়াছে। অন্য পথ—পামিরা দিয়া। † পামিরা—উত্তর সিরিয়ার প্রাচীন নগর। উহার হিব্রু নাম—তাদমোর। নগরে অনেক তালবৃক্ষ ছিল; এইজন্য গ্রীকেরা ঐ নগরকে 'পামিরা' বলিয়া পরিচয় দিত। খৃষ্ট-পূর্ব্ব দশম শতাব্দীতে রাজা সলোমন কর্ত্তৃক ঐ সুন্দর নগর নির্ম্মিত হইয়াছিল। লেভান্ত-উপসাগরের উপকূলে ঐ প্রাচীন নগরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়। পামিরা হইতে রোমে এবং ইউরোপের অন্যান্য নগরে পণ্য-দ্রব্য সংবাহিত হইত। পার্থিয়া-রাজ্যে ‡ বিপ্লবের ফলে, ভারতীয় বণিকগণের বাণিজ্যের এই পথ অনেক পরিমাণে রুদ্ধ হইয়া আসে। টলেমিগণের রাজত্বকালে, আলেকজান্দ্রিয়া নগরীর সমৃদ্ধি-সময়ে, লোহিত-সমুদ্রের পশ্চিম-উপকূলে কয়েকটি নূতন বন্দর প্রতিষ্ঠিত হয়। টলেমি আপনার জননীর নামে বেরেনিস্-বন্দর ¶ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 'মৈওস্ হোরমৌজ' নামে একটি বন্দরও ঐ সময় প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষের, আরবের, পারস্যের ও ইথিওপিয়ার পণ্যসমূহ

---

* *Vide* Heeren's *Historical Researches*, vol. II.

† Davie's *Bhugwat Gita.*

‡ পার্থিয়া—পশ্চিম এসিয়ার একটী প্রাচীন দেশ। কাস্পিয়ান সাগরের উত্তর-পূর্ব্ব-প্রান্তে ঐ দেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। রোম-সাম্রাজ্যে সাধারণ তন্ত্র শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তনার কালে পার্থিয়ার প্রসিদ্ধির অবধি ছিল না। অনেক সময় পার্থিয়া রোম-সাম্রাজ্যকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। ১৫০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে 'আর্‌সা সাইড' বংশ পার্থিয়ার সিংহাসন লাভ করেন। ২১৪ খৃষ্টাব্দে অন্তর্বিপ্লবে ঐ বংশের ধ্বংস-সাধন হয়।

¶ মিশরে টলেমি (Ptolmy) নামে সাত জন রাজা রাজত্ব করেন। ৩২৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ৪৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহাদের রাজত্ব-কালের পরিচয় পাই। দ্বিতীয় টলেমির মাতার নাম বেরেনিস (Berenice); আপনার মাতার নামানুসারে দ্বিতীয় টলেমি ঐ বন্দর প্রতিষ্ঠা করেন। ২৮৫ হইতে ২৪৭ খৃষ্টাব্দ দ্বিতীয় টলেমির রাজত্ব-কাল।—*The Ancient History of the Egyptians* by the Religious Tract Society.

প্রথমে ঐ দুই বন্দরে আসিয়া পৌঁছিত। সেখান হইতে উষ্ট্র-পৃষ্ঠে মিশরের কোপ্টস্-বন্দরে ঐ সকল পণ্য-দ্রব্য সংবাহিত হইত। তথা হইতে বণিকগণ পুনরায় পোতযোগে তৎসমুদায় আলেক্‌জান্দ্রিয়ায় লইয়া যাইতেন। এ পথে এভাবেও অনেক দিন বাণিজ্য চলিয়াছিল। ষ্ট্রাবো লিখিয়া গিয়াছেন,—তিনি এক সময়ে ১২০ খানি অর্ণবযানকে 'মৈওস্ হোরমৌজ্' হইতে ভারতাভিমুখে যাত্রা করিতে দেখিয়াছিলেন। ষ্ট্রাবো এবং প্লুটার্ক প্রভৃতি পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ বিদেশ-গমনোপযোগী রাজপথাদির অস্তিত্বের বিষয়ও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। পথে দূরত্ব-জ্ঞাপক খোদিত-প্রস্তর প্রোথিত ছিল; কোনও কোনও পথের দুই পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণী রোপিত হইয়াছিল; স্থানে স্থানে পান্থশালা ও কূপাদি খনন করাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ভারতবর্ষের মধ্যে এবং ভারতবর্ষের বাহিরে উভয়ত্রই বহুকাল পূর্ব্ব হইতে এইরূপ রাজপথাদির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। অধ্যাপক হীরেণও এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কেবল হিন্দু-নৃপতিগণই যে বিভিন্ন দেশে গতিবিধির জন্য পথ-নির্ম্মাণ করিতেন, তাহা নহে। রাজা সলোমনও, আপন য়িহুদী প্রজাবর্গের বাণিজ্য-সৌকর্য্যার্থ এইরূপ রাজপথ প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন। তাদমোর (পামিরা), বালবেক্ (হেলিওপোলিস্), হামাৎ (এপিফানিয়া) প্রভৃতি পল্লীতে রাজা সলোমন বণিকদিগের জন্য বিশ্রাম-স্থান নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। তাহার ফলে, মেসোপোটামিয়া-প্রদেশে বাবিলন, টেসিফন, সেলেউসিয়া, ওসিস্ প্রভৃতি বাণিজ্য-কেন্দ্রসমূহ উদ্ভূত হইয়াছিল। সমুদ্র-পথে বাণিজ্য-পোতাদির গমনাগমনের সুবিধার প্রতিও সলোমনের দৃষ্টি ছিল; তিনি সমুদ্র-পথে ও নানা স্থানে প্রহরীর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এবম্বিধ সুবিধা-সূত্রেও, ভারতের বাণিজ্য দিকে দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল।

যে কারণেই হউক, অতি-পুরাকালে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র ভারতের বাণিজ্য-প্রভাব বিস্তৃত ছিল। বেদে যখন বাণিজ্য-প্রসঙ্গ দেখি, সমুদ্র-যাত্রার বর্ণনা পাঠ করি, তখন অতি-দূর অতীত-কালে ভারতের বাণিজ্য-প্রভাব উপলব্ধ হয়। বেদ—পৃথিবীর আদি; সুতরাং আদিকাল হইতে ভারতবর্ষের বাণিজ্য সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল বুঝিতে পারি। সে তুলনায়, ভারতের বাণিজ্যের মৌলিকত্বের নিকট সকল দেশের সকল গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া যায়। পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে ভারতীয় বণিকগণের বাণিজ্যের যে পরিচয়-চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাতে বর্ত্তমান কালের অন্ততঃ পাঁচ সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বের বিবরণ প্রাপ্ত হই। বর্ত্তমান মন্বন্তরের এই অষ্টাবিংশতিতম কলি-যুগের প্রারম্ভে অষ্টাদশ মহাপুরাণের প্রবর্ত্তয়িতা মহাকবি বেদব্যাসের আবির্ভাব-কাল স্মরণ করিলে এবং সেই সকল মহাপুরাণ-মধ্যে ভারতীয় বণিকগণের বৈদেশিক-বাণিজ্যের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে দেখিলে, ভারতের বৈদেশিক-বাণিজ্য কতকাল পূর্ব্বের, তাহা সহজেই প্রতীত হইতে পারে। কল্পনার অনধিগম্য সেই দূর অতীতের প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জাতির পুরাতত্ত্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বা কি দেখিতে পাওয়া যায়? পালি-ভাষার প্রাচীন গ্রন্থসমূহের প্রতি লক্ষ্য করুন; তামিল-ভাষার প্রাচীন গ্রন্থ-সমূহের অভ্যন্তরে

প্রাচীন-ভারতের বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য।

অনুসন্ধান করুন; দেখিবেন,—সেখানেও সেই স্মৃতি উজ্জ্বল হইয়া আছে; দেখিবেন,—সে সকল গ্রন্থের মধ্যে কেমনভাবে ভারতীয় বণিকগণের বাণিজ্যের পরিচয় প্রকটিত রহিয়াছে! প্রাচীন মিশরের এবং আসিরিয়ার স্থাপত্যের মধ্যে ভারতীয় বণিকগণের বাণিজ্য-প্রভাব কিরূপ পরিস্ফুট হইয়া আছে, পূর্ব্বেই তাহা উল্লেখ করিয়াছি। বাইবেলের বর্ণনায়ও সে পরিচয় প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে। হেরোডোটাস্ ও টেসিয়াস্ প্রমুখ গ্রীস-দেশীয় ঐতিহাসিকগণ যে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও দূর-অতীতে ভারতের বাণিজ্যের প্রভাব দেখিতে পাইয়াছি। বাবিলন যুক্ত-রাজ্যের স্থাপত্যে, খৃষ্টজন্মের তিন সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে, তদ্দেশে ভারতীয় বাণিজ্যের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করি; গ্রীক-ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থ হইতে খৃষ্ট-জন্মের পাঁচ-শতাধিক বৎসর পূর্ব্বের বিবরণ প্রাপ্ত হই। আমাদের শাস্ত্র-গ্রন্থ আলোড়ন করিয়া তাহার আরও কত পূর্ব্ববর্ত্তিকালের বিবরণ জানিতে পারি! পৃথিবীর কোনও দেশ কখনও ইহার পূর্ব্বে কোনরূপ কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই। এই বাণিজ্য-ব্যাপারে ভারতবর্ষ প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছিল। মিশরের অভ্যুদয়কালে ভারতের বাণিজ্য মিশরে একাধিপত্য প্রভাব বিস্তার করে। আসিরিয়ায়, ফিনিসীয়ায়, রোমে, গ্রীসে, বাবিলনে সে বাণিজ্য বিস্তৃত হয়। প্রাচ্য-রাজ্যে চীনদেশে এবং এসিয়া-মহাদেশের উত্তর-সীমায় সে বাণিজ্য অব্যাহত থাকে। একটু নিগূঢ় অনুসন্ধান করিলে, আমেরিকা-মহাদেশেও সে বাণিজ্যের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, বুঝিতে পারি। মেক্সিকোর আজ্‌টেক-জাতির এবং পেরু প্রভৃতি দেশের সহিত ভারতের সম্বন্ধ-তত্ত্ব আলোচনায়, এ আভাস পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সকল বিষয় প্রণিধান করিলে, মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারা যায়,—বাণিজ্যে প্রাচীন-ভারতের প্রতিষ্ঠার তুলনা নাই; যে সময়ে পৃথিবীর যে জনপদ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াছিল, সেই জনপদেই ভারতীয় বণিকগণের বাণিজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল।

চীনের সহিত ভারতের বাণিজ্য।

[ধর্ম্ম-সম্বন্ধে ভারতের সহিত চীনের বাণিজ্য-সম্বন্ধ,—চীনে ভারতীয় বণিকগণের উপনিবেশ-স্থাপন;—উপঢৌকনাদি প্রদানে ভারতীয় বণিকগণের চীনে বাণিজ্য;—অর্ণবপোতের আকৃতি-দৃষ্টে চীনদেশে ভারতীয় বণিকগণের প্রভাব;—চীনে বণিকগণের উপনিবেশ ও আধিপত্য লোপের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যের পদ্ধতির পরিবর্ত্তন;—চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণের বর্ণনায় ভারতের বাণিজ্য-কথা;—বিভিন্ন কালে চীনে ভারতের বাণিজ্য।]

চীনদেশের প্রাচীনত্ব অবিসম্বাদিত। কিন্তু বাণিজ্য-ব্যপদেশে চীনদেশে কত পূর্ব্ব হইতে ভারতের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, সে তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলেই বা কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হই? ভারতবর্ষের সহিত চীনের সম্বন্ধ যে কতকাল পূর্ব্বের, তাহা নির্ণয় করাই দুঃসাধ্য। এক হিসাবে চীনের আদিই ভারতবর্ষ। শাস্ত্র-মতে, চীন-সাম্রাজ্য পুরাকালে ভারতেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। মনু-সংহিতায় দেখিতে পাই,—ক্রিয়াভ্রষ্ট ক্ষত্রিয়-জাতিই চীন-সাম্রাজ্যে শেষে আধিপত্য পাইয়াছিল। চীনের ধর্ম্ম-কর্ম্ম আচার-ব্যবহারাদির বিষয় অনুসন্ধান করিলে, অনেক স্থলেই আজি পর্য্যন্ত চীনে ভারতের প্রভাব অব্যাহত রহিয়াছে—দেখিতে পাই। ভারতের বৌদ্ধ-

ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বাণিজ্য-সম্বন্ধ।

ধর্ম্ম চীনের অধিকাংশ অধিবাসী আপন ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়া গৌরব অনুভব করিতেছেন। চীনে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-সংক্রান্ত যে সকল শাস্ত্র-গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তাহার দুই-তৃতীয়াংশ গ্রন্থ ভারতীয় বৌদ্ধ-ধর্ম্মগ্রন্থ-সমূহের অনুবাদ মাত্র। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-সংক্রান্ত যে সকল গ্রন্থ চীনে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আছে, তাহা প্রায়ই সংস্কৃত-ভাষার বাক্য-পরম্পরায় পরিপূর্ণ। ধর্ম্মালয়ে ধর্ম্মযাজকগণ যে সকল স্তোত্র পাঠ করেন, তাহা সংস্কৃত ভাষায়ই গ্রথিত। পার্থক্যের মধ্যে ঐ সকল স্তোত্র চীনা-অক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়া আছে মাত্র। ধর্ম্মকর্ম্মে জনসাধারণ যে প্রার্থনা উচ্চারণ করে, পদকাদিতে যে মন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহার সকলই সংস্কৃতমূলক। কোনও কোনও স্থলে ভারতের বর্ণমালায় ঐ সকল মন্ত্র লিখিত থাকার প্রথাও দেখা যায়। * অধিক বলিব কি, যে সকল বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারক ভারতবর্ষ হইতে চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেরই প্রতিমূর্ত্তি চীনের ধর্ম্মালয়-সমূহে আজিও সসম্মানে সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। ডক্টর ইটেল বহু অনুসন্ধানের ফলে বৌদ্ধধর্ম্ম-সংক্রান্ত একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহার সেই গ্রন্থে এ সকল পরিচয় বিশেষভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন,—'খৃষ্ট-জন্মের ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে ১৮জন বৌদ্ধ-ধর্ম্মযাজক ভারতবর্ষ হইতে যাত্রা করিয়া চীনে উপনীত হন; চীনের প্রত্যেক প্রধান ধর্ম্ম-মন্দিরে তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তি বিদ্যমান আছে।' † বৌদ্ধ-ধর্ম্ম কোন্ সময়ে চীনদেশে প্রবেশ লাভ করে, তদ্বিষয়ে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মধ্যেও নানা মতান্তর আছে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বলেন,—খৃষ্ট-জন্মের ২১৭ বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রথমে চীনে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল; কেহ বলেন,—২২১ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দকে চীন-দেশে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রথম প্রবেশের অব্দ ‡ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। চীনদেশের ইতিহাসে এ সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রাপ্ত হই, তাহাতে চীনের সম্রাট ৬৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধ-শ্রমণগণকে চীনে আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন—প্রতিপন্ন হয়। কাশ্যপ-মাতঙ্গ এবং গোভরণ নামধেয় দুই জন বৌদ্ধ-শ্রমণ, বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি এবং বৌদ্ধ-ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ লইয়া চীনে গমন করেন। সেই সময়ে বৌদ্ধ-ধর্ম্মমতসমূহ চীনে

---

* "Every popular Buddhist book is full of Sanskrit phrases. Many of the litanies which the priests read are Sanskrit prayers transliterated in Chinese characters, the prayers which exorcists among the common people recite, the charms amulets they use, frequently contain Sanskrit characters."—Dr. E. J. Eitel's *Buddhism : Its Historical, Theoretical and Popular Aspects.*

† "As early as 250 B. C. a number of eighteen Buddhist emissaries reached China, where they held in reverence to the present day, their images occupying a conspicuous place in every larger temple."—Dr. E. J. Eitel's *Buddhism : Its Historical, Theoretical and Popular Aspects.*

‡ জর্ম্মণ-পণ্ডিত হ্যাকম্যান (H. Hackman) বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অভ্যুদয় ও বর্ত্তমান অবস্থা (Buddhism as a Religion : Its Historical Development and its Present Conditions) সংক্রান্ত গ্রন্থে এবং এড্‌কিন্‌স (Rev. J. Edkins) চীনদেশীয় বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত পুস্তকে (Chinese Buddhism) প্রথমোক্ত মত প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু মিঃ এলেন (Mr. Herbert J. Allen) ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের 'রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে' শেষোক্ত মত প্রচার করেন।

প্রচারিত হইতে থাকে, বৌদ্ধ-ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ চীনা-ভাষায় অনুবাদিত হইতে আরম্ভ হয়। ধর্ম্ম-সম্বন্ধে ভারতের নিকট চীনের শিষ্যত্ব-গ্রহণের ইহাই সূচনা বলিয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করেন। ধর্ম্মকর্ম্ম-শিক্ষার জন্য চীনের সম্রাটগণ অনেক সময়ে ভারতবর্ষে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতেন। চীন-সম্রাটের সেই প্রতিনিধিগণ, ভারতবর্ষে আগমন করিয়া বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি ও দন্ত প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতেন, এবং বৌদ্ধ-ধর্ম্মগ্রন্থসমূহের পাণ্ডুলিপি সঙ্কলন করাইয়া লইতেন। এই সকল ব্যাপারেও ভারতীয় বণিকগণ চীনদেশে বাণিজ্যের নানারূপ সুবিধা পাইয়াছিলেন। *

চীনে উপনিবেশ-স্থাপন।

স্মরণাতীত-কাল পূর্ব্বে ভারতবাসীরা চীনে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। কিবা সংস্কৃত-সাহিত্যে কিবা চীনদেশের পুরাবৃত্তে উভয়ত্রই এতদ্বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা চীনদেশ হইতে রেশম, কর্পূর, ইস্পাত, সিন্দূর প্রভৃতি পণ্য-দ্রব্য ভারতবর্ষে আনয়ন করিতেন। সার হেন্‌রি ইউল্, চীন-সম্বন্ধে বহু-গবেষণাপূর্ণ এক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। গ্রন্থের নাম—'ক্যাথে এণ্ড দি ওয়ে দিদার'। সেই গ্রন্থের একস্থলে তিনি লিখিয়াছেন,—'ভারতবাসীর এবং চীনাদিগের জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অংশবিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীত হয়, দূর-অতীত-কালে উভয় দেশ অভিনব সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ ছিল। সে সম্বন্ধ যে কতকাল পূর্ব্বের সম্বন্ধ—চীনদেশের যে সকল পুরাবৃত্ত খৃষ্টজন্মের তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়, সে সকল পুবাবৃত্তও তাহা নির্ণয় করিতে পাবে নাই।' † ইউলের এবম্বিধ উক্তিতে মনুঃস্মৃতির আচারভ্রষ্ট ক্ষত্রিয়গণের স্মৃতি কাহারও কাহারও মনে উদয় হইয়া থাকে। ‡ 'মার্কো-পোলোর' ভ্রমণ-বৃত্তান্ত § গ্রন্থের সংস্করণ-প্রকাশ উপলক্ষে এম. পথিয়ার নামক জনৈক ফরাসী পণ্ডিত রূপান্তরে এই মতই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন,—'মনুর উক্তি কতকাংশে সত্য বলিয়া মনে হয়। প্রমাণ পাওয়া যায়, কতকগুলি ভারতবাসী, খৃষ্ট-জন্মের সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে, 'শেন্‌সি' অতিক্রম করিয়া চীনের পূর্ব্ব-সীমান্তে উপনীত হন। সেই সময়ে তাঁহারা একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই রাজ্যের নাম—'শিন' (Thsin) অর্থাৎ চীন।' ফরাসী পণ্ডিতের যতটুকু জ্ঞান ও যতটুকু ভূয়োদর্শন, তিনি সেই মতই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। খৃষ্ট-জন্মের সহস্র বৎসর পূর্ব্বের ঘটনার সহিত মনুসংহিতার ঘটনার সামঞ্জস্য সাধন করিতে যাওয়া

---

* লঙ্কাদ্বীপ হইতে চীন-সম্রাটগণ সর্ব্বদা ধর্ম্ম-সংক্রান্ত ঐ সকল সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া লইতেন,—স্যর ইমারসন্ টেনেটের গ্রন্থে এরূপ নানা প্রমাণ আছে।—*Vide* Sir Emerson Tennet's *Ceylon.*

† "There is in a part of the Astronomical system of the two nations the strongest implication of very ancient communication between them, so ancient as to have been forgotten even in the far-reaching annals of China".'—*Cathay and the Way thither* by Sir Henry Yule, K. C. S. I.

‡ মনুসংহিতা, ১০ম অধ্যায়, ৪৩।৪৪ শ্লোকে এতদ্বিষয়ে এই উক্তি দৃষ্ট হয়,—

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ। বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥

পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কম্বোজা জবনাঃ শকাঃ। পারদাপহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥"

§ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মার্কো পোলো (Marco Polo) দেশ-পরিভ্রমণে বহির্গত হন। ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতের করোমণ্ডল-উপকূলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইটালীয় অন্তর্গত ভিনিস-প্রদেশ তাঁহার জন্মস্থান। ১২৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১৭ বৎসর তিনি চীন-সাম্রাজ্যে অবস্থিতি করেন।

তাঁহার বিড়ম্বনা মাত্র। তবে খৃষ্ট-জন্মের সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতবাসিগণ যে বাণিজ্য-ব্যপদেশে চীনদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সে উপনিবেশ যে একটী স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল,—তাঁহার উক্তিতে এ বিষয় অবশ্যই বুঝিতে পারা যায়। অধিকন্তু এ বিষয়ে তিনিই একমাত্র প্রমাণ নহেন। তাঁহার ন্যায় পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের গ্রন্থেই এ সম্বন্ধে আরও নানা প্রমাণ পাওয়া যায়। চীনদেশের গ্রন্থ-পত্র আলোড়ন করিয়া অধ্যাপক লাকুপেরি প্রতিপন্ন করিয়াছেন,—'৬৮০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে ভারতীয় বণিকগণ 'কিয়াও-চাউ' উপসাগরে একটি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। উপনিবেশের নাম—'লঙ-গ' (Lang-ga) * বা লঙ্-য় (Lang-ya)। ঐ উপনিবেশের অন্তর্গত একটি পল্লীতে তাঁহাদের বাজার ও টাকশাল ছিল। সেই পল্লীর নাম—'শি-মিয়ে' (Tsi-mieh) বা 'শি-মো' (Tsi-moh)। বণিকগণ আপনাদের প্রতিষ্ঠিত মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রা প্রস্তুত করিতেন এবং সেই মুদ্রা সেই প্রদেশে প্রচলিত ছিল। চীনারা সেই হইতেই মুদ্রা-প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষা করেন। বণিকদিগের মুদ্রাযন্ত্র দেখিয়া, চীনদেশের জনৈক যুবরাজ আপন রাজ্যমধ্যে প্রথম মুদ্রা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। ৫৭৫ হইতে ৬৭০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই প্রকারে চীনদেশে মুদ্রা প্রস্তুত আরম্ভ হয়। তখন, ঔপনিবেশিক বণিকগণের সহিত পারিপার্শ্বিক চীন-সম্রাটের বিশেষ সদ্ভাব ছিল। সেই সদ্ভাবের ফলে, খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে (৫৮০-৫৫০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের মধ্যে) ঔপনিবেশিকগণের ও চীন-সাম্রাজ্যে যুক্তনামে মুদ্রা প্রস্তুত আরম্ভ হয় এবং সেই মুদ্রা চীন-রাজ্যের নানা স্থানে প্রচলিত থাকে। ইহার পর কিছুকাল (৪৭২—৪৮০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে) বণিকগণ স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া চালাইয়াছিলেন। পরিশেষে উপনিবেশে তাঁহাদের প্রভাব লোপ পাইয়া আসিলে, তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত মুদ্রার প্রচলন বন্ধ হয়। অধ্যাপক লাকুপেরি, ঔপনিবেশিকগণের প্রবর্ত্তিত মুদ্রার আলোচনা করিয়া, চীনদেশে ভারতীয় বণিকগণের বাণিজ্য-প্রভাবের বিষয় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। †

চীনদেশে বাণিজ্য-ব্যপদেশে ভারতীয় বণিকগণকে অনেক সময় অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। অনেক সময় দস্যুভয়ে তাঁহাদিগকে সশঙ্ক থাকিতে হইত; অনেক সময় রাজকর্ম্মচারিগণের অত্যাচার সহ্য করিতে হইত। শেষোক্ত কারণে চীনের সম্রাটের সহিত এবং তাঁহার প্রতিনিধিগণের সহিত নানারূপ বন্দোবস্ত করার আবশ্যক হইয়াছিল। খৃষ্টজন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে ঔপনিবেশিকগণ কি ভাবে চীন-দেশে বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহার আভাস পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছি। পরবর্ত্তিকালে উপঢৌকনাদি-প্রদানে সম্রাটের

উপঢৌকনে বাণিজ্যের সুবিধা।

* 'লঙ্-গ' (লঙ্গ) নাম দেখিয়া কেহ কেহ লঙ্কার বণিকগণ কর্ত্তৃক ঐ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু একটু অনুধাবন করিলে বুঝা যায়, বঙ্গদেশীয় বণিকগণ কর্ত্তৃক ঐ উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশ-প্রসঙ্গে এতদ্বিষয়ের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

† *Vide* Professor Terrien De Lacouperie's (1) *Western Origin of the Early Chinese Civilisation*, (2) *Catalogue of Chinese Coins from the VII Century B. C. to A. D. 621.*

সন্তুষ্টি-সাধনের ব্যবস্থা হয়। সেই উপঢৌকন—চীনা-ভাষায় "কুঙ" শব্দে অভিহিত হইত। চীনা-ভাষায় ঐ শব্দের অর্থ—সম্রাটের প্রতি সম্মান-জ্ঞাপক উপঢৌকন বা 'নজর' বুঝায় বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'কুঙ' উপঢৌকনে আদান-প্রাদান বা বিনিময় বুঝাইত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 'রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে' ডক্টর হার্থ 'কুঙ' শব্দ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন,—'কুঙ'-শব্দে প্রকৃত পক্ষে বিনিময় বুঝাইত। ভারতীয় বণিকগণ চীনদেশে উপস্থিত হইয়া সম্রাটের নিকট সম্মান জানাইবার জন্য আপনাদের দ্রব্য-সামগ্রী তাঁহাকে উপহার দিতেন; এবং উপহার প্রদানের সময় যেন কোনও ভারতীয় নৃপতির নিকট হইতে চীনদেশে গমন করিয়া সেই ভারতীয় নৃপতির আদেশে সম্রাটকে ঐ সকল দ্রব্য-সামগ্রী উপহার দিতেছেন,—এইরূপ ভাবই প্রকাশ করিতেন। তাহাতে চীন-সম্রাট্ পরিতুষ্ট হইতেন এবং প্রাপ্ত-দ্রব্যের বিনিময়ে আপনার দেশের দ্রব্য-সামগ্রী উপহার-স্বরূপ প্রদান করিতেন। চীনের রাজকীয় গ্রন্থাদিতে এ বিষয়ে যে বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, অর্থাৎ যে পরিমাণ সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া সম্রাট যে পরিমাণ সামগ্রী প্রদান করিতেন—তাহার যে আভাস পাওয়া যায়, তাহাতে 'কুঙ' শব্দে বিনিময়-বাণিজ্য ভিন্ন অন্য কোনও অর্থই সূচিত হয় না।'* এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া ডক্টর হার্থ বলিয়াছেন,—'অধুনা সন্ধি-সর্ত্তের ফলে বিভিন্ন দেশে যে বাণিজ্য-ব্যবসায় চলিয়াছে, সেকালে 'কুঙ'-উপঢৌকনে আদান-প্রদান-ব্যপদেশে প্রকারান্তরে সেই প্রথাই প্রচলিত ছিল।' 'কুঙ'-উপঢৌকন-দানে ভারতীয় বণিকগণের প্রথম ও দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দে বাণিজ্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায়। চীন-সম্রাট হোতি (হোটি) ৮৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। চীন-সম্রাট হিয়ান্তি (হিয়াণ্টি) ১৫৮-১৫৯ খৃষ্টাব্দে চীনদেশে রাজত্ব করেন। ঐ দুই সম্রাটের রাজত্ব-কালে ভারতবর্ষের রাজদূতগণ চীনে উপনীত হইয়াছিলেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য চীন-সম্রাটকে উপঢৌকন প্রদান করিয়া আসিয়াছিলেন। এইরূপ উপঢৌকন-প্রদানে সম্রাটের সহিত ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত করায়, চীনরাজ্যে ভারতীয় বণিকগণের বাণিজ্যের বাধা-বিঘ্ন বিদূরিত হয়। এই 'কুঙ' বা উপঢৌকন গ্রহণের জন্য খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন-সম্রাট কতকগুলি কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বৈদেশিক বণিকগণের তত্ত্বাবধানের এবং বাণিজ্য-সৌকর্য্যের ভার তাঁহাদের উপর ন্যস্ত ছিল। চীনদেশের রাজকীয় কার্য্যবিবরণীতে এ সকলের উল্লেখ আছে। লঙ্কা-দ্বীপের বিবরণ লেখক সার ইমার্সন টেনেন্ট্, 'কুঙ' উপঢৌকন গ্রহণ সম্বন্ধে ডক্টর হার্থের মতেরই পোষকতা করিয়া লিখিয়াছেন,—'চীনদেশের রাজকীয় বিবরণীতে যদিও উপঢৌকন-প্রথাকে সম্রাটের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের হেতুভূত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয়

* "Foreign trade had for long time been covered by the name, inseparable from the early foreign enterprise of Chinese Courts, of 'tribute.' The word 'tribute', in Chinese, *Kung*, was nothing but a substitute for what might as well as have been called 'exchange of produce' or 'trade', the trade with foreign nations being a monopoly of the Court."—Dr. F. Hirth Ph. D., in the *Journal of the Royal Asiatic Society*, for 1896.

দেশের মধ্যে বাণিজ্য-সম্বন্ধের সুবিধার জন্যই ঐরূপ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তাতার-বংশজ কুবলাই খাঁ যখন চীনের সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত, ভারতীয় বণিকগণ তখনও এইভাবে বাণিজ্য-সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তৎকালে ভারতীয় চারি জন নৃপতির রাজ্য হইতে এবং ভারত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে বণিকগণ এইভাবে চীনদেশে বাণিজ্য-ব্যবসায় চালাইবার সুবিধা পাইয়াছিলেন।* লঙ্কাদ্বীপ চিরকালই ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিচিত। লঙ্কাদ্বীপের বণিকগণও চীনদেশে এই প্রকার বাণিজ্যের সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ফলতঃ, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভে হিন্দু-বণিকগণ যে প্রথার প্রবর্ত্তনায় চীনদেশে বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া লইয়াছিলেন, মোগল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার দিনেও সেই প্রথা প্রচলিত ছিল এবং আজিও রূপান্তরে সেই প্রথাই চলিয়া আসিতেছে।

অর্ণবপোতের আকৃতি-দৃষ্টে।

যে সকল অর্ণবপোতে বণিকগণ চীনদেশে গতিবিধি করিতেন, তাহার কোনও পোতের সম্মুখভাগ মকরাকৃতি, কোনও পোতের সম্মুখভাগ ময়ূরাকৃতি, কোনও পোতের সম্মুখভাগ অন্যান্য জীবজন্তুর প্রতিকৃতির অনুকরণে গঠিত হইত। এবম্প্রকার প্রতিকৃতিযুক্ত পোতসমূহের বিষয় আলোচনা করিলে, তৎসমুদায় যে ভারতীয় শিল্পিগণের শিল্পচাতুর্য্যের পরিচয়, তাহাই বুঝা যায়। অধ্যাপক লাকুপেরি কিন্তু ঐ সকল পোত ফিনিসীয়গণের অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার সে সিদ্ধান্ত—ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত। কারণ, ভারতবর্ষই ঐ প্রকার পোতের উৎপত্তি-স্থান। কোন্ স্মরণাতীত কাল পূর্ব্ব হইতে ঐ প্রকার আকৃতিযুক্ত পোতের প্রচলন ভারতবর্ষে আছে, একটু অনুসন্ধান করিলেই তাহা প্রতীত হয়। অথচ, ঐ প্রকার আকৃতিযুক্ত পোতে অধ্যাপকপ্রবর কি করিয়া ফিনিসীয়ার অনুসরণ উপলব্ধি করিলেন, বুঝিতে পারি না। একটা সাদা কথায় এ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। আমরা পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করিয়াছি, ভারতবর্ষই ময়ূরের উৎপত্তি-স্থান; ভারতবর্ষ হইতেই ময়ূর সলোমনের ও হীরামের রাজ্যে রপ্তানি হইয়াছিল। যে দেশ ময়ূরের উৎপত্তি-স্থান, যে দেশ সর্ব্বদা ময়ূর সম্মুখে দেখে, ময়ূরের প্রতিকৃতি অঙ্কন করা—খোদাই করা সেই দেশেরই স্বাভাবিক কার্য্য। অন্য দেশ তাহার অনুকরণ করিতে পারে। কিন্তু যাহা তাহার নিজস্ব, তদ্বিষয়ে অন্যের অনুকরণের অনুকরণ করিতে তাহার কখনই প্রবৃত্তি হয় না। ভগীরথ কোন্ যুগে মর্ত্ত্যধামে গঙ্গা দেবীকে আনয়ন করেন, তাহার কাল-নির্ণয়ে কল্পনা পর্য্যুদস্ত হয়। গঙ্গা মকরবাহনে আগমন করেন, ইহাই প্রসিদ্ধি। সেই মকরবাহন স্মৃতির অনুসরণে পুরোভাগে মকর-মূর্ত্তি-সমন্বিত পোত প্রস্তুত হওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। প্রাচীন ভারতের শিল্প-সম্পদের মধ্যে পূর্ব্বোক্তরূপ আকৃতিবিশিষ্ট পোতের নানা প্রতিকৃতি আছে। সাঁচীর স্তূপ—প্রাচীন ভারতের স্থাপত্যের ও কারুকার্য্যের গৌরব-স্মৃতি। সেই স্তূপের পশ্চিম-তোড়ণ-দ্বারে একখানি অর্ণবপোতের প্রতিকৃতি খোদিত আছে। সেই পোত—মকরাকৃতিবিশিষ্ট। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করেন, খৃষ্টজন্মের তিন শত বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তরোপরি ঐ পোতের প্রতিকৃতি

* *Vide* Sir Henry Yule's *Cathay and the Way thither.*

খোদিত হইয়াছিল। * বঙ্গাধিপতি সিংহবাহুর পুত্র বিজয়, সিংহল-দেশ অধিকার করেন। প্রতিপন্ন হয়, খৃষ্ট-জন্মের অনূ্যন ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে সেই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। যেরূপ নৌযানের সাহায্যে তিনি সিংহল-দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, অজন্তার গুহাভ্যন্তরে প্রাচীর-গাত্রে তাহার প্রতিকৃতি অঙ্কিত আছে। সেই চিত্র খৃষ্ট-জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তিকালে অঙ্কিত হইয়াছিল। সে চিত্রের পোত-সমূহে জীব-জন্তুর মুখের আকৃতি দেখিতে পাই। মুখ-চোখ সে চিত্রে স্পষ্ট প্রকটিত আছে। প্রাচীন স্থাপত্যের মধ্যে পোতাদির এবংবিধ প্রতিকৃতির কোথাও অসদ্ভাব নাই। হিন্দুগণ যব-দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। কিরূপ আকৃতিবিশিষ্ট পোতে তাঁহারা যবদ্বীপে উপনীত হন, সেই পোতের অনুসন্ধান লউন। সেই পোতের প্রতিকৃতি যবদ্বীপে 'বোরোবোদার'-মন্দিরের স্থাপত্যের মধ্যে খোদিত আছে। সেই প্রতিকৃতি মকরাদি জীবের আকৃতিবিশিষ্ট। এই সকল বিষয় অনুধাবন করিলে প্রতিপন্ন হয়, অর্ণবপোতের ঐ প্রকার আকৃতি ভারতবর্ষের প্রবর্ত্তনা এবং পুরাবৃত্তে প্রত্নতত্ত্বে সে প্রমাণ জাজ্বল্যমান্ রহিয়াছে। সুতরাং স্বদেশের অর্ণবপোতে চীনদেশে গমন করিয়া ভারতবাসীরা চীনে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, এতৎপ্রসঙ্গে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

বাণিজ্য উপলক্ষে চানদেশে উপনিবেশ-স্থাপন এবং সেই উপনিবেশ পরিবর্ত্তন ও পরিত্যাগ সম্বন্ধে অধ্যাপক লাকুপেরি বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভারতীয় বণিকগণের চীনদেশে উপনিবেশ-স্থাপনের যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, সেই বিবরণ পাঠ করিলে বুঝিতে পারি, ঔপনিবেশিকগণ প্রথমে স্বাধীন ছিলেন; চীন-সাম্রাজ্যের সীমানার বাহিরে তাঁহাদের নূতন রাজ্যের অভ্যুদয় হইয়াছিল। চীন-সাম্রাজ্য দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইলে, ঔপনিবেশিকগণের নানা অসুবিধা উপস্থিত হয়। তখন তাঁহারা আপনাদের কার্য্যক্ষেত্রের স্থান-পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। যখন মাত্র হোয়াং-হো নদীর তীরদেশে চীন-সাম্রাজ্যের আধিপত্য বিস্তৃত ছিল, চীনের অধিকাংশ প্রদেশ যখন অসভ্য জনগণে ও বনজঙ্গলে পূর্ণ ছিল, ঔপনিবেশিকগণ তখন 'সান্-টুঙ্'-উপদ্বীপের দক্ষিণাংশে 'কিয়াও-চাউ' উপসাগরের সন্নিকটে আপনাদের কার্য্যক্ষেত্র নির্দ্ধারণ করিয়া লইয়াছিলেন। ৬৭৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ৩৭৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ প্রদেশে ঔপনিবেশিকগণের আধিপত্য বিস্তৃত ছিল। ৫৪৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে পারিপার্শ্বিক চীন-রাজ্যের প্রাধান্য তাঁহাদিগকে কিয়ৎ-পরিমাণে মানিয়া লইতে হইয়াছিল। ৪৯৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে এবং পরিশেষে ৪৭২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন রাজশক্তির প্রভাবে তাঁহাদিগকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। শেষোক্তাব্দে 'য়ু-য়ে' রাজবংশ তাঁহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। অগত্যা তাঁহারা 'লংগ' (লঙ্গ) ও 'শিমু' নগরদ্বয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ২০৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে প্রথমোক্ত স্থান হইতে এবং ১৪০—১১০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে শেষোক্ত স্থান হইতেও তাঁহাদিগকে চলিয়া যাইতে হয়। তখন ক্বেই-কি (Kwei-Ki) ও টুঙ্-য়ে (Tung-yeh) বন্দরদ্বয়ে তাঁহাদের নূতন উপনিবেশ

উপনিবেশে আধিপত্য।

* *Sanchi and Its Remains* by General F. C. Maisley.

প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশেষে আনাম উপকূলে, কাম্বোডিয়ার পশ্চিমে, তাঁহাদিগকে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। ৪৭২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে চীনারা যখন ঔপনিবেশিকগণের প্রধান উপনিবেশ 'লঙ্ক' অধিকার করিয়া লইয়া সেইস্থানে আপনাদের রাজধানী স্থাপন করেন, সেই সময়ে, রাজকীয় বিবরণীতে প্রকাশ, ঔপনিবেশিকগণের বাণিজ্য-তরণীর সাহায্যে চীনাদিগের ২৮০০ সৈন্য তাহাদের নূতন রাজধানীতে সংবাহিত হইয়াছিল। লঙ্ক-উপনিবেশ পরিত্যাগের পর, যে কারণেই হউক, অর্দ্ধশতাব্দী কাল ভারতীয় বণিকগণকে বাণিজ্যের পথ পরিবর্ত্তন করিতে হয়। তখন তাঁহারা মালাক্কা-প্রণালীর পথ পরিত্যাগ করিয়া, সুমাত্রা ও যবদ্বীপের দক্ষিণভাগ দিয়া, চীন-দেশে গতিবিধি করিতে আরম্ভ করেন। সে সময়ে যে সকল পণ্য চীন-রাজ্যের দক্ষিণ-উপকূলে বিক্রীত হইত, তাহার অধিকাংশই ভারতের সামগ্রী। সে সময়ে চিনি ও মিছরী একমাত্র ভারতের ইক্ষু হইতেই উৎপন্ন হইত। ভারতীয় বণিকগণ সেই চিনি, মিছরী ও ইক্ষু সর্ব্বপ্রথম, খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে, চীনদেশে লইয়া গিয়াছিলেন। ভারত-মহাসাগর মুক্তার ও শুক্তির আকর। বণিকগণ ঐ সময়ে মুক্তা ও শুক্তি চীনদেশে লইয়া গিয়াছিলেন। উত্তর-ভারতের গণ্ডার ঐ সময় চীনে বিক্রীত হইত। তখন বাদাখানের পান্না, চুণী ও 'আস্‌বেষ্টোস' কাষ্ঠ সমুদ্র-পথে বণিকেরা চীনে বিক্রয়ার্থ লইয়া যাইতেন। চীন-দেশের রাজকীয় বিবরণীতে এবম্বিধ ভারতজাত দ্রব্যের নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে (৩২৪-৩১০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে) ভারতের ঐ সকল পণ্য-দ্রব্য চীনদেশে বিক্রীত হইত,—অধ্যাপক লাকুপেরি তাহা সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছেন। খৃষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে লোহিত-সাগরের উপকূলভাগ হইতে পাশ্চাত্য-দেশের বণিকগণ চীনদেশাভিমুখে গতিবিধি আরম্ভ করেন। ভারতীয় বণিকগণ তখন 'হোপ্‌স্ন' ও 'কাটিগড়' নামক বন্দরদ্বয়ে আপনাদের বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ বন্দরদ্বয় চীন-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলেও সেখানে চীনাদিগের পূর্ণ-প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। ঐ দুই বন্দরে দক্ষিণ-ভারতের বহু সুগন্ধ মশলা, ময়ূর, প্রবাল প্রভৃতির ব্যবসা চলিয়াছিল। ভারতের ময়ূর ইহার বহু পূর্ব্বে পাশ্চাত্য-দেশে রপ্তানি হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যাইলেও, চীনদেশে ময়ূর এই প্রথম আমদানি হইয়াছিল বলিয়া লাকুপেরি সিদ্ধান্ত করেন। এই সময়েই চীনের 'হৈনান' দ্বীপের পশ্চিম-উপকূলে সর্ব্বপ্রথম মুক্তার আকর আবিষ্কৃত হইয়াছিল। শুক্তির ও মুক্তার উদ্ধারে পারদর্শী ভারতীয় নাবিকগণ, চীনদেশের সন্নিকটে সাগরে এই প্রথম মুক্তার আকর আবিষ্কার করেন। পরবর্ত্তিকালে ১১১ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে চীন-সম্রাটের রাজধানীতে রাজকীয় উদ্যানে ভারতের বহু তরু-লতা রোপিত হইয়াছিল। ভারতের বণিকগণ সম্রাটকে সেই সকল সরবরাহ করিয়াছিলেন। ইহার পর একবার নানাবিধ উজ্জ্বল মুক্তা, সুদর্শন প্রস্তর এবং বিবিধ বর্ণের কাচ চীন-সম্রাটের দরবারে বণিকগণ উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। সেই সকল উপহৃত সামগ্রী দেখিয়া ঔপনিবেশিকগণের নিকট ঐ সকল সামগ্রী সংগ্রহের জন্য সম্রাট তাঁহাদের বন্দরে দূত প্রেরণ করেন। খৃষ্ট-জন্মের পরবর্ত্তিকালে পূর্ব্বোক্ত ঔপনিবেশিক বণিকগণের বিশেষ কোনও কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। চীনদেশের একখানি প্রাচীন গ্রন্থে (ফুনাম-তু-

সু-চুয়াং) লিখিত আছে,—'খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৫৩ অব্দের পর হইতে কাম্বোডিয়াই ভারতীয় বণিক-গণের বাণিজ্যের একমাত্র কেন্দ্রস্থল মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। ঐ গ্রন্থের মতে 'কুস্থিন্' নামক জনৈক হিন্দু কর্ত্তৃক কাম্বোডিয়া-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্ত্তী কয়েক শতাব্দী কাল ঐ বন্দর হইতেই চীনদেশের বাণিজ্য চলিয়াছিল। শেষে এই উপনিবেশও প্রাধান্য হারাইয়াছিল। তখন যে ভাবে বাণিজ্য চলিয়াছিল, তাহার পরিচয় সেদিন পর্য্যন্ত দেদীপ্যমান ছিল।' বৈদেশিক বাণিজ্যের তত্ত্বাবধানের জন্য খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে 'ফু-কিন' বন্দরে চীনরাজের জনৈক কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার নাম—'চাউ-জু-কুয়া'। তিনি 'চু-কাউ-চি' অর্থাৎ বৈদেশিক জাতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেই বিবরণে চীনদেশে প্রাচ্য-জাতির বাণিজ্যের প্রসঙ্গ আছে। মালবার-রাজ্যের বিষয় উল্লেখ করিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন,—তাঁহার পরিচিত দুই জন ব্যক্তি বাণিজ্য-ব্যপদেশে মালবার হইতে চীনদেশে গমন করেন, এবং সেখানে গিয়া 'চুয়ান' নগরের দক্ষিণে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই দুই ব্যক্তিকে 'শি-লো-পা-কি-লি-কান' অর্থাৎ পিতা ও পুত্র বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে। চাউ-জু-কুয়ার সময়ে চুয়ান নগরের দক্ষিণস্থিত পল্লীতে আর একটী বৈদেশিক উপনিবেশের অস্তিত্ব ছিল। 'লো-হু-না' (সম্ভবতঃ রাহুল) নামক জনৈক ভারতীয় ধর্ম্মযাজক সেই পল্লীতে, দশম শতাব্দীর শেষভাগে, একটি বৌদ্ধ-মঠ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ৯৮৪ হইতে ৯৮৮ খৃষ্টাব্দে রাহুল সমুদ্র-পথে যাত্রা করিয়া ভারত হইতে চীনে উপনীত হন। সেই সময়ে ভারতের অনেক বণিক ঐ বন্দরে বাস করিতেন। তাঁহারা ধর্ম্মযাজক রাহুলকে স্বর্ণ, রেশম, জহরত ও মূল্যবান প্রস্তর-সমূহ উপঢৌকন দিতে অগ্রসর হন। কিন্তু রাহুলের ঐ সকল সামগ্রীর কোনই অভাব ছিল না। ঐ সকল উপঢৌকনের সাহায্যে রাহুল পূর্ব্বোক্ত ভূখণ্ড ক্রয় করেন। সেই ভূ-খণ্ডে এক বৌদ্ধ-মঠ নির্ম্মিত হয়। ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, দশম শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সময়েও চুয়ান-নগরের দক্ষিণাংশে ভারতীয় বণিকগণের উপনিবেশ ছিল। ঔপনিবেশিকগণ তখন স্বাধীন ছিলেন না বটে ; কিন্তু চীনের সহিত তাঁহাদের ঔপনিবেশিক সম্বন্ধ একেবারে ছিন্ন হয় নাই। 'মা-তুয়ান-লিন' খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চীনা-ভাষায় বৃহৎ অভিধান সঙ্কলন করেন। শত খণ্ডে সেই অভিধান সম্পূর্ণ হয়। সেই অভিধানে চীনের বিভিন্ন বন্দরে বাণিজ্য-তত্ত্বাবধায়কগণের প্রসঙ্গ আছে। ৯৯৯ খৃষ্টাব্দে বৈদেশিক বণিকগণের বিচারাদি সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা ছিল, উহাতে তাহা জানা যায়। ঐ সময়ও বৈদেশিকগণ আপনাদের স্বজাতীয় বিচারপতির নিকট বিচার প্রাপ্ত হইবার ক্ষমতা পাইয়াছিলেন। কতকটা বৈদেশিকগণের অনুরোধে, কতকটা বৈদেশিক বিভাগের কর্ম্মচারিগণের সুবিধার জন্য, এই ব্যবস্থা বিহিত হয়। * এই সময় আরবের, পারস্যের ও ভারতের বণিকগণ চীনদেশে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। ইহার পর ঔপনিবেশিকগণের আধিপত্য-লোপের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যের পদ্ধতি পরিবর্ত্তিত হয়।

---

* ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের 'রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে' ডক্টর হার্থ এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া গিয়াছেন।

প্রাচীনকালে চীনদেশ হইতে যে সকল পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত মধ্যেও ভারতবর্ষের বাণিজ্য-সম্পদের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

পরিব্রাজকগণের বর্ণনায় বাণিজ্য-প্রসঙ্গ।

চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণের মধ্যে ফা-হিয়ান সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে আগমন করেন। বৌদ্ধ-ধর্ম্মগ্রন্থ 'বিনয়পিঠক' প্রভৃতির সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের জন্য প্রধানতঃ তিনি ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। ৩৯৯ খৃষ্টাব্দে স্বদেশ হইতে যাত্রা করিয়া মধ্য-এসিয়ার মধ্য দিয়া ছয় বৎসরে তিনি ভারতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে আসিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সংক্রান্ত পুস্তক-সমূহ পাঠ করিতে ও সংগ্রহ করিতে ভারতবর্ষে আরও ছয় বৎসর অতীত হইয়া যায়। বার বৎসর পরে (৪১১ খৃষ্টাব্দে) বঙ্গদেশান্তর্গত তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে, ভারতীয় বণিকগণের একখানি অর্ণবপোতে তিনি স্বদেশ-যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনায় প্রকাশ,—সেই অর্ণব-পোত সমুদ্রপথে দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে সিংহল-দ্বীপে উপনীত হয়। সু-বাতাসের সাহায্যে একপক্ষ কাল দিবারাত্রি চলিয়া অর্ণবপোত সিংহলে পৌঁছিয়াছিল। ফা-হিয়ান দুই বৎসর কাল সিংহলে অবস্থান করেন। সেই সময়ে জনৈক বণিক, তত্রত্য বৌদ্ধ-মূর্ত্তির নিকট চীনদেশজাত শ্বেতরেশম-বিনির্ম্মিত একখানি ব্যজন উপহার দিয়াছিলেন। সেই ব্যজন দৃষ্টে পরিব্রাজকের নেত্র অশ্রু-অভিষিক্ত হয়। বার বৎসর পরে স্বদেশের সামগ্রী দেখিতে পাইয়া তাঁহার মনোমধ্যে স্বদেশের স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছিল, আর তাহাতেই তাঁহার নেত্রে বাষ্পসঞ্চার হইয়াছিল। ফা-হিয়ানের গ্রন্থে এই ব্যজনের উল্লেখ—ভারতের সহিত চীনের বাণিজ্য-সম্বন্ধের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। সিংহলে অবস্থান-কালে ফা-হিয়ান বহু সংস্কৃত ভাষার পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সিংহল হইতে যাত্রার সময় বণিকগণের অপর এক বাণিজ্যপোতে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময় সমুদ্র-পথে ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতে তাঁহাকে বড়ই বিপন্ন করিয়াছিল। একাদিক্রমে নব্বই দিন কাল ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত-হেতু বাণিজ্য-পোতের বহু সামগ্রী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, এবং পরিব্রাজকের বহু সঙ্গী বিনষ্ট হন। পরিব্রাজক এতদিন কাল বহু ক্লেশ সহ্য করিয়া ধর্ম্ম-গ্রন্থ-সমূহের যে সকল পাণ্ডুলিপি ও বুদ্ধদেবের যে সকল প্রতিমূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এই সময় তৎসমুদায় জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার নিতান্ত সৌভাগ্য-হেতু সে সকল কোনপ্রকারে রক্ষা পায়। নব্বই দিন পরে অর্ণবপোত মালয়-দ্বীপ-পুঞ্জের অন্তর্গত যব-দ্বীপে উপনীত হয়। যব-দ্বীপ তখন হিন্দুদিগের উপনিবেশ-মধ্যে সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ছিল। পাঁচ মাস কাল যব-দ্বীপে অবস্থানের পর পূর্ব্বরূপ সুবৃহৎ অপর একখানি অর্ণবপোতের সাহায্যে, পূর্ব্বরূপ বাত্যা-বিতাড়িত সমুদ্রের মধ্য দিয়া, ব্যশীতি দিবসের পর ফা-হিয়ান চীনের উপকূলে উপনীত হন। 'কিয়া-চাউ' উপসাগরে ভারতীয়-গণের প্রাচীন উপনিবেশ 'শি-মো' বন্দরের পশ্চিমে ফা-হিয়ান পোত হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, আপনার ধর্ম্মোপদেষ্টার অভিমতক্রমে, ফা-হিয়ান আপনার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন। ফা-হিয়ানের সেই ধর্ম্মোপদেষ্টার নাম—কুমার-জীব। কুমার-জীব ভারতবর্ষ হইতে ধর্ম্ম-প্রচার উদ্দেশ্যে চীনদেশে গমন করিয়া-

ছিলেন। চীনদেশের অনেকেই তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিল। ফা-হিয়ান যে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যে নানাস্থানে নানা আকারে ভারতের বাণিজ্য-প্রভাবের বিষয় প্রকটিত রহিয়াছে। যে বাণিজ্য-পোতে আরোহণ করিয়া ফা-হিয়ান যব-দ্বীপ হইতে চীনদেশে গমন করেন, সেই পোতে দুই শতের অধিক যাত্রীর স্থান ছিল; আর সেই সকল যাত্রীর নব্বই দিনের অধিক কাল ব্যবহারের উপযোগী খাদ্য-দ্রব্য ও পানীয় রক্ষিত হইয়াছিল; অধিকন্তু বণিকগণের বিবিধ পণ্য-দ্রব্যে পোত পরিপূর্ণ ছিল। তবেই বুঝিয়া দেখুন—সে বাণিজ্য-পোত কত বৃহৎ, আর কত বৃহৎ বাণিজ্য-পোত-নির্ম্মাণে ভারতবর্ষ কত কাল পূর্ব্ব হইতে অভ্যস্ত ছিল! সেই ভীষণ ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতের মধ্য দিয়া, মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকারময় সমুদ্র-পথ অতিক্রম করিয়া, ভারতবর্ষ হইতে সুদূর চীন-রাজ্যে উপনীত হওয়ার বিষয় অনুধাবন করিলেই বা কি কথা মনে হয়? মনে হয় না কি—ঐ পথে ভারতীয় বণিকগণের সর্ব্বদা গতি-বিধি ছিল! তাই তাঁহারা সে দুর্য্যোগের মধ্যেও পোত-পরিচালনায় সমর্থ হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন কাল হইতেই জ্যোতির্ব্বিদ্যার আলোচনায় প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন। চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর উদয়াস্ত দৃষ্টে অর্ণবপোত পরিচালনা সম্ভবপর বটে; কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন দিবসে অন্ধকারের মধ্যে পোত-পরিচালনা—সর্ব্বদা গতিবিধির পরিচায়ক। প্রাচীন ভারতে দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্রের অস্তিত্ব পূর্ব্বেই আমরা পতিপন্ন করিয়াছি। ফা-হিয়ানের বর্ণনা পাঠ করিলে, (যদিও ফা-হিয়ান সে মত ব্যক্ত করেন নাই) সে সময় দিঙ্‌নির্ণয়-যন্ত্রের ব্যবহার ছিল বলিয়াও মনে হইতে পারে। নচেৎ সে পথে, সে তরঙ্গ-সমাকুল অন্ধকারময় ভীষণ সমুদ্রের মধ্য দিয়া, পোত-চালনা কখনই সম্ভবপর নহে। চীনদেশে যে সকল বাণিজ্য-পোত গতিবিধি করিত, তৎসমুদায়ের সম্মুখভাগ মকরাদি জন্তুর আকৃতিবিশিষ্ট ছিল। তদ্দৃষ্টে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, চীনদেশীয় বণিকগণই এদেশে বাণিজ্য করিতে আসিতেন অর্থাৎ চীনদেশের বাণিজ্যে ভারতীয় বণিকগণের বিশেষ কোনও কৃতিত্ব ছিল না। এ উক্তির প্রতিবাদ পূর্ব্বেই (এই খণ্ডের ৭৯ম পৃষ্ঠায়) করিয়াছি। ফা-হিয়ানের স্বদেশ-যাত্রার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেও সে প্রতিবাদ দৃঢ় হয়। ফা-হিয়ান পাঁচ মাস যব-দ্বীপে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। যব-দ্বীপে অবস্থান-কালে তিনি দেখিয়াছিলেন,—যব-দ্বীপ তখন হিন্দুগণের উপনিবেশ-ক্ষেত্র; সেখানে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রবল প্রভুত্ব। সেখানে তখনও বৌদ্ধ-ধর্ম্ম বিশেষভাবে বিস্তৃত হইতে পারে নাই। যব-দ্বীপে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত একটী খোদিত-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পঞ্চম খৃষ্টাব্দে বা তাহার পূর্ব্বে সেই লিপি খোদিত হইয়াছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এই লিপির আবিষ্কারেও ফা-হিয়ানের উক্তি সমর্থিত হইতেছে। ফা-হিয়ানের যব-দ্বীপে অবস্থিতির বহু শতাব্দী পূর্ব্বে যব-দ্বীপ হিন্দুগণের লীলাভূমি ছিল। নানাপ্রকারে ইহা প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু ফা-হিয়ানের যব-দ্বীপে অবস্থিতি-কালে বা তাহার পূর্ব্বে চীন-দেশের কোনও অধিবাসী যবদ্বীপ পর্য্যন্তও কখনও আসিয়াছিলেন বলিয়া কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। যদি বাণিজ্য-ব্যপদেশে ভারতবর্ষে অথবা যবদ্বীপে চীনাদিগের গতিবিধি

থাকিত, তাহা হইলে ফা-হিয়ান নিশ্চয়ই কোনও চীনাকে ভারতবর্ষে অথবা যব-দ্বীপে দেখিতে পাইতেন এবং আপন গ্রন্থে তাহার বিষয় উল্লেখ নিশ্চয়ই করিয়া যাইতেন। স্বদেশের একখানি রেশমী পাখা দেখিয়া স্বদেশের স্মৃতি মনে জাগরূক হওয়ায় যাঁহার নেত্রে বাষ্পসঞ্চার হয়, আর সেই বিষয় যিনি আপন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিতে গৌরব অনুভব করেন, স্বদেশের কোনও মানুষকে দেখিলে তিনি কখনই তাঁহার বিষয় উল্লেখ করিতে বিরত হইতেন না। সুতরাং সমুদ্র-পথে বাণিজ্য-পোত-পরিচালনে ভারতের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার উদ্দেশ্যে যাঁহারা চীনের প্রাধান্য খ্যাপন করেন, তাঁহারা যে নিতান্ত ভ্রান্ত-বুদ্ধি-পরিচালিত একদেশদর্শী, তাহা বলাই বাহুল্য। ফা-হিয়ান যে অর্ণবপোতে চীনদেশে যাত্রা করিয়াছিলেন, সেই অর্ণবপোতে কতকগুলি বাণিজ্যোপজীবী ব্রাহ্মণ চীন-দেশে যাইতেছিলেন। ফা-হিয়ানের এই বর্ণনা পাঠ করিয়া কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, —সেকালে কি ব্রাহ্মণেরাও বণিক-বৃত্তি অবলম্বন করিতেন? শাস্ত্রে আপৎকালে (বিশেষ বিশেষ সামগ্রী সম্বন্ধে) ব্রাহ্মণের বণিক-বৃত্তির বিধান আছে। সুতরাং ফা-হিয়ানের সহযাত্রীর মধ্যে বণিক-ব্রাহ্মণের বিদ্যমানতা অসম্ভব নহে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভিনিসীয় পরিব্রাজক মার্কোপোলো চীনদেশে কতকগুলি বণিক ব্রাহ্মণ দেখিয়াছিলেন। সেই সকল বণিক-ব্রাহ্মণ গুজরাট ও কোঙ্কণ প্রদেশ হইতে (চৌল, টানা, বরৌচ প্রভৃতি বন্দর হইতে) চীনদেশে বাণিজ্য করিতে গমন করিয়াছিলেন। মার্কোপোলোর গ্রন্থে সেই ব্রাহ্মণ-বণিকগণের সত্যবাদিতা সম্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসা লিখিত আছে। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—'এই ব্রাহ্মণগণকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বণিক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা সত্যপরায়ণ। পৃথিবীতে এমন কোনও প্রলোভনের সামগ্রী নাই, যাহাতে তাঁহাদিগকে সত্য-ভ্রষ্ট করিতে পারে। যাঁহারা বিদেশ-গমনে অনভ্যস্ত ও বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধা-অসুবিধার বিষয় অনবগত ছিলেন, তাঁহারা যদি ঐ সকল ব্রাহ্মণগণকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহাদের উপর আপনাদের পণ্য-দ্রব্যের বিক্রয়-ভার ন্যস্ত করিতেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণ সেই সকল সামগ্রীকে আপনার সামগ্রী মনে করিয়া তাহার সম্পূর্ণ লভ্যাংশ বিশ্বাসকারীকে প্রদান করিতেন। পরিশেষে বিশ্বাসকারী ব্যক্তি অনুগ্রহ করিয়া যে লভ্যাংশ বিক্রয়কারী ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিতেন, তাহাতেই তাঁহারা সন্তুষ্ট হইতেন।' মার্কো-পালোর গ্রন্থে ঠিক ব্রাহ্মণ শব্দের উল্লেখ নাই। তিনি ফরাসী-ভাষায় যে উচ্চারণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে ইংরাজী ভাষায় আব্রৈমান (Abraiman) শব্দ লিখিত হইয়াছে। ঐ শব্দ—ব্রাহ্মণ শব্দের বিকৃত-উচ্চারণ বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। কেহ কেহ আবার বলেন, —বেণিয়া শব্দের বিকৃত-উচ্চারণেই এরূপ হইয়াছে। কারণ, গুজরাট-প্রদেশের বেণিয়াগণ অনেক দিন হইতে বাণিজ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন। ব্রাহ্মণগণই হউন আর বেণিয়াগণই হউন, ভারতের গুজরাট-প্রদেশের অধিবাসিগণই যে মার্কোপোলোর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে ঐরূপ প্রশংসা-ভাজন হইয়াছিলেন, তাহাতে সংশয় নাই। চীনদেশে যখন মোগল-বংশীয় কুবলাই খাঁ সম্রাট-পদে অধিষ্ঠিত, মার্কোপোলো সেই সময়ে সতর বৎসর কাল চীনদেশে বসতি করিয়াছিলেন। ভারতীয় বণিকগণের সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার

ভূয়োদর্শনের ফল। ব্রাহ্মণ কি বেনিয়া (বৈশ্য) ভারতের কোন্ বর্ণের বাণিজ্যের বিষয় মার্কোপোলো উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলেও ফা-হিয়ান যে ব্রাহ্মণগণের কথা বলিয়াছেন, তাহা বুঝা যায়। তিনি ভারতবর্ষে বহুকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সুতরাং ব্রাহ্মণের ও বৈশ্যের (বেনিয়ার) পার্থক্য নিশ্চয়ই তিনি অনুধাবন করিয়াছিলেন। ফা-হিয়ানের বর্ণনায় বুঝা যায়, তখনও এক সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ-গণ (সম্ভবতঃ গুজরাট প্রদেশের বা পশ্চিম-ভারতের ব্রাহ্মণগণ) বাণিজ্য-ব্যপদেশে চীন-দেশে গতিবিধি করিতেন। যাহা হউক, যে দিক দিয়াই দেখি, কিবা মার্কোপোলার কিবা ফা-হিয়ানের উভয়ের বর্ণনাতেই চীনদেশে ভারতের বাণিজ্য-প্রভাব প্রতিপন্ন হয়।

কি অবস্থায় কি ভাবে বণিকগণের সঙ্গে ফা-হিয়ান ভারতবর্ষ হইতে যাত্রা করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন, সে বিবরণ বড়ই কৌতুহলোদ্দীপক। ফা-হিয়ানের বর্ণনা হইতেও তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছি। ফা-হিয়ান লিখিয়া গিয়াছেন, তাম্রলিপ্ত হইতে যাত্রা করিয়া দুই পক্ষ পরে তিনি সিংহলে উপনীত হন। সিংহলে তিনি দুই বৎসর অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি আগমাদি বহু ধর্ম্ম-গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। পূর্ব্বে যে সকল ধর্ম্ম-গ্রন্থ ও প্রতিমূর্ত্তি সংগৃহীত হইয়াছিল এবং সিংহল-দ্বীপে যে সকল সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত হয়, তৎসমুদায় সঙ্গে লইয়া ফা-হিয়ান একখানি অর্ণবপোতে আরোহণ করেন। সেই অর্ণবপোতে দুই শতাধিক যাত্রী এবং বহু পণ্য-দ্রব্য সংবাহিত হইতেছিল। সেই সুবৃহৎ অর্ণবপোতের পার্শ্বে একখানি ক্ষুদ্র তরণী রজ্জুদ্বারা সংবদ্ধ ছিল। বৃহৎ-পোত কোনরূপে জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইলে, তৎসংবদ্ধ ক্ষুদ্র-তরণীর সাহায্যে আরোহীরা বিপদে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে,—ইহাই উদ্দেশ্য ছিল। অনুকূল বায়ু-প্রবাহে অর্ণবপোত নির্ব্বিঘ্নে দুই দিবস কাল পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইল। তৃতীয় দিবসে ভীষণ ঝঞ্ঝা উত্থিত হইয়া বারিনিধি কাঁপাইয়া তুলিল;—অর্ণবপোত বিপর্য্যস্ত করিবার উপক্রম করিল। বৃহৎ-পোতের পার্শ্বদেশে বিদার-সঞ্চার হইল। সঙ্গে সঙ্গে পোত-মধ্যে জল প্রবেশ করিতে লাগিল। আরোহিগণ আতঙ্কে ক্ষুদ্র-তরণীতে আশ্রয় লইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু অধিক লোক আরোহণ করিলে গুরু-ভারে ক্ষুদ্র-তরণী জলমগ্ন হইবার সম্ভাবনা;—এই আশঙ্কায়, ক্ষুদ্র-তরণীর নাবিকেরা উভয় তরণীর মধ্যের বন্ধন-রজ্জু কাটিয়া দিল। তখন দুই তরণী সেই অকূল-সমুদ্রের দুই দিকে ভাসিয়া চলিল। একে অন্যের সন্ধান লইতে আর সমর্থ হইল না। ফা-হিয়ান বণিকগণের সঙ্গে বৃহৎ তরণীতেই অবস্থিত রহিলেন। তখন, ছিদ্র দিয়া জল-প্রবেশে গুরুভারে তরণী বিপর্য্যস্ত হয় বুঝিয়া, বণিকগণ আপনাপন পণ্য-দ্রব্যসমূহ জলমধ্যে নিক্ষেপ করিতে বাধ্য হইলেন। কেহ বা পোত হইতে জল তুলিয়া ফেলিতে লাগিলেন; কেহ বা গুরুভার দ্রব্যসমূহ জলে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ফা-হিয়ান নাবিকগণের সহিত জলসেচনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে যে সকল গুরুভার দ্রব্য ছিল, তৎসমুদায় জলমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল। তখন কেবলই তাঁহার শঙ্কা হইতে লাগিল—বুঝি বা তাঁহার বড় আদরের, বড় যত্নের, বড় পরিশ্রমের সংগৃহীত পুস্তকগুলি এবং প্রতিমূর্ত্তিগুলি বণিকেরা জলে ফেলিয়া

ফা-হিয়ানের স্বদেশ-যাত্রা।

দেয়। ফা-হিয়ান কাতরকণ্ঠে ডাকিলেন,—"হে কোয়ান-শি-ইন্ (অবলোকিতেশ্বর)! এই সকল পবিত্র সম্পৎ লইয়া আমি যেন প্রাণে প্রাণে 'হান' (চীন) রাজ্যে পৌঁছিতে পারি। হে ভগবন! শাস্ত্র-গ্রন্থ অনুসন্ধানের জন্য আমি এই দূরদেশে আগমন করিয়াছি। আপনার অলৌকিক শক্তির প্রভাবে এই অর্ণবপোত রক্ষা করুন, এবং আমাকে আমার গন্তব্য বন্দরে পৌঁছাইয়া দেন।" দিবারাত্রি ত্রয়োদশ দিন প্রবল ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়া অর্ণবপোত একটি দ্বীপ-সান্নিধ্যে উপনীত হইল। সেখানে, ভাটার সময়, সমুদ্রের জল একটু সরিয়া গেলে, নাবিকেরা জাহাজের ছিদ্র দেখিতে পাইল। তখন ছিদ্রপথ রুদ্ধ করা হইল। পোত পুনরায় গন্তব্য-স্থানাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। সেই পথে সমুদ্র-মধ্যে বহু জলদস্যুর গতিবিধি ছিল। সৌভাগ্যক্রমে অর্ণবপোত দস্যুগণের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিল। নচেৎ, ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতের গ্রাস হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিলেও জলদস্যুর হস্তে অব্যাহতি ছিল না। চারিদিকে অসীম অনন্ত জলরাশি; পূর্ব্ব-পশ্চিম দিক্ নির্ণয় করিবার উপায় নাই। সূর্য্য-চন্দ্র-নক্ষত্রাদি দেখিয়া নাবিকেরা দিঙ্ নির্ণয় করিতেন। কিন্তু যখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতে পরিপূর্ণ, তখন আর দিক্ নির্ণয় করিবার উপায় মাত্র ছিল না;—বায়ুর গতি-প্রভাবে পোত যেদিকে পরিচালিত হইল, সেই দিকেই নাবিকগণ পোত-চালনায় বাধ্য হইলেন। প্রগাঢ় নৈশ-অন্ধকারে দিগ্বিদিক্ কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না; উত্তাল তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত, মধ্যে মধ্যে অগ্নিবর্ষী বিদ্যুতের বিকাশ এবং কচ্ছপ-কুম্ভীরাদি ভীষণ জলজন্তুর বিভীষিকা—প্রাণ ব্যাকুল করিতে লাগিল। বণিকেরা প্রমাদ গণিলেন; কোন্ পথে কোথায় যাইতেছেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অনন্ত অতল জলরাশি; কোথাও একটি পাহাড়ের চিহ্ন পর্য্যন্ত লক্ষিত হইল না; তাহা হইলে নাবিকেরা সেখানেই পোত-রক্ষা করিতে পারিতেন। যাহা হউক, পরিশেষে যখন আকাশ মেঘ-নির্ম্মুক্ত হইল, নাবিকগণ তখন পূর্ব্বাভিমুখে পোত-পরিচালনা করিলেন। ক্রমশঃ অর্ণবপোত গন্তব্য-পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। সেই বাত্যা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে সহসা যদি কোনও প্রস্তর-স্তূপে অর্ণবপোত প্রতিহত হইত, তাহা হইলে পোতভঙ্গে আরোহিগণের রক্ষার কোনই উপায় ছিল না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেরূপ দুর্ব্বিপদ উপস্থিত হইল না। একই ভাবে নব্বই দিন নব্বই রাত্রি কাটিয়া গেল। অতঃপর অর্ণবপোত 'যো-পথি' রাজ্যে (যবদ্বীপে) উপনীত হইল। এই রাজ্য ব্রাহ্মণগণে ও নাস্তিকগণে পরিপূর্ণ ছিল। ফো অর্থাৎ বুদ্ধদেব তখনও এ রাজ্যে কৃপা-কটাক্ষ-পাত করেন নাই। ফা-হিয়ান ছয় মাস যবদ্বীপে অবস্থান করেন। যব-দ্বীপ হইতে চীনদেশে যাত্রার সময় তিনি পূর্ব্বরূপ অপর একখানি বাণিজ্য-পোতে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে বাণিজ্য-পোতেও দুই-শতাধিক আরোহী সংবাহিত হইতেছিল। পঞ্চাশ দিনের উপযোগী খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় লইয়া চতুর্থ মাসের ষোড়শ দিবসে ঐ বাণিজ্য-পোত যব-দ্বীপ হইতে যাত্রা করিল। অর্ণবপোত উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখে কোয়াঙ-চেও অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। এই অর্ণবপোতে ফা-হিয়ান প্রথম কয়েক দিন কথঞ্চিৎ সুখস্বচ্ছন্দে ছিলেন। একমাস পরে আবার ভীষণ ঝঞ্ঝাবাত ও প্রবল বারিবর্ষণ আরম্ভ হইল। বণিকগণ ও যাত্রিগণ সকলেই সন্ত্রস্ত হইলেন। এই সঙ্কটের

দিনে ফা-হিয়ান পুনরায় 'কোয়ান-শি-ইন' বলিয়া ইষ্টদেবতাকে আহ্বান করিলেন। এক-মনে প্রার্থনা জানাইলেন—"হে দেবতা! রোষ পরিহার করুন; প্রকৃতি প্রশান্ত হউক। বহুকষ্টে সংগৃহীত পবিত্র সামগ্রীসমূহ লইয়া যেন স্বদেশে চীন-রাজ্যে পৌঁছিতে পারি।" প্রভাতে প্রকৃতি প্রশান্তভাব ধারণ করিলে, বণিক-গণ পরস্পর পরামর্শ করিয়া কহিলেন,—"এই সমন (শ্রমণ) আমাদের পোতে আশ্রয় লইয়াছে বলিয়াই যত দুর্ব্বিপদ উপস্থিত হইতেছে। এই ভিক্ষুকে একটা দ্বীপে নামাইয়া দিব। একজনের জন্য এতজনকে বিপন্ন করা সমীচীন নহে।" ঐ অর্ণবপোতে ফা-হিয়ানের একজন পৃষ্ঠপোষক (ট্যান-ওয়ে) ছিলেন। বণিকগণের পরামর্শের বিষয় শ্রবণ করিয়া, তিনি কহিলেন,—"আপনারা যদি এই সমনকে কোনও দ্বীপে নামাইয়া দেন, আমি হান-রাজ্যে পৌঁছিয়াই রাজার নিকট আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিব।" হান-রাজ্যের অধীশ্বর বৌদ্ধধর্ম্মের অনুরাগী। তিনি ভিক্ষুগণকে এবং ধর্ম্মযাজকগণকে সম্মান করিয়া থাকেন। ইহাতে বণিকগণের মনে নানা দুর্ভাবনা উপস্থিত হইল। তখন আর তাঁহারা ফা-হিয়ানকে পোত হইতে নামাইয়া দিতে সাহস করিলেন না। কিন্তু প্রকৃতি পুনরায় উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। আকাশ আবার মেঘাচ্ছন্ন হইল। আবার প্রতিকুল বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। নাবিকগণ সংক্ষুব্ধ হইলেন। তাঁহারা সপ্ততি দিবস যব-দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়াছেন, পানীয় জল ও খাদ্য-দ্রব্য প্রায় ফুরাইয়া গিয়াছে। তখন আর উপায় কি? তখন, লবণাক্ত সমুদ্র-জলে পাকাদি আরম্ভ হইল। পানীয় জল প্রত্যেকে দুই 'সিং' (প্রায় এক সের মাত্র) প্রাপ্ত হইবেন স্থির হইল। এইরূপে সকল পানীয় এবং সকল খাদ্য-দ্রব্য নিঃশেষ হইবার উপক্রম হইলে, বণিকেরা পরামর্শ করিয়া পোতাধ্যক্ষকে কহিলেন,—"কোয়াং-চেও বন্দরে পৌঁছিবার জন্য পঞ্চাশ দিন সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। সে সময় অতীত হইয়াও অনেক দিন কাটিয়া গেল। আমাদের সকল সম্বল ফুরাইল। এখন উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে পোত পরিচালনা করিয়া যাহাতে কোনও জনস্থানে উপনীত হওয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করা হউক।" আরও বার দিন বার রাত্রি জাহাজ চলিল। অবশেষে চাং-কোয়াং প্রদেশের অন্তর্গত 'লেও' পর্ব্বতের দক্ষিণস্থিত উপকূলে পোত উপস্থিত হইল। সেখানে পরিষ্কৃত জল ও খাদ্যশস্যের অভাব হইল না। সমুদ্র-পথে অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া, বহুদিন আতঙ্কে অবসাদে কাটাইয়া, বণিকগণ যখন এই উপকূলে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন তাঁহাদের মনে একটু আশার সঞ্চার হইল। বিশেষতঃ এক জাতীয় বৃক্ষ দেখিয়া, তাঁহারা যে চীন-দেশে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে আর আদৌ সংশয় রহিল না। যে বৃক্ষ দেখিয়া চীন-রাজ্যে উপনীত হওয়ার বিষয় মনে হইল, ফা-হিয়ান সে বৃক্ষের নাম লিখিয়া গিয়াছেন,—'লি-হো-শাই'। অর্ণব-পোত চীনদেশের সীমানায় পৌঁছিয়াছে বুঝিতে পারিলেও অনেকক্ষণ কোনও লোক-জনের সহিত সাক্ষাৎ হইল না, অথবা নিকটে তাঁহারা কোনও জনস্থানের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। কেহ কহিলেন—'এখনও কোয়াং-চেও বন্দরে পৌঁছিতে বিলম্ব আছে।' কেহ কহিলেন—'পোত কোয়াং-চেও বন্দর ছাড়াইয়া আসিয়াছে।' ফলতঃ, কেহই কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না। তখন কয়েকজন একখানি ক্ষুদ্র

নৌকায় আরোহণ করিয়া, নদী-মুখে প্রবেশ করিলেন। উদ্দেশ্য,—যদি কাহাকেও দেখিতে পান, জিজ্ঞাসা করিবেন,—তাঁহারা কোন্ দেশে কোথায় আসিয়াছেন। সহসা দুই জন ব্যাধের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তাহারা শিকার করিয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিল। ফা-হিয়ান দোভাষী মধ্যস্থ-রূপে, প্রথমে অভয় দিয়া ব্যাধদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কে তোমরা ?' তাহারা উত্তর দিল,—'আমরা ফো (বুদ্ধ) দেবের উপাসক।' ফা-হিয়ান আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এই পর্ব্বতে তোমারা কিসের অনুসন্ধানে গিয়াছিলে ?' তাহারা চাতুরী করিয়া উত্তর দিল,—'আগামী কল্য সপ্তম মাসের পনরই তারিখ। এই তারিখে ফো-দেবতার নিকট পূজা দিবার উদ্দেশ্যে আমরা পূজার উপকরণ সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলাম।' ফা-হিয়ান আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—'এ কোন্ রাজ্য ?' তাহারা উত্তর দিল,—"এই স্থানের নাম—সিং-চেও। লিউ-বংশের অধিকৃত 'চাং-কোয়ান-কিয়ন' রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।" এই উত্তর শুনিয়া বণিকগণ বড়ই আনন্দিত হইলেন। তখন সেই স্থানের শাসনকর্ত্তার নিকট লোক প্রেরিত হইল। সেই শাসনকর্ত্তার নাম—চাং-কোয়াং-লিয়ং। তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম্মে বিশ্বাসবান ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মে অনুরাগী ছিলেন। বুদ্ধ-দেবের প্রতিমূর্ত্তি ও বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-সংক্রান্ত পুস্তকাদি লইয়া সমন-গণ আসিয়াছে শুনিয়া তাঁহাদের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনার্থ তিনি একখানি নৌকায় আরোহণ করিলেন *এবং সমুদ্রে অর্ণব-পোত-সান্নিধ্যে উপনীত হইলেন। অবশেষে আরোহিগণ তীরে অবতরণ করিলেন এবং ঐ পুস্তক ও প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি সহ সকলে নগরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বণিকগণ 'যাং-চেউ' উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। ইহার পর ফা-হিয়ান শীত গ্রীষ্ম কয়েক মাস 'শিং-চেউ' সহরে অবস্থান করেন। সেই সময় ফা-হিয়ানের সংগৃহীত গ্রন্থাদি কিরূপে মুদ্রিত ও প্রচারিত হয় এবং ফা-হিয়ান কোন্ স্থান হইতে কোন্ স্থানে গমন করেন, ফা-হিয়ান আপন ভ্রমণ-বৃত্তান্তে তদ্বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

---

* ইউরোপের নানা ভাষায় ফা-হিয়ানের গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে। সেই সকল অনুবাদের মধ্যে ফরাসী ভাষার অনুবাদ প্রাচীন। ফরাসী ভাষার সে অনুবাদ হইতে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজী ভাষায় এক অনুবাদ প্রকাশ হয়। সেই ইংরাজী অনুবাদ গ্রন্থের নাম,—' The Pilgrimage of Fa Hian from the French Edition of the Foe Koue Ki of MM. Remusat, Klaproth, and Landresse with Additional Notes and Illustrations." এই গ্রন্থের একটি সুলভ সংস্করণ এক্ষণে বঙ্গবাসী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ফা-হিয়ানের গ্রন্থের অপর ইংরাজী অনুবাদ—অধ্যাপক লেগি কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়। ঐ গ্রন্থ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। অনেকে বলেন,—উহা মূলের অনুসারী। Vide *Record of Budhist Kingdoms* by Professor Legge. আমরা উভয় অনুবাদই দেখিয়াছি। কোন্ অনুবাদ কিরূপ হইয়াছে, তাহার একটু নমুনা নিম্নে প্রদান করিতেছি। অর্ণবপোত জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইলে ফা-হিয়ান যখন ভগবানকে ডাকিতেছেন, তখনকার বর্ণনা কোন্ অনুবাদে কিরূপ আছে, নিম্নে দেখুন,—The merchants were extremely alarmed for their lives, and expecting every moment that the vessel would go to the bottom, they took the heaviest objects and cast them into the sea. Fa Hian worked with the crew in pumping out the water; all that was superfluous of his own he, too, threw into the sea. But he dreaded lest the merchants

ফা-হিয়ান চীনদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, ভারতবর্ষের সহিত চীনদেশের সম্বন্ধ দৃঢ়তর হইয়া আসে। তখন ধর্ম্ম-তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ এবং বণিকগণ দলে দলে চীনদেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিতে আরম্ভ করেন। ধর্ম্ম-তত্ত্বানুসন্ধান জন্য যে সকল পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে হুয়েন-সাং, ইৎ-সিং প্রভৃতির স্মৃতি ইতিহাসে উজ্জ্বল হইয়া আছে। ফা-হিয়ানের ভারত-আগমনের প্রায় আড়াই শত বৎসর পরে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম অংশে (৬২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬৪৫ খৃষ্টাব্দে) হুয়েন-সাং ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে ভারতের বাণিজ্য-সম্পদের বিশেষ পরিচয় বিদ্যমান আছে। ৬৩০ খৃষ্টাব্দে হুয়েন-সাং সৌরাষ্ট্র-রাজ্য দর্শন করেন। সেই দেশের বণিকগণ বাণিজ্যে কিরূপ প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিল, তাঁহার গ্রন্থে তদ্বিষয় পরিবর্ণিত আছে। তখন যে ভারতবর্ষ হইতে চীন-দেশে সর্ব্বদা বাণিজ্য-পোত-সমূহ গতিবিধি করিত এবং মধ্যপথে ভারতীয় বণিকগণের বিভিন্ন বন্দর প্রতিষ্ঠিত ছিল,—হুয়েন-সাং তাহা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সুদূর পারস্য-রাজ্যে হিন্দুগণের উপনিবেশ ছিল। বাণিজ্য-ব্যপদেশে হিন্দু-বণিকগণ বিভিন্ন দেশে গতিবিধি করিতেন। হুয়েন-সাঙের বর্ণনার মধ্যে এবম্বিধ বিবিধ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। হুয়েন-সাঙের পর সপ্তম-শতাব্দীর শেষার্দ্ধ-কালে অনূন যাট জন পরিব্রাজক চীনদেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ইৎ-সিং তাঁহাদের মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন। ইৎ-সিং ৬৭৩ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। সেই গ্রন্থের নাম—'তা-তাং-সি-উ-কু-ফা-কাও-সেং-চুয়ান'। প্রসিদ্ধ তাং-বংশের রাজত্বকালে ধর্ম্মতত্ত্বানুসন্ধানের জন্য যে সকল ধর্ম্মযাজক ভারতবর্ষে বা তৎসন্নিহিত দেশ-সমূহে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঐ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল,—গ্রন্থের নামে তাহা বুঝা যায়। ইৎ-সিং আর একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সেই গ্রন্থের নাম—'নান্‌-হাই-চি-কুয়ে-নাই-ফা-চুয়ান'। ভারতবর্ষে এবং মালয়-দ্বীপপুঞ্জে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবের বিষয় ঐ গ্রন্থে পরিবর্ণিত

হুয়েন-সাং, ইৎ-সিং প্রভৃতির বৃত্তান্ত।

---

would cast overboard his books and his images! His sole resource was then to pray *Kouan shi in* to allow all the ecclesiastics to return alive to the land of Han. "As for me, said he, I undertook this distant journey to seek for the Law; I trust to the gods to protect this ship and enable me to reach the haven." *(Bangabasi Edition)*

The merchants were greatly alarmed, feeling their risk of instant death. Afraid that the vessel would fill, they took their bulky goods and threw them into the water. Fa-Hian also took his pitcher and washing basin, with some other articles, and cast them into the sea; but fearing that the merchants would cast over-board his books and images he could only think with all his heart of Kwan-she-yin, and commit his life to (the protection of) the church of the land of Han (saying in effect), "I have travelled far in search of our Law. Let me by your dread and supernatural (power), return from my wanderings, and reach my resting-place." *(Legge's Translation).*

গ্রন্থ। দক্ষিণ-সমুদ্র হইতে চীনদেশে ধর্ম্মমত কি ভাবে প্রচারিত হইয়াছিল, ঐ গ্রন্থে তাহা পরিব্যক্ত আছে। সুমাত্রা-দ্বীপে অবস্থান-কালে ইৎ-সিং ঐ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সুমাত্রা-দ্বীপ তখন জনৈক ভারতীয় নৃপতির শাসনাধীন ছিল। সেই ভারতীয় নৃপতির নাম—শ্রীভোজ। ইৎ-সিংএর বর্ণনায় প্রকাশ—ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে যাত্রার পথে,মালয়-উপদ্বীপে,ব্রহ্মদেশে এবং অন্যান্য স্থানে ভারতের উপনিবেশ-সমূহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে যে সকল অর্ণবপোত গতিবিধি করিত, সেই সকল উপনিবেশে ও বন্দরে সেই সকল অর্ণবপোত যাত্রী ও মালপত্র লইত। ঐ সকল উপনিবেশে ভারতের আচার-ব্যবহার, ধর্ম্ম-কর্ম্ম এবং ভাষা-ভাব প্রচলিত ছিল। ইৎ-সিং যাত্রিগণকে উপদেশ দিতেন—ভারতবর্ষে যাইতে হইলে, ঐ সকল উপনিবেশ হইতে প্রথমে সংস্কৃত-ভাষায় জ্ঞান-লাভ করা আবশ্যক এবং শ্রীভোজ রাজার অধিকৃত সুমাত্রা-দ্বীপ হইতে ধর্ম্ম-কর্ম্মের ক্রিয়া-পদ্ধতি শিক্ষা করা প্রয়োজন। ইৎ-সিং দক্ষিণ-মহাসমুদ্রে অনূন দশটী ভারতীয় উপনিবেশ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সে সকল উপনিবেশে তখন বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। সে সকল উপনিবেশের নামেও ভারতের প্রভাব পরিব্যক্ত হইত। সে সকল উপনিবেশ (১) শ্রীভোজ বা মালয়—সুমাত্রা-দ্বীপে, (২) কলিঙ্গ—যবদ্বীপে, (৩) মহসীন—বোর্ণিয়ো দ্বীপের দক্ষিণ-উপকূলে, (৪) কচ্ছ—সুমাত্রা-দ্বীপে, (৫) বলি, (৬) ভোজপুর, (৭) মযমন বা মযবন, (৮) নুতন ইত্যাদি। শেষোক্তগুলি মালয়-দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত বিভিন্ন দ্বীপের তাৎকালীন নাম বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। দ্বীপ-মধ্যস্থ ঐ সকল বাণিজ্য-বন্দরের বিষয় উল্লেখ করিয়া, ইৎ-সিং মহাদেশান্তর্গত তাৎকালীন কতকগুলি প্রসিদ্ধ বন্দরের নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সে বন্দরগুলি,—(১) শ্রীক্ষেত্র; অনেকে মনে করেন, ব্রহ্মদেশান্তর্গত বর্ত্তমান প্রোম সহর এক সময়ে ঐ নামে পরিচিত ছিল। (২) লকাঙ্ক বা কমলাঙ্ক; বর্ত্তমান পেগু এবং ইরাবতীর ব-দ্বীপ বলিয়া অনুমিত হয়; (৩) দ্বারাবতী বা অযোধ্যা;—শ্যামদেশ বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। (৪) চম্পা—বর্ত্তমান কোচিন-চায়না এবং আনামের অংশ-বিশেষ। (৫) কুক্কুটেশ্বর—কোরিয়া। ইৎ-সিং প্রধানতঃ এই সকল বন্দরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। হুয়েন-সাং, সমতট বা বঙ্গদেশের রাজধানীর বিষয় উল্লেখ করিয়া যথাক্রমে শ্রীক্ষেত্র, কমলাঙ্ক, দ্বারাবতী, ঈশানপুর, মহাচম্পা, যবনদ্বীপ প্রভৃতির পরিচয় দিয়াছেন। ফলতঃ, হুয়েন-সাঙের ও ইৎ-সিঙের বিবরণ পাঠ করিলে বেশ উপলব্ধি হয়,—ভারত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে এবং মহাদেশের উপকূলভাগে, ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশের সীমানার মধ্যবর্ত্তী অংশে, ভারতবাসীর একাধিপত্য প্রভাব ও বাণিজ্য বিস্তৃত ছিল। ইৎ-সিং আপন গ্রন্থে যে ষাট জন পরিব্রাজকের বিবরণ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই সমুদ্র-পথে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। কেহ বা চীন হইতে একেবারে বঙ্গদেশে আসেন, কেহ বা সিংহল-দ্বীপে অবতরণ করেন। ইৎ-সিং নিজে চীনদেশ হইতে যাত্রা করিয়া বঙ্গদেশান্তর্গত তাম্রলিপ্ত-বন্দরে উপনীত হইয়াছিলেন। পরিব্রাজক উ-হিং প্রথমে সিংহলে আসেন এবং পরিশেষে সিংহল হইতে ভারতবর্ষে আসেন। চেং-কুং প্রমুখ কয়েকজন ধর্ম্মযাজক ভারতবর্ষে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই পথে

ইহলীলা সম্বরণ করেন। চেং-কন্ এবং তাঁহার সঙ্গিগণ অনেকেই শ্রীভোজ অথবা চম্পা উপনিবেশে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সুতরাং তাঁহাদের অদৃষ্টে ভারতবর্ষে আসা ঘটে নাই। চাং-মিন্ পথে সমুদ্রগর্ভে পোতমগ্নে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। ঐ মহামনা পরিব্রাজক একখানি বাণিজ্যপোতে আরোহণ করিয়া সুমাত্রা-দ্বীপস্থিত মালয়-বন্দর হইতে ভারতবর্ষাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। যে বাণিজ্য-পোতে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন, গুরুভারে সেই পোত জলমগ্ন হয়। বন্দর পরিত্যাগ করিয়া অর্দ্ধ দিবস মাত্র অর্ণবপোত সমুদ্রপথে চলিয়াছে, সহসা উত্তাল তরঙ্গ আসিয়া পোতখানিকে বিপর্য্যস্ত করিল। ঐ অর্ণবপোতে আরোহিগণের জীবন-রক্ষার উপযোগী কয়েকখানি ক্ষুদ্র তরণী ছিল। আসন্ন-বিপদে আরোহিগণ সকলেই সেই সকল তরণীতে আশ্রয় লইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। সেই অর্ণবপোতের পরিচালক বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অনুরাগী ছিলেন। পরিব্রাজক চাং-মিন্‌কে বাঁচাইবার জন্য তিনি বিশেষরূপ চেষ্টিত হইলেন। কিন্তু চাং-মিন্ দেখিলেন,—তাঁহার জীবন রক্ষা করিতে গেলে, আর এক জনের জীবন নষ্ট হয়। সুতরাং তিনি পোতাধ্যক্ষকে কহিলেন,—"আমায় বাঁচাইবার প্রয়োজন নাই। আপনি অপরাপর সকলের প্রাণরক্ষা করুন। আমি যে অবস্থায় আছি, সেই অবস্থায়ই রহিলাম, একটুও নড়িব না।" দেখিতে দেখিতে পোত জলমগ্ন হইল। বৌদ্ধ-শ্রমণ চাং-মিন্ সমুদ্রের অনন্ত-ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন। ইৎ-সিঙের ভারতাগমনের পরবর্ত্তিকালে তিন শতাব্দী কাল,খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত, চীন-দেশের সম্রাট চীন-দেশের বহু বৌদ্ধ-শ্রমণকে ভারতবর্ষে আসিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। চীন-দেশের রাজকীয় বিবরণীতে তাঁহাদের বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। সেই সকল পরিব্রাজক প্রধানতঃ বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-সংক্রান্ত গ্রন্থাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই এদেশে আগমন করিয়াছিলেন। ৯৬৬ খৃষ্টাব্দে 'তাও-ইউ-এন' ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হন। ভারতবর্ষে তিনি দ্বাদশ বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তিনি চীন-দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, চীন-সম্রাটের আদেশ লইয়া ১৫৭ জন ধর্ম্মযাজক চীন হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ক্বিণি নামক আর একজন পরিব্রাজক চীন-দেশীয় তিন শত বৌদ্ধ ভিক্ষুসহ ৯৬৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ৯৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়াছিলেন। সংস্কৃত-গ্রন্থ-সংগ্রহ এবং বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-সংক্রান্ত স্মৃতিচিহ্ন-সমূহ সংগ্রহ তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। একাদশ শতাব্দীর পর ভারতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব লোপ পাইতে আরম্ভ হইলে চীন-দেশীয় ধর্ম্ম-যাজকগণের ভারতবর্ষে আগমনের পথ প্রায় অবরুদ্ধ হয়। বহুদিন পর্য্যন্ত তৎসংক্রান্ত বিশেষ কোনও পরিচয় পাওয়া যায় নাই। পরিশেষে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে (১৩৪২ খৃষ্টাব্দে) আর একবার মাত্র চীনের সহিত ভারতের ধর্ম্ম-সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। তখন পাঠান-বংশীয় সম্রাট মহম্মদ তোগলক দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। সেই সময় চীন-সম্রাটের জনৈক প্রতিনিধি সম্রাট-সকাশে উপস্থিত হন, এবং হিমালয়-পাদমূলে কোরা-পর্ব্বতের উপরিস্থিত বৌদ্ধ-মন্দির পুনর্নির্ম্মাণের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। ঐ স্থানে অনেক দিন পর্য্যন্ত চীনাদিগের গতিবিধি ছিল। এই সকল ঘটনায়, পরিব্রাজকগণের বর্ণনায়, প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য-গৌরবের যে পরিচয় পাওয়া যায়, ইতিহাসের অঙ্ক হইতে কখনও তাহা লোপ পাইবার

নহে। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে আরও প্রতিপন্ন হয়, অতি প্রাচীনকাল হইতে সে দিন পর্য্যন্ত চীনদেশের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য-সম্বন্ধ অব্যাহত ছিল।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রদেশে বাণিজ্য।

হিন্দু-রাজত্বে, বৌদ্ধ-প্রভাব-কালে, মুসলমানগণের শাসন-সময়ে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছিল। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে মুসলমানগণ ভারতবর্ষে প্রথম প্রবেশাধিকার লাভ করেন। তাহার পূর্ব্বে, ভারতবর্ষের প্রান্ত-সীমায়, কখনও পারস্যের, কখনও বা গ্রীসের প্রাধান্য বিস্তৃত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় বটে; কিন্তু খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে বৈদেশিকগণ কেহই ভারতে স্থায়ী অধিকার লাভ করিতে পারেন নাই। মুসলমানগণের ভারতাগমনের পূর্ব্ববর্ত্তি-কালে বৌদ্ধ-নৃপতিগণ প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়া ছিলেন। তাঁহারা ভারতেরই অধিবাসী ছিলেন; সুতরাং স্বীকার করিতে হয়,—খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ ভারতবর্ষেরই নৃপতিগণ কর্তৃক শাসিত ও রক্ষিত হইয়া আসিয়াছিল। মুসলমানগণের ভারতাগমন সময় হইতে ভারতবর্ষে বৈদেশিকগণের আধিপত্য। এই বৈদেশিক আধিপত্যের পূর্ব্বের সময়কে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক ভাগ—অবিমিশ্র হিন্দু-নৃপতিগণের রাজত্ব-কাল। অপর ভাগ—বিমিশ্র হিন্দু-রাজত্ব। প্রথমোক্ত কালে সূর্য্যবংশীয় এবং চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ ভারতে একছত্র শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। মৌর্য্য-বংশের অভ্যুদয়ে, বৌদ্ধ-নৃপতিগণের শাসন-কালে, বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়নৃপতিগণের একাধিপত্য-অধিকারের অবসান হয়। তখন, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে চন্দ্রবংশীয় ও সূর্য্যবংশীয় রাজন্যগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের অস্তিত্ব থাকিলেও, প্রধানতঃ বৌদ্ধ-নৃপতিগণের প্রভাব দিকে দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত ও অশোক প্রভৃতির একছত্র-প্রভাবের বিষয় এতৎপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। ৩২৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে গ্রীক-বীর আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষে আগমন করেন। তখন মৌর্য্য-বংশের একছত্র প্রভাব; তখন চন্দ্রগুপ্ত ভারতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। চন্দ্রগুপ্তের পর অশোকের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তিনি 'প্রিয়দর্শী' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আসমুদ্রহিমাচল ভারতের সর্ব্বত্র তাঁহার বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল। ২৩২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে ৪১ বৎসর রাজত্বের পর তাঁহার লোকান্তর ঘটে। তাঁহার পর মৌর্য্য-বংশে আরও কয়েকজন নৃপতি রাজত্ব করিয়াছিলেন। শাস্ত্রমতে মৌর্য্য-বংশের রাজত্বকাল—১৩৭ বৎসর। মৌর্য্য-বংশের পর শুঙ্গ-বংশ, কণ্ব-বংশ ও অন্ধ্র-বংশ যথাক্রমে ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছিলেন। উত্তর-ভারতে শক-বংশের অভ্যুদয়ে ভারতে যখন অন্ধ্রবংশের একছত্র-প্রভাব লোপ পায়, অন্ধ্রগণ তখন দাক্ষিণাত্য অধিকার করিয়া থাকেন। অন্ধ্র-বংশের রাজত্ব-কাল, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের গণনাক্রমে, প্রায় সাড়ে চারি শত বর্ষ নির্দ্ধারিত হয়। অন্ধ্র-বংশ ২০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ২৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্য-প্রদেশ অধিকার করিয়া ছিলেন। সেই সময়ে শক-বংশ (তাঁহারা 'কুশন' বা 'গুষণ' নামেও পরিচিত।) উত্তর-ভারতে আধিপত্য বিস্তার করেন। এই বংশের কণিষ্ক (কণিষ্ক) প্রভৃতির খ্যাতি বিশ্ব-বিশ্রুত। পূর্ব্বোক্ত রাজগণের রাজত্ব—'হিন্দু-রাজত্ব'

বিভিন্ন-সময়ের বিবরণ।

বলিয়া উক্ত হইলেও, তাঁহাদের রাজত্ব-কালকে অবিমিশ্র হিন্দু-রাজত্ব বলা যাইতে পারে না। মৌর্য্যবংশীয়গণ অনেকেই বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বটে, এবং শকগণও বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহাদের পূর্ব্ব-বিবরণ স্মরণ করিলে, অবিমিশ্র হিন্দু বলিয়া তাঁহাদিগকে নির্দ্দেশ করা যায় না। সুতরাং তাঁহাদের রাজত্ব-কালকে 'বিমিশ্র হিন্দু-রাজত্ব' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—কুরুক্ষেত্র মহাসমরের পর ভারতের রাজশক্তি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; ভারতের এক এক প্রদেশে তখন এক এক অভিনব রাজশক্তির অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। সুতরাং পরবর্ত্তিকালে কোথাও ক্ষত্রিয়-রাজগণের, কোথাও বা বৌদ্ধ-নৃপতিগণের, প্রভাব বিদ্যমান ছিল। তাঁহাদের মধ্যে সময়ে সময়ে কচিৎ কেহ একছত্র প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন আকাশে সে কেবল বিদ্যুদ্বিকাশ মাত্র। যাহা হউক, এবম্প্রকার অবিমিশ্র ও বিমিশ্র হিন্দু-রাজত্বের মধ্যে এবং পরবর্ত্তিকালে মুসলমান-শাসনের সময়ে কি ভাবে কোন্ দেশে ভারতের বাণিজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল, আর ভারতেরই বা কোন্ কোন্ প্রদেশ সে বাণিজ্যে প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছিল, অতঃপর সংক্ষেপে তাহা উল্লেখ করা যাইতেছে।

মৌর্য্যবংশের রাজত্বে ভারতের বাণিজ্য।

আলেকজাণ্ডার ৩২৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তখন ভারতে মৌর্য্য-বংশের আধিপত্য। মৌর্য্য-বংশীয় সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত তখন ভারতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। সে সময় ভারতবর্ষ বৈদেশিক বাণিজ্যে কিরূপ প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিল, আলেকজাণ্ডারের সম-সাময়িক ও তাঁহার অব্যবহিত পরবর্ত্তিকালের ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থ-পত্রে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তখন অর্ণবপোতের ও নৌ-যানের প্রাচুর্য্যের অবধি ছিল না। ইতিহাসে দেখিতে পাই, আলেক্জাণ্ডারের সৈন্যদল নৌ-বাহিনীর সাহায্যে সিন্ধু-নদ উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; আর সেই নৌবাহিনী ভারতীয় শিল্পিগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। সিন্ধুনদের হাইডাস্‌পেস্ * শাখা পার হইবার সময়ও আলেক্জাণ্ডারের সৈন্যগণ অসংখ্য নৌকার সাহায্য পাইয়াছিল। আলেক্জাণ্ডারের নৌ-সেনাপতি নিয়ার্কস্ সিন্ধুনদের মোহনায় এবং পারস্য-উপসাগরে গতিবিধির সময় অসংখ্য অর্ণবপোতের সাহায্য প্রাপ্ত হন। ভারতীয় শিল্পিগণের নির্ম্মিত ও ভারতীয় নাবিকগণের পরিচালিত সেই সকল পোতের সাহায্যে তাঁহার আট সহস্র সৈন্য, কয়েক সহস্র অশ্ব এবং বহু পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য সংবাহিত হইয়াছিল। এরিয়ান বলিয়া গিয়াছেন—'নিয়ার্কস্ আট শত তরণীর সাহায্য পাইয়াছিলেন।' কার্টিয়াস † ও ডায়ডোরাস্ প্রায় সহস্র পোতের

---

* 'হাইডাস্‌পেস্' (Hydaspes) সিন্ধু-নদের শাখা। এই শাখা নানা সময় নানা নামে পরিচিত ছিল। এখন উহার নাম ঝিলম্ (Jhilum) বা বিতস্তা। টলেমির গ্রন্থে উহার নাম—বিদাসপেস্ (Bidaspes) বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

† কার্টিয়াস্ (Curtius),—রোম-দেশীয় একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক। কাহারও মতে তিনি সম্রাট অগাষ্টসের সাময়িক; কাহারও মতে তিনি দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দে কন্‌ষ্টান্টাইনের বা থিওডোসিয়াসের রাজত্বকালে বিদ্যমান ছিলেন।

সাহায্য-প্রাপ্তির বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ভারতের শিল্পিগণ ভারতের উৎপন্ন কাষ্ঠে এক সময়ে এত অধিক পরিমাণ নৌ-যান বৈদেশিক আক্রমণকারীকে এক প্রদেশে সরবরাহ করিয়াছিল,—এই ব্যাপার স্মরণ করিলে, ভারতের বাণিজ্যের প্রভাব উপলব্ধি হয় না কি? ডক্টর ভিন্সেট স্মিথ এবং ডক্টর রবার্টসন্‌ এই প্রসঙ্গের আলোচনায় প্রাচীন ভারতের বাণিজ্যের প্রভাবই উপলব্ধি করিয়াছেন। আইন-ই-আকবরীর বর্ণনায় পঞ্জাব-প্রদেশ মোগল-সাম্রাজ্যের তৃতীয় প্রদেশ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এক সময়ে চল্লিশ সহস্র বাণিজ্য-তরী ঐ প্রদেশে সিন্ধু-নদের বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিল,—আইন-ই-আকবরীতে তাহার উল্লেখ আছে। সিন্ধু-নদে এইরূপ বাণিজ্য-তরীর বিদ্যমানতা অতি প্রাচীন-কাল হইতে উপলব্ধি হয়। আলেক্‌জাণ্ডার সেই সকল বাণিজ্য-তরীর সাহায্য পাইয়াই ভারত-অভিযানে সফলকাম হইয়াছিলেন। ইহাই ভিন্সেট স্মিথের সিদ্ধান্ত। * রবার্টসনেরও এই মত। তিনি বলেন,—'এক সময়ে এতাধিক তরণীর সাহায্য পাওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু পঞ্চনদ-প্রদেশে বহুসংখ্যক নদ-নদীর এবং সেই সকল নদ-নদীতে বাণিজ্যের বিদ্যমানতার বিষয় স্মরণ করিলে, কিছুই অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। রাজ্ঞী সেমিরামিসের ভারতাক্রমণ-কাহিনীতেই বা কি দেখিতে পাই? চারি সহস্রাধিক পোত সিন্ধুনদে তাঁহাকে বাধা প্রদান করিয়াছিল। গজনীর মামুদ যখন ভারতাক্রমণে অগ্রসর হন, তখনও ঐ পরিমাণ পোত তাঁহাকে বাধা-প্রদানের জন্য প্রস্তুত ছিল। আবার আইন-ই-আকবরীর বর্ণনায় দেখিতে পাই, মোগল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার দিনে নানা আকারের অন্যূন চল্লিশ সহস্র পোত (সিন্ধু-প্রদেশের) সরকার-তাত্তার অধিবাসিগণের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইত।' † তবেই বুঝা যায়, আলেক্‌জাণ্ডার যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন ভারতবর্ষের অসংখ্য বাণিজ্য-তরণী বাণিজ্য-ব্যপদেশে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। গ্রীক-দূত মেগাস্থিনিস্‌ মৌর্য্য-বংশের রাজত্বকালে কিছুকাল ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তখন মৌর্য্যরাজগণের পোত-নির্ম্মাণ-কার্য্যালয় ছিল। বেতন-ভোগী কর্ম্মচারীরা সেই রাজকীয় কার্য্যালয়ে পোত-নির্ম্মাণে নিযুক্ত থাকিত। ব্যবসায়ী বণিকগণ পোতাধ্যক্ষের নিকট হইতে বাণিজ্যের জন্য পোত ভাড়া লইতে

---

* । "The *Ayeen Akbari* reckons the *Panje-ab* as the third province of the *Mogul* Empire, and mentions 40,000 vessels employed in the commerce of the Indus. It was this commerce that furnished Alexander with the means of seizing, building, hiring, or purchasing the fleet with which he fell down the stream."—*Early History of India* by V. A. Smith.

† । "That a fleet so numerous should have been collected in so short a time is apt to appear at first sight incredible. But as the Punjab country is full of navigable rivers, on which all the intercourse among the natives was carried on, it abounded with vessels ready constructed to the conqueror's hands so that he might easily collect that number."—Dr. Robertson's *Disquisition concerning Ancient India.*

পারিতেন। রাজকীয় পোত বণিকগণকে ভাড়া দেওয়ার বিষয় ষ্ট্রাবো বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাপ্রোবেণ-দ্বীপের (সিংহল, সিলোন, বা লঙ্কা-দ্বীপ তৎকালে তাপ্রোবেণ নামে পরিচিত ছিল) বিবরণ-ব্যপদেশে প্লিনি ঐ দ্বীপের বণিকগণের বাণিজ্যের যে পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহার বর্ণনায় প্রকাশ,—'লঙ্কা-দ্বীপের ও ভারতবর্ষের মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রের কোথাও গভীর জল, কোথাও বা অল্প জল, কোথাও জলের পরিমাণ দুই এক ফুটের অধিক নহে, কোথাও জল অতলস্পর্শ; এই কারণে ঐ অঞ্চলে যে সকল অর্ণবপোত ব্যবহৃত হইত, তাহার দুই দিকেই হাল (বহিত্র) ছিল, এবং দুই দিকেই তাহা ঘুরাণ যাইত। লঙ্কা-দ্বীপের নাবিকগণ নক্ষত্র-দৃষ্টে পোত-চালনায় অভ্যস্থ ছিলেন না; কারণ, লঙ্কা-দ্বীপের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে সপ্তর্ষি-মণ্ডল (Great Bear) লক্ষ্য হইত না; সুতরাং তাঁহারা পক্ষীর সাহায্যে দিঙ্‌নির্ণয় করিয়া সমুদ্র-পথে নৌকা চালাইতেন। তাহাদের অর্ণবপোতে দিঙ্‌-নির্ণয়কারী পক্ষী প্রতিপালিত হইত; সমুদ্র-মধ্যে সময়ে সময়ে সেই পক্ষিগণকে উড়াইয়া দিয়া তাহাদের সাহায্যে নাবিকগণ দেশাদির সন্ধান করিয়া লইত।' কি পরিমাণ ভার বহন করিয়া ঐ সকল অর্ণবপোত সমুদ্র-পথে যাত্রা করিত, প্লিনি তাহাও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল অর্ণবপোতে তিন সহস্র 'য়্যামফোরে' * অর্থাৎ অনূ্যন চারি সহস্র মণ পণ্য সংবাহিত হইতে পারিত। লঙ্কা-দ্বীপ চিরদিনই ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং লঙ্কা-দ্বীপের এই বাণিজ্য-প্রসঙ্গে ভারতীয় বণিকগণের বৈদেশিক বাণিজ্যেরই আভাস পাওয়া যায়। এই সকল প্রমাণ ভিন্ন, মৌর্য্য-বংশের রাজত্ব-কালে ভারতের বাণিজ্যের ও নৌ-শক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ—চাণক্য-প্রণীত 'অর্থশাস্ত্রে' দেদীপ্যমান রহিয়াছে। যেমন চন্দ্রগুপ্তের নাম, তেমনি চাণক্যের নাম ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। চাণক্য অদ্বিতীয় ধী-শক্তিশালী রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহারই চক্রান্ত-ফলে মৌর্য্য-বংশের প্রাধান্য। তিনি চন্দ্রগুপ্তের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন, অথবা তাঁহারই ইঙ্গিতে চন্দ্রগুপ্ত পরিচালিত হইতেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজনীতি বিবৃত করিয়া তিনি 'অর্থশাস্ত্র' প্রণয়ন করেন। † অর্থ-শাস্ত্রের দ্বিতীয় খণ্ডের ষোড়শ অধ্যায়ে 'পণ্যাধ্যক্ষ', একবিংশ অধ্যায়ে 'শুল্কাধ্যক্ষ', দ্বাবিংশ অধ্যায়ে 'শুল্ক-ব্যবহার', অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে 'নাবধ্যক্ষ' প্রভৃতির প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। 'পণ্যাধ্যক্ষ' প্রসঙ্গে দেখিতে পাই,—'স্থলজ এবং জলজাত পণ্য যাহা নদী বা স্থলপথে আনীত হইয়াছে, পণ্যাধ্যক্ষ, তাহাদের গ্রাহকতা বা মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করিবেন।...... রাজকীয় ভূমিতে যে সকল পণ্য উৎপাদিত হইবে, তাহা একত্রীভূত করিতে হইত। বৈদেশিক পণ্য ভিন্ন ভিন্ন স্থলে রক্ষিত হইবে। প্রজাকে উভয় প্রকার পণ্যই

---

* য়্যাম্ফোরা (Amphora);—পূর্ব্বকালে অর্ণবপোতে যে সকল পণ্য দ্রব্য সংবাহিত হইতে য়্যাম্ফোরা বা ট্যালেণ্ট হিসাবে পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিবার ব্যবস্থা ছিল। চল্লিশ য়্যাম্ফোরায় এখনকার এক টন (Ton) হয়। টন = ২২৪০ পাউণ্ড, প্রায় ১১২০ মণ।

† মহীশূরের পণ্ডিত শ্যাম শাস্ত্রী—সংস্কৃত ভাষায় লিখিত অর্থশাস্ত্রের ইংরাজী অনুবাদ করেন। এক্ষণে অধ্যাপক সমাদ্দার মহাশয় উহার প্রথম খণ্ডের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

সুবিধাজনক দরে বিক্রয় করিতে হইবে। যাহাতে প্রজার ক্ষতি হয়, রাজা এরূপ উচ্চমূল্য গ্রহণ করিবেন না।......যাঁহারা বৈদেশিক পণ্য আমদানি করিবেন, পণ্যাধ্যক্ষ তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ দেখাইবেন। যে সকল নাবিক ও সার্থবাহ বৈদেশিক পণ্য আমদানি করিবেন, পণ্যাধ্যক্ষ তাঁহাদিগকে শুল্ক হইতে অব্যাহতি দিবেন; কেন-না, তদ্ভিন্ন তাঁহারা লাভ করিতে পারিবেন না।' বণিকগণ কিরূপ পদ্ধতিতে লাভালাভ গণনা করিবেন, বৈদেশিক পণ্যের সহিত স্বদেশজাত পণ্যের বিনিময়ের সময় কি প্রণালীতে কার্য্য করিবেন, বণিকগণের বিদেশ-গমন-কালে তাঁহাদের নিরাপদ জন্য বিদেশের রাজ-কর্ম্মচারীর সহিত পণ্যাধ্যক্ষ কিরূপ ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন,—এ অধ্যায়ে আমরা তাহার আভাস পাই। শুল্কাধ্যক্ষ শুল্ক-সংগ্রহ-কালে কোন্ কোন্ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন,—একবিংশ অধ্যায়ে তাহার উল্লেখ আছে। বণিকগণ পণ্যসহ উপস্থিত হইলে, চারি পাঁচ জন শুল্ক-আদায়কারী তাহাদের পরিচয় গ্রহণ করিবে; 'বণিকগণ কে, কোন্ স্থান হইতে তাহারা আগমন করিল, কতখানি পণ্য তাহারা আনয়ন করিয়াছে এবং কোন্ স্থানে তাহাদের পণ্যের উপর প্রথম অভিজ্ঞান-মুদ্রা দেওয়া হইয়াছে',—শুল্কাধ্যক্ষ তাহার সন্ধান লইবেন। এখন যেমন বিদেশ হইতে গোপনে অস্ত্র-শস্ত্র আনয়ন করিলে দণ্ডার্হ হইতে হয়, তখনও ঐরূপ কার্য্য দণ্ডনীয় ছিল। যাহারা গোপনে নিষিদ্ধ-পণ্য প্রেরণ করিত, শুল্কাধ্যক্ষ তাহাদের প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখিতেন। তাহারা গুরুতর দণ্ড পাইত। 'কোনও ব্যক্তি নিষিদ্ধ পণ্য (যথা—শস্ত্র, বর্ম্ম, কবচ, লৌহ, রথ, রত্ন, ধান্য, পশু) আমদানি করিলে অন্যত্র-বর্ণিত শাস্তি ব্যতীত ঐ সকল বস্তু হইতে স্বত্ব-চ্যুত হইত।' শুল্ক-ব্যবহার প্রসঙ্গে স্বদেশ-জাত ও বিদেশ-জাত পণ্যের আমদানির ও রপ্তানির শুল্ক-পরিমাণ নির্দ্ধারিত আছে। শঙ্খ, মণি, মুক্তা, প্রবাল, অলঙ্কার, রেশম, চন্দন, হস্তিদন্ত, লৌহাদি ধাতু, ঔষধ, বস্ত্র, কার্পাস, লবণ, ক্ষার, পশু, পক্ষী প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্যের বাণিজ্যের ও শুল্কের পরিমাণ এই অংশে দেখিতে পাই। 'নাবধ্যক্ষ' অধ্যায়ে নাবধ্যক্ষের কর্ম্ম বিবৃত আছে। 'নাবধ্যক্ষ সমুদ্রগামী জাহাজ, নদীমুখ, স্বাভাবিক অস্বাভাবিক হ্রদ ও অন্যান্য সুরক্ষিত দুর্গের নিকটবর্ত্তী নদীতে যে সকল জাহাজ গমনাগমন করে, তাহার হিসাব পরীক্ষা করিবেন। বণিকগণ পত্তনে (বন্দরে) আসিয়া তাহাদের নির্দ্ধারিত শুল্ক প্রদান করিবেন।...পণ্য-পত্তনে যখন কোনও বাত্যাহত জাহাজ উপস্থিত হইবে, তখন পত্তনাধ্যক্ষ তাহাকে পিতার ন্যায় অনুগ্রহ দেখাইবেন। যে সকল জাহাজের পণ্য জলদুষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগকে শুল্ক হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে; অথবা অর্দ্ধেক শুল্ক লইয়াই তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে যাত্রা করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে।...যে সকল বৈদেশিক বণিক এই দেশে বহুবার আগমন করিয়াছে এবং যাহারা স্থানীয় বণিকগণের সুপরিচিত, তাহারা পণ্য-পত্তনে প্রবেশ করিতে পারিবে। চাণক্য-প্রণীত অর্থশাস্ত্রে বাণিজ্য-সংক্রান্ত এইরূপ নানা প্রসঙ্গ দেখিতে পাই। এই সকল বিষয় অভিনিবেশ-সহকারে পাঠ করিলে, মৌর্য্য-বংশের রাজত্বকালে নৌ-বিভাগের এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের যে সুচারু বন্দোবস্ত ছিল, তাহা বেশ প্রতীত হয়। তাৎকালিক 'নাবধ্যক্ষ' এখনকার ইংরেজ-রাজত্বের 'পোর্ট-কমিশনার' প্রভৃতির অনুরূপ

পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাণিজ্যের সুবিধা-সূত্রে সে সময়ে বিদেশ হইতে বহু বণিক ভারতবর্ষে আগমন করিতেন, এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের রাজস্ব প্রভৃতিতে রাজকোষে বহু অর্থ সমাগম হইত। খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মৌর্য্য-বংশের প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে এ সকল বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবৃত আছে। রাজা চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-সীমা পূর্ব্ব-পশ্চিমে সমুদ্র-কূল পর্য্যন্ত এবং উত্তরে এরিয়া, আরাকোসিয়া ও পারোপানিসাদাই প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখন বৃটিশ-রাজত্বের যে প্রান্তসীমা, তাহা অতিক্রম করিয়াও সে রাজ্য মধ্য-এসিয়ার অনেক দূর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিল। সুতরাং স্থলপথে ও জলপথে উভয় পথেই তখন ভারতের বাণিজ্যের সুবিধা ঘটিয়াছিল। চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র রাজা অশোক যখন ভারতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, তখন সিরিয়া, মিশর, সাইরিণ, মাসিডোনিয়া, এপিরাস প্রভৃতি গ্রীক-অধিকৃত জনপদের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্বন্ধ বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন, এক দিকে বাণিজ্যের, অন্য দিকে ধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল বলিয়া ভারতবর্ষ সর্ব্বত্র সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিল। দক্ষিণে সুদূর লঙ্কাদ্বীপে অশোকের একাধিপত্য-অধিকার বিস্তৃত হয়। তদ্বিষয়ের আলোচনায় তাঁহার রাজত্বকালে দূর-সমুদ্রে অর্ণবপোতাদির গতিবিধির প্রকৃষ্ট পরিচয়ই পাওয়া যায়। কবি ক্ষেমেন্দ্র 'বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে কাশ্মীর-দেশে কবি ক্ষেমেন্দ্রের বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন হয়। ভারতের বণিকগণ, চন্দ্রগুপ্তের ও অশোকের রাজত্বকালে, সমুদ্র-পথে কেমনভাবে বাণিজ্য করিতেন, ঐ গ্রন্থে তাহার একটি চিত্র প্রকটিত আছে। ঐ গ্রন্থের ত্রিসপ্ততি অধ্যায়ে (পল্লবে) কতকগুলি বণিকের অভিযোগের বর্ণনা দেখিতে পাই। সেই বর্ণনায় প্রকাশ—সম্রাট অশোক তখন পাটলি-পুত্রের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। কতকগুলি বিদেশ-প্রত্যাগত বণিক সম্রাট-সকাশে অভিযোগ করিতে উপস্থিত। ভারত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্য করিতে গিয়া, জল-দস্যু কর্তৃক তাহারা হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছে,—ইহাই তাহাদের অভিযোগ। সেই ঘটনা জ্ঞাপন করিয়া বণিকেরা বলিতেছে,—'সম্রাট যদি প্রতিকার না করেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে বণিক-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া অন্য বৃত্তি অব-লম্বন করিতে হইবে। তাহা হইলে, বৈদেশিক বাণিজ্য-লোপে, সম্রাটের রাজস্ব-পরিমাণ যে অনেক হ্রাস-প্রাপ্ত হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।' যে সকল জলদস্যু বণিকগণের পোত লুণ্ঠন করিয়াছিল, কবি তাহাদিগকে 'নাগ' নামে পরিচিত করিয়াছেন। 'ড্রাগুন' বা সর্পাকৃতি দেবতার পূজক চীনাগণ ঐ বণিকগণের উক্তিতে 'নাগ'-দস্যু নামে পরিচিত হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। যাহা হউক, বণিকগণের অনুযোগের পর রাজা অশোক সমুদ্র-পথে বাণিজ্য-বিষয়ে রাজ-ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন। তাম্রপত্রে সেই ঘোষণা খোদিত হয়। যদিও সেই ঘোষণার প্রভাবে সে সময়ে দস্যুতার গতিরোধ হয় নাই ; কিন্তু পরবর্ত্তিকালে তাঁহার প্রেরিত বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-প্রচারকগণের চেষ্টায় সে দস্যুতা কমিয়া আসিয়াছিল। তখন 'নাগ'-জলদস্যুগণ রাজা অশোককে সম্মানের চক্ষে দেখিয়া-ছিল এবং তাঁহার আদেশানুবর্ত্তী হইয়া বণিকদিগের অপহৃত দ্রব্যাদি প্রত্যর্পণ করিয়াছিল। মৌর্য্য-বংশের শাসন-কালে, ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের এইরূপ বিবিধ প্রমাণ বিদ্যমান।

চন্দ্রগুপ্তের ও অশোকের রাজত্বের পর, অন্ধ্র-বংশের ও শক-বংশের রাজত্বকালে, বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতের প্রতিষ্ঠার বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশ অন্ধ্র-রাজগণের এবং উত্তরাংশ শকগণের অধিকারভুক্ত ছিল। তখনও রোমের ও গ্রীসের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ বিশেষভাবে স্থাপিত হইয়াছিল। প্লিনির প্রাকৃতিক ইতিহাসে, টলেমির ভূ-বৃত্তান্তে, 'পেরিপ্লাস' * গ্রন্থে এবং ষ্ট্রাবো ও আগাথারসাইডিস্ প্রভৃতির রচনার মধ্যে সেই সময়ের বাণিজ্যের বিবিধ বিবরণ প্রাপ্ত হই। তৎকাল-প্রচলিত বৈদেশিক মুদ্রা ভারতবর্ষে প্রাপ্ত হওয়াতেও ভারতের সহিত বিদেশের বাণিজ্য-সম্বন্ধ জ্ঞাত হওয়া যায়। মিঃ আর সিওয়েল দাক্ষিণাত্যের পুরাতত্ত্ব-উদ্ধারে বিশেষ যশস্বী হইয়াছেন। তিনি 'ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার' গ্রন্থে অন্ধ্ররাজগণের রাজত্বকালের বাণিজ্য-বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় প্রকাশ,—অন্ধ্র-রাজগণের রাজত্ব (২০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ২৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) বিশেষ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ছিল। স্থলপথে ও জলপথে তখন উভয় পথেই বাণিজ্য চলিত। একদিকে পশ্চিম-এসিয়ায়, গ্রীসে, রোমে, মিসরে, অন্যদিকে চীন-দেশে ও অন্যান্য প্রাচ্য-দেশে তাৎকালিক বাণিজ্য বিস্তৃত ছিল। তখন দাক্ষিণাত্য হইতে রোমনগরে রাজদূতগণ গতিবিধি করেন। সিরিয়ার সমরে ভারতবর্ষের হস্তীর সাহায্য গৃহীত হইত। প্লিনি বলেন,—'এই সময়ে রোম-দেশ হইতে বহু-পরিমাণ মুদ্রা ভারতবর্ষে প্রেরিত হইয়াছিল।' পেরিপ্লাস-গ্রন্থেও সে উক্তি সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত। ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যে, রোমদেশের মুদ্রা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। ৬৮ খৃষ্টাব্দে একদল ইহুদী রোমকগণের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া দক্ষিণ ভারতবর্ষে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহারা মালবার উপকূলে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। † ডক্টর ভাণ্ডারকর দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন ইতিহাস প্রণয়ন করেন। অন্ধ-রাজত্বে বৈদশিক বাণিজ্যের বিষয়ে তাঁহার গ্রন্থেও এবম্বিধ বিবরণ পাওয়া যায়। ‡ শকগণের রাজত্ব-কালে উত্তর-ভারতের বাণিজ্য ঐরূপ বিস্তৃতি-লাভ করিয়াছিল। সেই সময়ে রোম-সাম্রাজ্যের সহিত বাণিজ্যের সম্বন্ধ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। 'রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে' জনৈক অভিজ্ঞ লেখক এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন,—'ভারতবর্ষ এবং চীনদেশ ভিন্ন প্রাচীন মহাদেশের সমগ্র জনপদ যখন রোম-সাম্রাজ্যের সিজার-বংশীয় রাজগণের প্রাধান্য মান্য করিতে বাধ্য হইয়াছিল, সেই সময়ে ভারতের কণিষ্কের প্রতাপ রোমের তোরণ-

অন্ধ্র ও শক বংশের রাজত্বকালে।

* পেরিপ্লাস বা পেরিপ্লাস্ অব দি ইরিথ্রিয়ান সি (Periplus of the Erythraean Sea) নাবিক-গণের সমুদ্র-যাত্রার পথ-প্রদর্শক গ্রন্থ বিশেষ। একজন বহুদর্শী নাবিক লোহিত সমুদ্র, পারস্য উপসাগর, মালবর ও করমণ্ডল উপকূল পরিভ্রমণ করিয়া ঐ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তিনি ভারতবর্ষের বারিগাজা-ভারোচ্ (Barygaza-Bharoach) বন্দরের বহু বর্ষ অবস্থান করিয়াছিলেন।

† "In A. D. 68 a number of Jews fleeing from Roman persecution seems to have taken refuge among the friendly coast-people of South India, and to have settled in Malabar."— R. Sewell, *Imperial Gazetteer*, new edition, Vol. II.

‡ Vide, *Early History of the Deccan* by Dr Bhanderkar.

দ্বারে রোম-সম্রাট হাড্রিয়ানের প্রাচীর-সান্নিধ্যে উপনীত হয়; তখন রোমদেশীয় সুবর্ণ-মুদ্রাদির সঙ্গে সঙ্গে তদ্দেশীয় শিল্পকলা ও ভাব-পরম্পরা ভারতবর্ষে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। তখন রেশম,মণি-মাণিক্য ও মসলা প্রভৃতির বিনিময়ে ভারতীয় রাজগণের ধন-ভাণ্ডার পূর্ণ হইয়াছিল।' * রোম-সাম্রাজ্যের সহিত উত্তর-ভারতের এবম্বিধ বাণিজ্য-সম্বন্ধ সত্বেও উত্তর-ভারতে রোমদেশীয় মুদ্রা ক্বচিৎ প্রাপ্ত হওয়া যায়; অথচ, দাক্ষিণাত্যে রোম-দেশীয় মুদ্রার অসদ্ভাব নাই। ইহার কারণ কি? ঐতিহাসিকগণ নির্দ্ধারণ করেন.—উত্তর-ভারতে টাকশাল স্থাপিত হইয়াছিল, এবং সেই টাকশালে রোমদেশের মুদ্রা গলাইয়া লইয়া নূতন মুদ্রা প্রস্তুত করা হইত। † যাহা হউক, শকগণের ও অন্ধ্রগণের রাজত্বকালে বিদেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য বিশেষভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং তখন ভারতে নূতন নূতন বাণিজ্য-বন্দরের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ হইতে সপ্তম শতাব্দীতে উত্তর-ভারতে গুপ্তবংশের এবং রাজা হর্ষবর্দ্ধনের প্রভাব লক্ষিত হয়। মধ্যে হুনগণ (৫০০ খৃষ্টাব্দ—৫৮০ খৃষ্টাব্দ) কোনও কোনও প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। সে সময়ে ভারত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে এবং চীন প্রভৃতি দেশে বিশেষভাবে বাণিজ্য চলিয়াছিল। সেই বাণিজ্যের পরিচয়-চিহ্ন, গুপ্ত-রাজগণের এবং হুনরাজগণের প্রবর্ত্তিত মুদ্রা-সমূহ, মাদাগাস্কর দ্বীপে ও মালয়দ্বীপ-পুঞ্জে পরবর্ত্তিকালে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। রাজা হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্ব-কালে চীনা-পরিব্রাজক হুয়েন-সাং ভারতবর্ষে আগমন করেন। ভারতবর্ষের বাণিজ্য-বিবরণ তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তের আলোচনায় বিশেষ-ভাবে উপলব্ধি হয়। কলিঙ্গ-দেশের এবং বঙ্গদেশের বণিকগণ এই সময়ে ব্রহ্মদেশে ও মালাক্কা-দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। সপ্তম শতাব্দীর পর হইতে মুসলমানগণের ভারতাগমনের সময় পর্য্যন্ত চোল, চালুক্য প্রভৃতি রাজশক্তির অভ্যুদয়েও ভারতের নানাস্থানে নূতন নূতন বাণিজ্য-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

---

* "When the whole of the civilized world, excepting India and China, passed under the sway of the Cæsars, and the Empire of Kaniksa marched, or almost marched, with that of Hadrian, the ancient isolation of India was infringed upon, and Roman arts and ideas travelled with the stream of Roman gold which flowed into the treasuries of the Rajas in payment for the silks, gems, and spices of the Orient."—*Journal of the Royal Asiatic Society*, 1903.

† "Kadphises I. who struck coins in bronze or copper only, imitated, after his conquest of Kabul, the coinage of Augustus in his later years or the similar coinage of Tibe ius (14 to 38 A. D.). When the Roman gold of the early Emperors began to pour into India in payment for the silks, spices, gems, and dye-stuffs of the East, Kadphises II. perceived the advantage of a gold currency, and struck an abundant issue of Orientalized *aurei*, agreeing in weight with their prototypes, and not much inferior in purity. In Southern India, which during the same period maintained an active maritime trade with the Roman Empire, the local Kings did not attempt to copy the imperial *aurei*, which were themselves imported in large quantities, and used for currency purposes just as English sovereigns are now in many parts of the world"—V. A. Smith, *Early History of India*.

মুসলমান-নৃপতিগণের আধিপত্য-কালে ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্য কোন্ পথে প্রধাবিত হইয়াছিল, এক্ষণে তদ্বিষয় অনুধাবন করা যাউক। সময়ে সময়ে রাজশক্তি ক্ষীণ হইলে বাণিজ্য-পথে দস্যুগণ বড়ই বিঘ্ন উৎপাদন করিত। খৃষ্ট-জন্মের বহু-পূর্ব্ববর্ত্তিকালে পাশ্চাত্য-দেশের সহিত ভারতের যে বাণিজ্য-সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল, দস্যুগণের উপদ্রবে মধ্যে মধ্যে সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। পারস্য-সাম্রাজ্যের যখন প্রবল প্রতাপ, জলদস্যুর উপদ্রব-হেতু তত্রত্য বণিকগণকে তখনও সময় সময় ভারতের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে হইয়াছিল। তাঁহারা দস্যু-ভয়ে সমুদ্র-তীরে বন্দর নির্ম্মাণ করেন নাই। জলদস্যুগণ তাঁহাদের বাণিজ্য-বন্দর-সমূহ লুণ্ঠন করিত বলিয়া, নগর-রক্ষার উদ্দেশ্যে এক সময়ে পারসিকগণ টাইগ্রিস নদীর মোহানা বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আলেকজাণ্ডারের ভারতাগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে এই পথ রুদ্ধ হইয়াছিল। ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগমন-কালে নদীমুখের প্রস্তর-স্তূপ অপসরণ করিয়া আলেকজাণ্ডার বাণিজ্যের সেই পথ উন্মুক্ত করেন। ষ্ট্রাবো ও এরিয়ান এই বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে পূর্ব্বোক্তরূপ একদল জলদস্যু লঙ্কা-দ্বীপের শাসনকর্ত্তার প্রেরিত আটখানি পোত লুণ্ঠন করিয়াছিল। কালিফের পরিতুষ্টি-সাধন জন্য সেই সকল পোতে উপঢৌকনাদি প্রেরিত হইয়াছিল। কতকগুলি 'হজ'-যাত্রী, কতকগুলি পিতৃমাতৃহীন মুসলমান বালক এবং আবিসিনীয়া দেশের কতকগুলি ক্রীতদাস সেই সকল পোতের আরোহী ছিল। পথিমধ্যে দস্যুদল কর্ত্তৃক সেই সকল পোত লুণ্ঠিত হয়। মেদ-জাতীয় দস্যুগণ এবং দেবলের ও সিন্ধু-নদের মোহানাস্থিত দস্যুগণ সেই সকল পোত লুণ্ঠন করিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ পায়। সেই সূত্রে, কালিফ সিন্ধুদেশ-আক্রমণের আদেশ দেন; আরব-সেনাপতি মহম্মদ ইবন কাসিম সিন্ধুদেশ অধিকার করেন। * 'সা-নামা' গ্রন্থে প্রকাশ,—সেই সময়ে বহুসংখ্যক পোতের সাহায্যে কাসিম সিন্ধু-নদ পার হইয়াছিলেন। ইহার পর হইতে আরব-দেশের সহিত সিন্ধু-প্রদেশের নূতন বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। নবম শতাব্দীতে আরবদেশের বণিকগণের সহায়তায় ভারতের পণ্য দিগ্দিগন্তে সংবাহিত হইয়াছিল। বোগদাদে কালিফগণের অভ্যুদয়-কালে আরব-দেশের বণিকগণ বিশেষ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হন। কালিফের অধিনায়কত্বে আরবদেশের যোদ্ধৃগণ বিশেষ প্রতাপশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা মিশর অধিকার করেন, আলেকজান্দ্রিয়ার সহিত ইউরোপের বাণিজ্যের পথ অবরুদ্ধ করিয়া দেন। সেই সময়ে, ৬৩৫ খৃষ্টাব্দে, পারস্য-উপসাগরের মোহানায় বসোরা বন্দর প্রতিষ্ঠিত হয়। আলেকজান্দ্রিয়ার সহিত প্রতিযোগিতায় বসোরা বন্দর প্রাচ্যের সহিত প্রতীচ্যের বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। কালিফের প্রাধান্যের দিনে, আরবের অভ্যুদয়-কালে, যে সকল বৈদেশিক বণিক বাণিজ্য-উপলক্ষে ভারতে আসিয়া-ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সিন্দাবাদ, সুলেমান, মাসোদি প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন। †

মুসলমানদিগের আধিপত্য-কালে ভারতের বাণিজ্য।

* "পৃথিবীর ইতিহাস", দ্বিতীয় খণ্ড, ৩০১ ও ৩০৬ প্রভৃতি পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† Sir George Birdwood,—*Report on the Old Records of India Office.*

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে নাবিক সিন্দাবাদ ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন। ৮৫০ খৃষ্টাব্দে বসোরার বণিক স্থলেমান ভারতের বাণিজ্য-বন্দর-সমূহের সহিত পরিচিত হন। গুজরাটের ও মালবারের সন্নিকটস্থ সমুদ্রকে তিনি 'লার' নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। লঙ্কাদ্বীপ বা সিলোন তাঁহার নিকট 'সেরেণ' দ্বীপ নামে পরিচিত হইয়াছিল। ঐ সকল স্থানের বাণিজ্য-সম্পৎ তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ৮৯০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৯৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বোগ্দাদ-সহরের বণিক মাসোদি ভারতবর্ষে অবস্থান করেন। তৎকালে ভারত-জাত বহু পণ্য-দ্রব্যের মধ্যে লবঙ্গ, জায়ফল, কর্পূর, চন্দনকাষ্ঠ প্রভৃতি তিনি বিদেশে রপ্তানি হইতে দেখিয়াছিলেন। আলবারুণীর গ্রন্থে খৃষ্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতের বাণিজ্য-প্রসঙ্গ দেখিতে পাই। * তৎকালে গুজরাটের উপকূলভাগ বাণিজ্যে বিশেষ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ছিল। তখন, মালব হইতে প্রচুর পরিমাণ চিনি বিদেশে রপ্তানি হইত; পৃথিবীর নানা স্থানে ভারতের পণ্য অর্ণবপোত-সাহায্যে সংবাহিত হইত। মালবার উপকূল এই সময়ে ভারতের বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। পান্না, মুক্তা, সুগন্ধ দ্রব্য ও তৃণ প্রভৃতি এই সময়ে ইরাক, খোরাসান, সিরিয়া, রুম ও ইউরোপে চালান যাইত। তৎকালে এক প্রকার সুবৃহৎ অর্ণবপোত-সাহায্যে চীন এবং মাচীন হইতে নানা জাতীয় পণ্য ও বস্ত্রাদি আনয়ন করা হইত। চীনা-ভাষায় সেই সু-বৃহৎ অর্ণবপোত 'জঙ্ক' বলিয়া পরিচিত ছিল। ওয়াসেফ (১৩২৮ খৃষ্টাব্দে) বলেন,—'জঙ্কগুলি দেখিলে মনে হইত, যেন এক একটা পক্ষ-সংযুক্ত বৃহৎ পর্ব্বত সমুদ্রের উপর বায়ুভরে ভাসিয়া চলিয়াছে।' দ্বাদশ শতাব্দীতে সিন্ধু-দেশের দেবল বন্দর বিশেষ প্রসিদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিল। চীন-দেশের বাণিজ্য-পোত-সমূহ এবং উমান হইতে আগত পণ্যবাহী-পোত-সমূহ দেবল-বন্দরে আশ্রয় লইত এবং সেখান হইতে বণিকগণ বাণিজ্যের সুবিধা পাইতেন। আল-ইদ্রিসি দেবল-বন্দরের এবম্বিধ সমৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তৎকালে বরুচা (বরোচ বন্দর) প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। চীন-দেশের এবং সিন্ধু-দেশের অনেক বাণিজ্য-তরী ঐ বন্দরে আসিয়া পণ্য সংগ্রহ করিত। এই সময়ে করোমণ্ডল-উপকূল কার্পাস-বস্ত্রের ব্যবসায়ে,মালবার উপকূল দারুচিনি ও পিপ্পলের ব্যবসায়ে এবং সিন্ধু-তীরস্থিত মানসুরা বন্দর জাম্বীর লেবুর ব্যবসায়ে প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছিল। ফলতঃ, মুসলমান-সাম্রাজ্যের শৌর্য্য-প্রভায় যখন দিগ্দিগন্ত উদ্ভাসিত, ভারতের বাণিজ্যের প্রভাব তখন সর্ব্বত্র অনুভূত হইয়াছিল।

প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য-কেন্দ্র বন্দর-সমূহ।

অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশের কোন্ বন্দর সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে যে সকল স্থানের যে নাম দৃষ্ট হয়, তাহার অনেক নামই এখন পরিবর্ত্তিত। বঙ্গ, গৌড়, দ্রাবিড়, কলিঙ্গ, কোঙ্কণ, মগধ প্রভৃতি নামে বিভিন্ন জনপদ বিভিন্ন সময়ে পরিচিত ছিল। এখন সে সকল নামের ও পরিচয়ের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। একই নামে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জনপদ পরিচিত ছিল,—সে প্রমাণের অসদ্ভাব নাই। পঞ্চ-গৌড় পঞ্চ-

প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য-বন্দর।

* *Vide* Sir Henry Elliot's ***History of India.***

দ্রাবিড় প্রভৃতির তত্ত্ব অনুধাবন করিলে এ বিষয় উপলব্ধি হইতে পারে। এক প্রদেশের নৃপতি অন্য প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিলে, অথবা এক প্রদেশের অধিবাসিগণ অন্য প্রদেশে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিলে, শেষোক্ত প্রদেশ অনেক সময়েই প্রথমোক্ত প্রদেশের নামে পরিচিত হইত। ভারত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে এবং প্রশান্ত-মহাসাগরের উপকূল-ভাগে যে সকল বন্দর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তৎসমুদায়ের সংজ্ঞার বিষয় অনুধাবন করিলে, এ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। দৃষ্টান্ত আরও অনেক প্রদর্শন করা যায়। মগধের কতকগুলি বণিক বর্ত্তমান শ্রীহট্ট-জেলায় গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়া আপনাদের উপনিবিষ্ট-স্থানের নামকরণ করিয়াছিলেন—মগধ। * প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণকে এখন তজ্জন্য নানা ধাঁধায় ঘুরিয়া বেড়াইতে হইতেছে। যে জনপদে যখন রাজশক্তির অভ্যুদয় হয়, তখন সেই জনপদের নামই প্রবল হইয়া পড়ে। প্রাচীন জনপদের অন্য অস্তিত্ব সে যেন গ্রাস করিয়া বসে। এইরূপে, নানা কারণে অনেক প্রাচীন জনপদের স্থান-নির্দ্দেশে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। যাহা হউক, সে আবরণের মধ্য হইতে ভারতের প্রাচীন বাণিজ্য-বন্দর-সমূহের যে কয়েকটীর নাম উদ্ধার করিতে পারি, তাহারই চেষ্টা পাইতেছি। বারাণসীর প্রাচীনত্ব অবিসম্বাদিত। বৌদ্ধ-জাতক গ্রন্থে দেখিতে পাই,—বারাণসীর সহিত বাবিলনের বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল। ভরুকচ্ছ বা বরোচ এবং চম্পা (বর্ত্তমান ভাগলপুর) প্রভৃতি বাণিজ্য-কেন্দ্রের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি (এই খণ্ডের ৫৫—৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। সিন্ধুনদ হইতে এবং পাটল হইতে বাণিজ্য-পোত-সমূহ ইউরোপে গতিবিধি করিত। আগাথারসাইডিস্ এ বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আগাথারসাইডিস্—পৃথিবী-বিখ্যাত আলেক্‌জান্দ্রিয়ান লাইব্রেরীর সভাপতি ছিলেন। ১৭৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন হয়। ষ্ট্রাবো, প্লিনি, ডায়-ডোরাস্ প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ আগাথারসাইডিসের উক্তিতে যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আগাথারসাইডিস্ পূর্ব্বোক্ত দুই স্থান (সিন্ধুনদ ও পাটল) হইতে বাণিজ্য-পোত-সমূহ বিদেশে গিয়াছিল দেখিয়াছিলেন। প্লিনি—প্রাকৃতিক ইতিহাস সংক্রান্ত গ্রন্থ-রচনায় প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। ৭৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন হয়। ভারতের কতকগুলি বন্দরের বিষয় তিনি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাপ্রোবেণ বন্দরের বিষয় প্লিনির গ্রন্থে বিশেষভাবে উল্লেখ আছে। তাপ্রোবেণ—লঙ্কাদ্বীপের নামান্তর বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ভারতের পণ্য রোম-দেশের অর্থ শোষণ করিয়া লইতেছে বলিয়া তাঁহার আক্ষেপের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। প্লিনির পর পেরিপ্লাস্ গ্রন্থের বর্ণনা উল্লেখযোগ্য। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে (১০০ খৃষ্টাব্দে) পেরিপ্লাস্ গ্রন্থ বিরচিত হয়। তাহার পর টলেমির ভূগোল-গ্রন্থ। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমির ভূগোল-গ্রন্থ প্রণীত হয়। ভারতের বাণিজ্য-কেন্দ্র সম্বন্ধে ঐ দুই গ্রন্থ পাশ্চাত্য-জাতির মধ্যে বিশেষ সমাদৃত। সুতরাং ঐ দুই গ্রন্থে ভারতের কোন্ কোন্ বাণিজ্য-কেন্দ্রের পরিচয় পাওয়া যায়, দেখা যাউক। পেরিপ্লাসের মতে, বরোচ পশ্চিম-ভারতের বাণিজ্য-কেন্দ্র মধ্যে পরিগণিত ছিল। সেখান হইতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পণ্য-দ্রব্য সংবাহিত হইত। পেরিপ্লাসের বর্ণনায়

* সাহিত্য-সংবাদ, তৃতীয় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

পৈথান ও টগর নামক আর দুইটি বাণিজ্য-কেন্দ্রের পরিচয় পাওয়া যায়। পৈথান—বারিগাজার দক্ষিণে কুড়ি দিনের পথে এবং টগর পৈথানের পশ্চিমে দশ দিনের পথে। পৈথান বা পিথান—বর্ত্তমান কালে নিজাম-রাজ্যের অন্তর্গত ধাড়ুর নামক স্থানে চিহ্নিত হয়। ঐ দুই বন্দর হইতে বহু-পরিমাণ মণি-মাণিক্য, মস্‌লিন, তুলা ও বিবিধ পণ্য বরোচ বন্দরে রপ্তানি হইত, এবং সেখান হইতে তৎসমুদায় বিদেশে যাইত। পেরিপ্লাসে আর আর যে সমুদ্রতীরস্থ বন্দরের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে সৌপ্পার, কল্লিয়েনা, সেমুল্লা, মাণ্ডাগোড়া, পালাই,—পাতামাই, মেলিজেই-গড় প্রভৃতি বন্দর প্রসিদ্ধ। সৌপ্পার—বম্বে-প্রেসিডেন্সীর বেসিন-বন্দরের সন্নিকটস্থ সুপার নামক স্থানকে সৌপ্পার বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। পেরিপ্লাস্ কথিত কল্লিয়েনা—বর্ত্তমান কল্যাণ সহর বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। কল্যাণ-সহর এক সময়ে বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। কেনাড়ির এবং জুন্নারের গহ্বরাভ্যন্তরে খোদিত লিপিতে বহু দাতার নাম লিখিত আছে। তাঁহারা কল্যাণের অধিবাসী বাণিজ্য-ব্যবসায়ী বলিয়া পরিচিত। সেমুল্লা বন্দরকে কেহ বা চেম্বুর, কেহ বা মৌল বলিয়া অনুমান করেন। মাণ্ডাগোড়া—বর্ত্তমান মান্দাদ। পালাই-পাতামাই বন্দরকে কেহ কেহ মাহাদের নিকটস্থ পাল-বন্দর বলিয়া মনে করেন। মেলিজেইগড় অধুনা জয়গড় নামে পরিচিত হইয়া থাকে। দক্ষিণ-দিকের তিনটী প্রধান বন্দরের উল্লেখ পেরিপ্লাস-গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। সেই তিনটী বন্দরের নাম,—টিন্‌ডিস্, মুজিরিস্, নেলকিংডা। এই তিনটী বন্দর হইতে পিপ্পল, মশলা, মুক্তা, গজদন্ত, সূক্ষ্ম রেশম ও হীরা, পান্না, চুনী প্রভৃতি বহুমূল্য প্রস্তর-সমূহ বিদেশে রপ্তানি হইত। হিন্দু-বণিকগণের বাণিজ্য-পোত-সমূহ পূর্ব্ব-আফ্রিকায়, আরবে ও পারস্যের বন্দর-সমূহে সর্ব্বদা গতিবিধি করিত। সকোত্রা-দ্বীপের উত্তর-উপকূলে হিন্দু-বণিকগণের উপনিবেশ ছিল। 'পেরিপ্লাসে' এ সকল উল্লেখ আছে। মালবার ও করোমণ্ডল উপকূল হইতে যে সকল বাণিজ্য-পোত বিদেশে যাত্রা করিত, সে সমস্তই ভারতীয় শিল্পিগণের শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয়। মালবার-উপকূলে লিমিরিক্-বন্দরে কয়েক প্রকার পোত-দৃষ্টে তদ্বিবরণ 'পেরিপ্লাস'-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়। পরবর্ত্তিকালে মার্কোপোলো প্রমুখ পরিব্রাজকগণ চীনদেশে যে শ্রেণীর বাণিজ্য-পোত দেখিয়াছিলেন, পেরিপ্লাস-বর্ণিত পোতের বর্ণনার সহিত তাহার সাদৃশ্য অনুভূত হয়। টলেমির ভূগোলে যে সকল বাণিজ্য-বন্দরের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী বন্দর বিশেষ উল্লেখযোগ্য;—(১) সৈরাষ্ট্র—সৌরাষ্ট্রের বিকৃত উচ্চারণ, বর্ত্তমান সুরাটকে বুঝাইয়া থাকে; (২) মোনোগ্লোসন্—গুজরাটের অন্তর্গত মনগ্রোল-বন্দর; (৩) আরিয়াক—মহারাষ্ট্র-দেশকে বুঝাইয়া থাকে; (৪) মৈসোলিয়া—মসলিপত্তন্; (৫) কোনাগর—কেনারক্-বন্দর; (৬) সৌপার; (৭) মুজিরিস্ বা মিজিরিস্—বর্ত্তমান মাঙ্গালোর (পেরিপ্লাস কর্ত্তৃক ঐ নামে অভিহিত হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন); (৮) পাটল,—সিন্ধু-প্রদেশের অন্তর্গত হায়দ্রাবাদ পাটল নামে পরিচিত ছিল বলিয়া সপ্রমাণ হয়; এই পাটল-বন্দরকে বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থান বলিয়া দ্বিতীয় পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে আগাথারসাইডিস্ও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; (৯) বাকেরেই ইত্যাদি। দক্ষিণ

ভারতের বন্দর-সমূহের পরিচয়, প্রাচীন তামিল-সাহিত্যের অভ্যন্তরে নানা আকারে প্রকটিত আছে। মুচিরি-বন্দর পেরিয়ার-নদীর মোহানায় সমুদ্র-তীরে অবস্থিত। "এরূকাড্‌ডুর-তারান-কান্নানার-আকাম" কাব্যে কবি লিখিয়াছেন—'মুচিরি উন্নতিশীল নগর। এখানে যবনগণের সুদৃশ্য অর্ণবপোত-সমূহ গতিবিধি করে। সেই অর্ণবপোতে তাহারা সুবর্ণ আনয়ন করিত এবং সুবর্ণের বিনিময়ে মরিচ লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইত। সেই সকল অর্ণবপোতের গতিবিধি-সূত্রে পেরিয়ার-বক্ষ শ্বেত-উর্ম্মিমালায় উদ্ভাসিত থাকিত। ঐ বন্দর চেরল-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।' অন্য আর এক কবি ('ওয়ারাণার-পুরাম' কাব্য-রচয়িতা) লিখিয়া গিয়াছেন,—'এই বন্দরে ধান্যের বিনিময়ে মৎস্য মিলিত। লোকে বস্তা বস্তা মরিচ লইয়া বাজারে বিক্রয় করিতে যাইত; বিক্রেয় দ্রব্যের বিনিময়ে অর্ণবপোত হইতে সুবর্ণ পাওয়া যাইত। পণ্যের বিনিময়ে যে সুবর্ণ মিলিত, মুচিরি-বন্দরে তাহা বজরায় করিয়া নামান হইত। এই বন্দর তরঙ্গ-সঙ্গীতে সদাই মুখরিত ছিল। রাজা কুড্‌ডুবন, কিবা সামুদ্রিক কিবা পার্ব্বতীয়,—সকল প্রকার দুষ্প্রাপ্য সামগ্রীতে দর্শকের চিত্ত প্রফুল্ল রাখিয়াছিলেন।' প্রাচীন তামিল-কাব্যে 'কাবরি-পড্ডিনাম' নামক আর একটি বন্দরের মনোহর বর্ণনা আছে। পেরিপ্লাস-কথিত 'কামারা' এবং টলেমি কথিত 'খাবেরিজ' বন্দর তামিল-কাব্যে ঐ নামে পরিচিত ছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। ঐ বন্দরের অপর নাম—'পুকার'। কাবেরী-নদীর উত্তর-তীরে ঐ বন্দর প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বন্দরের শ্রীবৃদ্ধির দিনে কাবেরী অধিকতর বিস্তৃত ও গভীর-জল-সম্পন্ন ছিল। পালভরে পরিচালিত অর্ণবপোত-সকল তখন অনায়াসে ঐ বন্দরে গতিবিধি করিত। ঐ নগর তখন দুই অংশে বিভক্ত ছিল। সমুদ্র-তীরবর্ত্তী অংশ 'মারুভার-পাক্কাম' নামে অভিহিত হইত। বন্দরের পার্শ্বে উপকূল-ভাগে অর্ণবপোত-বন্ধনের উপযোগী উন্নত-ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছিল এবং পণ্যাদি উত্তোলন-অবতরণের ব্যবস্থা ছিল। এই বন্দরে পণ্য-কর সংগৃহীত হইত। কর-সংগৃহীত হইলে, চোল-রাজগণের রাজকীয় নিদর্শন-স্বরূপ ব্যাঘ্র-মূর্ত্তি-বিশিষ্ট মোহর পণ্য-দ্রব্যে অঙ্কিত করা হইত। মোহরাঙ্কন হইলে, ছার-প্রাপ্ত হইয়া বণিকগণ আপন-আপন দ্রব্য বিপণীতে লইয়া যাইতে পারিতেন। 'পড্ডিনাপ্পালাই' কাব্যে এই বিবরণ পরিবর্ণিত আছে। এই বন্দরের সন্নিকটে যবন-বণিকগণের উপনিবেশ ছিল। তাঁহারা বিবিধ চিত্তাকর্ষক সামগ্রী বিক্রয় করিতেন। বৈদেশিক বণিকগণ দূর সমুদ্র অতিবাহন করিয়া, এই বন্দরে বাণিজ্য করিতে আসিতেন। এই বন্দরে দেশের বিভিন্ন-ভাষা-ভাষী জনগণের সমাগম ছিল। কত বিভিন্ন প্রকৃতির ব্যবসায়ীই এই বন্দরে বসতি করিতেন! কেহ বা বিবিধ সুগন্ধ দ্রব্য বিক্রয় করিত; কেহ বা রেসম, পশম বা তুলার দ্রব্যে কারুকার্য্য করিত; কেহ বা মণি-মুক্তা-স্বর্ণ প্রভৃতির ব্যবসায় করিত; চিত্রকর, সূত্রধর, স্বর্ণকার, সর্ব্ববিধ পণ্য-ব্যবসায়ী—সে বন্দরে কোনও শ্রেণীর লোকেরই অভাব ছিল না। 'চিলাপ্পথিকরম্' তামিল-কাব্যে মারুভারপাক্কাম বন্দরের এইরূপ বর্ণনা লিখিত আছে। এই বন্দরে ইলাম বা লঙ্কা-দ্বীপ হইতে এবং কালাকাম বা ব্রহ্মদেশ হইতে সর্ব্বদা পণ্য-দ্রব্য আসিত। এই বন্দরের

তামিল-সাহিত্যে বাণিজ্য-বন্দরের পরিচয়।

সন্নিকটে সমুদ্র-মধ্যে আলোক-গৃহ (Light-house) ছিল। সেই আলোক-দৃষ্টে গভীর রাত্রে, দূর সমুদ্র হইতে অর্ণবপোত সকল এখানে গতিবিধি করিতে পারিত। 'পেরুম-পদ-আরূপ-পদাই' নামক অন্য এক তামিল কাব্যে, করোমণ্ডল উপকূলের সন্নিকটে আলোক-গৃহের বিদ্যমানতার বর্ণনা আছে। কবি বলিতেছেন,—ইষ্টক-নির্ম্মিত সুদৃঢ় অত্যুচ্চ আলোক-গৃহ সকল নিশাকালে উজ্জ্বল আলোকে সমুদ্র-মধ্যস্থিত অর্ণবপোত-সমূহকে বন্দরের পথ প্রদর্শন করিত। ফলতঃ, সভ্য-সমুন্নত দেশে পোতাধিষ্ঠান প্রভৃতির জন্য যে সকল ব্যবস্থা-বন্দোবস্তের প্রয়োজন, তাহার কোনও ব্যবস্থারই ত্রুটি ছিল না। 'কবিরি-পাড্ডিনাম' নগরে চোল-রাজগণের যে অট্টালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল, সেই অট্টালিকা নির্ম্মাণের জন্য মগধ হইতে শিল্পিগণ আসিয়াছিলেন, মারাদাম হইতে যন্ত্রিগণ আসিয়াছিলেন; এবং অবন্তী হইতে কর্ম্মকারগণ, ও যবন-দেশ (গ্রীস) হইতে সূত্রধরগণ আসিয়াছিলেন। তামিল-দেশের সুনিপুণ কারিকরগণের সাহায্যে অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

বিদেশীর বর্ণনায় ভারতের বাণিজ্য বন্দর।

প্লিনি, টলেমি এবং পেরিপ্লাস প্রভৃতির প্রদত্ত বিবরণের পর, ভারতের বাণিজ্য-বন্দর-সম্বন্ধে বৈদেশিকগণের মধ্যে 'কসমাস্ ইণ্ডিকোপ্লেয়ষ্টেস্' যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কস্‌মাস্—রোম-দেশীয় একজন প্রসিদ্ধ বণিক। রোম-সম্রাট দ্বিতীয় জাষ্টিনিয়ানের রাজত্ব-কালে তিনি বাণিজ্য-ব্যপদেশে আফ্রিকা-মহাদেশে ইথিওপিয়া প্রদেশের আডুল-বন্দরে গমন করিয়াছিলেন। ঐ বন্দর আকৃসুমের রাজার অধিকৃত ও তৎকালে বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। ৫৬০ খৃষ্টাব্দে কস্‌মাস্ পূর্ব্বোক্ত বন্দরে আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি। কস্‌মাসের গ্রন্থের নাম—'ক্রিশ্চিয়ান টপোগ্রাফি'। * ঐ গ্রন্থে ঐ সময়ের খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণের বসতি-স্থানের উল্লেখ আছে। কস্‌মাসের গ্রন্থে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত বাণিজ্য-বন্দর-সমূহের নাম দৃষ্ট হয়;—(১) 'মালা' বা মালবার,—কস্‌মাস্ এই বন্দরকে মরিচ-ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; (২) 'সিন্ধুজ',—সিন্ধু-দেশ তাঁহার গ্রন্থে ঐ নামে অভিহিত হইয়াছে; (৩) ওরবোটা,—সুরাট বন্দরকে তিনি এই নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন বলিয়া সপ্রমাণ হয়; (৪) কল্লিয়েন,—কাহারও মতে বোম্বাই বন্দরের নিকটস্থ 'গল্লিয়ান' ঐ নামে পরিচিত ছিল; কেহ বলেন,—কল্যাণ-বন্দর কস্‌মাসের বর্ণনায় ঐ নাম পরিগ্রহ করিয়াছিল; (৫) 'সিবর,' (৬) 'পাটি, (৭) মাঙ্গারুথ, (৮) 'সালোপাটনা', (৯) নেলো-পাটনা ও (১০) পুদাপাটনা। ৫২৬ খৃষ্টাব্দে কস্‌মাস সিন্ধু বা দেবল রাজ্য হইতে এবং ওরহেট (সুরাট বা বীরবল) হইতে লঙ্কাদ্বীপে বাণিজ্য-পোত চলিতে দেখিয়াছিলেন। সিলোন বা লঙ্কাদ্বীপকে তিনি সেরেণ-দ্বীপ বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় প্রকাশ,—এক সময়ে ঐ সেরেণ-দ্বীপ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল মধ্যে পরিগণিত ছিল। তখন লঙ্কাদ্বীপ হইতে এক দিকে চীনদেশে অন্য দিকে লোহিত-সমুদ্র ও পারস্য-উপসাগরে পণ্য-বাহী অর্ণবপোত-সমূহ গতিবিধি করিত। কেহ কেহ বলেন, চীনের সহিত যে ভারতের বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল, কস্‌মাসের পূর্ব্বে পাশ্চাত্য-দেশের আর

* Cosmas Indicopleustes, *Christian Topography.*

কোনও গ্রন্থকার তাহার উল্লেখ করেন নাই। কস্‌মাসের পর বৈদেশিকগণের মধ্যে যাঁহারা ভারতের বাণিজ্য-বন্দরাদির বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মার্কোপোলো সমধিক প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন।

মার্কোপোলোর বর্ণনায় ভারতের বাণিজ্য।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ-শতাব্দীর শেষভাগে, মুসলমানগণের ভারত-আক্রমণ-কালে, বৈদেশিক বাণিজ্যের বিবিধ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। ইতিপূর্ব্বে চীনদেশের সহিত ভারতবর্ষের যে বাণিজ্য-সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল, এ সময় সে সম্বন্ধ অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসে। যেমন ভারতবর্ষে মুসলমানগণের আক্রমণে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, মোগলগণের আক্রমণে চীনদেশেও সেইরূপ বিপ্লব উপস্থিত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে (১২০৬ খৃঃ-অঃ) প্রসিদ্ধ মোগল-বীর জঙ্গিস-খাঁ চীন-দেশ অধিকার করেন। সেই হইতে চীনের কতকাংশ মোগল-গণের রাজ্যান্তর্ভুক্ত হয়। তদবধি ১২৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চীন-রাজ্যের কতকাংশ চীনাদিগের এবং কতকাংশ মোগল-দিগের অধিকারভুক্ত ছিল। ঐ সময়ে মোগল-বংশীয় কুবলাই খাঁ সম্পূর্ণরূপে চীনদেশে আপন আধিপত্য বিস্তার করেন এবং চীনের একচ্ছত্র সম্রাট বলিয়া পরিচিত হন। কুবলাই খাঁর রাজত্ব-কালে ভারতের সহিত চীনের বাণিজ্য-সম্বন্ধ পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হয়; ভারতবর্ষের দূতগণ বাণিজ্যের সুবিধার জন্য চীনদেশে যথারীতি গতিবিধি করিতে আরম্ভ করেন। সম্রাট কুবলাই খাঁর আধিপত্য-কালে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী মার্কোপোলো চীনদেশে অব-স্থিতি করিয়াছিলেন এবং চীনদেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ইটালীর অন্তর্গত ভিনিসীয়া-দেশ মার্কোপোলোর জন্মস্থান। তাঁহার পিতা এবং খুল্লতাত বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন। তাহাদেরই সঙ্গে মার্কোপোলো চীনদেশে আগমন করেন। স্বদেশ হইতে যাত্রা করিয়া, মধ্য-এসিয়ার ভীষণ মরুক্ষেত্র বহু-কষ্টে উত্তীর্ণ হইয়া, ১২৭৫ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে মার্কোপোলো চীনদেশে উপনীত হন। তখন তাঁহার যুবা বয়স। তাঁহাকে দেখিয়াই চীন-সম্রাট কুবলাই খাঁ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হন। ফলে, মার্কোপোলো একটী রাজকীয় উচ্চ-পদ-লাভ করেন। সেই উপলক্ষে তিনি চীন-সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে গতিবিধি করেন, এবং তাঁহাকে ভারতবর্ষে, ব্রহ্মদেশে ও পারস্যে দূতরূপে যাইতে হয়। স্বদেশ হইতে যাত্রা করিয়া মার্কোপোলো কি ভাবে কোন্ দেশে গতিবিধি করেন এবং কোথায় কি দর্শন করেন, একখানি গ্রন্থে তিনি তৎসমুদায় লিপিবদ্ধ করিয়া যান। সেই গ্রন্থ 'মার্কোপোলোর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত' বলিয়া প্রসিদ্ধ। * চীনদেশ হইতে সমুদ্র-পথে যাত্রা করিয়া ভারতবর্ষে দাক্ষিণাত্যের বন্দর-সমূহ তিনি পর্য্যবেক্ষণ করেন। তৎসূত্রে তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে

* বলা বাহুল্য, মার্কোপোলোর সেই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ফরাসী ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। এক্ষণে সেই গ্রন্থ ইউরোপের নানা ভাষায় অনুদিত হইয়াছে। ইংরাজীতে ঐ গ্রন্থের অনেক অনুবাদ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে দুই খানি অনুবাদ প্রসিদ্ধ। তবে স্যর হেনরী ইউল কৃত অনুবাদই উৎকৃষ্ট বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। সেই অনুবাদ-গ্রন্থের পুরা নাম—The Book of Ser Marco Polo—the Venetian concerning the kingdoms and marvels of the East. Translated and edited by Colonel Sir Henry Yule, R. E., C. B., K. C. I. E. অপরখানি মার্সডেনের অনুবাদ। সে খানির নাম—*The Travels of Marco Polo* (Marsden's translation) Edited by Thomas Wright.

চীন-দেশের এবং ভারতবর্ষের বাণিজ্য-বন্দর-সমূহের বিশদ বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়। চীন-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত 'জেটন' এবং 'কিন্‌সে' নামক দুইটী বন্দরের বিষয় মার্কোপোলো বিশেষ-ভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মার্কোপোলো কথিত 'জেটন' বন্দর অধুনা 'চোয়ান-চাউ-ফু' বা 'চিন্‌-চেউ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ঐ বন্দরের বর্ণন-ব্যপদেশে মার্কোপোলো লিখিয়া গিয়াছেন,—"পৃথিবীর দুইটী প্রধান বাণিজ্য-বন্দরের মধ্যে 'জেটন' প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন। এই 'জেটন' বন্দরে ভারতের বাণিজ্যপোত-সমূহ প্রতিনিয়ত গতিবিধি করে। সেই সকল বাণিজ্যপোতে বিবিধ সুগন্ধী মসলা এবং বহুমূল্য পণ্যদ্রব্য আনীত হয়। মাঞ্জি অর্থাৎ দক্ষিণ-চীন হইতে বহু বণিক সর্ব্বদা এই বন্দরে আগমন করে। তাহারা এখান হইতে ভারতের আমদানী অপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য পণ্যদ্রব্য-সমূহ, মূল্যবান প্রস্তর ও মুক্তা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া লয়। সেই সকল ভারতীয় পণ্য চীনদেশীয় বণিকগণ কর্ত্তৃক চীনের বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। আলেকজান্দ্রিয়া সহরে কিম্বা অন্যান্য খৃষ্টান-রাজ্য-সমূহে ভারতবর্ষ হইতে মরিচাদি লইয়া অর্ণবপোত যাতায়াত করে; কিন্তু যে পরিমাণ সামগ্রী পাশ্চাত্য-দেশে রপ্তানী হয়, তাহার শতগুণ সামগ্রী চীনদেশে 'জেটন' বন্দরে আমদানী হইয়া থাকে।" মার্কোপোলোর এই বর্ণনায় প্রতিপন্ন হয়, ভারতবর্ষ হইতে পাশ্চাত্য-দেশে যে পণ্য রপ্তানী হইত, তাহার তুলনায় অনেক অধিক পরিমাণ ভারতীয় পণ্যের চীনদেশে কাট্‌তি ছিল। 'জেটন' বন্দরের অনতিদূরে 'ফুজু' নামে আর একটী বন্দর ছিল। সে বন্দরের বর্ত্তমান নাম—'ফু-চাউ'। একটী বিশাল নদীর উভয় পার্শ্বে ঐ বন্দরের অবস্থান। নদীর বিস্তৃতি এক মাইলের কম ছিল না। সমুদ্রতীরস্থ 'জেটন' বন্দরে ভারতবর্ষ হইতে যে সকল বাণিজ্য-পোত গতিবিধি করিত, তাহার অধিকাংশ সেই নদী-বক্ষ ভেদ করিয়া 'ফুজু' বন্দরে গমনাগমন করিত। বহুমূল্য প্রস্তরের ও মুক্তার পণ্যে এই বন্দরটী বিশেষ প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার পর মার্কোপোলো 'কিন্‌সে' বন্দরের বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 'কিন্‌সে' বন্দরের বর্ণনায় প্রকাশ,—"এই বন্দর সমুদ্র হইতে পঁচিশ মাইল দূরে, 'গাং-ফু' প্রদেশে অবস্থিত। এ বন্দরে সর্ব্বদা আমদানী-রপ্তানীর কাজ চলিতেছে। এখানে বিপণীর পশ্চাদ্ভাগে বিস্তৃত খাল আছে; সেই খালের ধারে প্রস্তর-নির্ম্মিত অট্টালিকা-সমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে যে সকল বণিক 'কিন্‌সে' বন্দরে আগমন করেন, তাঁহারা এবং অন্যান্য দেশের বণিকেরা সেই সকল অট্টালিকায় বাস করিতে পান, তাঁহাদের পণ্য-দ্রব্যাদিও সেই সকল অট্টালিকায় রক্ষিত হয়।" এই বন্দরে পণ্যদ্রব্যের উপর কর-সংগ্রহ হইত। চীন-গবর্ণমেণ্ট কি নিয়মে কর গ্রহণ করিতেন, 'মার্কোপোলো' তাহা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সে করের হার,—মসলাদি দ্রব্যের মূল্যের উপর শতকরা সাড়ে তিন টাকা এবং অন্যান্য দ্রব্যের উপর শতকরা দশ টাকা নির্দ্ধারিত ছিল। সম্রাট কুবলাই খাঁর রাজত্বকালে ভারতের পণ্য চীনদেশে উপনীত হইলে কি ভাবে তাহা চীনের বিভিন্ন প্রদেশে সংবাহিত হইত, ফরাসী-দেশীয় প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডি-গাইনস্‌ তাহার একটু পরিচয় দিয়াছেন। 'ফো-কিন' প্রদেশের বন্দর-সমূহে এবং 'চোয়ান-চৌ' (এই বন্দর মার্কোপোলোর গ্রন্থে 'জেটন' নামে পরিচিত) বন্দরে পশ্চিম-দেশ (ভারতবর্ষ প্রভৃতি) হইতে পণ্যবাহী

অর্ণব-পোত-সমূহ উপনীত হইলে মোগলগণের এবং কুবলাই খাঁর আনন্দের অবধি থাকিত না। ভারতবর্ষ হইতে পণ্যদ্রব্য-সমূহ চীনের বন্দরে উপস্থিত হইলে একটী প্রকাণ্ড মেলা বসিয়া যাইত এবং সেখান হইতে সেই সকল সামগ্রী পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিক্রয়ার্থ বণিকগণ লইয়া যাইত।

'জেটন' বন্দর হইতে সমুদ্র-পথে পারস্যে গমন-কালে মার্কোপোলো দক্ষিণ-ভারতের ও গুজরাটের বহু বাণিজ্য-বন্দর দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে সেই সকল বন্দরের অনেকগুলির পরিচয় আছে। তাঁহার পরিদৃষ্ট একটী প্রদেশের নাম—'মাবার' (Maabar)। এই প্রদেশ সে সময় বাণিজ্যে বিশেষ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ছিল। এই প্রদেশকে তিনি পৃথিবীর মধ্যে সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন ও সমুন্নত রাজ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। † মাবার-রাজ্যের মধ্যে একটী প্রধান বন্দর ছিল। তাহার নাম—'কৈল' (Cail)। বর্ত্তমান তিন্নেভেল্লি সহরকে কেহ কেহ প্রাচীন 'কৈল' বন্দর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, এবং বর্ত্তমান 'তাঞ্জোর' প্রদেশ 'মাবার' রাজ্য বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ মার্কোপোলো লিখিত 'মাবার' প্রদেশকে 'মালবার' উপকূল বলিয়া অনুমান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বাস্তব তাহা নহে। মার্কোপোলোর গ্রন্থে 'মেলিবার' (Melibar) নামে আর এক প্রদেশের উল্লেখ আছে। মেলিবার—মালবার বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কুমারিকা অন্তরীপ হইতে নেল্লোর পর্য্যন্ত যে ভূমিখণ্ড অর্থাৎ অধুনা যাহা করোমণ্ডল উপকূল বলিয়া পরিচিত হয়, মুসলমানগণের শাসন-সময়ে সেই প্রদেশ 'মাবার' নামে পরিচিত ছিল। ১২৮০ খৃষ্টাব্দে এই মাবার-রাজ্য হইতে চীনদেশে দূত প্রেরিত হইয়াছিল। চীনাদিগের রাজকীয় বিবরণীতে দক্ষিণ-ভারতের অন্তর্গত 'মা-পা-র' (Ma-pa-rh) রাজ্য হইতে চীন-সম্রাটের দরবারে দূতগমনের প্রসঙ্গ লিখিত আছে। ১২৮৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট কুবলাই খাঁর দরবারে 'মাবার' হইতে উপঢৌকনাদি গিয়াছিল,—প্রোক্ত রাজকীয় বিবরণীতে তাহারও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল বৈদেশিক রাজ্য হইতে চীনে উপঢৌকনাদি গিয়াছিল, তাহার মধ্যে 'মাবার' রাজ্যের পরিচয় একটু বিশেষভাবে লিখিত আছে। রাজকীয় বিবরণীতে প্রকাশ,—মাবার-রাজ্য পঞ্চ-ভ্রাতার শাসনাধীন ছিল; আর তাঁহাদের প্রতিনিধিরূপে 'চামালেটীং' (Chamalating) চীনে মোগল-দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 'মাবার'-প্রদেশের সমৃদ্ধি-সময়ে আরবের ও পারস্যের মুসলমান ঐতিহাসিকগণ ঐ প্রদেশের বাণিজ্য-সম্পদের বিষয় শতমুখে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। পারস্যের অন্তর্গত সিরাজ-সহরের অধিবাসী আব-দুল্লা এন ওয়াসেফ ১৩০০ খৃষ্টাব্দে পারস্য ভাষায় এক ইতিহাস প্রণয়ন করেন। সেই গ্রন্থের নাম—'তাজ্জিয়াতুল্ আমসার্ ওয়া তাজরিয়াতুল আসার্।' ‡ সাধারণতঃ এই গ্রন্থ 'তারিখ-

দক্ষিণ-ভারতে মাবার বন্দর।

De Guigne's—*Historie Generale des Huns*

† 'The finest and noblest province in the world.'—*The book of Ser Marco Polo.*

‡ *Tazjiyatul Amsar wa Tazriyatul Asar* means—A Ramble through the Regions and the Passing of Ages.

ই-ওয়াসেফ' নামে পরিচিত। 'মাবার'-রাজ্য সম্বন্ধে এই গ্রন্থে লিখিত আছে,—'মাবার-প্রদেশ কাউলাম হইতে নীলাওয়ার পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কাউলাম (Kaulam) অধুনা কুইলন (Quilon) বলিয়া এবং নীলাওয়ার (Nilawar) অধুনা নেল্লোর বলিয়া পরিচিত হইতেছে। সমুদ্রতীরে মাবার-রাজ্যের দৈর্ঘ্য—তিন শত প্রসং। ঐ রাজ্যের অধিপতি 'দেবর' অর্থাৎ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর বলিয়া পরিচিত। চীন ও মাচীন হইতে কৌতূহল-প্রদ পণ্য-সমূহ এবং 'হিন্দ' ও 'সিন্দ' হইতে তত্তদ্দেশের উৎপন্ন উৎকৃষ্ট সামগ্রী-সমূহ সর্ব্বদা এই বন্দরে সংবাহিত হয়। পক্ষবিশিষ্ট প্রকাণ্ড পর্ব্বতের ন্যায় 'জঙ্ক' নামধেয় অর্ণব-পোতে সেই সকল পণ্য এই বন্দরে আনীত হইয়া থাকে। পারস্যোপসাগরস্থিত দ্বীপ-সমূহের ঐশ্বর্য্য এবং 'ইরাক' ও 'খোরাসান' হইতে আরম্ভ করিয়া রুম-রাজ্যের (কনস্তান্তিনোপলের) ও ইউরোপের সমৃদ্ধি-সৌষ্ঠব প্রধানতঃ 'মাবার'-বন্দরের বাণিজ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।' পারস্য-দেশের অন্যতর প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রশিদুদ্দীনের গ্রন্থেও ওয়াসেফের এই সকল কথার প্রতিধ্বনি দৃষ্ট হয়। রশিদুদ্দীন ১৩১০ খৃষ্টাব্দে আপন গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। তাঁহার গ্রন্থের নাম—'জামিউৎ-তাওয়ারিখ'। ঐ গ্রন্থে প্রকাশ,—'মাবার হইতে রেশমী দ্রব্য, সুগন্ধ দ্রব্য ও বহু-পরিমাণ মুক্তা বিদেশে রপ্তানী হইত। স্থল-পথে ও জলপথে উভয় পথেই এখানকার পণ্য বিদেশে যাইত। রাজ্যের দৈর্ঘ্য-বিস্তৃতির বিষয়ে ও রাজার দেবর উপাধি প্রভৃতি সম্বন্ধে এই গ্রন্থ—ওয়াসেফের গ্রন্থের সম্পূর্ণ অনুসারী। মাবার-প্রদেশের এক সময়ের অবস্থা বর্ণন করিতে গিয়া, ওয়াসেফ আরও যাহা লিখিয়াছেন, এতৎপ্রসঙ্গে তাহাও উল্লেখ-যোগ্য। ওয়াসেফ লিখিয়াছেন,—'কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে সুন্দর-পাণ্ডি মাবারের 'দেবর' বা রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার তিন ভাই। ভ্রাতৃগণ সকলেই ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে স্বাধীন-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দেবরের ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে তকিউদ্দিন আবদার রহমন গুণবান ও বিশেষ কর্ম্মক্ষম ছিলেন। তিনি হিন্দ-প্রদেশের 'মার্জবান' বা শাসনকর্ত্তা বলিয়া প্রখ্যাত। তাঁহার যশোগানে ও প্রশংসাবাদে দেশের অধিবাসিগণ সকলেই মুক্তকণ্ঠ ছিলেন। তিনিই দেবরের সহকারী মন্ত্রী ও প্রধান পরামর্শদাতা। সর্ব্ববিষয়েই তাঁহার বিজ্ঞতা প্রকাশ পাইত। চীন ও হিন্দ প্রভৃতি দূরদেশ হইতে যে সকল পণ্য-দ্রব্য 'মাবার' বন্দরে আনীত হইত, আবদার রহমনের আদেশানুসারে, তাঁহার প্রতিনিধি ও কর্ম্মচারিগণ তৎসমুদায়ের সারাংশ প্রথমে গ্রহণ করিতেন। তাঁহাদের পছন্দমত দ্রব্যাদি গৃহীত হওয়ার পর অপরে পণ্যাদি ক্রয় করিতে পারিত। আবদার রহমন যে সকল পণ্য পছন্দ করিয়া লইতেন, তৎসমুদায় তাঁহার আপনার অর্ণবপোতে 'কেজ' দ্বীপে সংবাহিত হইত, অথবা বণিকগণকে ও পোতাধ্যক্ষগণকে তিনি তৎসমুদায় ঐ দ্বীপে লইয়া যাইতে আদেশ দিতেন। সেখানেও সাধারণ লোকে সহসা সে সকল পণ্য ক্রয় করিতে পারিত না। তত্রত্য 'মালিকুল ইসলামের' কর্ম্মচারিগণ প্রথমে আসিয়া আপনাদের আবশ্যক দ্রব্য গ্রহণ করিত। তাহারা গ্রহণ করার পর, বণিকেরা অবশিষ্ট দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইয়া 'মাবারের' অধিবাসিগণের মধ্যে বিক্রয় করিত। অবশিষ্ট যাহা কিছু থাকিত, কতক পোত-সাহায্যে পারিপার্শ্বিক দ্বীপ-সমূহে ও পূর্ব্ব-পশ্চিমের বিভিন্ন দেশে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইত। ঐ সকল সামগ্রী বিক্রয় করিয়া বিক্রয়-

লব্ধ অর্থে আবার আপনাদের ব্যবহারোপযোগী সামগ্রী ক্রয়ের ব্যবস্থা ছিল। ফলতঃ, দূর চীনদেশের পণ্য 'মাবার' হইতে নানাস্থানে সুদূর পশ্চিমে বিস্তৃত হইয়া পড়িত। পৃথিবীর অন্যত্র বাণিজ্যের এরূপ সুব্যবস্থা ছিল বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায় না।' মার্কোপোলো 'মাবার' প্রদেশের প্রধান বন্দরের নাম 'কেল' বা 'কৈল' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—'কৈল' নগর সুবৃহৎ ও সুপ্রসিদ্ধ। পশ্চিমের হর্ম্মোজ, কিশ, এডেন এবং আরবের বিভিন্ন স্থান হইতে ঘোটক ও অন্যান্য পণ্য বহন করিয়া যে সকল বাণিজ্য-পোত পূর্ব্বাভিমুখে গতিবিধি করিত, তৎসমুদায় এই 'কৈল' বন্দরে প্রথম উপস্থিত হইত। * মার্কোপোলো—ভারতের প্রাচীনত্বের তুলনায় সেদিনের মার্কোপোলো—যে বন্দরের এইরূপ সমৃদ্ধির বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, আশ্চর্য্যের বিষয়—তাঁহার পরিদৃষ্ট সেদিনের সেই সমৃদ্ধি-সম্পন্ন বন্দরের স্থান-নির্দ্দেশে অধুনা অনুসন্ধিৎসু প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের গবেষণা পর্য্যুদস্ত হইতেছে। দ্রাবিড়ী-ভাষার ব্যাকরণ-রচনায় প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন ডক্টর কল্ডওয়েল তিন্নেভেল্লী-জেলার ইতিহাস-গ্রন্থ প্রণয়ন-উপলক্ষে মার্কোপোলো-কথিত 'কৈল' বন্দরের অনুসন্ধান লইয়াছিলেন। তিনি বলেন,—কোরকাই এবং সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী স্থানে প্রাচীন কয়াল (Kayal) নামে একটী ক্ষুদ্র পল্লী দৃষ্ট হয়। মার্কোপোলো কথিত সুবিখ্যাত 'কৈল-বন্দর' কালে ঐ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বর্ত্তমান কৈল-পল্লীর দুই তিন মাইল উত্তরে এবং পল্লীর নিকট এক মাইল দেড় মাইল ব্যাপিয়া ভগ্ন ইষ্টকের ও মৃৎ-পাত্রের স্তূপ পরিদৃষ্ট হয়। সেই ভগ্ন-স্তূপের মধ্যে আরব-দেশের মৃৎপাত্রের ও নানা আকারের নানা রঙের চীনা বাসনের ভগ্নাবশেষ-সমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে। সে সকল ভগ্নাবশেষ সংগ্রহ করিলে এক দিনে এক গাড়ী সংগ্রহ হইতে পারে। কয়াল, কোরকাই এবং পারিপার্শ্বিক পল্লীর অধিবাসিগণের স্মৃতি হইতে চীনের সহিত কয়ালের বাণিজ্য-সম্বন্ধের বিষয় যদিও লোপ পাইতে বসিয়াছে; কিন্তু ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত চীনা বাসনের ভগ্নাংশ-সমূহ সে স্মৃতি জাগরুক করিয়া দিতেছে। তবে যে আরবের ও পারস্যোপসাগরের বন্দর-সমূহের সহিত কয়ালের বাণিজ্য-সম্বন্ধের বিষয় আজিও অনেকের স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হয় নাই, তাহার কারণ—সেই বাণিজ্য-সম্বন্ধ অতি আধুনিক কালেও বিদ্যমান ছিল।' † কৈল-বন্দরের স্থান-নির্দ্দেশে ডক্টর কল্ডওয়েল যে কোরকাই পল্লীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে ঐ স্থানের প্রাচীনত্ব নানারূপে প্রতিপন্ন হয়। খৃষ্ট-পূর্ব্ব নবম শতাব্দীতে কোরকাই পাণ্ড্যবংশীয় রাজগণের রাজধানী ছিল। সে প্রাচীন-গৌরবের কিঞ্চিৎ আভাস এই খণ্ড পৃথিবীর ইতিহাসে ওফির-বন্দর-প্রসঙ্গে

* "Cail is a great and noble city. It is at this city that all the ships touch that come from the west, as from Hormes, and from Kis, and from Aden, and all Arabia, laden with horses and with other things for sale."—*Marco Polo.*

† "The people of Kayal, Korkei and the neighbourhood have forgotten the existence of any trade between Kayal and China, though the broken pieces of China pottery which lie all about might have helped them to keep the fact in their remembrance."—*A Political and General History of the District of Tinnevelly in the Presidency of Madras by Rev. R. Caldwell. L. L. D.*

পূর্ব্বে (৬২পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) উল্লেখ করিয়াছি। ওয়াসেফের বর্ণনায় ঐ প্রদেশের রাজার নাম—সুন্দরপাণ্ডি বলিয়া পরিচয় পাইয়াছি। হইতে পারে, সুন্দরপাণ্ডি—সেই প্রাচীন পাণ্ড্য-বংশের শেষ স্মৃতি; সম্ভবতঃ তাঁহার পর হইতেই ঐ রাজ্য মুসলমান-রাজ্য-মধ্যে পরিগণিত হয়। সুন্দরপাণ্ডির দক্ষিণ-হস্ত-স্বরূপ (তাঁহার ভ্রাতা বলিয়া পরিচিত) তকিউদ্দিন আবদার বহমন প্রভৃতির বিষয় স্মরণ করিলে তাঁহারাই মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সে বিতর্কের স্থান এখানে নহে। এখানে কেবল এতৎপ্রসঙ্গে আভীর, উবারি, ওফির, কোরকাই, কৈল, কয়াল প্রভৃতির প্রাচীনত্বের ও অভিন্নত্বের স্মৃতি জাগরূক হইতেছে, ইহাই বলা যাইতে পারে।

মার্কোপোলো কথিত অন্যান্য বন্দর।

মার্কোপোলো দক্ষিণ-ভারতের আর আর যে সকল বাণিজ্য-কেন্দ্রের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে মেলিবার (Melibar), মুৎফিলি (Mutfili) ও লার (Lar) প্রদেশ এবং কোমারি (Comari), কৈলাম (Coilum), এলি (Eli), টানা (Tana), কম্বেট (Cambaet), সেমেনাট (Semenat) প্রভৃতি বন্দর তৎকালে বিশেষ প্রসিদ্ধিসম্পন্ন ছিল। মালবার-প্রদেশকেই মার্কোপোলো মেলিবার বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, প্রতিপন্ন হয়। মেলিবার-রাজ্যের বর্ণনা-প্রসঙ্গে মার্কোপোলো লিখিয়াছেন,—'নানা দেশ হইতে, প্রধানতঃ মাঞ্জি-প্রদেশ (দক্ষিণ-চীন) হইতে, এই বন্দরে বাণিজ্যপোত-সমূহ আগমন করিত। এই বন্দর হইতে মাঞ্জিতে এবং পশ্চিমাঞ্চলে বহুবিধ মসলা রপ্তানী হইত। এখান হইতে যে সকল পণ্য এডেন-বন্দরে যাইত, বণিকগণ তৎসমুদায় প্রায়ই আলেকজান্দ্রিয়া সহরে চালান দিতেন। তবে এই বন্দর হইতে পূর্ব্বাঞ্চলে যদি পণ্য-বাহী পোত দশ খানা যাইত, পশ্চিমাঞ্চলে সে তুলনায় এক খানার অধিক যাইত না।' এই মালবার-উপকূল স্মরণাতীত-কাল পূর্ব্বে যে বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রসিদ্ধিসম্পন্ন ছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই প্রদেশের অন্তর্গত কালিকট বন্দর এক সময়ে যে সমৃদ্ধির উচ্চ-চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহার নানা প্রমাণ পাওয়া যায়। আরবদেশের প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী ইবন-বাতুতা ১৩৪২ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে আগমন করেন। কালিকট-প্রদেশ তখন একজন হিন্দু-নৃপতির শাসনাধীন ছিল। ইবন-বাতুতা ঐ বন্দর সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন,—'মালবার-প্রদেশে কালিকট একটী প্রধান বন্দর। পৃথিবীর সকল দেশের বণিকগণের এই বন্দরে গতিবিধি আছে। এই বন্দরের অধিকাংশ মুসলমান বণিক এতই ধনৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন যে, তাঁহাদের যে কেহ একজন ঐ বন্দরে সমাগত পোত-সমূহের সমগ্র পণ্য ক্রয় করিতে সমর্থ ছিলেন এবং তাহাদের যে কেহ একজন একাই তদনুরূপ পণ্য-বাহী পোত-সমূহ সজ্জিত করিয়া বিদেশে পাঠাইতে পারিতেন।'* মেলিবার-প্রদেশের বর্ণনার পর মার্কোপোলো টানা বন্দরের বিষয় উল্লেখ করিয়া

* "We next come to Kalikut, one of the great ports of the districts of Malabar, and in which merchants from all parts are found. The greatest part of the Mahommadan merchants of this place are so wealthy that one of them can purchase the whole freightage of such vessels as put in here, and fit out others like them."—*The Travels of Iben Batuta* translated by S. Lees.

মেলিবার-প্রদেশের বর্ণনার পর মার্কোপোলো টানা বন্দরের বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান কালে বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীতে থানা নামে একটী বন্দর দৃষ্ট হয়। বোম্বাই হইতে কুড়ি মাইল দূরে সালসেটি দ্বীপে ঐ বন্দর অবস্থিত। মার্কোপোলো-কথিত টানা বন্দর—অধুনা 'থানা' নাম পরিগ্রহ করিয়াছে বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। এই বন্দর সম্বন্ধে মার্কোপোলো লিখিয়া গিয়াছেন,—'এই বন্দর বাণিজ্য-ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ। বহু অর্ণব-পোত ও বণিক-সম্প্রদায় সর্ব্বদা এখানে গতিবিধি করে। এই বন্দর হইতে নানা শ্রেণীর অত্যুৎকৃষ্ট চর্ম্ম, মোমজামা এবং কার্পাস-বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হইত। বিদেশ হইতে বণিক-গণ এই বন্দরে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র এবং অন্যান্য বিবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানী করিয়া থাকে।' টানা-বন্দরের পর মার্কোপোলোর গ্রন্থে 'লার' প্রদেশের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বকালে এক সময়ে গুজরাটকে ও কোঙ্কণের উত্তরাংশকে 'লাট-দেশ' বলিত। মার্কোপোলো উহাকেই 'লার'-প্রদেশ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ঐ প্রদেশের বণিকগণকে মার্কোপোলো 'আব্রৈমান' (ব্রাহ্মণ ?) নামে পরিচিত করিয়া তাঁহাদের সততার ভূয়সী প্রশংসা করেন। ঐ সকল বণিক যেমন সত্য-পরায়ণ ছিলেন, তেমনই পবিত্র জীবন যাপন করিতেন। তাঁহারা মদ্য-মাংস স্পর্শ করিতেন না, এবং পরের দ্রব্যকে লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান করিতেন। তাঁহাদের গলদেশে যে উপবীত ছিল, মার্কোপোলোর বর্ণনায় তাহা বুঝিতে পারা যায়। * মার্কোপোলো-কথিত 'কৈলাশ' বন্দর অধুনা ট্রাভাঙ্কোরের (ত্রিবাঙ্কুরের) অন্তর্গত 'কুই-লোন' নগর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। মার্কোপোলোর বর্ণনায় প্রকাশ,—ঐ বন্দরে মাঞ্জি অর্থাৎ দক্ষিণ-চীন, আরব ও 'লেভান্ত' উপসাগর হইতে পণ্য-বাহী পোত সহ বণিকগণ সর্ব্বদা আগমন করে; ঐ বন্দরে রপ্তানীর ও আমদানীর কার্য্যে তাহারা বিশেষ লাভবান হয়। চীন-দেশের রাজকীয় বিবরণীতেও এই 'কুইলোন' বন্দরের বাণিজ্যের বিষয় উল্লেখ আছে। এই বন্দরের বা প্রদেশের নৃপতি চীনাদিগের নিকট 'পিনাতি' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কুইলোনের অধিপতিগণ সাধারণতঃ 'বেনাদান' বলিয়া পরিচিত। ত্রিবাঙ্কুরের রাজারা আজিও ঐ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ঐ নাম চীনা-ভাষায় 'পিনাতি' রূপ পরিগ্রহ

* 'লার'-প্রদেশের বণিকগণের সম্বন্ধে মার্কোপোলোর উক্তির আভাস পূর্ব্বেও (এই পরিচ্ছেদের ৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) আমরা প্রদান করিয়াছি। পাঠকগণের অবগতির জন্য মার্কোপোলোর গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ অংশও উদ্ধৃত করিতেছি,—"You must know that these Abraiman are the best merchants in the world, and the most truthful, for they would not tell lie for anything on earth. If a foreign merchant who does not know the ways of the country applies to them and entrusts his goods to them they will take charge of these and sell them in the most legal manner, seeking jealously the profit of the foreigner and asking no commission except what he pleases to bestow. They eat no flesh, and drink no wine, and live a life of great chastity. Nor would they on any account take what belongs to another, so their law commands. And they are all distinguished by wearing a thread of cotton over one shoulder and tied under the other arm, so that it crosses the breast and the back."—*Marco Polo (Yule's Edition.)*

করিয়া থাকিবে, ইহাই অনেকে অনুমান করেন। * 'কুইলোন' বন্দরে আদা, মরিচ এবং উৎকৃষ্ট নীল পাওয়া যাইত। 'ব্রাজিল' (রং-করিবার উপযোগী) কাঠ এখানে প্রচুর মিলিত। আরবের ও পারস্যের বণিকগণ আপনাদের বাণিজ্য-পোত সহ এই বন্দরে বাণিজ্য করিতে আসিতেন। মার্কোপোলো-কথিত 'এলি'-বন্দর অধুনা 'কানানোর' নাম পরিগ্রহ করিয়াছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। 'মাঞ্জি' ভিন্ন অন্যান্য দেশ হইতে যে সকল বাণিজ্য-পোত গ্রীষ্মকালে এই বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইত, সপ্তাহ মধ্যে পণ্য-দ্রব্য নামাইয়া দিয়া সেই সকল পোত যত শীঘ্র সম্ভব এই বন্দর হইতে চলিয়া যাইত। কারণ, নদীর মোহানা ভিন্ন এই বন্দরে জিনিষ-পত্র নামাইবার-উঠাইবার সুবিধা ছিল না। অপিচ, সে স্থান প্রধানতঃ বালুকাকীর্ণ থাকায় সেখানে অধিক দিন পোত রক্ষা করা নাবিকগণ বিপজ্জনক বলিয়া মনে করিত। কিন্তু 'মাঞ্জি' হইতে যে সকল বাণিজ্য-পোত ঐ বন্দরে উপস্থিত হইত, তৎসমুদায় ঐ স্থানে অধিক দিন অবস্থান করায় কোনও দ্বিধাবোধ করিত না। তাহারা বন্দর-সান্নিধ্যে বাণিজ্য-পোত রক্ষার উপযোগী কাঠের নঙ্গর প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিল। মার্কোপোলোর বর্ণনায় 'এলি'-বন্দরের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। মার্কোপোলোর ভারত-আগমনের প্রায় ৭০ বৎসর পরে ইবন-বাতুতা ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি ঐ বন্দরকে একটী সুপ্রতিষ্ঠিত সুগঠিত নগর বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। নদীর মোহানায় ঐ নগর অবস্থিত ছিল এবং বড় বড় জাহাজ-সকল ঐ বন্দরে গতিবিধি করিত। ইবন-বাতুতার উচ্চারণে এই বন্দর 'হিলি' বলিয়া পরিচিত হয়। তিনি বলেন,—কেবল হিলি, কাউলাম ও কালিকট বন্দরেই চীন-দেশের বাণিজ্য-পোত সমূহ গতিবিধি করিত। মার্কোপোলো আর আর যে সকল বন্দরের নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যে তাঁহার কথিত 'মুৎফিলি' অধুনা 'তেলিঙ্গন' বলিয়া, কাম্বেট 'কাম্বে' বলিয়া, কোমারি 'কমোরিন' বলিয়া এবং সেমেনাট 'সোমনাথ' বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে। 'কাম্বে' বন্দরে প্রচুর পরিমাণ নীল উৎপন্ন হইত এবং অতি সূক্ষ্ম মোমজামা মিলিত। এখান হইতে কাপাস-বস্ত্রের রপ্তানী ছিল। চামড়ার ব্যবসায়ে এই স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধি-লাভ করে। এখানে অতি উত্তমরূপে চামড়া পরিষ্কার করিবার ব্যবস্থা ছিল। করোমণ্ডল উপকূল মুক্তা উত্তোলনের কেন্দ্র-স্থান ছিল, এবং গুজরাটের উপকূলভাগ জল-দস্যুর উপদ্রবে দুরধি-

---

* মার্কোপোলোর ভ্রমণ-বৃত্তান্তের অনুবাদক ইউল সাহেবের এবং প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত এম্ পাথিয়ার প্রভৃতির অনুসরণে 'ডন' পত্রের প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার এম্-এ মহাশয় এই কথাই লিখিয়া গিয়াছেন। প্রসিদ্ধ ফরাসী ঐতিহাসিক মিশনারী ডি. মৈল্লা, কিউলান (কুইলোন) রাজ্যের প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—১২৮২ খৃষ্টাব্দে ঐ রাজ্য হইতে বাণিজ্যের সুবিধার জন্য চীনদেশে চোয়ান-চু (জেটন) বন্দরে দূত প্রেরিত হইয়াছিল। সেই দূত নানাবিধ উপহারের মধ্যে চীন-সম্রাটকে একটী পুচ্ছবিহীন কৃষ্ণবর্ণ সুবৃহৎ বানর উপহার দিয়াছিলেন। সেই উপহার প্রাপ্ত হইয়া চীন-সম্রাট আপনার জনৈক প্রতিনিধিকে (সেই প্রতিনিধি 'যাং-টিং-পি' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন) তিন বার সেই বন্দরে ভারতীয় দূতের সান্নিধ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন।—De Mailla প্রণীত *Historie Generale de la China*, M. Pauthier প্রণীত ***Relations Politiques*** এবং Sir Henry Yule অনূদিত *The Book of Sir Marco Polo* প্রভৃতি গ্রন্থ আলোড়ন করিয়া হারাণ বাবু এই সকল তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিয়াছেন।

গম্য ছিল,—মার্কোপোলোর বর্ণনায় এতদ্বিবরণ অবগত হওয়া যায়। জল-দস্যুগণ প্রতি বৎসর শতাধিক পোত সহ সমুদ্র-পথে গতিবিধি করিত। আপনাদের পোত মধ্যে আপন আপন পুত্র-পরিবারকেও তাহারা সঙ্গে লইত। সারা গ্রীষ্মকাল তাহারা সমুদ্র-পথে শিকার অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইত এবং পথে কোনও বাণিজ্য-পোত দেখিলে তাহা লুণ্ঠন করিত। সময়ে সময়ে পঁচিশ-ত্রিশ খানা দস্যু-পোতে তাহারা দুর্গশ্রেণী গঠন করিয়া রাখিত। পাঁচ-ছয় মাইল পর্য্যন্ত সমুদ্র-পথ তাহাদের দুর্গ-মধ্যে পরিণত হইত। হঠাৎ কোনও পোত যদি তাহাদের কবলে পড়িত, তাহার আর নিস্তার ছিল না। 'সকোট্রা' দ্বীপে এইরূপ অসংখ্য জল-দস্যুর আড্ডা ছিল। সেখানে তাহারা নিঃসঙ্কোচে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিত। মার্কোপোলো ভারতবর্ষে সুবৃহৎ অর্ণবপোতসমূহ দেখিয়াছিলেন। এক-একখানি পোত-পরিচালনায় তিন শতাধিক নাবিকের আবশ্যক হইত। এক-একখানি পোতে পাঁচ-ছয় সহস্র বস্তা মরিচ বহন করিতে পারিত। ঐ সকল পোত বাণিজ্যের জন্য দেশে-বিদেশে গতিবিধি করিত। মালবার-উপকূলে মুক্তা উত্তোলন সম্বন্ধে বণিকগণের যে বন্দোবস্ত ছিল, তাহাতে সমবায়-বাণিজ্য-প্রথার (জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীর) আভাস পাওয়া যায়। কতকগুলি বণিক একত্র মিলিত হইয়া নানা-শ্রেণীর বিভিন্ন-আকৃতির পোতের ও ডুবুরীদিগের সাহায্যে শুক্তি উত্তোলন করিত। তৎকালে যে সকল ডুবুরী সমুদ্র-গর্ভ হইতে শুক্তি উত্তোলন করিত, তাহাদের কৃতিত্বের বিষয় স্মরণ করিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। ডুবুরীদিগের গায়ের সঙ্গে জালের থলে ঝুলান থাকিত। সমুদ্র-গর্ভে ডুব দিয়া যতক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ রাখিতে সমর্থ হইত, ততক্ষণ শুক্তি তুলিয়া তাহারা জলের উপর ভাসিয়া উঠিত। পুনঃপুনঃ ডুব দিয়া শুক্তি তুলিয়া ডুবুরীরা কৃতিত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইত। এইরূপভাবে শুক্তি উত্তোলন করাইয়া বণিকগণ মুক্তার ব্যবসায়ে বিশেষ লাভবান হইতেন।

পরবর্ত্তী বৈদেশিক ভ্রমণকারিগণ।

মার্কোপোলোর পরবর্ত্তী বৈদেশিক ভ্রমণকারী বা গ্রন্থকারগণের মধ্যে আবুল-ফেদা, ফ্রায়ার ওডোরিক, ইবন-বাতুতা, ওয়াসেফ, মাহুয়ান, আবদার রাজ্জাক, নিকোলো-কন্টি, ষ্টেফানো, বার্থেমা প্রভৃতির প্রদত্ত ভারতের বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিবরণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবুল-ফেদা—ডামাস্কাসের অধিবাসী। তিনি খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১২৭৪ খৃঃ—১৩৩১ খৃঃ) ভারতবর্ষ-পরিভ্রমণে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি মালবার-বন্দরে মরিচ-ব্যবসায়ের বিষয় এবং করোমণ্ডল-উপকূলে সূক্ষ্ম কার্পাস-বস্ত্র ব্যবসায়ের বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে (১৩২১ খৃঃ) ফ্রায়ার ওডোরিক ভারত-মহাসমুদ্র পার হইয়া ভারতবর্ষে উপনীত হন। যে অর্ণবপোতে তিনি আরোহণ করিয়াছিলেন, রাজপুত নাবিক-গণ কর্ত্তৃক সেই অর্ণবপোত পরিচালিত হইয়াছিল। সেই অর্ণবপোত সাত শত আরোহী বহন করিয়া আনিয়াছিল। এই বিবরণ পাঠ করিয়া ডক্টর ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ বলেন,—'ফ্রায়ার ওডোরিকের এই ভ্রমণ-বৃত্তান্তের বর্ণনায় প্রতিপন্ন হয়, গুজরাটের নাবিকগণ এইরূপ সুবৃহৎ অর্ণবপোত-সমূহ আগাথারসাইডিসের সময় হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারত-মহাসাগরে পরিচালন করিতে অভ্যস্থ ছিল। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আরব-

দেশের প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী ইবন-বাতুতা দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হন। তিনি চব্বিশ বৎসর কাল (১৩২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) বিদেশ-ভ্রমণে ব্রতী ছিলেন। মহম্মদ তোগলকের দূতরূপে ইবন-বাতুতা চীনদেশে গমন করেন। কাম্বে হইতে তিনি জাহাজে আরোহণ করিয়াছিলেন। কালিকট, সিলোন, বঙ্গদেশ প্রভৃতি স্থান-সমূহে অশেষ বিপদ অতিক্রম করিয়া তিনি চীনদেশাভিমুখে অগ্রসর হন। চীনদেশ হইতে প্রত্যাগমনকালে প্রথমে মালবার-উপকূলে আসিয়া তিনি কিছুদিন অপেক্ষা করিয়াছিলেন। অবশেষে মালবার উপকূল হইতে তিনি মস্কটে ও অর্ম্মজে গমন করেন। ভারতের বন্দর-সমূহ সম্বন্ধে মার্কোপোলো যে সকল বিষয় লিখিয়া যান, ইবন-বাতুতার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে প্রায়ই সেই সকল বিষয়ের পোষকতা দৃষ্ট হয়। তবে জল-দস্যুর উপদ্রব সম্বন্ধে ইবন-বাতুতা প্রকারান্তরে মার্কোপোলোর উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন বলিয়াই বুঝা যায়। ইবন-বাতুতা বলেন,—'যে সকল বাণিজ্য-পোত বাণিজ্য-শুল্ক প্রদান না করিয়া প্রবঞ্চনা করিবার চেষ্টা পাইত, জলদস্যুগণ সেই সকল পোত লুণ্ঠন করিত।' ফলে, বৈদেশিকগণের নিকট দস্যুনামে অভিহিত হইলেও লুণ্ঠনকারিগণ রাজবিধি-লঙ্ঘনকারিগণের দণ্ডদানে রাজবিধি-রক্ষারই সহায়তা করিত। ঐতিহাসিক ওয়াসেক চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। 'মাবার' বাণিজ্য-বন্দর প্রসঙ্গে তাঁহার উক্তি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি (এই পরিচ্ছেদের ১০৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ওয়াসেফ বলেন,—'মাবার (মালবর ?) বন্দরে আরব ও পারস্য হইতে বহু অশ্ব বিক্রয়ার্থ আসিত। আবু-বাকরের রাজত্বকালে এক এক বৎসর দশ সহস্রাধিক অশ্ব ঐ বন্দরে আমদানী হইয়াছিল।' মার্কোপোলো (১৩০৮ খৃষ্টাব্দে) এই অশ্ব-ব্যবসায়ের বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি বলেন,—'ভারতের রাজস্বের অধিকাংশ, অশ্ব-ক্রয়ের জন্য বিদেশে চলিয়া যাইত। মার্কোপোলোর পর বৈদেশিকগণের গ্রন্থে ভারতবর্ষের বাণিজ্য-সম্বন্ধে যে উল্লেখ দৃষ্ট হয়, মা-হুয়ানের বৃত্তান্ত তাহার মধ্যে বিশেষ প্রয়োজনীয়। মা-হুয়ান—মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী চীনা। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে চীন-দেশ হইতে চেংহো যখন ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশ-পরিভ্রমণে আগমন করেন, মাহুয়ান তখন দোভাষীরূপে তাঁহার সঙ্গে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ১৪০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কালিকট বন্দরের বাণিজ্য-সম্পদের বিষয় বর্ণন করেন। ঐ বন্দর তৎকালে বাণিজ্যের কেন্দ্র-স্থান মধ্যে পরিগণিত ছিল এবং বিভিন্ন দেশের বণিকগণ ঐ বন্দরে বাণিজ্য করিতে আসিতেন। চীনদেশ হইতে যখন কোনও বাণিজ্য-পোত ঐ বন্দরে উপনীত হইত, তখন রাজকীয় বাণিজ্য-পরিদর্শকগণ জনৈক 'চিট্টি' বা মহাজনের সহিত বাণিজ্য-পোতে আগমন করিতেন। তখন পণ্য-দ্রব্যাদির তালিকা প্রস্তুত হইত এবং তৎসমুদায়ের দর-নির্দ্ধারণের জন্য একটী দিন নির্দ্দিষ্ট হইত। বাণিজ্যের বিষয় উল্লেখ ব্যপদেশে, চীনদেশের বাণিজ্যের সুবিধার জন্য ভারতবর্ষ হইতে যে দূত প্রেরিত হইত, মাহুয়ান তদ্বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে (১৪৪২ খৃষ্টাব্দে) আবদার রাজ্জক কালিকট-বন্দরের সমৃদ্ধির বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি বলেন,—'কালিকট হইতে সর্ব্বদাই বাণিজ্য-পোত-সমূহ মক্কা-নগরে গমন করিত; সেই সকল বাণিজ্য-পোতে প্রধানতঃ মরিচ

বোঝাই থাকিত। কালিকটের অধিবাসিগণ পোত-পরিচালনে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিত। সুতরাং এই বন্দরের বাণিজ্য-পোত-সমূহ-আক্রমণে জলদস্যুগণ কখনই সাহস করিত না। এই বন্দরে সর্ব্ববিধ পণ্য-দ্রব্যেরই আমদানী-রপ্তানী ছিল। এই বন্দরে সুবিচার ছিল; বণিকগণের পণ্যাদির সুরক্ষার ব্যবস্থা ছিল; সুতরাং বণিকগণ নানাদেশ হইতে বহুবিধ পণ্য-দ্রব্য লইয়া এই বন্দরে আগমন করিত। তাহারা নিঃসঙ্কোচে আপন আপন পণ্য তীরে নামাইয়া বন্দরের বাজারে বিক্রয় করিতে পাঠাইত। সেই সময়ে সেই সকল পণ্যের উপর তাহাদের কোনরূপ দৃষ্টি রাখিবার আবশ্যক ছিল না; অপিচ, সেই সকল পণ্যের হিসাব-পরীক্ষার জন্যও তাহাদিগকে উদ্বিগ্ন থাকিতে হইত না। শুল্কালয়-সংক্রান্ত রাজকর্ম্মচারীরাই বণিকগণের পণ্য-দ্রব্যাদি রক্ষার ভার গ্রহণ করিতেন এবং দিবারাত্রি তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। বিক্রীত-দ্রব্যের মূল্যের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ শুল্ক-স্বরূপ গৃহীত হইত। কোনও দ্রব্য বিক্রীত না হইলে, তজ্জন্য বণিককে কোনও শুল্ক দিতে হইত না। কচিৎ কোনও বাণিজ্য-পোত দৈব-বিপাকে পথভ্রষ্ট হইলে অন্যান্য স্থানের অধিবাসিগণ একটা ছলা করিয়া সে পোত লুণ্ঠন করিত; কিন্তু কালিকট বন্দরে সে আশঙ্কা ছিল না। যদি কোনও পোত পথভ্রষ্ট হইয়া এই বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইত, বন্দরের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহাকে আশ্রয় প্রদান করিতেন; বাণিজ্য-পোতকে কোনই উদ্বেগ সহ্য করিতে হইত না।' পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নিকো-লো-কণ্টি নামক জনৈক পরিব্রাজক ভারতবর্ষ-ভ্রমণে আগমন করেন। ভারতের বাণিজ্য ও নৌ-যানাদি সম্বন্ধে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—'ভারতের অধিবাসিগণ আমাদের অপেক্ষা বৃহত্তর যানাদি নির্ম্মাণ করিতে পারদর্শী। তাহারা এত বড় বড় অর্ণবপোত প্রস্তুত করিতে পারিত যে, সেই অর্ণবপোতে এগার বার মণ (ওজনের) মদা পূর্ণ দুই সহস্রাধিক পিপা সংবাহিত হইতে পারিত। সেই অর্ণবপোত-সমূহের এক-একটীর পাঁচটী করিয়া মাস্তল ছিল এবং পাঁচখানি পাইলের সাহায্যে তাহা পরিচালিত হইত। তিন প্রস্ত তক্তার দ্বারা তাহারা সেই পোতের তলদেশ প্রস্তুত করিত। বিষম বাত্যায় তরণী বিপর্য্যস্ত হইবার উপক্রম হইলে, নির্ম্মাণ-কৌশলের দৃঢ়তায় উহা রক্ষা পাইত। অপিচ, কতকগুলি পোত এমনই সুকৌশলে নির্ম্মিত হইত যে, তাহার একাংশ ভগ্ন হইলেও অপরাংশ অব্যাহত থাকিত এবং তৎসাহায্যে যাত্রিগণ রক্ষা পাইত।' দক্ষিণ-দেশের বণিকগণ সম্বন্ধে তিনি যে বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে ভারতের বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন,—'বণিকগণ বিশেষ ধনৈশ্বর্য্যসম্পন্ন। তাহাদের অনেকেরই আপন আপন অর্ণবপোত আছে। শতকরা চল্লিশখানি পোত তাহাদের নিজস্ব। সেই এক-একখানি পোতের মূল্য—দেড় সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রার কম নহে।' পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইটালীর অন্তর্গত 'জেনোয়া' নগরের অধিবাসী বণিক ষ্টেফানো ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার উদ্দেশ্যে ভারবর্ষে আগমন করেন। তাঁহার নাম—'হায়রোনিমো ডি সাণ্টো ষ্টেফানো।' তিনি 'কোসির' (বর্ত্তমান 'কায়রো' বন্দর এক সময়ে ঐ নামে পরিচিত ছিল) বন্দর হইতে যাত্রা করিয়া ভারতবর্ষে আসেন। যে অর্ণবপোতে তিনি আরোহণ করিয়াছিলেন, সেই

অর্ণবপোতের কাষ্ঠফলকগুলি রজ্জু দ্বারা সংবদ্ধ ছিল এবং কার্পাস-বিনির্ম্মিত পাইল-ভরে তাহা পরিচালিত হইত। ভারতবর্ষে আসিয়া ষ্টেফানো একবার সমুদ্র মধ্যে বড়ই বিপদে পড়িয়াছিলেন। সুমাত্রা দ্বীপ হইতে তিনি সেবার কাম্বে-বন্দরে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিলেন। পথে মালদ্বীপ-পুঞ্জের নিকট ভীষণ ঝঞ্ঝাবাতে তাঁহার পোতখানি ভগ্ন হয়। তখন ভগ্ন-পোতের একখানি তক্তায় আরোহণ করিয়া তিনি সমুদ্র-মধ্যে ভাসিতে থাকেন। যে অর্ণবপোতে তিনি সুমাত্রা-দ্বীপ হইতে যাত্রা করেন, সেই পোতের সঙ্গে আরও তিনখানি পণ্য-বাহী পোত কাম্বে-বন্দরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল। সুবাতাসের সাহায্য পাইয়া সেই পোতত্রয় পাঁচ মাইল অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। তাহারা যখন পূর্ব্বোক্ত পোত-মগ্নের সংবাদ পায়, তখন পোতের আরোহীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ও মগ্নপোতের পণ্যাদির উদ্ধার-কল্পে নৌকা প্রেরণ করে। তাহারই একখানিতে আশ্রয় পাইয়া 'ষ্টেফানো' কাম্বে-সহরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। আবদার রাজ্জকের, নিকোলো-কণ্টির এবং ষ্টেফানোর পরিবর্ণিত সেই সকল বিবরণ 'হাক্লুত' সোসাইটীর প্রকাশিত 'পঞ্চদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষ'-সংক্রান্ত গ্রন্থে প্রকাশিত আছে। * ষ্টেফানোর পর ইটালীদেশ হইতে আর একজন ভ্রমণকারী ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম—লোডোভিকো ডি বার্থেমা। তিনি ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে (১৫০৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫০৮ খৃষ্টাব্দ) ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে কিরূপ সুবৃহৎ ও সুদৃঢ় অর্ণবপোত প্রস্তুত হইত, তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে সে পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তৎকাল-প্রচলিত নানাবিধ অর্ণবপোতের নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কত দিনে কোন্ বন্দর হইতে কোন্ বন্দরে পৌঁছান যাইত, তাঁহার বর্ণনায় সে আভাস পাওয়া যায়। সে হিসাবে কালিকট হইতে আট দিনে পারস্যে এবং কুমারিকা অন্তরীপে পৌঁছান যাইত। তিনি মিশর, সিরিয়া, আরব, পারস্য, ভারতবর্ষ ও ইথিওপিয়া প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করিয়া গিয়া ১৫১০ খৃষ্টাব্দে ইটালীয় ভাষায় আপন ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন। † ভারতের বাণিজ্য-সম্পদ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন, বঙ্গদেশ-প্রসঙ্গে তাহার আলোচনা হইবে। ভারতবর্ষে মোগল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে যে সকল বৈদেশিক লেখক ভারতবর্ষের বাণিজ্যের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদেরই মধ্যে কয়েক জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির বর্ণিত বিবরণের আভাসমাত্র প্রদত্ত হইল। ইহার পর মোগল-সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হইতে ইংরেজ-রাজ্যের প্রতিষ্ঠার

* *India in the 15th Century* (Hakluyt Society's publication.) ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ১৫ই ডিসেম্বর 'হাক্লুত সোসাইটী' (Hakluyt Society) সংগঠিত হয়। ব্রিটনের অধিবাসিগণের বিদেশ-ভ্রমণের ও বৈদেশিক-আবিষ্কারের বিবরণ সংগ্রহ জন্য রিচার্ড হাকলুত অশেষ পরিশ্রম করেন। তদনুসারে তাঁহারই নামে ঐ সমিতি সংগঠিত হইয়াছিল।

† জন উইন্টার জোনস্ ইংরাজী ভাষায় 'বার্থেমার' ভ্রমণ-বৃত্তান্তের অনুবাদ করেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে জর্জ্জ পার্সি বেজার অভিনব টীকা-টিপ্পনী সহ ঐ গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছিলেন। গ্রন্থখানি 'হাকলুত সোসাইটীর' প্রকাশিত গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। গ্রন্থের ইংরাজী নাম—*The Travels of Lodovico de Verthema*, in Egypt, Syria, Arabia, Persia, India and Ethiopia, translated by John Winter Jones and edited by G. P. Badger.

কালে ভারতের বাণিজ্যের গতি কোন্ পথে প্রধাবিত হয় এবং কিরূপভাবে কোন্ বাণিজ্য-কেন্দ্রের অভ্যুদয় হয়, যথাস্থানে তাহার আলোচনা করা যাইবে।

উপসংহারে বিবিধ বক্তব্য।

ভারতের বাণিজ্যের কথা কহিতে গেলে, আরও কত কথাই কহিবার প্রয়োজন হয়। এতৎপ্রসঙ্গে এ পর্য্যন্ত যে সকল কথা বলা হইল, তাহাতে প্রদেশ-বিশেষের আংশিক কথারই আলোচনা হইয়াছে। বিশদভাবে কহিতে গেলে, ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিতে হয়। দাক্ষিণাত্যের এবং পশ্চিম-ভারতের কথা যতটুকু যে ভাবে বলা হইয়াছে, সে ভাবেও যদি অন্য প্রদেশের কথা কহিতে হয়, কত অনুসন্ধানের ও কত সময়ের আবশ্যক এবং তাহাতে গ্রন্থকলেবরই বা কি পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। এ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের বাণিজ্যের কথা আমরা উল্লেখই করি নাই। অনেকে হয় তো মনে করিতে পারেন,—'বঙ্গদেশ সেদিন মাত্র সমুদ্র-গর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে; বঙ্গদেশের আর গৌরবের কথা কি আছে; আর তাই বুঝি আমরা বঙ্গদেশ সম্বন্ধে নীরব রহিয়া গিয়াছি।' কিন্তু বাস্তবিক কি তাই? সত্যসত্যই কি বঙ্গদেশ সেদিন মাত্র সাগর-গর্ভ হইতে উত্থিত হইল? আর সত্যসত্যই কি বঙ্গ-দেশের গৌরবের কথা কিছুই নাই? বঙ্গের বাণিজ্য-সম্পদের এবং অন্যান্য গৌরবের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয়, এই খণ্ডে পরিচ্ছেদান্তরে প্রকটন করিবার প্রয়াস পাইলাম। তাহাতেই বঙ্গদেশ সম্বন্ধে ভ্রম-ধারণা দূরীভূত হইবে। বঙ্গদেশ ভিন্ন, মধ্য-ভারত, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, লঙ্কা-দ্বীপ প্রভৃতি প্রসঙ্গেও কত কথাই বলা যাইতে পারে। কলিঙ্গ-রাজ্যের অভ্যুদয়ের দিনে এবং চোল-রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সময়ে তত্তৎ-রাজ্যের বিভিন্ন বন্দর হইতে যে বাণিজ্য-প্রভাব দিকে দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল, তদ্বিষয় আলোচনা করিলেও কত তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়! ভারতের বাণিজ্য-সৌকর্য্যের জন্য ভারতের বিভিন্ন জনপদ হইতে প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে বিভিন্ন সময়ে রাজ-প্রতিনিধিগণ গতিবিধি করিতেন। ধর্ম্মপ্রচার-ব্যপদেশে ভারতীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ বিভিন্ন প্রদেশে গমন করিয়া প্রকারান্তরে ভারতের বাণিজ্যের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। যেমন বহির্ব্বাণিজ্যে, তেমনই অন্তর্ব্বাণিজ্যে ভারতের কৃতিত্ব প্রকট পরিদৃশ্যমান। কোন্ দেশে কোন্ দ্বীপে কোথায় কি ভাবে ভারতের উপনিবেশ-সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং কেমন ভাবে ভারতীয় নৃপতির রাজ্যের বা নামের অনুসরণে উপনিবেশাদির নামকরণ হইয়াছিল, সে সকল তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলেও এতদ্বিষয় হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

বাণিজ্য-প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় তত্ত্ব।

প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ প্রায় সকলেই সিংহল-দ্বীপকে বৈদেশিক বাণিজ্যের একটী কেন্দ্রস্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সিংহল-দ্বীপ নানা সময়ে নানা নামে পরিচিত ছিল। রামায়ণে ও পুরাণ-পরম্পরায় 'লঙ্কা' নাম দেখিতে পাই। লঙ্কাকে অনেকে 'সিংহল' বা 'সিলোন' নামে অভিহিত করেন। বৌদ্ধ-জাতক গ্রন্থে এবং পরবর্ত্তী সাহিত্যে সিংহল নাম উজ্জ্বল হইয়া আছে। মধ্যযুগে এই দ্বীপ 'তাপ্রোবেণ' নামে পরিচিত হয়। 'ওনিসিক্রাইটস'

সিংহল বা লঙ্কা-দ্বীপ।

উহাকে ঐ নামে প্রথমে অভিহিত করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। 'তাপ' এবং 'রাবণ' এই দুই শব্দের সংযোগে 'তাপ্রোবেণ' নামের উৎপত্তি। 'তাপ' শব্দে দ্বীপ বুঝায়। 'রাবণের' পরিচয় হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন। রাবণের 'তাপ' বা দ্বীপ—এই অর্থে 'তাপ্রোবেণ' নামের সৃষ্টি,—ইহাই পণ্ডিতগণের অনুমান।* টলেমি বলেন,—এই দ্বীপ পূর্ব্বে 'পালোসিমুণ্ডি' (Paloesimundi) নামে পরিচিত ছিল; কিন্তু তাঁহার সময়ে ঐ দ্বীপ 'সালিস' (Salice) নামে পরিচিত হয়। দ্বীপের অধিবাসিগণ ঐ দ্বীপকে 'সালোই' (Saloe) নামে অভিহিত করিত। তাহা হইতে ক্রমশঃ 'সেলান' বা 'সিলোন' (Selan or Ceylon) সূচিত হয়। হিন্দুগণ ঐ দ্বীপকে 'সিংহল' দ্বীপ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ঐ দ্বীপের প্রাচীন নাম যে 'পালোসিমুণ্ডি' ছিল, 'প্লিনি' তাহার পোষকতা করিয়া গিয়াছেন; তবে তাঁহার সময়ে উহা 'তাপ্রোবেণ' নাম পরিগ্রহ করিয়াছিল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কারের পূর্ব্বে 'তাপ্রেবেণ' পৃথিবীর বিপরীত অংশে অবস্থিত নূতন মহাদেশ-রূপে প্লিনির গ্রন্থে পরিবর্ণিত হয়। সেই দূর অতীতকালে উহা বাণিজ্যের ও সভ্যতার কেন্দ্র-স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত। 'কসমাস' সিংহলকে 'সেলান'-দ্বীপ বা 'সেরেন'-দ্বীপ নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়ে সিংহলে বাণিজ্য-সম্পদের বিষয় পূর্ব্বে (এই খণ্ডের ১০৬ পৃষ্ঠায়) উল্লেখ করিয়াছি। অধ্যাপক হীরেণ বলেন,—'আলেকজাণ্ডারের ভারত আগমনকালে এবং টলেমিগণের সমসময়ে লঙ্কা-দ্বীপ বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল; আলেকজাণ্ডারের সময়েই 'তাপ্রোবেণ' একটী দ্বীপ বলিয়া পরিচিত হয়। প্লিনি, আলেক-জাণ্ডারের সমসাময়িক প্রাচীন ঐতিহাসিকগণের মত উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ফলতঃ, ৫০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ৫০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লঙ্কা-দ্বীপ হিন্দুবণিক-গণের প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-স্থান ছিল। ঐ স্থান হইতে সুদূর আফ্রিকার 'আডিউল' বন্দরে, ইয়ামেনে, মালবারে, পূর্ব্ব-উপদ্বীপে এবং চীনদেশে বাণিজ্য চলিত। লঙ্কাদ্বীপের সহিত অষ্ট্রেলিয়ার বাণিজ্য-সম্বন্ধ এই সময় বিদ্যমান ছিল।' † এরিয়ানের গ্রন্থে লঙ্কাদ্বীপের যে বিবরণ দৃষ্ট হয়, তাহাতে বুঝা যায়, লঙ্কা-দ্বীপের উত্তরাংশ সুসভ্য ছিল। ঐ দ্বীপ হইতে পশ্চিমে ইটালি পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বে চীন পর্য্যন্ত বাণিজ্য চলিত। টলেমির বর্ণনায় লঙ্কা-দ্বীপের কয়েকটী প্রধান বন্দরের পরিচয় পাওয়া যায়; যথা,—তালাকোরি, মোদুত্তি, আমুরোগ্রামম্, মেয়োগ্রামম্ ইত্যাদি। লঙ্কা-দ্বীপের প্রাচীন গৌরব-বিভবের বিষয় চিন্তা করিতে গেলে, কত কথাই মনে হয়! মনে হয়,—এই কি সেই স্বর্ণ-লঙ্কা? কি বিভবৈশ্বর্য্যের মহিমায় ইহার নাম স্বর্ণ-পুরী হইয়াছিল? প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের কেহ কেহ অনুমান করেন,—বর্ত্তমান সিলোন বা লঙ্কা-দ্বীপ রাবণের সে স্বর্ণ-পুরী লঙ্কা নহে। সে লঙ্কা সমুদ্রের অতলতলে নিমজ্জিত হইয়াছে; তাহার ধ্বংসাবশেষ মাত্র এখন লঙ্কা-দ্বীপ নামে পরিকীর্ত্তিত হইতেছে। তদনুসারে কেহ কেহ অষ্ট্রেলিয়া মহাদ্বীপকে রাবণের লঙ্কা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। সে হিসাবে সিংহল এবং লঙ্কা দুইটী স্বতন্ত্র

---

* *Asiatic Researches*, Vol. V.

† *Vide* Professor Heeren's *Historical Researches*, Vol. II.

জনপদ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ভূ-তত্ত্ববিদ্‌গণের গবেষণার বিষয় অনুধাবন করিলেও রাবণের লঙ্কার অন্ততঃ কতকাংশ সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইয়াছে বলিয়া প্রতীতি জন্মে। সে হিসাবে বুঝিতে পারা যায়, এসিয়া-মহাদেশের দক্ষিণাংশ হইতে আফ্রিকার পূর্ব্ব-প্রান্ত পর্য্যন্ত পুরাকালে এক বিস্তৃত ভূ-খণ্ড ছিল। সেই ভূখণ্ডকে একটী স্বতন্ত্র মহাদেশ বলিলেও বলা যাইতে পারে। প্রাকৃতিক বিবর্ত্তনে সেই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড ছিন্ন-বিছিন্ন ও তাহার অধিকাংশ জলমগ্ন হয়। অধুনা ভারত-মহাসাগরের ও দক্ষিণ-মহাসাগরের মধ্যে ইতস্ততঃ বিছিন্ন যে দ্বীপপুঞ্জ দৃষ্ট হয়, তৎসমুদায় সেই প্রাকৃতিক বিপ্লবের ভগ্নাবশেষ। অধ্যাপক হেকেল এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অনুধাবন করিবার বিষয়। অধ্যাপক হেকেল বলেন,—'ভারত-মহাসাগরে একটী মহাদেশের অবস্থিতি প্রতিপন্ন হয়। সুন্দা-দ্বীপপুঞ্জ (সুন্দরবন ?) হইতে এসিয়া মহাদেশের উপকূল-ভাগ বহিয়া আফ্রিকার পূর্ব্ব-উপকূল পর্য্যন্ত সেই মহাদেশ বিস্তৃত ছিল। সেই মহাদেশই সম্ভবতঃ মানবের আদি-জন্মভূমি। এক সময়ে সে মহাদেশের গৌরবের অবধি ছিল না।' * মনুষ্যের উৎপত্তি-তত্ত্ব-বিষয়ক আর এক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থেও এবম্বিধ মত পরিব্যক্ত। সেই গ্রন্থে প্রকাশ,—'যে স্থান মানবের আদি-জন্মভূমি বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, সে স্থান এখন ভারত-মহাসাগরের গর্ভে লীন হইয়াছে।' † অধুনা পাশ্চাত্য-শিক্ষিত বহু দ্রাবিড়ী পণ্ডিত এই মতের পোষকতায় তামিল-দেশের প্রাচীনত্ব ও পূর্ব্ব-গৌরব খ্যাপন করিতেছেন। ‡ তাঁহারা বলেন,—'প্রাচীন পাণ্ড্য-রাজ্য দক্ষিণে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেই ভূ-খণ্ড এক্ষণে

---

* Professor Hæckel says,—'The Indian Ocean formed a continent which extended from Sunda Islands along the coast of Asia to the east of Africa. This large continent is of great importance from being the probable cradle of the human race."

† "The locality of the origin of the earliest race from recent reasearches appears to have been on lands now submerged beneath the Indian Ocean."—*The Science of Man.*

‡ এ সম্বন্ধে তাঁহাদের একটী কৌতূহলপ্রদ উক্তি এখানে উল্লেখ করিতেছি। তামিল-দেশই যে ভারতীয় সভ্যতার আদিভূত, তাহারই প্রমাণ-প্রসঙ্গে তাঁহারা বলেন,—আর্য্যগণের ভারত-আগমনের পূর্ব্বে যে জাতি ভারতবর্ষে বাস করিতেন, তাঁহারা 'ভারত' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহাদের নামানুসারেই 'ভারতভূমি' নামকরণ হয়। প্রাচীন-ভারতে তাঁহাদের ন্যায় শক্তিশালী আর কেহই ছিল না। সে জাতির লোক-সংখ্যাও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। তাঁহারা অধুনা-লোপপ্রাপ্ত 'চাল্ডাইক-ইলামাইট' জাতির শাখা। সভ্যতার আদি-স্থান 'আকা-ডিয়ান চাল্ডিয়া' হইতে তাঁহারা পর্য্যায়ক্রমে ভারতবর্ষে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। 'চাল্ডিয়া' হইতে তাঁহাদের প্রথম আগমন—মনুর সময়ে, ভারতের জলপ্লাবন-কালে। তাঁহাদের একদল লোক মনুর সঙ্গে পারস্যোপসাগরের মধ্য দিয়া আরব-সাগর পার হইয়া ভারতের দক্ষিণ পশ্চিম-উপকূলে উপনীত হন। বর্ত্তমান কুমারিকা অন্তরীপের সন্নিকটে পশ্চিম-ঘাট গিরিমালার অন্তর্ভুক্ত মলয়-পর্ব্বত তাঁহাদের প্রথম-আশ্রয়ের স্থান হইয়াছিল। ক্রমশঃ তাঁহারা দক্ষিণ-মহাদেশে উপনিবিষ্ট হন। সেই মহাদেশ পাণ্ড্যদেশ নামে অভিহিত হইয়াছিল। সেই হইতে দক্ষিণ-দেশের নৃপতিগণ 'পাণ্ডীয়' নামে পরিচিত হন। মহাভারতোক্ত বীর পাণ্ডবগণেরও এই হইতেই নামকরণ হইয়াছিল। বর্ত্তমান লঙ্কাদ্বীপের দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ হইতে পারুলী নদী পর্য্যন্ত সাত শত যোজন সেই পাণ্ড্য-রাজগণের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তামিল বা দ্রাবিড় দেশ প্রসঙ্গে এই সকল বিষয়ের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত।' ভূ-তত্ত্ববিৎ ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এ সম্বন্ধে যাহা সিদ্ধান্ত করেন, প্রাচীন তামিল-গ্রন্থে সেই মত পরিব্যক্ত দেখিতে পাই। 'সিলাপ্পাদিকরম' তামিল-কাব্য খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিরচিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ কাব্যে লিখিত আছে,—'পুরাকালে পারুলী নদী এবং কুমারী অন্তরীপের মধ্যে বিস্তৃত এক ভূ-খণ্ড ছিল; সমুদ্র তাহা গ্রাস করিয়াছেন; সেই ভূ-খণ্ডে কুমারী-অন্তরীপের দক্ষিণে সাত শত যোজন পরিমিত উনপঞ্চাশৎ বিভাগবিশিষ্ট এক জনপদ ছিল।' 'ইরাইয়ানার'-বিরচিত 'আগা-প্পোরুল' গ্রন্থের ভূমিকায় তামিল-দেশের প্রসিদ্ধ কবি 'নাক্কিরারাও' এই কথাই লিখিয়া গিয়াছেন। 'তোলকাপ্পিযাম' গ্রন্থের ভূমিকায় এবং টীকায় 'ইলামপুরানার' এবং 'নাচ্চিনার কিনিয়াব' যথাক্রমে ঐ কিম্বদন্তীরই সমর্থন করিয়াছেন। ফলতঃ, প্রাচীন তামিল-কাব্যে দ্রাবিড়ী-পণ্ডিতগণের মন্তব্যে এবং ভূ-তত্ত্ববিদগণের গবেষণায় বেশ বুঝা যায়,—বর্ত্তমান লঙ্কা-দ্বীপের দক্ষিণে বহুদূর-বিস্তৃত এক সুসভ্য জনপদ পুরাকালে বিদ্যমান ছিল; প্রাকৃতিক বিপ্লবে সে জনপদ এক্ষণে সাগর-গর্ভে লীন হইয়াছে। যাঁহারা মধ্য-এসিয়ায় অথবা উত্তরমরুতে মানবের আদি-জন্মভূমি বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতেছেন, এই সকল সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই তাঁহাদের বিচার-বিতর্কের বিষয়ীভূত হইবে। যাহা হউক, প্রাচীন সিংহল, যে কালে যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, পুরাকালে বাণিজ্য-সম্পদে ও ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বে উহা যে গরীয়ান্ ছিল, নানারূপেই তাহা প্রতিপন্ন হয়।

ধর্ম্মপ্রচারকগণ ধর্ম্মপ্রচার-ব্যপদেশে বিভিন্ন দেশে গতিবিধি করায় ভারতের বাণিজ্যের পথ নানাদিকে প্রশস্ত হইয়া আসিয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি, এক সময়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভারতের সনাতন-ধর্ম্ম বিস্তৃত হইয়াছিল, আর আজিও তাহার ক্ষীণ পরিচয়-চিহ্ন ইউরোপে, আফ্রিকায়, এমন কি আমেরিকায় পর্য্যন্ত, লক্ষ্য করিতে পারা যায়। ("পৃথিবীর ইতিহাস" প্রথম খণ্ডের এক-ত্রিংশ পরিচ্ছেদে ৪৬৪ হইতে ৪৬৮ পৃষ্ঠায় এবং দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আর্য্যগণের আধিপত্য-প্রসঙ্গে, এ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। এখানে তত্তদ্বিষয়ের পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র।) ভারতের ধর্ম্মের প্রভাব কোথায় না বিস্তৃত ছিল? সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে সর্ব্বত্র ভারতের ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হয়। তবে, সেই সূত্রে কোন্ দেশে কিরূপভাবে বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সাধারণতঃ তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে ভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। দূর অতীতের গভীর অন্ধকারের মধ্যে সেইরূপ দুই একটী ক্ষীণ-রশ্মি অধুনা নয়নপথে পতিত হইয়া থাকে। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব-প্রতিপত্তির দিনে পৃথিবীর চারিদিকে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিমল জ্যোতিঃ বিস্তৃত হইয়াছিল। কিন্তু অধিকাংশ দেশেই এখন বৌদ্ধ-ধর্ম্মের জ্যোতিঃ নির্ব্বাপিত হইয়াছে। পৃথিবীর যে দুই-একটী জনপদ আজিও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া আছে, তাহাদের মধ্যে ক্বচিৎ কোথাও প্রাচীন-ভারতের বাণিজ্যের স্মৃতি জড়িত হইয়া রহিয়াছে! তন্মধ্যে, চীন জাপান প্রভৃতি প্রাচ্যদেশে সেই স্মৃতি একটু উজ্জ্বল দেখিতে পাই। খৃষ্ট-জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তিকালে চীনদেশে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-প্রচারক-

বাণিজ্য-সৌকর্য্যে ধর্ম্ম-প্রচারকগণ।

গণের গতিবিধি-সূত্রে কি ভাবে চীনে ভারতের বাণিজ্য বিস্তৃতি-লাভ করিয়াছিল, পাশ্চাত্য-জাতির ইতিহাস হইতে সে বিবরণ একটু একটু প্রদান করিয়াছি। ধর্ম্মপ্রচারকগণের চীনদেশে গতিবিধির জন্য, খৃষ্ট-জন্মের পরবর্ত্তিকালেও ভারতীয় বণিকগণ চীনদেশে বাণিজ্যের নানা সুবিধা পাইয়াছিলেন। সেই ধর্ম্ম-প্রচারকগণ কি ভাবে কখন চীনে গমন করেন, এ দেশে ভারতের কোনও ইতিহাসে তাহা অনুসন্ধান করিয়া পাইবার উপায় নাই। রাষ্ট্র-বিপ্লবে ও প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে সে চিহ্ন সকলই লোপ পাইয়াছে। সুতরাং এ বিষয়ে এখন আমাদিগকে চীনাদিগের ও তাঁহাদের অনুসরণকারী পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের অনুসন্ধানের উপরই নির্ভর করিতে হইবে। চীনাভাষায় লিখিত 'ত্রিপিটক' সংক্রান্ত 'কোয়াই-ইউ-এন ক্যাটালগ'-গ্রন্থে এইরূপ কতগুলি ধর্ম্মপ্রচারকের পরিচয় আছে। ফা-হিয়ানের ভারত-আগমনের দুই বৎসর পূর্ব্বে (৩৯৮ খৃষ্টাব্দে) ধর্ম্মপ্রচারোদ্দেশে 'বুদ্ধভদ্র' চীনদেশে গমন করেন। তিনি শাক্যবংশীয় যুবরাজ অমিতোদনের বংশসম্ভূত। কোচীন হইতে যাত্রা করিয়া তিনি চীনে পৌঁছিয়াছিলেন। তাঁহার পর ৪২০ খৃষ্টাব্দে 'সঙ্ঘ বর্ম্মণ' চীনদেশে গমন করেন। তিনি সিংহল-দেশের অধিবাসী ছিলেন এবং 'মহীশাসক বিনয়' অনুবাদ করিয়া প্রসিদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিলেন। তিনি স্থলপথে চীন-দেশে গমন করেন এবং ৪৪২ খৃষ্টাব্দে জলপথে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। ৪২৪ খৃষ্টাব্দে কাবুলের ভূতপূর্ব্ব নৃপতির পৌত্র 'গুণবর্ম্মণ' চীনদেশে সুঙ্-বংশীয় রাজগণের রাজধানীতে উপনীত হন। তিনি লঙ্কা-দ্বীপ হইতে যাত্রা করিয়া যবদ্বীপ পরিদর্শন করিয়া চীনে পৌঁছিয়াছিলেন। ৪২৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট 'উন' যখন চীন-রাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, সেই সময়ে তিন জন সিংহলদেশীয় বৌদ্ধ-প্রচারক চীনে গমন করেন। 'ভিক্ষুণী-নিদান'-গ্রন্থে প্রকাশ,—৪৩৩ খৃষ্টাব্দে নন্দী নামক একখানি অর্ণবপোতে সিংহল-দেশ হইতে একদল ভিক্ষুণী চীন-দেশে গমন করিয়া ভিক্ষুণী-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। বৌদ্ধ-ব্রহ্মচারিণীগণ সেই আশ্রমে আশ্রয় পাইতেন। ৪৩৪ খৃষ্টাব্দে অপর একখানি অর্ণবপোতে অপর কতকগুলি সিংহল-দেশীয় ভিক্ষুণী চীনদেশে প্রেরিত হন। সিংহলদেশে যে প্রণালীতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিধিবিধান প্রতিপালন করা হয়, সেই প্রথা চীনদেশে প্রচলন করিবার জন্যই এই ভিক্ষুণী-সম্প্রদায় প্রেরিত হইয়াছিল। ৪৩৫ খৃষ্টাব্দে লঙ্কা-দ্বীপ হইতে যাত্রা করিয়া 'গুণভদ্র' চীন সাম্রাজ্যের 'কাউ'-প্রদেশে উপনীত হন। ফা-হিয়ান লঙ্কা-দ্বীপ হইতে 'সংযুক্ত-আগম' গ্রন্থের যে পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, 'গুণভদ্র' তাহার অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইহার পর সঙ্ঘভদ্র আপনার শিক্ষকের সহিত চীনদেশে গমন করেন। তিনি ৪৮৮ খৃষ্টাব্দে 'বুদ্ধঘোষ' প্রণীত 'সামন্ত পাশদিক' গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া যশস্বী হন। ৫২৬ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ-ভারতের জনৈক রাজপুত্র 'বোধিধর্ম্ম' চীনদেশে গমন করেন। তিনি প্রবীণ প্রসিদ্ধ ধর্ম্মাধ্যক্ষ বলিয়া চীনদেশে বিশেষ সম্মান পাইয়াছিলেন। দক্ষিণ-চীনের সম্রাট আপন রাজধানী নান্‌কিন্ সহরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যান। চীনদেশের প্রসিদ্ধ ভৌগোলিক 'চিয়া-টান' তৎপ্রণীত 'হুয়াং-হুয়া-সি-তা-চি' অর্থাৎ 'প্রতীচ্যে রাজকীয় দৌত্যবাহিনী'-সংক্রান্ত গ্রন্থে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—

বুদ্ধভদ্র, ভিক্ষুণী-সঙ্ঘ প্রভৃতি।

বোধিধর্ম্ম জলপথে কাণ্টন-সহরে।

'আনাম হইতে স্থলপথে 'টিয়েন-চু' (ভারতবর্ষ) পৌঁছান যায়। তথাপি 'তা-মো' (বোধিধর্ম্ম) জলপথে সমুদ্র বাহিয়া 'পান-য়ু' (ক্যাণ্টন) সহরে আসিয়াছেন। তবে কি দূর স্থলপথ অতিক্রম করিয়া আসার অপেক্ষা জলপথে ত্বরিৎ আসা যায়?'* ভৌগোলিক 'চিয়া-টানের' † এই বিবরণ পাঠ করিলে উপলব্ধি হয়, তৎকালে স্থলপথেই চীনদেশে গতিবিধি প্রশস্ত ছিল। অথবা ভৌগোলিক সেই বিষয়ই সাধারণতঃ অবগত ছিলেন। যাহা হউক, চীনদেশে বোধিধর্ম্মের আগমনের পর হইতে চীনে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিশেষভাবে বিস্তৃত হয়। তখন দলে দলে বৌদ্ধপ্রচারকগণ চীনে গিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। সেই সময়ে চীনের এক 'লো-য়াং' প্রদেশে তিন-সহস্রাধিক বৌদ্ধ-ভিক্ষু এবং দশ-সহস্রাধিক গৃহস্থ গিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীনদেশে ভারতীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণের আধিপত্য-বিস্তারের বিষয় চীনদেশ-সংক্রান্ত প্রায় সকল গ্রন্থেই দৃষ্ট হয়। ‡ ধর্ম্ম-প্রচারকগণ চীনে বসবাস করায় ভারতের ধর্ম্ম, ভারতের শিল্প এবং ভারতের বাণিজ্য চীনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। চীনদেশের কোনও কোনও সহৃদয় নৃপতি বৌদ্ধপ্রচারকগণের জন্য সুন্দর সুন্দর আশ্রম-সমূহ প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন। 'ওয়ে'-রাজ্যের যুবরাজ বৌদ্ধ-প্রচারকগণের প্রতিপালনের জন্য বিশেষরূপ ব্যবস্থা করেন এবং তাঁহাদের বসবাসের জন্য মনোরম স্থানে মনোহর অট্টালিকা-সমূহ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। পরবর্ত্তিকালে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত

* 'চিয়া-টান' প্রণীত গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদে এই বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে,—"To reach Tien-Chu from Anam, there is an overland road by which one may go to this country; yet Ta-mo came floating on the sea to Pan-yu, and we may fairly ask whether the sea-journey be not more expeditious than that lengthy road overland." ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে বোধিধর্ম্মের এই যাত্রার বিবরণ ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের 'রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে' এবং মিষ্টার হাকম্যানের ও মিষ্টার এড্‌কিন্সের গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত আছে।

† চীনদেশীয় ভৌগোলিক 'চিয়া-টান' টাং-বংশের রাজত্বকালে (৭৩০ হইতে ৮০৫ খৃষ্টাব্দে) বিদ্যমান ছিলেন। বৈদেশিক জাতির সম্বন্ধে তিনি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তিনি কতকগুলি মানচিত্র প্রস্তুত করিয়া চীনদেশের সহিত জলপথে বৈদেশিকগণের বাণিজ্য-সম্বন্ধের আভাস প্রদান করেন।

‡ চীন দেশের সহিত ভারতের এবম্বিধ সম্বন্ধ-তত্ত্বের বিষয়ে ডক্টর ইটেল লিখিয়াছেন,—"Buddhism in a foreign region introduced by foreign priests, of whom there were at the beginning of the 6th century upwards of three thousand living in China."—*Buddhism: Its Historical, Theoretical and Popular Aspects* by Dr. E. J. Eitel. এ বিষয়ে ডক্টর এডকিন্সের উক্তি,—"At the beginning of the 6th century A. D. the number of Indians in China was upwards of three thousand. Many of them resided at Lo-yang, the modern Honan-Fu. The Prince of Wei kingdom exerted himself greatly to provide maintenance for them in monasteries erected on the most beautiful sites."—*Chinese Buddhism* by Rev. J. Edkins. মিষ্টার কাকাসু ওকাকুরা প্রণীত প্রাচ্যের আদর্শ সংক্রান্ত গ্রন্থে এবম্বিধ উক্তি দেখিতে পাই,—"Thus, there was at one time in Lo-yang itself, to impress their national religion and art on Chinese soil, more than three thousand Indian monks and ten thousand Indian families."—*The Ideals of the East* by Mr. Kakasu Okakura.

বহু ধর্ম্মপ্রচারকের গতিবিধির পরিচয় পাওয়া যায়। ৭২০ খৃষ্টাব্দে 'বজ্রবোধি' সমুদ্র-পথে চীনদেশের রাজধানীতে উপনীত হন। মলয়দেশ তাঁহার জন্মভূমি। তিনি বহু মূলমন্ত্র অনুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি চীনে গূঢ়-রহস্যময় একটী বৌদ্ধ-সম্প্রদায় গঠন করেন। এই সময়ে মঞ্জুশ্রী নামক আর একজন বৌদ্ধ-প্রচারক চীনদেশে গিয়াছিলেন। কিন্তু রাজকর্ম্ম-চারিগণের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য সংঘটিত হওয়ায়, তিনি রোষভরে চীন-সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করেন। একখানি বাণিজ্য-পোতে আরোহণ করিয়া চীনের দক্ষিণ-উপকূল হইতে তিনি ভারতাভিমুখে রওনা হইয়াছিলেন। এই সময়ে জাপানের সহিতও ভারতের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। বোধিধর্ম্ম ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে চীন হইতে জাপানে গমন করেন।

জাপানে বৌদ্ধ-সম্প্রদায়গণ।

যুবরাজ 'শোতোকু' তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া প্রীত হইয়াছিলেন। ৫৭৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬২১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যুবরাজ শোতোকুর বিদ্যমানতার বিষয় অবগত হওয়া যায়। 'সুবকাকর' নামক মধ্য-ভারতের অধিবাসী বৌদ্ধপ্রচারক, ৭১৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ৭৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, চীন-দেশে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-প্রচারকার্য্যে ব্রতী ছিলেন। তিনি মধ্যে একবার জাপানে গমন করেন। সেই সময়ে তত্রত্য একটী মন্দিরে একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ রাখিয়া আসেন। ইহার পর ৭৩৬ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্ম-প্রচারক 'বোধিসেন' জাপানে গমন করেন। তিনি মঞ্জুশ্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য চীনে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি জাপানে গমন করেন। তিনি জাপানে অনেক দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। জাপানের ধর্ম্মপ্রচারকগণকে তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দেন। রাজদরবার হইতে তাঁহার প্রতিপোষণের জন্য বিশেষরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। জনসাধারণ তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ও ভক্তিমান্ হয়। বলা বাহুল্য, এবম্প্রকার সম্বন্ধ-সূত্রে জাপানের সহিত ভারতের বাণিজ্যের পথ অনেকটা প্রশস্ত হইয়া আসে। এদিকে চীনে বৌদ্ধশ্রমণগণের উপনিবেশের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মধ্যভারতের অধিবাসী 'পুণ্য-উপচয়' ৬৫৫ খৃষ্টাব্দে সিংহল হইতে চীনদেশে গমন করেন। সেই সময়ে 'পালান্' হইতে জ্ঞানভদ্র নামক জনৈক বৌদ্ধপ্রচারক চীনে দ্বিতীয়বার গমন করিয়াছিলেন।

শ্রমণ-গণের উপনিবেশ।

'পালান'—দক্ষিণ মহাসমুদ্রের কোনও জনপদ বলিয়া উল্লিখিত হয়। কিন্তু কোন্ জনপদ, তদ্বিষয়ে মতান্তর আছে। ৭২৯ খৃষ্টাব্দে 'মি-টো' নামে পরিচিত জনৈক বৌদ্ধ-শ্রমণ উত্তর-ভারত হইতে চীনে গমন করেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের 'ত্রিরত্নে' সুপণ্ডিত ছিলেন। একদল বৌদ্ধ-ভিক্ষু-সহ চীনে উপনীত হইয়া তিনি চীনে আপন প্রাধান্য বিস্তার করেন। ধর্ম্মপ্রচারকগণের এইরূপ গতিবিধি দশম ও একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল। দশম শতাব্দীর শেষভাগে চীনদেশে বৌদ্ধপ্রচারক-গণের গতিবিধি বিশেষভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। 'সুঙ'-বংশের ইতিহাসে সমন্ত-নামক জনৈক বৌদ্ধশ্রমণের বিষয় লিখিত আছে। তিনি কতকগুলি সঙ্গিসহ চীন-রাজদরবারে উপনীত হন। তাঁহার সেই সঙ্গিগণের মধ্যে ষোলটী বিভিন্ন পরিবারের স্ত্রী-পুরুষ উপস্থিত ছিলেন। ৯৫৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা চীনে উপনীত হন। এই বৌদ্ধ-সম্প্রদায় চীন-সম্রাটের উপঢৌকন-স্বরূপ কতকগুলি প্রসিদ্ধ-জাতীয় ঘোটক লইয়া যান। 'মা-তুয়ান-লিন্' প্রণীত 'এন্‌সাইক্লো-

পিডিয়া' গ্রন্থে এবং 'পিয়ান-ই-টিয়ান' নামক অন্যতর চীনাভাষার 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া' গ্রন্থে এ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। মা-তুয়ান-লিনের গ্রন্থে, পশ্চিম-ভারতের ছয় জন শ্রমণ (সমন্ত এবং আর পাঁচ জন) এই সময় চীন দেশে গিয়াছেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থে ষোলটী পরিবারের ও সমন্তের গমনের কথাই লেখা আছে। এই ঘটনার পর ৯৬৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ৯৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আরও বহু শ্রমণ চীনদেশে উপনীত হন। তাঁহারা সম্রাট-সকাশে বহু-বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রদান করিয়া সম্রাটের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে 'য়াং-কিয়ে-কোয়াং-লো' (য়াং-কিয়ে-সৌ-লো) নামক জনৈক শ্রমণ সম্বন্ধে বিভিন্ন উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি পূর্ব্ব-ভারতের কোনও রাজার পুত্র বলিয়া পরিচিত। এ বিষয়ে বিশেষ মতান্তর নাই। তবে কেহ বলেন,—তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারক ছিলেন। কেহ বলেন,—তিনি রাজপুত্র,সম্রাটের সহিত সখ্য-স্থাপন জন্য চীনে গিয়াছিলেন। 'য়াং-কিয়ে-কোয়াং-লো' ধর্ম্মসংক্রান্ত কতকগুলি পাণ্ডুলিপি চীন-সম্রাটকে উপহার দেন। সেই পাণ্ডুলিপিগুলি 'ফান্-কিয়া'(সংস্কৃত বা পালি) ভাষায় লিখিত ছিল। ইহার পর যাঁহারা চীনে ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীভোজ-রাজ্যের জনৈক বৌদ্ধ-শ্রমণ বিশেষ প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। বৌদ্ধধর্ম্ম-সংক্রান্ত গ্রন্থ চীনাভাষায় অনুবাদ জন্য ৯৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সম্রাট কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া চীন-দেশে গিয়াছিলেন। ইহার পর (৯৮৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ৯৮৬ খৃষ্টাব্দে) 'লো-হু-না' (বৌদ্ধ-প্রচারক 'রাহুল' চীনাদিগের উচ্চারণে 'লো-হু-না' নাম পরিগ্রহ করেন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়) ধর্ম্মপ্রচার-ব্যপদেশে চীনদেশে গমন করিয়া প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছিলেন। ৯৯৬ খৃষ্টাব্দে একদল বৌদ্ধ-শ্রমণ চীনে উপনীত হন। তাঁহারা একখানি বাণিজ্য-পোতে ভারতবর্ষ হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। সম্রাটকে উপহার দিবার জন্য তাঁহারা কয়েক প্রকার ঘণ্টা, বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি ও তালপত্রে লিখিত কয়েকখানি পুঁথি লইয়া গিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম-সংক্রান্ত সেই পুঁথিগুলি এবং উপহৃত দ্রব্যাদি পাইয়া সম্রাট বিশেষ পরিতুষ্ট হন। ইহার পর, ১০২৪, ১০২৭, ১০৩৪ ও ১০৩৬ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারকগণের চীনদেশে গমনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময় প্রধানতঃ সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মসংক্রান্ত পুস্তকাদি লইয়া গিয়াছিলেন। ১০৩৪ খৃষ্টাব্দে নয় জন শ্রমণের চীনদেশে গমনের বিষয় মা-তুয়ান-লিন উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। চীনাদিগের উচ্চারণে তাঁহাদের একজনের নাম—'সেন-চিং' রূপ পরিগ্রহ করিয়া আছে। তিনি 'সুযশ' বলিয়া অধুনা এ দেশে পরিচিতি হইতেছেন। 'সুযশ'—শ্রমণের গুণবাচক পরিচয়। তাঁহার সঙ্গী অপর কয়জনের নামও ঐরূপ বিশেষণমূলক। একজন ধর্ম্মপর, একজন গৌরবময়, ইত্যাদি। সম্রাট-সকাশে গমন করিয়া তাঁহারা সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত কতকগুলি বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রন্থ উপহার দিয়াছিলেন। তাঁহাদের উপহৃত আর আর সামগ্রীর মধ্যে বুদ্ধদেবের অস্থি, বুদ্ধদেবের দন্ত ও বোধিসত্ত্বের প্রতিমূর্ত্তি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। সেই সকল উপহারের বিনিময়ে শ্রমণগণকে সম্রাট রেশমী বস্ত্রাদি উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তিকালে বৌদ্ধ-প্রচারকগণের গতিবিধির আর বিশেষ কোনও উল্লেখ দেখা যায় না। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ক্ষীণ হইয়া

আসে। এদিকে ইস্‌লাম-ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে এসিয়া-মহাদেশ নবীন আলোকে উদ্ভাসিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রচার-কার্য্য একরূপ বন্ধ হইয়া আসে। ইহার পর বৈদেশিক বাণিজ্যে ধর্ম্মপ্রচারকগণের প্রভাব লোপ পায়। তখন একমাত্র দূত-প্রেরণ দ্বারা বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধার ব্যবস্থা হইযাছিল।

দূতপ্রেরণে বাণিজ্যের সুবিধা।

উপনিবেশ-স্থাপনে, উপঢৌকন-প্রদানে, অবশেষে দূত-প্রেরণে, চীনের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্বন্ধ যে ভাবে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পূর্ব্বে (এই পরিচ্ছেদের ৭৬ হইতে ৭৯ পৃষ্ঠায়) প্রদান করিয়াছি। কেবল চীনদেশ বলিয়া নহে; রোমে, গ্রীসে, পারস্যে, মিশরে, নানাদেশে ভারতবর্ষের রাজদূতগণ প্রতিনিয়ত গতিবিধি কবিতেন। অনেক সময় ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের পথ প্রশস্ত করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। যেমন ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে দূত প্রেরিত হইত, তেমনই বৈদেশিকগণও ভারতের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপন জন্য ভারতীয় নৃপতিগণের সন্নিধানে দূত প্রেরণ করিতেন। রোমের, গ্রীসের, পারস্যের, মিশরের এবং চীনের ইতিহাস-সমূহে রাজদূতগণের গতিবিধির বিবরণ নানাস্থানে পরিদৃষ্ট হয়। গ্রীক-বীর আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষে আগমন করার পর, গ্রীসের সহিত ভারতবর্ষ এক অভিনব সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ হয়। চন্দ্রগুপ্তকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে অসমর্থ হওয়ায়, আলেকজাণ্ডারেব সেনাপতি সেলিউকাস-নিকেটর মৌর্য্য-সম্রাটের সহিত সন্ধি-স্থাপন করেন। সেই সন্ধির সর্ত্তে সেলিউকাস-দুহিতা চন্দ্রগুপ্তের সহিত পরিণীতা হন। তখন, গ্রীক-দূত মেগাস্থিনিস কিছুকাল ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তখন, ভারতবর্ষ হইতে গ্রীসে এবং গ্রীসদেশ হইতে ভারতবর্ষে দূতগণ সর্ব্বদাই গতিবিধি করিতেন। তাহাতে ভারতের সহিত গ্রীসের যে বাণিজ্য-সম্বন্ধ দৃঢ়তর হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

গ্রীসে ও রোমে দূত যাতায়াত।

২৮০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে সেলিউকাস নিহত হন। তৎপুত্র আণ্টিওকস্‌-সোটর পিতৃ-পরিত্যক্ত রাজ্যের আধিপত্য লাভ করেন। সে সময়ে চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার মগধের সিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন। মাতুল আণ্টিওকস্‌-সোটরের সহিত ভাগিনেয় বিন্দুসারের অসদ্ভাব ছিল না। ইহাঁদের রাজত্ব-কালে দূতগণ অব্যাহতভাবে গতিবিধি করিতেন। খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে (২৮৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ২৪৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) টলেমি ফিলাডেলফাস্‌ মিশরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে ডাইওনিসাস্‌ নাম্নীয় জনৈক রাজদূত ভারতবর্ষে আগমন করেন। সম্ভবতঃ সে সময়েও বিন্দুসার মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইহার পর রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের প্রতিষ্ঠার দিনে সিরিয়া-রাজ আণ্টিওকাস থিয়স, মিশর-রাজ টলেমি এবং মাসিডন-রাজ আণ্টিকোলস্‌ ভারতবর্ষে দূত প্রেরণ করেন। অশোকের শিলা-লিপিতে এই সকল দূতের উল্লেখ আছে। অগাষ্টাস্‌ সিজার * যখন রোমের সম্রাট-পদে অধিষ্ঠিত, সেই সময়ে

---

* আগষ্টাস্‌-সিজার রোমের একজন প্রসিদ্ধ পুরুষ। অধুনা ইংরাজী-ভাষায় উপমায় 'আগষ্টাসের সময়ের সাহিত্য' (*Augustan age* of literature) বাক্য প্রায়ই উচ্চারিত হয়। এই অগাষ্টাসের সময়ে রোম সাম্রাজ্যের সাহিত্য বিশেষরূপ শ্রীবৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াছিল। সেই হইতেই এই উপমা চলিয়া আসিতেছে। ৬৩ পূর্ব্ব-

(২০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে) রাজা 'পাণ্ডিয়ন্' তাঁহার রাজধানীতে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে পাণ্ড্য-রাজ্যের নৃপতি 'পাণ্ডিয়ন্' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। উত্তর-ভারতের মৌর্য্য-রাজবংশ ইউরোপের সহিত যখন সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ হন, দাক্ষিণাত্যের নৃপতিগণের মধ্যে পাণ্ড্যরাজগণ তখন সেইরূপ সখ্যতা-স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তিকালে দাক্ষিণাত্যের সহিত রোমের যে বাণিজ্য-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়, পাণ্ড্যরাজগণের দূত-প্রেরণাদি চেষ্টাই তাহার মূলীভূত। অগাষ্টাস্ সিজারের সময়ে উত্তর-ভারতের অধিপতি পোরাসের নিকট হইতেও এক দূত প্রেরিত হইয়াছিল। ষ্ট্রাবোর গ্রন্থে সেই দূতের নাম—'জার্ম্মাণো-খেগাজ' (Zarmano-Khegas) বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই নামে, ভারতীয় ভাষার কোন্ শব্দ কি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাহা বুঝা যায় না। দূত যে পত্র লইয়া যায়, সেই পত্র গ্রীক-ভাষায় লিখিত ছিল। পত্রে পোরাস্ আপনাকে ভারতের ছয় শত নৃপতির অধিপতি বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। রাজা পোরাসের নিকট হইতে যে দূত অগাষ্টাসের রাজধানীতে গমন করেন, এথেন্স-সহরে তিনি অগ্নিদগ্ধ হইয়া ইহলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন। সেইখানেই তাঁহার কবর হয়। সেই কবরের গাত্রে তাঁহার পরিচয়-জ্ঞাপক কয়েকটী কথা লিখিত ছিল। তাহার মর্ম্ম,—'যোগী খেগাজ বা খেগান এই কবরে আশ্রয় লইয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষের 'বারুগাজা' হইতে এখানে আসিয়াছিলেন। স্বদেশের আচার-পদ্ধতি পালন করিয়া তিনি অক্ষয়-কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন।' * অগাষ্টাসের সময় দূত-প্রেরণের বিষয় 'ডিওন কাসিয়াস', 'ফ্লোরাস' এবং 'ওরোসিয়াস' বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। রাজা পোরাসের নিকট হইতে যে সকল সামগ্রী অগাষ্টাস্-সকাশে উপহার-স্বরূপ প্রেরিত হইয়াছিল, তৎসহ একটী ব্যাঘ্র ছিল। ডিওন কাসিয়াস বলেন,—'ইহার পূর্ব্বে রোমবাসীরা কখনও ব্যাঘ্র দর্শন করেন নাই; সুতরাং ব্যাঘ্র দেখিয়া তাঁহারা বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন।' সম্রাট অগাষ্টাসের সময় রোম-সাম্রাজ্য

খৃষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর অগাষ্টাসের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম—'অক্টেভিয়াস্', মাতার নাম—'আর্টিয়া'। 'আর্টিয়া'—জুলিয়াস সিজারের ভাগিনেয়ী। এ হিসাবে জুলিয়াস সিজার,—অগাষ্টাসের প্রমাতামহ। অগাষ্টাসের বয়ঃক্রম যখন চারি বৎসর, তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার মাতা পত্যন্তর গ্রহণ করেন। অগাষ্টাসের বয়স যখন বার বৎসর, তখন তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়া, জুলিয়াস্ সিজার তাঁহাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন, এবং আপনার উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করিয়া যান। ৪৪ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে (১৫ই মার্চ্চ) জুলিয়াস্-সিজারের হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়। ইহার পর, নানা বিপ্লব অতিক্রম করিয়া অগাষ্টাস্ রোমের 'কন্সল্' (Consul) নির্ব্বাচিত হন। প্রথমে তাঁহার নাম ছিল—জুলিয়াস্ সিজার অক্টেভিয়ানাস্। ২৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে তাঁহার কৃতিত্বে মুগ্ধ হইয়া, সদস্যগণ তাঁহাকে 'অগাষ্টাস্' (*Augustus* meaning *Sacred*) অর্থাৎ 'পবিত্র' আখ্যা প্রদান করেন। সেই হইতে তাঁহার নাম হয়—কেয়স্ জুলিয়াস্-সিজার অক্টেভিয়ানাস্ অগাষ্টাস্ (Caius Julius Cæsar Octavianus Augustus)। সংক্ষেপতঃ তিনি অগাষ্টাস্ সিজার বলিয়া পরিচিত। ১৪ খৃষ্টাব্দের ১৯শে আগষ্ট ৭৭ বৎসর বয়সে অগাষ্টাস্ ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

প্রাচীনকালের বাণিজ্য-বিষয়ক গ্রন্থে ডক্টর ভিন্সেন্ট সেই কবর-গাত্রাঙ্কিত লিপির ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। সে অনুবাদ,—"Here rests Khegas or Khegan the Jogue, an Indian from Barugaza, who rendered himself immortal according to the custom of his country."—*Commerce of the Ancients* by Dr. Vincent.

হইতে অনেক লোক এদেশে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তখন ভারতে রোমীয়গণের কতকগুলি উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। সেই সময়ে ভারতের সহিত রোমের বন্ধুত্ব-বন্ধন এতই দৃঢ় হয় যে, দাক্ষিণাত্যের মুজিরি-বন্দরে অগাষ্টাসের নামে একটী মন্দির পর্য্যন্ত উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। * রোম-সম্রাট ট্রাজানের † সময়েও ভারতবর্ষ হইতে রোমে দূত প্রেরিত হয়। ১১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া ট্রাজান ইহলোক পরিত্যাগ করেন। বিদেশ-ভ্রমণে বহির্গত হইয়া সমুদ্রপথে তিনি টাইগ্রিস নদীর মোহানা পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। সেখান হইতে তিনি ভারতযাত্রী পণ্যবাহী অর্ণবপোত দেখিতে পান। ডিওন-কাসিয়াস যে দূতের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, সেই দূত ৯২ খৃষ্টাব্দে রোম-নগরে উপস্থিত হয়। ভিন্সেণ্ট স্মিথ সিদ্ধান্ত করেন,—সে দূত দ্বিতীয় 'কাড্ফাইসেসের' নিকট হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ অধিকার করিয়া আপন বিজয়বার্ত্তা ঘোষণার উদ্দেশ্যে ট্রাজান-সমীপে কাড্ফাইসেস ঐ দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ রোম-সম্রাট কনষ্টাণ্টাইনের রাজত্বকালে ভারতবর্ষ হইতে দূত প্ররিত হইয়াছিল, এবং রোম-সম্রাট জুলিয়ানের শাসন সময়ে (৩৬১ খৃষ্টাব্দে) ভারতের দূত রোমে গমন করেন। ‡ রোমের সহিত ভারতের এইরূপ সখ্যতার দ্বিবিধ কারণ অনুভূত হয়। পার্থিয়ান-গণ ও শাশানিয়ান-গণ ¶ রোম-সাম্রাজ্যের চিরশত্রু বলিয়া পরিচিত। ঐ দুই শক্তিকে ক্ষীণ করিবার জন্য ভারতের সহিত রোমের বন্ধুত্ব-বন্ধন আবশ্যক হইয়াছিল। তখন ভারতের সহিত রোমের সখ্যতা সংস্থাপিত না হইলে, প্রাচ্যের সহিত প্রতীচ্যের বাণিজ্য একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সুতরাং ভারতের 'কুশন্' বা শক নৃপতিগণের সহিত সখ্যতা-স্থাপন রোমের পক্ষে বড়ই প্রয়োজন হইয়াছিল; যেহেতু বাক্‌ত্রিয়া-রাজ্য এবং সিন্ধু-নদের উপত্যকা-প্রদেশ তখন শকগণের অধিকারভুক্ত ছিল। ফলতঃ, পার্থিয়ান ও শাশানিয়ান-দিগকে দমন রাখিয়া ভারতের সহিত বাণিজ্য চালাইবার উদ্দেশ্যেই মার্ক-এণ্টনির §

* "It is even stated, and no doubt truly, that a temple dedicated to Augustus existed at Muziris."—V. A. Smith.

† মার্কাস উলপিয়াস ট্রাজানাস (Marcus Ulpius Trajanus) সাধারণতঃ ট্রাজান নামে পরিচিত। ৫২ খৃষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর ইঁহার জন্ম হয়। ১১৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। ৯৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ইনি রোমের সম্রাট-পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

‡ রোম-সম্রাট কনষ্টাণ্টাইন (Constantine I)—গ্রেট বা মহৎ বলিয়া পরিচিত। ২৬২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ৩৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ইহলীলা সম্বরণ করেন। রোম-সম্রাট জুলিয়ান (Julian) ৩৬১ খৃষ্টাব্দ হইতে ৩৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ৩৩১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি কনষ্টাণ্টাইন-দি-গ্রেটের ভ্রাতুষ্পুত্র।

¶ পার্থিয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। পারস্য-সাম্রাজ্য শাশান্-বংশীয় নৃপতিগণের শাসনাধীন হইলে, সে রাজ্যের অধিবাসিগণ শাশানিয়ান নামে পরিচিত হয়। রাজবংশ তখন 'শাশানাইড' আখ্যা লাভ করে।

§ মার্কাস এণ্টোনিয়াস (Marcus Antonius) বা মার্ক এণ্টনি (Mark Antony) ৮৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ৩০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে ক্লিওপেট্রার মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ পাইয়া আপনার তরবারির উপর পড়িয়া তিনি আত্মহত্যা করেন। রোম-সাম্রাজ্যের সুশাসন-কল্পে এক সময়ে 'ট্রায়াম্ভার' (Triumver) অর্থাৎ তিন জন শাসনকর্ত্তার সমবায়ে শাসন-সংসদ সংগঠিত হয়। মার্ক এণ্টনি সেই শাসন-সংসদের একজন সদস্য ছিলেন। এইরূপ শাসন-সংসদ দুইবার গঠিত হইয়াছিল। প্রথম শাসন-সংসদে, ৫৯ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, জুলিয়াস-সিজার, পম্পিয়াস এবং ক্রেসাস্—এই তিন জন সদস্য ছিলেন। দ্বিতীয় সংসদ, ৪৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, এণ্টোনিয়াস (মার্ক এণ্টনি) অক্টেভিয়ানাস এবং লেপিডাস্ এই তিন জনকে লইয়া সংগঠিত হইয়াছিল।

সময় হইতে জাষ্টিনিয়নের * সময় পর্য্যন্ত (৩০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ৫৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) রাজকীয় দূতগণের গতিবিধি-সূত্রে রোম-সাম্রাজ্য ভারতের সহিত সখ্যতা-বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। একটী ঘটনার উল্লেখে পরস্পরের এই সখ্যতা-বন্ধনের বিষয় হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। রোমীয় সেনাপতি কোরবুলো ৬০ খৃষ্টাব্দে 'হির্কানিয়া' † প্রদেশের রাজদূতকে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। সেখান হইতে শক-নৃপতিগণের রাজ্যের মধ্য দিয়া রাজদূত হির্কানিয়ায় পৌঁছিবার সুবিধা পাইয়াছিল। প্রাচীন রোমের সহিত ভারতের এবম্বিধ বিবিধ সম্বন্ধের পরিচয় প্রাপ্ত হই। রোম প্রভৃতির ন্যায় পারস্যের সহিতও ভারতের সম্বন্ধের বিষয় অবগত হওয়া যায়। ভারতের রাজদূত পারস্যে যাইতেন এবং পারস্যের রাজদূত ভারতে আসিতেন,—এ প্রমাণের অসদ্ভাব নাই। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে উত্তর-ভারতের হর্ষবর্দ্ধন এবং দক্ষিণ-ভারতের দ্বিতীয় পুলিকেশী প্রসিদ্ধিসম্পন্ন হন। এই দুই নৃপতির রাজত্ব-কালে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য নানাদেশে দূত-প্রেরণের ব্যবস্থা ছিল। দ্বিতীয় খসরু যখন পারস্যের সিংহাসনে অধিরূঢ়, সেই সময়ে (৬২৫-৬২৬ খৃষ্টাব্দে) রাজা পুলিকেশীর প্রেরিত দূত পারস্য-সম্রাটের দরবারে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। সেই সূত্রে ভারতীয় নৃপতির প্রতি সম্মান-প্রদর্শন উপলক্ষে পারস্য-সম্রাট পারস্য হইতেও এক দূত প্রেরণ করেন। বলা বাহুল্য, ভারতে আসিয়া সেই দূত যথারীতি সংবর্দ্ধনা প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। অজন্তার গিরিগুহায় প্রাচীর-গাত্রে একটী চিত্র অঙ্কিত আছে। কত পুরাতন চিত্র!—অথচ সেই চিত্রে পারস্যের রাজদূতগণের অভ্যর্থনার দৃশ্য কেমন সুন্দর প্রকটিত রহিয়াছে! তুলনায় এ সকল—সে দিনের কথা। ৫২১ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ৪৮৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দারায়ুস পারস্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। সেই সময়ে তিনি ভারতবর্ষ হইতে বেতনভুক সৈন্যদল সংগ্রহ করেন। ইহাতেও বুঝা যায়, ভারতবর্ষের সহিত পারস্যের মিত্রতা-সম্বন্ধ ছিল। ভারতবর্ষ হইতে পারস্যের সৈন্য-সাহায্য-গ্রহণের বিষয় ষ্ট্রাবো উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। দারায়ুসের ভারতবর্ষ অধিকার সম্বন্ধে একটা কিম্বদন্তি আছে। সেই কিম্বদন্তির অসত্যতা প্রতিপন্ন করিয়া, ষ্ট্রাবো বলেন,—'পারস্য কখনও ভারতবর্ষ অধিকার করিতে পারেন নাই। পরন্তু ভারতবর্ষ হইতে সময়ে সময়ে পারস্যকে সৈন্য-সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।' ‡

পারস্যে দূত যাতায়াত।

* জাষ্টিনিয়ানাস্ প্রথম (Justinianus I)—জাষ্টিনিয়ান (Justinian) নামে প্রসিদ্ধ। ৪৮৩ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ৩৮ বৎসর রাজত্ব করিয়া, ৮৩ বর্ষ বয়সে, ৫৬৫ খৃষ্টাব্দে, ইনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ইনি আইন-সংক্রান্ত বহু বিধি-বিধান প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

† হির্কানিয়া (Hircania)—এসিয়া-মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত কাস্পিয়ান-সাগরের দক্ষিণস্থিত প্রাচীন জনপদ। এক সময়ে এই প্রদেশ আসিরীয়া-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আলেকজাণ্ডার যখন পারস্য-অভিমুখে অগসর হন, এই রাজ্যের ছয় সহস্র সৈন্য পারস্য-সম্রাট দারায়ুসের পক্ষ অবলম্বন করিয়া, আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিল। ২৪৪ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে এই রাজ্য পার্থিয়ার অধিকারভুক্ত হয়। ইহার পর এই রাজ্য কখনও স্বাধীন, কখনও বা অন্যের অধীন হইয়াছিল।

‡ *Vide* Elphinstone's *History of India*—Mr. E. B. Cowell's *note*, p. 253.

রাজদূতগণের গতিবিধি-সূত্রে বাণিজ্য-সম্বন্ধ-প্রতিষ্ঠার পরিচয় চীনদেশের ইতিহাসে অধিকমাত্রায় পরিদৃষ্ট হয়। 'কুও' উপঢৌকন প্রদান উপলক্ষে কিরূপভাবে চীনের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্বন্ধ দৃঢ়তর হইয়াছিল, সে পরিচয় পূর্ব্বেই (এই পরিচ্ছেদের ৭৭-৭৯ পৃষ্ঠায়) কিছু কিছু প্রদান করিয়াছি। তৎকালে ভারতবর্ষ হইতেও চীনদেশে যেমন দূত প্রেরিত হইত, চীনদেশ হইতেও সেইরূপ দূতসমূহ ভারতবর্ষে আগমন করিতেন। খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী হইতে যে দূত-গণের গতিবিধি ছিল, চীনদেশের রাজকীয় বিবরণীতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। লিয়াং-বংশের ইতিহাসে প্রকাশ,—হান-বংশের সম্রাট স্থয়ানের রাজত্বকালে (৭৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ৪৯ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের মধ্যে) ভারতের রাজদূতগণ চীন-সম্রাটের জন্য উপঢৌকন লইয়া গিয়াছিলেন। সেই রাজদূতগণ আনাম-উপকূলস্থিত 'জিনানের' পথ দিয়া চীনে উপনীত হন। 'ইণ্ডো-চায়না-সংক্রান্ত বিবিধ বৃত্তান্তের' মধ্যে লিয়াং-বংশের ইতিবৃত্ত বর্ণন-উপলক্ষে মিষ্টার গ্রোন্-ভেল্ট এই বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। * এই বর্ণনায় বুঝিতে পারা যায়, আনাম-উপকূলে তখন হিন্দুগণের উপবিবেশ প্রতিষ্ঠিত ছিল। † আনাম-উপকূল পর্য্যন্ত পণ্যাদি অর্ণবপোত-সাহায্যে সংবাহিত হইত; সেখান হইতে স্থলপথে তৎসমুদায় চীন-দেশের রাজধানীতে যাইত। 'শত্রুঞ্জয়-মাহাত্ম্যম্' নামক সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত জৈনদিগের একখানি ধর্ম্মগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে অথবা খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীন ও মহাচীনের সহিত সৌরাষ্ট্র-দেশের বাণিজ্য-সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। সৌরাষ্ট্র-দেশীয় এক বণিকের নাম—যাদব। তিনি জৈন-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। চীনে ও মহাচীনে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে, তিনি অনেকগুলি পণ্যবাহী পোত প্রেরণ করেন। বার বৎসর পরে তন্মধ্যের আঠার খানি পোত বহুমূল্য সুবর্ণাদিতে পরিপূর্ণ হইয়া দেশে প্রত্যাবৃত্ত হয়। ‡ সৌরাষ্ট্র-দেশের বণিক যাদব খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন। তাহার প্রমাণ-স্বরূপ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের বংশ-পরিচয় উল্লিখিত হইয়া থাকে। যাদবের পিতা—রাজা বিক্রমার্কের

দূত-প্রেরণে চীনে বাণিজ্য-সম্বন্ধ।

---

* *History of the Liang Dynasty* translated by Mr. W. P. Growenveldt in the *Miscellaneous Papers relating to Indo-China*, Vol. 1.

† *Vide* Professor Terrien Lacouperie's—*Western Origin of the Early Chinese Civilisation.*

‡ 'শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্যম্' কাব্যের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে এইরূপ বর্ণনা লিখিত আছে,—"ইতশ্চ পূর্ব্বং তেনৈব পুরিতাশ্চ-ভবন্ কিল। বাহনানি মহাচীনচীনভোটান প্রতিস্ফুটম্। ভ্রমিত্বা বায়ুবশতঃ স্বর্ণদ্বীপং সমাসদন্। অষ্টাদশাপি পোতান্তে ভূতাস্বর্দ্ধাতুভির্ভৃশম্। প্রবেশকাল এবাস্ত সমেষ্যন্তি সুভাগ্যতঃ। * * দ্বাদশাব্দীপ্রান্তে পোতানুপাগতান্ কথয়িষ্যতি সানন্দঃ স্বর্ণধাতুভৃতানপি।" এই 'শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্যম্' গ্রন্থ, অধ্যাপক ওয়েবারের মতে, ৫৯৮ খৃষ্টাব্দে এবং ডক্টর বর্জেসের মতে ৪২০ খৃষ্টাব্দে বিরচিত হয়। অধ্যাপক ওয়েবার ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মণীর 'লিপজিগ' সহর হইতে এই কাব্য প্রথম প্রকাশ করেন। তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থের নাম—*Uber das Catrunjaya Mahatmyam, Ein Beitrag zur Gschichte der Jaina* (edited by Prof. Albrecht Weber) ইণ্ডিয়ান য়্যাণ্টিকেয়ারি (Indian Antiquary Vol. II.) দ্বিতীয় খণ্ডে এ সম্বন্ধে ডক্টর বর্জেসের (James Burgess C.I.E., L.L.D) প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সমসাময়িক-ছিলেন। বিক্রমার্ক, জৈন-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীরের দেহত্যাগের পরবর্ত্তি-কালে ৪৭০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ৫২৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে মহাবীরের বিদ্যমানতার বিষয় প্রতিপন্ন হয়। এ হিসাবে যাদবের পিতা ৫৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। সুতরাং যাদব কর্ত্তৃক বাণিজ্য-পোত প্রেরণ পূর্ব্বোক্ত সময়েই সম্ভবপর। চীন-সম্রাট 'হোতি' এবং 'হিয়ান্তির' সময়ে রাজদূতগণ উপঢৌকন লইয়া গিয়াছিলেন,—সে পরিচয় পূর্ব্বেই আমরা প্রদান করিয়াছি। সে সময়ে প্রধানতঃ 'জিনান' (বর্ত্তমান টঙ্কুইন্) হইতে স্থলপথে চীন-দেশে দূত গিয়াছিল। খৃষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে 'ওয়ে' ও 'সিন' বংশের রাজত্ব-কালে (২২০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৪১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) কিছুদিন দূত-প্রেরণাদির প্রথা রহিত ছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ঐ সময়ে ভারতবর্ষ নানা অন্তর্বিপ্লবে সংক্ষুব্ধ ছিল। সুতরাং বাণিজ্য-সৌকর্য্যার্থ তখন প্রায়ই কোনও দূত প্রেরিত হওয়ার বিষয় জানিতে পারা যায় না। তবে 'সিন'-বংশীয় সম্রাট 'মৌ-টি' যখন সিংহাসনে অধিরূঢ়, সেই সময়ে (৩৫৭ খৃষ্টাব্দে) ভারত-বর্ষ হইতে একজন 'চেন্-টান্' বা দূত সম্রাট-সকাশে উপস্থিত হইয়া কতকগুলি সুশিক্ষিত ঘোটক ও হস্তী উপহার দিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ অনেকে সিদ্ধান্ত করেন, উপহৃত হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতি সামগ্রী অর্ণবপোত-সাহায্যে ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে সংবাহিত হইয়াছিল।

চীনে হস্তী ও অশ্ব প্রেরণ।

তাহা হইলে, তখন কত সুবৃহৎ বাণিজ্য-পোত চীনদেশে গমনাগমন করিত, সহজে প্রতীত হয়। ভারতবর্ষ হইতে ফা-হিয়ানের চীনদেশে প্রত্যাগমনের পর রাজদূতগণের গতিবিধি অধিক মাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বিশেষতঃ 'সুঙ'-বংশীয় সম্রাট 'ওয়েন-টি'র রাজত্বকালে (৪২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ৪৫৩ খৃষ্টাব্দে) ভারতের সহিত চীনের বন্ধুত্ব-বন্ধন দৃঢ়তর হইয়াছিল। সম্রাট 'ওয়েন-টি' ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। চীন-সাম্রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের সুপ্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বিশেষভাবে চেষ্টান্বিত ছিলেন। সেই সূত্রে, ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারকগণকে তিনি চীনে আনয়ন করিতেন। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রতি চীন-সম্রাটের ঐকান্তিক অনুরাগ দেখিয়া, ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গ অনেকেই দূত-প্রেরণে তাঁহাকে সম্ভাষণ জানাইতেন। 'সুঙ'-বংশের ইতিহাসে লিখিত আছে,—'জেবাবাদা' নামক জনৈক ভারতীয় নৃপতি, সম্রাট 'ওয়েন-টি'র অশেষ প্রশংসাজ্ঞাপক পত্র-সহ দূত পাঠাইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন,—'যদিও বিস্তৃত মহাসমুদ্র এই দুই রাজ্যকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু সর্ব্বদা দূতগণের গতিবিধি-সূত্রে উভয় দেশের পরস্পরের মধ্যে নিকট-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা।' ভারতের কোন্ প্রদেশের কোন্ নৃপতি 'সুঙ'-বংশের ইতিহাসের ইংরাজী অনুবাদে 'জেবাবাদা' (Jebabada) নাম পরি-গ্রহ করিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। উচ্চারণের তারতম্যে ভাষার বিকৃতি ঘটিয়া এমনই একটা প্রহেলিকার মধ্যে লইয়া যায়। সম্রাট 'ওয়েন-টি'র রাজত্বকালে লঙ্কাদ্বীপ হইতেও ঐরূপ রাজদূত গমন করিয়াছিলেন। সেই দূতের হস্তে লঙ্কাদ্বীপের তাৎকালিক অধিপতি সম্রাট-সকাশে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠান। সে পত্রে লিখিত থাকে,—'কিবা জলপথে, কিবা স্থলপথে, এই রাজ্য হইতে চীনদেশে তিন বৎসরে পৌঁছান যাইত; কিন্তু এখন উভয় রাজ্যে সর্ব্বদা লোকজন যাতায়াত করিতেছে।' এইরূপ পত্রসহ যে

সকল রাজ্যের দূতগণ ঐ সময়ে চীন-সাম্রাজ্যে গিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটী রাজ্যের ও রাজার নাম 'সুঙ'-বংশের ইতিহাসে লিখিত আছে। সেই সকল রাজ্যের একটী রাজ্যের নাম—'আরাতন' (Aratan) ; ঐ রাজ্য হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত ছিল। ঐ রাজ্যের রাজার নাম—'পিশবর্ম্মা' (Pishabarma)। কোথায় বা আরাতন, কোথায় বা পিশবর্ম্মা! প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণ সন্ধান করিয়া দেখুন! ৪২৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট 'ওয়েন-টী' সকাশে 'থিয়েন-চু' (Thientchu) হইতে তদ্দেশের উৎপন্ন-সামগ্রী উপঢৌকন লইয়া দূত গিয়াছিলেন। 'সুঙ'-বংশের ইতিহাসে, সম্রাট 'ওয়েন-টি'র জীবনবৃত্তান্ত মধ্যে, এই বিবরণ লিখিত আছে। 'থিয়েন-চু' কোন্ দেশকে বুঝায়? পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, চীনারা ভারতবর্ষকেই ঐ নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। অপর আর যে রাজ্য হইতে দূত যায়, সে রাজ্যের একটীর নাম 'কপিলি' (Kapili)। কেহ কেহ মনে করেন, বুদ্ধদেবের জন্মভূমি 'কপিলাবস্তু' নগরী ঐ নামে অভিহিত হইয়া থাকিবে। ঐ রাজ্যের রাজার নাম—চন্দ্রপ্রিয় (Chandrapriya) বলিয়া ইংরাজি-গ্রন্থে উল্লেখ আছে। চীনাদের উচ্চারণের অনুসরণে প্রথমে 'কিয়া-পি-লি' (Kia-pi-li), পরে 'কপিলি' এবং এখন 'কপিলাবস্তু' নাম সিদ্ধান্ত হইতেছে। 'চন্দ্রপ্রিয়' শব্দ চীনাদিগের ভাষায় ছিল না। তাঁহাদের উচ্চারণের অনুসরণে প্রথম যে ইংরাজী শব্দ লিখিত হয়, তাহার রূপ—'ইউয়ে-আই' (Youei-ai) ; ঐ শব্দের অর্থ—'চন্দ্রের প্রিয় বা ভালবাসার পাত্র'। সেই সূত্র লইয়া, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ, কপিলাবস্তুর রাজা চন্দ্রপ্রিয় দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছেন। চীনা-ভাষার 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া' প্রণেতা 'মা-তুয়ান-লিন' এই দূত-প্রেরণ-সম্বন্ধে আপন গ্রন্থে অনেক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 'কিয়া-পি-লি' হইতে তত্রত্য নৃপতি পত্রসহ যে দূত প্রেরণ করেন, সেই দূতের সঙ্গে হীরকখচিত একটী অঙ্গুরী, বিশুদ্ধ স্বর্ণের বলয়, নানাবিধ মূল্যবান দ্রব্য, দুইটী তোতাপাখী (একটী শ্বেতবর্ণের ও একটী রক্তিমবর্ণের পক্ষবিশিষ্ট) উপহার পাঠাইয়াছিলেন। মা-তুয়ান-লিনের গ্রন্থে ঐ বিবরণ এবং ঐরূপ আরও নানা বিবরণ প্রকাশিত আছে। একটী বিবরণে প্রকাশ,—সম্রাট 'মিং-টি'র রাজত্বকালে (৪৬৬ খৃষ্টাব্দে) 'কিয়া-পি-লি'র রাজা পুনরায় উপঢৌকন-সহ দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। চীন-সম্রাট তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া 'কিয়া-পি-লি'র রাজাকে একটী উপাধি প্রদান করেন। উপাধির সংজ্ঞা—'কিয়েন-ওয়ে-সিয়াং-কিউন' অর্থাৎ রাজ্যাধিপতি। ৪৭৭ খৃষ্টাব্দে উত্তর-চীনে সম্রাট 'হিয়াও-ওয়েন-টী' রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজত্বকালে পশ্চিম-ভারত হইতে চীনদেশে দূত গিয়াছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে আরও নানাস্থান হইতে চীনে ঐরূপ দূত প্রেরিত হয়। তন্মধ্যে কয়েকটী বৌদ্ধরাজ্যের নাম উল্লেখ আছে। সে সকল নাম—'সৌ মো-লি', 'কিন্-থো-লি', 'পো-লি', ইত্যাদি। ঐ সকল জনপদ কোথায় ছিল, তাহা নির্ণয় হয় না। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে যে সকল রাজদূত ভারতবর্ষ হইতে চীনে গমন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 'লিয়াং'-বংশের, 'ওয়ে'-বংশের এবং 'চীন্'-বংশের তিন জন প্রধান

বিভিন্ন রাজ্যের দূত।

কপিলি-রাজ্য ও চন্দ্রপ্রিয় রাজা।

সম্রাটের রাজত্বকালে, কয়েক জন দূতের গমনের বিষয় অবগত হওয়া যায়। 'লিং'-বংশের রাজত্বকালে (৫০২ খৃষ্টাব্দ হইতে ৫৫৬ খৃষ্টাব্দে) প্রায় প্রতি বৎসরই রাজদূতগণ চীনে গমনাগমন করিয়াছিলেন। ভারতের, রোমের ও অন্যান্য স্থানের দূতগণের গতিবিধির বিষয়, ঐ সময়ের চীনের রাজকীয় বিবরণীতে লিখিত আছে। সম্রাট 'ঔ-টি' ৫০২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজ্যাভিষেকের বৎসরে 'কিও-টো' নামক ভারতীয় নৃপতির উপঢৌকন লইয়া রাজদূত চীনে গিয়াছিলেন। সম্রাট 'ঔ-টি'র জীবন-বৃত্তান্তে এতদ্বিষয় পরিবর্ণিত আছে। রাজা 'কিও-টো' যাঁহাকে দূত-রূপে পাঠাইয়াছিলেন, চীনাদিগের উচ্চারণে তাঁহার নাম 'চু-লো-টা' (Tchu-lo-ta) বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার উপাধি, চীনদিগের উচ্চারণে 'চাং-সি' (Tchang-shi) রূপ পরিগ্রহ করিয়া আছে। সেই রাজদূত রাজা 'কিও-টো'র প্রেরিত একখানি পত্র এবং কতকগুলি সামগ্রী সম্রাটকে উপহার-স্বরূপ প্রদান করেন। উপহৃত দ্রব্যের মধ্যে, বৈদূর্য্য-খচিত একটী পিক্‌দানী ছিল, কার্পাস-নির্ম্মিত বস্ত্রাদি ছিল। রাজা 'কিও-টো' ভারতের কোন প্রদেশে রাজত্ব করিতেন, মা-তুয়ান্-লিনের গ্রন্থে তাহার একটু পরিচয় আছে। সেই রাজ্যে 'সিন-আউ' নদী প্রবাহিত। সে নদীর পাঁচ শাখা। 'কৌ-যেন-লেন' পর্ব্বত হইতে সেই নদী প্রবাহিত। সেই নদীর জল সুমিষ্ট ও স্বচ্ছ। ঐ নদীর গর্ভে শ্বেতপ্রস্তরবৎ পরিষ্কৃত লবণ (সৈন্ধব) পাওয়া যাইত। চীনাদিগের বিবরণে ভারতের যে নৃপতি 'কিও-টো' নামে অভিহিত হইয়াছেন, তিনি গুপ্ত-বংশীয় কোনও নৃপতি হওয়াই সম্ভবপর। 'সিন-থাউ' সিন্ধু-নদকে বুঝাইতে পারে। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, তখন ভারতের উত্তরপশ্চিম-প্রদেশে গুপ্ত-বংশের প্রাধান্যেরই পরিচয় পাওয়া যায়। পুলি-কেশী (পুলকেশী) তখন ঐ প্রদেশে প্রসিদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। সুতরাং তাঁহার রাজধানী হইতেই দূত প্রেরিত হইয়াছিল মনে হইতে পারে। যাহা হউক, উপহৃত-সামগ্রীর বিনি-ময়ে দূতের নিকট চীন-সম্রাটও কতকগুলি সামগ্রী ভারতীয় নৃপতিকে উপহার-স্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন। সেই সকল দ্রব্যের মধ্যে নানাপ্রকার কারুখচিত পাত্র, নানাপ্রকার সুগন্ধ দ্রব্য ও শঙ্খবিনির্ম্মিত নানাপ্রকার সামগ্রী ছিল। সম্রাট 'ঔ-টি'র রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে (৫০৩ খৃষ্টাব্দে) মধ্যভারত হইতে এবং তৃতীয় বৎসরে উত্তর-ভারত হইতে দূত প্রেরিত হইয়াছিল। দূতগণ আপন আপন দেশজাত উৎকৃষ্ট সামগ্রী-সমূহ সম্রাট-সকাশে উপহার-স্বরূপ লইয়া গিয়াছিলেন। দক্ষিণ-চীনে এবং উত্তর-চীনে উভয়ত্রই ঐরূপ প্রতিনিধি-প্রেরণের ব্যবস্থা ছিল। তখন 'ওয়ে'-বংশ উত্তর-চীনে রাজত্ব করিতেন। ঐ বংশের সম্রাট 'সুয়ান-উ' বা 'হিওনান্-উ' ৫০৩, ৫০৭, ৫০৮ ও ৫১৫ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ-ভারত হইতে উপঢৌকনাদি প্রাপ্ত হন। মা-তুয়ান-লিন লিখিয়াছেন,—'সিউয়েন-ওন' (৫০০-৫০৪ খৃষ্টাব্দে) ভারতীয় রাজদূতের নিকট হইতে সুসজ্জিত অশ্ব উপহার পাইয়াছিলেন। 'চু-ফান-চি' নামক বৈদেশিক-জাতির বিবরণ-সংক্রান্ত ভৌগলিক-গ্রন্থে প্রকাশ,—সম্রাট 'সুয়ান-উ'র রাজত্বকালে (৫০০ হইতে ৫১৫ খৃষ্টাব্দে) 'টিয়েন-চু' হইতে যে দূত গিয়াছিলেন, তিনি বড় বড় ঘোটক উপহার-স্বরূপ প্রদান করেন। যে রাজ্য হইতে তিনি গিয়াছিলেন,

কিও-টোর রাজ্যের দূত।

সে রাজ্যের উৎপন্ন-সামগ্রীর পরিচয় জানা যায়,—'সে রাজ্যে সিংহ, ব্যাঘ্র, নকুল, উষ্ট্র, গণ্ডার, হস্তী, কচ্ছপ প্রভৃতি জন্তু এবং স্বর্ণ, তাম্র, লৌহ, সীসক, টীন প্রভৃতি ধাতব পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়; সে দেশে স্বর্ণখচিত বস্ত্র, কার্পাস-বস্ত্র এবং কম্বল প্রস্তুত হয়; সেখানে অভ্রের ন্যায় অথচ লাল-রঙের এক রকম প্রস্তর আছে;—সে প্রস্তর বিদীর্ণ করিলে যে পাতলা পাতলা খণ্ড হয়, সে গুলিকে একত্র রাখিলে, রেশমের সূক্ষ্ম-বস্ত্রের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। সেখানে হীরক পাওয়া যায়; উহা ময়দার ন্যায় শ্বেতবর্ণ, আগুনে উহা দগ্ধ করা যায় না, উহার দ্বারা কাচ ও বহুমূল্য প্রস্তরাদি কর্ত্তিত হইয়া থাকে। সে দেশে চন্দন-কাষ্ঠ, বিভিন্ন সুগন্ধ মসলা, ইক্ষু, মিছরী এবং সকলপ্রকার ফল পাওয়া যায়। সে দেশের অধিবাসিগণ বৎসরে একবার 'তা-সিন' (সিরিয়া) এবং 'ফু-নান্' (শ্যাম-দেশ) দেশে বাণিজ্য করেন। কড়ি সেই দেশে বিনিময়-ব্যাপারে মধ্যস্থ-রূপে প্রচলিত আছে।' প্রোক্ত তালিকায় যে সকল সামগ্রীর নাম দৃষ্ট হয়, ঐ সকল সামগ্রী সেই সময়ে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানী হইত, ইহাই বুঝা যায়। ইহার পর 'হিউয়ান-টি'র রাজত্বকালে, ৫৭১ খৃষ্টাব্দে, ভারত হইতে আর এক দূত প্রেরিত হওয়ার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। সে দূত নানাবিধ ভারতীয় পণ্য উপহার-স্বরূপ লইয়া গিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে এই দূত-প্রেরণ-বিষয়ে একটু বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। 'সুই' বংশের প্রথম সম্রাট 'য়াং-টি' বিভিন্ন দেশের সহিত চীনের সম্বন্ধ-স্থাপনে প্রয়াস পান। কিন্তু সকলেই তাঁহার প্রাধান্য মান্য করুক, ইহাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা হয়। তিব্বতের এবং অন্যান্য অনেক দেশের রাজা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু ভারতবর্ষ সেরূপ সম্বন্ধ-স্থাপন করিতে সম্মত হন না। ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য ভারতবর্ষ হইতে এ পর্য্যন্ত দূত প্রেরিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে চীন-সম্রাটের প্রাধান্য-স্বীকারের কোনই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় নাই। সুতরাং এই সময়ে ভারতীয় নৃপতিগণ চীনে কোনও উপঢৌকনাদি প্রেরণ একেবারে বন্ধ করিয়া দেন। ফলে, পরবর্ত্তিকালে অন্যরূপ প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। তখন ভারতবর্ষ হইতেও যেমন দূত যাইতে আরম্ভ করেন, চীনদেশ হইতেও সেইরূপ ভারতবর্ষে রাজ-দূতগণ আসিতে বাধ্য হন। যে কারণেই হউক, ৬০৭ খৃষ্টাব্দে চীনরাজের জনৈক প্রতিনিধি লঙ্কাদ্বীপে আগমন করেন। লঙ্কাদ্বীপের তাৎকালিক অধিপতি তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য ত্রিশখানি পোত-সহ 'কিউ-মো-লো' নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে সমুদ্রপথে প্রেরণ করিয়াছিলেন। 'সুই-সু' নামক 'সুই' বংশের ইতিবৃত্তে এতদ্বিবরণ লিখিত আছে। ইহার পর, ৬২৬ খৃষ্টাব্দে 'টাং' বংশের সম্রাট 'টাই-সুং'য়ের রাজত্বকালে দূত-গমনাগমনের প্রথা বিশেষভাবে প্রবর্ত্তিত হয়। 'টাং' বংশের ইতিহাসে লিখিত আছে,—৬৪১ খৃষ্টাব্দে উত্তর-ভারতের সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য চীনে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। চৈন-পরিব্রাজক 'হুয়েন-সাং' ভারতবর্ষে আসিয়া চীন-সম্রাটের গুণগাথা কীর্ত্তন করায়, রাজা হর্ষবর্দ্ধন ঐরূপ দূত-প্রেরণে প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন। তাহার ফলে, চীনদেশ হইতেও ভারতবর্ষে দূত আসিয়া, রাজা হর্ষবর্দ্ধনের প্রতি সম্বর্দ্ধনা জানাইয়াছিলেন। 'মা-তুয়ান-লিন' শিলাদিত্যের নাম 'শি-লো-য়ি-টো' রূপে এবং

চীনে ভারতীয় পণ্য।

তাঁহাকে 'মো-কি-টো' দেশের (মগধের) রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। শিলাদিত্যের নিকট যিনি চীন হইতে দূতরূপে আসিয়াছিলেন, তিনি 'লি-ই' নামে চীনাদিগের গ্রন্থে অভিহিত হইয়াছেন। ইহার পর, রাজা হর্ষবর্দ্ধনের নিকট হইতে বিবিধ উপঢৌকন লইয়া, আর এক দূত চীনদেশে গমন করেন। সেই দূতের চীনে উপস্থিতির পর, চীন-সম্রাটেরও আর এক দূত ভারতবর্ষে আসেন। * ৬৪৬ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ হইতে চীনে দূত গমনাগমনের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু তখন কোন্ নৃপতির নিকট হইতে দূত প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার কোনও নিদর্শন নাই। সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে চারি বার দূত প্রেরণের উল্লেখ আছে। তৎকালে ভারতবর্ষ পাঁচটী ভাগে বিভক্ত ছিল বলিয়া চীনাদিগের গ্রন্থে প্রকাশ। সম্রাট 'কাউ-স্থং' (৬৬৭ ও ৬৬৮ খৃষ্টাব্দে) সেই পাঁচ বিভাগ হইতে উপহার পাইয়াছিলেন। ইহার পর, ৬৭২ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ-ভারত হইতে এবং ৬৯০ ও ৬৯২ খৃষ্টাব্দে প্রোক্ত পাঁচ বিভাগ হইতেই দূত প্রেরিত হইয়াছিল। ঐ পাঁচ প্রদেশের মধ্যে, চারি প্রদেশের রাজার নাম, চীনাদিগের গ্রন্থে নিম্নলিখিত ভাবে উচ্চারিত হইয়াছে দেখিতে পাই; যথা—'মো-লো-পা-মো' অর্থাৎ পূর্ব্ব-প্রদেশের রাজা, 'চে-লো-খি-পা-লো' অর্থাৎ পশ্চিম-প্রদেশের রাজা, 'না-না' অর্থাৎ উত্তর-প্রদেশের রাজা, 'টি-মো-সি-না' অর্থাৎ মধ্য-প্রদেশের রাজা। অষ্টম-শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে (৭০১ খৃষ্টাব্দ হইতে ৭৫৬ খৃষ্টাব্দ মধ্যে) প্রায় প্রতি বৎসরই ভারতের কোন-না-কোন প্রদেশ হইতে দূত প্রেরিত হইয়াছিল। এই সকল দৌত্যের মধ্যে একবারের দৌত্যের উদ্দেশ্য একটু স্বতন্ত্র ছিল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। ৭১৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ৭৪২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সেই দৌত্যবাহিনী চীনে পৌঁছিয়াছিল। সেই দৌত্যসহ পঞ্চ-বর্ণের পক্ষবিশিষ্ট কয়েকটী তোতাপাখী উপহার-স্বরূপ প্রেরিত হয়। এবার দূতগণ চীন-সম্রাটের নিকট এক অভিনব সাহায্য-প্রাপ্তির প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। সেই সময়ে 'টা-সি' (আরবগণ) এবং 'তৌ-ফা-ন্' (তিব্বতীয়গণ) ভারতবর্ষের প্রতি সময়ে সময়ে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য ভারতবর্ষ হইতে চীন-সম্রাটের নিকট সৈন্য-সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। দূতগণ এবার ঐ প্রার্থনা জানাইবার জন্য চীনে গমন করিয়াছিলেন। চীন-সম্রাট 'ইউ-য়ান-সোং' (সাধারণতঃ যিনি 'মিং-হোয়াং-টি' বলিয়া পরিচিত) ভারতীয় দূতগণের বিশেষরূপ অভ্যর্থনা করেন, এবং

ভারতবর্ষের পাঁচ বিভাগ।

* এই দূত ৬৪৮ খৃষ্টাব্দে মগধে উপনীত হন। মগধে তখন একপ্রকার রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত। রাজা হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর, তাঁহার মন্ত্রী অর্জ্জুন (বা অরুণাসব) সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি চীন হইতে আগত দূতের অপমান করেন এবং তাঁহার দ্রব্য-সামগ্রী লুণ্ঠন করিয়া লন। 'ওয়াং-হিউয়েন-সি' সেই দৌত্যবাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন। দূতের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার হইলে, 'ওয়াং-হিউয়েন-সি' তিব্বতে পলায়ন করেন। তখন তিব্বত হইতে একদল সৈন্য মগধ আক্রমণে অগ্রসর হয়। সেই সৈন্যদলে নেপাল-রাজের সাত সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য যোগদান করে। 'কুমার' নামধেয় পূর্ব্ব-ভারতের নৃপতি ঐ সময় ঐ যুদ্ধযাত্রায় চীনাদিগকে সহায়তা করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধে অর্জ্জুন পরাজিত ও নিহত হন। "*Vide* an article by M. Sylvain Levi headed *Les Missions de Wang-Hiuen-Tse* in the *Journal Asiatique,* 1900. p 297 etc, and also an article headed *Tibetan Invasion of India in 647 A. D., and its Results* by L. A. Waddell, C. B., in the *Imperial and Asiatic Quarterly Review,* January, 1911 p 37-65." (*Dawn*)

দূতগণকে কতকগুলি পোষাক-পরিচ্ছদ উপহার প্রদান করেন। তিব্বতীয়গণ স্থলপথে, আরবীয়গণ জলপথে, চীনের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিন্ন করিবার চেষ্টা করায়, ভারতবর্ষ যেমন চীনের নিকট সৈন্য-সাহায্য প্রার্থনা করেন; চীনের সম্রাটও যে ভারতীয় নৃপতিগণের নিকট সেইরূপ সাহায্য-প্রার্থনা না করিয়াছিলেন, তাহা নহে। 'টাং'-বংশের রাজত্বকালের শেষভাগে চীনে বিষম বিপ্লব উপস্থিত হয়। 'সুঙ' বংশের সিংহাসনাধিকারের কাল পর্য্যন্ত (৯৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) সেই অশান্তি অব্যাহত ছিল। ৭৭৩ খৃষ্টাব্দে তিব্বতীয়গণ চীন-সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। চীন-সম্রাট রাজধানী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এই সময়ে কিছুকাল চীনারা তিব্বতীয়গণের আক্রমণে বড়ই বিপন্ন-অবস্থায় কালযাপন করেন। তখন (৭৮৭ খৃষ্টাব্দে) মন্ত্রিগণের পরামর্শে চীন-সম্রাট 'টে-সুং' ভারতের নিকট সাহায্য-প্রার্থী হন। * খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে দশম শতাব্দীর অধিকাংশ সময়, চীনের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্বন্ধ প্রায় বিচ্ছিন্ন হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। † অতঃপর খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ভারতে 'চোল'-রাজ্যের অভ্যুদয়-কালে দুই বার দুই দৌত্যবাহিনী চীন-সাম্রাজ্যে গমন করিয়াছিল। প্রথম দৌত্যবাহিনী ১০৩৩ খৃষ্টাব্দে 'চোল'-রাজ 'শ্রীরাজা ইন্দ্র-চোল' কর্তৃক প্রেরিত হয়। দ্বিতীয় দৌত্যবাহিনী ১০৭৭ খৃষ্টাব্দে চোল-রাজ 'কুলতুঙ্গে'র রাজত্বকালে প্রেরিত হইয়াছিল। 'সুঙ্-সি' নামক 'সুঙ'-বংশের ইতিহাসে এই দুই দৌত্যবাহিনীর বিবরণ বিবৃত আছে। চীনাদিগের উচ্চারণে রাজ্যের নাম 'চু-লিয়েন' এবং রাজদ্বয়ের নাম যথাক্রমে 'শি লি-লো-চা-ইন-টো-লো-চু-লো' এবং 'টি-ওয়া-কা-লো' রূপ গ্রহণ করিয়া আছে। কিন্তু সময়ের ও নামের সামঞ্জস্য-সাধনে পণ্ডিতগণ চোল-রাজ্যের ঐ দুই নৃপতির বিষয়ই নির্দ্ধারণ করিয়া লইয়াছেন। শেষোক্ত নৃপতির নিকট হইতে কাচপাত্র, কর্পূর, রেশমী বস্ত্র, গণ্ডার-শৃঙ্গ, গজদন্ত, ধুপ, গোলাপজল, হিঙ্গ, সোহাগা, লবঙ্গ প্রভৃতি উপহার প্রেরিত হয়। ঐ সকল সামগ্রী উপহার পাইয়া চীন-সম্রাট ৮১,৮০০ তাম্রখণ্ড (মুদ্রা) প্রদান করেন। ইহাতে দূতগণ বিশেষ লাভবান হইয়াছিলেন। এই দৌত্য-ব্যাপারে ৭২ জন দূতের গমনের বিষয় উল্লেখ আছে। তাহাতে ডক্টর হার্থ সিদ্ধান্ত করেন,—দূত বলিয়া পরিচিত ব্যক্তিগণ সমবায় সংগঠন করিয়া ব্যবসার সুবিধার উদ্দেশ্যে চীনদেশে গমন করিয়াছিলেন। ‡ ইহার পর চীনে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য দূত গমনাগমনের

চোল রাজ্যের দূত চীনদেশে।

* চীন-সম্রাটের সাহায্য প্রার্থনার বিষয় ইউলের গ্রন্থে (*Cathay and the Way Thither* by Col. Henry Yule) দৃষ্ট হয়।

† "Towards the end of the ninth century, * * * and throughout the greater part of the tenth century, * * * merchants from oversea encountered many obstacles owing to the unsettled state of the coast."—*China Its History, Arts and Literature* by Cap. F. Brinkley, Vol. X.

‡ "This so-called embassy was probably, like most of the missions to the coast of China, nothing better than a trading expedition on joint account, the 72 ambassadors being the share-holders or their supercargoes."—Dr. F. Hirth P.H.D., in the *Journal of the Royal Asiatic Society*, 1896.

সংবাদ, কুবলাই খাঁর রাজত্বকালের ইতিহাসে বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ আছে। কুবলাই খাঁ ১২৫৯ খৃষ্টাব্দে চীন-সাম্রাজ্যে একাধিপত্য অধিকার লাভ করেন। তাঁহারই রাজত্বকালে মার্কোপোলো ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া কুবলাই খাঁ বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়াস পান। তবে, তাঁহার প্রতি সকলে সম্মান প্রদর্শন করিয়া উপঢৌকন প্রেরণ করুন,—ইহাই তাহার আকাঙ্ক্ষা হয়। ভারত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের কোনও কোনও অংশ এবং ভারতবর্ষের কোনও কোনও প্রদেশ, তাঁহার আকাঙ্ক্ষা-অনুরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন বটে ; কিন্তু জাপান, যবদ্বীপ এবং ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশ তাঁহার প্রস্তাবে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। যে সকল দেশ হইতে সম্রাট কুবলাই খাঁর নিকট উপঢৌকনাদি প্রেরিত হইয়াছিল, মার্কোপোলোর গ্রন্থে তাহার কয়েকটীর নাম দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল রাজ্যের বা প্রদেশের নাম—'মাপেয়ুল', 'সুমুনতলা', 'সুমেন্না', 'সেঙকিল', 'মালানটান', 'লৈলাই', 'নবং', 'তিনঘোয়েয়ুল'। সার হেনরি ইউল বলেন,—'প্রথমোক্ত চারিটী রাজ্য ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত হওয়াই খুব সম্ভব এবং শেষোক্তগুলি সম্ভবতঃ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল।' * কিন্তু এখনকার কোন্ কোন্ জনপদ তখন যে ঐ সকল নামে পরিচিত ছিল, তাহা কেহই নির্ণয় করিয়া বলিতে পারেন না। যাহা হউক, ঐ সময় এবং পরবর্ত্তিকালে বঙ্গদেশের সহিত চীনের বাণিজ্য-সম্বন্ধ বিশেষভাবে স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। তখন, বঙ্গদেশ হইতেও যেমন উপহার পাঠান হইত, চীন-সাম্রাজ্য হইতেও সেইরূপ উপঢৌকনাদি আসিত। গয়েস-উদ্দীন আজম সাহ যখন বঙ্গের সিংহাসনে অধিরূঢ় (১৩৮৫—১৪৫৭ খৃষ্টাব্দ), সেই সময়ে (১৪০৮ খৃষ্টাব্দে) বঙ্গদেশ হইতে চীনে দূত গিয়াছিল। বঙ্গাধিপতি গয়েস উদ্দিন, সেই দূতের সঙ্গে কতকগুলি ঘোড়া, ঘোড়ার জিন, স্বর্ণের ও রৌপ্যের অলঙ্কার, পানপাত্র প্রভৃতি নানাবিধ সামগ্রী উপহার পাঠাইয়াছিলেন। উহার পর সৈয়ফ উদ্দীন হামজা সাহ (১৪০৭—১৪১০ খৃষ্টাব্দে) ঐরূপ উপহার প্রেরণ করেন। তাঁহার দূত ১৪১৫ খৃষ্টাব্দে চীনে উপনীত হয়। ঐ বৎসর চীন হইতে উপঢৌকনাদি লইয়া যুবরাজ 'সি-চাউ' প্রমুখ দৌত্যবাহিনী বঙ্গদেশে আসেন। † পঞ্চদশ শতাব্দীতে দূত প্রেরণে বাণিজ্যের ব্যবস্থা-বন্দোবস্তের বিবরণ 'মিং'-বংশের ইতিহাসে প্রকট পরিদৃশ্যমান

কুবলাই খাঁর সময়ে।

উপঢৌকন প্রত্যুপঢৌকন।

---

* "We hear from Marco Polo of some part of the intercourse which Kublai Khan endeavoured to establish with the western countries of Asia, and his endeavours are specially mentioned in the Chinese annals. Unfortunately, he and his officers seem to have entertained the Chinese notion that all intercourse with his empire should take the form of homage, and his attempts that way in Java and Japan had no very satisfactory result. But he is said to have been more fortunate in 1286 with the kingdoms of Mapeul, Sumuntala, Sumenna, Sengkill, Malantan, Lailai, Navang, Tinghoeul. Of these the first four are almost certainly Indian. The rest of the names probably belong to the Archipelago."—*Cathay and the Way Thither* by Sir Henry Yule.

† *The Journal of the Royal Asiatic Society* (1896)—article by George Phillips.

আছে। ঐ সময়ে যেমন ভারতবর্ষ হইতে, তেমনই চীনদেশ হইতে সমানভাবে দূত গমনাগমনের সংবাদ পাওয়া যায়। ১৪১৬ খৃষ্টাব্দের শীতকালে, 'মালাক্কা', 'কালিকট' এবং অন্যান্য সতেরটি রাজ্য হইতে উপঢৌকনাদি সহ চীনে দূত প্রেরিত হইয়াছিল। সেই দূতগণ চীন হইতে যখন প্রত্যাবৃত্ত হন, তখন 'চেঙ-হো' নামধেয় চীন-সম্রাটের জনৈক পদস্থ প্রতিনিধি ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গকে সম্রাট-প্রদত্ত প্রীতি-উপঢৌকন প্রদান করিতে আসেন। চীন-সম্রাটের ঐ পূর্ব্বোক্ত প্রতিনিধি, বঙ্গদেশ, কালিকট, কোচিন, চোল, কুমারিকা, কৈলন, কৈল, সিলোন প্রভৃতি দেশে বিভিন্ন সময়ে উপঢৌকনাদি সহ আগমন করিয়াছিলেন। ১৪৩৬ খৃষ্টাব্দে কালিকট, উত্তর-সুমাত্রা, কোচিন, আরব, কৈল, এডেন, হর্ম্মোজ, কুমারী, কাম্বোজ প্রভৃতি দেশ হইতে চীনে দূত প্রেরিত হয়। যবদ্বীপের প্রতিনিধির সহিত তাঁহারা প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিলেন। এই সময় চীন-সম্রাট যব-দ্বীপের নৃপতিকে একখানি পত্র লেখেন। সেই পত্রে ভারতবর্ষের এবং অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিগণের বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ থাকে। যব-দ্বীপের অধিপতি যেন অপরাপর দেশের দূতগণের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন এবং তাঁহাদিগকে আপন আপন দেশে পাঠাইবার সুব্যবস্থা করিয়া দেন,—পত্রে তদ্রূপ অনুরোধ ছিল। দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ তোগলকের শাসন সময়ে, (১৩৪১—১৩৪২ খৃষ্টাব্দে) চীন-সম্রাটের প্রতিনিধি বা দূত আসিয়া 'কোরা' পর্ব্বতে বৌদ্ধ-মন্দির সংস্কারের অনুমতি প্রার্থনা করেন। ইহার পর, দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ তোগলকের নিকট হইতে চীন-সাম্রাজ্যে দূত প্রেরিত হয়। সেই দূত—আরবদেশীয় প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী ইবন-বাতুতা। সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে ১৩৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি চীনদেশের উদ্দেশে গমন করেন। গোয়া পর্য্যন্ত তিনি স্থলপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। গোয়া হইতে জাহাজে চড়িয়া মালবর উপকূল অতিক্রম করিয়া তিনি কালিকটে উপনীত হন। তখন চীনদেশে যাইবার জন্য কালিকটে কতকগুলি অর্ণবপোত প্রস্তুত ছিল। সম্রাটের প্রেরিত উপঢৌকনাদি-সহ ইবন-বাতুতা সেই পোতে আশ্রয়-গ্রহণের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু দ্রব্য-সামগ্রী পোতে উত্তোলন করা হইলে, সহসা বিষম বাত্যায় পোত বিপর্য্যস্ত হয়। ইবন-বাতুতা তখনও পোতে আরোহণ করেন নাই। তাঁহার সঙ্গের দ্রব্য-সামগ্রী কতক ভাসিয়া যায়, কতক বা চীনে চলিয়া যায়। ইবন-বাতুতা কিছু দিন ঐ বন্দরে এবং কিছু দিন মালদ্বীপে অবস্থান করিয়া, পরিশেষে বঙ্গদেশে আসেন। বঙ্গদেশান্তর্গত সোনারগাঁ বন্দর হইতে একখানি বাণিজ্য-পোতে আরোহণ করিয়া প্রথমে যব-দ্বীপে এবং অবশেষে অন্য এক জাহাজে তিনি চীনদেশে পৌঁছিয়াছিলেন। ইহার পর চীন-সম্রাট 'জোঙ্-লো' (কিঙ্-সু) ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে 'পেঙ্-কো-লি' দেশ হইতে উপঢৌকন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।* ঐ 'পেঙ্-কো-লি' রাজাকে পণ্ডিতগণ 'বঙ্গরাজ্য' বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। মোগল-সাম্রাজ্যের চরম উন্নতির দিনে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবার হইতে (১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে) চীনে দূত প্রেরিত হয়। দিনেমারদিগের দূত ঐ সময়ে একসঙ্গে চীনের

দিল্লীতে চীনের দূত।

---

* জর্ম্মাণ-দেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত লাসেন্ (C. Lassen) তদীয় ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-সংক্রান্ত গ্রন্থে (Indische Alterthumskunde) চতুর্থ খণ্ডে এই দৌত্য-বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন।

সম্রাট-সকাশে অভ্যর্থিত হন। যাহা হউক, এইরূপে দেখা যায়,—খৃষ্ট-জন্মের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী সময় হইতে ইউরোপীয়গণের ভারত-আগমন সময় পর্য্যন্ত বাণিজ্যের সুবিধার জন্য ভারতবর্ষ হইতে বিভিন্ন দেশে দূত প্রেরিত হইত, এবং সেই সকল দেশ হইতেও ভারতবর্ষে দূত আগমন করিত। চীনের সহিত ভারতের এই সম্বন্ধ যে কতকাল পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল, সে তত্ত্ব নির্ণয়ে ইতিহাসকে পরাভব স্বীকার করিতে হয়।

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য-প্রসঙ্গে * আরও কত দেশের কত কথাই কহিবার আবশ্যক হয়। ভারতের যে জনপদ যখন সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াছিল, সেই জনপদই বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। কত দিকে কত মতে সে প্রতিষ্ঠার প্রমাণ-পরম্পরা বিদ্যমান রহিয়াছে। বাণিজ্য-ব্যপদেশে বিভিন্ন দেশে গতি-বিধি-সূত্রে সেই সেই দেশে ভারতীয় বণিকগণের কত যে উপনিবেশ স্থাপিত হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। ভারতীয় বণিকগণের আপন দেশের নামানুসারে সেই সকল উপনিবেশের অনেকগুলির নামকরণ হইয়াছিল। সে পরিচয় আজিও দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এক যদি প্রাচীন কলিঙ্গ-রাজ্যের বিষয় আলোচনা করি, তাহাতেই কত তত্ত্ব অবগত হই। খৃষ্ট জন্মের আট শতাব্দী পূর্ব্বে ঐ রাজ্যের অভ্যুদয়ের বিষয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন। কলিঙ্গ-দেশের রাজপুত্রগণকে পর্য্যন্ত অর্ণবপোত-পরিচালনায় এবং বাণিজ্য-বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। † কেহ কেহ কহেন,—রামায়ণোক্ত বলিরাজ কলিঙ্গদেশেরই অধিপতি ছিলেন, এবং তাহারই নামানুসারে বলিদ্বীপের নামকরণ হইয়াছিল। কলিঙ্গ-দেশের বণিকগণ ব্রহ্মদেশে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। সিঙ্গাপুরে তাঁহাদের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। সে নিদর্শন ঐ সকল দেশের এক সম্প্রদায়ের অধিবাসীর 'ক্লিং'-সংজ্ঞা দেখিয়াই উপলব্ধি হয়। কলিঙ্গ হইতে 'কলিঙ', 'কলিং', 'ক্লিং'—উচ্চারণের এইরূপ বিকৃতি ঘটিয়াছে। ব্রহ্মদেশে পেগু-সহরে প্রাচীন-কালের কতকগুলি মুদ্রা ও পদক পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি হিন্দুদিগের নিদর্শন। সেগুলি দেখিয়া পণ্ডিতগণ ব্রহ্মদেশে কলিঙ্গ-দেশীয় বণিকগণের বাণিজ্য-সম্বন্ধের পরিচয় দেন। ‡ মালাক্কা-দ্বীপেও ঐরূপ উপনিবেশের পরিচয় আছে। চৈন-পরিব্রাজক ইৎ-সিং ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে যাত্রার সময়ে যে সকল দ্বীপের বা বন্দরের নাম করিয়া গিয়াছেন (৯১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য), তৎসমুদায় ভারতীয় বণিকগণের উপনিবেশ-প্রতিষ্ঠারই পরিচয় দেয়। এইরূপ দেখিতে গেলে, তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করিলে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রভাব উপলব্ধি হয়, বিভিন্ন জনপদে ভারতীয় বণিকগণের উপনিবেশ-সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়।

বৈদেশিক বাণিজ্যে উপনিবেশ-প্রসঙ্গ।

---

* 'ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য' প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'ইণ্ডিয়ান সিপিং' গ্রন্থ (A History of Indian Shipping and Maritime Activity from the Earliest Times by Sj. Radhakumud Mookerji) এবং 'চীনে বাণিজ্য' সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার মহাশয়ের 'ডন্' মাসিকপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উঁহারা উভয়েই অশেষ গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন।

† *Vide* Hunter's *Orissa*, Vol. I.

‡ Col. Sir A. Phayre in the *Journal of the Asiatic Society*, 1873.

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-বিভব।

[বঙ্গদেশের প্রাচীন গৌরব ;—বঙ্গদেশ অপবিত্র নহে,—মনুসংহিতার শ্লোক প্রক্ষিপ্ত ;—সৃষ্টি-প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য কল্পনা,—বঙ্গদেশের প্রাচীনত্বের পরিচয়-প্রসঙ্গে ;—হুয়েন সাং পরিদৃষ্ট সমতট ও রঘুবংশের বর্ণনায় সামঞ্জস্য-সাধন,—সমুদ্রগুপ্ত ও কালিদাস ;—জ্ঞানে, বিদ্যায়, শিল্পে, বাণিজ্যে, শৌর্য্য-বীর্য্যে প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-খ্যাতি ;—বঙ্গের প্রাচীনত্ব-বিষয়ে প্রমাণ-পরম্পরা ,—বাঙ্গালার বাণিজ্য-প্রভাব ;—বাণিজ্য কেন্দ্র বন্দর-সমূহ ;—তাম্রলিপ্ত,—উহার প্রাচীনত্ব ও ঐশ্বর্য্য-বিভব ;—সপ্তগ্রাম,—বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠা,—পূর্ব্ববঙ্গ,—চট্টগ্রাম,—সুবর্ণগ্রাম,—সন্দীপ প্রভৃতি ;—গৌড়, লক্ষ্মণাবতী, নবদ্বীপ প্রভৃতির প্রাচীন গৌরব-স্মৃতি ;—বিভিন্ন-দেশে বাঙ্গালীদের উপনিবেশ ও অধিকার-বিস্তার,—লঙ্ক, সিংহল, বলি প্রভৃতির প্রসঙ্গ ,—চীনের সহিত বাঙ্গালার বাণিজ্য,—বঙ্গদেশের অর্ণবপোত প্রভৃতি ;—বিভিন্ন জনপদে বঙ্গের ধর্ম্মপ্রচারকগণ,—বাঙ্গালীর কৃতিত্ব-পরিচয় ;—বঙ্গদেশ সম্বন্ধে অন্যান্য বিবিধ বক্তব্য।]

সমষ্টিভাবে বিচার করিতে গেলে পুরাবৃত্তে ভারতবর্ষের যেমন গৌরব-গরিমার অবধি নাই, ব্যষ্টিভাবে বিচার করিতে গেলে ভারতবর্ষের অঙ্গীভূত এই বঙ্গদেশেরও তেমনই গৌরব-গরিমার তুলনা নাই। সমষ্টিভাবে বিচার করিতে গেলে ভারতবর্ষের সভ্যতার প্রাচীনত্ব যেমন পৃথিবীর সকল দেশের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, ব্যষ্টিভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বঙ্গদেশকেও তেমনই পৃথিবীর সভ্য-জনপদের আদিভূত বলিয়া বুঝা যায়। এ কথায় এক সম্প্রদায় হয় তো নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন ; বলিবেন,—'বঙ্গদেশ সবে মাত্র সেদিন সাগরগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে ; বঙ্গদেশের আবার প্রাচীনত্বের গৌরব-গরিমার কথা কি আছে ?' তাঁহারা আরও বলিবেন,—'এ একটা অপবিত্র দেশ ; এ দেশে অনার্য্য অসভ্যজাতির বাস ছিল ; এ দেশে আসিতে হইলে প্রায়শ্চিত্ত করার প্রয়োজন হইত ; এ দেশের আবার গৌরব-গরিমার কথা কি আছে ?' কি জানি কি কারণে, না-জানি কাহার কোন্ উদ্দেশ্য-সাধন-ব্যপদেশে, বঙ্গদেশ-সম্বন্ধে এই সকল কাহিনী প্রচারিত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা অনেকেরই প্রাণে বঙ্গদেশের এবম্বিধ কলঙ্ক-কথা বদ্ধমূল হইয়া আছে ! কিন্তু, একটু অনুসন্ধান করিলে, একটু গবেষণা করিয়া দেখিলে, বঙ্গদেশ-সম্বন্ধে এ সকল ভ্রম-ধারণা অনায়াসে দূর হইতে পারে। ভারতবর্ষ যখন সভ্যতার উচ্চ-চূড়ায় সমারূঢ়, জ্ঞান-সূর্য্য যখন ভারতবর্ষের উপর মধ্যাহ্ন-কিরণ বিকীরণ করিতেছিলেন ; এই বঙ্গদেশ তখন সর্ব্ববিষয়েই সমুন্নত ছিল, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র-স্থান-মধ্যে পরিগণিত হইত, পবিত্র-ভূমি পুণ্য-ক্ষেত্র বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারিত ; আর তখন, বিস্তার-বিভবে, বীরত্বের-গৌরবে, বঙ্গের বিজয়কেতন গগন চুম্বন করিত। আপনার জন্মভূমি বলিয়া অযথা গৌরব-খ্যাপন করিতেছি না ; ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের কৃতিত্ব-কাহিনী কীর্ত্তন করিতে গিয়া, যে দুই চারিটী বিষয়ের সন্ধান পাইতেছি, তাহাতেই প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটিত হইবে,—প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-বিভবের পরিচয় পাইব।

বঙ্গদেশের প্রাচীন গৌরব।

অধুনা-প্রচারিত মনুসংহিতায় একটী শ্লোক দৃষ্ট হয়,—"অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র-মগধেষু চ। তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥" অর্থাৎ,—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র, মগধ প্রভৃতি দেশে, তীর্থযাত্রা ভিন্ন অন্য কারণে গমন করিলে, প্রায়শ্চিত্ত করার আবশ্যক হয়। মনুসংহিতার ঐ শ্লোকটী যে প্রক্ষিপ্ত, বঙ্গাদি দেশের প্রতি বিদ্বেষ-বিশিষ্ট কোনও পণ্ডিত কর্তৃক ঐ শ্লোকটী রচিত হইয়া মনুসংহিতার মধ্যে যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, আমরা পুনঃপুনঃ এই কথা বলিয়া আসিতেছি। সহমরণ-সংক্রান্ত ঋগ্বেদের ঋক পরিবর্ত্তিকালে কেমন ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, ঋকের 'অগ্রে' শব্দ কেমন ভাবে 'অগ্নে' রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল,—যথাযোগ্য প্রমাণ-পরম্পরা-সহ আমরা তাহা ইতিপূর্ব্বে সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিয়াছি। * বঙ্গ-দেশাদির অপবিত্রতা-সংক্রান্ত পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটী মনুসংহিতার অঙ্কে কেমন ভাবে কোন্ সময়ে স্থানপ্রাপ্ত লইয়াছে, তাহাও আজ প্রদর্শন করিতেছি। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ মনুসংহিতার যে সকল সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে জর্ম্মণীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডক্টর জুলিয়স জলি কর্তৃক প্রকাশিত সংস্করণ অসংখ্য পাণ্ডুলিপি দৃষ্টে সঙ্কলিত হইয়াছিল। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন-সহরে ঐ গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য, ঐ গ্রন্থে 'অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গেষু' ইত্যাদি শ্লোক নাই। ইহার পর, 'প্রাচ্যের পবিত্র পুস্তক'-সংক্রান্ত গ্রন্থা-বলীতে অধ্যাপক জি বুলার মনুসংহিতার যে সংস্করণ প্রকাশ করেন, তন্মধ্যেও ঐ শ্লোক দৃষ্ট হয় না। রাও সাহেব বিশ্বনাথ নারায়ণ মণ্ডলিক সি-এস-আই মহোদয় ষড়্‌বিধা টীকা-সমন্বিতা যে মনুসংহিতা প্রকাশ করেন, তন্মধ্যেও ঐ শ্লোক নাই। ফলতঃ, নিরপেক্ষ ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রচারিত প্রাচীন কোনও মনুসংহিতার মধ্যে ঐ শ্লোক পাওয়া যায় না। সুতরাং পূর্ব্বের কোনও পুঁথিতে ঐ শ্লোক ছিল না বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। † পরবর্ত্তিকালে কোনও দুরভিসন্ধিপরায়ণ ব্যক্তি কর্ত্তৃক ঐ শ্লোকটী মনুসংহিতার কোনও পুঁথির মধ্যে সংযোজিত হইয়াছিল; এবং সেই পুঁথি, যে কারণেই হউক, অধুনা এ দেশে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে; আর তাই, ঐ শ্লোকের দোহাই দিয়া, অন্যান্য প্রদেশের ঈর্ষাপর জনগণ বঙ্গাদি দেশের অপবিত্রতা-খ্যাপনে উহাদের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। মনুসংহিতায় কখনও ঐ শ্লোক ছিল না এবং থাকাও সম্ভবপর নহে। মহর্ষি মনু আর্য্যাবর্ত্ত পবিত্র-স্থানের যে সীমানা নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন; হিমালয়ের দক্ষিণস্থিত, বিন্ধ্য-পর্ব্বতের উত্তর, পূর্ব্ব-পশ্চিমে সাগর-বেষ্টিত, যে ভূ-খণ্ডকে তিনি আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন; বঙ্গদেশ সে সীমানার বহির্ভূত নহে। যে মনু পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে বঙ্গদেশকে গণ্য করিয়াছেন, তিনিই আবার উহাকে অপবিত্র বলিয়া ঘোষণা করিবেন,—ইহার অধিক বিসদৃশ ভাব আর কি হইতে পারে? অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র, মগধ সর্ব্বত্রই পীঠস্থান

বঙ্গদেশ অপবিত্র নহে।

* 'পৃথিবীর ইতিহাস', ৩য় খণ্ড, দ্বাদশ পরিচ্ছেদে (৪৫৯—৪৬৬ পৃষ্ঠায়) সহমরণ-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

† Compare '*Manav-Dharma-Sastra*' edited by Dr. Julius Jolly Ph. D., English translation of Manu by Prof. G. Buhler in the 'Sacred Books of the East' Series, Vol. XXV, and the edition of Manu published by Rao Saheb Visvanath Narayan Mandlik C. S. I

আছে; ইহাদের অধিকাংশ স্থানের মধ্য দিয়া (অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ প্রভৃতির মধ্য দিয়া) পতিতপাবনী জাহ্নবী প্রবাহিতা; এ সকল স্থান কি কখনও অববিত্র হইতে পারে? ফলতঃ, বঙ্গদেশ কখনই অববিত্র নহে;—এ সম্বন্ধে মনু-বচন প্রক্ষিপ্ত।

বঙ্গদেশের প্রাচীনত্বের পরিচয়—বেদে, আরণ্যকে, সূত্রে, সংহিতায়, রামায়ণে, মহাভারতে এবং পুরাণ-পরম্পরায়—কোথায় নাই? * শাস্ত্র-কথিত সেই প্রাচীনত্বের ধারণায়, অধুনা অনেকেরই কল্পনা পর্য্যুদস্ত। শাস্ত্রোক্তির অনুসরণে, সৃষ্টির কাল-নির্দ্দেশের প্রয়াস পাইলে, অধুনা প্রায়ই হাস্যাস্পদ হইতে হয়। এই পৃথিবী কত কালের?—এই মনুষ্য-সমাজ কত কালের?—এ তত্ত্বের অনুসন্ধানে তাই কত জনের কত মতই দেখিতে পাই! বহুকাল হইতে পাশ্চাত্য-দেশে এ সম্বন্ধে একটা মত চলিয়া আসিতেছিল। খৃষ্ট-জন্মের চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ের ৫ হাজার ৯ শত ২০ বৎসর পূর্ব্বে এই পৃথিবীর সৃষ্টি হয়,—সে মতে ইহাই পরিকল্পিত। আবার আমাদের হিসাবে দেখিতে গেলে, ঐ সময়ের অব্যবহিত পরেই কলির প্রবর্ত্তনা হইয়াছিল বুঝিতে পারি। কোথায় পৃথিবীর সৃষ্টির কথা, আর কোথায় কলির প্রবর্ত্তনা! আকাশ-পাতাল পার্থক্য! সে হিসাবে যখন প্রভাত, এ হিসাবে তখন সন্ধ্যা! আমরাই যেন এতদিন ভুল বুঝিয়া আসিয়াছি! অন্ততঃ পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন জনগণ এতদিন তাহাই মনে করিতেছিলেন। কিন্তু যতই দিন যাইতেছে, ততই তাঁহাদের ধারণা পরিবর্ত্তিত হইতে বসিয়াছে। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানে, মনুষ্যের উৎপত্তি-তত্ত্ব নির্দ্ধারণ-কল্পে মস্তিষ্ক-চালনার ফলে, এখন কত তত্ত্বই প্রকাশ পাইতেছে! পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণেরই কয়েকটী গবেষণার বিষয় উল্লেখ করিতেছি; বিষয়টী তাহাতেই বিশদীকৃত হইতে পারিবে। শতাব্দী পূর্ব্বে 'পাভিল্যাণ্ড কেভ' গহ্বরে † প্রাচীনকালের মনুষ্যের কতকগুলি অস্থি-পঞ্জর পাওয়া যায়। তাহারই কয়েকটি অস্থি দেখিয়া সেগুলিকে একটী স্ত্রীলোকের অস্থি বলিয়া স্থির করা হয়। সেই অস্থিগুলির উপর গিরিমাটীর একটা স্তর পড়িয়া ছিল; আর সেইজন্য সেই অস্থিগুলি সাধারণতঃ 'রেড লেডি অব্ পেভিলাণ্ড' অর্থাৎ পেভিলাণ্ডের রক্তিমবর্ণবিশিষ্টা নারী বলা হইত। যখন ঐ অস্থিগুলি প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তখন উহা যে অতি প্রাচীনকালের মনুষ্যের অস্থি, তাহা নির্দ্ধারিত হয় বটে; কিন্তু কতকাল পূর্ব্বের মনুষ্যের অস্থি, তাহা সঠিক হয় না। 'রয়েল য়্যানথ্রোপলজিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট' সমিতির অধিবেশনে অধ্যাপক সোল্লাস্ সম্প্রতি ঐ অস্থি-পঞ্জরের কাল নির্দ্দেশ করিতেছেন। ‡ অধ্যাপক-প্রবর বলিতেছেন,—'আরিগনাশিয়ান' কালে (Aurignacian age) 'ক্রো-ম্যাগনন্' (Cro-Magnon) জাতীয় লোক ইউরোপের অধিকাংশ বাসযোগ্য ভূমিতে বসতি করিত।

সৃষ্টি-প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য কল্পনা।

* 'পৃথিবীর ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ, ২৩৭ প্রভৃতি পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† "Paviland Cave represents the most westerly outpost of the Cro-Magnon race, which extended to the east as far as Moravia (in Austria) and to the south as far as Mentone (in Italy)".

‡ Lecture of the Royal Anthropological Institute delivered by Prof. W. J. Sollas.

সেই কাল—বর্ত্তমান সময়ের বিংশ-সহস্র বৎসর পূর্ব্বের কাল; অর্থাৎ, যে সময়ে 'গ্লেসিয়াল' (তুষারসমাচ্ছন্ন অবস্থা) অতীত হইয়া 'পোষ্ট-গ্লেসিয়াল' (তুষার-পাতের পরবর্ত্তী অবস্থা) চলিতেছিল, সেই সময়ে এই 'অরিগনাশিয়ান' কাল বিদ্যমান ছিল। * ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের শীতকালে 'পাভিলাণ্ড কেভ' গহ্বরে পুনরনুসন্ধান-ফলে, কতকগুলি অগ্ন্যুৎপাদক যন্ত্র পাওয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে রঁ্যাদা করিবার যন্ত্র, খোদিবার যন্ত্র, ছিদ্র করিবার যন্ত্র প্রভৃতিও আছে। ঐ সকল দ্রব্যের অনেকগুলি 'আরিগনাশিয়ান' কালের বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ঐ গহ্বরে পূর্ব্বোক্ত অস্থি-পঞ্জরের সঙ্গে গজদন্ত-বিনির্ম্মিত কতকগুলি সামগ্রী পাওয়া যায়; সেগুলিও পূর্ব্বোক্ত কালের সামগ্রী। গজদন্ত-নির্ম্মিত সেই সামগ্রীগুলির মধ্যে একটী পদক আছে। ভারতবর্ষে যেরূপ রৌপ্য-বলয় দৃষ্ট হয়, সে পদক সেইভাবে সেই আকারে সংগঠিত। গজদন্তের ছড়ি, লোম পরিষ্কার করিবার উপযোগী যন্ত্র, সূচের ন্যায় বেধক প্রভৃতি আর আর যে সকল সামগ্রী ঐ সঙ্গে পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি 'ম্যামোথ' নামক পুরাকালীন বৃহত্তম জন্তুর দন্ত হইতে ঐ সকল প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত হইতেছে। যাহা হউক, বিংশ-সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, ঐ সকল অস্ত্র-শস্ত্র ও গজদন্ত-বিনির্ম্মিত দ্রব্যাদি প্রস্তুতে পারদর্শী, (সুতরাং সুসভ্য) জনগণ ইউরোপের ঐ অংশে যে বাস করিয়াছিলেন, 'পাভিলাণ্ড কেভের' এই আবিষ্কারে তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। কোথায় খৃষ্ট-জন্মের চারি-সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মনুষ্য-সৃষ্টির কল্পনা, আর কোথায় তাহারও আঠার-সহস্রাধিক বৎসরের পূর্ব্বে, সুসভ্য মনুষ্য-সমাজের অস্তিত্ব! কয়েক বৎসরের মধ্যেই পাশ্চাত্য-দেশের চিন্তার গতি এইরূপভাবে পরিবর্ত্তিত হইতে চলিয়াছে! দৃষ্টান্ত আর একটা উল্লেখ করি। অধ্যাপক কিথ, বিলাতের বিজ্ঞান-সভার বক্তৃতায়, এইরূপ আর এক অভিনব-তত্ত্ব আবিষ্কারের সংবাদ প্রচার করিয়াছেন। কিছুকাল পূর্ব্বে ইংলণ্ডের টেমস্-নদীর গহ্বরে মৃৎ-স্তরের অভ্যন্তরে আর একটী মনুষ্যের অস্থি-পঞ্জর পাওয়া যায়। সেই অস্থি-পঞ্জর যে মনুষ্যের, সে মনুষ্য অনূ্যন ১ লক্ষ ৭০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। অধ্যাপক কিথ বলেন,—'টেমস্-নদী অধুনা যে অবস্থায় অবস্থিত, পূর্ব্বে উহা তদপেক্ষা অনূ্যন প্রায় এক শত ফিট উচ্চ ছিল। কাল-বশে স্তরের পর স্তর অপসৃত হওয়ায়, উহা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। যে অস্থি বহু নিম্ন-স্তরে প্রোথিত ছিল, এখন তাহা বাহির হইয়া পড়িয়াছে।' যাহা হউক, যে কারণেই হউক, টেম্‌স নদী-গর্ভে প্রাপ্ত প্রোক্ত অস্থি-পঞ্জর যে ১ লক্ষ ৭০ হাজার বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তিকালের মনুষ্যের, অধুনা তাহা তারস্বরে ঘোষিত হইতেছে। এবম্বিধ আরও বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যায়। সার চার্লস লায়েল নির্দ্ধারণ করিয়াছেন,—মিসিসিপি নদী এখন যে পথে প্রবাহিত, লক্ষাধিক বৎসর পূর্ব্বে উহা সেই পথে প্রবাহিত হইয়াছে। কতকগুলি মৃৎ-পাত্র, কবর-স্থান এবং বৃক্ষ পরীক্ষা করিয়া, ডক্টর ডাউলার প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ঐ নদীর অধিত্যকা-প্রদেশে অনূ্যন পঞ্চাশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মনুষ্যের বসবাস ছিল। ভূতত্ত্ববিদ্গণ অধুনা যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছেন, তাহাতে গ্লেসিয়াল অর্থাৎ তুষার-পাতের কাল

* গ্লেসিয়াল্ ও পোষ্ট-গ্লেসিয়াল কালের আলোচনা 'পৃথিবীর ইতিহাস', তৃতীয় খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদে ৮৬, ৮৭, ৮৮ প্রভৃতি পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বর্ত্তমান সময়ের ২ লক্ষ ৪০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছিল এবং 'পোষ্ট-গ্লেসিয়াল' বা তুষারপাতের পরবর্ত্তিকাল বর্ত্তমান সময়ের ৮০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রবর্ত্তিত হয়। সুতরাং বুঝিয়া দেখুন, কত ভ্রম-সংস্কার কিরূপে দূরীভূত হইতে চলিয়াছে! বঙ্গদেশ-সম্বন্ধে—বঙ্গদেশ সবেমাত্র সেদিন সাগর-গর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে—অনেকের মনে এইরূপ যে ভ্রম-সংস্কার আছে, একটু অনুশীলন করিলে, তাহা দূরীভূত হইতে পারে। প্রসঙ্গতঃ এতদ্বিষয়ে দুই একটী দৃষ্টান্তের অবতারণা করিতেছি। চীন-পরিব্রাজক হুয়েন-সাংয়ের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে বঙ্গদেশের নামোল্লেখ নাই; পরন্তু, কালিদাসের রঘুবংশে একটী শ্লোকে (চতুর্থ সর্গে) রঘুর দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে যাহা লিখিত আছে, তাহাতে সে সময়ে বঙ্গদেশ বিল-খালে ও বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র-বৃহৎ নদ-নদীতে সমাচ্ছন্ন ছিল এবং বঙ্গের অনেক স্থল বসতি-যোগ্যই হয় নাই,—ইহাই অনেকে অনুমান করিয়া লইতেছেন। আমরা প্রথমে রঘুবংশের শ্লোকটীর এবং তৎসংক্রান্ত দুই একটি কথার আলোচনা করিতেছি; সঙ্গে সঙ্গে চৈন-পরিব্রাজক হুয়েন-সাংয়ের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের প্রসঙ্গও অনুধাবন করিয়া দেখিতেছি। তাহাতেই বুঝা যাইবে—তখনও বঙ্গদেশ কেমনভাবে কিরূপ গৌরব-সম্ভ্রমে প্রতিষ্ঠিত ছিল! বঙ্গদেশের আধুনিকত্ব-সম্বন্ধে রঘুবংশের যে শ্লোকটীর বিষয় প্রধানতঃ উত্থাপিত হয়, সে শ্লোকটী,—

বঙ্গদেশ সম্বন্ধে ভ্রম-ধারণা।

"বঙ্গান্ উৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভং গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু চ॥"

এই শ্লোকের অর্থে উপলব্ধি হয়,—'বঙ্গদেশ নৌযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; বীরবর রঘু সে যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাভূত করেন। বঙ্গদেশ রঘুর নিকট পরাজিত হইলে, গঙ্গা-প্রবাহের অন্তর্বর্ত্তী নগরে রঘু আপন জয়স্তম্ভ প্রোথিত করেন।' ইহা ভিন্ন, ঐ শ্লোকের কোথাও এমন কোনও বাক্য নাই,—যাহাতে বঙ্গদেশ বাসের অযোগ্য কেবলমাত্র খাল-বিল-পূর্ণ স্থান বলিয়া বুঝা যাইতেছে। যে রামায়ণ মহাকাব্যের অনুসরণে রঘুবংশ বিরচিত, সেই রামায়ণ মহাকাব্যে যখন বঙ্গরাজ্যের নামোল্লেখ আছে, তখন মহাকবি কালিদাসের কাব্য-রচনার বহুপূর্ব্বে বঙ্গদেশ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে বঙ্গদেশের নৃপতি আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ইহাতেও কালিদাসের রঘুবংশ কাব্য প্রণয়নের বহু পূর্ব্বে বঙ্গদেশের সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। তবে কি কারণে বঙ্গদেশ সম্বন্ধে (বঙ্গদেশ বাসের অযোগ্য ছিল এইরূপ) সংশয়-প্রশ্ন উত্থাপিত হয়? রঘুবংশের শ্লোকে নৌযুদ্ধের বর্ণনা এবং গঙ্গা-প্রবাহের অন্তর্বর্ত্তী নগরে জয়স্তম্ভ প্রোথিত-করণ,—এই দুই বিষয়ের উল্লেখ-দৃষ্টেই বঙ্গদেশ বাসের অযোগ্য ছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়া যায়! হুয়েন-সাংয়ের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে বঙ্গের নাম নাই, আবার কালিদাসের বর্ণনায় বঙ্গের ঐরূপ অবস্থার বিষয় বর্ণিত রহিয়াছে,—যুগপৎ এই দুই চিন্তাপ্রবাহ মস্তিষ্কে প্রবাহিত হওয়ায় সাধারণতঃ বঙ্গদেশ-সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়। সুতরাং শ্লোকে কালিদাস বঙ্গের কোন্ অংশের বা কোন্ রাজধানীর বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন এবং হুয়েন-সাং আপন ভ্রমণ-বৃত্তান্ত-মধ্যে কেনই বা বঙ্গের নামোল্লেখ করেন নাই,—এই দুই তথ্য নিষ্কাষণ করিতে পারিলেই

সকল তত্ত্ব অধিগত হইতে পারিবে। আমরা মনে করি,—শ্লোকে কালিদাস নবদ্বীপ রাজধানীর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। অধুনা প্রতিপন্ন হইতেছে, বিক্রমাদিত্য-অভিধেয় দ্বিতীয় সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে, খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে, মহাকবি কালিদাস আবির্ভূত হন। * সঙ্গে সঙ্গে আরও সপ্রমাণ হয়,—'এই বঙ্গদেশান্তর্গত নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী পল্লী-বিশেষেই মহাকবির জন্মভূমি ছিল; আর বিক্রমাদিত্য-অভিধেয় দ্বিতীয় সমুদ্রগুপ্ত এই বঙ্গদেশেই রাজত্ব করিতেন।' নবদ্বীপের সন্নিকটে ক্রোশাধিক ব্যবধান-মধ্যে সমুদ্রগড় নামে একটী গ্রাম আছে। প্রতিপন্ন হয়, সেই সমুদ্রগড় সমুদ্রগুপ্তের গড় ছিল। † কালিদাস—

মহাকবি কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন।

ভারতের গৌরব কালিদাস—সেই রাজধানীর সান্নিধ্যে বসবাস করিতেন এবং রাজার আশ্রয়-তরুমূলে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার কাব্যে নিত্য-পরিদৃষ্ট সেই রাজধানীর চিত্রই প্রতিভাত হইয়াছিল। বাল্মীকির রামায়ণে বঙ্গের কোনও রাজধানীর বর্ণনা নাই। কালিদাস যে রাজধানী প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহারই ছবি তাঁহার তুলিকায় অঙ্কিত হইয়া আছে। রাজধানীর চতুর্দ্দিকে গঙ্গা প্রবহমানা, রাজধানী গঙ্গাপ্রবাহান্তর্বর্ত্তী বলিয়া 'দ্বীপ'-বিশেষণে বিশেষিত; সুতরাং রাজধানী-রক্ষার জন্য নৌ-বলেরই আবশ্যক হইয়াছিল। এই চিত্র হৃদয়ে উদ্ভাসিত হওয়ায় কাব্যে কালিদাস তাহাই অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। কাব্যে এই চিত্র প্রকটিত দেখিয়া, নৌ-বলে রাজধানী রক্ষার চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়া, সমগ্র বঙ্গদেশ জলময় বা সমুদ্র-গর্ভে নিমজ্জিত ছিল বলিতে হইবে কি? পরিব্রাজক হুয়েন-সাংয়ের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের বিষয়ও একটু অভিনিবেশ-সহকারে আলোচনা করিলে, বঙ্গদেশের তাৎকালিক রাজধানীর ঐরূপ আভাসই পাওয়া যায়। হুয়েন-সাং বঙ্গদেশের নামোল্লেখ করেন নাই; তাহাতেই কি বঙ্গদেশের অস্তিত্বাভাব প্রমাণিত হয়? সে কথা যদি কেহ বলেন,

বঙ্গদেশ-সম্বন্ধে হুয়েন-সাং।

তাহা হইলে ভারতবর্ষের এবং ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেরই অনস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়। হুয়েন-সাং যখন যে নগরে উপনীত হইয়াছেন, সেই নগরের নামোল্লেখ ও বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি কোনও দেশের বা প্রদেশের পরিচয় তো দেন নাই! সুতরাং তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে বঙ্গদেশের নাম নাই বলিয়া বিস্মিত হইবার কোনই কারণ নাই। তিনি ভিন্ন ভিন্ন জনপদের প্রধান প্রধান

* স্বর্গীয় প্রাসিদ্ধ পণ্ডিত ডক্টর টি. ব্লক এবং কাশীর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামাবতার শর্ম্মা সাহিত্যাচার্য্য উভয়ে বিভিন্ন পথে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া মহাকবি কালিদাসের কাল-নির্ণয়-সম্বন্ধে ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। বহুভাষাবিৎ হরিনাথ দে মহাশয় ঐ সিদ্ধান্তই ব্যক্ত করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,—"The date of Kalidasa has been at last conclusively settled by industry of two eminent scholars :—Dr. T. Bloch and Pundit Ramabatar Sarma Sahityacharya, the results of whose researches carried on independently of each other, happily agrees in almost every detail. They have succeeded in satisfactorily proving from evidence both internal and external that the author of Raghubansa and Kumarsambhaba flourished during the reign of Samudra Gupta II Vikramaditya and that of his son Kumar Gupta."

† এ বিষয় 'সাহিত্য-সংবাদ' মাসিক পত্রে (১৩২০ সালের) আলোচনা দ্রষ্টব্য।

নগরে উপস্থিত হইয়া সেই সেই নগরের বিষয়ই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তোল্লিখিত কয়েকটী নগরের নাম উল্লেখ করিতেছি। যথা,—'পু-লু-শা-পু-লু', 'পো-লো-নি-সি', 'অ-যু-তো', 'চেন-পো', 'তো-মো-লি-তি', 'কি-লো-না-সু-ফা-লা-না', 'পুন্-না-ফা-তান্-না,' 'সান্-মো-তা-চা' ইত্যাদি। * ঐ সকল নাম যথাক্রমে পেশোয়ার, বারাণসী, অযোধ্যা, চম্পা, তমলুক, কর্ণসুবর্ণ, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন (পুণ্ড্রবর্দ্ধন), সমতট প্রভৃতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কি উচ্চারণে কি নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা অনুধাবন করিতে গভীর গবেষণা আবশ্যক হয় না কি? সে গবেষণা-সত্ত্বেও ঐ সকল নামের স্থান-নির্দ্দেশে আজিও কত মতান্তর রহিয়া গিয়াছে। হুয়েন-সাং কথিত 'পুন্-না-ফা-তান্-না' হইতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নামের সূচনা করিয়া লইয়া, কেহ কহিতেছেন—ঐ নাম বর্ত্তমান পাবনা-জেলাকে বুঝাইত, কেহ কহিতেছেন—হুয়েন-সাংয়ের উচ্চারণে পাণ্ডুয়া নাম ঐ রূপ পরিগ্রহ করিয়া আছে। কর্ণসুবর্ণ নামেও বিভিন্ন জনপদ চিহ্নিত হইয়া থাকে। মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র এক সময়ে কুসুমপুর (পুষ্পপুর) আখ্যা লাভ করিয়াছিল। সে নামের অনুসরণে বিচার করিতে গেলে, হুয়েন-সাং কথিত 'পু-লু-শা-পু-লু' পাটলিপুত্র বলিয়া পরিচিত হইতে পারে। যাহা হউক, ঐ সকল নাম দেখিয়া, তিনি যে প্রধানতঃ এক একটী নগরের বিষয়ই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা বেশ বুঝা যায়। আর, তাহা বুঝিতে পারিলে, বঙ্গদেশের তাৎকালীন প্রধান প্রধান নগরের মাত্র পরিচয় দিয়াই তিনি নিরস্ত হইয়াছেন—উপলব্ধি হয়। বঙ্গদেশান্তর্গত যে কয়টী নগরের নাম তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কর্ণসুবর্ণ, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, তাম্রলিপ্ত, সমতট প্রভৃতির কোনটীরই স্থান-নির্দ্দেশ অবিসম্বাদিত-রূপে হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। হুয়েন-সাংয়ের কথিত 'তো-মো-লি-তি' তাম্রলিপ্তকে বুঝাইত এবং তাম্রলিপ্তই বর্ত্তমানকালে তমলুক নাম গ্রহণ করিয়াছে—এ বিষয়ে তাদৃশ মতান্তর না থাকিতে পারে; কিন্তু অপর তিনটী সম্বন্ধে, বিশেষতঃ সমতট সম্বন্ধে, সম্পূর্ণ মতান্তর আছে। হুয়েন-সাংয়ের যে উচ্চারণ হইতে সমতট নাম নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, সে উচ্চারণে সমতট নাম হয় কিনা—তাহাই সন্দেহ। তাহার পর, সমতটের স্থান-নির্দ্দেশে, কেহ যশোহরকে, কেহ বা ফরিদপুরকে, কেহ বা ঢাকাকে লক্ষ্য করিতেছেন। † এখানেও মতান্তর। আমরা বলি, কি উচ্চারণ, কি স্থান-নির্দ্দেশ—সকলই প্রমাদসঙ্কুল।

* চীনাভাষার উচ্চারণের অনুসরণে ইংরাজী ভাষায় বিভিন্ন লেখক ঐ সকল স্থানের বিভিন্নরূপ উচ্চারণ কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের বর্ণবিন্যাস অনুসারে বঙ্গভাষায় উচ্চারণ করিতে গেলে, সে উচ্চারণেও নানা মতান্তর ঘটে। যথা:—'পুন্-না-ফা-তান্-না', বা 'পু-ন-ফ-তন-ন; 'কি-লো-না-সু-ফা-লা-না' বা 'কি-লো-নো-সু-কা-ল-ন' ইত্যাদি।

† চীনদেশীয় অন্যতম পরিব্রাজক ইৎ-সিং সমতট পূর্ব্ব-ভারতে অবস্থিত এইমাত্র বলিয়া যান। কনিংহাম বর্ত্তমান যশোহরকে সমতট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন,—"The delta of the Ganges and its chief city which occupied the sight of the modern Jessore &c." —*vide* Maj.-Gn. Alexander Cunningham, *Ancient Geograply of India*, ফাও'সান সমতটকে ঢাকা জেলা এবং ওয়াটার্স ফরিদপুর জেলার পূর্ব্বভাগ বলিয়া অনুমান করেন। রমেশচন্দ্র দত্ত-মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গ বলিয়া (Eastern Bengal was *Samatata*) অভিহিত করিয়া গিয়াছেন।

বঙ্গদেশে সমতট নামে কোন প্রসিদ্ধ জনপদ বিদ্যমান থাকার অন্য কোনই প্রমাণ নাই। এক হুয়েন-সাংয়ের বিকৃত উচ্চারণ, আর সেই উচ্চারণের অনুসরণে একটা নাম ও স্থান কল্পনা করিয়া লওয়া!—ইহা ভিন্ন অন্য কোনই নিদর্শন দেখি না। ইহাতেই বিষম গণ্ডগোল ঘটিয়াছে। শুধু কি স্থানের নামে এই গণ্ডগোল! উচ্চারণের গণ্ডগোলে হুয়েন-সাংয়ের নিজের নামে পর্য্যন্ত গণ্ডগোল বাধিতেছে! পরিব্রাজকের নিজের নাম যে কি ছিল, একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে গেলে, তাহাতেও নানা সংশয় ঘটে। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ কত জন কত প্রকারেই ঐ নামের উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন! তাঁহাদের বর্ণবিন্যাস-ভঙ্গী দেখিয়া, প্রকৃত নাম নির্দ্ধারণ করা বড়ই দুরূহ। * এইজন্য অধুনা বঙ্গভাষায়ও ঐ নামের নানা মূর্ত্তি দেখিতে পাই। বাঙ্গালায় কেহ লেখেন—হুয়েন-সাং, কেহ লেখেন—হিউ-যেন-সিয়াং, কেহ লেখেন—হিয়েন্থ-সাং, কেহ লেখেন—অন-উয়ন-চুয়ন, কেহ লেখেন—ইউয়ান্-চুযাং ইত্যাদি। হুয়েন-সাংয়ের বর্ণিত অন্যান্য প্রায় সকল স্থানেরই নামের আদ্যাক্ষর মিলাইয়া একটা কিনারা পাওয়া যায় এবং সে নামের সে নগরের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়। কিন্তু সমতট অভিধেয় কোনও জনপদের অস্তিত্বই আমরা অনুসন্ধান করিয়া পাই না। আমাদের তাই মনে হয়, হুয়েন-সাংয়ের উচ্চারণ হইতে সমতট নাম স্থির না করিয়া, অন্য স্থানের অনুসন্ধান করা শ্রেয়স্কর। এ প্রসঙ্গে আমরা সমতট নাম এবং সমতটের স্থান-নির্দ্দেশ একেবারে উল্টাইয়া দিতে চাই। আমরা বলি,—নবদ্বীপের সন্নিকটে ক্রোশাধিক ব্যবধান-মধ্যে সমুদ্রগড় নামে যে প্রাচীন পল্লী দৃষ্ট হয়, হুয়েন-সাং-কথিত এবং তত্ত্ববিদ্‌গণের কল্পিত সমতটের উহাই শেষ-নিদর্শন। সমুদ্রগড় বিক্রমাদিত্য-অভিধেয় দ্বিতীয় সমুদ্রগুপ্তের রাজধানী ছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে দ্বিতীয় সমুদ্রগুপ্তের বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন হয়। পণ্ডিতগণের গবেষণা-প্রভাবে যখন সপ্রমাণ হইতেছে—মহাকবি কালিদাস দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য-অভিধেয় রাজচক্রবর্ত্তী সমুদ্রগুপ্তের সভাসদ্ ছিলেন, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে যখন প্রমাণ হয়—বঙ্গদেশান্তর্গত সমুদ্রগড় সেই সমুদ্রগুপ্তের রাজধানী ছিল, অপিচ, কালিদাসের রঘুবংশের বর্ণনায় যখন ঐ অঞ্চলের চিত্রই প্রকটিত হইতেছে বুঝিতে পারি; তখন সমতট অভিধেয় নগরের স্থান-নির্দ্দেশে আর সংশয় থাকিতে পারে না। নবদ্বীপ রাজধানী ছিল; নবদ্বীপের অনতিদূরস্থ সমুদ্রগড় রাজার গড় বা কেল্লা ছিল; সেই রাজধানী বা সেই গড় অধিকার করিতে হইলে, জলযুদ্ধেরই প্রয়োজন হয়;—কবির তুলিকায় রঘুর দিগ্বিজয়-বর্ণনার কল্পনায় সেই ভাবেরই বিকাশ পাইয়াছে। তাহা হইলে, হুয়েন-সাংয়ের

সমতট কোথায়?

---

* পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কে কিরূপ বর্ণ-বিন্যাসে পরিব্রাজকের নামের উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কয়েকটী উদাহরণ দেখুন:—

পরিব্রাজকের নাম।	উচ্চারণকারী।	পরিব্রাজকের নাম।	উচ্চারণকারী।
Hiuen Tsang.	V. A. Smith.	Hiouen Thsang.	Julien and Wade.
Hwen Thsang.	A Cunningham.	Huan Chwang.	Mayers.
Yuan Chwang.	Rhys Davids.	On-Yuan-Chwang.	Watters.
Hsuan Chwang.	Legge.	Yuen Chwang.	Wylie.
Hiuen Tsieng.	Beal.	Hhüen Kwan.	Nanjio.

পরিদৃষ্ট বঙ্গরাজ্যান্তর্গত 'সান-মো-তা-চা' রূপে উচ্চারিত এবং আধুনিক পণ্ডিতগণের গবেষণা-প্রভাবে 'সামাতাতা' বা সামাটাটা' (Samatata) বা 'সমতট' অভিধেয় নগর—সমুদ্রগড় বলিয়া মনে হয় না কি? আমরা তো তাহাই সিদ্ধান্ত করি। এরূপ সিদ্ধান্তের আরও কয়েকটি বিশিষ্ট কারণ আছে। হুয়েন-সাং যে যে স্থান হইতে যে যে স্থানে গমন করিয়াছিলেন, তাহাদের পরস্পরের ব্যবধানের বা দূরত্বের বিষয় অনুধাবন করিলেও ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। দূরত্বের পরিচয়ে এবং দিঙ্-নির্ণয়-বিষয়ে হুয়েন-সাংয়ের বর্ণনায় (অন্ততঃ তাঁহার গ্রন্থের অনুবাদে) অনেক ভ্রম-প্রমাদ দৃষ্ট হয়। কিন্তু, তাহা হইলেও, মোটামুটী দেখিতে গেলে, তিনি যেস্থান হইতে যাত্রা করিয়া 'সমতটে' বা 'সমুদ্রগড়ে' আসেন এবং সেখান হইতে যাত্রা করিয়া যেস্থানে গমন করেন, তাহার দূরত্বাদির বিষয় অনুধাবন করিলে, আমাদের সিদ্ধান্তে কোনও সংশয় থাকিতে পারে না। কামরূপ রাজ্য হইতে 'সমতট' নগরের ব্যবধান, হুয়েন-সাংয়ের মতে, বার শত হইতে তের শত 'লি' অর্থাৎ প্রায় সওয়া দুই শত মাইল। তখন কামরূপ-রাজ্যের সীমানা যে পর্য্যন্ত ছিল, সেই সীমানা হইতে সমুদ্রগড়ের দূরত্ব এইরূপই হইতে পারে। তাহার পর, সমুদ্রগড় হইতে তাম্রলিপ্তের দূরত্ব অনুধাবন করুন। পরিব্রাজকের বর্ণনায় ঐ দূরত্ব নয় শত 'লি' বা প্রায় দেড় শত মাইল। সমুদগড় হইতে, জলপথেই হউক বা স্থলপথেই হউক, প্রাচীন তাম্রলিপ্ত নগরীর দূরত্ব ঐরূপ হওয়াই সম্ভবপর। পরিব্রাজক কোন্ পথে কোথায় গিয়াছিলেন, তাহার ঠিক নিদর্শন নাই। সুতরাং দূরত্বের সম্বন্ধে অনেকটা অনুমানের উপরই তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইয়াছিল। এ অবস্থায়ও তাঁহার বর্ণিত 'সান্-মো-তা-চা' নগরের সহিত সমুদ্রগড়ের যে সাদৃশ্য দেখা যায়, তাহা নিশ্চয়ই বিবেচনার বিষয়। তবে এখানে আর দু'একটী সংশয়-প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। প্রথম প্রশ্ন,—যদি সমুদ্রগড়ই পরিব্রাজক-বর্ণিত বঙ্গের অন্যতম প্রধান নগর হয়, তাহা হইলে তাঁহার পরিদৃষ্ট 'সঙ্ঘারাম' প্রভৃতির নিদর্শন কৈ? দ্বিতীয়তঃ—হুয়েন-সাংয়ের বর্ণিত নগরে অর্ণবপোতাদির গতিবিধি ছিল; সে লক্ষণই বা সমুদ্রগড়ে এখন কি অবশিষ্ট রহিয়াছে? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে, নবদ্বীপের ও সমুদ্রগড়ের পূর্ব্ব-পারস্থিত 'সুবর্ণবিহার' পল্লীর ধ্বংসাবশেষের প্রতি লক্ষ্য করিতে পারি। ঐ পল্লীতে এক সময়ে যে বৌদ্ধগণের 'সঙ্ঘারাম'-সমূহ বিদ্যমান ছিল, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ পল্লীতে এখনও অনেক ভগ্ন-অট্টালিকার স্তূপ দৃষ্ট হয়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষগণ ঐ স্থান হইতে অনেক প্রস্তর ও ইষ্টক সংগ্রহ করিয়া লইয়া অট্টালিকা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। কৃষ্ণনগর রাজবংশের ইতিহাসে—ক্ষিতীশ-বংশাবলীচরিতে—এ বিষয় লিখিত আছে। নবদ্বীপ, সমুদ্রগড় যখন সমধিক শ্রীসম্পন্ন ছিল, তখন ভাগীরথীর উভয় তীরে পারিপার্শ্বিক স্থান-সমূহে বহু দূর পর্য্যন্ত রাজধানীর পরিসর বিস্তৃত থাকাই সপ্রমাণ হয়। যে কোনও রাজধানীর বা প্রধান নগরের পরিসরের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলেই এ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। দিল্লী যখনই রাজধানী হয়, উহার বিস্তৃতি তখনই আট দশ ক্রোশের কম হয় নাই। মুর্শিদাবাদ যখন রাজধানী ছিল, উত্তর-দক্ষিণে পাঁচ ছয় ক্রোশ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। বর্ত্তমান কলিকাতার আকৃতি-পরিসর প্রভৃতির বিষয়

পর্য্যালোচনা করিলেও উহাই বুঝিতে পারি। বৌদ্ধনিবাস সুবর্ণবিহার এ হিসাবে রাজধানীর অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। পরিব্রাজকের বর্ণনায় তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। কেহ হয় তো জিজ্ঞাসা করিতে পারেন,—বিহার-প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ 'সঙ্ঘারাম'-সমূহের স্মৃতি যেরূপ উজ্জ্বল রহিয়াছে, নবদ্বীপের সন্নিকটে উহা সেরূপ উজ্জ্বল নহে কেন? তাহার উত্তর—বৌদ্ধধর্ম্মের উপর যখন ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হয়, স্মার্ত্ত রঘুনন্দনাদির আবির্ভাবে যখন শ্রুতি-স্মৃতির বিজয়-পতাকা পুনরুড্ডীন হইতে থাকে, বৌদ্ধদিগের 'সঙ্ঘারাম'-সমূহ তখন আপনা-আপনিই উৎখাত হইয়াছিল। বিহার-প্রদেশে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের সে প্রভাব অনেক কাল পর্য্যন্ত সে ভাবে বিস্তৃত হইতে পারে নাই, তাই ঐ প্রদেশে এখনও ভগ্নস্তূপ-সমূহ এতাদৃশ লোপপ্রাপ্ত হয় নাই। ধর্ম্মবিপ্লবের অভিঘাতে এইরূপ পরিবর্ত্তনই ঘটিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন, বঙ্গের উপর দিয়া অনেক প্রাকৃতিক বিপ্লবও চলিয়া গিয়াছে। ভূকম্পনে বাঙ্গালার বহু স্থাপত্য-নিদর্শন ভূতলশায়ী হয়; জলপ্লাবনেও বাঙ্গালার বহু প্রাচীন নগর ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া যায়। নবদ্বীপ এবং গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী—রাজচক্রবর্ত্তী লক্ষ্মণ-সেনের রাজধানী ছিল। তখন, ঐ দুই রাজধানীর সমৃদ্ধির অবধি ছিল না। কিন্তু এখন সে সমৃদ্ধির চিহ্নমাত্রও অনুসন্ধান করিয়া মিলিতেছে না। অথচ, উহার কত পূর্ব্ববর্ত্তি-কালের রাজধানী মগধে বা বিহারে আজিও প্রাচীন স্মৃতি-চিহ্নের সন্ধান মিলিতেছে। সুন্দরবন-প্রদেশে ভূগর্ভ-প্রোথিত কত অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ অধুনা আবিষ্কৃত হইতেছে; সেদিনের প্রতাপাদিত্য প্রভৃতির রাজধানীর চিহ্ন এখনই লোপ পাইতে বসিয়াছে। বঙ্গের উপর বিধাতার নিগ্রহই এই বিবর্ত্তনের প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয় না কি? দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে—বলিতে পারি, নবদ্বীপে ও সমুদ্রগড়ে অর্ণবপোতাদির গতিবিধির তখনও কোনও বিঘ্ন ঘটে নাই। ভাগীরথী দিন দিন ক্ষীণাঙ্গী হইয়া আসিতেছেন। বিশ বৎসর পূর্ব্বে গঙ্গার যে প্রভাব ছিল, এখন আর সে প্রভাব নাই। প্রধানতঃ কৃত্রিম উপায়ে জলপ্রবাহের গতি ভিন্নমুখী হইয়াছে বলিয়া, কতকটা বা স্বাভাবিক পলি জমিয়া, ভাগীরথীর মোহানা এখন অবরুদ্ধ। সুতরাং এখন আর ভাগীরথীর পূর্ব্বের স্রোত নাই, পূর্ব্বের গভীরতা নাই, পূর্ব্বের বিস্তৃতি নাই। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে ও ষোড়শ শতাব্দীতে, পর্ত্তুগীজগণ, দিনেমারগণ, ফরাসীগণ ও ইংরাজগণ এই গঙ্গাগর্ভে যে সকল বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবপোত পরিচালনা করিয়াছিলেন,—পাশ্চাত্য-জাতির ইতিহাসে তদ্বিবরণ লিখিত আছে বলিয়াই তৎসমুদায় বিশ্বাস করিতে হইতেছে; নচেৎ, সে সকল বিবরণও এখন কল্পিত-কাহিনী বলিয়া প্রতীত হইত। দৃষ্টান্তস্থলে সপ্তগ্রামের বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করি। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সপ্তগ্রামে বৃহদাকার অর্ণবপোত-সমূহ গতিবিধি করিত। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী—তিনের সম্মিলনে ত্রিবেণী তখন কি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিই ধারণ করিয়া ছিল! সে সাক্ষ্য পাশ্চাত্য-জাতিরাই আজিও তারস্বরে প্রদান করিতেছেন। কিন্তু কোথায় সে সপ্তগ্রাম, আর কোথায় সে ত্রিবেণীর ত্রিধারা! গঙ্গা এখন ক্ষীণা ও শীর্ণা। যমুনার অস্তিত্ব সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। সরস্বতী এখন একটী রেখামাত্রে পর্য্যবসিতা। কয়েক শত বৎসরের মধ্যেই এই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। এ হিসাবে,

সপ্তম শতাব্দীর হুয়েন-সাং যে সমুদ্রগড়ের সন্নিকটে অর্ণবপোতের গতিবিধি লক্ষ্য করিবেন, তাহা আর বিচিত্র কি? সমুদ্রগুপ্তের সময়ে চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে যে রাজধানী সমৃদ্ধিশালিনী ছিল, দুই শত বৎসর পরে, সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে, হুয়েন-সাং সেই রাজধানীই দর্শন করিয়াছিলেন। এ সিদ্ধান্ত ভিন্ন অন্যরূপ সিদ্ধান্তে কখনই আস্থা-স্থাপন করা যায় না। তবেই বুঝা যায়, 'সান্-মো-তা-চা' বা 'সমতট' সমুদ্রগড় ভিন্ন অন্য স্থান নহে; সমুদ্রগড় সমুদ্রগুপ্তের রাজধানী ছিল; বিক্রমাদিত্য অভিধেয় সমুদ্রগুপ্তের আশ্রয় পাইয়া কালিদাস প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিলেন। এতৎ-প্রসঙ্গে আরও বুঝিতে পারা যায়, হুয়েন-সাংয়ের ভারতবর্ষে আগমন-সময়ে বঙ্গদেশের যে অস্তিত্ব ছিল না, তাহা নহে; পরন্তু বঙ্গদেশ তখন সমধিক সমৃদ্ধি-সম্পন্নই ছিল। বঙ্গদেশের তাৎকালীন বিভিন্ন নগরের বিষয় আলোচনা করিলেই হুয়েন-সাং-পরিদৃষ্ট বঙ্গদেশের প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। হুয়েন-সাং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ পরিভ্রমণ করেন। কিন্তু প্রায় কোনও প্রদেশেই তিনি একাধিক সমৃদ্ধি-সম্পন্ন নগর দেখেন নাই। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত মধ্যে বঙ্গের এবং বিহারের একাধিক প্রসিদ্ধ স্থানের নাম দেখিতে পাই। তাঁহার পরিদৃষ্ট অন্য প্রদেশে সেরূপ প্রসিদ্ধ স্থান বিরল ছিল বলিয়াই বোধ হয়। বিহার এবং উড়িষ্যা-প্রদেশ পূর্ব্বে এবং পরে অনেক দিন পর্য্যন্ত বঙ্গরাজ্যেরই সীমানান্তর্ভুক্ত ছিল। বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা আসাম প্রভৃতিকে বহুকাল হইতে বঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রাখিয়াছিলেন। সে হিসাবে, বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা প্রভৃতির গৌরব-কাহিনী এক বঙ্গের নামেই কীর্ত্তিত হইলেও দোষ হয় না। কিন্তু বঙ্গের ততদূর পরিসর স্বীকার করিতে যদি সঙ্কোচ বোধ হয়, অধুনা বঙ্গের যে সীমানা প্রাপ্ত হই, তাহার মধ্যেই হুয়েন-সাং কতগুলি সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগর দর্শন করিয়াছিলেন, বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি! তিনি দেখিয়াছিলেন—'চেন-ফো' বা 'চেন-পো'। ঐ নগরের তখন কি ঐশ্বর্য্য-বিভবই ছিল! প্রাচীন চম্পা-নগর হুয়েন-সাংয়ের উচ্চারণে 'চেন-ফো' নাম পরিগ্রহ করে। চম্পা-নগর এখন ভাগলপুরের সন্নিকটে চিহ্নিত হয়। তবেই বুঝুন,—এ নগর বাঙ্গালার নগর কি না। হুয়েন-সাং আর এক যে নগর দেখেন, সে নগরের নাম 'পান্-না-ফা-তান্-না'। ঐ নগর অধুনা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বলিয়া অভিহিত হয়। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন—প্রাচীন পাণ্ডুয়াই হউক, আর পাবনাই হউক, উহা যে বঙ্গের নগর, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তৃতীয়তঃ, হুয়েন-সাং পরিদৃষ্ট একটী নগরের নাম—'কি-লো-না-সু-ফা-লা-না'। প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ হুয়েন-সাংয়ের নিকট ঐ নামে অভিহিত হইয়াছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কর্ণসুবর্ণ কোন্ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত? কর্ণসুবর্ণ যে বঙ্গেরই একটি প্রাচীন নগর, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। চতুর্থতঃ, হুয়েন-সাং কথিত—'তো-মো-লি-তি'। 'তো-মো-লি-তি'—তাম্রলিপ্ত বা তমলুক বলিয়াই কীর্ত্তিত হয়। ঐ নগর যে বঙ্গেরই নগর, সে কথা বলাই বাহুল্য মাত্র। হুয়েন-সাং দেখিয়াছিলেন,—'কামলঙ্কা।' উহা 'কুমিল্লা' বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। হুয়েন-সাং দেখিয়াছিলেন—'কামরূপ' রাজ্য। ময়মনসিংহের পূর্ব্বভাগ পর্য্যন্ত (শ্রীহট্ট, কাছাড় প্রভৃতি) ঐ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত

সমতটই সমুদ্রগড়।

ছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। উহা কি বঙ্গদেশ নহে? তিনি দেখিয়াছিলেন—'চি-লিৎ-সা-তা-লো'। উহা শ্রীক্ষেত্র বলিয়া অনুমিত হয়। শ্রীক্ষেত্র তখন বঙ্গেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিহারের কথা ছাড়িয়া দিই; এক বঙ্গদেশের সীমানার মধ্যেই হুয়েন-সাং এতগুলি সমৃদ্ধ-সম্পন্ন নগর দেখিয়াছিলেন। যে প্রদেশে এতগুলি সুপ্রতিষ্ঠ নগর বিদ্যমান ছিল, যাঁহারা সে প্রদেশের অনস্তিত্ব প্রমাণ করিতে প্রয়াস পান, তাঁহারা যে কতদূর ভ্রান্তবুদ্ধি-পরিচালিত, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। ফলতঃ,হুয়েন-সাংয়ের ভারত-আগমন-সময়ে বঙ্গদেশ ছিল—সমৃদ্ধি-সম্পন্ন নগর-জনপদাদি-বিভূষিত বঙ্গদেশ ছিল, এ বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় থাকিতে পারে না; এবং তাঁহার বর্ণনাতেই এ বিষয় প্রতিপন্ন হয়। *

শিল্পে-বাণিজ্যে, শৌর্য্যে-বীর্য্যে প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-খ্যাতি।

বঙ্গের প্রাচীনত্বের পরিচয় কি আর কহিব? বেদে বঙ্গের নাম আছে; সংহিতায়, পুরাণে, রামায়ণে, মহাভারতে বঙ্গের উল্লেখ আছে; হুয়েন-সাংয়ের বর্ণনায় বঙ্গের নিদর্শন অব্যাহত দেখিলাম; বঙ্গের বর্ণনায় মহাকবি কালিদাস প্রকারান্তরে উহার প্রতিষ্ঠাই খ্যাপন করিয়া গিয়াছেন বুঝিলাম; এ সকল সত্ত্বেও বঙ্গের প্রাচীনত্বে কে সংশয় করিতে পারে? ফলতঃ, বঙ্গদেশ কখনই বাসের অযোগ্য ছিল না;—অতি প্রাচীনকালেও বঙ্গের গৌরব-বিভায় পৃথিবী পুলকিত হইয়াছিল।

প্রাচীনত্বের প্রমাণ পরম্পরা।

প্রাচীন বঙ্গের শিল্পকলার যদি অনুসন্ধান লই, কি দেখিতে পাই? পাশ্চাত্য-জাতির মতে মিসরের সভ্যতা সকল দেশের সকল সভ্যতার আদিভূত। কিন্তু সেই প্রাচীন মিসরে ভারতের শিল্প কিরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। প্রাচীন মিসরে মৃতদেহ রক্ষার ('মামির'—mummy) যে প্রথা † প্রচলিত ছিল, তাহাতে দেখিতে পাই, তত্রত্য ধনবানগণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উৎকৃষ্ট শিল্প-সম্পৎ বস্ত্রাদিতে সেই দেহ আবৃত করিতেন। মিসরের কয়েকটি কবরে ইতিপূর্ব্বে কতকগুলি সেই 'মামি' করা মৃতদেহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে কবরে ঐ সকল দেহ রক্ষিত ছিল, মিসরীয় রাজগণের অষ্টাদশ বংশের সম-সময়ে সেই কবর প্রতিষ্ঠিত হয়। খৃষ্ট জন্মের ১৪৬২ বৎসর পূর্ব্বে মিসরীয় অষ্টাদশ রাজ-বংশের পরিসমাপ্তি। কবরে যে সকল মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল, সেগুলির অধিকাংশই 'মসলিন' বস্ত্রে আবৃত ছিল; আর সেই 'মসলিন' ভারতজাত বলিয়া পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। ‡ অনুধাবন করিয়া দেখুন, এই একমাত্র বিবরণে বঙ্গের প্রাচীনত্বের, প্রতিষ্ঠার, শিল্প-সম্পদের, বাণিজ্যের কি পরিচয় দেদীপ্যমান রহিয়াছে! বঙ্গদেশ মসলিনের জন্মভূমি। এক বঙ্গদেশ ভিন্ন পৃথিবীর অন্য কোথাও মসলিনের ন্যায়

---

* হুয়েন-সাং পরিদৃষ্ট বঙ্গের ও বিহারের জনপদ-সমূহের বিস্তৃত বিবরণ 'পৃথিবীর ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ডে, একাদশ, চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ প্রভৃতি পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

† মিশরে মৃতদেহ 'মামি' করিয়া রক্ষার বিবরণ 'পৃথিবীর ইতিহাস' তৃতীয় খণ্ডে পঞ্চম পরিচ্ছেদে ১৬৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

‡ "In the tombs dating from the time of the 18th dynasty which ended in 1462 B. C., there are said to have been found mummies wrapt up in Indian muslins."—*The Ancient History of the Egyptians* published by the Religious Tract Society.

সূক্ষ্ম বস্ত্র উৎপন্ন হয় না ; এমন কি, মস্‌লিনের উপযোগী সূক্ষ্ম সূত্রও পৃথিবীর অন্যত্র জন্মে না।* খৃষ্ট-জন্মের প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সেই মস্‌লিন মিসরে মৃতের গাত্রে 'মামি'-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহার অধিক প্রাচীন বঙ্গের গৌরবের নিদর্শন বৈদেশিক ইতিহাসে আর কি থাকিতে পারে ? বোগদাদের কালিফগণ এবং পারস্যের পাতসাহ-গণ ভারতবর্ষ হইতে মস্‌লিন সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়া আপনাদের শিরস্ত্রাণের শোভা-বর্দ্ধন করিতেন। প্রাচীন-কালে চীনদেশেও এই মস্‌লিনের সমাদর ছিল। দিল্লীর বাদসাহগণের নিকট মস্‌লিন কি সমাদর লাভ করিয়াছিল, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। এক মস্‌লিন-প্রসঙ্গেই প্রাচীন বঙ্গের কত প্রতিষ্ঠার বিষয় অনুভব করা যায়! সিংহল-দ্বীপে প্রাচীন কালের বহু শিল্প-সম্পদের ও স্থাপত্যের নিদর্শন আছে। সিংহলে প্রাচীন সভ্যতার একটী বিশেষ পরিচয়-চিহ্ন—জল-সঞ্চয় ও জল-নিঃসারণ-ব্যবস্থা। সুবৃহৎ পুষ্করিণী বা কৃত্রিম হ্রদ-সমূহ প্রবল বন্যার কবল হইতে সিংহলকে রক্ষা করিয়া সিংহলে কি প্রকারে কৃষির উন্নতি-বিধান করিতেছে, তদ্বিষয় চিন্তা করিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। মিষ্টার পার্কার প্রাচীন সিংহল-সম্বন্ধে সম্প্রতি একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। সেই গ্রন্থের একটী পরিচ্ছেদে সিংহলে জল-সংরক্ষণের অপূর্ব্ব কাহিনী বিবৃত আছে। সিংহলের অন্তর্গত 'পাণ্ডা-ওয়েনা'য় জল-সংরক্ষণের জন্য অতি পুরাকালে একটী বাঁধ বাঁধা হইয়াছিল। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সেই বাঁধ-বদ্ধ প্রকাণ্ড দীর্ঘিকার জলে দেশের লোক যে কত উপকার পাইয়া-ছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। পার্কার বলেন,—'খৃষ্টজন্মের পূর্ব্ববর্ত্তিকালে পাশ্চাত্য কোনও জনপদে এতাদৃশ সুবৃহৎ জলাশয় দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অধিক কি, খৃষ্ট-জন্মের পরবর্ত্তি-কালেও, বর্ত্তমান সভ্য-সমুন্নত সময়েও, এতাদৃশ জলাশয় বিরল। কি সাহসিকতার সহিত, কি অভিনব মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়া, প্রাচীনকালের নৃপতিগণ এই বন্যাপ্রবণ উপত্যকা-প্রদেশে মৃত্তিকার দ্বারা এমন সুদৃঢ় বাঁধ বাঁধিয়া এইরূপ সুবৃহৎ জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, অনুধাবন করিলে, আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। বর্ষাকালে প্রবল বারিবর্ষণে এই প্রদেশ স্বতঃই পরিমগ্ন হইবার সম্ভাবনা। এই প্রদেশে বৎসরে গড়ে ৮৫ ইঞ্চি বারি-বর্ষণ হয়। প্রবল বর্ষার সময় প্রতি সেকেণ্ডে বন্যার জল ১২ হাজার হইতে ১৪ হাজার ঘন 'ফিট' পর্য্যন্ত সঞ্চিত হইতে পারে। এ বিষম বর্ষার হস্ত হইতে দেশকে রক্ষা করা, কি সমস্যার বিষয়, স্থপতিমাত্রেই তাহা অনুভব করিতে

শিল্প-বাণিজ্যে প্রাচীন বঙ্গের প্রতিষ্ঠা।

---

* 'পৃথিবীর ইতিহাস', তৃতীয় খণ্ড, একাদশ পরিচ্ছেদ, ৪৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। অনেক ইংরেজের প্রথমে ধারণা ছিল, মস্‌লিনের ন্যায় সূক্ষ্ম বস্ত্র ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্যত্রও জন্মিত। কিন্তু ক্রমশঃ সে ধারণা অন্তর্হিত হইতে চলিয়াছে। মস্‌লিন দেখিবার পূর্ব্বে 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকা' গ্রন্থে মস্‌লিনের অদ্বিতীয়ত্ব সম্বন্ধে সংশয়ের ভাব প্রকাশ পায়। পরিশেষে মস্‌লিনের আদর্শ দেখিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া সম্পাদক পাদ-টীকায় লিখিতে বাধ্য হন,—" It is beyond our conception how this yarn can be spun by the distaff and spindle, or woven afterwards by any machinery"—*Encyclopædia Britanica*, seventh Edition, Vol. VII. p. 396.

পারিবেন।' * বিষম বর্ষার সময় এইরূপ কৃত্রিম জলাশয়ে বা হ্রদ-সমূহে জল রক্ষা করিয়া, অনাবৃষ্টির দিনে সেই জল খাল কাটিয়া বাহির করিয়া দিয়া, কৃষিকার্য্যের সুবিধা করা হইত। প্রধানতঃ পার্ব্বত্য-প্রদেশে অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হয়। সুতরাং পর্ব্বতের পার্শ্বে বা উপত্যকাদেশেই ঐরূপভাবে বাঁধ বাঁধিয়া জল রক্ষার ব্যবস্থা হইত। কোথাও একদিকে বাঁধ বাঁধিলে কাজ চলিত, কোথাও বা দুই তিন দিকে বাঁধ বাঁধার আবশ্যক হইত। সিংহল দ্বীপের একাংশ যেমন অত্যধিক পরিমাণ বারিবর্ষণে প্রোথিত হওয়ার সম্ভাবনা, উহার অপরাংশ আবার তেমনই অনাবৃষ্টি-নিবন্ধন বিশুষ্ক হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা। পূর্ব্বোক্ত রূপ কৃত্রিম হ্রদ-সমূহে সেই আশঙ্কা দূর করিয়াছিল। অনেক সময় নদীর মোহানার বাঁধ বাঁধিয়াও ঐরূপ হ্রদ প্রস্তুত হইয়াছিল। এক একটী হ্রদের আয়তনের বিষয় অনুধাবন করিলে, কিরূপ পরিশ্রমে কিরূপ অর্থব্যয়ে তাহা নির্ম্মিত হইয়াছিল, উপলব্ধি হইতে পারে। মিষ্টার ডেকিন্ ভারতের জলসেচন-প্রণালী সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাহাতে ঐ সকল কৃত্রিম হ্রদের পরিসরের, সংখ্যার এবং ঐ সকল নির্ম্মাণের ব্যয়াদির একটু আভাস পাওয়া যাইতে পারে। † ডেকিনের বর্ণনায় প্রকাশ,—'পাদিভিল বাঁধ—দৈর্ঘ্যে এগার মাইল। উহার ভিত্তিভূমির বিস্তার দুই শত ফিট; চূড়ার পরিসর ত্রিশ ফিট। ঐ বাঁধের উচ্চতা কোনও কোনও স্থানে সত্তর ফিটের ... । চতুষ্কোণ প্রস্তরে ঐ বাঁধ বাঁধা হইয়াছে। দেশীয় পারিশ্রমিকের সুলভ হার ধরিলেও ঐ বাঁধ-নির্ম্মাণে অন্যূন তের লক্ষ পাউণ্ড (এখনকার হিসাবে ১ কোটী ৯৫ লক্ষ টাকা) ব্যয় পড়িয়াছিল। কালাওয়েয়া জলাশয়ের পরিধি চল্লিশ মাইল। ঐ হ্রদ সহস্র 'একার' (একার—৪৮৪০ বর্গ গজ) ভূখণ্ডে তিন শত কোটী ঘন-ফিট জল-ধারণের উপযোগী। উহার বাঁধের দৈর্ঘ্য বার মাইল; উচ্চতা ৫০।৬০ ফিট; চূড়ার পরিসর ২০০ ফিট। অম্বাগঙ্গা নদীর গতি রোধ করিয়া আর এক বাঁধ প্রস্তুত হয়। ঐ বাঁধের পরিসর ৯৯ ফিট; উচ্চতা নদীর উপরিভাগ হইতে ৪০ ফিটের কম নহে। ঐ নদীর বাঁধ ২৪ মাইল পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। সেই ২৪ মাইল বাঁধের উচ্চতা—কোথাও ৪০ ফিট, কোথাও ৯০ ফিট। তাহাতে নৌ-চালনোপযোগী বহু জলাশয়ের সৃষ্টি হইয়াছে এবং অবশেষে আরও ৫৭ মাইল খাল দিয়া ঐ জল চলিয়া গিয়াছে। আজিও সিংহল-দ্বীপে পূর্ব্বোক্তরূপ পাঁচ সহস্রাধিক কৃত্রিম তড়াগের সাহায্যে কৃষকেরা কৃষিকার্য্য করিয়া আসিতেছে।'

---

* এ সম্বন্ধে মিঃ পার্কারের নিজের ভাষা নিজের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি—"Although the size of this reservoir was surpassed by other pre-Christian one's, and left far behind by many post-Christian works, we cannot fail to be astonished at the boldness and originality of the early engineer who ventured to construct such an earthen bank across a valley down which floods of considerable volume passed in the rainy season. Owing to the heavy rainfall of the gathering ground, which averages about 85 inches per annum, the maximum flood may amount to 12,000 or 14,000 cubic feet per second. Every engineer will recognise that to get rid of this volume of water in safety would be a serious problem."—*Ancient Ceylon* by H. Parker.

† Vide *Irrigated India* by Mr. Alfred Deakin.

মিষ্টার ডেকিনের বর্ণনায় আরও প্রকাশ,—'সিংহল-দ্বীপের এবং দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন স্থানে যে সকল কৃত্রিম হ্রদ আছে, সে সকলের সংখ্যা ৬০ হাজারের কম নহে। ঐ সকল জলাশয়ে বর্ষার সময় জল সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গ্রীষ্মকালে লোকের ব্যবহারে প্রযুক্ত করা হয়।' ডেকিন আরও বলেন,—'সিংহল-দ্বীপের কৃত্রিম জলাশয়াদির বাঁধের পরিমাণের সহিত মাদ্রাজ-প্রেসিডেন্সির জলাশয়াদির বাঁধের পরিমাণ যোগ করিলে যে পরিমাণ-ফল হয়, তাহাতে ছয় ফিট উচ্চ প্রাচীরে ভূ-গোলককে একবার সম্পূর্ণরূপে এবং একবার অর্দ্ধেকভাবে বেষ্টন করা যায়।' সিংহল-দ্বীপের এবংবিধ জলাশয়াদির ও জলসেচন-প্রণালীর বিষয় যিনিই আলোচনা করিয়াছেন, তিনিই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছেন; সে ব্যাপারে আধুনিক স্থপতিগণকেও আশ্চর্য্যান্বিত করে। এই জল-রক্ষার ব্যবস্থা অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। খৃষ্ট জন্মের পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে বাঁধ বাঁধিয়া ঐরূপ জলাশয় প্রস্তুত হইয়াছিল এবং খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সিংহল-রাজ পরাক্রমবাহু কর্তৃক ঐরূপ কয়েকটী জলাশয়ের সংস্কার-সাধন হয়,—এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। * রাজা ধাতুসেন পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে কালাওয়ে জলাশয়ের (কালাওয়াবি বলিয়াও প্রসিদ্ধ) সংস্কার-সাধন করেন। ঐ জলাশয়ের পরিধি ৪০ মাইলের এবং উহার বাঁধের দৈর্ঘ্য ১২ মাইলের কম ছিল না। এইরূপ কত পূর্ব্বের কত বৃহৎ বৃহৎ জলাধারের অস্তিত্ব-নিদর্শন—সিংহল-দ্বীপের অধিবাসিগণের স্থাপত্যের ও শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। † কিন্তু সে সকল এই স্থাপত্যে বঙ্গদেশের প্রভাব যে পরিদৃশ্যমান্, অনেকেই বোধ হয় তাহা অবগত নহেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গবেষণা-প্রভাবেই এখন সে তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে। 'সিংহলের ইতিহাস' গ্রন্থে সার এমারসন্ টেনেণ্ট এ সম্বন্ধে কি বলিতেছেন, দেখুন,—'খৃষ্ট-জন্মের পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের যুবরাজ 'বিজয়' সিংহল দেশ অধিকার করেন।

প্রাচীন সিংহলে বঙ্গের স্থাপত্য ও শিল্প।

তাঁহার সিংহল অধিকারের পূর্ব্বে, সিংহলের অধিবাসীরা কৃষিকার্য্যে অনভিজ্ঞ ছিল। বিজয়ের বংশধর হিন্দুনৃপতিগণের নিকট সিংহলের অধিবাসীরা কৃষিকার্য্য-শিক্ষা-বিষয়ে সম্পূর্ণরূপ ঋণী। জলাশয়-নির্ম্মাণে, ধান্যের চাষে, জলসেচনে, তাঁহাদেরই নিকট সিংহলবাসীরা জ্ঞানলাভ করে। বিজয়ের উত্তরাধিকারী প্রথমে সিংহলে জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাহার পর ক্রমে ক্রমে জলাশয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকালে জীব-হিংসার প্রতি বিরাগ এবং শাক-সব্জীতে লোকের স্পৃহা বর্দ্ধন করে। তাহার ফলে—নূতন নূতন তড়াগের

* "The King (Parakrama Bahu) constructed 1470 tanks and [illegible] canals and repaired 1395 large with 960 smaller tanks and 3621 canals. Some of the older works, which he put into working order are believed to date back to 500 B.C."—*Irrigated India* by Mr. Alfred Deakin.

† সিংহলের এই জল-সংরক্ষণ প্রাচীনত্ব বিষয় নিম্নলিখিত গ্রন্থ-সমূহে বিশেষভাবে বিবৃত আছে;—Tenent's *Ceylon*, (2) Turnour's *Mahawanso*, (3) Henry W. Caves *Ruined Cities of Ceylon*, (4) and in the Sinhalese annals. (*Mahawanso*, *Dipawanso*, *Mahawansi*, *Raja-Ratnakari*, *Raja-Vali*).

সৃষ্টি এবং কৃষিকার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়; সিংহলে অসংখ্য উদ্যান, ফুল-ফলভারাবনত বৃক্ষ-সমূহ ও শাক-সব্জী দেখিতে পাওয়া যায়; সিংহলবাসীরা শুষ্কশস্যের বপন-প্রণালী শিক্ষা করে; জলাশয়-নির্ম্মাণ ও জলসেচন জন্য খাল-খনন প্রভৃতিতে অভ্যস্ত হয়; আবাদের উপযোগী ভূমি প্রস্তুত করিতে শিখে।' * বঙ্গের যুবরাজ বিজয় অসংখ্য লোকজন লইয়া সিংহল অধিকারে যাত্রা করিয়াছিলেন। সিংহল তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। বঙ্গের বিদ্যার প্রভাব, জ্ঞানের প্রভাব, কর্ম্মের প্রভাব—সিংহলে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সিংহলে যে শিল্প-সম্পৎ দেখিতে পাই, প্রাচীনকালের দেবদেবীর যে সমস্ত মূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তৎসমুদায়েও বঙ্গদেশের স্মৃতি উজ্জ্বল হইয়া আছে। সিংহল যখন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল বন্যায় ভাসমান হয়, তখন বঙ্গদেশের এবং বিহারের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বীজ সেখানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের প্রতিষ্ঠার দিনে সিংহলে জ্ঞানের আলোক কিরূপভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, ইতিহাসে তাহার সাক্ষ্যের অভাব নাই। সে সময়ে সিংহলে যত কিছু সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, সিংহলবাসীর যে কোনও কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, সকলেরই মূলে বৌদ্ধপ্রচারকগণের প্রভাব দেখিতে পাই; আর সেই ধর্ম্মপ্রচারকগণের মধ্যে অনেকেই যে বঙ্গদেশের অধিবাসী ছিলেন, তাহাও বুঝিতে পারি। সিংহলের পর যবদ্বীপের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যাইতে পারে। যবদ্বীপে বিভিন্ন সময়ে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের, বৌদ্ধধর্ম্মের এবং বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাধান্য বিস্তৃত হইয়াছিল। চৈন-পরিব্রাজক ফা-হিয়ান যখন যবদ্বীপে গিয়াছিলেন, তখন বৌদ্ধধর্ম্ম তথায় বিস্তার-লাভ করে নাই। তখন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মই সেখানে প্রবল হইয়াছিল। বিচার করিয়া দেখুন,—সে দূর দ্বীপে কাহারা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রবর্ত্তনা করিয়াছিল? যবদ্বীপে বাঙ্গালীর প্রতিপত্তিই তাহার মূলীভূত। বাঙ্গালী ভিন্ন অন্য কাহারও প্রভাব সেখানে সে সময়ে বিস্তৃত হওয়া সম্ভবপর নহে। কোন্ হেতুবাদে, কি যুক্তির প্রভাবে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়? বঙ্গদেশ হইতে ঐ দ্বীপে অর্ণবপোতসমূহ গতিবিধি করিত, সে প্রমাণ সেদিন পর্য্যন্ত পাইয়াছি। ইবন-বাতুতা সুবর্ণগ্রাম হইতে যাত্রা করিয়া একেবারে যবদ্বীপে যান। যবদ্বীপ হইতে পরিশেষে তিনি চীনে গিয়াছিলেন। তবেই বুঝা যায়, বঙ্গদেশ হইতে যবদ্বীপে যাইবার সরাসরি একটা

যবদ্বীপে বাঙ্গালীর প্রভাব-প্রতিপত্তি।

* "Before the arrival of Wijay, who invaded and conquered the island (Ceylon) in the fifth Century B.C., agriculture was unknown in Ceylon. It was to the Hindu Kings who succeeded Wijay that Ceylon was indebted for the earliest knowledge of agriculture, for the construction reservoirs and the practice of irrigation for the cultivation of rice. The first tank in Ceylon was formed by the successor of Wijay, and their subsequent extension to an almost incredible number is ascribable to the influences of the Buddhist religion, which abhoring the destruction of animal life, taught its multitudinous votaries to subsist exclusively upon vegetable food. Hence, the planting of gardens, the diffusion of fruit-trees and leguminous vegetables, the showing of dry grain, the formation of reservoirs and canals, and the reclamation of lands in situations favourable for irrigation."—*History of Ceylon* (vol. I) by Sir Emerson Tennent

পথ ছিল। কেহ বলিতে পারেন,—ইবন-বাতুতা সেদিনের লোক; তাহাতে পুরাতন কথা কি আসিতে পারে? ইহাতে বলিতে পারি,—অনেক দিন হইতে নাবিকগণের গতিবিধি না থাকিলে, হঠাৎ ইবন-বাতুতাকে লইয়া নাবিকগণ কখনই ঐ দ্বীপে পৌঁছিতে পারিত না। সুতরাং বুঝা যায়, পূর্ব্ব হইতেই ঐ পথে বাঙ্গালীদের গতিবিধি ছিল। তাহার পর একটি বিশিষ্ট প্রমাণ দিতেছি। যবদ্বীপে প্রাপ্ত দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তিতে এবং মন্দিরাদিতে যে শিল্পকলার পরিচয় পাওয়া যায়, সে শিল্পকলা বাঙ্গালীর নিজস্ব। রামায়ণের ও মহাভারতের অনেক দৃশ্য যবদ্বীপে প্রকটিত আছে। 'বোরোবোদার' * মন্দিরে যে সকল চিত্র খোদিত রহিয়াছে, তাহার অধিকাংশই বঙ্গীয় শিল্পিগণের শিল্পচাতুর্য্যের পরিচায়ক। কেহ কেহ সেগুলিকে বৌদ্ধদিগের কীর্ত্তি বলিয়া অনুমান করেন। তাহা হইলেও, বঙ্গদেশের বহু পরিচয়-চিহ্ন তাহাতে দেদীপ্যমান্। সে আলোচনা বিস্তৃতভাবে না করিয়া, একটিমাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখে, যবদ্বীপে দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি যে বাঙ্গালীর কীর্ত্তি—অন্ততঃ তাহার মধ্যে বাঙ্গালীর প্রভাব প্রকট রহিয়াছে, তাহা প্রদর্শন করিতেছি। 'ভারতবর্ষের স্থাপত্য ও চিত্র-শিল্প' সম্বন্ধে মিষ্টার হাভেল যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন; 'ভারতের এবং প্রাচ্য-দেশের স্থাপত্য' সম্বন্ধে ফার্গুসনের যে গ্রন্থ আছে, এবং যবদ্বীপের বৃটীশ-গবর্ণর সার ষ্ট্যাম্ফোর্ড রাফেলস্ প্রণীত 'যবদ্বীপের ইতিহাস',—এই সকল গ্রন্থ আলোড়ন করিলে সে তত্ত্ব উদ্ঘাটন করা যায়। † উঁহারা যবদ্বীপের বহু দেবদেবীর মূর্ত্তির পরিচয় দিয়াছেন। তন্মধ্যে যবদ্বীপের পূর্ব্বাংশে 'মালং'-বিভাগে 'সিংহেশ্বরীর' ভগ্নস্তূপ মধ্যে যে একটী মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, সে দেবীমূর্ত্তি নিশ্চয়ই বাঙ্গালীর নিজস্ব। দেবী দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করিতেছেন, সেই মূর্ত্তিতে এই চিত্র প্রকটিত। প্রস্তর খোদিয়া কত কাল পূর্ব্বে ঐ মূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা যায় না। 'মালং'-প্রদেশে গভীর অরণ্যের মধ্যে ঐ দেবী-মূর্ত্তি বিক্ষিপ্ত ছিল। মিষ্টার হাভেল অনুমান করেন,—'৯৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যবদ্বীপে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রভাব ছিল। সেই সময়েই ঐ মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে।' আমরা কিন্তু ঐ মূর্ত্তি ঐ সময়েরও পূর্ব্ববর্ত্তি-কালের বলিয়া সিদ্ধান্ত করি। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে ফা-হিয়ান যবদ্বীপে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রভাব দেখিয়াছিলেন। তাহার অল্পদিন পরেই বৌদ্ধধর্ম্ম সে স্থান অধিকার করে। পরিশেষে যথাক্রমে মুসলমানগণ এবং খৃষ্টানগণ যবদ্বীপে প্রতিষ্ঠাপন্ন হন। সুতরাং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিলোপ-সাধনের পূর্ব্বে ঐ দেবী-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, বেশ বুঝিতে পারা যায়। পরন্তু উপলব্ধি হয়, বৌদ্ধ-বিপ্লবের কালে ঐ মূর্ত্তি স্থানভ্রষ্ট হইয়াছিল এবং মুসলমানগণের অভ্যুদয়কালে উহা লোকলোচনের অন্তরালে জঙ্গলাভ্যন্তরে পড়িয়া ছিল। এই সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত। সিংহেশ্বরীর ভগ্নস্তূপ-মধ্যে-প্রাপ্ত ঐ মূর্ত্তি এক্ষণে হল্যাণ্ড-দেশের অন্তর্গত লেডেন-নগরে, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির পরিচয়মূলক

---

* 'বুদ্ধদেবের'—এই শব্দ উচ্চারণের বিকৃতি-হেতু 'বোরোবোদার' রূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকিবে বলিয়াই মনে হয়।

† *Vide* Mr. E. B. Havell's *Indian Sculpture and Painting*, Fergusson's *History Indian and Eastern Architecture*, Sir Stamford Raffles's *History of Java*.

চিত্রশালায় রক্ষিত হইয়াছে।* মিষ্টার হাভেল ঐ মূর্ত্তির যে বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন, সে মহিষাসুরমর্দ্দিনী দেবী-মূর্ত্তি এই বাঙ্গালী জাতিরই আরাধ্য। পৃথিবীর আর কোনও প্রদেশে দেবীর ঐ মূর্ত্তি সম্পূজিত হয় বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষের মধ্যেও এক বঙ্গদেশেই ঐ মূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে। সুতরাং শিল্পের হিসাবেই বলুন, আর ধর্ম্মের হিসাবেই বলুন, সেই দূর অতীতকালে বঙ্গদেশের প্রভাব যে যবদ্বীপে বিস্তৃত হইয়াছিল, এই দেবী মূর্ত্তি দ্বারাই তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। বোরোবোদার মন্দির-গাত্রে যে সকল কারুকার্য্য দৃষ্ট হয়, যে সকল প্রতিমূর্ত্তি তাহার ভিত্তি-প্রাচীর-গাত্রে খোদিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে বাঙ্গালীর কৃতিত্বের বহু নিদর্শন বিদ্যমান্ আছে। বঙ্গদেশে যে আকৃতির পোতসমূহ প্রচলিত, যে প্রকার পোতের সাহায্যে বাঙ্গালী নাবিকগণ সমুদ্র-পথে গতিবিধি করিতে অভ্যস্ত ছিল, তৎসমুদায়ের নানা প্রতিকৃতি সেই মন্দির-গাত্রে খোদিত হইয়া আছে। গুর্জ্জর ও কলিঙ্গ-দেশের শিল্পিগণের পার্শ্বে সেখানে যে বঙ্গীয় শিল্পিগণের শিল্প-নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছিল, মন্দিরের কারুকার্য্যের প্রতি যিনিই লক্ষ্য করিবেন, তিনিই তাহা বুঝিতে পারিবেন।† কেবল সিংহলদ্বীপে বা যব-দ্বীপে বলিয়া নহে;—মধ্য-এসিয়ায়, তিব্বতে, চীনে, জাপানে, ব্রহ্মদেশে, শ্যাম-রাজ্যে, কাম্বোডিয়ায়, বাঙ্গালীর প্রধান্যের ও শিল্প-নৈপুণ্যের নিদর্শন আজিও বিদ্যমান আছে। বাঙ্গালার স্থাপত্য, শিল্প ও প্রস্তর-মূর্ত্তি-খোদাই-প্রণালী, কেহ কেহ বলেন, প্রথমে নেপালে গিয়াছিল,—নেপাল হইতে তিব্বতে ও চীনে ঐ সকল শিল্প প্রচারিত হয়। ধাতু গলাইয়া ঢালাই-কার্য্য শিক্ষার প্রণালীও বঙ্গদেশ হইতে নেপালের মধ্য দিয়া চীন প্রভৃতি দেশে প্রচারিত হইয়াছিল। এ বিষয়ে দুই এক জন বাঙ্গালী-শিল্পীর কৃতিত্ব-কাহিনী শুনিতে না পাওয়া যায়, এমন নহে। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে বরেন্দ্র-ভূমের অধিবাসী প্রসিদ্ধ শিল্পী ধীমান্ এবং তাঁহার পুত্র 'বিটপাল' নেপালে গমন করিয়া যে শিল্প-কলা শিক্ষা দেন, ক্রমশঃ তাহা চীনে ও অন্যান্য জনপদে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তিব্বতে, চীনে, জাপানে যে সকল বুদ্ধ-মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই বঙ্গদেশীয়

* "Hindu Sculpture has produced a master-piece in the great stone alto-relievo of Durga slaying the demon, Mahisa found at Singasari, in Java and now in the Ethnographic Museum, Leyden. It belongs to the period of Brahmanical ascendency in Java which lasted from about A. D 950 to 1500. The goddess is striding over the prostrate carcass of the buffalo, in which disguise Mahisha had concealed himself, and seizing the real dwarf-like form of the demon, she is preparing to deal him his death-blow."—*Indian Sculpture and Painting* by Mr. E. B. Havell.

† "Artists and art-critics also see in the magnificent sculptures of the Burobudur temple in Java the hands of Bengali artists who worked side by side with the people of Kalinga and Gujrat in thus building of its early civilization. And the numerous representations of ships which we find in the vast panorama of the bas-reliefs of that colossal temple reveal the type of ships which the people of Lower Bengal built and used in sailing to Ceylon, Java, Sumatra, China and Japan, in pursuit of their colonizing ambition, commercial interests, and artistic and religious missions."—*A History of Indian Shipping* by Mr. Radhakumud Mookerji.

কারিকরগণের হস্ত-প্রসূত।* প্রাচীনকালে চীনদেশ হইতে যে সকল পরিব্রাজক ভারতবর্ষে ধর্মগ্রন্থাদি সংগ্রহের জন্য আগমন করিয়াছিলেন, প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি তাঁহারা প্রধানতঃ বঙ্গদেশ হইতেই সংগ্রহ করেন। বঙ্গদেশের ধর্ম্মপ্রচারকগণই প্রথমে চীন প্রভৃতি দেশে গিয়া ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যে ব্রতী হন। আরও এক কথা, একটু অভিনিবেশ-সহকারে অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায়, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উৎপত্তি-স্থান এই বঙ্গদেশ এবং এই বঙ্গদেশ হইতেই উহা অন্যত্র বিস্তৃতি লাভ করে।† তাহা হইলে, বৌদ্ধমন্দিরাদিতে বা বৌদ্ধপ্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতিতে যে শিল্পকলার বিকাশ দেখিতে পাই, তৎসমুদায়ের মূল বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্যত্র সম্ভবপর নহে। ফলতঃ, প্রাচীনকালে বঙ্গদেশ যে শিল্পসম্পদে প্রতিষ্ঠান্বিত ছিল এবং বিভিন্ন জনপদের আদর্শ-স্থানীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোনই সংশয় নাই।

প্রাচীন বঙ্গের যতই ঐশ্বর্য্য-বিভব থাকুক, অনেকের হৃদয়ের বদ্ধমূল বিশ্বাস, বঙ্গদেশ কখনও শৌর্য্য-বীর্য্যে গৌরবসম্পন্ন ছিল না। সর্ব্বাবধ্বংসী কালের পেষণে বঙ্গের এখন এমনই দুরবস্থার দিন আসিয়াছে! কি পরিতাপের বিষয়—বঙ্গের শৌর্য্য-বীর্য্য-কাহিনী এখন উপকথায় অন্তর্নিবিষ্ট! কি মানুষ, কি প্রকৃতি—সকলেই বঙ্গের প্রতি এতই বিরূপ যে, প্রাচীন বঙ্গের শৌর্য্য-বীর্য্যের স্মৃতিচিহ্নটুকুও মুছিয়া ফেলিবার পক্ষে কেহই চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। একদিকে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়,—অন্যদিকে ধর্ম্মবিপ্লব! উভয় প্রকারে বঙ্গের সকল গৌরব-চিহ্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। বাঙ্গালার সে পরিচয়, বাঙ্গালায় এখন আর খুঁজিয়া পাইবার উপায় নাই। সে পরিচয় সন্ধান করিবার জন্য, বাঙ্গালীকে এখন আসমুদ্রহিমাচল আলোড়ন করিয়া বেড়াইতে হইতেছে;—কোথায় কাশ্মীর, কোথায় সিংহল, কোথায় যবদ্বীপ,—কি চিহ্ন কোথায় বিচ্ছিন্নভাবে রহিয়াছে, তাহাই অনুসন্ধান করিতে হইতেছে;—আর কি পরিতাপের বিষয়, দূর-দেশে-বিক্ষিপ্ত সেই বিচ্ছিন্ন-কাহিনীই এখন বাঙ্গালার ইতিহাসের উপাদান হইয়া দাঁড়াইতেছে! বৌদ্ধ-সম্প্রদায়, পীড়নের একশেষ সহ্য করিয়া, সুদূর সিংহল-দ্বীপে আশ্রয়

প্রাচীন বঙ্গের শৌর্য্যবীর্য্য।

---

* "No less creditable also were the artistic achievements of Bengal, besides, we have seen, influencing the art of Borobudur, Bengali art has influenced that of Nepal through the schools of painting, Sculpture, and works in cast metal founded about the middle of the 9th century by Dhiman and his son Bitpal, inhabitants of Barendra and from Nepal the art of Bengali masters spread to China and other parts of the Buddhistic world."—*Ibid.* মিষ্টার হ্যাভেলের ভারতীয় স্থাপত্য ও চিত্রশিল্প-সংক্রান্ত গ্রন্থেও এ বিষয়ের পোষকতা দৃষ্ট হয়। যথা,—"From the seaports of our eastern and western coasts India sent streams of colonists, missionaries and craftsmen all over southern Asia, Ceylon, Siam and for distant Cambodia. Through China and Corea Indian art entered Japan about the middle of the 6th century."—*Indian Sculpture and Painting* by Mr. Havell, *Vide* also Indian Antiquary, Vol. iv.

(†) এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

লইয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে কতকগুলি ধর্ম্মগ্রন্থ তাঁহাদের সঙ্গে সিংহলে স্থান পাইয়াছিল। তাহারই একখানি গ্রন্থে—'মহাবংশে'—আমরা প্রমাণ পাইতেছি, খৃষ্টজন্মের ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের যুবরাজ 'বিজয়সিংহ' বাহুবলে সিংহল-দ্বীপ অধিকার করিয়াছিলেন। বিপুলায়তন অর্ণব-পোতে সপ্তশতাধিক অনুচর-সহ তিনি সিংহলে উপনীত হন। সিংহল বঙ্গের যুবরাজের অধিকারভুক্ত হয়। দ্বীপের পূর্ব্ব-নাম পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। বঙ্গের শিক্ষা, বঙ্গের বিদ্যা, বঙ্গের শিল্পকলা, সিংহলে বিস্তৃতি-লাভ করে। বিজয়সিংহের এই সিংহল-বিজয়-বার্ত্তা যদি 'মহাবংশে' স্থান না পাইত, আর যদি ভারতের অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থের ন্যায় 'মহাবংশের' পাণ্ডুলিপি বিধ্বস্ত ও বিলুপ্ত হইত, তাহা হইলে, বাঙ্গালীর এ পরিচয় আর কোথাও খুঁজিয়া পাইতাম না। বাঙ্গালায় সে পরিচয় অনুসন্ধান করিয়া পাইবার উপায় নাই,—বাঙ্গালার উপর দিয়া এমনই বিপ্লবের বন্যা বহিয়া গিয়াছে! সে পরিচয় প্রধানতঃ বিদ্যমান—মহাবংশে; আর বিদ্যমান—বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে—অজন্তার গিরিগহ্বরে। সেই গিরি-গহ্বরে প্রাচীর-গাত্রে চিত্রাবলীর মধ্যে কতকাল পূর্ব্বে বিজয়সিংহের সিংহল-বিজয়-চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল; আর আজি, সে চিত্র দেখিয়া, মহাবংশের বর্ণনার সহিত মিলাইয়া, পূর্ব্ব-গৌরব-স্মরণে, আমরা এখন উল্লাসে উৎফুল্ল হইতেছি। অজন্তার গিরি-গহ্বরে অঙ্কিত চিত্রে বিজয়সিংহের সিংহলে অবতরণের কি জাঁক-জমকপূর্ণ দৃশ্যই প্রকটিত রহিয়াছে! সুসজ্জিত হস্তিসমূহ পোত হইতে তীরে অবতরণ করিতেছে। যুদ্ধার্থ প্রস্তুত অশ্ব-সমূহকে তীরে অবতরণ করান হইতেছে। সে যেন এক বিরাট্ উদ্যোগ পর্ব্ব। সুদূর বঙ্গদেশ হইতে হয়-হস্তী-সমন্বিত সৈন্য-পরিপূর্ণ অর্ণবপোতসমূহ ভীষণ সমুদ্র পার হইয়া সিংহলে আপনাদের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিতেছে;—ইহার অপেক্ষা বাঙ্গালীর গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে? এই এক ঘটনার চিত্রে, বাঙ্গালীর বাহুবল, নৌবল, রণকৌশল, অর্ণবপোত-পরিচালনা প্রভৃতি বিবিধ শক্তির পরিচয় দেদীপ্যমান্ নহে কি? অধিক বলিব কি, বিজয়সিংহের সিংহল-বিজয়ের পর হইতেই সিংহল-দ্বীপে সভ্যতার অঙ্গীভূত স্থাপত্য, শিল্প ও জ্ঞান-বিজ্ঞান পরিস্ফুট হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও এখন তাহা একবাক্যে স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন। এক সিংহলে বলিয়া নহে; এক সময়ে বাঙ্গালী তামিল দেশে—এক হিসাবে সমস্ত দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে—আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়া বুঝা যায়। যেমন বিজয়সিংহ হইতে সিংহলের নামকরণ হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারি, তেমনই বঙ্গের এক সময়ের রাজধানী তাম্রলিপ্তের নামানুসারে তামিল দেশের নামকরণ হইয়াছিল বলিয়া বুঝা যায়। এ সিদ্ধান্তে মতান্তর থাকিতে পারে বটে; কিন্তু তামিল-দেশে বিজয়সিংহের বিজয়-পতাকা যে উড্ডীন হইয়াছিল, তামিলদিগের ইতিহাসেই তাহা প্রকটিত আছে। তবে সে বিবরণে প্রকাশ—বিজয়সিংহ তামিল-রাজ্যের রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং সিংহল-জয়ে তামিল-দেশীয় সৈন্যের সাহায্য পাইয়াছিলেন। যাহা হউক, যেভাবেই এ ঘটনা বিবৃত হউক, বাঙ্গালীর সিংহল-বিজয়-কাহিনী এখন আর উড়াইয়া দিবার উপায়

বাঙ্গালীর সিংহল-বিজয়।

নাই। খৃষ্টজন্মের ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে, ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে—সুদূর সিংহল-দ্বীপে—বাঙ্গালীর এই যে শৌর্য্য-বীর্য্যের নিদর্শন আছে, ভারতের উত্তর-প্রান্তে, ভূ-স্বর্গরূপে পরিকল্পিত সৌন্দর্য্য-নিকেতন কাশ্মীর-রাজ্যে বাঙ্গালীর সেই শৌর্য্য-বীর্য্য দেখিয়া আসুন। বঙ্গদেশের ইতিহাসে বাঙ্গালীর সে বীরত্বের স্মৃতি বহুকাল লোপ পাইয়াছে। বঙ্গদেশে কোথাও সে বীরত্ব-কাহিনী পরিকীর্ত্তিত নহে। কিন্তু কাশ্মীরে—কাশ্মীরের ইতিহাস 'রাজতরঙ্গিণী' গ্রন্থে—সে কাহিনী কেমনভাবে পরিবর্ণিত রহিয়াছে, পাঠ করিয়া দেখুন। যথা,—চতুর্থ তরঙ্গে,—

কাশ্মীরে বাঙ্গালীর বীরত্ব-স্মৃতি।

"গৌড়োপজীবিনামাসীৎ সত্ত্বমদ্ভুতং তদা। জহুর্যে জীবিতং ধীরাঃ পরীক্ষস্থ প্রভোঃ কৃতে॥
শারদাদর্শনভিষাৎ কাশ্মীরান্ সংপ্রবিশ্যতে। মধ্যস্থদেবাবসথং সংহতা সমবেষ্টয়ন্॥
দিগন্তরস্থে ভূপালে প্রবিবেক্ষুনবেক্ষ্য তান্। পরিহাসহরিং চক্রু পূজকাঃ পিহিতাবরিং॥
তে রামস্বামিনং প্রাপ্য রাজতং বিক্রমোর্জ্জিতাঃ। পরিহাসহরিভ্রান্ত্যা চক্রুরুৎপাট্য রেণুশঃ॥
তিলং তিলং তং কৃত্বা চ চিক্ষিপুর্দিক্ষু সর্ব্বতঃ। নগরান্নির্গতৈঃ সৈন্যৈর্হন্যমানাঃ পদে পদে॥
শ্যামলা রক্তসংসক্তাস্তে পতন্নিহতা ভুবি। অঞ্জনাদ্রি-দৃষৎখণ্ডা ধাতুস্যন্দোজ্জ্বলা ইব॥
তদীয় রুধিরাসারৈঃ সমমুদ্রুজ্জ্বলীকৃতা। স্বামিভক্তিরসামান্যা ধন্যাচেয়ং বসুন্ধরা॥
বজ্রাদ্বজ্রকৃতং ভয়ং বিরমতি শ্রীঃ পদ্মরাগাস্তবে-ন্নানাকরমপি প্রশাম্যতি বিষং গারুত্মাদশ্মনঃ।
একৈকং ক্রিয়তে প্রভাবনিয়মাৎ কর্ম্মেতি রত্নৈঃ পরং,
পুংরত্নৈ পুনরপ্রমেয়মহিমোন্নদ্ধৈর্নকিং সাধ্যতে॥
ক দীর্ঘকাললভ্যোধ্যা শাস্তে ভক্তিঃ ক চ প্রভৌ। বিধাতুরপ্যসাধ্যং তদ্ যদ্ গৌড়ৈর্বিহিতং তদা॥
লোকোত্তরস্বামিভক্তিপ্রভাবাণি পদে পদে। তাদৃশানি তদাভুবন ভৃত্যরত্নানি ভূভৃতাং॥
রাজ্ঞঃ প্রিয়ো রক্ষিতোঽভুদ্গৌড়রাক্ষসবিপ্লবে। রামস্বাম্যুপহারেণ শ্রীপরিহাসকেশবঃ॥
অদ্যাপি দৃশ্যতে শূন্যং রামস্বামিপুরাস্পদং। ব্রহ্মাণ্ডং গৌড়বীরানাং সনাথং যশসা পুনঃ॥"

রাজা ললিতাদিত্য, পরিহাস-কেশবকে মধ্যস্থ রাখিয়া, গুপ্তঘাতক দ্বারা গৌড়েশ্বরকে ত্রিগামী নামক স্থানে বধ করিয়াছিলেন। সেই গুপ্ত-হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ-জন্য বঙ্গাধিপতির সৈন্যগণ কাশ্মীর-রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। উপরি-উদ্ধৃত শ্লোক কয়েক পংক্তিতে তাহারই বর্ণনা দেখিতে পাই। শব্দার্থের অনুসরণে ঐ শ্লোক কয়েক পংক্তির অর্থ নিষ্পন্ন হয়,—"গৌড়াধীশের সাহসিক অনুজীবিগণ প্রভু-হত্যার প্রতিশোধ-মানসে অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল। তাহারা শারদামন্দির-দর্শন-ছলে কাশ্মীর-দেশে প্রবেশ করিয়া, সাক্ষীদেব পরিহাস-কেশবের মন্দির বেষ্টন করিল। সেই সময়ে নরপতি দেশান্তরে ছিলেন। তাহাদিগকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে অভিলাষী দেখিয়া, পূজকগণ পরিহাস-কেশবের মন্দির-দ্বার রুদ্ধ করিলেন। বিক্রমশালী গৌড়বাসিগণ পরিহাস-কেশব-ভ্রমে, রজতময় রামস্বামীর বিগ্রহ উৎপাটিত করিয়া, রেণুরূপে পরিণত করিল ও তিল তিল করিয়া চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিল। অনন্তর সৈন্য-সকল নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। শোণিত-সিক্ত শ্যামবর্ণ গৌড়ীয়গণ, সৈন্যগণের অস্ত্রাঘাতে নিহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল; যেন অঞ্জন-শৈলের শিলাখণ্ড সকল মনঃশিলার রসে

রঞ্জিত হইল। তাহাদের রুধিরধারায় এবম্বিধ অসামান্য প্রভুভক্তি উজ্জ্বলীকৃত ও পৃথিবী ধন্য হইয়াছিল। হীরক হইতে বজ্রভয় দূর হয়, পদ্মরাগ হইতে লক্ষ্মী লাভ হয়, মরকত-মণি হইতে বিবিধ বিষের উপশম হয়; রত্ন-সমূহ স্ব স্ব শক্তি-অনুসারে এক একটী নির্দ্দিষ্ট কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া থাকে; কিন্তু অসীম-মহিমা পুরুষ-রত্ন কোন্ কার্য্য সাধন করিতে অসমর্থ? কোথায় দীর্ঘকালের গন্তব্য-পথ, আর কোথায় মৃত-প্রভুর প্রতি ভক্তি;—গৌড়দেশীয়গণ যাহা করিয়াছিল, তাহা বিধাতারও অসাধ্য। পুরাকালে নৃপতিবৃন্দের এতাদৃশ ভৃত্যরত্ন ছিল; তাহারা পদে পদে লোকোত্তর স্বামিভক্তির প্রভাব প্রদর্শন করিয়াছিল। গৌড়-রাক্ষস-সমূহের আক্রমণকালে রাজার প্রিয় পরিহাস-কেশব রাম-স্বামীর বিনাশ দ্বারা রক্ষা পাইয়াছিল। রামস্বামীর মন্দির অদ্যাপি বিগ্রহ-শূন্য দৃষ্টিগোচর হয়; কিন্তু গৌড়ীয়গণের যশোরাশিতে জগৎ পূর্ণ রহিয়াছে।" শব্দার্থের অনুসরণে শ্লোক কয়েক পংক্তির উক্তরূপ অনুবাদ নিষ্পন্ন হয় বটে; কিন্তু মর্ম্মার্থ অনুধাবন করিলে, কি ভাব উপলব্ধি হয়? উপলব্ধি হয় না কি—ললিতাদিত্য গুপ্তঘাতকের সাহায্যে বঙ্গের কোনও নৃপতির হত্যাকাণ্ড সাধন করিয়াছিলেন; আর তাঁহার সেই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিফল প্রদানের জন্য বঙ্গাধিপের সৈন্যদল কাশ্মীর-রাজ্য আক্রমণ করে। পরিহাস-কেশব কর্ত্তৃক বাঙ্গালার নৃপতি নিহত হন। সুতরাং তাঁহার প্রাণনাশে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সৈন্যগণ তাঁহার মন্দির বা আবাস-স্থান আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু সেখানে রামস্বামী কর্ত্তৃক পরিচালিত কাশ্মীরী সেনা বঙ্গের সৈন্যদলকে বাধাপ্রদান করে। তাহাতে রামস্বামী নিহত হন; এবং অন্যান্য কাশ্মীরী সেনা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়। এই যুদ্ধে বঙ্গবীরগণ যে বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন, কাশ্মীরবাসীরা তাহাতে বিস্ময়-বিমুগ্ধ হন। তদ্রূপ বীরত্ব সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। কবি তাই বলিয়াছেন,—'রামস্বামীর মন্দির অদ্যাপি বিগ্রহ-শূন্য দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু গৌড়ীয়গণের যশোরাশিতে জগৎ পূর্ণ হইয়াছে।' কাশ্মীরের কবি, কাশ্মীরের ঐতিহাসিক, বাঙ্গালীর বীরত্ব সম্বন্ধে এতদূর উচ্চ-প্রশংসাবাণী ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। কাশ্মীরাক্রমণকারী বঙ্গ-সেনানীকে কবি শত্রুভাবে দেখিয়াছেন, 'রাক্ষস' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; অথচ, তাহাদের বীরত্বের কথা তাঁহাকে শতমুখে কীর্ত্তন করিতে হইয়াছে। ইহার অধিক বাঙ্গালীর বাহুবলের পরিচয় আর কি হইতে পারে? একবার সমগ্র কাশ্মীর-রাজ্য বাঙ্গালীর অধিকারে আসিয়াছিল। সে প্রমাণও এখন পাওয়া যাইতেছে। বিক্রমাদিত্য কাশ্মীর-রাজ্য অধিকার করেন, আর সে অধিকৃত রাজ্যের শাসন-ভার কবি কালিদাসের উপর অর্পণ করেন। রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়া, কালিদাস 'মাতৃগুপ্ত' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। * তবেই দেখুন, একদিকে হিমা-লয়, অন্যদিকে কন্যাকুমারী—বাঙ্গালীর বাহুবল কোথায় না বিস্তৃত হইয়াছিল? মহাভারতে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে নানা রাজ্যের সৈন্যদল সমবেত হয়। বঙ্গাধিপের বাঙ্গালী-সেনাও সে যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। রঘুর দিগ্বিজয়ে বঙ্গদেশে আধিপত্য-বিস্তারে বঙ্গের সৈন্য-

* 'পৃথিবীর ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ড, অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে ২৯২-২৯৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। বিক্রমাদিত্য ও কালিদাস উভয়েই যে বাঙ্গালী ছিলেন, এখন নানারূপেই প্রতিপন্ন হইতেছে।

দলের সহিত রঘুর যুদ্ধ হইয়াছিল ;—কেবল কালিদাসের রঘুবংশের বর্ণনায় নহে, বাল্মীকির রামায়ণেও সে আভাস পাওয়া যায়। গ্রীক-বীর আলেকজাণ্ডার যখন ভারতাক্রমণে অগ্রসর হন, বঙ্গদেশের রাঢ়ভুমের সৈন্য তাহাকে বাধাপ্রদান করিতে গিয়াছিল। যাহারা বাধা দেয়, তাহারা গঙ্গারাঢ়ী (Gangaradhis) বলিয়া অভিহিত হয়। গঙ্গারাঢ়ী কাহারা ? গঙ্গাতীরবর্ত্তী রাঢ় অঞ্চলের অধিবাসীরাই এরূপ সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিল। পরিব্রাজক হুয়েন-সাং ভারতবর্ষে আসিয়া গঙ্গারাঢ়ীগণ কর্ত্তৃক আলেকজাণ্ডারকে বাধা দেওয়ার সংবাদ শ্রবণ করিয়াছিলেন। মেগাস্থিনিসের বর্ণনায়ও এই গঙ্গারাঢ়ীদিগের বীরত্বের কাহিনী বিবৃত আছে। মেগাস্থিনিসের উচ্চারণে এই প্রদেশের নাম কতকটা 'গঙ্গারিদাই'-রূপে উচ্চারিত হইয়াছে। আলেকজাণ্ডার, এসিয়া-মহাদেশের সকল দেশে আপনার বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়াও, এই গঙ্গারিদাই দেশে পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই দেশের অধিবাসীদিগের বড় সুশিক্ষিত হস্তী ছিল। সেই সকল শিক্ষিত হস্তীর সাহায্যে তাঁহারা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন, কেহই তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইতে সাহসী হইত না। ডায়ডোরাস্, মেগাস্থিনিসের বৃত্তান্তের যে সার-সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টতঃ লিখিত আছে,—'গঙ্গাতীরবর্ত্তী গঙ্গারাঢ়ী বা গঙ্গারিদাই জাতির সহিত যুদ্ধে পরাজয়ের সম্ভাবনা মনে করিয়া, আলেকজাণ্ডার সেদিকে অগ্রসরই হন নাই।' ডায়ডোরাসের বর্ণনায় আরও প্রকাশ,— 'গঙ্গারিদাই দেশে চারি সহস্র সুশিক্ষিত হস্তী ছিল। কোন বৈদেশিক রাজা কখনই তাহাদের দেশ অধিকার করিতে সমর্থ হন নাই।' বঙ্গদেশান্তর্গত বর্দ্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি বিভাগ রাঢ়ভূমি বলিয়া পরিচিত। বীরগণের আবাস-ভূমি ছিল বলিয়াই 'বীরভূমি' নাম হইয়াছিল। প্রতিপত্তি কখনই খর্ব্ব হয় নাই, পরন্তু দিন দিনই বর্দ্ধমান ছিল,—এই জন্যই 'বর্দ্ধমান' নাম। এই সকল প্রধান-স্থান-সমন্বিত রাঢ়ভূমি— এক সময়ে আলেকজাণ্ডারের ন্যায় বীরপুরুষের প্রাণেও ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল। মেগাস্থিনিস প্রভৃতির উক্তিতে, ডায়ডোরাস্ প্রভৃতির বর্ণনাতে, তাহা সপ্রমাণ হয়। পরবর্ত্তিকালেও অনেক দিন পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ আপনার বাহু বলের পরিচয় দিয়া আসিয়াছিল। গুপ্ত-বংশের, পাল-বংশের, সেন-বংশের রাজত্বকালে বঙ্গদেশের প্রভাব-প্রতিপত্তির বিষয় স্মরণ করিয়া দেখুন ;—এ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইবে। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গুপ্তরাজগণ বঙ্গদেশ হইতেই বিভিন্ন প্রদেশে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উৎপত্তি-স্থান ও অভ্যুদয়ক্ষেত্র—এই বঙ্গদেশ। বিভিন্ন জনপদ অধিকার করিয়া বিভিন্ন প্রদেশে তাঁহারা নূতন নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বটে ; কিন্তু তাঁহাদের প্রধান রাজধানী এই বঙ্গদেশেই ছিল। বঙ্গদেশের অন্তর্গত সমুদ্রগড়—রাজা সমুদ্রগুপ্তের গড় বা রাজধানী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণও এই বঙ্গদেশেই প্রতিষ্ঠান্বিত ছিলেন। এই গুপ্তবংশ ৩০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৪৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আপনাদের প্রাধান্যের নানা পরিচয়-চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। বহু প্রাচীন মুদ্রায় এবং খোদিত লিপিতে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠার বিষয় ঘোষণা করিতেছে। গুপ্তবংশের প্রবর্ত্তিত একটী শকাব্দা হইতেও তাঁহাদের

বঙ্গদেশ-আক্রমণে আলেকজাণ্ডারের আশঙ্কা।

প্রাধান্য বুঝিতে পারা যায়। কেহ কেহ মৌর্য্য-বংশীয় রাজা চন্দ্রগুপ্তকে গুপ্তবংশের আদি বলিয়া মনে করেন। কিন্তু মৌর্য্য-বংশীয় চন্দ্রগুপ্ত হইতে ধরিয়া সমুদ্রগুপ্তাদি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গুপ্তরাজগণের পর্য্যায় নির্ণয়করা যায় না। সাধারণতঃ 'মহারাজ গুপ্ত' হইতে গুপ্তবংশের অভ্যুদয় ধরা হইয়া থাকে। মহারাজ গুপ্ত ৩০০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার পর, ঘটোৎকচ গুপ্ত (৩১০ খৃষ্টাব্দে), চন্দ্রগুপ্ত প্রথম (৩১৯ খৃষ্টাব্দে), সমুদ্রগুপ্ত (৩৫০ খৃষ্টাব্দে), চন্দ্রগুপ্ত দ্বিতীয় (৪০১-৪১৪ খৃষ্টাব্দে), কুমারগুপ্ত (৪১৫-৪৪৯ খৃষ্টাব্দে), স্কন্দগুপ্ত (৪৫৫-৪৬৮ খৃষ্টাব্দে) প্রতিষ্ঠান্বিত ছিলেন। ইহাদের মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত নামধেয় নৃপতিদ্বয় এবং মতান্তরে সমুদ্রগুপ্ত 'বিক্রমাদিত্য' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তখন, সম্রাট বা রাজচক্রবর্ত্তীর ন্যায় 'বিক্রমাদিত্য' শব্দ একটা উপাধির মধ্যে পরিগণিত ছিল। যিনিই ভারতবর্ষে একাধিপত্য প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেন, তিনিই 'বিক্রমাদিত্য' নামে পরিচিত হইতেন। তাহা হইলেই বুঝা যায়, গুপ্ত-বংশীয় নৃপতিগণের মধ্যে অন্ততঃ তিন জন নৃপতি ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট্ হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে সমুদ্রগুপ্ত (নবদ্বীপ বা সমুদ্রগড় যাঁহার রাজধানী ছিল) কোন্ দেশে কি ভাবে বিজয়-স্তম্ভ প্রোথিত করিয়াছিলেন, তাহার সাক্ষ্যের অভাব নাই। এলাহাবাদ দুর্গে অশোকের স্তম্ভ (লাট) মধ্যে যে লিপি খোদিত রহিয়াছে, তাহাতে সমুদ্রগুপ্তের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। সমুদ্রগুপ্ত কোন্ কোন্ রাজ্যে আপন বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন, খোদিত লিপিতে তাহার পরিচয় দেদীপ্যমান। তিনি কোশলাধিপতি মহেন্দ্রকে আক্রমণ করিয়া পরে মুক্তিদান করেন। ইহাতে তাঁহার যশ বিশেষ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। মহাকান্তারের 'ব্যাঘ্ররাজ', কেরলের 'মন্তরাজ,' পিষ্টপুরের 'মহেন্দ্র,' কাত্তুরার পার্ব্বত্য-রাজ 'স্বামী দত্ত,' এরাণ্ডাপাল্লার 'বিষ্ণুগোপ', অবমুক্তের 'নীলরাজ', বেঙ্গির 'হস্তিবর্ম্মণ', পালক্কের 'উগ্রসেন', দেবরাষ্ট্রের 'কুবের', কুস্থলপুরের 'ধনঞ্জয়' এবং দাক্ষিণাত্যের অপরাপর রাজন্যবর্গ সকলেই তাঁহার নিকট পরাজিত ও বন্দী হন। এই পরাজিত রাজন্যবর্গকে সমুদ্রগুপ্ত পরিশেষে মুক্তিদান করেন। রুদ্রদেব, মাতেল, নাগদত্ত, চন্দ্রবর্ম্মণ, গণপতি নাগ, নাগসেন, অচ্যুত, নন্দিন, বলবর্ম্মণ এবং আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য নৃপতিগণ সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক ধ্বংস প্রাপ্ত হন; আরণ্য-প্রদেশের রাজন্যবর্গ তাঁহার সম্পূর্ণরূপ অধীনতা স্বীকার করেন। কামরূপ, নেপাল, দাবক, কাত্রিপুর প্রভৃতি সীমান্ত-প্রদেশের নৃপতিগণ তাঁহার আজ্ঞাবহ হইয়া কর-দানে তাঁহার তুষ্টি-বিধান করিয়াছিলেন। মালব, আভীর, মদ্রক, যাদব প্রভৃতি জাতিগণ সকলেই ঐ ভাবে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। যে সকল রাজবংশ রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করেন। সা, সাহিন-সা প্রভৃতি পাশ্চাত্যের রাজন্যবর্গ নানারূপ উপঢৌকন-প্রদানে তাঁহার তুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। সিংহল প্রভৃতি দ্বীপের অধিবাসিগণও তাঁহার বশ্যতা স্বীকারে উপঢৌকনাদি প্রদান করেন। তবেই বুঝুন, বঙ্গদেশীয় নৃপতির বাহুবল কতদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল! প্রাচীন কলিঙ্গ-রাজ্যই বা কাহাদের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া আছে? কলিঙ্গ-রাজ্যের অভ্যুদয়ের মূলেও বঙ্গদেশের প্রভাব। এক সময়ে

গুপ্ত-বংশে বাঙ্গালীর প্রভাব।

বঙ্গদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া কলিঙ্গ-রাজ্য দক্ষিণে গোদাবরী-নদীর মোহানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মেগাস্থিনিসের গ্রন্থে কলিঙ্গ-রাজ্যের যে বর্ণনা প্রাপ্ত হই, তাহাতে জানিতে পারি, একসময়ে কলিঙ্গ-রাজ্যের সমৃদ্ধির অবধি ছিল না। বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যা অনেক দিন পর্য্যন্ত কলিঙ্গ-রাজ্য বলিয়া পরিচিত ছিল। হুয়েন-সাংয়ের ভারতাগমনকালে কলিঙ্গ-রাজ্য গৌরব-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল বটে; কিন্তু তখনও তাহার প্রাচীন গৌরবের কথা সর্ব্বত্র ঘোষিত হইত। প্রাচীন কলিঙ্গ-রাজ্যের ঘন-বসতির বিষয় উল্লেখ করিতে গিয়া হুয়েন-সাং লিখিয়া গিয়াছেন,—'প্রাচীন কলিঙ্গ-রাজ্যে এত লোকের বসতি ছিল যে, পথে প্রায়ই লোকের গায়ে গায়ে ঘর্ষণ হইত; এতই গাড়ী-ঘোড়ার গতিবিধি ছিল যে, সর্ব্বদাই গাড়ীর চাকায় চাকায় ধাক্কা লাগিত।' * বঙ্গদেশের অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক যে কলিঙ্গ-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, ভারত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে সেই কলিঙ্গ-রাজ্যের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। † ইহার পর পাল-বংশের ও সেন-বংশের বিভব-ঐশ্বর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। ‡ পাল-বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল ৮১৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন লাভ করেন। তিনি মগধাদি রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। পাল-বংশীয় রাজা দেবপাল কামরূপ-রাজ্য ও উড়িষ্যা অধিকার করেন। ঐ বংশীয় নারায়ণ পাল উত্তরভারতে একছত্র আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ১০১৭খৃষ্টাব্দে গজনীর মামুদ যখন কনোজ আক্রমণ করেন, কনোজ তখন পাল-বংশের অধিকারভুক্ত ছিল। মামুদ কর্ত্তৃক কনোজ লুণ্ঠিত হওয়ার পর, 'বারি'-নগরে পাল-বংশের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। মহীপাল ১০২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমপুরে এই পাল-বংশের কীর্ত্তি-স্মৃতির বহু ধ্বংসাবশেষ আছে। কোথায় বিক্রমপুর, আর কোথায় কনোজ!—পাল-বংশীয় নৃপতিগণ এতদূর পর্য্যন্ত আপনাদের প্রভাব-বিস্তারে সমর্থ ছিলেন। পাল-বংশের পর, বঙ্গে সেন-বংশের প্রতিষ্ঠা। সেন বংশীয় রাজা বল্লাল-সেন ও লক্ষ্মণ-সেন দক্ষিণে উড়িষ্যা-প্রদেশে ও পশ্চিমে বারাণসী পর্য্যন্ত আপনাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। সেন-বংশের হস্ত হইতেই বঙ্গরাজ্য মুসলমানগণের অধিকারে আসে বটে, কিন্তু মাত্র অষ্টাদশ জন অশ্বারোহী সৈন্যের সাহায্যে বক্তিয়ার খিলিজি যে বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন, তাহা অতিরঞ্জিত। যখন বঙ্গরাজ্য মুসলমানগণের অধিকারভুক্ত হয়, লক্ষ্মণ-সেন তাহার অনেক পূর্ব্বে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ষড়যন্ত্রের ফলে, লক্ষ্মণ-সেনের যুবক-পুত্রের হস্ত হইতে বঙ্গরাজ্য স্খলিত হয়। কিন্তু তাহা হইলেও বাঙ্গালীর বীরত্ব-স্মৃতি সেই সঙ্গেই যে লোপ পাইয়াছিল, তাহা নহে। বঙ্গদেশ মুসলমানগণের করতলগত হওয়ার পরও বাঙ্গালী-

পালবংশ ও সেনবংশ।

---

* "In old days the Kingdom of Kalinga had a very dense population; there shoulders rubbed one with the other, and the axles of their chariot wheels girded together."—*Travels of Houen-Tsang.*

† "It was the Bengalis who founded the Kalinga Empire whence they spread their conquests beyond the seas and colonised Java and other islands of the Indian Archipelago."—*Dawn*, 1907.

‡ 'পৃথিবীর ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে ২৬৩ ও ২৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বীরের বহু বীরত্ব-কাহিনী প্রচারিত আছে। মুসলমানগণের মধ্যেও বঙ্গদেশবাসী বাঙ্গালীর সংখ্যা অল্প ছিল না। তাঁহাদের বাহুবলে রাজ্য-সীমা বৃদ্ধি ও রাজ্য-রক্ষা—বাঙ্গালীরই বীরত্বের পরিচয়। হিন্দুর মধ্যেও সে সময়ে বীরের অভাব ছিল না। মুসলমান-নৃপতিগণের পক্ষ অবলম্বনে যে সকল বাঙ্গালী-বীর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বীরত্ব-কাহিনী অনেকেই অবগত আছেন। আবার প্রবল-প্রতাপ মোগল-সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া, প্রতাপাদিত্য প্রমুখ বীরগণ যে বিপুল বাহু-বলের পরিচয় দিয়াছিলেন, ইতিহাস সে সাক্ষ্য চিরদিন প্রদান করিবে। সীতারাম রায় প্রভৃতির বীরত্ব-কাহিনীর বিষয় স্মরণ করিলেও বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। বঙ্গদেশ অধিকার করিয়া ইংরেজ যখন অন্যান্য প্রদেশে আপনাদের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিতে প্রযত্নপর হইলেন, ইংরেজের সহায়তা-কল্পে তখনই কি বাঙ্গালী অল্প বাহুবলের পরিচয় দিয়াছিল? সুদূর ব্রাজিলে গিয়া সেনাপতি-পদে সমাসীন থাকিয়া, বাঙ্গালী বীর কর্ণেল সুরেশচন্দ্র সেদিনও পাশ্চাত্য-জগৎকে বিমুগ্ধ করিয়াছেন। অধিক দৃষ্টান্ত বাহুল্য মাত্র। ফলতঃ, বিবিধ প্রকারেই প্রতিপন্ন হয়, বঙ্গদেশ কখনই শৌর্য্যবীর্য্যহীন ছিল না।

জ্ঞানের গৌরবে, বিদ্যার বিভবে, বঙ্গদেশ চিরদিনই সম্মানের উচ্চ-চূড়ায় সমারূঢ়। যে জ্ঞানালোক যখনই জগতে বিচ্ছুরিত হইয়াছে, বঙ্গদেশে তখনই তাহার ঔজ্জ্বল্য লক্ষ্য করিয়াছি। ধর্ম্মের মধ্যেই জ্ঞানের বিকাশ। ধর্ম্মের যে ভাব যখনই পরিস্ফুট হইয়াছে, বঙ্গদেশে তখনই সে ভাব প্রকট দেখিয়াছি। কল্পনার দুরধিগম্য কালে প্রচারিত শাস্ত্র-গ্রন্থাদির উৎপত্তি-স্থান-নির্ণয়ে প্রয়াস বিফল বটে; কিন্তু শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় ও টীকায় বঙ্গদেশ যে গুণপনা দেখাইয়া আসিয়াছে, তাহার তুলনা নাই। প্রসঙ্গতঃ দুইটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। ন্যায়-শাস্ত্রের আলোচনায় বাঙ্গালার স্থান অদ্বিতীয়। নব্য-ন্যায়—নবদ্বীপের নিজস্ব সম্পত্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।* ন্যায়-দর্শনের যে সকল টীকাকার প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই বঙ্গদেশবাসী। স্মৃতি-শাস্ত্রেও বঙ্গদেশের প্রতিষ্ঠার অবধি নাই। স্মৃতি-শাস্ত্র-সম্বন্ধে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন বঙ্গদেশে যুগান্তর উপস্থিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই অনুশাসন মান্য করিয়া আজিও হিন্দু-সমাজ পরিচালিত হইতেছে। ধর্ম্মপ্রচারক-রূপে, শিক্ষক-রূপে, নীতি-শাস্ত্র ধর্ম্ম-শাস্ত্র প্রভৃতি বিবিধ সদ্গ্রন্থ প্রণয়নে বাঙ্গালীর যশ চিরকালই উজ্জ্বল ছিল। অতীতের গভীর অন্ধকারের মধ্য হইতে ইতিহাসের যে আলোক-রশ্মি বিচ্ছুরিত দেখি, তাহাতে শিক্ষাপ্রচার-কার্য্যে বাঙ্গালী উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছে—দেখিতে পাই। প্রাচীন-ভারতে যে সকল প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়, তাহার অনেক স্থলেই বাঙ্গালীর প্রাধান্য ছিল। মুসলমানগণের বঙ্গদেশ অধিকারের পূর্ব্বে, গৌড়াধিপতিগণের রাজত্বকালে, নবদ্বীপের উচ্চ-সমৃদ্ধির দিনে, নবদ্বীপ যে শিক্ষার কেন্দ্রস্থান ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। নবদ্বীপের পতনের পর, ভারতে বৌদ্ধ-প্রভাবকালে, নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাপন্ন হয়। কিন্তু ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েও

জ্ঞানের গৌরব ও বিদ্যার বিভব।

---

* ন্যায়-দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা 'পৃথিবীর ইতিহাস' প্রথম খণ্ডে দশম পরিচ্ছেদ প্রভৃতিতে দ্রষ্টব্য।

বাঙ্গালায় কৃতিত্ব দেদীপ্যমান। নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয় যেমন বিশ্ববিশ্রুত, ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যক্ষ শীলভদ্রের নামও সেইরূপ দেশ-বিখ্যাত। এক সময়ে ভারতবর্ষে—শুধু ভারতবর্ষেই বা বলি কেন, দেশে বিদেশে—শীলভদ্রের সম্মান ও প্রতিষ্ঠার অবধি ছিল না। চৈন-পরিব্রাজক হুয়েন-সাং যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন, তিনি শীলভদ্রের মনীষা ও সম্মান-দর্শনে তাঁহার চরণ চুম্বন করিয়া তাঁহার চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়াছিলেন। শীল-

নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ে শীলভদ্র।

ভদ্রের কর্ত্তৃত্বাধীনে নালন্দার বিশ্বাবিদ্যালয়ে পনর শত দশ জন অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন এবং দশ সহস্রাধিক ছাত্র ঐ বিশ্বাবিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেন। পূর্ব্বাধ্যক্ষ ধর্ম্মপাল নির্ব্বাণ-লাভ করিলে, শীলভদ্র অধ্যক্ষ-পদে প্রতিষ্ঠিত হন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে, পঞ্চাশ বৎসরাধিক-কাল, শীলভদ্র নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত ছিলেন। ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতেন। প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপক দশ জন, পঞ্চাশৎ-বিধ সূত্র-গ্রন্থে ও শাস্ত্র-গ্রন্থে অভিজ্ঞ ছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক পাঁচ শত জন, ত্রিংশ-বিধ সূত্র-গ্রন্থে শাস্ত্র-গ্রন্থে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক সহস্র জন, বিংশ-বিধ সূত্র-গ্রন্থে ও শাস্ত্র-গ্রন্থে প্রতিষ্ঠান্বিত ছিলেন। অধ্যক্ষ শীলভদ্র, সর্ব্ববিধ সূত্র-গ্রন্থে ও শাস্ত্র-গ্রন্থে অভিজ্ঞতা লাভ করায়, অধ্যক্ষের প্রধান-পদ প্রাপ্ত হন। হুয়েন-সাং যখন শীলভদ্রের প্রজ্ঞায় বিমুগ্ধ হইয়া অশ্রুপূর্ণ-লোচনে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, শীলভদ্রের বয়ঃক্রম তখন ১০৬ বৎসর অতীত হইয়াছিল। সেই নিক্লেশ নির্ব্বিকার মহাত্মার দর্শন-লাভে হুয়েন-সাং যে কি পর্য্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তেই তাহা বিবৃত আছে। এইবার একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখুন দেখি,—শীলভদ্র কে ছিলেন এবং কিরূপ প্রতিভা-প্রভাবে নালন্দার বিশ্ববিদ্যা-লয়ে অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত হন? শীলভদ্র—এই বঙ্গদেশেই ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। হুয়েন-সাংয়ের বর্ণনায় শীলভদ্র 'সমতটের অধিবাসী ছিলেন' বলিয়া প্রকাশ। সমতটের স্থান-নির্দ্দেশে মতান্তর আছে বলিয়া, কেহ তাঁহাকে বিক্রমপুরের (রামপালের) অধিবাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু আমাদের নির্দ্ধারণ-ক্রমে শীলভদ্র নবদ্বীপ বা সমুদ্রগড়ের নিকটবর্ত্তী স্থানের অধিবাসী ছিলেন বলিয়াই প্রতিপন্ন হন। বিক্রমপুরেরই হউন, আর নবদ্বীপেরই হউন, শীলভদ্র যে বাঙ্গালী ছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। তবে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করায় তাঁহার নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। প্রথমে তিনি 'দন্তদেব' বলিয়া পরিচিত ছিলেন; পরিশেষে শীলভদ্র নামে অভিহিত হন। ষোড়শ বর্ষ বয়সে তিনি চতুর্ব্বেদে সাঙ্খ্য-ন্যায় প্রভৃতি দর্শন-শাস্ত্রে এবং আয়ুর্ব্বেদে পারদর্শিতা লাভ করেন। তাহার পর তিনি নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠান্বিত হন। অল্পদিনের মধ্যেই নালন্দায় তাঁহার প্রতিভা-প্রভা প্রকাশ পায়; বিশ্ববিদ্যালয়ের তাৎকালিক অধ্যক্ষ ধর্ম্মপাল তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হন।

বাঙ্গালী দন্তদেবের শীলভদ্র নাম।

'দন্তদেব' কি প্রকারে শীলভদ্র নামে অভিহিত হইলেন, তদ্বিষয়ে একটী গল্প আছে। দাক্ষিণাত্যের একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষধর্ম্মপালের সহিত বিচার করিবার জন্য, মগধ-রাজ দরবারে উপস্থিত হন। সেই সময়, ধর্ম্মপাল বিচারার্থ আহূত হইলে, দন্তদেব তাঁহাকে বাধা

দেন;—ধর্ম্মপালের পরিবর্ত্তে স্বয়ং সেই দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিতের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। একজন ত্রিংশবর্ষ বয়স্ক বাঙ্গালী অধ্যাপক সেই বিচারে প্রবৃত্ত হইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করায়, তাঁহার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী মনে করিয়া, অন্যান্য অধ্যাপকেরা তাহাতে আপত্তি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন; পরন্তু, দন্তদেব জয়লাভ করিলে তাঁহাদের প্রধান্যে বিঘ্ন ঘটিবে আশঙ্কায় ঈর্ষান্বিত হইয়াও তাঁহারা দন্তদেবকে বিচারে প্রবৃত্ত করার পক্ষে বাধা দিয়াছিলেন। ধর্ম্মপাল, দন্তদেবের শক্তি-সামর্থ্য অবগত ছিলেন। সুতরাং তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া, দন্তদেবকেই বিচার-ক্ষেত্রে উপস্থিত করিলেন। মগধের দরবারে, মগধাধিপ-সান্নিধ্যে, বিচার আরম্ভ হইল। অধ্যাপকগণ ও ছাত্রগণ সকলেই সেখানে উপস্থিত হইলেন। নানাস্থানের পণ্ডিত-মণ্ডলী এবং দর্শকবৃন্দ সে দ্বন্দ্ব দেখিতে আসিলেন। বহুক্ষণ বিচার-বিতর্ক চলিল। অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত জয়-পরাজয় নির্ণয় হইল না। পরিশেষে দন্তদেব জয়লাভ করিলেন। তাঁহার যুক্তি-তর্কে এবং বাক্‌পটুতায় সভাস্থ সকলেই বিমুগ্ধ হইলেন। বাঙ্গালী পণ্ডিতের জয়ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইল। বাঙ্গালী পণ্ডিতের সেই বিজয়-বার্ত্তা—কেবল ভারতে নহে—পৃথিবীর বিভিন্ন-প্রান্তে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ৫৫৪ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। দন্তদেবের এবম্বিধ বিজয়লাভে মগধাধিপতি পরম পরিতুষ্ট হন, এবং পুরস্কার-স্বরূপ তিনি দন্তদেবকে গয়ার সন্নিকটে এক বিস্তৃত ভূখণ্ড পারিতোষিক প্রদান করেন। কিন্তু দন্তদেব সে পারিতোষিক গ্রহণ করিতে চাহেন না। তিনি ভিক্ষু;—তিনি ভূ-সম্পত্তি লইয়া কি করিবেন? পাছে পুনরায় বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয়—এই আশঙ্কায়, তিনি রাজপ্রদত্ত পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেন। ইহার পর, এই মহাপুরুষের মহত্ত্ব স্মরণ করিয়া, পূর্ব্বোক্ত প্রদেশে মগধাধিপতি একটী বৌদ্ধ-সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। সে সঙ্ঘারাম বুদ্ধদেবের নামে উৎসর্গীকৃত হয়। আর সেই হইতে দন্তদেব 'শীলভদ্র' নামে পরিচিত হন। 'শীলভদ্র' সংজ্ঞা শ্রেষ্ঠ সাধুত্বের পরিচায়ক। চৈন-গ্রন্থকারগণ 'শীলভদ্র' নামেই দন্তদেবের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী বলিয়া বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন;—তাই শীলভদ্রকে বাঙ্গালী বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি। নচেৎ, নাম দেখিয়া তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া বুঝিবার উপায় নাই। শীলভদ্র নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ে শতাধিক বৎসর কাল বিষয়-বিশেষের অধ্যাপক-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। শীলভদ্র ভিন্ন ভারতমাতার আরও পঞ্চাশ জন সুসন্তান বিভিন্ন সময়ে নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, আপনাদের যশঃপ্রভায় দিগ্‌দিগন্ত প্রভান্বিত করিয়াছিলেন। নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁহারা অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই এক একজন বিশ্ব-বিখ্যাত। কিন্তু তাঁহারা যে কোন্ প্রদেশের অধিবাসী, নাম দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই। শীলভদ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যাপক ধর্ম্মপাল, বাঙ্গালারই পাল-রাজগণের বংশ-সম্ভূত বলিয়া মনে হইতে পারে। মাধ্যমিক দর্শন-শাস্ত্রের উদ্ভাবন-কর্ত্তা বলিয়া নাগার্জ্জুন প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন। তিনি একসময়ে নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কে ছিলেন, কোথায় তাঁহার নিবাস ছিল, জানিবার উপায় নাই। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের

নালন্দার অধ্যাপকগণ।

একজন বিখ্যাত অধ্যাপকের নাম—'গুণমতি বোধিসত্ত্ব'। সাঙ্খ্য-দর্শনের তর্ক-যুক্তি খণ্ডন করিয়া, বৌদ্ধমত প্রতিষ্ঠা দ্বারা তিনি প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহারও জন্মভূমির পরিচয় পাওয়া যায় না। নালন্দার আর একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপকের নাম—'প্রভামিত্র'। চীনদেশে 'ধর্ম্মচক্র' প্রবর্ত্তনার মূলে তাঁহার প্রভাব বিদ্যমান্। প্রভামিত্র বাঙ্গালী ছিলেন বলিয়াই পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গালী প্রভামিত্র ধর্ম্ম-সংক্রান্ত যে ক্রিয়া-পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করেন, আজিও চীনদেশে এবং তিব্বতে সেই ক্রিয়া-পদ্ধতি প্রচলিত আছে। নালন্দার আর আর অধ্যাপকগণের মধ্যে 'জিনমিত্র', 'চন্দ্রপাল', 'স্থিরমতি', 'জ্ঞানচন্দ্র', 'শীঘ্রবুদ্ধ' প্রভৃতি সবিশেষ প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য তিব্বতের নৃপতি কর্ত্তৃক জিনমিত্র তিব্বতে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব্বে ও পরে ভারতবর্ষে আর আর যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যুদয় ঘটিযাছিল, তত্তৎস্থানেও বাঙ্গালীর বিদ্যানুরাগিতা পরিদৃশ্যমান। পূর্ব্ব-গৌরবের স্মৃতি বিস্মৃতির অতল গর্ভে নিমজ্জিত হউক, কিন্তু পরবর্ত্তিকালে বিদ্যার প্রভায় বঙ্গদেশ যে অন্যান্য প্রদেশকে মুহ্যমান করিয়াছিল, সে পরিচয় অনুসন্ধান করিবার আবশ্যক হয় না। আধুনিক ইতিহাসই সে পরিচয় বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। বঙ্গদেশে মুসলমানগণের আগমনের পর হইতে নবদ্বীপে জ্ঞান-সূর্য্যের পুনরুদয় লক্ষিত হয়। উহার অব্যবহিত পূর্ব্বে বিক্রমশীলায় বৌদ্ধসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় এবং মিথিলায় ব্রাহ্মণদিগের বিশ্ববিদ্যালয় সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু মুসলমানগণের বঙ্গদেশে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ-বিহার হইতে বৌদ্ধদিগের উচ্ছেদ-সাধন আরম্ভ হয়। কি জানি কি কারণে, মুসলমান-আক্রমণকারিগণ বৌদ্ধ-ভিক্ষুকগণের উপর নিদারুণ উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছিলেন। সে নির্য্যাতনে অনেকের প্রাণনাশ হয়, অনেকে নেপালে ও তিব্বতের দিকে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করেন। অধুনা তিব্বতের উপত্যকা-প্রদেশ যে অসংখ্য বৌদ্ধ-আবাসে পরিপূর্ণ, মুসলমান আক্রমণ-কারিগণের উৎপীড়নই তাহার প্রধান কারণ। পূর্ব্ব হইতেই ঐ সকল দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তৃত হইয়াছিল বটে; কিন্তু তান্ত্রিক বৌদ্ধ-সম্প্রদায় ঐ সময়েই ঐ সকল দেশে প্রধানতঃ প্রতিষ্ঠিত হন। বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, তারা প্রভৃতি প্রতিমূর্ত্তির প্রবর্ত্তনা—ঐ সময়েরই। ঐ সময়ই বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহ সমূলে উৎপাটিত হইয়াছিল। বক্তিয়ার খিলিজি যখন বিহার হইতে বঙ্গদেশে আগমন করেন, সেই সময়ে বিক্রমশীলার বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়, মিথিলার প্রভা ক্ষীণ হইয়া আসে। বক্তিয়ার বিক্রমশীলার বিশ্ববিদ্যালয় অগ্নি-সংযোগে ভস্মসাৎ করেন। এ দিকে, বঙ্গদেশের প্রতিভাবান্ ছাত্রগণের মিথিলায় গতিবিধির পথ অবরুদ্ধ হয়। সুতরাং মিথিলার গর্ব্বও খর্ব্ব হইয়া আসে। তখন, একমাত্র নবদ্বীপই ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিল। আর, সে পক্ষে মুসলমান-শাসনকর্ত্তৃগণ যে সম্যক্ সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। মিথিলার গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার মূল—বাসুদেব সার্ব্বভৌম। ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষার জন্য মিথিলা অনেক দিন হইতে প্রতিষ্ঠান্বিত ছিল। ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন-উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ছাত্রগণ মিথিলায় গতিবিধি করিতেন। কিন্তু ন্যায়-সংক্রান্ত

বিক্রমশীলার ও মিথিলার বিশ্ববিদ্যালয়।

কোন গ্রন্থ বা টীকা মিথিলা হইতে কাহারও স্থানান্তরে লইয়া যাইবার ক্ষমতা ছিল না। মিথিলার পাঠ সমাপ্ত হইলে ছাত্রগণকে কেবলমাত্র 'উপাধি' লইয়া দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইত। তাঁহারা পুঁথিপত্র কিছুই সঙ্গে লইতে পাইতেন না। মিথিলার পুঁথিপত্র অন্যত্র চলিয়া গেলে, মিথিলার প্রাধান্য লোপ পাইবে,—এই আশঙ্কায়, অধ্যাপকগণ এ বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে, বাসুদেব সার্ব্বভৌম তাঁহাদের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করেন ;—মৈথিলী পণ্ডিতগণের ব্যবস্থায় বিপর্য্যয় ঘটিয়া যায়। নবদ্বীপে থাকিয়া আপন পিতা মহেশ্বর বিশারদের নিকট বাসুদেব ব্যাকরণ, সাহিত্য, ব্যবহার-বিধি প্রভৃতি শিক্ষা করেন। তাহার পর তিনি মিথিলায় ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে যান। তখন পক্ষধর মিশ্র মিথিলার প্রধান নৈয়ায়িক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। বাসুদেব তাঁহারই নিকট ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। অধ্যয়ন শেষ হইলে 'শলাকা-পরীক্ষা' গৃহীত হয়। সে পরীক্ষার পদ্ধতি বড়ই কঠিন। শলাকার দ্বারা অধ্যাপক পুঁথি বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। পুঁথির যে পৃষ্ঠায় গিয়া শলাকার অগ্রভাগ স্পর্শ করিবে, সেই পৃষ্ঠার সেই অংশের লিখিত বিষয় পরীক্ষার্থীকে বলিতে হইবে। অধ্যাপক পক্ষধর মিশ্র পুঁথির পত্র মধ্যে শতাধিক বার শলাকা বিদ্ধ করেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, বাসুদেব প্রত্যেকবারই শলাকা-সংলগ্ন অংশের পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহাতে অধ্যাপক পক্ষধর মিশ্র অত্যধিক সন্তুষ্ট হইয়া বাসুদেবকে 'সার্ব্বভৌম' উপাধি প্রদান করেন। কিন্তু তখনও কেহই বুঝিতে পারেন নাই যে, সমস্ত ন্যায়-শাস্ত্র বাসুদেবের কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছে। কেহ কালী কলমে লিখিয়া আনিতে পারিতেন না ;—এতদিন তাই মিথিলার ন্যায়-শাস্ত্র-সংক্রান্ত গ্রন্থাদি মিথিলার বাহিরে যাইতে পারে নাই। কিন্তু বাসুদেব অন্তরের মধ্যে যে তাহা লিখিয়া লইয়া গেলেন, কেহই তাহার সন্ধান পাইলেন না। সমগ্র 'তত্ত্ব-চিন্তামণি' এবং 'কুসুমাঞ্জলির' কবিতাংশ কণ্ঠস্থ করিয়া লইয়া, বাসুদেব সংগোপনে বারাণসী-তীর্থ-পর্য্যটনে গমন করেন। তিনি মিথিলার সম্পৎ অন্তরস্থ করিয়া লইয়াছেন প্রকাশ পাইলে, মৈথিলীগণের হস্তে তাঁহার প্রাণ-হানির আশঙ্কা ছিল ; তাই তিনি তীর্থযাত্রার নাম করিয়া বারাণসী-ক্ষেত্রে পলায়ন করেন। সেখানে গিয়া বাসুদেবের হৃদয়ে বিদ্যার অভিনব জ্যোতি বিকীর্ণ হয়। বারাণসী-ধামে তিনি বেদান্ত-দর্শনে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এইরূপে, ন্যায়-দর্শন, বেদান্ত-দর্শন, উভয় দর্শনে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া বাসুদেব যখন নবদ্বীপে প্রত্যাবৃত্ত হন, তখন আপনা-আপনিই তাঁহার যশ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। নবদ্বীপে আসিয়া বাসুদেব সার্ব্বভৌম অভিনব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও তাঁহার বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বলিয়া রাজকীয় সনন্দ লাভ করে নাই ; কিন্তু তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য—পরীক্ষা-গ্রহণ ও উপাধি-দান প্রভৃতি—সমভাবেই চলিয়াছিল। অপিচ, তাঁহার বিদ্যালয়ের অনুসরণে নানাস্থানে নূতন নূতন বিদ্যালয়ের উদ্ভব হইয়াছিল। এ হিসাবে বাসুদেব-প্রবর্ত্তিত বিদ্যালয়ই মুসলমান-শাসন-কালে নদীয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। সার্ব্বভৌম-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে যে সকল ছাত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহারা এক

বাসুদেব সার্ব্বভৌম।

একটী রত্ন-মধ্যে পরিগণিত। বাসুদেব সার্ব্বভৌমের চারি জন প্রধান ছাত্রের নাম উল্লেখ করিতেছি। চারি জনের প্রত্যেকেই এক একটী দিকপাল-বিশেষ। প্রথম, রঘুনাথ শিরোমণি; ইনি নবান্যায়-শাস্ত্রের প্রবর্ত্তয়িতা। দ্বিতীয়, রঘুনন্দন; ইনি বঙ্গদেশ-প্রচলিত হিন্দু-ব্যবহার-বিধির—স্মৃতিশাস্ত্রের প্রবর্ত্তয়িতা। তৃতীয়, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ; ইনি বিলুপ্তপ্রায় তান্ত্রিক-মতের প্রতিষ্ঠাতা। চতুর্থ, শ্রীচৈতন্যদেব; বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবর্ত্তনায় ইনি যেভাবে ভারতবর্ষকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন, কাহারও অবিদিত নাই। অধিক বলিতে কি, পরিশেষে বাসুদেব সার্ব্বভৌমও ইঁহার প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-মন্ত্রেরই অনুবর্ত্তী হন। জীবনের শেষভাগে বাসুদেব সার্ব্বভৌম শ্রীক্ষেত্রে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। সেখানে তত্রত্য নৃপতি গজপতি প্রতাপরুদ্র (১৫২০ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার পৃষ্ঠপোষণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়। বাসুদেব সার্ব্বভৌম 'সার্ব্বভৌম-নিরুক্তি' নামক ন্যায়-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ঐ গ্রন্থ এক সময়ে নৈয়ায়িকগণের নিকট সমাদৃত ছিল। ১৪৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাসুদেবের বিদ্যমান-কাল প্রতিপন্ন হয়। সার্ব্বভৌম যে ভিত্তি-প্রস্তর প্রোথিত করিয়া যান, ছাত্র রঘুনাথ শিরোমণি কর্ত্তৃক তাহার উপর সুদৃঢ় সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়। রঘুনাথ শিরোমণি কিরূপে মিথিলার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া নবদ্বীপে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, সে বৃত্তান্ত বিশেষ কৌতূহলপ্রদ। রঘুনাথের জীবন-কাহিনী আলোচনা করিলে, সে বিবরণ বিশেষভাবে অবগত হওয়া যাইবে। অনুমান ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপে রঘুনাথের জন্ম হয়। চারি বৎসর বয়সের সময় রঘুনাথের পিতৃবিয়োগ ঘটে। অতি কষ্টে রঘুনাথের জননী রঘুনাথকে লালন-পালন করিতে থাকেন। সেই সময়ে, রঘুনাথের অভিনব প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বের পরিচয় পাইয়া, তাঁহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বুঝিতে পারিয়া, বাসুদেব সার্ব্বভৌম তাঁহার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করেন। রঘুনাথের জননী একদিন চতুষ্পাঠী হইতে রঘুনাথকে আগুন আনয়ন করিতে বলেন। আগুন আনিবার উপযোগী কোন পাত্র না লইয়াই রঘুনাথ আগুন আনিতে যান। তখন চতুষ্পাঠীর ছাত্রেরা জলন্ত অঙ্গার লইয়া রঘুনাথকে দিতে যায়। রঘুনাথ উঠান হইতে মাটী তুলিয়া লইয়া হাতের উপর রাখিয়া আগুন গ্রহণ করেন। অধ্যাপক বাসুদেব সার্ব্বভৌম দুর হইতে বালকের এই প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাহার পরই রঘুনাথ, সার্ব্বভৌমের স্নেহদৃষ্টি লাভ করেন। ব্যঞ্জনবর্ণ শিক্ষাদানের সময়েও সার্ব্বভৌম রঘুনাথের প্রতিভার পরিচয় পান। ক, খ পড়িবার সময় রঘুনাথের মনে প্রশ্নের উদয় হয়,—'খ' বর্ণ আগে না হইয়া 'ক' বর্ণ আগে হইল কেন? বলা বাহুল্য, বালকের এই প্রশ্নের সমাধানে বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে স্বর-বিজ্ঞান ও ব্যাকরণ-তত্ত্ব বিশদভাবে বিবৃত করিতে হইয়াছিল। ব্যাকরণ, সাহিত্য, কোষ-গ্রন্থ, ব্যবহার-বিধি প্রভৃতিতে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, বাসুদেবের নিকট রঘুনাথ ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়নের সময় রঘুনাথ এরূপভাবে জটিল প্রশ্ন সকল উত্থাপন করিতেন যে, সে সকল প্রশ্নের সমাধানে অধ্যাপক-প্রবরের মস্তিষ্ক অনেক সময় বিঘূর্ণিত হইত। দুরূহ প্রশ্নের সমাধানের জন্য গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া,

রঘুনাথ শিরোমণি।

রঘুনাথ অনেক সময় বৃক্ষতলে বসিয়া দিন কাটাইয়া দিতেন। তাঁহার প্রগাঢ় চিন্তার ফলে, অধ্যাপক বাসুদেব সার্ব্বভৌম অনেক সময় তাঁহার নিকট তর্কযুদ্ধে পরাজিত হইতেন। অধিক কি, ন্যায়-শাস্ত্র সম্বন্ধে বাসুদেবের টীকা পরবর্ত্তিকালে রঘুনাথের যুক্তিপ্রভাবে নিষ্ফল প্রমাণিত হইয়াছিল। নবদ্বীপের পাঠ সমাপন করিয়া, রঘুনাথ মিথিলার বিদ্যা অধিগত করিবার জন্য উৎসুক হন। সার্ব্বভৌমের সম্মতিক্রমে ছাত্র সাজিয়া রঘুনাথ মিথিলায় গমন করেন। তখনও পক্ষধর মিশ্র জীবিত ছিলেন। পক্ষধর মিশ্রকে বিচারে পরাভূত করিয়া নবদ্বীপে উপাধি-দানের উপযোগী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবেন, ইহাই রঘুনাথের লক্ষ্য ছিল। রঘুনাথ এক-চক্ষু-হীন ছিলেন; তাই প্রধানতঃ তিনি 'কাণা রঘুনাথ' বলিয়া অভিহিত হইতেন। একচক্ষুহীন বলিয়া সহপাঠীরা প্রথম প্রথম তাঁহাকে বিদ্রূপ করিত। একটী শ্লোক আবৃত্তি করিয়া তাহারা বলিত,—"ইন্দ্র সহস্রলোচন, মহাদেব ত্রিলোচন, আর সকলে দ্বিলোচন; কে হে তুমি একলোচন?" কিন্তু অধিক দিন ছাত্রগণকে এ বিদ্রূপ করিতে হয় নাই। পক্ষধর মিশ্রের চতুষ্পাঠীতে প্রবেশ-লাভ করিয়া, রঘুনাথ অল্প দিনেই ছাত্রগণের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ-স্থান অধিকার করেন। সহপাঠিগণ তো দূরের কথা, অধ্যাপক পক্ষধর মিশ্রই অনেক সময় রঘুনাথের সহিত তর্কে পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেন। ন্যায়ের তর্কে ক্রুদ্ধ হইয়া পক্ষধর মিশ্র এক দিন রঘুনাথকে নীচজনোচিত গালাগালি করেন। নীরবে সে তিরস্কার সহ্য করিয়া রঘুনাথের প্রাণ প্রতিহিংসানলে জ্বলিয়া উঠে। রঘুনাথ পক্ষধর মিশ্রের সংহার-সাধনে কৃতসঙ্কল্প হন। একদিন গভীর নিশায়, তরবারি গ্রহণ করিয়া, পক্ষধর মিশ্রের মুণ্ডচ্ছেদের জন্য রঘুনাথ নিভৃতে বসিয়া থাকেন। শরৎকাল; পূর্ণিমার চন্দ্র হাসির ছটায় নভস্তল আলো করিয়া আছেন। সেই শারদীয়া পূর্ণিমা নিশীথে, পক্ষধর মিশ্র আপন সহধর্ম্মিণীর পার্শ্বে বসিয়া নৈশ-শোভা দর্শন করিতেছিলেন। সেই অবস্থায়, পক্ষধর মিশ্রের সংহার-সাধন করিতে গিয়া, রঘুনাথ থমকিয়া দাঁড়াইলেন। প্রধানতঃ সেই মনোহর রজনীতে পতি-পত্নীর একাসনে উপবেশনের দৃশ্যে তাঁহার হৃদয় চমকিয়া উঠিল। তাহার পর তাঁহাদের দুই জনের মধ্যে যে কথোপকথন চলিতেছিল, তাহা শুনিয়া, রঘুনাথ অধিকতর বিচলিত হইয়া উঠিলেন। পতিকে সম্বোধন করিয়া পত্নী কহিলেন,—"নাথ! এই নিশামণির ন্যায় উজ্জ্বল সামগ্রী পৃথিবীতে আর কি আছে?" পক্ষধর উত্তর দিলেন,—"প্রিয়তমে! আছে, আছে বৈ কি!—ইহার অপেক্ষাও এক অত্যুজ্জ্বল সামগ্রী আছে। আজ অপরাহ্নে আমি কেবল সেই ভাবনাই ভাবিতেছি। বঙ্গদেশ হইতে এক যুবা নৈয়ায়িক আসিয়াছে; মিথিলাকে সে যেন এক অভিনব সমস্যায় ফেলিয়াছে। আজ প্রাতঃকালে এক বিষম তর্কে সে আমায় পরাজয় করিয়াছে। আমার মনে হয়, তাহার জ্ঞান ঐ পূর্ণচন্দ্রের অপেক্ষাও জ্যোতিষ্মান্। সে আজ আমার হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিয়াছে।" হত্যাভিলাষে প্রস্তুত রঘুনাথ অলক্ষিতে দাঁড়াইয়া পতি-পত্নীর কথোপকথন শুনিতেছিলেন। পত্নীর প্রশ্নের পর পতির উত্তর যখন শুনিলেন, তাঁহার হস্ত হইতে তরবারি আপনা-আপনি স্খলিত হইয়া পড়িল। রঘুনাথ বাষ্প-গদগদকণ্ঠে ছুটিয়া আসিয়া পক্ষধর মিশ্রের পদপ্রান্তে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে

লাগিলেন। পক্ষধর মিশ্র রঘুনাথকে আলিঙ্গন করিলেন। পরদিন প্রভাতে সকল ছাত্রের সমক্ষে রঘুনাথের নিকট আপন পরাভব স্বীকার করিয়া পক্ষধর মিশ্র মহত্ত্বের পরিচয় দিলেন। পক্ষধর মিশ্রের পরাজয়-স্বীকারের ফলে, নবদ্বীপের সুপ্রতিষ্ঠা হইল; নবদ্বীপ—ছাত্রগণকে উপাধি-দানে ক্ষমতা পাইলেন। অনুমান ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে রঘুনাথ মিথিলায় এই বিজয়-লাভ করেন। আর, সেই হইতেই নদীয়ায় অভিনব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে সত্তর বৎসর বয়সে রঘুনাথ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। রঘুনাথের স্মৃতি আজিও নবদ্বীপ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। বাসুদেব, রঘুনাথ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠার ফলে, কাশী, কাঞ্চি, দ্রাবিড়, গুর্জ্জর, উজ্জয়িনী প্রভৃতি স্থান হইতে ছাত্রগণ আজিও নবদ্বীপে ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আসেন। ভারতবর্ষের আর আর বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয় অতি প্রাচীন বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়। পুরাকালে এক সময়ে এই তক্ষশীলা প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিনিময়ের কেন্দ্রস্থল-মধ্যে পরিগণিত ছিল। তখন মিশর, বাবিলন, সিরিয়া, আরব, ফিনিসিয়া, ইফেসিয়া * প্রভৃতি পাশ্চাত্যদেশের পণ্ডিতগণ এবং চীন প্রভৃতি প্রাচ্য-দেশের পণ্ডিতগণ জ্ঞানানুশীলনের জন্য তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত হইতেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে ও পরবর্ত্তিকালে বহুদিন পর্য্যন্ত, মুর-দিগের অভ্যুদয়-সময়ে, করডোভা-নগরের † বিশ্ব-বিদ্যালয় পাশ্চাত্য-দেশে জ্ঞানের কেন্দ্রস্থল মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। তখন আফ্রিকার, ইউরোপের, আরবের ও ইহুদিদিগের বিদ্যার্থিগণ করডোভায় মুর-দিগের বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত হইয়া জ্ঞানের আদান-প্রদান করিতেন। করডোভা হইতেই তখন বিভিন্ন জাতি পরস্পরের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিচয়াদি প্রাপ্ত হইতেন। তক্ষশীলা—প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের উভয় দেশের সম্বন্ধ রক্ষা করিয়াছিল। ‡ ভারতবর্ষের জ্ঞান-রত্ন প্রধানতঃ তক্ষশীলার পথেই পাশ্চাত্য-দেশে সংবাহিত হইত।

রঘুনাথের বিজয়লাভে নদীয়ার গৌরব।

তক্ষশীলার বিশ্ব-বিদ্যালয়।

---

* ইফেসাস্ (Ephesus) বা ইফেসিয়া—এসিয়া মাইনরের একটী প্রাচীন নগর। লিডিয়া প্রদেশে কেষ্ট্রাস্ নদীর মোহানায় ঐ নগর অবস্থিত ছিল। এক সময় এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হয়।

† করডোভা—স্পেন-দেশের একটী প্রসিদ্ধ নগর। ৭১১ খৃষ্টাব্দে মুরগণ এই নগর অধিকার করেন। তৎপরে ৭৫৬ খৃষ্টাব্দে এই নগর মুর-দিগের রাজধানী মধ্যে পরিগণিত হয়। সেই হইতে এই নগর বিদ্বজ্জনগণের সমাগম-জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১২৩৬ খৃষ্টাব্দে এই নগর স্পেনীয়-গণের অধিকারে আসে। ঐ সময় আরবদিগের (মুরদিগের) হস্ত হইতে ঐ নগর ফার্ডিনাণ্ড উদ্ধার করেন।

‡ "In the Moorish University (Cordova), African, Arab, Jew and European all met, some to give and others to take in the great exchange of culture. It was possible there to take, as it were, a bird's-eye view of the most widely-seperated races of men, each with their characteristic outlook. In the same fashion, Taxila in her day was one of the focal points, one of the great resonators, as it were, of Asiatic culture. Here between 600 B. C. to 500 A. D, met Babylonian, Syrian, Egyptian, Arab, Phoenician, Ephesian, Chinese and Indian. The knowledge that was to go out of India must first be carried to Taxila, thence to radiate in all directions."—Sister Nivedita in the *Modern Review.*

খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত তক্ষশীলার কোন-না-কোনরূপ সমৃদ্ধির নিদর্শন দেখিতে পাই। এরিয়ান, ষ্ট্রাবো, প্লিনি প্রমুখ পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ প্রায় সকলেই তক্ষশীলার সমৃদ্ধির বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এরিয়ানের বর্ণনায় প্রকাশ,—'সিন্ধুনদের ও হাইডাস্‌পাসের (বর্ত্তমান বিয়াস্ বা বিপাশা) মধ্যে এই বহুজন-পূর্ণ সুবৃহৎ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন নগর বিদ্যমান।' ষ্ট্রাবোর বর্ণনায় প্রকাশ,—'এই সুবৃহৎ নগরে সুচারু বিধি-বিধান প্রবর্ত্তিত। ইহার পারিপার্শ্বিক প্রদেশ জনপূর্ণ এবং সমধিক উর্ব্বরতা-সম্পন্ন।' প্লিনি এই নগরকে সুপ্রসিদ্ধ নগর বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। রামায়ণে এবং মহাভারতে নানাস্থানে তক্ষশীলার উল্লেখ দেখা যায়। বৌদ্ধগণের 'সুত্ত'-গ্রন্থে (মহাপরিনিব্বাণ সুত্ত ও মহাসুদশন সুত্ত প্রভৃতিতে) এই নগরের অশেষ সমৃদ্ধির পরিচয় আছে। এই জনকোলাহলপূর্ণ নগরে সর্ব্বদাই হস্তীর নিনাদ, অশ্বের হ্রেষারব, শকটের ঘর্ঘর-শব্দ প্রতিধ্বনিত হইত। কোথাও ঢক্কার নিনাদ, কোথাও মৃদঙ্গের ধ্বনি, কোথাও বীণার ঝঙ্কার শুনা যাইত। কোথাও সঙ্গীতের স্বরলহরী প্রবহমান ছিল। কোথাও করতাল মন্দিরা ঘণ্টার সুরে আনন্দের কল-কল্লোল উঠিয়াছিল। কোথাও—'খাও দাও আনন্দে দিন কাটাও' নীতির অনুসরণে অনেকেই আনন্দে দিন কাটাইতেছিল। ফলতঃ, প্রধান নগরে বা রাজধানীতে যেরূপভাবে লোকের দিন কাটে, বৌদ্ধ 'সুত্ত'-গ্রন্থের বর্ণনায় তক্ষশীলার সেই অবস্থারই পরিচয় পাই। গৌতম-বুদ্ধের বিদ্যমানকালে তক্ষশীলা গান্ধার-প্রদেশের সীমান্ত-নগর এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের একতম কেন্দ্রস্থান ছিল। চন্দ্রগুপ্ত, অশোক প্রভৃতির রাজত্বকালে তক্ষশীলা বৌদ্ধদিগের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়। শকগণের এবং গ্রীকদিগের প্রভাব তক্ষশীলায় অনেক পরিমাণে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। আলেকজাণ্ডার যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন, তক্ষশীলায় তিনি তিন দিন অবস্থিতি করিয়া-ছিলেন। তক্ষশীলার অধিবাসিগণ তাঁহার অভিযানে অনেকরূপ সাহায্য করিয়াছিল। ঐ তক্ষশীলার নিকটে আলেকজাণ্ডার দুইটী নগর (নিকাইয়া, বুকেফালা) প্রতিষ্ঠা করেন। গ্রীক ঔপনিবেশিকগণের বসবাসের জন্যই ঐ দুই নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সূত্রে তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জ্ঞানার্জ্জনে গ্রীকদিগের বিশেষ সুবিধা ঘটিয়া-ছিল। ফিলোষ্ট্রেটস্ (খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর) বলেন,—"আপোলোনিয়াস্ জ্ঞানান্বেষণে তক্ষশীলায় গমন করিয়াছিলেন। বিদেশভ্রমণে, জ্ঞানার্জ্জনে তিনি পিথাগোরাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। আপোলোনিয়াসের তক্ষশীলায় গমন-সময়ে তক্ষশীলার নৃপতি গ্রীক-ভাষায় তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তক্ষশীলা নগরের প্রাচীরের বহির্দ্দেশে আপো-লোনিয়াস্ একটী জাঁকজমকপূর্ণ মন্দির দেখিতে পান। সেই মন্দিরের গাত্রে চারিধারে তাম্রফলকে সুন্দর সুন্দর চিত্র অঙ্কিত ছিল। রাজা পোরসের সহিত আলেকজাণ্ডারের যুদ্ধের দৃশ্যাবলী সেই চিত্রে তিনি প্রকটিত দেখেন।" খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে তক্ষ-শীলা ইউক্রেডাইটসের রাজ্যান্তর্ভুক্ত হয়। গ্রীস-দেশীয় ইউক্রেডাইটস্ বাক্‌ট্রিয়ার অধি-পতি ছিলেন। তাঁহার হস্ত হইতে ঐ নগর শকগণের অধিকারে আসে।* এইরূপে

* "পৃথিবীর ইতিহাস" দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, ১০৬ হইতে ১০৯ পৃষ্ঠায় তক্ষশীলা-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

গ্রীকগণের এবং শকগণের অধিকারে আসায়, তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ দুই জাতির প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে বিদ্যাদান জন্য কখনও অর্থগ্রহণ করার পদ্ধতি ছিল না। পাশ্চাত্য-জাতির সহিত সম্বন্ধ-সূত্রে তক্ষশীলায় অর্থের বিনিময়ে বিদ্যা-দানের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়। আরও, তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয় আয়ুর্ব্বেদ-চর্চ্চায় এক সময়ে যে অধিকতর চেষ্টান্বিত হইয়াছিল, তাহারও কারণ—গ্রীসের প্রভাব। সেই সময়ে ভারত-বর্ষের আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র অধিগত করিয়া লইবার জন্য গ্রীকগণ বিশেষভাবে উদ্যোগী হইয়া-ছিলেন। ইউরোপের প্রাচীন চিকিৎসা-বিজ্ঞানে আজিও তাই ভারতের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ছায়াপাত দেখিতে পাই। তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয়-বিষয়ে বৌদ্ধজাতক-গ্রন্থেও বিশিষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান্। 'মহাবগ্‌গ' জাতক খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর গ্রন্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। * 'মহাবগ্‌গ' জাতকে অষ্টম খণ্ডে জীবকের প্রসঙ্গে তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু বিবরণ বিবৃত আছে। জীবক সাত বৎসর কাল তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি চিকিৎসা-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। আয়ুর্ব্বেদে—উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় তাঁহার পারদর্শিতার অবধি ছিল না। তাঁহার অধ্যাপক তাঁহাকে পরীক্ষা করার জন্য একবার তাঁহার হস্তে একখানি কোদালি প্রদান করেন। কোদালি প্রদান করিয়া অধ্যাপক, জীবককে বলিয়া দেন,—"এই তক্ষশীলা সহরের চারিদিকে এক যোজনের মধ্যে যেখানে যত বৃক্ষ আছে, পরীক্ষা করিয়া আইস। তাহাদের মধ্যে যে সকল বৃক্ষ ভৈষজ্য-মধ্যে পরিগণিত নহে, সেই সকল বৃক্ষের পরিচয় আমাকে প্রদান করিতে হইবে।" অধ্যাপকের আদেশক্রমে জীবক সেই প্রদেশের প্রায় সমস্ত বৃক্ষের ভৈষজ্য-গুণ পরীক্ষা করিয়া দেখেন। পরিশেষে অধ্যাপকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন,—"কোনও বৃক্ষই ভৈষজ্য-গুণ-বিহীন নহে।' এই বলিয়া তিনি একে একে কোন্ বৃক্ষের কি গুণ, বর্ণন করিলেন।" জীবক আত্রেয় ঋষির ছাত্র ছিলেন। বুদ্ধদেব তাঁহার মিত্র বলিয়া পরিচিত। বিম্বিসার যখন মগধের রাজপদে অধিষ্ঠিত, জীবক রাজ-চিকিৎসক-পদ লাভ করেন। আয়ুর্ব্বেদে জীবক এক সময়ে প্রমাণ-মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। এই জীবকের প্রসঙ্গে জাতক-গ্রন্থে তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা পরিচয় প্রাপ্ত হই। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগ ছিল। ঐ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা দেওয়া হইত, গান্ধর্ব্ব-বেদ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, অর্থশাস্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি কোন বিদ্যারই অধ্যাপনার ত্রুটি ছিল না। বঙ্গ, বিহার, উত্তর-পশ্চিম প্রভৃতি প্রদেশের নানা-শ্রেণীর ছাত্রগণ ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে যাইতেন। রাজ-পুত্রগণও সে সময় ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া অধ্যয়নে রত থাকিতেন। অধুনা "রেসিডেন্-সিয়াল" 'কলেজ' বা 'ইউনিভারসিটির' প্রবর্ত্তনার জন্য নানারূপ চেষ্টা চলিয়াছে। কিন্তু ঐ প্রথার সুফল ভারতবর্ষেই প্রথম প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিল। গুরুগৃহে বাস করিয়া শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করার প্রথা ভারতবর্ষেই প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। কিবা প্রবল প্রতাপশালী রাজার

জীবকের প্রতিষ্ঠা।

* *Vide* Rhys David's and Oldenburg's Preface to the Vinaya Texts in the Sacred Books of the East Series.

পুত্র, কিবা ভিক্ষোপজীবী দরিদ্র ব্রাহ্মণের তনয়,—গুরুগৃহে সকলকেই সমভাবেই কষ্ট সহ্য করিয়া বিদ্যা-শিক্ষা করিতে হইত। এক সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া বিদ্যা-শিক্ষার জন্য, রাজা-প্রজা পরস্পরের মধ্যে প্রীতির ভাব বদ্ধমূল থাকিত। তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম প্রথম ছাত্রগণ—ধনী দরিদ্র সকলেই—একভাবে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন। পরবর্ত্তিকালে ঐ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপর পাশ্চাত্য-প্রভাব বিস্তৃত হওয়ায় শিক্ষাদান-প্রণালীর কতকটা রূপান্তর ঘটিয়াছিল। জাতক-গ্রন্থে তাহারও একটী বিবরণ দেখিতে পাই। 'তিল-মুখি' জাতকে প্রকাশ, কাশীনরেশ ব্রহ্মদত্ত আপন পুত্রকে তক্ষশীলায় শিক্ষালাভার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন। কুমারের বয়ঃক্রম যখন ষোড়শ বর্ষ, রাজা তাঁহাকে এক জোড়া বিনামা, পত্র-বিনির্ম্মিত একটী ছত্র এবং এক সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়া বলেন,—'যাও পুত্র, তক্ষশীলায় গিয়া শিক্ষালাভ করিয়া আইস।' কুমার যথাদেশ তক্ষশীলায় গমন করেন। তক্ষশীলায় গমন করিয়া, শিক্ষকের আবাস-সন্নিধানে উপনীত হইয়া, দেখিতে পান,—শিক্ষক ছাত্রগণের নির্দ্দিষ্ট পাঠ শেষ করাইয়া আপন কুটীর-সম্মুখে পাদচারণা করিয়া বেড়াইতেছেন। দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া, বিনামা খুলিয়া, ছত্র নামাইয়া রাখিয়া, কুমার শিক্ষকের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। ক্লান্ত শ্রান্ত বালককে নিকটে আসিতে দেখিয়া, শিক্ষক জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি কে? কোথা হইতে আসিতেছ?" বিদ্যার্থী কুমার উত্তর দিলেন,—"আমি বারাণসী হইতে আসিতেছি। আমি রাজপুত্র।" শিক্ষক জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি কি জন্য আসিয়াছ?" কুমার বিনীতস্বরে কহিলেন,—"আমি আপনার নিকট অধ্যয়ন করিতে আসিয়াছি।" শিক্ষক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি শিক্ষকের উপযুক্ত পারিশ্রমিক লইয়া আসিয়াছ? অথবা তুমি আমার পরিচর্য্যা করিয়া শিক্ষালাভ করিবে মনস্থ করিয়াছ?" কুমার কহিলেন,—"আমি গুরুদক্ষিণার উপযোগী অর্থই আনিয়াছি।" এই বলিয়া, শিক্ষকের চরণতলে কুমার সেই সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলেন। কুমারকে আর কোনই কষ্ট স্বীকার করিতে হইল না। শিক্ষক প্রাণপণ-যত্নে স্বতন্ত্রভাবে কুমারকে শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গুরুগৃহে কুমারের আদরের অবধি রহিল না। এ প্রথা পাশ্চাত্যের অনুসরণে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, নিঃসন্দেহ। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে শিক্ষা-সম্বন্ধে এবম্বিধ বৈষম্যের দৃষ্টান্ত ক্বচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, ঐ তক্ষশীলায় জীবক যখন পাঠ করিয়াছিলেন, কোশল-রাজ্যের যুবরাজ প্রসেনজিৎ তখন তাঁহার সহিত একসঙ্গে শিক্ষা পাইয়াছিলেন। জীবক একজন অজ্ঞাত-কুলশীল ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত। অথচ, রাজপুত্রের সহিত তিনি একত্র শিক্ষালাভ করিয়া-ছিলেন, এবং পরিশেষে রাজসংসারে উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তক্ষশীলার অধ্যাপকের পদেও তিনি সমাসীন হইতে পারিয়াছিলেন। তক্ষশীলায় তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তির বিষয় কোনক্রমেই উড়াইয়া দেওয়া যায় না। এই জীবক কোন্ দেশের অধিবাসী ছিলেন? নানা-রূপে প্রতিপন্ন হয়, জীবক বাঙ্গালী ছিলেন। একা জীবক নহেন; ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও অনেক বাঙ্গালীর কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল। যেমন শিক্ষা-প্রচার-কার্য্যে, তেমনই শিক্ষার মূলভিত্তি-গ্রন্থনে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব দেখিতে পাই। ভাব—ভাষায় নিবদ্ধ হয়। ভাষা—বর্ণমালার সাহায্যে স্থায়িত্ব লাভ করে। সে হিসাবে বর্ণমালাই ভাষার অঙ্গ। ভাব—প্রাণ;

ভাষা—শরীর। শরীর না থাকিলে যেমন প্রাণের অস্তিত্ব অনুভূত হয় না, বর্ণমালা ব্যতীত ভাষারও সেইরূপ অস্তিত্বাভাব ঘটে। যে জাতির মস্তিষ্কে এই বর্ণমালার কল্পনা প্রথমে প্রতিভাত হইয়াছিল, সে জাতির ধীশক্তির তুলনা হয় না। আমরা পূর্ব্বেই ("পৃথিবীর ইতিহাস" দ্বিতীয় খণ্ডে চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে 'ভারতের বর্ণমালা' প্রসঙ্গে) প্রতিপন্ন করিয়াছি, বর্ণমালার আদি-উৎপত্তি-স্থান এই বঙ্গদেশ। ফিনিসীয়ায় বলুন, গ্রীসে বলুন, মিশরে বলুন, সেবিয়ায় বলুন, বঙ্গীয় বর্ণমালার পূর্ব্বে কোথাও কোনও বর্ণমালার উৎপত্তি হয় নাই। উচ্চারণ-হিসাবে বঙ্গীয় বর্ণমালা স্বভাব-সঙ্গত; আকৃতি-হিসাবেও বঙ্গীয় বর্ণমালা স্বভাব-উৎপন্ন। উচ্চারণ-সম্বন্ধে সামান্য একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করি। একটী বঙ্গাক্ষরের নাম—'ক', একটীর নাম—'খ', একটীর নাম—'গ', ইত্যাদি। অন্য দেশের অন্য বর্ণমালায় উচ্চারণের এমন সহজ পদ্ধতি দেখিতে পাইবেন না। অন্য ভাষায় এই 'ক', 'খ' প্রভৃতি বর্ণের উচ্চারণে দুই বা ততোধিক বর্ণের সংযোগ-সাহায্য আবশ্যক হইবে; আর তাহাতেও ঐ সকল বর্ণের প্রকৃত উচ্চারণ সূচিত হইবে কি না—বলা যায় না। ইংরাজী ভাষা আজকাল সর্ব্বত্রই প্রচলিত; সুতরাং ইংরাজী ভাষার বর্ণমালার দৃষ্টান্তে এ তত্ত্ব বেশ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। ভাবিয়া দেখুন দেখি, ক, খ, গ, প্রভৃতি এক একটী বর্ণের উচ্চারণে ইংরাজীর কয়টী বর্ণের সাহায্য আবশ্যক হয়? ইংরাজীর 'কে' অক্ষরের পর 'এ' যোগ করিলে ঠিক 'ক' হয় না; উহার সহিত আবার 'ডবলিউ' যোগ করিয়া কেহ কেহ 'ক' বর্ণের উচ্চারণ নির্দ্ধারণ করেন। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, সে নির্দ্ধারণও সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। এইরূপ, 'খ' বর্ণের উচ্চারণে ইংরাজীর অন্ততঃ তিনটী বর্ণের (কে, এইচ, এ) সাহায্য আবশ্যক হয়। 'গ' বর্ণ সম্বন্ধেও ঐরূপ একাধিক বর্ণের প্রয়োজন বুঝিতে পারি। তবেই বুঝুন, কোন্ বর্ণমালা সম্পূর্ণ ও স্বাভাবিক! আবার অন্য পক্ষে আকৃতির বিষয় অনুধাবন করিলেও বুঝা যায়, কতকগুলি সরল-বক্র রেখার সমবায়ে বঙ্গাক্ষর সংগঠিত, সুতরাং উহাই স্বাভাবিক অক্ষর। শাস্ত্রদর্শী হিন্দু অবশ্যই অবগত আছেন, এই বঙ্গাক্ষরই তন্ত্রশাস্ত্রে বীজ-রূপে পরিকল্পিত হইয়াছে। অধুনা একলিপি-বিস্তারের কল্পনায় একপক্ষ নাগরাক্ষর প্রবর্ত্তনার পক্ষে চেষ্টা পাইতেছেন; অপর পক্ষ 'রোমান' অক্ষর চালাইবার পক্ষে উদ্যোগী হইয়াছেন। কিন্তু কেহ বঙ্গাক্ষরের উপযোগিতা উপলব্ধি করিতেছেন না। বঙ্গীয় বর্ণমালা ভিন্ন অপর কোনও বর্ণমালা, এমন কি নাগরাক্ষর পর্য্যন্ত, সম্পূর্ণ ও স্বাভাবিক নহে। অপিচ, অতি প্রাচীনকালে বঙ্গীয় বর্ণমালাই শাস্ত্রগ্রন্থে ও পণ্ডিতগণের লিপি-কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। বর্ণমালার দুই একটী বর্ণের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলেই এ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। মনে করুন—৯। এই ৯-বর্ণ এক বঙ্গীয় বর্ণমালা ভিন্ন অন্য বর্ণমালায় নাই। নাগরাক্ষরের মধ্যে যদিও অধুনা ৯-কার রূপে ব্যবহৃত একটী বর্ণ দেখিতে পাই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা ৯-কার নহে; ঋ-ফলান্ত ল-কার ৯-কার-রূপে ব্যবহৃত মাত্র। নাগরাক্ষরে 'লৃ' ও যাহা, ৯-ও তাহা; যথা;—ক্লৃ, ক্লৃ। কিন্তু '৯'-কারের ও 'লৃ'র আকার একরূপ হইলে কত গণ্ডগোল ঘটিতে পারে, একটু অনুসন্ধান করিলেই উপলব্ধি হইবে। আর্য্যভট্ট-প্রবর্ত্তিত বীজগণিতের সংখ্যা-

বর্ণমালার উৎপত্তি-স্থান বঙ্গদেশ।

লিখন-প্রণালীতে বর্ণমালার প্রত্যেক বর্ণে এক একটী সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হয়। যেমন 'ক্' বলিতে ১, 'খ' বলিতে ২, 'গ্' বলিতে ৩ ইত্যাদি; বলা বাহুল্য, ঐ ক্, খ্, গ্ হলন্তান্ত। ক্ হইতে ম্ পর্য্যন্ত পঁচিশটী হলন্তান্ত বর্ণ 'বর্গাক্ষর' বলিয়া অভিহিত হয়। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বর্ণ (যথা,—য, র, ল, ব, শ প্রভৃতি ব্যঞ্জনবর্ণ এবং অ, আ প্রভৃতি স্বরবর্ণ) অবর্গ বলিয়া পরিচিত। বর্গাক্ষরে যেরূপ সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হয়, অবর্গাক্ষরেও সেইরূপ সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সে হিসাবে হলন্তান্ত য=৩, র=৪, ল=৫, ব=৬, শ=৭ ইত্যাদি। অ=১ ও ১০; ই=১০০ ও ১০০০; ঌ=১০,০০০০০০০ ও ১০০,০০০০০০০ ইত্যাদি।* এক অক্ষরের সহিত অন্য অক্ষর মিলিত হইলে পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। আবার, বর্গাক্ষরের সহিত অবর্গাক্ষর যুক্ত হইলে অবর্গাক্ষরের পরিমাণ একরূপ, এবং অবর্গাক্ষরের সহিত অবর্গাক্ষর যুক্ত হইলে তাহার পরিমাণ আর একরূপ হইয়া থাকে। বর্গাক্ষরে মিলিত হইলে অ-কারের পরিমাণ ১, অবর্গাক্ষরে মিলিত হইলে অ-কারের পরিমাণ ১০, ইত্যাদি। যথা;—কি=১×১০০=১০০, শি=৭×১০০০=৭০০০; একই 'ই'কার (অবর্গ) 'ক'-য়ে (বর্গাক্ষরে) যুক্ত হওয়ায়, 'ই'-কারের পরিমাণ ১০০ হইল, আবার ঐ 'ই'-কার 'শ'-য়ে (অবর্গে) যুক্ত হওয়ায় 'ই'-কারের পরিমাণ ১০০০ হইল। পার্থক্য কত বুঝিয়া দেখুন। এ হিসাবে ঌ-কারের এবং ল্ৃর পার্থক্য কত, সহজেই উপলব্ধি হয় না কি? এই সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে 'ভারতী' পত্রিকায় যে সমীচীন মন্তব্য প্রকাশিত হয়, নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি; বক্তব্য বিষয় তাহাতে অধিকতর বিশদীকৃত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি। "দেবনাগর অক্ষরে ঌ-কারের আকৃতি ল‍ৃ এবং ঋ-কারান্ত ল, ল্ৃ, এই বর্ণের আকৃতি ল‍ৃ। কোন বর্ণের সহিত সংযুক্ত হইলে উভয়ের আকৃতি সমান, ল‍ৃ। কিন্তু ঌ যদি বর্গাক্ষরে যুক্ত থাকে, তাহা হইলে উহার স্থান অর্ব্বুদ, এবং অবর্গাক্ষরে বৃন্দ; ল্ৃ শব্দে পাঁচ কোটী বুঝায়, সুতরাং প্রকৃত অর্থ বুঝিতে গোল বাধে। একটী উদাহরণ যথা;—"ছ্লৃ"। বাঙলায় লিখিলে উহা ছঌ অথবা ছ্ল্ৃ এই দুই বুঝাইতে পারে। কিন্তু উভয়ের কত পার্থক্য, তাহা দেখ। ছঌ=৭×১০৮=সাত অর্ব্বুদ। ছ্ল্ৃ=ছ্ৃ+ল্ৃ=৭ নিযুত+৫ কোটি=সাতান্ন কোটি। সুতরাং বুঝা যায়, আর্য্যভটীয় আধুনিক দেবনাগর অক্ষরে প্রথমে লিখিত হয় নাই।" ইত্যাদি। প্রোক্ত প্রসঙ্গে আমরা কয়েকটী অভিনব সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। প্রথম, আর্য্যভট্টের সময়ে বঙ্গীয় বর্ণমালাই প্রচলিত ছিল, বঙ্গীয় বর্ণমালাই পণ্ডিতগণের নিকট সমাদৃত হইত। দ্বিতীয়তঃ, আর্য্যভট্ট বাঙ্গালী ছিলেন, তিনি বঙ্গীয় বর্ণমালাই ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। তৃতীয়তঃ, বঙ্গদেশই বীজগণিতের উৎপত্তি-স্থান; বাঙ্গালী আর্য্যভট্টই বীজগণিতের প্রবর্ত্তয়িতা। আর্য্যভট্ট যে ঌ-কারের ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, কয়েকটী বৈদিক শব্দে এই ঌ-কারের ব্যবহার দেখিতে পাই। কঌপ্ত, কঌপ্তকীলা, কঌপ্তধূপ, কঌপ্তিক প্রভৃতি ঌ-সংযুক্ত শব্দ শাস্ত্র-গ্রন্থে আছে। সে সকল স্থলেও 'ল্ৃ'র পরিবর্ত্তে ঌ-কারেরই

বীজগণিতের প্রবর্ত্তন বঙ্গদেশ।

---

* বর্গাক্ষরের ও অবর্গাক্ষরের সংখ্যা লিখন-প্রণালী "পৃথিবীর ইতিহাস" তৃতীয় খণ্ডে, ৩৩১ হইতে ৩৩৪ পৃষ্ঠায় বিশেষভাবে বিবৃত আছে।

প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং বেদাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে বঙ্গাক্ষরই ব্যবহৃত হইত বুঝা যায়। তন্ত্র-শাস্ত্রে বঙ্গাক্ষরের বিশেষ প্রয়োজন। বীজমন্ত্র-সমূহ সমস্তই বঙ্গীয় বর্ণমালা। তান্ত্রিক ক্রিয়া-কলাপে হোম-বেদিকায় যে বর্ণ অঙ্কিত হয়, তাহাও বঙ্গীয় বর্ণমালা। বঙ্গাক্ষর লোপ পাইলে, তন্ত্রের বীজাক্ষর লোপ পাইবে, ধর্ম্মকর্ম্মে বিঘ্ন ঘটিবে। শাস্ত্রানুশাসন মান্য করিতে হইলে, সেরূপভাবে বঙ্গাক্ষরের বিলোপ-সাধন-পক্ষে চেষ্টা কখনই যুক্তিযুক্ত নহে। অধিকাংশ হিন্দুই তন্ত্রের অনুশাসন মান্য করেন। বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের মধ্যেও তান্ত্রিক মত প্রচলিত আছে। সুতরাং বঙ্গাক্ষরের উপযোগিতা অনেককেই মান্য করিতে হয়। অন্য কোনও দেশের কোনও বর্ণমালা ধর্ম্মের সহিত এইরূপ সংশ্রবযুক্ত নহে। যাহা ধর্ম্মের সহিত সংশ্রবযুক্ত, তাহাই আদিভূত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তবেই বুঝা যায়, বঙ্গদেশই বর্ণমালার আদি উৎপত্তি-স্থান। বঙ্গীয় বর্ণমালা হইতেই, স্থুল-সূক্ষ্ম রেখার পরিকল্পনায়, রূপান্তর ঘটাইয়া, অন্যান্য বর্ণমালার সৃষ্টি করা হইয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, শাস্ত্রগ্রন্থ-সমূহ কোথায় কি ভাবে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কিন্তু এই বর্ণমালার প্রসঙ্গে বেশ বুঝিতে পারা যায়, অন্ততঃ শাস্ত্রের একাঙ্গ (তন্ত্রশাস্ত্র) এই বঙ্গদেশেই পরিপুষ্ট হইয়াছিল। এই উক্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বা প্রতিবাদের আদৌ সম্ভাবনা নাই। মানবের আদি-উৎপত্তি-স্থান নির্ণয়ে, দেবগণের আবাসভূমি-নির্দ্ধারণে, আজিকালি অনেকে অনেকরূপে মস্তিষ্ক-চালনা করিতেছেন। সে দলে তত্ত্বদর্শী এমন দুই একজনকেও দেখিতে পাই,—যাঁহারা দেবলোক বলিতে প্রাচীন বঙ্গদেশকে এবং মানবের আদিপুরুষ মনুর অধিষ্ঠান-স্থান বলিতে এই বঙ্গদেশকেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যাঁহারা অন্য কোন দূর জনপদে দেবলোকের অন্বেষণ করেন, অথবা ভারতের বহির্দ্দেশে মানবের আদি-বাসস্থান বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত দলের যুক্তি-সিদ্ধান্ত যে অধিক ভঙ্গপ্রবণ, তাহা আমরা স্বীকার করি না। যাহা হউক, সে সকল তত্ত্ব এখানকার আলোচনার বিষয়ীভূত নহে। প্রসঙ্গান্তরে তদ্বিষয়ের আলোচনা দেখিতে পাইবেন। * ধর্ম্মপ্রচার-ক্ষেত্রে, জ্ঞানালোক বিস্তারে, বঙ্গদেশের প্রতিষ্ঠার তুলনা নাই। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ধর্ম্মপ্রচারের ও জ্ঞান-বিস্তারের জন্য যাঁহারা চিরযশস্বী হইয়া আছেন, ভারতীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণই তাঁহাদের শীর্ষস্থানীয়। † আবার সে পক্ষে

---

* আর্য্যগণের আদি-বাস-স্থান যে ভারতবর্ষ, তাঁহারা যে উত্তর-মেরু বা মধ্য এসিয়া হইতে ভারতবর্ষে আসেন নাই, এ প্রমাণ আমরা পূর্ব্বেই ("পৃথিবীর ইতিহাস" প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য) করিয়াছি। মানবের আদি-জন্মভূমি বিষয়েও আভাস সেখানে দেওয়া হইয়াছে। ভবিষ্যতে তদ্বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা যাইবে।

† অধুনা পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন পণ্ডিতগণের গবেষণা প্রভাবেই প্রতিপন্ন হইতেছে, মহাত্মা যীশুখৃষ্টও স্বধর্ম্মপ্রচারে অনেকাংশে ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের অনুসরণ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র দত্তের প্রাচীন ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত গ্রন্থ হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি;—" It is clear, therefore, that the entire structure of church government and church institutions—in so far as there is resemblance between the two systems—was borrowed from the East by the West, not from the West by the East,...The glory of Buddhism consists not in the pompous ceremonials which were witnessed in Nalanda and Thibet, and which were reproduced after several centuries in Rome but in the moral precepts of surpassing beauty which were preached in Beneras and Rajagriha by Gautama himself, and were repeated after five centuries in Jerusalem. 'Never has any one', says M. Renan, 'so much as He

বাঙ্গালীর যশঃপ্রভাই অধিকতর সমুজ্জ্বল। দৃষ্টির অন্তরালভূত দূর-অতীতকালে পৃথিবীর যে যে প্রান্তে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল, ভারতের কোন্ প্রদেশের কৃতিত্ব তাহাতে প্রকটিত, নির্ণয় করিবার উপায় নাই। খৃষ্ট-পূর্ব্ব শতাব্দীতে যাঁহারা ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে বাঙ্গালী ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি। পরবর্ত্তিকালে চীনে, জাপানে, তিব্বতে, সিংহলে যে ধর্ম্ম-মত প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা বাঙ্গালীরই কৃতিত্বের নিদর্শন। নেপালের পথে তিব্বত হইয়া চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশ লাভ করে। পরিশেষে উহা জাপানে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যে যে কয় জন প্রধান ধর্ম্মপ্রচারকের পরিচয় পাই, তাঁহারা প্রায় সকলেই বাঙ্গালী ছিলেন। খৃষ্ট-জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তিকালে চীনে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হয়। খৃষ্ট-জন্মের দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম-সংক্রান্ত গ্রন্থাদি ভারতবর্ষ হইতে চীনে প্রেরিত হইয়াছিল। সেই সকল গ্রন্থ বঙ্গাক্ষরে লিখিত ছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। বঙ্গদেশ হইতেই জ্ঞান-রশ্মি প্রথমে চীনে বিস্তৃত হইয়াছিল। জিনমিত্র বাঙ্গালী ছিলেন, পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। তিব্বতের অধিপতি কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া তিনি তিব্বতে ধর্ম্মপ্রচার করিতে যান। সেখান হইতে তিনি চীনদেশে গিয়াছিলেন বলিয়াও কিম্বদন্তি আছে। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান—বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম-গ্রহণ করেন। বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যে ব্রতী হইয়া, তুষার-মণ্ডিত হিমালয় অতিক্রম করিয়া, তিনি তিব্বতে ও চীনে ধর্ম্মপ্রচার করিতে গিয়াছিলেন। খৃষ্ট-জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তিকালে নালন্দাব বিশ্ববিদ্যালয় যখন প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময়ে এই সকল বাঙ্গালী প্রচারকগণ ভারতবর্ষের বাহিরে জ্ঞানালোক বিস্তার-কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। খৃষ্ট-জন্মের পরবর্ত্তিকালে, পাল-বংশের রাজত্বকালে, অতীশ ও ধর্ম্মপাল তিব্বতে ও চীনে ধর্ম্মপ্রচার করিতে যান। উঁহারা উভয়েই বাঙ্গালী। উঁহাদের উভয়েরই প্রভাব চীনদেশ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়। যে ধর্ম্মপাল তিব্বতে গমন করেন, তিনিই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। সে হিসাবে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ধর্ম্মপালও বাঙ্গালী বলিয়া প্রতিপন্ন হন। ফা-হিয়ানের ভারত আগমনের দুই বৎসর পূর্ব্বে বজ্রবোধি চীনদেশে ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যে যশঃসম্মান লাভ করেন। আর আর যে সকল ধর্ম্মপ্রচারক চীনে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 'ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য' প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সেই সকল প্রচারকগণের মধ্যে বোধিধর্ম্ম, মঞ্জুশ্রী, বোধিসেন,—তিন জনই বাঙ্গালী ছিলেন বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। তাঁহারা জাপানে গিয়া কয়েকখানি ধর্ম্মগ্রন্থ রাখিয়া আসেন। সেই সকল ধর্ম্মগ্রন্থ বঙ্গাক্ষরে লিখিত ছিল। এ ঘটনা

ধর্ম্ম-প্রচারে বাঙ্গালী।

(Jesus) made the interests of humanity predominate in His lite over the littlenesses of self-love. There never was a man, Sakya Muni, perhaps, excepted, who has to this degree trampled under foot family, the joys of the world, and all temporal care.' To do good unto those who smite you, to love those who hate and persecute you, and to relinquish the world for righteousness,—these were the cardinal teachings of Gautama and of Jesus. Was this similarity in precepts merely accidental ?"—*Civilisation in Ancient India* by Mr. R. C. Dutt পৃথিবীর ইতিহাস তৃতীয় খণ্ডে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ১২৫ পৃষ্ঠায় এই বিষয়ের বিশদ আলোচনা দ্রষ্টব্য।

—খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণও অধুনা এ ঘটনার সাক্ষ্য দিতেছেন। 'উষ্ণিষা-বিজয়-ধর্ম্মী' নামক গ্রন্থের একখানি পুঁথি জাপানে 'হোরিউজি' মন্দিরে ধর্ম্মযাজকগণ কর্তৃক সম্পূজিত হইয়া থাকে। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে যেরূপ বর্ণমালা প্রচলিত ছিল, ঐ পুঁথি সেইরূপ বর্ণমালায় লিখিত। কেহ কেহ ঐ পুঁথি খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করেন; কিন্তু সে অনুমান সমীচীন নহে। * ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীনদেশে ভারতীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণের বিশেষরূপ প্রতিষ্ঠার নিদর্শন আছে। ঐ সময়ে প্রায় তিন সহস্রাধিক বৌদ্ধ-ভিক্ষু ও দশ সহস্রাধিক গৃহস্থ ভারতবর্ষ হইতে চীনে গিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। বোধিধর্ম্ম ঐ সময়েই চীনে বিশেষরূপ সম্মান প্রাপ্ত হন এবং জাপানে গমন করেন। সুতরাং জাপানে যে পুঁথি পাওয়া যায়, তাহা ষষ্ঠ শতাব্দীর ; এবং ঐ পুঁথি বোধিধর্ম্ম-প্রদত্ত পুঁথি বলিয়াই অনুমান হয়। পরিব্রাজক ইৎসিং তাম্রলিপ্ত-বন্দর হইতে পাঁচ লক্ষ শ্লোকপূর্ণ যে ধর্ম্মগ্রন্থ চীনে লইয়া যান, তাহাও বঙ্গাক্ষরে লিখিত ছিল বলিয়া বুঝা যায়। সেই পুঁথিও চীনে জাপানে প্রচারিত হইয়াছিল। আলেকজন্দ্রিয়ার 'থেরাপিউট্‌স'-গণের মধ্যে অথবা প্যালেষ্টিনের 'এসিন'-গণের মধ্যে যে সকল বৌদ্ধ-ভিক্ষুর প্রভাব বিস্তার হইয়া পড়িয়া ছিল, আর যাহার ফলে খৃষ্ট-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনার মূলে সন্নীতি-সমূহের উদ্ভব দেখিতে পাই, সে বৌদ্ধভিক্ষুগণ ভারতেরই অধিবাসী ছিলেন। † তাঁহাদের মধ্যেও বাঙ্গালীর প্রভাব সম্ভবপর। রাজচক্রবর্ত্তী অশোক যে সকল প্রচারককে দেশে বিদেশে পাঠাইয়াছিলেন, প্রমাণ পাই, তাঁহাদের মধ্যে বাঙ্গালী অনেক ছিলেন। পাশ্চাত্যের প্রচার-কার্য্যে বাঙ্গালীর সে পরিচয় যদিও নির্ণয় করা দুঃসাধ্য ; কিন্তু প্রাচ্য-দেশে চীন-জাপানে বাঙ্গালীর সে স্মৃতি এখনও লোপ পায় নাই। চীনদেশের ধর্ম্মালয়ে আজিও বাঙ্গালী শ্রমণগণের প্রতিমূর্ত্তি সম্পূজিত হইয়া থাকে। প্রাচ্যে চীন-জাপানে ধর্ম্মাধ্যক্ষ-পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বাঙ্গালী যে সম্মান লাভ করিয়াছিল, দক্ষিণে—সিংহলে—সিংহলের সুপ্রতিষ্ঠার দিনে, বাঙ্গালীর সেই সম্মান লক্ষ্য করুন। সিংহলাধিপতি পরাক্রমবাহুর প্রভাব প্রতিপত্তির বিষয় ইতিহাসে বিশেষরূপে পরিকীর্ত্তিত দেখিতে পাই।

---

* বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে দীনেশ বাবু একাদশ শতাব্দীর অক্ষর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু বহুদর্শী পণ্ডিতগণের মতে ঐ বর্ণমালা খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর বঙ্গীয় বর্ণমালা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। যথা—"The priests of the temple worship the manuscript of a Buddhistic work called *Usnisa Vijaya Dharmi*, written in a character considered by experts to be identical with that prevalent in Bengal in thc sixth century."—*Anecdota Oxoniensis*, Vol. III, as quoted in the *Indian Shipping*.

† প্যালেষ্টাইনের এসিন-গণ (Essenes) যে বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণের ন্যায় জীবন যাপন করিতেন, আর তাঁহাদের সদ্ভাব-পরম্পরা ঐ প্রদেশে বিকাশ প্রাপ্ত হওয়ার সমসময়েই যে যীশুখৃষ্ট আবির্ভূত হন ও তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত-মধ্যে এসিন-গণের (সুতরাং বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণের) ধর্ম্মমতের ছায়াপাত হয়, তাহা অনেকেই এখন স্বীকার করিতেছেন। ডিন্ ম্যান্‌সেল ও ডিন্ মিলম্যান্ প্রমুখ চিন্তাশীল খৃষ্টানগণ এবং সেলিং ও সোপেনহার প্রমুখ দার্শনিকগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, ভারত হইতে প্রেরিত বৌদ্ধধর্ম্মযাজকগণের শিক্ষার ফলেই থেরাপিউট-গণের ও এসিন-গণের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। রাজচক্রবর্ত্তী অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য বিভিন্ন জনপদে ধর্ম্মপ্রচারকগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সিরিয়া, মিশর, মাসিডন, এপিরস, সাইরিন,—গ্রীক-দিগের এই পাঁচটী রাজ্যে অশোকের দূত প্রেরিত হইয়াছিল। ঐ সকল স্থানে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারে বিশেষভাবে সহায়তা করেন। তাঁহার সেই অনুষ্ঠানের ফলেই বৌদ্ধধর্ম্ম চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে ; আর খৃষ্টধর্ম্মে তাহারই প্রভাব দেখিতে পাই।

সেই পরাক্রমবাহুর রাজত্বকালে, সিংহলে সঙ্ঘারাম-সমূহের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ-পদে যিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহার পরিচয় কিছু জানেন কি ? তিনি একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-সন্তান ; তাঁহার নাম—রামচন্দ্র কবিভারতী। রাজা পরাক্রমবাহুর রাজত্বকালে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ রামচন্দ্র, সিংহলের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের আসনে সমাসীন ছিলেন। কোথায় হিমালয়ের পরপারে তিব্বতে চীনে জাপানে, আর কোথায় সাগরপারে সিংহলে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে,—কতকাল পূর্ব্বে বাঙ্গালী এইরূপে ধর্ম্মাধ্যক্ষের আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, বিবেচনা করিয়া দেখুন। এইরূপে প্রতিপন্ন হয়, অতি প্রাচীন কাল হইতেই বঙ্গদেশ শিল্প-বাণিজ্যে শৌর্য্য-বীর্য্যে ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠান্বিত ছিল। কখনও বঙ্গ-নামে কখনও বা গৌড়-নামে এই জনপদ পরিচিত থাকায়, সময় সময় ইহার প্রাচীনত্বের বিষয়ে কাহারও কাহারও মনে সংশয় ঘটিতে পারে। কিন্তু একটু প্রণিধান-পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিলে, সে সংশয় আপনা-আপনিই দূরীভূত হইয়া যায়।

বাঙ্গালার বাণিজ্য-প্রভাব।

প্রাচীন ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের বিষয় আলোচনা করিতে হইলে, বঙ্গদেশের বাণিজ্য-প্রভাবের প্রতি স্বতঃই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ যখন প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিল, বঙ্গদেশেরও সে সময়ে প্রসিদ্ধির অবধি ছিল না। স্মরণাতীত কাল হইতে বঙ্গদেশে বহু বাণিজ্য-বন্দর প্রতিষ্ঠান্বিত ছিল। স্মরণাতীত কাল হইতে বঙ্গদেশের বণিকগণ দেশে-বিদেশে বাণিজ্য করিয়া বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। উত্তর-ভারতের ও মধ্য-ভারতের অধিকাংশ পণ্য বঙ্গের বণিকগণের সাহায্যে, বঙ্গের বন্দর হইতে বিদেশে রপ্তানী হইত। প্রাচীন বঙ্গের অন্যান্য ঐশ্বর্য্য-গৌরবের পরিচয়-চিহ্ন বঙ্গদেশ হইতে যেমন একেবারে লোপ পাইয়াছে, প্রাচীন বাঙ্গালার বাণিজ্য-কেন্দ্র বন্দর-সমূহের পূর্ব্বস্মৃতি সেইরূপ ম্লান হইয়া আছে। অধুনা প্রাচীন বঙ্গের যে কয়েকটী বাণিজ্য-বন্দরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার সুযোগ পাইতেছি, সেগুলির সম্বন্ধেও প্রধানতঃ বৈদেশিকগণের বিবরণের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। তাম্রলিপ্ত কতকালের প্রাচীন নগর, নির্দ্ধারণ করা যায় না ; রামায়ণে, মহাভারতে, পুরাণে, তন্ত্রে, তাম্রলিপ্তের উল্লেখ সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই। অথচ, ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য তাম্রলিপ্তের প্রথম প্রতিষ্ঠা, ফা-হিয়ানের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্তের পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করা দুঃসাধ্য। তাম্রলিপ্ত হইতে বাণিজ্য-পোতে আরোহণ করিয়া ফা-হিয়ান সিংহলে গিয়াছিলেন ;—কি পরিতাপের বিষয়, সেই বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া, এখন আমাদিগকে প্রাচীন বাঙ্গালার বাণিজ্যের ইতিহাসের সূচনা লিখিতে হয়! ফা-হিয়ানের ভারত-আগমনের কত সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মিশরে মামির মধ্যে মৃতদেহের গাত্রে বাঙ্গালার মসলিন ব্যবহৃত হইয়াছিল,—মিশরের ইতিহাসে সে সংবাদ অবগত হইয়াও সে বাণিজ্যের মূল-সূত্র অনুসন্ধান করিতে পারি না। কারণ, সেই সুদূর-অতীতকালে বাঙ্গালার কোন্ বন্দর হইতে কি সূত্রে কোন্ দেশীয় বণিকগণ কর্ত্তৃক বাঙ্গালার মসলিন মিশরে সংবাহিত হইয়াছিল, সে পরিচয় এখন কালের অন্ধতম গর্ভে

বাণিজ্য-কেন্দ্র বন্দর-সমূহ।

প্রোথিত হইয়া আছে। তাহার পরবর্ত্তিকালের বহুদিনের সম্বন্ধ-সূত্র ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। কাজেই ফা-হিয়ানের ভারত-আগমন, আর তাম্রলিপ্তে বাণিজ্য-পোতে আরোহণ,—বঙ্গের বাণিজ্য-পরিচয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফা-হিয়ানের পর হুয়েন-সাং ভারতবর্ষে আসেন। সৌভাগ্য-ক্রমে তিনি বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, তাম্রলিপ্ত বন্দর দেখিয়াছিলেন; তাই মুসলমানগণের বা খৃষ্টানগণের ভারত আগমনের পূর্ব্বে বঙ্গদেশের বাণিজ্য-সম্পদের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতে সমর্থ হইতেছি। মনে করিয়া দেখুন দেখি,—তাম্রলিপ্ত কতকাল পূর্ব্বের প্রাচীন নগর—কতকাল পূর্ব্বের প্রাচীন বন্দর—কতকাল পূর্ব্বের প্রাচীন রাজধানী! পুরাণ-সমূহের আদি-ভূত বিষ্ণুপুরাণ তাম্রলিপ্ত-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—"তাম্রলিপ্তান্ সমুদ্রতটপুরীশ্চ দেবরক্ষিতো রক্ষিস্যতি।" (বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়, অষ্টাদশ শ্লোক)। তবেই বুঝা যায়, বিষ্ণুপুরাণের সময়েও তাম্রলিপ্ত সমুদ্রতীরস্থ বন্দর বলিয়া বিখ্যাত ছিল। যাঁহারা পুরাণ-সমূহকে আধুনিক বলিয়া মনে করেন, অথচ মহাবংশাদি বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রন্থের প্রাচীনত্ব অস্বীকার করেন না, তাঁহাদিগের প্রতীতির জন্য তাম্রলিপ্ত-সম্বন্ধে মহাবংশের উক্তিও উল্লেখ করিতে পারি। মহাবংশে প্রকাশ, খৃষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে এই তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতেই অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া, বিজয়সিংহ সিংহল-যাত্রা করিয়াছিলেন। সুতরাং এ হিসাবে খৃষ্ট-জন্মের পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে তাম্রলিপ্ত সমৃদ্ধি-সম্পন্ন বন্দর ছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ফা-হিয়ান ৪১১ খৃষ্টাব্দে তাম্রলিপ্ত বন্দরের যে সমৃদ্ধি দর্শন করেন, দুই শত বৎসর পরে হুয়েন-সাং ঐ বন্দরের সেই সমৃদ্ধি দর্শন করিয়াছিলেন। এই তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে সরাসরি চীনদেশে বাণিজ্য-পোত গমনাগমনের বন্দোবস্ত ছিল। চৈন-পরিব্রাজক ইৎ-সিং চীনদেশ হইতে যাত্রা করিয়া একেবারে তাম্রলিপ্ত বন্দরে উপনীত হন। ৬৭৩ খৃষ্টাব্দে ইৎ-সিং ঐ বন্দরে উপনীত হন এবং বার বৎসর পরে ঐ বন্দর হইতেই স্বদেশ-যাত্রা করেন। স্বদেশ-যাত্রা-কালে ইৎসিং তাম্রলিপ্ত হইতে পাঁচ-লক্ষাধিক শ্লোকযুক্ত একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ চীনে লইয়া যান। ইৎসিংয়ের বর্ণনায় প্রকাশ, সেই গ্রন্থ চীনা-ভাষায় অনুবাদ করিলে সহস্র-খণ্ডে বিভক্ত প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইতে পারিত। * যাহা হউক, ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে গতিবিধির পক্ষে তাম্রলিপ্ত-বন্দরই তখন প্রশস্ত ছিল। ইৎ-সিংয়ের সঙ্গিগণ অনেকে বহুদিন ঐ বন্দরে বাস করিয়াছিলেন। ইৎসিংয়ের সমসময়ে যাঁহারা চীনদেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন, তাঁহারাও অনেকে তাম্রলিপ্তে আসিয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন। শেষোক্ত পর্য্যটকগণের মধ্যে 'তাও-লিন', 'তা-চেঙ-তেঙ', 'হুই-লুন', 'উ-হিং', 'চেং-কন', 'চাং-মিন' প্রভৃতি প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন। ইঁহারা প্রত্যেকেই বৌদ্ধধর্ম্ম-শাস্ত্রের বিশেষ বিশেষ অংশে অভিজ্ঞ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইঁহারা কোন্ পথে কি ভাবে তাম্রলিপ্ত সহরে আসিয়াছিলেন, তদ্বিবরণ আলোচনায়, কোন্ কোন্ দেশের সহিত তাম্রলিপ্তের বাণিজ্য-সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল বুঝিতে পারা যায়। তাও-লিন যবদ্বীপ ও নিকোবর-দ্বীপপুঞ্জের পথ দিয়া তাম্রলিপ্তে আসেন। তৎ-প্রসঙ্গে যবদ্বীপের ও নিকোবর-দ্বীপপুঞ্জের সহিত তাম্রলিপ্তের বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল বুঝিতে পারা

তাম্রলিপ্তের প্রাচীনত্ব।

---

* *Vide I*-Tsing's *Memoire* by Chavannes.

যায়। 'তা-চেঙ-তেঙ' লঙ্কা-দ্বীপ হইতে তাম্রলিপ্তে আসেন। যে বাণিজ্য-পোতে তিনি তাম্রলিপ্তে আসিতেছিলেন, পথি-মধ্যে সেই বাণিজ্য-পোত দস্যু কর্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছিল। এই ঘটনায় লঙ্কা-দ্বীপের সহিত তাম্রলিপ্তের বাণিজ্য-সম্বন্ধ ও সমুদ্রপথে বিঘ্ন-বিপত্তির বিষয় উপলব্ধি হয়। 'হুই-লুন' কোরিয়া হইতে তাম্রলিপ্তে আসেন। ইহাতে কোরিয়ার সহিত তাম্রলিপ্তের বাণিজ্য-সম্বন্ধের প্রমাণ পাওয়া যায়। 'উ-হিং' লঙ্কা-দ্বীপ হইতে তাম্রলিপ্তে আসেন এবং তাম্রলিপ্ত হইতে লঙ্কার পথেই স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। 'চেঙ-কন' এবং তাঁহার সঙ্গিগণ চীনদেশ হইতে যাত্রা করিয়া শ্রীভোজ-দ্বীপ পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। সেখানে ব্যারাম-পীড়া উপস্থিত হওয়ায় তাঁহারা তাম্রলিপ্তে পৌঁছিতে পারেন নাই। এই সকল বিবরণে চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণেব বর্ণনা হইতেই বিভিন্ন দেশের সহিত বঙ্গদেশের বাণিজ্য-সম্বন্ধ বুঝিতে পারি। হুয়েন-সাংয়ের বর্ণনায় প্রকাশ,—'তাম্রলিপ্ত বন্দরে বহুমূল্য দ্রব্যাদির এবং মণিমুক্তা প্রভৃতির ব্যবসায় চলিত। যেমন জলপথে, তেমনই স্থলপথে—তাম্রলিপ্তের বাণিজ্য সর্ব্বত্র বিস্তৃত ছিল।' তাম্রলিপ্তের অনতিদূরে 'হরিকেলা' নামে আর একটী প্রাচীন বন্দরের পরিচয় পাই। 'তান্-কোয়াঙ' নামক চৈন-পরিব্রাজক ঐ বন্দরে আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ আছে। চীনদেশীয় একজন বিখ্যাত শ্রমণ—নাম 'সেঙ-চি'—শিষ্যগণ ও সঙ্গিগণ সমভিব্যাহারে একেবারে সমতট-বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইৎ-সিংয়ের বর্ণনায় পূর্ব্বোক্ত অধিকাংশ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। তবেই চৈন-পরিব্রাজকগণের গতিবিধির কালে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত, বঙ্গদেশে তাম্রলিপ্ত, হরিকেলা এবং সমতট—তিনটী বাণিজ্যবন্দরের পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ সকল বন্দর হইতে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ও সুদূর চীনদেশে সর্ব্বদা বাণিজ্য-পোতের গতিবিধি ছিল। কিন্তু ঐ সকল বন্দরের চিহ্ন পর্য্যন্ত এখন লোপ পাইতে বসিয়াছে। তাম্রলিপ্ত আর সে তাম্রলিপ্ত নাই। সমতটের স্থান-নির্দ্দেশে মতান্তর ঘটিতেছে; এমন কি, সমতটের সন্ধান পাওয়াই এখন কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হরিকেলা কোথায় ছিল, এখন তাহার নাম ও চিহ্ন দুইই লোপ পাইয়াছে। পর্ত্তুগীজ-প্রমুখ পাশ্চাত্য-জাতিগণের বাণিজ্যের কেন্দ্র-স্থল—সেদিনের সমৃদ্ধিশালী বন্দর সপ্তগ্রামেরই বা এখন কি নিদর্শন বিদ্যমান আছে? বর্ত্তমান হুগলী জেলায় ত্রিবেণী-সঙ্গমের সন্নিকটে সপ্তগ্রাম চিহ্নিত হইতেছে বটে; কিন্তু তাহাতে সপ্তগ্রামের স্মৃতি কিছুই নাই। যদিচ সপ্তগ্রামের সকল স্মৃতি-চিহ্নই লোপ পাইয়াছে, যদিচ উহার সকল ঐশ্বর্য্য-বিভবের কথাই কালের অন্ধতম-গর্ভে বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি যে কিছু বিচ্ছিন্ন বিবরণ দেখিতে পাই, যে কিছু বিক্ষিপ্ত উপাদান প্রাপ্ত হই, তাহাতেই পুরাবৃত্তে সপ্তগ্রামের প্রকৃষ্ট স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারি। সপ্তগ্রাম এক সময়ে সমৃদ্ধি-সম্পন্ন রাজধানী ছিল, সুখ-সম্পৎ-ঐশ্বর্য্যের কেন্দ্রস্থান-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। তখন, নানাদেশের নানাশ্রেণীর লোক-সকল ঐ নগরে গতিবিধি করিতেন। তখন, সপ্তগ্রাম বিভিন্ন-শ্রেণীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আবাস-স্থলে পরিণত হইয়াছিল। তখন, বিভিন্ন-সম্প্রদায়ের অসংখ্য লোকের বসবাস-হেতু সপ্তগ্রামের পরিসর সাত ক্রোশেরও অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কত পূর্ব্বে, কোন্

সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণী।

কালে, কোন্ কোন্ গ্রামের সমবায়ে, রাজধানী সপ্তগ্রামের প্রতিষ্ঠা হয়, প্রত্নতত্ত্ব অবিসংবাদিত-রূপে সে সমাচার প্রদান করিতে সমর্থ নহেন। সপ্তগ্রাম বলিতে পূর্ব্বে নিম্ন-লিখিত সাতটী গ্রামের সমষ্টি বুঝাইত ; যথা, বাসুদেবপুর, বাঁশবেড়িয়া, কৃষ্ণপুর, নিত্যা-নন্দপুর, শিবপুর, সপ্তগ্রাম, শঙ্খনগর। কিন্তু এ সকল গ্রামের অনেকগুলিই এখন লোপ-প্রাপ্ত ; কোনও কোনটী এমনই বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত যে, তাহাদিগকে সপ্তগ্রামের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণনা করিতেই সংশয়-প্রশ্ন উঠে। * সপ্তগ্রাম প্রতিষ্ঠার ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া সুকঠিন। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী—তিনের সম্মিলনে যে ত্রিবেণী তীর্থ, সে যে স্মরণাতীত-কাল পূর্ব্বের পুণ্য-ক্ষেত্র, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। প্রয়াগে গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর মিলন যতদিন হইতে যুক্তবেণী নামে অভিহিত, ত্রিবেণীতে গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর বিভিন্ন-মুখী গতি ততদিন হইতেই মুক্তবেণী নামে পরিচিত। সে কোন্ কালের কাহিনী, কে নির্দ্দেশ করিবে ? পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের মধ্যে টলেমির গ্রন্থে সপ্তগ্রামের উল্লেখ দেখা যায়। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্ব্বে সপ্তগ্রাম সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল, টলেমির উক্তিতে তাহা প্রতিপন্ন হয়। তিনি সপ্তগ্রামকে সমৃদ্ধি-সম্পন্ন রাজধানী বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষের বিবরণে প্লিনি যদিও সপ্তগ্রামের নাম উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু তদুক্ত ত্রিবেণীর বিবরণ হইতে সে সময় ঐ অংশের সমৃদ্ধির পরিচয় পাই। হুয়েন-সাংয়ের উচ্চারণের অনুসরণে তাঁহার পরিদৃষ্ট এক নগরকে 'চরিত্রপুর' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়।

* একজন অভিজ্ঞ লেখক প্রাচীন সপ্তগ্রামের সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া তদন্তর্গত কয়েকটী গ্রামের নিম্নরূপ পরিচয় দিয়াছেন ;—"কলিকাতা হইতে একত্রিশ মাইল দূরবর্ত্তী ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথে ত্রিশবিঘা ষ্টেসন হইতে মগরা ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী সরস্বতী নদীর সেতু পর্য্যন্ত সপ্তগ্রামের ধ্বংসাবশেষের বিস্তৃতি। ত্রিশবিঘা হইতে পূর্ব্বে বাঁশবেড়িয়া, উত্তরে মগরাগঞ্জ ও ত্রিবেণী হইতে পশ্চিমে মগরা ও দক্ষিণে বাঁশবেড়িয়া পর্য্যন্ত যদি একটী চতুরস্র ক্ষেত্র কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রটী প্রাচীন সপ্তগ্রামের ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণ। এই ভূখণ্ডের মধ্যে চারি পাঁচটী গ্রাম আছে। সেগুলি প্রাচীন নগরীর এক এক পল্লীর নাম। মোগল-সাম্রাজ্যের প্রারম্ভে সপ্তগ্রামের অবনতি আরম্ভ হয়। আর এক শত বৎসরের মধ্যে বিশাল নগরী অরণ্যে পরিণত হইয়া পড়ে। কিন্তু বড়পাড়া, মালোপাড়া, কাগজিপাড়া প্রভৃতি গ্রাম অদ্যাপি লোকের মনে প্রাচীন সপ্তগ্রামের পল্লীবিভাগের কথা জাগরিত করিয়া দেয়। ত্রিশবিঘা হইতে বাঁশবেড়িয়া পর্য্যন্ত সমুদায় ভূখণ্ড প্রাচীন পুষ্করিণী ও দীর্ঘিকায় পরিপূর্ণ। কোন কোন পুষ্করিণীতে এখনও ইষ্টক নির্ম্মিত ঘাট দেখা যায়। কিন্তু অধিকাংশ পুষ্করিণীর জল অপেয় হইয়া গিয়াছে। সপ্তক্রোশব্যাপী বিশাল নগরীর ধ্বংসাবশেষ-মধ্যে একটী মসৃজিদ ও একটী মন্দির এখনও উচ্চশীর্ষ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, অবশিষ্ট সমুদায়ই কালক্রমে লুপ্ত হইয়াছে। যে সরস্বতী সুদূর রোমক সাম্রাজ্যের অর্ণবপোত সমুদ্র হইতে বক্ষে বহিয়া নগরপ্রান্তে উপস্থিত করিত, সেই ক্ষীণকায়া সরস্বতীতে এখন পথিকের পদ-প্রক্ষালনের উপযোগী জলও নাই। শুনিতে পাওয়া যায়, দক্ষিণে সরস্বতী নদীর গর্ভের চিহ্ন পর্য্যন্তও নাই। নদীগর্ভে হলকর্ষণকালে কৃষকগণ মুদ্রা বা অর্ণবপোতের শৃঙ্খল, নোঙ্গর ইত্যাদি পাইয়া এখনও সাতগাঁয়ের কথা স্মরণ করিয়া থাকে। সরস্বতী ও গঙ্গার সঙ্গম স্থানের অতি অল্প দূরে একটী সেতুর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। উহাও প্রাচীন সপ্তগ্রামেরই সেতু। চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে বাদশাহ হোসেন শাহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহার নিকটই বর্দ্ধমান-রাজের ব্যয়ে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নির্ম্মিত নূতন সেতু বিদ্যমান রহিয়াছে। রঘুনাথ দাসের পাটও সরস্বতী নদীর উপর অবস্থিত।"—সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, পঞ্চদশ ভাগ।

তথা-কথিত চরিত্রপুর—চরিত্রপুর নামক কোনও স্বতন্ত্র নগর নহে—সপ্তগ্রাম বা তদন্তর্গত পল্লীবিশেষ, তাঁহার উচ্চারণ-দোষে ঐ অভিনব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আছে। পাল-বংশের ও সেন-বংশের অভ্যুদয়কালে সপ্তগ্রাম নানারূপে প্রতিষ্ঠান্বিত ছিল। তাহার পরিচয় অপর কিছু পাইবার যদিও উপায় নাই; কিন্তু পরবর্ত্তিকালে আবিষ্কৃত মস্‌জিদাদির ভগ্ন-স্তূপ মধ্যে সে নিদর্শন বিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান আছে। বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব-সময়ে যে সকল বৌদ্ধমঠ প্রতিষ্ঠিত হয়, জৈনগণের অভ্যুদয়কালে যে জৈন-দেবালয়-সমূহ স্থাপিত হয়, ভগ্ন মস্‌জিদ প্রভৃতির উপাদানভূত ইষ্টকে ও প্রস্তরে সে স্মৃতি এখনও লোপ পায় নাই। হিন্দু-মন্দির, বৌদ্ধ-মন্দির, জৈন-মন্দির প্রভৃতিতে সপ্তগ্রাম এক সময়ে শোভান্বিত ছিল; সেই সকল মন্দিব ভাঙ্গিয়া, মন্দিরের উপরে বা মন্দিরের উপাদানভূত ইষ্টক ও প্রস্তর প্রভৃতি লইয়া, মুসলমানগণ মস্‌জিদ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। * ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে (হিজরা ৬৯৮ অব্দে) সপ্তগ্রাম মুসলমানগণের অধিকার-ভুক্ত হয়। ঐ সময়ে তুর্ক-জাতীয় জাফর খাঁ সেন-রাজগণের হস্ত হইতে নগরী ছিন্ন হইয়া করিয়া লন। নগরের মন্দির প্রভৃতি বিলুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হয়; সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানগণের মস্‌জিদ প্রভৃতি নির্ম্মিত হইতে থাকে। † ইহার পর প্রায় চারি শত বৎসর কাল সপ্তগ্রামে মুসলমানগণের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন ছিল। পাঠান-গণেব এবং আফগান-গণের অধিকার-কালে বৈদেশিক বণিকগণের গতিবিধি-সূত্রে সপ্তগ্রামের বাণিজ্য বিশেষরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে পর্ত্তুগীজগণ বঙ্গদেশে বাণিজ্য আরম্ভ করেন। পূর্ব্ব-বঙ্গে চট্টগ্রাম, পশ্চিম-বঙ্গে সপ্তগ্রাম—তাঁহাদের বাণিজ্যের কেন্দ্র-স্থান হইয়া উঠিয়াছিল। চট্টগ্রামকে তাঁহারা 'পোর্টো গ্রাণ্ডে' (Porto Grande) বা বড়-বন্দর এবং সপ্তগ্রামকে 'পোর্টো পিকোয়েনো' (Porto Piqueno) বা ছোট-বন্দর বলিয়া পবিচিত করিতেন। সপ্তগ্রাম যখন সের-সাহের অধিকাবভুক্ত হইয়াছিল, সেই সময়ে এবং তাঁহার পুত্র ইসলাম্-সাহের রাজত্বকালে সপ্তগ্রামে রাজকীয় মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। সেই মুদ্রাযন্ত্রে যে সকল মুদ্রা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার কয়েকটী রৌপ্য-মুদ্রা পরবর্ত্তিকালে আবিষ্কৃত হইয়াছে। আফগান-গণের ও পাঠান-গণের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সপ্তগ্রামের পতন সংঘটিত হইয়াছিল। সেই সময় সরস্বতী-নদীর বেগ মন্দীভূত হইয়া আসে। সুতরাং

---

* জাফর খাঁর সমাধি ও তৎ-সন্নিহিত মসজিদে যে সকল প্রস্তর-শিল্প আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে দেব-দেবীর মূর্ত্তি এবং বঙ্গাক্ষরে কোন কোন মূর্ত্তির পরিচয় লিখিত আছে। হিন্দুদিগের দেব-মন্দির ভাঙ্গিয়া তাহারই মধ্যে জাফর খাঁর সমাধি-স্থান প্রস্তুত হইয়াছিল। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডি. মনি 'এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে' (Journal of the Asiatic Society of Bengal vol XVI.) খোদিত লিপির পাঠোদ্ধারে চেষ্টা পান। তাহাতে এই সকল বিষয় বিশেষভাবে বুঝিতে পারা যায়।

† সুলতান রুকুনুদ্দিন কৈকায়ুস যখন বঙ্গের সিংহাসনে অধিরূঢ়, তাঁহার সামন্ত-রূপে জাফর খাঁ দিনাজপুর প্রদেশ শাসন করিতেন। দেবকোট তাঁহার রাজধানী ছিল। ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে সপ্তগ্রাম জয় করিয়া তিনি পনর বৎসরকাল সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তৃপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জাফর খাঁর পুরা নাম—উলগ্-ই-আজম্-হুমায়ুন জাফর খাঁ বহরম ইৎগিন। কেহ কেহ অনুমান করেন, গঙ্গাস্তোত্র-রচয়িতা দরাফ খাঁ ও জাফর খাঁ একই ব্যক্তি। কিন্তু তদ্বিষয় আজিও অবিসংবাদিত-রূপে সপ্রমাণ হয় নাই।

সরস্বতী বাহিয়া যে সকল অর্ণবপোত সপ্তগ্রামে আসিত, সে সকল আর আসিতে পারিত না। তখন, কিছুদিন বর্ত্তমান হাওড়ার সমীপস্থ বেতোড় বণিকগণের বাণিজ্য-কেন্দ্র-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। * তখন, অর্ণবপোত-সমূহ বেতোড়ে অবস্থিতি করিত। সেখান হইতে নৌ-যানাদির সাহায্যে সপ্তগ্রামের সহিত পণ্যাদির আদান-প্রদান চলিত। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দের অব্যবহিত পরে (ঐ সময়ে বড় বড় অর্ণবপোত সপ্তগ্রামে যাইতে পারিত না) সপ্তগ্রামের বাণিজ্যের স্থান বেতোড় অধিকার করিয়াছিল। জলদস্যুর উপদ্রব নিবারণের জন্য ঐ সময় বেতোড়ে একটী দুর্গ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়। † তখন কিছুদিন বেতোড় হইতেই পাশ্চাত্য-দেশের সহিত পশ্চিম-বঙ্গের বাণিজ্য চলিয়াছিল। সপ্তগ্রাম হইতে পাশ্চাত্যে পারস্যে, আরবে, মিশরে, প্রাচ্যে চীনে, মলয়ে, যবদ্বীপে বাণিজ্য-পোত-সমূহ গতিবিধি করিত। লঙ্কা ও মলয়-দ্বীপপুঞ্জেও সপ্তগ্রামের বাণিজ্য বিস্তৃত ছিল। সুতরাং বেতোড়ের বাণিজ্যও সেইরূপ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সপ্তগ্রামের বাণিজ্য যখন বেতোড়ের পথে সংবাহিত হইতে আরম্ভ হয়, সেই সময়েও ইউরোপীয় পর্য্যটকগণ সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধির বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ভিনিস-দেশীয় পরিব্রাজক সিজার-ডি-ফ্রেডারিক ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে সপ্তগ্রাম দর্শন করেন। ১৫৮১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি এদেশে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনায় প্রকাশ,—'সপ্তগ্রাম বন্দর হইতে প্রতি বৎসর পণ্য-দ্রব্য বোঝাই করিয়া ত্রিশ পঁয়ত্রিশ খানা অর্ণবপোত বিদেশে যাইত। সেই সকল পোতে চাউল, নানাবিধ মোটা বস্ত্র, গালা, প্রচুর পরিমাণ চিনি, নানা জাতীয় বিশুষ্ক ও সুরক্ষিত ফল, মরিচ, তৈল এবং অন্যান্য বিবিধ দ্রব্য বোঝাই থাকিত। এই সুন্দর নগরে নানাবিধ দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে মিলিত।' বড় বড় জাহাজ-সকল তখন সপ্তগ্রামে যাইতে পারিত না; সুতরাং ছোট ছোট জাহাজের সাহায্যে দ্রব্যাদি বেতোড়ে সংবাহিত হইত, এবং বেতোড় হইতে বৃহৎ অর্ণবপোতের সাহায্যে তৎ-সমুদায় দূরদেশে চালান যাইত। ‡ ইংরেজ বণিকগণের মধ্যে রাল্‌ফ ফীচ বাণিজ্য-ব্যপদেশে প্রথমে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থান হইতে পণ্যবাহী নৌবহর-সমূহ সপ্তগ্রামে গতিবিধি করিত, তিনি তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি যখন আগ্রা হইতে সপ্তগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করেন, সেই সময়ে এক শত আশী খানি পণ্যবাহী নৌকা, লবণ,

বেতোড়ে বাণিজ্য।

* "বেতোড় এক্ষণে হাওড়া জেলার অন্তর্গত শিবপুর থানার একটী গ্রাম। শিবপুর সানাপাড়ার ঠিক দক্ষিণধারে বেতাইতলা নামে একটী স্থান আছে। পূর্ব্বে ইহাকে বেতোড় বলা হইত। এ স্থানটী ষোড়শ শতাব্দীতে গঙ্গার অব্যবহিত ধারে অবস্থিত ছিল। এক্ষণে তথা হইতে গঙ্গা প্রায় এক মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছে।" সাহিত্য-সংবাদ, তৃতীয় বর্ষ।

† এখন যেখানে বোটানিক্যাল গার্ডেন, বেতোড়ের দুর্গের অবস্থিতির স্থান সেইখানেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ ঐ স্থানকে 'বড় থানা' বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই দুর্গের বিষয় 'হেজেস ডাইরী' গ্রন্থে (Hedge's Diary, vol ii) দৃষ্ট হয়। সে মতে বেতোড়ে ও উহার পার-পারে দুইটী দুর্গ ছিল বুঝা যায়।

‡ হাক্‌লুত সোসাইটির প্রকাশিত পুস্তকে ফ্রেডারিকের প্রদত্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।—*Vide* The Principal Navigations, Voyages, Traffiques and Discoveries etc. Published by Richard Hakluyt.

অহিফেন, হিঙ্গ, সীসক, কার্পেট, প্রভৃতি বিবিধ পণ্যসম্ভার লইয়া আগ্রা হইতে সপ্তগ্রামে উপনীত হয়। কি হিন্দু কি মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বণিকগণই সপ্তগ্রামে সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন। * ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে ফীচ ভারতবর্ষে আসিয়ছিলেন। গোয়া প্রভৃতি পরিভ্রমণ করিয়া তিনি আগ্রায় যান। আগ্রা হইতে ফতেপুর, প্রয়াগ, বারাণসী ও পাটনা হইয়া তিনি (অনুমান ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে) সপ্তগ্রামে আসেন। সপ্তগ্রামের পর তিনি শ্রীপুর, সোনারগাঁ প্রভৃতি বন্দর-সমূহ দর্শন করিয়াছিলেন। ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে ২৯এ এপ্রেল তিনি লণ্ডন-সহরে প্রত্যাবৃত্ত হন। তিনিই প্রথম ইংরেজ-বণিক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। লণ্ডনে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য্যের বিষয় বর্ণনা করায়, পরবর্ত্তিকালে ইংরেজ-বণিকগণ দলে দলে ভারতবর্ষে আসিতে প্রলুব্ধ হন। ফীচের বর্ণনায় প্রকাশ,—'সপ্তগ্রাম মুর-গণের সমৃদ্ধি-সম্পন্ন নগর। সকল সামগ্রীই এখানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বিস্তৃত নগরের একস্থানে না একস্থানে প্রত্যহই হাট-বাজার বসে এবং নানাদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় চলে। চব্বিশ ছাব্বিশ দাঁড়যুক্ত নৌকার দ্বারা নানাস্থানের চাউল ও অন্যান্য পণ্য এই বন্দরে সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়া থাকে।' † ষোড়শ শতাব্দীর ভৌগোলিক সোমারিয়ো-ডি-রেগনী সপ্তগ্রামকে পশ্চিম-বঙ্গের প্রধান বন্দর বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনানুসারে ঐ বন্দরে দশ সহস্রাধিক গৃহস্থের বাস ছিল। বলা বাহুল্য, তখন সপ্তগ্রামের পতন আরম্ভ হইয়াছে। দেশীয় বণিকগণের প্রতি পর্ত্তুগীজদিগের অত্যাচারই সপ্তগ্রামের অবনতির প্রধান কারণ। মুসলমানগণের প্রভাব ক্ষীণ হইয়া আসিলে, পর্ত্তুগীজেরা সপ্তগ্রামে যথেচ্ছ অত্যাচার আরম্ভ করে; বণিকগণের পণ্যাদি অল্পমূল্যে ক্রয় করা এবং লুণ্ঠন করিয়া লওয়া তাহাদের কার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। পর্ত্তুগীজগণের এই দস্যুবৃত্তির দরুণ সপ্তগ্রামের ক্ষীণবশিষ্টটুকুও লোপ পায়। বৈদেশিক-গণের সংশ্রব-সংক্রান্ত এবংবিধ নানা

প্রাচীন কবিগণের বর্ণনায়।

বিবরণ ভিন্ন, প্রাচীন বাঙ্গালার কবিগণের গ্রন্থে ত্রিবেণী সপ্তগ্রাম ও বেতোড়ের বাণিজ্য-সম্পদের নানা পরিচয় পাওয়া যায়। কবি বিপ্রদাস ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে (১৪১৭ শকে) 'মনসা-মঙ্গল' রচনা করেন। চাঁদ সদাগরের সপ্তগ্রাম দর্শন-প্রসঙ্গে তিনি সপ্তগ্রামের একটী বর্ণনা লিখিয়া গিয়াছেন। সেই বর্ণনা পাঠ করিলে, পূর্ব্বের ও তৎসময়ের সপ্তগ্রামের একটী জীবন্ত ছবি হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়। কবি বিপ্রদাস-বিরচিত 'মনসা-মঙ্গলে' সপ্তগ্রামের বর্ণনা; যথা,—

"বুহিত্র চাপাযা কুলে চাদ অধিকারী (ব)লে দেখিব কেমন সপ্তগ্রাম।
তথা সপ্তঋষিস্থান সর্ব্বদেব অধিষ্ঠান শোক দুখ সর্ব্বগুণধাম॥

* ফীচের বর্ণনায় প্রকাশ,—" I went from Agra to Satgaon in Bengala in the company of one hundred and four score boats laden with salt, opium, hing (asafoedita), lead, carpets, and divers other commodities down the river Jamuna. The Chief Merchants are Moores and Gentiles." —*The Principal Navigations, Voyages, Traffiques and Discoveries etc.* Published by Richard Hakluyt.

† সপ্তগ্রাম সম্বন্ধে ফীচের উক্তি,—"Satgaon is a fair city for a city of the Moors and very plentiful of all things. Here in Bengal they have every day, in one place or other, a great market which they called Chandeun, and they have many great boats which they called Pencose, wherewithal they go from place to place and buy rice and many other things; their boats have 24 or 26 oars to row them, they be of great burthen."

জোতি হব্যা একমুর্তি রিসিমুনি সবে তথি তপ জপ করে নিরন্তর।
গঙ্গা আর সরস্বতি জমুনা বিসাল্ল তথি অধিষ্ঠান উমা মাহেশ্বরি॥
দেখিয়া ত্রিবিনি গঙ্গা চাদরাজ মনে রঙ্গা কুলেতে চাপয্যা মধুকর।
আনন্দিত মহারাজ করে নৃপতি তির্থি কাজ ভক্তিভাবে পুজে মহেশ্বর॥
তির্থ কার্য্য সমাপীয়্যা অন্তরে হরি (ষ)হয়্যা উঠে রাজা ভূমিয়া নগর।
ছত্তিষ আশ্রমে লোক নাহি কোন দুঃখ সোক আনন্দে বঞ্চয়ে নিরন্তর॥
বৈসে জতো দ্বিজগণ সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ তেজময় যেন দিবাকর।
সর্ব্বতত্ব জানে মর্ম্মে বিসাদ গুরুধর্ম্মে জ্ঞান গুরু দেবের সোসর॥
পুরুষ মদন জেনো রমণি সাবিত্রি হেনো আভরণ সব স্বর্ণময়।
তার রূপ গুণ জতো তাহা বা কহিব কত হেরিতে নিমিস বিলয়॥
অভিনব সুর পুরি দেখি সব সারি সারি প্রতি ঘরে কনকের ঝারা।
নানারত্ন অবিসাল জোতিময় কাচচাল রাজমুক্তা প্রলম্বিত ধারা॥
সভে দেবে ভক্তি মুক্তি প্রতিঘরে নানা মুত্তি রত্নময় সকল প্রাসাদে।
আনন্দে বাজায় বাদ্দি শঙ্খ ঘণ্টা মৃদঙ্গ আদি দিখি রাজা বড়ই প্রমাদে॥
নিবষে যবন জতো তাহা ব'লিব কতো মোঙ্গল পাঠান মোকাদীম।
ছয়দ মোল্লা কাজি কেতাব কোরাণ রাজি দুই ওক্ত করে তছলিম॥
মসিদ মোকাম ঘরে সেলাম বাজায় করে ফয়তা করয়ে পিত্য লোকে।
বন্দিয়া মনসা দেবি দ্বিজ বিপ্রদাস কবি উদ্ধারিয়া ভকত সেবকে॥" *

কবি বিপ্রদাসের † বর্ণনায় ত্রিবেণী-তীর্থ ঋষি-মুনির আশ্রয়-স্থান ছিল বলিয়া বুঝিতে পারি। সপ্তর্ষিগণ ত্রিবেণী-সন্নিধানে অবস্থিতি করিতেন, ইহাও প্রতিপন্ন হয়। বলা বাহুল্য, ত্রিবেণীর মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে এ বর্ণনা অতিরঞ্জিত নহে। শাস্ত্রে ত্রিবেণীর মাহাত্ম্য ভূয়সী পরিকীর্ত্তিত। যেমন প্রয়াগ—ত্রিবেণী-সঙ্গমে মহাতীর্থ, তেমনই সপ্তগ্রাম—ত্রিবেণী-সঙ্গমে মহাতীর্থ। প্রয়াগের যে মাহাত্ম্য, ত্রিবেণীরও সেই মাহাত্ম্য। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন এই ত্রিবেণী-সম্বন্ধে প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্বে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বুঝিতে পারি, প্রয়াগ-স্নানে ও ত্রিবেণী-স্নানে সমান পুণ্যলাভ হয়। যথা, প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্বে.—"প্রদ্যুম্ননগরাদ্ যাম্যে (পাঠান্তরে বা প্রদ্যুম্নস্য হ্রদাৎ যাম্যে) সরস্বত্যাস্তথোত্তরে। তদ্দক্ষিণ প্রয়াগস্তু গঙ্গাতোযমুনাগতা। স্নাত্বা তত্রাক্ষয়ং পুণ্যং প্রয়াগ ইব লভ্যতে॥" ইহাতে বুঝা যায়, প্রদ্যুম্ন-নগরের বা প্রদ্যুম্ন-হ্রদের দক্ষিণে

* মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বিপ্রদাসের পুঁথির উদ্ধার-সাধন করেন। তাঁহার সংগৃহীত এসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকালয়ে রক্ষিত পুঁথির পাঠ অনুসরণে উক্ত কবিতা উদ্ধৃত করা হইল।

† চব্বিশ-পরগণা জেলার বটগ্রাম নামক স্থানে বিপ্রদাস পিপ্‌লাই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম—মুকুন্দ পণ্ডিত। হোসেন সার শাসন-সময়ে তিনি বিদ্যমান ছিলেন। গ্রন্থ-শেষে ভণিতায় তাঁহার পরিচয় পাই,—

"মুকুন্দ পণ্ডিত সুত বিপ্রদাস নাম। চিরকাল বসতি নক্ষত্র্যা বটগ্রাম॥
শুক্লা দসমীতিথি বৈসাখ মাসে। সিঅরে বসিয়া পদ্মা কহিলা উপদেশে॥
কবিগুরু ধিরজনে করি পরিহার। রচিল পদ্মার গীত সাস্ত্র অনুসার॥
সিন্ধু ইন্দু বেদ মহি সক পরিমাণ। নৃপতি হুসেনসা গৌড়ে সুলক্ষণ॥"

এই কবিতার 'সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী' শব্দ হইতে 'অঙ্কস্য বামা গতি' অনুসারে "মনসা-মঙ্গল" রচনার কাল ১৪১৭ শকাব্দা নির্দ্দিষ্ট হয়।

সরস্বতী নদীর উত্তরে এই দক্ষিণ-প্রয়াগ অবস্থিত। এই স্থানে গঙ্গা-যমুনা পৃথক হইয়াছেন। প্রয়াগ স্নানে যে ফল, এখানে স্নান করিলেও সেই অক্ষয় পুণ্য লাভ হয়। "ইয়ং মুক্তবেণীতি কথ্যতে প্রয়াগে যুক্তবেণী।" যে বঙ্গদেশকে অপবিত্র বলিয়া মনুসংহিতার প্রক্ষিপ্ত শ্লোকে ঘোষণা করা হইয়াছে, বুঝিয়া দেখুন, সেই বঙ্গদেশের কত মাহাত্ম্য! এই ত্রিবেণী-মাহাত্ম্য স্মরণ করিলে, বেদ-বর্ণিত আর্য্য-ঋষিগণের লীলা-নিকেতন গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ—এই বঙ্গদেশ বলিয়াই স্পর্দ্ধা করিতে পারি না কি? স্মার্ত্ত রঘুনন্দনোক্ত যে প্রদ্যুম্ন-নগরের বা প্রদ্যুম্ন-হ্রদের নাম দেখিলাম, তাহাতেও বঙ্গদেশের এক প্রাচীন স্মৃতি মনোমধ্যে জাগরুক হয়। প্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত নগর—প্রদ্যুম্ন-নগর সংজ্ঞা লাভ করে। প্রদ্যুম্ন—শ্রীকৃষ্ণের অংশাবতার। স্বয়ং কামদেবও প্রদ্যুম্ন নামে অভিহিত হন। আবার রুক্মিণী-গর্ভে প্রদ্যুম্ন নামে বাসুদেবের এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেন। যেখানে ত্রিবেণী-সঙ্গম, তাহার সন্নিকটে ঐ সকল দেবতার অধিষ্ঠানই সম্ভবপর। তাঁহাদের অধিষ্ঠানভূত স্থানই তাঁহাদের পুণ্য-স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া ছিল বুঝা যায়। কিন্তু এখন সে স্থান অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া দুঃসাধ্য। তবে প্রাচীন পুঁথি-পত্র হইতে অবগত হওয়া যায়, বর্ত্তমান পাণ্ডুয়া (পেঁড়ো) পূর্ব্বে প্রদ্যুম্ন-নগর নামে পরিচিত ছিল। পাণ্ডুয়ার দক্ষিণে ত্রিবেণী অবস্থিত বলিয়া এবং উহার পূর্ব্ব-নাম প্রদ্যুম্ন-নগর জানিয়া, অধুনা ঐ স্থানকেই প্রদ্যুম্ন-নগর বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। কিন্তু প্রদ্যুম্ন-হ্রদ বা সরোবর কোথায় ছিল, অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। ফলতঃ, যেমন ত্রিবেণী-তীর্থের অবস্থানে, তেমনই প্রদ্যুম্ন-নগরের বিদ্যমানে—দেবাধিষ্ঠানে—বঙ্গদেশ পুণ্যপূত ছিল। কবিকঙ্কণ-বিরচিত চণ্ডী-কাব্যেও ত্রিবেণীর সমৃদ্ধির, বাণিজ্যের ও পুণ্যমাহাত্ম্যের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়;—

"বামদিকে হালিসহর দক্ষিণে ত্রিবেণী। যাত্রীদের কোলাহলে কিছুই না শুনি॥
লক্ষ লক্ষ লোক এককালে করে স্নান। বাস হেম তিল ধেনু দ্বিজে দেয় দান॥
গর্ভে বসি শিবপূজা করে কোনজন। রজতের সিপে কেহ করয়ে তর্পণ॥
শ্রাদ্ধ করে কোন জন জলের সমীপে। সন্ধ্যাকালে কোন জন দেয় ধূপদীপে॥
ত্রিবেণী তীর্থের চূড়ামণি।
আশ্রম করিয়া তথি, করে স্নান ধনপতি, তরি পূরে নানা ধন কিনে॥"

ক্ষেমানন্দ ও কেতকাদাস বিরচিত 'মনসার ভাসান' কাব্যে ত্রিবেণী-সন্নিহিত কালীদহের উল্লেখ আছে। কবিদ্বয়ের বর্ণিত নেতা ধোপানীর পাট, ত্রিবেণীর সন্নিকটে আজিও চিহ্নিত হইয়া থাকে। 'মনসার ভাসান'—বেহুলার উপাখ্যান বঙ্গদেশের অনেক কবি অনেক ভাবে বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের বর্ণনায় প্রায়ই তাঁহাদের আপন-আপন বাসস্থানের সমীপবর্ত্তী জনপদের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ক্ষেমানন্দ ও কেতকাদাসের বর্ণনা হইতে চাঁদ সদাগরের বাসস্থানের যে নিদর্শন পাই, তাহাতে বর্দ্ধমান-বিভাগের কোন গণ্ডগ্রামে চাঁদ সদাগরের বসতি ছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সেই গ্রামের নাম—চম্পকনগর। এই চম্পকনগর ও চাঁদ সদাগরের সহিত প্রাচীন বাঙ্গালার যে এক অভিনব স্মৃতি বিজড়িত হইয়া আছে, সে স্মৃতি কতকাল পূর্ব্বের, তাহা নির্ণীত না হইলেও, কখনই লোপ পাইবে না। সর্পদষ্ট মৃতপতি

ক্রোড়ে লইয়া, মান্দাসে ভাসিয়া, যেখানে আসিয়া বেহুলা পতির পুনর্জ্জীবন লাভ করেন, সে এই ত্রিবেণী তীর্থ। ত্রিবেণী-তীরে রজকী বস্ত্র-ধৌত-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। মৃতপতি ক্রোড়ে বেহুলাকে দেখিয়া, দয়ার্দ্র হইয়া, আপন প্রভুর নিকট হইতে সে ঔষধ আনিয়া দেয়। সেই ঔষধে 'নাখিন্দর' নবজীবন লাভ করেন। এ ঘটনা পুরুষ-পরম্পরায় মুখে মুখে কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু কত কালের ঘটনা, কে নির্ণয় করিবেন? বৈষ্ণব কবিগণের গ্রন্থেও সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণীর মাহাত্ম্য সমভাবে পরিকীর্ত্তিত। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব-কালে উদ্ধারণ দত্তের প্রসঙ্গে বৈষ্ণব-গ্রন্থে ত্রিবেণীর ও সপ্তগ্রামের উল্লেখ দেখি। পরম-ভাগবত উদ্ধারণ দত্ত সপ্তগ্রামের সুবর্ণ-বণিক-সম্প্রদায়ের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই প্রভাবে বৈষ্ণবধর্ম্মের নবারুণকিরণে সপ্তগ্রাম আলোকিত হইয়াছিল। উদ্ধারণ দত্তের ভগ্নমন্দির ও রঘুনাথ দাসের পাট সে স্মৃতি আজিও বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। সপ্তগ্রামে ভক্তপ্রবর উদ্ধারণ দত্তের গৃহে শ্রীমৎ নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর শুভাগমন হইয়াছিল। বৈষ্ণব-গ্রন্থে, বৃন্দাবন-দাস-বিরচিত শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে, নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সপ্তগ্রাম দর্শনের যে বর্ণনা দৃষ্ট হয়, তাহাতে সপ্তগ্রামের বাণিজ্যের ও সমৃদ্ধির নিদর্শন দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

শ্রীচৈতন্যের সময়ে সপ্তগ্রাম।

"কথো দিন থাকি নিত্যানন্দ খড়দহে। সপ্তগ্রাম আইলেন সর্ব্বগণ সহে॥
সেই সপ্তগ্রামে আছে সপ্ত-ঋষি-স্থান। জগতে বিদিত সে ত্রিবেণী-ঘাট নাম॥
সেই গঙ্গাঘাটে পূর্ব্বে সপ্ত-ঋষিগণ। তপ করি পাইলেন গোবিন্দ-চরণ॥
তিন দেবী সেই স্থানে একত্র মিলন। জাহ্নবী যমুনা সরস্বতীর সম্মিলন॥
প্রসিদ্ধ ত্রিবেণীঘাট সকল ভুবনে। সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয় যার দরশনে॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পরম আনন্দে। সেই ঘাটে স্নান করিলেন সর্ব্ববৃন্দে॥
উদ্ধারণ দত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে। রহিলেন মহাপ্রভু ত্রিবেণীর তীরে॥
কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দের চরণ। ভজিলেন অকৈতবে দত্ত উদ্ধারণ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের সেবা-অধিকার। পাইলেন উদ্ধারণ কিবা ভাগ্য আর॥
জন্ম জন্ম নিত্যানন্দস্বরূপ ঈশ্বর। জন্ম জন্ম উদ্ধারণ তাঁহার কিঙ্কর॥
যতেক বণিককুল উদ্ধারণ হৈতে। পবিত্র হইল দ্বিধা নাহিক ইহাতে॥
বণিক তারিতে নিত্যানন্দ-অবতার। বণিকেরে দিলা প্রেমভক্তি অধিকার॥
সপ্তগ্রামে প্রতি বণিকের ঘরে ঘরে। আপনি শ্রীনিত্যানন্দ কীর্ত্তন বিহরে॥
বণিক-সকল নিত্যানন্দের চরণ। সর্ব্বভাবে ভজিলেন লইয়া স্মরণ॥
বণিকসভের কৃষ্ণভজন দেখিতে। মনে চমৎকার পায় সকল জগতে॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মহিমা অপার। বণিক অধম মূর্খে যে কৈল উদ্ধার॥
সপ্তগ্রামে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ রায়। গণ-সহ সঙ্কীর্ত্তন করেন লীলায়॥
সপ্তগ্রামে যত হৈল কীর্ত্তন-বিহার। শত বৎসরেও তাহা নারি বর্ণিবার॥
পূর্ব্বে যেন সুখ হৈল গোকুল-নগরে। সেইমত সুখ হৈল সপ্তগ্রাম পুরে॥"

এই বর্ণনায়, ত্রিবেণী-সপ্তগ্রামের পবিত্রতার ও মাহাত্ম্যের বিষয় বুঝিতে পারা যায়।

এই বর্ণনায়, শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভৃতির আবির্ভাব সময়ে, সপ্তগ্রাম বণিকপ্রধান স্থান ছিল, বাণিজ্যে সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, স্বতঃই প্রতীত হয়। সুবর্ণবণিক-সম্প্রদায় চিরদিনই ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য প্রতিষ্ঠান্বিত। যে নগর যখনই বাণিজ্যের কেন্দ্র-স্থানমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, তখনই সেই নগরে সুবর্ণবণিক-সম্প্রদায়ের প্রভাব দেখিতে পাই। ইউরোপীয় বণিকগণ যে এদেশে প্রথম আগমন করেন, সুবর্ণবণিক-সম্প্রদায়ের সহায়তাই তাহার ভিত্তি-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। হুগলীর প্রাচীন ইতিহাস এই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কলিকাতা মহানগরীতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিষ্ঠার মূলে, এই সুবর্ণবণিক-সম্প্রদায়ের সহায়তা চিরপ্রসিদ্ধ। সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্তের পরিচয়-প্রসঙ্গে সেই তথ্যই অবগত হইলাম। * প্রায় চারি শত বৎসর পূর্ব্বে 'ষষ্ঠীমঙ্গল' প্রণেতা কবি কৃষ্ণরাম, সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধির বিষয় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সে বর্ণনার কিয়দংশ,—

"সপ্তগ্রাম জে ধরণি নাহি তুল। চালে চালে বৈসে লোক ভাগিরথির কুল ॥
নিরবধি জজ্ঞ দান পুণ্যবান লোক। অকাল মরণ নহি নহি দুখ সোক ॥
ষক্রজিৎ রাজার নাম তার অধিকারী। বিবরিএ জতগুণ বলিতে নহি পারি ॥
নিমল জসের সখি প্রেতপ্ত তপন। জিনিয়া অমরাপুরী তাহার ভবন ॥" †

'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে সাতগাঁয়ের উল্লেখ আছে। তাহাতে হুগলী, চব্বিশ পরগণা, নদীয়া প্রভৃতির বহু অংশ ঐ পরগণার অন্তর্ভুক্ত ছিল, বুঝা যায়। সপ্তগ্রামের অঙ্গ-স্থানীয় বেতোড়ের সম্বন্ধেও প্রাচীন বাঙ্গালা-গ্রন্থে নানা উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মাধবাচার্য্যের এবং মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-গ্রন্থ যথাক্রমে ১৫৭৯ ও ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। ঐ দুই গ্রন্থে বেতোড়ের উল্লেখ এইরূপ আছে। যথা, মুকুন্দরামের চণ্ডীতে,—

"কলিকাতা এড়াইল বেনিয়ার বালা। বেতোড়েতে উত্তরিল অবসান বেলা ॥
বেতাইচণ্ডীকা পূজা করিল সাবধানে। ধনস্ত গ্রামখানা সাধু এড়াইল বামে ॥"

এইরূপ মাধবাচার্য্যের গ্রন্থে ;—

"রৈঘরে থাকিয়া সাধু বলে বাহবা। বেতোড়েতে উত্তরিল সাধুর সপ্ত না ॥"

১৫৪০ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ ঐতিহাসিক ডি. ব্যারোজ ভারতের একখানি মানচিত্র প্রস্তুত

* উদ্ধারণ দত্ত ১৪৮২ খৃষ্টাব্দে (১৪০৩ শকে) সপ্তগ্রামে সুবর্ণবণিক-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম—শ্রীকর। মাতার নাম—ভদ্রামতী। পুত্র শ্রীনিবাস প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনকে ও বিষয়-বিভব পরিত্যাগ করিয়া, আটচল্লিশ বর্ষ বয়সে তিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। ছয় বৎসর নীলাচলে এবং ছয় বৎসর বৃন্দাবনে বাস করিয়া ষাট বৎসর বয়সে অগ্রহায়ণ মাসে কৃষ্ণা-ত্রয়োদশী তিথিতে তিনি দেহত্যাগ করেন। বৃন্দাবনে বংশী-বট-সন্নিধানে উদ্ধারণ দত্তের সমাধি আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। বৈষ্ণব-গ্রন্থে উদ্ধারণ দত্ত কৃষ্ণসখা সুবাহুর অবতার বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। পদসমুদ্র-গ্রন্থে—উদ্ধারণ দত্তের পরিচয় ও গৃহত্যাগের বিবরণ এইরূপ ভাবে পরিবর্ণিত হইয়াছে ;—

"শ্রীকরনন্দন দত্ত উদ্ধারণ ভদ্রাবতী-গর্ভজাত।
ত্রিবেণীতে বাস নিতাইর দাস শ্রীগৌরাঙ্গ-পদাশ্রিত ॥
বিষয়-বাণিজ্য সংসারিক কার্য্য মলপ্রায় ত্যজ্য করি।
পুত্র শ্রীনিবাসে রাখিয়া আবাসে হইলা বিবেকাচারী ॥
নীলাচল পুরে প্রভু মিলিবারে সদা ইতি উতি ধায়।
আশা ঝুলি লয়ে ভিখারী হইয়ে প্রসাদ মাগিয়া খায় ॥"

† কৃষ্ণরাম কৃত 'ষষ্ঠী-মঙ্গল'—এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি।

করেন। সেই মানচিত্রে বেতোড়ের নাম লিখিত আছে। তাহার পর, বেতোড়ের বাণিজ্য লোপ পাইলে, সপ্তদশ শতাব্দীতে যে সকল মানচিত্র দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে আর বেতোড়ের নাম দেখা যায় না। পর্ত্তুগীজগণ, আপনাদের বাণিজ্য শেষ হইলে, পণ্য-দ্রব্যে অর্ণবপোত পরিপূর্ণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন-কালে, প্রতি বৎসরই বেতোড়ের বন্দরে আগুন লাগাইয়া দিয়া যাইতেন। ভিনিস-দেশীয় ভ্রমণকারী সিজার ফ্রেডারিক, বেতোড়ের এবম্বিধ ভাগ্যবিবর্ত্তন দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাহা লিখিয়াছেন, এস্থলে তাহা উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি। তিনি লিখিয়াছেন,—'জোয়ারের সাহায্যে সপ্তগ্রামে পৌছান যায়। সপ্তগ্রাম যাইবার পথে বেতোড় বলিয়া একটী বন্দর আছে। ঐ বন্দর হইতে অর্ণবপোত-সকল আর অগ্রসর হইতে পারে না। কারণ, উপরের দিকে নদীর জল অতি অল্প। পর্ত্তুগীজেরা প্রতি বৎসরই বেতোড়ে নূতন বন্দরের সৃষ্টি করিত ও তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিত। ঐ বন্দরে খড়ের দ্বারা তাহারা বাসের-ঘর ও দোকান-ঘর প্রস্তুত করিয়া লইত। সে সময় আবশ্যকানুরূপ সকল দ্রব্যই সেখানে পাওয়া যাইত। যতদিন পর্য্যন্ত জাহাজ সকল বেতোড়ে থাকিত এবং বোঝাই-কাজ চলিত, ততদিন পর্য্যন্ত বন্দরের জাঁক-জমক অব্যাহত রহিত। অবশেষে পণ্য লইয়া পোত-সমূহ পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অভিমুখে যাত্রা করিবার সময় পর্ত্তুগীজেরা ঘর-বাড়ীগুলিতে আগুন লাগাইয়া পুড়াইয়া দিত। এই ব্যাপারে আমি বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হই। সপ্তগ্রামের পথে অগ্রসর হইবার সময় আমি বেতোড়ের বন্দরে অসংখ্য লোক, অসংখ্য অর্ণবপোত এবং বিস্তৃত বিপণী দেখিয়াছিলাম। কিন্তু প্রত্যাগমনকালে বেতোড়ের অবস্থা দেখিয়া আমি বড়ই বিস্মিত হইলাম। বন্দর-বাজার সকলই তখন ভূমিসাৎ ও ভস্মীভূত। কতকগুলি অগ্নি-দগ্ধ বাড়ীর চিহ্ন ভিন্ন আমি আর কিছুই দেখিতে পাই নাই।' * পর্ত্তুগীজগণ কি উদ্দেশ্যে বন্দরের ধ্বংস-সাধন করিতেন, তাহা প্রকাশ নাই। তবে বন্দরের সৌভাগ্য-শ্রী পর্ত্তুগীজগণের হস্তেই যে বিধ্বস্ত হইয়াছিল, এই বর্ণনায় তাহা বুঝা যায়। যেমন বেতোড়ের, তেমনই সপ্তগ্রামের অবনতির মূল—পর্ত্তুগীজগণ। ওলন্দাজ-বণিক লিনশোটেন, ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে অবস্থিতি করেন। তিনি পর্ত্তুগীজগণকেই সপ্তগ্রামের অবনতির প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায়

---

* "A good tide's rowing before you come to Satagaon, you shall have a place which is called Buttor, and from thence upwards the ships do not go, because that upwards the river is very shallow and little water. Every year at Buttor they make and unmake a village with houses and shops made of straw and with all things necessary to their uses, and this village standeth as long as the ships ride there, and they depart for the Indies, and when they are departed, every man goeth to his plot of houses, and there seteth fire on them, which thing made me to marvel. For as I passed up to Satagaon I saw this village standing with a great number of people with an infinite number of ships and bazars, and at my return coming down I was all amazed to see such a place so soon razed and burnt, and nothing left but the sign of the burnt houses."—*Vide* Hakluyt's ***The Principal Navigations, Voyages, Traffiques and Discoveries etc.***

প্রকাশ,—পর্ত্তুগীজগণের অত্যাচারেই সপ্তগ্রামে বণিকগণের গতিবিধি বন্ধ হইয়াছিল। মোগল-সম্রাট আকবরের রাজত্বকালেই সপ্তগ্রাম বন্দর বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। ইহার পর, পর্ত্তুগীজেরা দিল্লীর বাদসাহের নিকট হইতে হুগলীতে স্থায়ী বন্দর প্রতিষ্ঠার অনুমতি পান। সপ্তগ্রামের সম্যক পতন—সেই হইতেই। যে সপ্তগ্রামের সহিত প্রাচীন রোমের বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল, সমুদ্রপথে সংবাহিত পণ্যাদি যে সপ্তগ্রামের মধ্যস্থতায় ভারতের বিভিন্ন জনপদে বিস্তৃত হইয়া পড়িত, পৌরাণিক সময় হইতে আরম্ভ করিয়া পর্ত্তুগীজগণের হুগলী-বন্দর প্রতিষ্ঠার দিন পর্য্যন্ত যে সপ্তগ্রামকে ইউরোপীয়গণ ভারতের বাণিজ্য-কেন্দ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, * এখন সে সপ্তগ্রামের কি অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, চিন্তা করিতেও কষ্ট হয়। সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে জাফর-খাঁর সমাধি, উদ্ধারণ-দত্তের মন্দির, রঘুনাথ দাসের পাট, সপ্তগ্রাম-দুর্গের ভগ্নস্তূপ, জমাল-উদ্দিনের সমাধি প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষীণ-স্মৃতি-চিহ্ন মাত্র বিদ্যমান আছে; আর আছে একটী প্রবাদ-বাক্য—"গাজীর কুড়ুল নড়ে চড়ে পড়ে না।" জাফর খাঁর (গাজীর) সমাধির পূর্ব্বভাগে প্রস্তর-সংলগ্ন একখণ্ড লৌহ দৃষ্ট হয়। ঐ লৌহখণ্ড কতকাল হইতে দোদুল্যমান রহিয়াছে, কেহই বলিতে পারেন না। ঐ লৌহখণ্ড 'গাজীর কুড়ুল' নামে পরিচিত। ত্রিবেণীর পূর্ব্ব-চিহ্ন কি আর আছে? ত্রিবেণীর গঙ্গাতীরে যে বাঁধাঘাট দৃষ্ট হয়, ঐ ঘাট রাজা মুকুন্দদেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মুকুন্দদেব উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নৃপতি। ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি সিংহাসন লাভ করেন। সে হিসাবে সাড়ে তিন শত বৎসরের অধিক কাল এই ঘাট নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু ঘাটটী এখনও হতশ্রী হয় নাই। সপ্তগ্রাম পরিত্যক্ত হইলে, হুগলী

হুগলী, চুঁচুড়া প্রভৃতি।

জাঁকিয়া উঠে। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হুগলীর বাণিজ্য-সমৃদ্ধির বিষয় ইংরেজগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। টমাস বাউরে জাহাজের অধ্যক্ষ-রূপে এদেশে আসেন। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দশ বৎসর কাল তিনি অর্ণবপোতাদির গতিবিধির তত্ত্বাবধারণ করিতেন। তিনি বঙ্গোপসাগর-সমীপস্থ জনপদ-সমূহের ভৌগোলিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তাঁহার সেই গ্রন্থে হুগলীর এবং বাঙ্গালার নানাস্থানের বাণিজ্যের বিষয় নিম্নলিখিতরূপে পরি-বর্ণিত আছে। 'হুগলী-সহরে, বালেশ্বরে এবং পিপ্‌লী বন্দরে নবাবের ও কয়েক জন বণিকের অন্যূন কুড়িখানি সুবৃহৎ অর্ণবপোত ছিল। সেই অর্ণবপোতের সাহায্যে তাঁহারা প্রতিবৎসর সমুদ্রপথে বাণিজ্য করিতেন। কতকগুলি পোত সিংহল-দ্বীপের দিকে বাণিজ্য করিতে যাইত; কতকগুলি পোত টানাসারি বা টেনাসারিম-দ্বীপের দিকে পরিচালিত হইত; ঐ সকল অর্ণবপোতে তাঁহারা প্রধানতঃ হস্তী আনয়ন করিতেন। এতদ্ব্যতীত মালদ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত দ্বাদশ সহস্র দ্বীপে বৎসরে ছয় সাত বার ঐ সকল অর্ণবপোত গতিবিধি করিত। সেই দ্বীপপুঞ্জ হইতে কড়ি ও নারিকেল-দড়ি আসিত এবং নানা-

* "It was known to Romans ... It was the great mart of Bengal to which all the sea-bourne trade was brought."—Marshman's *History of Bengal.* *Vide* also Hunter's *Statistical Account of Bengal,* Vol. iii, and *Journal of the Asiatic Society of Bengal* for 1847 and 1909.

প্রকারে বণিকগণ লাভবান হইতেন। সিংহল-দ্বীপের হস্তী-সকল ওলন্দাজদিগের নিকট হইতে আনয়ন করা হইত। ওলন্দাজগণ তখন হস্তী-পোষণে বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা বন-মধ্যে হস্তী লইয়া গিয়া পোষ মানাইতেন। চাউল, ঘৃত, গম, অহিফেন, রেশমী বস্ত্র বা 'কেলিকো' বস্ত্র প্রভৃতির বিনিময়ে বঙ্গদেশের বণিকগণ সেই সকল হস্তী ক্রয় করিতেন। এই সময় দিনেমারদিগের সহিত বাঙ্গালার বণিকগণের বিরোধ উপস্থিত হয়। তাহাতে দিনেমারগণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং মুর-গণ (মুসলমান) লাভবান হন।' * ইহার পর হুগলী, চুঁচুড়া, চন্দননগর, শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থান বৈদেশিক বণিকগণের বাণিজ্যে ক্রমেই সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠে।

পূর্ব্ববঙ্গের বাণিজ্যবন্দর-সমূহ।

বৈদেশিক বণিকগণের ও ভ্রমণকারিগণের বর্ণনায় বাঙ্গালার আর আর যে বাণিজ্য-বন্দরের পরিচয় পাওয়া যায়,* তাহার মধ্যে চট্টগ্রাম, সুবর্ণগ্রাম, সন্দীপ, বাঙ্গালা-নগর, বাকলা, শ্রীপুর, গৌড়, পাণ্ডুয়া, তান্দা প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পশ্চিম-প্রদেশের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য চীন-সম্রাট 'যুঙ্‌-লো' ১৪০৫ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন দেশে দূত প্রেরণ করেন। চীন-সম্রাটের দূত-রূপে যিনি ভারতবর্ষে আসেন, তাঁহার নাম,—'চেং-হো'। আরবী-ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া 'মাহুয়ান', সম্রাট-প্রেরিত সেই দূতের সঙ্গে, দোভাষীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া এ দেশে আসেন। এই দৌত্যবাহিনী সুমাত্রা হইতে চট্টগ্রাম-বন্দরে আসিয়া প্রথমে উপনীত হন। মাহুয়ান তখন বঙ্গদেশের বাণিজ্য-সম্পদ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বঙ্গরাজ্যের বিবরণ-প্রসঙ্গে তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে অবগত হওয়া যায়,—'এ দেশের ধনবানগণ অনেকেই অর্ণবপোত নির্ম্মাণ করাইতেন; এবং সেই সকল অর্ণবপোতের সাহায্যে বৈদেশিক জাতির সহিত বাণিজ্য-কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। অনেকে ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন, অনেকে চাষ-আবাদ করিতেন, কেহ কেহ বা শিল্পকলায় নৈপুণ্য দেখাইতেন। রাজকীয় অর্ণবপোত-সমূহ সুসজ্জিত হইয়া, বিদেশে বাণিজ্যের জন্য প্রেরিত হইত। এই দেশ হইতে মুক্তা এবং বহুমূল্য প্রস্তর-সমূহ চীন-সম্রাটকে উপঢৌকন-স্বরূপ পাঠাইবার ব্যবস্থা ছিল।' † মাহুয়ান যখন ভারতবর্ষে আসেন, তখন বোধ হয়, তাম্রলিপ্ত বন্দর তাদৃশ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ছিল না। পূর্ব্ব-বঙ্গের বন্দর-সমূহই তখন সমধিক প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছিল। সুমাত্রা হইতে মাহুয়ান যে পথে পূর্ব্ব-বঙ্গে আগমন করেন, তাহাতে তখন পূর্ব্ব-বঙ্গের সহিতই চীনের সরাসরি বাণিজ্য-সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল, বুঝা যায়। মাহুয়ান লিখিয়া গিয়াছেন,—'নিম্নলিখিত পথ বাহিয়া, 'সু-মেন-তা-লা' হইতে 'পাঙ্‌-কো-লা' রাজ্যে অর্ণবপোত পৌঁছিয়াছিল। প্রথমে 'মাও-সান্' পরে 'সুই-লাম' দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছিয়া, অর্ণবপোত উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে পরিচালিত হয়। সুবাতাসের

---

* *A Geographical Account of Countries* round the Bay of Bengal, 1669 to 1679, by Thomas Bowrey edited by Lt.-Col. Sir Richard Temple.

† *Vide* Journal of the Royal Asiatic Society, 1895—Mahuan's ***Account of the Kingdom of Bengala*** by Mr. George Philips.

সাহায্যে একুশ দিন চলিয়া জাহাজ 'চে-টি-গান' বন্দরে আসিয়া নোঙ্গর করে। সেখান হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকার সাহায্যে পাঁচ শত লি (প্রায় ১৬৬ মাইল) দূরস্থিত 'সোনা-উর-কঙ' নগরে পণ্যাদি প্রেরিত হয়। সেখান হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে শতাধিক মাইল গমন করিলে, বেঙ্গালা-রাজ্যে পৌঁছান যায়।' মাহুয়ানের উচ্চারণে সু-মেন-তা-লা, পাঙ-কো-লা, চে-টি-গান, সোনা-উর-কঙ প্রভৃতি শব্দ যথাক্রমে সুমাত্রা, বাঙ্গালা, চট্টগ্রাম, সুবর্ণগ্রাম প্রভৃতির পরিবর্ত্তে যে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। 'মাওসান'—সুমাত্রার অন্তর্গত একটী দ্বীপকে এবং 'সুইলান' নিকোবর-দ্বীপপুঞ্জকে বুঝাইয়াছে এইরূপ অনুমান হয়। তদুক্ত 'পাঙ্-কো-লো' * শব্দে সমগ্র বাঙ্গালাদেশকে যে বুঝায় নাই, বাঙ্গালাদেশের একটী নগর-বিশেষকে যে বুঝাইয়াছিল, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। বাঙ্গালার এই নগরের উল্লেখ বৈদেশিক ভ্রমণকারিগণের অনেকেরই বর্ণনায় দেখিতে পাই। মাহুয়ানের ভারত-আগমনের প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বে (১৩৪৬ খৃষ্টাব্দে) ইবন-বাতুতা বাঙ্গালাদেশের দুইটী প্রধান বিভাগের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। একটী বিভাগের নাম—বাঙ্গালা (বাঙ্‌লা); অপর বিভাগের নাম—লক্ষ্মণাবতী। তাঁহার বর্ণনায় বুঝা যায়, ঐ দুই বিভাগে তখন দুই জন স্বাধীন নৃপতি ছিলেন এবং সেই দুই নৃপতির পরস্পরের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিত। ইবন-বাতুতার বর্ণনায় আরও প্রকাশ,—সেই সময়ে মাল-দ্বীপপুঞ্জ হইতে অনেক কড়ি বঙ্গদেশে আমদানি হইত, এবং চাউল প্রভৃতি পণ্য-দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ে তৎ-সমুদায় বিনিময়ের মধ্যস্থ-রূপে (মুদ্রার ন্যায়) ব্যবহৃত ছিল। ইবন-বাতুতা ভারতবর্ষের দুইটী প্রদেশকে বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রস্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সেই দুইটী প্রদেশের একটী—বাঙ্গালা; অপরটী—ভারতের সর্ব্ব-দক্ষিণাংশ (দাক্ষিণাত্যের সীমান্ত-ভাগ)। বাঙ্গালায় এবং দাক্ষিণাত্যে তখন বাণিজ্য বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। চীনের সহিত সরাসরি তখন এই দুই প্রদেশ হইতেই বাণিজ্য চলিত। সুবর্ণগ্রাম (সোনার গাঁ) যখন পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানগণের রাজধানী ছিল, সেই সময়ে ইবন-বাতুতা সেখানে আসিয়াছিলেন। মাল-দ্বীপ হইতে যাত্রা করিয়া তেতাল্লিশ দিন পরে তিনি বঙ্গদেশের যে নগরে উপস্থিত হন, সে বন্দরের নাম—'সাদকাওয়ান' † রূপে তিনি উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন। ঐ বৃহৎ নগর সমুদ্রের তীরে অবস্থিত বলিয়া প্রকাশ। ইবন-বাতুতার কথিত 'সাদকাওয়ান'-নগর 'চট্টগ্রাম' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। ঐ নগর হইতেই যাত্রা করিয়া, তিনি চল্লিশ দিন পরে যবদ্বীপে পৌঁছিয়াছিলেন। প্রথম ইংরেজ-পরিব্রাজক রালফ্ ফীচ যখন সোনার-গাঁয়ে আসেন, তখনও ঐ নগরের বাণিজ্য-সম্পদের অবধি ছিল না। তাঁহার বর্ণনায় প্রকাশ,—'এই সোনার-গাঁয়ে

চট্টগ্রাম, সুবর্ণগ্রাম প্রভৃতি।

---

* মাহুয়ান-কথিত 'পাঙ-কো-লো' বর্ত্তমান ঢাকা সহরের 'বাঙ্গালাবাজার' পল্লীকে কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যে সময়ে ঐ অংশেই রাজধানী ছিল বলিয়া কথিত হয়। যাহা হউক, প্রসঙ্গান্তরে এ বিষয় একটু বিশদভাবে আলোচনা করা হইল। (১৯৮ প্রভৃতি পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

† ইবন-বাতুতার উচ্চারণে চট্টগ্রাম ও সুবর্ণগ্রাম যথাক্রমে—Sadkawan ও Sunur Kawan রূপ পরিগ্রহ করিয়া আছে।

অত্যুৎকৃষ্ট সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম কার্পাস-বস্ত্র মিলিত। এই বন্দর হইতে প্রচুর পরিমাণ কার্পাস-বস্ত্র ও চাউল রপ্তানী হইত। সেই চাউল ও বস্ত্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন-স্থানে, লঙ্কা-দ্বীপে, পেগু, মালাক্কা, সুমাত্রা ও অন্যান্য স্থানে বণিকগণ চালান দিত।' * ফীচ পূর্ব্ববঙ্গে আরও কয়েকটী সমৃদ্ধি-সম্পন্ন বাণিজ্য-বন্দর দেখিয়াছিলেন। বাকৃলা;—এই বন্দর হইতে প্রচুর পরিমাণে চাউল, কার্পাস-বস্ত্র এবং রেশমী-বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হইত। বাকৃলা প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপ-রাজ্যের রাজধানী ছিল বলিয়া কথিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে চন্দ্রদ্বীপের নাম লোপ পায়। তখন চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত জনপদকে বাকৃলা বা বগ্‌লা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছিল। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে 'সরকার বাকৃলা' একটী স্বতন্ত্র বিভাগ বলিয়া উল্লিখিত আছে। প্রধানতঃ বর্ত্তমান বাখরগঞ্জ জেলা এবং খুলনা ও ফরিদপুর জেলার কিয়দংশ চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত ছিল। চন্দ্রদ্বীপের রাজধানী বাকৃলার অবস্থান বিষয়ে নানা মতান্তর আছে। তবে সাধারণতঃ বরিশাল-জেলার পটুয়াখালি মহকুমার অন্তর্গত কচুয়া-পল্লীকে এখন চন্দ্রদ্বীপের প্রাচীন রাজধানী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। কচুয়া ও বাকৃলা দুইখানি স্বতন্ত্র পরস্পর-সংলগ্ন গ্রাম ছিল বটে; কিন্তু কালক্রমে উভয়েই বাকৃলা নামে প্রসিদ্ধ হয়। রাজা কন্দর্পনারায়ণ ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে বাকৃলা হইতে মাধবপাশায় রাজধানী পরিবর্ত্তন করেন। তখন মাধবপাশাই বাকৃলা নামে পরিচিত হয়। ফীচ ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে কন্দর্প-নারায়ণকেই বাকৃলায় রাজত্ব করিতে দেখিয়াছিলেন। মাধবপাশায় কন্দর্পনারায়ণের রাজধানীর শেষ স্মৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন বাকৃলায় পরম-বৈষ্ণব রূপ-সনাতন জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীপুর;—এই বন্দর হইতে প্রচুর পরিমাণে কার্পাস-বস্ত্র বিদেশে যাইত। বর্ত্তমান নোয়াখালী-জেলায় সন্দ্বীপের সন্নিকটে প্রাচীন শ্রীপুর বন্দর চিহ্নিত হইয়া থাকে। শ্রীপুর রাজা কেদার রায়ের রাজধানী ছিল। কেদার রায় ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে শ্রীপুরে প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন। ফীচের পূর্ব্বে লোডোভিকো-ডি-বার্থেমা, সিজার-ডি-ফ্রেডারিক, বার্ব্বোসা ও সোমেরিও-ডি-রেগ্‌নী প্রভৃতি পরিব্রাজকগণ বঙ্গদেশের বাণিজ্য-বন্দর-সমূহের বিষয় উল্লেখ করেন। সিজার ফ্রেডারিক—ভিনিস-দেশীয় পরিব্রাজক। পেগু হইতে চট্টগ্রামে আসিবার সময়ে ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে বিষম বাত্যার তুফানে পড়িয়া তিনি সন্দ্বীপে আসিয়া উপনীত হন। সন্দ্বীপ বন্দর তখন কিরূপ বাণিজ্য-প্রধান স্থান ছিল, তাঁহার বর্ণনায় তাহা বুঝিতে পারা যায়। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—'ঐ বন্দর হইতে বৎসরে দুই শতাধিক অর্ণবপোত লবণ লইয়া বিদেশে যাইত। এই বন্দরে অর্ণবপোত-নির্ম্মাণের উপাদানাদি এত পর্য্যাপ্ত পরিমাণ পাওয়া যাইত এবং এত অল্পব্যয়ে এই বন্দরে অর্ণবপোতাদি নির্ম্মিত হইত যে, তুরস্কের সুলতান পর্য্যন্ত এই স্থান হইতে পোত নির্ম্মাণ করাইয়া লইতেন। আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর অপেক্ষাও অল্পব্যয়ে

বাকৃলা-চন্দ্রদ্বীপ শ্রীপুর সন্দ্বীপ।

---

* Ralph Fitch says:—"Here is best and finest cloth made of cotton that is in all India. Great store of cotton cloth goeth from here, and much rice, wherewith they serve all India, Ceylon, Pegu, Malacca, Sumatra and many other places.'

এখান হইতে সুলতানের আবশ্যকমত পোতাদি নির্ম্মিত হইত।' ফ্রেডারিকের সন্দীপ-বন্দর দর্শনের প্রায় আশী বৎসর পরে হার্ব্বার্ট নামক জনৈক ইংরেজ-পরিব্রাজক ঐ বন্দর দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনায় প্রকাশ,—'ভারতবর্ষের মধ্যে সন্দীপ একটী অন্যতম বন্দর।' বার্থেমা, বাঙ্গালা-নগরের বাণিজ্য-সমৃদ্ধির বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি টেনাসেরিম (তাঁহার উচ্চারণে টার্ণাস্সারি) হইতে যাত্রা করিয়া এগার দিন পরে বাঙ্গালা-নগরে উপস্থিত হন। তিনি ইতিপূর্ব্বে যত নগর দেখিয়াছিলেন, এই বাঙ্গালা-নগর সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এই বন্দরে সর্ব্বপ্রধান ধনী বণিকগণকে তিনি দেখিয়াছিলেন। এই বন্দর হইতে বৎসরে অন্ততঃ পঞ্চাশখানি জাহাজ কার্পাস-বস্ত্রে ও রেশমী-বস্ত্রে বোঝাই হইয়া বিদেশে যাইত। ঐ সকল পণ্য, তুরস্কে, সিরিয়ায়, পারস্যে, আরবে, ইথিওপিয়ায় এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী হইত। বাঙ্গালা-নগরে বিভিন্ন দেশের জহুরী বণিকগণ গতিবিধি করিতেন।† বার্থেমার বর্ণনায় 'বাঙ্গালা' বলিয়া একটী নগরের এবং 'বাঙ্গালা' বলিয়া একটী প্রদেশের উল্লেখ দেখা যায়। বাঙ্গালা নগরের পূর্ব্বোক্তরূপে বাণিজ্যের পরিচয় দিয়া, বার্থেমা অন্য স্থানে বলিয়াছেন,—'এই দেশে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়, নানাবিধ মাংস পাওয়া যায়, প্রচুর পরিমাণ চিনি ও আদা মিলে। কার্পাস-বস্ত্র এখানে প্রচুর উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর আর কোনও দেশে এই সকল দ্রব্য এত অধিক পরিমাণ উৎপন্ন হয় না।' ‡ বাঙ্গালা-নগরে অবস্থান-কালে বার্থেমা চীনদেশ হইতে আগত দুই জন খৃষ্টানের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গেই বার্থেমা পেগু যাত্রা করিয়াছিলেন। বার্থেমার বঙ্গদেশ আগমনের সম-সময়েই অন্যতম ইউরোপীয় পরিব্রাজক বার্ব্বোসা বঙ্গদেশে আগমন করেন। তিনি ও 'বেঙ্গালা' (বাঙ্গালা) নামক বন্দরের সমৃদ্ধির বিষয় বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় প্রকাশ,—'উপসাগরের আকৃতি গ্রহণ করিয়া উত্তরাভিমুখে গিয়া সমুদ্র যেখানে বক্রভাব ধারণ করিয়াছে, সেইস্থানে বাণিজ্য-বন্দর-সমন্বিত 'বেঙ্গালা' নামে একটী বৃহৎ নগর আছে। এই প্রদেশ বহুদূর-বিস্তৃত, এখান-

বাঙ্গালা (বাঙলা) নগর।

ঢাকা-জেলার ভৌগোলিক-বৃত্তান্ত সংক্রান্ত গ্রন্থে মিষ্টার টেলার, ফ্রেডারিকের উক্তির এইরূপ আভাস দিয়াছেন ;—"Two hundred ships are laden yearly with salt, and that such was the abundance of materials for ship-building in this part of the country that the Sultan of Constantinople found it cheaper to have his vessels built here, than at Alexandria." —*A Sketch of the Topography and Statistics of Dacca*, by Dr. James Taylor. কোন কোন গ্রন্থে বৎসরে তিন শতাধিক লবণ-বোঝাই অর্ণবপোতের সন্দীপ হইতে বিদেশে গমনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

† "From Tarnassari we took the route towards the city of Bangalla at which we arrived in eleven days. This city was one of the best that I had hitherto seen. Here there are the richest merchants ever met with. Fifty ships are laden every year in this place with cotton and silk stuffs. These same stuffs go through all Turkey, through Syria, Persia, Arabia Felix, Ethiopia, and through all India. There are also here very great merchants in jewels, which come from other countries."—*The Travels of Lodovico de Varthema.*

‡ "This country abounds more in grain, flesh of every kind, in great quantity of sugar, and of great abundance of cotton, than any other country in the world." *Ibid.*

কার জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। এখানে নানাদেশের নানালোকের গতিবিধি আছে। এখানকার সকলেই বড় বড় ব্যবসায়ী। চীনদেশের 'গিউঙ্কি' (জঙ্ক) এবং মক্কার জাহাজের ন্যায় এখানকার সকলেরই বড় বড় জাহাজ আছে। সেই সকল সুবৃহৎ অর্ণবপোতে বহুপরিমাণ পণ্য সংবাহিত হয়। সেই সকল পোতের সাহায্যে, বণিকগণ কারোমোণ্ডল, মালবর, কাম্বে, টেনাসেরিম, সুমাত্রা, জেলাম, মালাক্কা প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য করেন,—এক স্থানের পণ্য অন্য স্থানে সংবাহিত হয়।' * বার্কোসার বর্ণনাতেও বাঙ্গালা বলিয়া একটী নগরের এবং বাঙ্গালা বলিয়া একটী দেশের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে বুঝিতে পারি। রেগ নী 'বেঙ্গালা'-নগরের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন,—'ঐ নগরে চল্লিশ হাজার ঘর গৃহস্থের বাস।' পর্চ্চাসের বর্ণনায় প্রকাশ,—'বাঙ্গালায় প্রচুর পরিমাণে, চাউল, গম, চিনি, আদা, মরিচ, কার্পাস, রেশম উৎপন্ন হয়। এখনকার জলবায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ।' † এ বর্ণনাতে—বাঙ্গালা নগরের নহে—বাঙ্গালা দেশের কথাই বলা হইয়াছে বুঝা যায়। প্রসিদ্ধ ভৌগোলিক ও মানচিত্র-প্রস্তুতকারী মেজর রেণেল এবং বার্থেমার ভ্রমণ-বৃত্তান্তের ইংরাজী অনুবাদের সম্পাদক মিষ্টার জর্জ্জ পার্সি বেজার বলেন,—'মেঘনার মোহানায় ঐ বাঙ্গালা নগর অবস্থিত ছিল। এক্ষণে ঐ নগর নদী-গর্ভে বিলীন হইয়াছে।' ‡ কিন্তু ঢাকার ভৌগোলিক বিবরণ-সংক্রান্ত গ্রন্থের লেখক মিষ্টার টেলার বলেন,—'ঢাকা-সহরে এখন যেখানে বাঙ্গালাবাজার পল্লী অবস্থিত, প্রাচীন বাঙ্গালা-নগর বাঙ্গালার রাজধানীরূপে ঐ খানেই বিদ্যমান ছিল।' সামান্য কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বের একটী নগর,—প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের পরিব্রাজকগণ সে দিন পর্য্যন্ত যে নগরের সমৃদ্ধি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন,—সেই নগরের অস্তিত্ব-অনুসন্ধানে এখন এতই মতান্তর ঘটিয়াছে। দূর-অতীতের প্রাচীন বাঙ্গালার ঐশ্বর্য্য-বিভবের বিষয় অনুসন্ধান করিতে গবেষণা একেবারেই পর্য্যুদস্ত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বৈদেশিকগণের এবংবিধ বিবরণ হইতেই বুঝা যায়, পূর্ব্ববঙ্গে 'বাঙ্গালা' নামে এক সমৃদ্ধি-সম্পন্ন নগর ছিল, সে নগর এখন লোপ পাইয়াছে, এখন আর তাহার সন্ধান পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতেছে না। এ তুলনায়, পশ্চিম-বঙ্গের সপ্তগ্রাম, গৌড়, নবদ্বীপ কত পুরাতন, সহজেই উপলব্ধি হয়। সুতরাং ঐ সকল স্থানের পুরাতন-তত্ত্ব আরও গভীর অন্ধকারের মধ্যে বিলীন হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? গৌড়ের উল্লেখ, আদিকাল হইতেই দেখিতে

---

* "The sea forms a gulf which bends towards the north at the head of which is situated a great city which is called Bengala with a good port. The country being very extensive, and the climate temperate, many persons frequent it, and all are great merchants, who possess large ships like those of Mecca, and some like those of China called Giunchi, which are very large and carry large cargoes and with these they navigate towards Corromandel, Malabar, Cambay, Tenasserim, Sumatra, Zeilan, and Malacca; and they trade with all kinds of merchandize from one place to the other." *Ibid.*

† *Purchas, his pilgrims containing a History of the World in Sea Voyages and Land Travels* by Samuel Purchas B. D.

‡ *Vide* Rennell's *Memoir of the Map of Hindoostan*, and Dr. J. Taylor's *Topography and Statistics of Dacca.*

পাই। পুরাণমাত্রেই গৌড়ের প্রসঙ্গ আছে। শাস্ত্র-গ্রন্থই গৌড়ের প্রাচীনত্ব কীর্ত্তন করিতেছেন। বাঙ্গালা দেশের এবং বাঙ্গালা বন্দরের বিবরণ সম্পর্কে পরবর্ত্তী ভ্রমণকারিগণের বর্ণনায় নানা সন্দেহ-সংশয় উপস্থিত হয়। তাঁহারা বাঙ্গালা-নগরের বিষয় বলিয়াছেন, কি বাঙ্গালা বন্দরের বিষয় বলিয়াছেন, অনেক সময় তাহা বুঝিয়া উঠাই সুকঠিন। সুমাত্রা-দ্বীপের অন্তর্গত 'আচীন' বন্দরের বর্ণনায় মিষ্টার টমাস বাউরে লিখিয়াছেন,—'অনেক জাহাজ এবং নৌকা প্রায় সকল সময়েই বিভিন্ন স্থান হইতে এখানে আগমন করে। সেই সকল স্থানের নাম—সুরাট, মালবর-উপকূল, বেঙ্গালা ইত্যাদি।' ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে জন ডেভিস্ নামক জনৈক ইংরেজ পোত-পরিচালক আচীন-বন্দরের বাণিজ্য-প্রসঙ্গে বাঙ্গালার নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ওলন্দাজ পরিব্রাজক লিনশোটেন বাঙ্গালার বাণিজ্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি ঠিক বাঙ্গালা-বন্দরের নাম উচ্চারণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার উচ্চারণে 'বেঙ্গালেন' নাম দেখিতে পাই। তিনি বলেন —'বেঙ্গালেন-প্রদেশ হইতে নানাশ্রেণীর অর্ণবপোত ও বণিকগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে বাণিজ্যোদ্দেশ্যে গতিবিধি করিত।' * ল্যাভেল নামক জনৈক ফরাসী ভ্রমণকারী ১৬০১ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি মালদ্বীপপুঞ্জের সহিত বাঙ্গালার বাণিজ্য প্রত্যক্ষ করেন। তিনি ত্রিশ চল্লিশখানি অর্ণবপোতকে কেবল কড়ি বোঝাই লইয়া আসিতে দেখিয়াছিলেন। তিনি বলেন,—'সেই সমস্ত জাহাজ 'বেঙ্গালায়' আসিয়াছিল। সেখানেই কেবল সেই সকল কড়ি প্রচুর মূল্যে ও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিক্রীত হইত। † চীনদেশের সহিত বাঙ্গালার যে বাণিজ্য-সম্বন্ধের পরিচয় পাই, তাহাতে বাঙ্গালা নগর সময় সময় গৌড়কে বুঝাইয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়। চীনের মিং-রাজবংশের ইতিবৃত্ত 'মিং-শি' গ্রন্থে প্রকাশ,—'পাঙ-কো-লা'র রাজা 'ঐ-য়া-সে-টিঙ' ১৪০৮ খৃষ্টাব্দে চীন-সম্রাটকে কতকগুলি উপঢৌকন পাঠাইয়াছিলেন। আর সেই উপঢৌকনের বিনিময়ে চীন-সম্রাট নানাবিধ দ্রব্য প্রদান করেন। পর বৎসরেও দুই বার ঐরূপ দূত গিয়াছিল ও সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ১৪১২ খৃষ্টাব্দে এ দেশের দূতের সহিত চীন-রাজের কয়েক জন দূত এদেশে আগমন করেন। সেই সময়ে পূর্ব্বোক্ত 'ঐ-য়া-সে-টিঙ' ইহলোক পরিত্যাগ করায় তাঁহার সমাধি-উৎসবে চীনের সেই দূতগণ উপস্থিত ছিলেন। তখন ঐ-য়া-সে-টিঙের পুত্র 'সৈ-ফে-টিঙ' সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তাঁহার সিংহাসন প্রাপ্তির পর, ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে, নূতন নৃপতির স্বাক্ষরিত পত্র ও কতকগুলি উপঢৌকন লইয়া চীনে রাজদূত গিয়াছিল। পরবর্ত্তী বৎসরে চীনের যুবরাজ 'সি-চাউ', চীন-সম্রাটের প্রতিনিধি-রূপে বহু উপঢৌকন লইয়া, এদেশে আসিয়া, নূতন রাজাকে ও রাণীকে সম্বর্দ্ধনা করেন। ইহার পর ১৪৩৮ ও ১৪৩৯ খৃষ্টাব্দে চীনদেশে দূত গমনাগমনের পরিচয় পাওয়া যায়। মিং-বংশের

চীন-দেশের সহিত বঙ্গের বাণিজ্য।

* *The Voyage of John Huyghen van Linschoten to the East Indies* edited by A. C. Burnell and P. A. Tiele, vol. ii.

† ল্যাভেলের (Francois Pyrad de Lavel) বর্ণিত বাঙ্গালার বিবরণ পার্চ্চাসের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে (Purchas, his pilgrims &c.) দ্রষ্টব্য।

ইতিহাসে প্রাপ্ত এই সকল বিবরণ হইতে আমরা কি বুঝিতে পারি? যে সময়ের বিবরণ ঐ গ্রন্থে পরিবর্ণিত, তখন গয়েসউদ্দিন ও তৎপুত্র সৈয়ফউদ্দিন বঙ্গের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। গয়েসউদ্দিন ও সৈয়ফউদ্দিন যথাক্রমে 'ঐ-য়া-সে-টিঙ' ও 'সৈ-ফে-টিঙ' রূপে পরিচিত হইয়াছেন বলিয়াই বুঝা যায়। কিন্তু তাঁহাদের রাজধানী ছিল—গৌড়, পাণ্ডুয়া প্রভৃতি স্থানে। সুতরাং মিং-বংশের ইতিহাসে লিখিত 'পাঙ-কো-লা' সমগ্র বাঙ্গালা দেশকে বুঝাইয়াছে বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। গৌড়ের রাজাই বাঙ্গালার রাজা ছিলেন। বাঙ্গালার নামেই গৌড়ের পরিচয় ছিল। পূর্ব্ববঙ্গে যখন রাজধানী হয়, তখনও, যেখানেই রাজধানী থাকুক, তত্রত্য নৃপতি 'বঙ্গের অধিপতি' বলিয়াই পরিচিত হন। সে হিসাবে, কি পূর্ব্ববঙ্গ, কি উত্তরবঙ্গ, কি পশ্চিমবঙ্গ, কি দক্ষিণবঙ্গ—বঙ্গের সকল অংশই বিদেশীর নিকট বাঙ্গালা বা বঙ্গদেশ এই সাধারণ সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিল। বাঙ্গালা নামেই পরিচিত থাকুক, আর অন্য নামেই পরিচিত থাকুক, বাণিজ্য-বন্দরের মধ্যে ঢাকা—পূর্ব্ববঙ্গের আর একটী প্রাচীন প্রসিদ্ধ বন্দর বলিয়া বিখ্যাত। সমুদ্রগুপ্তের শিলালিপিতে 'ডবাক্' নামক এক নগরের পরিচয় পাওয়া যায়। ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডে 'ঢক্কা'-সংজ্ঞক নগরীর উল্লেখ আছে। ঢক্কাবাদ্যপ্রিয়া মহাকালীর অধিষ্ঠান-স্থান বলিয়া নগরের 'ঢক্কা' নাম হইয়াছিল। 'বুড়ীগঙ্গা' নদীর তটে অবস্থিত, ঐ নগর যবনগণের অধিকার-কালে 'জাঙ্গীর-পত্তন' বা 'জাহাঙ্গীরাবাদ' সংজ্ঞা লাভ করে। মুসলমানগণের প্রাধান্য-কালে ঢাকার প্রতিপত্তি বিশেষ বৃদ্ধি পায়। পাল-বংশের ও সেন-রাজবংশের

ঢাকা।

প্রতিষ্ঠার দিনে বিক্রমপুর (বর্ত্তমান ঢাকা জেলার অধিকাংশ ও ফরিদপুর জেলার কিয়দংশ) প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। রামপাল প্রভৃতি স্থানে সে স্মৃতির ধ্বংসাবশেষ আজিও দৃষ্ট হয়। মুসলমানেরা ঢাকায় আপনাদের শাসন-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৩৩০ খৃষ্টাব্দে মোহম্মদ তোগলক পূর্ব্ববঙ্গ অধিকার করেন। তখন সোনারগাঁ রাজধানী হয়। বঙ্গরাজ্য তখন তিন ভাগে বিভক্ত ছিল বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায়; (১) সোনারগাঁ, (২) সাতগাঁ, (৩) লক্ষ্মণাবতী। সোনারগাঁ অনেক দিন পর্য্যন্ত রাজধানী ছিল। সেরশাহের উত্তরাধিকারিগণ (১৫৩৮ খৃষ্টাব্দের পর) ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে ইস্‌লাম খাঁ ঢাকায় রাজধানী আনয়ন করেন। মধ্যে মধ্যে রাজধানী পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। পরিশেষে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে মীর্‌জুম্‌লা স্থায়ি-রূপে ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার সময়ে এবং সায়েস্তা খাঁর শাসন-সময়ে ঢাকার সমৃদ্ধি বিশেষভাবে প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিল। সায়েস্তা খাঁ ঢাকা-সহরকে বিস্তৃত করেন। সায়েস্তা খাঁর শাসন সময়েই (১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে) প্রসিদ্ধ ফরাসী ভ্রমণকারী টেভার্নিয়ার ঢাকায় আসিয়াছিলেন। তখন ঢাকাই পূর্ব্ববঙ্গের বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সায়েস্তা খাঁর নির্ম্মিত ইষ্টক-সেতু হইতে আরম্ভ করিয়া নদীর ধারে দীর্ঘে এক ক্রোশ পরিমিত স্থানে তখন শুধুই পোত-নির্ম্মাণের কার্য্য চলিত। টেভার্নিয়ার স্বচক্ষে এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সেই সকল পোত-সাহায্যে দেশ-বিদেশে বাণিজ্য চলিত। ঢাকায় তখন ওলন্দাজগণের ও ইংরেজগণের বাণিজ্য-

কুঠি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সময়ে নবাব সায়েস্তা খাঁ মগ-দিগের সহিত যুদ্ধে বড়ই বিব্রত ছিলেন। * টেভার্নিয়ারের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে 'বাঙ্গালা' বলিয়া কোন বন্দরের অস্তিত্ব অনুভূত হয় না। তিনি বাঙ্গালা দেশের রাজধানী বলিয়াই ঢাকা-সহরকে পরিচিত করিয়া গিয়াছেন। পূর্ববঙ্গে আরও অনেক প্রাচীন বাণিজ্য-স্থান ছিল। কিন্তু তৎ-সমুদায়ের স্মৃতি এখন ম্লান হইয়া পড়িয়াছে।

বঙ্গের আর আর বাণিজ্য-স্থানের মধ্যে প্রাচীন গৌড় ও লক্ষ্মণাবতী সমধিক প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন। গৌড় যে কতকালের প্রাচীন জনপদ, কতকালের প্রাচীন রাজধানী, তাহা নির্ণয় করা যায় না। পৌরাণিক ইতিবৃত্তের বিষয় এখানে উল্লেখ করার আবশ্যক বোধ করি না। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিকগণ এই গৌড় রাজধানীর প্রাচীনত্ব-বিষয়ে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই খৃষ্ট জন্মের সাত শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে গৌড় যে বাঙ্গালার রাজধানী ছিল—প্রতিপন্ন হয়। মেজর রেনেল, হিন্দু-স্থানের মানচিত্র-প্রকাশে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রথম যশস্বী হন। তাঁহার সেই মানচিত্র-সংশ্লিষ্ট মন্তব্যে গৌড়-সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে;—'গৌড় বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী। উহা লক্ষ্মণাবতী নামেও পরিচিত হয়। টলেমি গৌড়কেই 'গেঙ্গিয়া রেজিয়া' (Gengia regia) নামে অভিহিত করিয়াছেন—অনুমান হয়। এই নগর গঙ্গার পূর্ব্বতীরে রাজমহলের প্রায় পঁচিশ মাইল নিম্নে (দক্ষিণে) অবস্থিত। খৃষ্ট জন্মের ৭৩০ বৎসর পূর্ব্বে এই গৌড় নগর বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। হুমায়ুন বাদশাহ এই নগরের জীর্ণসংস্কার করিয়া ইহাকে নূতন সৌন্দর্য্যে ভূষিত করেন। তৎকর্ত্তৃক এই নগর 'জেন্নুতিয়াবাদ' নামে পরিচিত হয়। এই নগর যে 'সরকার' বা বিভাগ ভুক্ত ছিল, তাহার কতকাংশ অদ্যাপি 'জেন্নুতিয়াবাদ' নামে পরিচিত হইয়া থাকে। ফেরিস্তা বলেন,— এই নগরের জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় এই নগর অল্পদিন পরেই পরিত্যক্ত হইয়াছিল। তখন গঙ্গার কয়েক মাইল উজানে 'তাণ্ডা' বা 'তাঁড়া' নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। গঙ্গাতীর হইতে প্রাচীন গৌড়ের কোন অংশই এখন সাড়ে চারি মাইলের কম দূরবর্ত্তী নহে। কোনও কোনও অংশ—পূর্ব্বে যাহা গঙ্গার স্রোতে নিত্য-বিধৌত হইত—এক্ষণে বার মাইল দূরবর্ত্তী হইয়াছে। তবে গঙ্গার সহিত সংস্রবযুক্ত যে একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী এক্ষণে গৌড়ের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, বর্ষাকালে তদ্দ্বারা নৌকা চলাচল করে। গৌড়ের সীমানার পূর্ব্ব পার্শ্বে, কোন কোন স্থানে, দুই মাইলের মধ্যে মহানন্দা নদী প্রবাহিত। এই নদী গঙ্গার সহিত সংযুক্ত এবং ইহাতে বার মাস নৌকা-চলাচল করে। বিশেষ বিবেচনা করিয়া পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিলেও, গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের দৈর্ঘ্য (গঙ্গার পুরাতন তটে প্রসারিত) পনের মাইলের কম ছিল না; প্রস্থ দুই তিন মাইল ছিল। কতকগুলি পল্লী এখনও গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে বিদ্যমান আছে; অবশিষ্ট সমস্তই গভীর অরণ্যে পরিণত হইয়াছে, ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদের আবাসভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোনও কোনও অংশ বা ইষ্টক-চূর্ণ মৃত্তিকা-পূর্ণ কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। ধ্বংসাবশেষ মধ্যে বহুকারুকার্য্য-সমন্বিত

গৌড় ও লক্ষ্মণাবতী।

* *Vide* Tevernier's *Travels in India* (Bangabasi edition) Book 1, Chap. viii.

কৃষ্ণমর্ম্মরপ্রস্তর-নির্ম্মিত একটী মসজিদ এবং প্রাচীন দুর্গের দুইটী বিশাল অত্যুচ্চ সিংহদ্বার দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। এই কয়টী এবং আরও কয়েকটি ইমারত যে এত-কাল বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ—নির্ম্মাণোপকরণসমূহের গুণ। ঐ সকল উপকরণ সচরাচর বাজারে বিক্রীত হয় না এবং সাধারণ ইষ্টক-নির্ম্মিত ইমারতের ন্যায় সহজে ভাঙ্গিয়া ফেলাও যায় না। যাহা হউক, গৌড়ের ভগ্নাবশেষ সামান্য সামান্য ইষ্টকালয়গুলিকে ভাঙ্গিয়া এখন বাজারে বিক্রয় করা হইতেছে এবং মালদহ মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে অট্টালিকাদি নির্ম্মাণের জন্য চালান যাইতেছে। আমি এ পর্য্যন্ত যত প্রকার ইষ্টক দেখিয়াছি, তন্মধ্যে গৌড়ের ইষ্টকগুলি সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়গঠিত। বহু যুগ হইতে উহার প্রান্তভাগের সূক্ষ্মতা ও গাত্রের মসৃণতা কি সুন্দরভাবে অব্যাহত রহিয়াছে! বঙ্গ ও বিহার উভয় প্রদেশের সম্মিলিত রাজ্যের অতি উপযোগী স্থান দেখিয়াই গৌড় নগরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। উভয় প্রদেশের বহুজনাকীর্ণ অংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, ঐ নগর তৎ-কেন্দ্র-গত স্থান ছিল বলিয়াই উপলব্ধি হয়। বঙ্গ ও বিহারের অধিকাংশ স্থানে নৌ-যানে গমনাগমন সুবিধাজনক। প্রধান প্রধান নদীর সঙ্গম-স্থলে গৌড় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত থাকায় সর্ব্বত্রই গতিবিধির সুবিধা ছিল। যেদিক হইতে বঙ্গদেশ আক্রমণের আশঙ্কা, গঙ্গা ও অপরাপর স্রোতস্বতী সে সকল দিকে যেন রক্ষা করিয়া বিরাজমান ছিল।' * ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মেজর রেনেল গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া তাহার এই বর্ণনা লিখিয়া গিয়াছেন। এই বর্ণনায়, গৌড়ের প্রাচীনত্ব, প্রভাব-প্রতিপত্তি, বাণিজ্য-সমৃদ্ধি সকল পরিচয়ই প্রাপ্ত হই। নদীতীরে দৈর্ঘ্যে পনের মাইল বিস্তৃত সহরের বাণিজ্য-প্রভাব স্বতঃই উপলব্ধি হয় না কি? রেনেল নদীর একধারে সহর ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব সার্ভেয়ার-জেনারেল কর্ণেল কোলব্রুক এবং মিষ্টার উইলফোর্ড বলেন,—'গৌড় নগরের মধ্য দিয়াই পূর্ব্বে গঙ্গা প্রবাহিতা ছিলেন। 'তবকাত-নশেরী' গ্রন্থের রচয়িতা মেন্‌হাজউদ্দিন ১২৪৩-১২৪৪ খৃষ্টাব্দে গৌড় নগরে বসিয়া যে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহাতেও এই বিবরণ অবগত হওয়া যায়।' † হিন্দু-রাজত্ব-কালে গৌড়ের বাণিজ্য-বিভব কিরূপ বিস্তৃত ছিল, সে পরিচয় এ দেশের ইতিহাসে মিলিতে না পারে; কিন্তু প্রাচ্যে চীনে ও পাশ্চাত্যে নানাস্থানে সে পরিচয় আজিও ম্লানভাবে বিদ্যমান আছে। ‡ মুসলমানগণের প্রাদুর্ভাব-কালে গৌড়ের বাণিজ্য একদিকে তুরস্কে, অন্য দিকে চীনদেশে যে বিশেষভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উজ্জ্বল নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। ১২০২ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণ গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া প্রচার। ১২১২ হইতে ১২২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত 'গয়েস উদ্দিন ইয়াজ লক্ষ্মণাবতী রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বোগদাদের কালিফের সহিত তিনি সম্বন্ধ-সংশ্রব রাখিয়াছিলেন। তখন গৌড় রাজধানী হইতে গঙ্গার মোহানা দিয়া সমুদ্র-পথে বসোরা বন্দরে পণ্যবাহী পোত

---

* Major Rennell's *Memoir of a Map of Hindoostan.*

† *Vide* Stewart's History of Bengal, Sec. III. and Asiatic Researches, Vol. VII.

‡ বঙ্গের উপনিবেশ প্রভৃতির প্রসঙ্গে এতদ্বিবরণ দ্রষ্টব্য।

গতিবিধি করিত। ১২২৩ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণাবতী নগরে যে মুদ্রা প্রস্তুত হয়, কালিফের রাজধানীতে সেই মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাণিজ্য-সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকায় সুলতান গয়েস উদ্দিনের মুদ্রা বসোরায় গিয়াছিল।* গৌড় হইতে বোগদাদ ও বসোরা সহরে এই বাণিজ্যের বিষয় 'রিয়াজুস্-সালাতিন' গ্রন্থের ভূমিকায় মৌলবী আব্দাস সালাম বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় মুসলমান নৃপতিগণের নিকট হইতে বাণিজ্য-সৌকর্য্যের জন্য চীনদেশে নানাসময়ে রাজদূত প্রেরিত হয়। গৌড় রাজধানী হইতেও সে সময় চীনে বাণিজ্য-পোত গমনাগমন করিয়াছিল। চীনদেশের ইতিহাসে বঙ্গের তৎকালিক কয়েকজন নৃপতির নাম 'ঐ-য়া-সে-টিঙ,' 'গৈ-য়া-সু-টিঙ', 'সৈ-ফে-টিঙ' ইত্যাদি রূপে লিখিত আছে। তাহা হইতে গয়েসউদ্দিন, সৈয়ফউদ্দিন প্রভৃতি বঙ্গের শাসনকর্ত্তাদিগের সময়ে চীনের সহিত বঙ্গের বা গৌড়ের বাণিজ্য-সম্বন্ধের বিষয় অনেকে সিদ্ধান্ত করেন। চীনাদিগের ভাষায় ঐ শাসনকর্ত্তাদিগকে 'পাঙ্কোলার রাজা' ইত্যাকার পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। 'পাঙ্কোলার রাজা' বলিতে বাঙ্গালার রাজাকেই বুঝাইয়া থাকে। ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণাবতী হইতে পাণ্ডুয়ায় (মালদহের সন্নিকটে) রাজধানী স্থানান্তরিত হয়।

পাণ্ডুয়া।

সুলতান জালাল উদ্দিনের শাসন-সময়ে (১৩৯২ খৃষ্টাব্দে হইতে ১৪০৯ খৃষ্টাব্দে) পাণ্ডুয়া হইতে রাজধানী পুনরায় গৌড়ে আসিয়াছিল। পাণ্ডুয়ায় যখন রাজধানী ছিল, সেই সময় চীনের সহিত পাণ্ডুয়ার বাণিজ্যের বিবরণ চীনদেশীয় গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাণ্ডুয়া রাজধানীর বিষয় চীনাভাষায় লিখিত 'ইউয়েন-চিয়েন-লে-হান' নামক 'এন্সাইক্লোপিডিয়া'-গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে;—'পান-টু-য়া নগরে বঙ্গের অধিপতি বাস করেন। চতুর্দ্দিক প্রাচীর-বেষ্টিত এই নগরী অতি বৃহৎ। এখানকার রাজপ্রাসাদ সুবিস্তৃত। পিত্তল-নির্ম্মিত স্তম্ভোপরি সেই প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত। স্তম্ভ-সমূহের গাত্রে পুষ্পস্তবক ও জীবজন্তুর প্রতিকৃতি খোদিত। দরবার-গৃহে উচ্চ মঞ্চোপরি নানাবিধ বহুমূল্য প্রস্তরখচিত সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। রাজা সেই সিংহাসনের উপর জানু গাড়িয়া উপবেশন করেন।' † ষোড়শ শতাব্দীর পর্ত্তুগীজ ঐতিহাসিকগণ তাৎকালিক ভ্রমণকারিগণের নিকট অবগত হইয়া গৌড়ের সমৃদ্ধির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ঐতিহাসিক সুজা (ম্যানুয়েল ডি ফেরিয়া ই সুজা) ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে গৌড়-সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন,—'গৌড় রাজধানী গঙ্গাতীরে প্রায় সাড়ে চারি ক্রোশ বিস্তৃত। এই নগরে বার লক্ষ গৃহস্থের বসতি। নগরটী সুরক্ষিত। নগরের সরল সুবিস্তৃত রাজপথে পথিককে ছায়াদানের জন্য শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষ-সমূহ রোপিত আছে। পথে সময়ে সময়ে এতই জনতা বৃদ্ধি পায় যে, মানুষের চাপে মানুষ মরিয়া যায়।' ব্যারোজ (জোয়া ডি ব্যারোজ) নামক অন্য একজন ঐতিহাসিক তৎপ্রণীত 'ডা-এসিয়া' নামক গ্রন্থে গৌড়ের ঐরূপ বিবরণই লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার

* ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের, 'এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে' বঙ্গদেশের প্রাথমিক মুদ্রা সংক্রান্ত প্রবন্ধে মিষ্টার টমাস্ এই বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন।—Vide *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, 1873—*The Initial Coinage of Bengal* by Mr. E. Thomas, F.R.S.

† Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1909.

বর্ণনায় প্রকাশ,—'গৌড়ের রাজপথে এতই লোক-সমাগম হয় যে, সে জনসঙ্ঘ ভেদ করিয়া অগ্রসর হওয়া যায় না। নগরের অধিকাংশ বাসভবন জাঁকজমকপূর্ণ এবং সুদৃঢ়।' * ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে তান্দা (তাঁড়া) নগরে রাজধানী পরিবর্ত্তিত হয়। সোলিমান সা গৌড় হইতে ঐ নগরে রাজধানী উঠাইয়া আনেন। ইংলণ্ডের বণিক রালফ ফীচ, এই নগরে বাণিজ্যের প্রাধান্য দেখিয়াছিলেন। এই নগর হইতে কার্পাস ও কার্পাস-বস্ত্র প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হইত। ফীচ যখন তান্দা হইতে গৌড়ের পথে দক্ষিণ বঙ্গের অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হন, তখনই গৌড় ধ্বংস-প্রায়। ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে গৌড় সম্বন্ধে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—'আমরা যখন গৌড়ের পথে অগ্রসর হই, তখন কয়েকখানি ক্ষুদ্র গ্রাম এবং ভীষণ জঙ্গল মাত্র দেখিতে পাইয়াছিলাম। মধ্যে মধ্যে মহিষ, শূকর ও হরিণ দেখিতে পাই। ঘাসগুলা মানুষের অপেক্ষা বড় বড় হইয়াছিল। অনেক ব্যাঘ্রকেও ঐ স্থানে বিচরণ করিতে দেখিয়াছিলাম।' গৌড়ের এই শোচনীয় অবস্থার দিনে যে তান্দা-নগর কিছুদিনের জন্য বাঙ্গালার রাজধানী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার চিহ্ন এখন অতি কষ্ট করিয়া অনুসন্ধান করিতে হয়। মেজর রেনেল বলেন,—'তাণ্ডা, তাঁড়া বা তাড়া রাজমহল যাইবার পথে গৌড়ের অতি নিকটেই অবস্থিত ছিল। ঐ নগরের প্রাচীন দুর্গের প্রাচীর ভিন্ন এখন আর কোনও চিহ্নই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কোন্ সময় এই নগর পরিত্যক্ত হয়, তাহাও জানিবার উপায় নাই।' মিষ্টার উইলফোর্ড আবার তান্দার অনুরূপ স্থান নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার মতে, গৌড়ের পরপারে বাগমতী নদীর ধারে ঐ নগর বিদ্যমান ছিল। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে 'খোয়াসপুর তোণ্ডা' বিভাগের পরিচয় পাওয়া যায়। কেহ কেহ উহাকেই তান্দা নগরের অংশ বলিয়া মনে করেন। † গৌড়ের বাণিজ্য-প্রভাব হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া আসিলে, মালদহ (পুরাতন মালদহ) বাণিজ্যের কেন্দ্র-স্থল হইয়া দাঁড়ায়। এই নগর মহানন্দা এবং কালিন্দীর সঙ্গম-স্থলে অবস্থিত ছিল। নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায়, গৌড়ের রাজধানী পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, গৌড় ও পাণ্ডুয়ার মধ্যবর্ত্তী মালদহ ব্যবসা-বাণিজ্যে শ্রী-সম্পন্ন হয়। এই নগর তখন তোরণ-দ্বার দ্বারা সুরক্ষিত ছিল; এবং মূল্যবান পণ্যদ্রব্যাদির সুরক্ষার উদ্দেশ্যে এই নগরের অভ্যন্তরে উচ্চপ্রাচীর-বিশিষ্ট 'কাট্রা' বা পান্থশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পুরাতন মালদহ কেবল যে এই সময়েই বাণিজ্য-স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা নহে। প্রাচীনকাল হইতে এই স্থান রেশমের এবং তুলার বস্ত্রের ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। সার উইলিয়াম হাণ্টার তৎপ্রণীত 'ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল য়্যাকাউণ্ট অব বেঙ্গল' গ্রন্থে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন মালদহের প্রাচীন বাণিজ্য-বিষয়ে একটী কৌতুকাবহ ঘটনার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন,—'লিখিত আছে, প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে সেখ ভিক্ নামক জনৈক বণিক 'কাতার' 'মুসরি' প্রভৃতি

তাণ্ডা (তাঁড়া)।

পুরাতন মালদহ।

---

* পর্ত্তুগীজ ঐতিহাসিকগণের এই সকল বিবরণ নিম্নলিখিত পুস্তকে দ্রষ্টব্য;—(1) Green's Collection of Voyages and Travels, vol. 1., (2) Portuguese Asia by Manuel de Fariay Sousa translated by John Stevens, (3) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1909.

† Rennell's *Memoir of a Map of Hindoostan*, and *Asiatic Researches* Vol. V.

মালদহজাত বস্ত্রের বাণিজ্য করিতেন। ঐ সময়ে তিনি রেশমী বস্ত্রপূর্ণ তিনখানি অর্ণব-পোত লইয়া রুষিয়ার বাণিজ্য করিতে যান। পারস্যোপসাগরের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে তাঁহার দুইখানি পোত জলমগ্ন হইয়াছিল।' * এই ঘটনার উল্লেখে, ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে, মালদহের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। নবাব সায়েস্তা খাঁর শাসনকালে (১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে) পাটনা, মালদহ,ঢাকা,কাশীমবাজার প্রভৃতি স্থানে ইংরেজদের বাণিজ্য-কুঠী প্রতিষ্ঠিত ছিল। সায়েস্তা খাঁ সে সকল কুঠী অধিকার করিয়া লইতে ও ইংরেজদিগকে বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত করিতে চেষ্টান্বিত হন। ফলতঃ প্রাচীনকাল হইতে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত গৌড় বা তাহার পারিপার্শ্বিক স্থান-সমূহ কোন-না-কোনরূপে বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠান্বিত ছিল। চিরদিনই গৌড় বলিতে সমগ্র বঙ্গদেশকে বুঝাইয়া আসিয়াছে। রাজধানী-রূপে গৌড়ের বাণিজ্যের প্রভাব দেখি; কখনও বা বঙ্গদেশের বিভিন্ন অংশে বাণিজ্যের প্রভাব দেখিয়া গৌড়ের বাণিজ্য বলিয়া উল্লেখ করি। গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী যখন হিন্দু-নৃপতিগণের রাজধানী ছিল, মুসলমানগণ যখন এদেশে আসেন নাই, তখনকার বাণিজ্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে হইলে, হিন্দুবণিকগণের প্রাধান্যের বিষয়ই মনে হয়। গৌড় প্রভৃতি যখন মুসলমানগণের রাজধানীতে পরিণত, তখন হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বণিকগণেরই প্রাধান্য দেখি। প্রাচীন কবিদিগের কাব্য-গ্রন্থে বাঙ্গালী বণিকগণের গৌড়ে বাণিজ্যের বিষয় নানাস্থানে উল্লেখ আছে। কবিকঙ্কণ-বিরচিত চণ্ডী-কাব্যে ধনপতি সদাগরের ও তাঁহার পুত্র শ্রীমন্তের গৌড় রাজধানীতে বাণিজ্যের বিষয় অবগত হওয়া যায়। কুশাই নামক গৌড়ের জনৈক শিল্পীর নিকট হইতে চাদ সদাগর কতকগুলি বাণিজ্য-তরী প্রস্তুত করাইয়া লইয়াছিলেন। ধনপতি সদাগরের বাণিজ্যের বিষয় স্থানীয় কিম্বদন্তিতেও প্রচারিত আছে। গৌড়ের সহিত নবদ্বীপের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। গৌড় হইতে নবদ্বীপে রাজধানী আসিয়াছিল, আবার নবদ্বীপ হইতে গৌড়ে রাজধানী গিয়াছিল। যে নগর যখন রাজধানী হয়, তাহার বাণিজ্য আপনা-আপনি বৃদ্ধি পায়। নবদ্বীপ কতকালের নগর, নবদ্বীপের উৎপত্তির মূলতত্ত্ব নির্দ্ধারণ করা যায় না। প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণের কাব্যে নবদ্বীপের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে নয়টী দ্বীপের সমবায়ে নবদ্বীপ নাম সূচিত হইয়াছিল বলিয়া বুঝিতে পারি। আবার নবদ্বীপের চারিদিকে গঙ্গা প্রবহমানা ছিল বলিয়া উহার নাম নবদ্বীপ হইয়াছিল—এ প্রমাণও পাওয়া যায়। যে নয়টী দ্বীপের সমবায়ে নবদ্বীপ নামের পরিকল্পনা, সেই নয়টী দ্বীপের নাম—অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, রুদ্রদ্বীপ। শ্রীচৈতন্যদেবের সম-সাময়িক ও তাঁহার অন্তরঙ্গ-স্থানীয় ঠাকুর নরহরি সরকার তদীয় 'ভক্তি-রত্নাকর' গ্রন্থে নবদ্বীপ ও তাহার পারিপার্শ্বিক স্থান-সমূহের মাহাত্ম্য-তত্ত্ব এইরূপ ভাবে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন;—

নবদ্বীপ।

"নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর। যথা জন্ম হৈল কৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর॥

---

* *Vide* Sir W. W. Hunter's *Statical Account of Bengal* Vol. I

মায়াপুর করিয়া দর্শন। ক্রমেতে ভ্রমহ যাতে ভ্রমে বিজ্ঞগণ॥
প্রথমে দেখহ আতোপুর। অন্তর্দ্বীপ নাম যার মহিমা প্রচুর॥
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন তথা। কহিল ব্রহ্মার প্রতি অন্তরের কথা॥
এই হেতু অন্তর্দ্বীপ নাম। বিস্তারিব সে সব প্রসঙ্গ ভাগ্যবান॥
সুবর্ণবিহার ওই হয়। কহিব পশ্চাৎ হেথা যৈছে বিলশয়॥
সিমলিয়া গ্রাম তার পরে। শ্রীসীমন্তদ্বীপ পূর্ব্বে কহে যাহারে॥
তথা প্রভুপদে করি নতি। করিলা ধারণ ধূলা সীমন্তে পার্ব্বতী॥
শ্রীসীমন্তদ্বীপ নাম ঐছে। বিস্তারি কহিব পার্ব্বতীরে কৃপা যৈছে॥
গাদিগাছা গ্রাম এবে কয়। গোদ্রুমদ্বীপাখ্যা পূর্ব্বে সুখের আলয়॥
শ্রীসুরভি রহি বৃক্ষতলে। করিল প্রভুরে স্তুতি ভাসি নেত্রজলে॥
এ হেতু গোদ্রুমদ্বীপ কয়। বর্ণিব বিশেষ করি শুন মহাশয়॥
শ্রীমাজিদা গ্রাম নাম এবে। পূর্ব্বে মধ্যদ্বীপ নাম কহে ঋষি সভে॥
ঋষি প্রতি করি দৃষ্টিপাত। মধ্যাহ্নকালেতে প্রভু হইলা সাক্ষাৎ॥
ঐছে মধ্যদ্বীপ নাম তার। ঋষি প্রতি যৈছে কৃপা হইল বিস্তার॥
বামণ-পোখৈরা পুণ্য গ্রাম। ব্রাহ্মণপুষ্কর এ বিদিত পূর্ব্বনাম॥
ব্রাহ্মণের জানি মনঃকথা। আইলেন আনন্দে পুষ্করতীর্থ তথা॥
এ প্রসঙ্গ অতি সুমধুর। পুষ্করের দ্বারে কৃপা হইল প্রভুর॥
তদুপরি হাটডাঙ্গা গ্রাম। সর্ব্বত্র বিদিত উচ্চ হট্ট পূর্ব্বনাম॥
ইন্দ্রাদি দেবতা উচ্চ স্থানে। বসাইলা হট্ট প্রভু চরিত্র কথনে॥
উচ্চ হট্ট নাম এ প্রকারে। সে সব প্রসঙ্গ ব্যক্ত হবে কারু দ্বারে॥
কুলিয়া পাহাড়পুর গ্রাম। পূর্ব্বে কোলদ্বীপ পর্ব্বতাখ্যানন্দধাম॥
প্রভু প্রিয় ভক্ত কোলদ্বীপে। পর্ব্বতের প্রায় দেখা দিলা কোলরূপে॥
কোলদ্বীপ নাম এই মতে। অত্যন্ত মধুর কথা আছয়ে ইহাতে॥
সমুদ্রগড়ি গ্রাম প্রচার। শ্রীসমুদ্রগতি নাম পূর্ব্বেতে ইহার॥
সমুদ্র প্রভুর সন্দর্শনে। গঙ্গাশ্রয় করিয়া আইসে হর্ষ মনে॥
ইথে অতি কৌতুক প্রচার। বর্ণিলেন পরম আনন্দে গ্রন্থকার॥
চাঁপাহাটি গ্রাম অতি মনোরম। পূর্ব্বে নাম চম্পাহট্ট খ্যাতি নিরূপম॥
কিনিয়া চম্পকপুষ্প রঙ্গে। বিষ্ণু পূজে বিপ্র ভাসি প্রেমের তরঙ্গে॥
রাতুপুর গ্রাম মুখ্য হয়। ঋতুদ্বীপ নাম পূর্ব্বে কেবা না জানয়॥
বসন্তাদি ঋতু সেনাবেশে। বাঢ়ায় প্রভুর সুখ অশেষ বিশেষে॥
শ্রীবিদ্যানগর পুণ্যস্থান। বৃহস্পতি আদি যথা কৈলা বিদ্যাদান॥
বিদ্যার প্রভাব নানামতে। অবিদ্যা ঘুচায় সে গ্রামের দর্শনেতে॥
তদুপরি গ্রাম জান্নগর। পূর্ব্বে জহ্নুদ্বীপ নাম কহে বিজ্ঞবর॥
তথা তপ কৈল জহ্নু মুনি। হইলা সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্য চিন্তামণি॥

জহ্নুদ্বীপ অতি রম্য স্থান। যে করে দর্শন সে পরম পুণ্যবান॥
মাউগাছি গ্রাম কেনা জানে। মোদদ্রুমদ্বীপ পূর্ব্বে কহয়ে ইহানে॥
রামচন্দ্র বনবাস কালে। পাইলা পরম মোদ বসি বৃক্ষতলে॥
পূর্ব্বে ছিল রামবট স্থান। কলিতে হইল লোপ জানে ভাগ্যবান॥
জানকী লক্ষ্মণ সহ রাম। যৈছে মোদ পাইলা সে প্রসঙ্গ অনুপাম॥
তদুপরি শ্রীবৈকুণ্ঠপুর। যে গ্রাম দর্শনে সুখ বাঢ়য়ে প্রচুর॥
প্রভু নারায়ণ মহারঙ্গে। দিলেন দর্শন প্রিয় ভক্তে লক্ষ্মী সঙ্গে॥
নারায়ণ পীঠস্থান ছিল। প্রভুর ইচ্ছায় তাহা সঙ্গোপন হৈল॥
তথাতে কৌতুক অতিশয়। বর্ণিবেন কেহ এ প্রসঙ্গ প্রেমময়॥
এবে মাতাপুর কহে লোক। পূর্ব্বে মহৎপুর নাম নাশে দুঃখ শোক॥
মহৎ শ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির। বনবাসে আসি তথা হইলেন স্থির॥
মহৎ পুর মধ্যে রম্য স্থান। পঞ্চবট ছিলা হৈলা অন্তর্দ্ধান॥
দ্রৌপদী সহিত পঞ্চ ভাই। পাইলা পরমানন্দ রহিয়া তথাই॥
মহৎপুর প্রসঙ্গ মধুর। বিস্তারিব যারে কৃপা হইব প্রভুর॥
গঙ্গা পূর্ব্বধারে রাহুপুর। রুদ্রদ্বীপ নাম পূর্ব্বে মহিমা প্রচুর॥
যথা রুদ্র নিজ গণসনে। করিলা নর্ত্তন মহাপ্রভুর কীর্ত্তনে॥
রুদ্রদ্বীপে কৌতুক অপার। কেহ বর্ণিবেন ইহা করিয়া বিস্তার॥
তার পর আছে পণ্য গ্রাম। বেলপোখৈরা পূর্ব্বেতে বিল্বপক্ষ নাম॥
একপক্ষ পূজি বিল্বদলে। প্রভুপ্রিয় হৈলা বিপ্র শিবকৃপাবলে॥
তৈছে কৈল শিবের অর্চ্চন। যৈছে প্রভুপ্রিয় হৈল হইব বর্ণন॥
শ্রীভারুইডাঙ্গা নাম গ্রাম। ভরদ্বাজ মুনি তথা করিলা বিশ্রাম॥
এ প্রসঙ্গ অতি রসায়ন। প্রভু কৃপাবলে কেহ করিব বর্ণন॥
সুবর্ণবিহার নাম যার। তথা গৌরাঙ্গের অতি অদ্ভুত বিহার॥
গৌরচন্দ্রে দেখি সভে কয়। সুবর্ণপ্রতিমা কি কীর্ত্তন বিহরয়॥
সুবর্ণবিহার নাম ঐছে। কেহো বিস্তারিব প্রভু বিহরহে যৈছে॥
নবদ্বীপ মধ্যে স্থান যত। এক মুখে তাহা বা কহিবে কেবা কত॥
তার মধ্যে কহি যে প্রধান। চিনাডাঙ্গা পাটডাঙ্গা আদি রম্যস্থান॥
যৈছে গৌর কৃষ্ণে নাহি ভেদ। তৈছে নবদ্বীপ বৃন্দাবন কহে বেদ॥"

নরহরি সরকার শ্রীচৈতন্যদেবের অপেক্ষা আট নয় বৎসরের বড় ছিলেন। ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে (১৪০০ শকে) তাঁহার জন্ম হয় বলিয়া প্রকাশ আছে। ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, প্রায় সাড়ে চারি শত বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপের পারিপার্শ্বিক ঐ সকল স্থানের প্রাচীন মাহাত্ম্যের কথা এদেশে প্রচারিত ছিল। শ্রীরামচন্দ্র এই বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন, যুধিষ্ঠিরাদির এই বঙ্গদেশে আগমন ঘটিয়াছিল, জহ্নু মুনির আশ্রম এই বঙ্গদেশেই ছিল, আর এই সকল পুণ্যপূত স্থানের মধ্যক্ষেত্রেই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। পবিত্র

স্থানেই পতিতপাবন আবির্ভূত হন। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সময়ে, নরহরি সরকারের বর্ণনাক্রমে, পারিপার্শ্বিক নয়টী বিশিষ্ট স্থানের সমবায়ে নবদ্বীপ সংগঠিত হওয়ার পরিচয় পাইলেও, নবদ্বীপ বলিয়া তখন যে স্বতন্ত্র এক নগর ছিল, তাহাও উপলব্ধি হয়। নবদ্বীপ—ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সেন-বংশের রাজধানী। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে, রাজচক্রবর্ত্তী লক্ষ্মণ-সেন নবদ্বীপ রাজধানীতেই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার পিতা বল্লালসেনের স্মৃতি-চিহ্নের ভগ্নাবশেষ 'বল্লালদীঘি' প্রভৃতি আজিও সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। রাজধানী পরিবর্ত্তিত হওয়ায় এবং গঙ্গার গতির পরিবর্ত্তন ঘটায়, প্রাচীন স্থান-সকল চিহ্নিত হওয়া দুর্ঘট হইয়া পড়িয়াছে বটে; কিন্তু, শ্রীচৈতন্যদেবের বিদ্যমান-সময়ে নবদ্বীপ যে সর্ব্বরূপে সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ছিল, ঐ নগর যে বাণিজ্যের কেন্দ্র-স্থান মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল, বৈষ্ণব কবিগণের বিবরণ হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। জলঙ্গীর এবং ভাগীরথীর সঙ্গম-স্থলে অবস্থিত থাকায়, নবদ্বীপে পূর্ব্ববঙ্গের ও পশ্চিম-বঙ্গের উভয় বঙ্গের বাণিজ্য বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তখন, উত্তরে হিমালয়-শিখরে—কাশ্মীরে ও ভোট-রাজ্যে—নবদ্বীপের বাণিজ্য বিস্তৃত ছিল; আবার দক্ষিণে কাঞ্চি-দেশের সহিত নবদ্বীপের বাণিজ্য চলিত; মধ্য-ভারতে বারাণসী-ধামে, ত্রিহুতে ও পাটলিপুত্র-নগরে, গৌড়ে ও উড়িষ্যায়, নবদ্বীপের বাণিজ্য বিস্তৃত হইয়া ছিল। কবি জয়ানন্দ, তৎপ্রণীত 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থে, নবদ্বীপের বিক্রেয় দ্রব্যের উল্লেখে উপসংহারে লিখিয়াছেন;—

"লেখিতে না পারি যত দাস-দাসী প্রেমের মন্দিরে খাটে।
যে দ্রব্য সব ভুবন-দুর্লভ বিকায় নদীয়ার হাটে॥"

কোথাকার কোন্ দ্রব্য নবদ্বীপের হাটে বিক্রীত হইত, কবি জয়ানন্দের বর্ণনায় তাহার একটু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে; অনুধাবন করিয়া দেখুন;—

"ডাবর বাটা গুবাক্ সংপুট দর্পণ রসবাটিকা।
তাম্রহাণ্ডি রসপিত্তলকলস 'বারাণসীর' ত্রিপদিকা॥
শঙ্খ বাটাবাটী সর্ব্বাঙ্গ থাল রসময় রসথুরি।
'তিরোহুত' গাড়ু তাম্রমুখারমণ্ডল শীতল পিত্তল ঝারি।
পাষাণভাজন অতি সুগঠন খড়িকা রঙ্গি কাপড়া।
'উড়িয়া' 'গৌড়িয়া' চিরনী বিচিত্র সাঁপুড়া॥
টাড় গাঠ্যা কড়ি হিরণ্য মাদুলী কেয়ূর কঙ্কণ রত্ন নূপুরে।
হেমকিয়া পাতা বিদ্রুম মুকুতা 'কাশ্মীরদেশের' খুরে॥
তবক সুর পানবাটা 'কাঞ্চিদেশের' বিচিত্র বেলি।
'পাটনেত' ভোট সকলাত কম্বল শ্রীরামখানি জমকা।
'ভোভোট্টদেশের' ইন্দ্রনীলমণি লক্ষ্মীবিলাস তারকা॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীমৎ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর নবদ্বীপের যে পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও নবদ্বীপের সম্যক সমৃদ্ধির বিষয় অবগত হই। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের তিন চারি বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করেন। মহাপ্রভুর

লোকান্তর গ্রহণের সময় তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসরের অধিক হয় নাই। নবদ্বীপের পশ্চিমাংশে ক্রোশাধিক ব্যবধানে মাউগাছি-গ্রাম তাঁহার জন্মস্থান। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর নবদ্বীপের মাহাত্ম্যের ও গৌরবের বিষয় এইরূপ ভাবে লিখিয়া গিয়াছেন ;—

"নবদ্বীপের সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে। একেক ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোক স্নান করে॥
বিবিধ বয়সে এক জাতি লক্ষ লক্ষ। সরস্বতী প্রসাদে সভে মহাদক্ষ॥
সভে মহা অধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে। বালকেহো ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষ্যা করে॥
নানাদেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়। নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥
রমা-দৃষ্টিপাতে সর্ব্বলোক সুখে বসে। ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে॥"

কেবল নবদ্বীপ নহে ;—নবদ্বীপ যখন রাজধানী ছিল, নবদ্বীপের পারিপার্শ্বিক স্থান-সমূহ অধিকাংশই তখন সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। নবদ্বীপ হইতে—নবদ্বীপ হইতেই বা বলি কেন—সপ্তগ্রাম হইতে গৌড় পর্য্যন্ত গঙ্গাতীরবর্ত্তী নগর-গ্রাম-সমূহ বাণিজ্য-বিভবে বিদ্যার গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। গঙ্গাতীরবর্ত্তী প্রাচীন গ্রাম-সমূহের ধ্বংসাবশেষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আজিও সে নিদর্শন কিছু-না-কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়। শান্তিপুর, কাল্না, সমুদ্রগড়, পূর্ব্বস্থলী, দাঁইহাট, কাটোয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতির সহিত কত প্রাচীন স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে। ঐ সকল স্থানের ও উহাদের নিকটবর্ত্তী বহু গ্রামের প্রাচীন অট্টালিকা-সমূহের বহু ভগ্নস্তূপ প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি করিলে, কত পুরাতন কথাই মনে পড়ে! বর্দ্ধমান-জেলায় পূর্ব্বস্থলী থানার পশ্চিমাংশে অনতিদুরে চন্দ্রকেতু রাজার রাজধানীর ভগ্নাবশেষ চিহ্নিত হইয়া থাকে। ঐ অঞ্চলের লোকেরা মৃত্তিকাদি খননের সময় 'চন্দ্রকেতু' রাজার মুদ্রা পাইয়াছিল বলিয়াও জানা যায়। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই চন্দ্রকেতু রাজাই গ্রীকদিগের নিকট 'সান্দ্রোকোট্টাস্' (Sandrocottas) নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। 'চন্দ্রকেতু' হইতেই ঐরূপ উচ্চারণ সম্ভবপর। যাহা হউক, ঐ রাজধানী এখন মাত্র মৃত্তিকাস্তূপে পর্য্যবসিত। উহার বাণিজ্যাদিরও কোন চিহ্ন এখন অনুসন্ধানে পাওয়া যায় না। বাঙ্গালাব প্রাচীন কবিগণের গ্রন্থে বাঙ্গালার বহু প্রাচীন বাণিজ্য-কেন্দ্রের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। তাহার কোনও কোনও স্থান এখনও নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কবিকঙ্কণের চণ্ডী-কাব্যে ধনপতি সদাগরের বাসস্থান উজানী (উজাবনি, উজয়ানি) নগর বলিয়া বর্ণিত আছে। সে নগর এককালে অতি সমৃদ্ধিশালী রাজধানী ছিল। রাজা বিক্রমকেশরী সেই নগরে রাজত্ব করিতেন। কবিকঙ্কণ-বিরচিত চণ্ডী-কাব্যে উজানি-নগরের ও রাজা বিক্রমকেশরীর মাহাত্ম্য-কথা কিরূপ পরিবর্ণিত আছে, নিম্নে পাঠ করিয়া দেখুন ;—

উজানী নগর।

"উজানী-নগর, অতি মনোহর, বিক্রমকেশরী রাজা।
করে শিবপূজা, উজানীর রাজা, কৃপাময়ী দশভুজা॥
যেন রঘুরাজা, তেন পালে প্রজা, কর্ণের সমান দাতা।
যুধিষ্ঠির বাণী, শুকদেব জ্ঞানী, প্রসন্না মঙ্গলা মাতা॥
মহা ধনুর্দ্ধর, দিব্য কলেবর, নারদ সমান গানে।

শুনে অবিরত,	পুরাণ ভারত,	দ্বিজে দেই হেমদানে ॥
উজানীর কথা,	গড় চারি ভিতা,	চৌদিকে বেউড় বাঁশ।
রাজার সামন্ত,	নাহি পায় অন্ত,	যদি ফিরে চারি মাস ॥
ভিতে বাস গাঢ়,	পাথরের গড়,	কাঙ্কর পুরট শোভা।
পাথরে খিচনী,	যেন দিনমণি,	চারিদিকে করে শোভা ॥
নগরের নারী,	ইন্দ্র বিদ্যাধরী,	ভূষণ-ভূষিত গা।
যতেক পুরুষ,	মনোহর বেশ,	পীড়য়ে বসন্ত বা ॥
বিক্রমকেশরী,	তাঁহার নগরী,	আছে কত সদাগর।
তাঁহার আদেশে,	ধনপতি বৈসে,	যারে সুখী নৃপবর ॥"

এই বর্ণনায় গড়-পরিখা-বেষ্টিত বিশাল রাজধানীর যে চিত্র দেখিতে পাই, সে নগর এখন কোথায়? চারি মাস পরিভ্রমণ করিলেও যে নগরের অন্ত মিলিত না, যে নগরে কত সদাগর বাণিজ্য-ব্যপদেশে সর্ব্বদা গতিবিধি করিত, সে নগর এখন কোথায়? কেবল এক কবিকঙ্কণে নহে,—ক্ষেমানন্দ কেতকাদাসের 'মনসার ভাসানে' উজানী-নগরের সমৃদ্ধির পরিচয় প্রাপ্ত হই; বংশীদাস-কৃত 'পদ্মাপুরাণে' উজানীর সমৃদ্ধির বিষয় পরিবর্ণিত আছে; বিজয়গুপ্তের 'মনসা-মঙ্গলে', নারায়ণদেবের 'পদ্মাপুরাণে', উজানীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। বাঙ্গালার বিভিন্ন সময়ের প্রসিদ্ধ কবিগণ যে নগবের সমৃদ্ধির বিষয় পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, সে নগর এখন কোথায়? এই উজানী-নগরের প্রসঙ্গে কত কথাই মনে আসে। যে বিক্রমকেশরী বিক্রমাদিত্যের নাম বিশ্ববিখ্যাত, তিনি উজ্জয়িনীর অধীশ্বর ছিলেন বলিয়া অভিহিত হন। এই উজানীর পূর্ব্ব-সমৃদ্ধির বিষয় স্মরণ করিলে, এই উজানীকেই উজ্জয়িনী বলিয়া মনে করিতে পারি না কি? পুঁথিতে উজয়নী পাঠও দৃষ্ট হয়। উজানী, উজয়নী, উজ্জয়িনী—অভিন্ন হওয়া সম্ভব নহে কি? কিন্তু যাউক সে কথা। এখন, উজানী কোথায় ছিল, সন্ধান করিয়া দেখুন দেখি! বর্দ্ধমান-জেলায় কাটোয়া-মহকুমায় উজানী-নগব অবস্থিত ছিল। এক্ষণে মঙ্গলকোট-থানার পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীসমূহ উজানীর ক্ষীণ স্মৃতি রক্ষা করিতেছে মাত্র। এখন উজান বলিলে বড় কেহ চিনিতে পারেন না; মঙ্গলকোটই এখন উজানীর স্থান অধিকার করিয়া আছে। মঙ্গল-কোটে উজানীর দুর্গ ছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। গৌড়ের সমৃদ্ধির দিনেও উজানীর কিছু কিছু গৌরব ছিল। ক্রমে মুসলমানগণের প্রাদুর্ভাবে উজানীর নাম পর্য্যন্ত লোপ পায়। 'চৈতন্যমঙ্গল'-রচয়িতা লোচনদাস এই উজানী-নগরে জন্মগ্রহণ করেন। উজানী—পীঠস্থান ও তীর্থ-ক্ষেত্র। উজানীতে দেবীর কনুই পড়িয়াছিল। উজানীর স্থান অধিকার করায় মঙ্গল-কোট এখন সেই তীর্থ-স্থানে পরিণত হইয়াছে। এই উজানীর বণিক ধনপতি সদাগরের প্রসঙ্গে বঙ্গের আরও বহু প্রাচীন বাণিজ্য-স্থানের পরিচয় পাই। ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে নানাস্থানের বণিকগণ আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সেই সকল স্থানের বিষয় আলোচনা করিলেও বাঙ্গালার বহু বাণিজ্য-কেন্দ্রের নিদর্শন পাই। কবিকঙ্কণ লিখিয়া-ছেন,—"বর্দ্ধমান হইতে বেণে আইসে ধুসদত্ত। ষোলশো বেণের মাঝে যাহার মহত্ব।"

এই কবিতা পংক্তিদ্বয়েই বর্দ্ধমানের বাণিজ্য-প্রভাব উপলব্ধি হয়। কবি লিখিয়াছেন,—"চম্পাই-নগরের বেনে চান্দ সদাগর। সঙ্গে লক্ষ্মী সদাগর চাপিয়া কুঞ্জর।" যে বণিক কুঞ্জর আরোহণে নিমন্ত্রণ রক্ষায় আগমন করেন, তিনি কত বড় বণিক—স্বতঃই বুঝিতে পারা যায়। প্রত্যেকের পরিচয় কত দিব? ভালুকী, মণ্ডলা, কর্জ্জনা, ফতেপুর বোরশূল, মানাব, দশ-ঘড়া, শেয়াখালা, লাড়ুগাঁ, পাঁচড়া, কারথি, সাঁকো, খাঁড়ঘোষ, ইছানী প্রভৃতি স্থান হইতে ষোল শত বণিক ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধ-উপলক্ষে সমবেত হইয়াছিলেন। কবিকঙ্কণের এই এক বর্ণনাতেই প্রাচীন বাঙ্গালার বাণিজ্য-সম্পদ উপলব্ধি হয় না কি? উজানীর ন্যায় আর এক প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী নগরীর পরিচয় প্রাচীন কবিগণের কাব্যে দেখিতে পাই। সে নগরীর নাম—রামাবতী বা রমতী। পাল-রাজগণের প্রতিষ্ঠার দিনে এই রামাবতীর গৌরবের অবধি ছিল না। রাজা রামপাল এই নগরে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়া গঙ্গাবাস করিয়াছিলেন। রাজকীয় অট্টালিকা-সমূহে, অসংখ্য উচ্চচূড় দেবমন্দিরে এবং দিক্-দেশাগত বণিকগণের অগণিত পণ্য-বীথিকায় এই নগর সুশোভিত ছিল। বাণিজ্যার্থী বণিকগণের এবং তাঁহাদের অর্ণবপোত-সমূহে বন্দর নিয়ত পরিপূর্ণ থাকিত। কবি সন্ধ্যাকর এই নগরীকে বিশ্বকর্ম্মা-নির্ম্মিত সুবর্ণপুরী বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। ঘনরাম প্রণীত 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল' মহাকাব্যে এ নগরীর অশেষ সৌন্দর্য্যের বর্ণনা আছে। কবি লিখিয়াছেন,—

"হস্তিনানগর হেন হয় অনুমান। পরিসর পাষাণে রচিত পুরীখান॥
মঠ কোঠা মন্দির সহর সৌধময়। কত ঠাঁই দেউল দেহারা দেবালয়॥"
কত কাঁচা কাঞ্চন কলস শোভে তায়। ঐ দেখ পতাকা উড়িছে মন্দ বায়॥

দুই শত বৎসরের অধিক কাল হইল মহাকবি ঘনরাম আবির্ভূত হন। তিনি রমতি বা রমাবতী নগরের যে বর্ণনা লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার বহুপূর্ব্বে কবি সন্ধ্যাকর সংস্কৃত কবিতায় সেই মহিমাই কীর্ত্তন করেন। সে বর্ণনার কয়েক পংক্তিও নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি,—

"দরদলিতকনককেতককান্তিমপ্যশেষকুসুমহিতাম্।
অরবিন্দেন্দীবরময়সলিলসুরভিশীতলশ্বসনাম্॥
অপি ধবলধামলেখালক্ষ্মীভারাভিরামপুরনীলাম্।
নিরুপরি কনককলসসেনকায় পীবরপয়োধরাভোগায়॥"

কিন্তু এ নগরী এখন কোথায়! অনেক অনুসন্ধানে ভগ্নাবশেষ দেখিয়া স্থির হয়,—লক্ষ্মণাবতীর উত্তরে গঙ্গাতীরে এই নগর বিদ্যমান ছিল। এই নগর ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পরবর্ত্তিকালে লক্ষ্মণাবতী প্রস্তুত হয়। বাঙ্গালায় এমন নগর গ্রাম আরও কত ছিল, কে নির্ণয় করিতে পারে?

মুর্শিদাবাদে বৈদেশিক বাণিজ্য।

মুসলমান-রাজত্বের অভ্যুদয়ে ইউরোপীয় বণিকগণের বাণিজ্য-প্রভাবে বাঙ্গালার যে যে বন্দর সমুন্নত ও শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার অধিকাংশেরই পরিচয় পূর্ব্বে প্রদান করিয়াছি। মুর্শিদাবাদে যখন বাঙ্গালার মসনদ প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সময়ে ও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তিকালে মুর্শিদাবাদের পারিপার্শ্বিক কতকগুলি স্থান পাশ্চাত্য-দেশের সহিত বাণিজ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত বর্ত্তমান সৈয়দাবাদের উত্তরে ফরাসিগণ 'বাণিজ্য-কুঠী স্থাপন

করিয়াছিলেন। ফরাসিগণের বসবাস জন্য ঐ স্থান 'ফরাসডাঙ্গা' নামে অভিহিত হইয়াছিল। এখনও সে ফরাসডাঙ্গার নাম আছে; কিন্তু সে চিহ্ন কিছুই নাই। এখন ফরাসডাঙ্গা বলিতে একমাত্র চন্দন-নগর ফরাসডাঙ্গাকেই বুঝাইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত ফরাসডাঙ্গার পূর্ব্ব-দক্ষিণ অংশে অনতিদূরে কালিকাপুর নামক স্থানে ওলন্দাজদিগের পণ্যশালা অবস্থিত ছিল। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে কালিকাপুরে ওলন্দাজগণের বাণিজ্য-কুঠীর অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়। কালিকাপুরে ওলান্দাজগণ একটা 'কেল্লা' পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কালিকাপুরে তখন এক বৃহৎ বিপণি ছিল। জন-কোলাহলে সে বিপণি নিয়ত মুখরিত থাকিত। এখন কলিকাতার বড়বাজার প্রভৃতিতে যেরূপ লোক-সমাগম দৃষ্ট হয়, কালিপুরের চকে সর্ব্বদাই সেইরূপ লোক-সমাগম হইত। কিন্তু সে চিহ্ন এখন কিছুই নাই। কালিকাপুরের অধিকাংশই এখন ভীষণ জঙ্গলে পরিপূর্ণ। ক্বচিৎ কোথাও দুই এক ঘর কৃষকের বসতি আছে; ক্বচিৎ কোথাও দুই একখণ্ড ভূমিতে চাষ-আবাদ চলিতেছে; ক্বচিৎ কোথাও প্রাচীন সমৃদ্ধির ক্ষীণ চিহ্ন লুক্কায়িত রহিয়াছে। কোনও কোনও অংশে হিংস্র জন্তু আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। কালিকাপুরের শেষ-স্মৃতির মধ্যে আছে,—ওলন্দাজদিগের একটী সমাধি-স্থান। ঐ সমাধি-স্থানও কালের কশাঘাতে বিচূর্ণ হইতে বসিয়াছিল।* সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্ত-বিভাগের অনুকম্পায়, মধ্যে মধ্যে সংস্কার-সাধনের ফলে, উহা ধ্বংসের পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের পর কালিকাপুরের কুঠী ওলন্দাজদিগের নিকট হইতে ইংরাজেরা ক্রয় করিয়া লন। এই কালিকাপুরের পূর্ব্বাংশে কাশীমবাজার। কাশীমবাজারেও পূর্ব্বে ওলান্দাজগণের পণ্যশালা ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। কিন্তু 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর' বাণিজ্যেই কাশীমবাজারের প্রসিদ্ধি। হুগলীতে বাণিজ্য-কুঠী স্থাপনের অব্যবহিত পরে কাশীমবাজারে 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর' একটী এজেন্সি খোলা হইয়াছিল। হুগলীর কুঠীর তত্ত্বাবধানে সেই এজেন্সির কার্য্য পরিচালিত হইত। পরিশেষে কাশীমবাজারেই কুঠী-স্থাপনা হয়। কাশীমবাজার হইতে রেশমী বস্ত্র, গজদন্ত, মস্‌লিন, কার্পাস-বস্ত্র প্রভৃতি ইউরোপে রপ্তানি হইত। কাশীমবাজারের বাণিজ্য হইতেই ইংরেজের ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইয়াছিল বলিয়া বুঝা যায়। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে কাশীমবাজারের বাণিজ্যে কত টাকা খাটিয়াছিল, ইতিহাসে তাহার একটা পরিচয় আছে। হণ্টার বলেন,—'ঐ সময়ে ইংলণ্ড হইতে বাঙ্গালায় বাণিজ্যের জন্য দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার পাউণ্ড স্বর্ণমুদ্রা এদেশে আসিয়াছিল। তন্মধ্যে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার পাউণ্ড কাশীমবাজারেই ব্যয় হয়।'† ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দের রেনেলের বিবরণে অবগত হওয়া যায়,—'ঐ সময় এক কাশীমবাজারেই ইউরোপীয়গণ চারি লক্ষ পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের (পাউণ্ড = প্রায় অর্দ্ধ সের) রেশম ক্রয় করিয়াছিলেন। সেই

কালিকাপুর, কাশীমবাজার প্রভৃতি।

---

* ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন গ্যাষ্ট্রেল এখানে সাতচল্লিশটী কবর দেখিতে পান (Gastrell's *Statistical Report of Murshidabad.*) কিন্তু এখন বাইশটী মাত্র কবর আছে। তাহারও ছয়টী মাত্র ক্রসবিশিষ্ট; অবশিষ্টগুলির উচ্চতা দুই এক হাতের অধিক নহে।

† *Hunter's Statistical Account of Murshidabad.*

সময়ে কাশীমবাজারের রেশম-কুঠীর মূল্য কুড়ি লক্ষ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।' কাশীম-বাজারের সে বাণিজ্যের পরিচয়-চিহ্ন এখন আর কিছুই নাই। ইংরেজগণের রেসিডেন্সির ভগ্নাবশেষ আর সমাধি-স্থান মাত্র—এখন একপার্শ্বে পড়িয়া আছে। তদ্দৃষ্টে এখন মনোমধ্যে পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগাইয়া দেয়। কাশীমবাজারের সমাধি-স্থানে যাঁহাদের কবর আছে, তাঁহাদের দুই এক জনের পরিচয় গ্রহণ করিলেও কাশীমবাজারের বাণিজ্য-সমৃদ্ধি অনুভূত হয়। লায়ন ফ্রেজার নামক একজনের কবরে পরিচয় আছে,—তিনি হীরা জহরতের ব্যবসা করিতেন; তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে নীলের ও ভৈষজ্যের পরীক্ষক ছিলেন। যেমন ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরাজগণকে মুর্শিদাবাদের এই সকল বিভিন্ন-স্থানে বাণিজ্য করিতে দেখি, দিনেমার ও আর্ম্মেনিয়ান্-গণ সেই ভাবেই ঐ অঞ্চলে বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠান্বিত ছিলেন। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে আর্ম্মেনিয়ান্-গণ ঐ অঞ্চলে প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন হন। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে আর্ম্মেনিয়ান্-গণ যে একটী গির্জ্জা নির্ম্মাণ করেন, আজিও তাহা বিদ্যমান আছে। আওরঙ্গজেবের নিকট হইতে আর্ম্মেনিয়ান্-গণ মুর্শিদাবাদে বাণিজ্যের অধিকার পাইয়াছিলেন। সৈয়দাবাদে খেতার্খা পল্লীতে তাঁহাদের বাণিজ্য-কেন্দ্র আজিও লোকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

বাঙ্গালার উপর দিয়া বিপ্লবের যে বিষম ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া গিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালার সকল পরিচয়-চিহ্নই লোপ পাইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালার বাণিজ্যের পরিচয় প্রদান করিতে হইলে, তাই এখন ইউরোপীয় ভ্রমণকারিগণের বা ইউরোপীয় বণিকগণের বিবরণই একমাত্র অবলম্বন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহারা আসিয়া সপ্তগ্রাম দেখিলেন; সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধির বিষয় কীর্ত্তিত হইল। তাঁহারা আসিয়া হুগলীতে, শ্রীরামপুরে, চন্দননগরে, কাশীমবাজারে কুঠী স্থাপন করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল স্থানের মাহাত্ম্য-কথা প্রচারিত হইল। সুতরাং বাঙ্গালার বাণিজ্য-প্রসঙ্গে ইউরোপীয় বণিকগণ কি ভাবে কোন্ সময়ে বঙ্গদেশে আসিয়া আপনাদের বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন, এস্থলে সংক্ষেপে তাহা উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ করিতেছি। ইদানীন্তন-কালে এদেশে প্রথমে পর্ত্তুগীজগণ আসিয়া বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করেন। উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া ভাস্কো-ডি-গামার বাণিজ্য-তরী ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে মালবর-উপকূলে কালিকট-নগরে উপস্থিত হয়। এই পথের সন্ধান পর্ত্তুগীজগণ ভারতীয় নাবিকগণের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। * স্বদেশ হইতে যাত্রা করিয়া প্রায় এক বৎসরে (ভাস্কো-ডি-গামার

বাঙ্গালার বাণিজ্যে ইউরোপীয়গণ।

---

* 'প্রাচীন-কালে ভারত-মহাসাগরের বাণিজ্য'-সংক্রান্ত-গ্রন্থে উইলিয়ম ভিন্সেন্ট এই বিষয়ে লিখিয়া গিয়াছেন,—"The celebrated Map of Venice, drawn up for Prince Henry (of Portugal) in the year 1459 by Fra Mauro of St. Michael di Murano does exhibit a southern termination of Africa, the knowledge of which was derived from a report of an Indian navigator who had passed it from the east".—*The Commerce and Navigation of the Ancients in the Indian Ocean* by William Vincent D. D., Vol. ii. পর্ত্তুগালের রাজা দ্বিতীয় জন, ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে 'পেড্রো কভিলহাম্' নামক জনৈক পর্ত্তুগীজকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। আফ্রিকার দক্ষিণ দিয়া জলপথে ভারতবর্ষে পৌঁছিবার কোন সুবিধা আছে কিনা, তাহার সন্ধান লওয়াই কভিলহামের উদ্দেশ্য

যাত্রার দিন ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাস) তাঁহারা ভারতে আসেন। সেই হইতে ভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জে তাঁহাদের বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হয় ; মালবর উপকূলস্থিত গোয়া-নগর তাঁহাদের বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থান হইয়া উঠে। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজগণ বাঙ্গালায় প্রবেশ করেন। এই সময়েই চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রাম পর্ত্তুগীজগণের প্রধান বাণিজ্য-স্থান হইয়া উঠিয়াছিল। মানুষের বুঝি ধন-তৃষার শেষ নাই! তাই ব্যবসায়-বাণিজ্যে পরিতৃপ্ত না হইয়া, পর্ত্তুগীজগণ পরিশেষে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করেন।

বাঙ্গালায় পর্ত্তুগীজগণ।

গঞ্জালেস্, সেই জলদস্যুগণের নেতৃস্থান অধিকার করিয়া, পূর্ব্ববঙ্গ উৎখাত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। চট্টগ্রাম ও তাহার পারিপার্শ্বিক স্থান-সকল সেই দস্যুদলের ক্রীড়া-কেন্দ্র মধ্যে পরিগণিত হয়। অল্পদিন মধ্যেই গঞ্জালেস্ সন্দ্বীপ-বন্দর অধিকার করিয়া বসেন। তখন, কিছু দিনের জন্য, সন্দ্বীপ গঞ্জালেসের রাজধানী বলিয়া গণ্য হইয়াছিল এবং পারিপার্শ্বিক ভূস্বামিগণ অনেকেই গঞ্জালেসকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সন্দ্বীপ হইতে দস্যুদল পূর্ব্ব-বাঙ্গালার বিভিন্ন-স্থানে এবং আরাকান-প্রদেশে লুঠ-তরাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার সুবাদার সে অত্যাচার অসহ্য বলিয়া মনে করেন। ঐ দস্যুদলকে দমন জন্য তখন ঢাকায় বাঙ্গালার রাজধানী পরিবর্ত্তন করার আবশ্যক হয় ;—সঙ্গে সঙ্গে মোগল-বাহিনী সন্দ্বীপ অভিমুখে অভিযান করে। কিন্তু পর্ত্তুগীজগণের কৌশলে সে অভিযান ব্যর্থ হয়। দুই দুইবার আক্রমণ করিয়াও মোগলসেনা বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল। গঞ্জালেস্ তখন ঐ প্রদেশে একছত্র আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসেন। ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে সন্দ্বীপ প্রদেশে গঞ্জালেসের প্রভাব-প্রতিপত্তির অবধি ছিল না। বাঙ্গালার সুবেদার ইস্‌লাম খাঁ, ঢাকায় রাজধানী আনয়ন করিয়াও, দস্যুদলকে দমন করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহার পর কাশিম খাঁ সুবেদার হন। তিনিও উপদ্রব নিবারণে অশক্ত

ছিল। তিনি ভারতবর্ষের নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া জানিতে পারেন,—ভারতবাসীরা উত্তমাশা অন্তরীপের পথ অবগত আছে। তিনি ভারতবর্ষের একজন মুসলমানের নিকট হইতে একখানি মানচিত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই মানচিত্রে উত্তমাশা অন্তরীপের এবং আফ্রিকার উপকূলের সমস্ত বন্দর চিহ্নিত ছিল। ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, কভিলহাম্ পর্ত্তুগালের রাজাকে ভারতবর্ষে বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য বিশেষরূপে উৎসাহান্বিত করেন। (Vide *Travels to Discover the Source of Nile* by James Bruce, Vol. ii.) প্রধানতঃ কভিলহামের নিকট সন্ধান পাইয়াই 'ভাস্কো-ডি-গামা' ভারতের পথে অগ্রসর হইতে উদ্‌বুদ্ধ হন। ভাস্কো-ডি-গামার অনুসরণে পর্ত্তুগীজগণ যখন দলে দলে ভারতের দিকে আসিয়াছিলেন, তখন পূর্ব্ব-সমুদ্রে বহুদিনের প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্য-প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। বহুদিনের উপবাসী বুভুক্ষু ব্যাঘ্র মেষপাল-মধ্যে পতিত হইলে যেভাবে তাহাদিগকে গ্রাস করিবার চেষ্টা করে, পর্ত্তুগীজগণ এ দেশে উপস্থিত হইয়া সেইভাবেই পণ্য-বীথিকা-সমূহ লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হন। ইণ্ডিয়া আপিসের পুরাতন রিপোর্টে পর্ত্তুগীজগণের সেই বাণিজ্য-বিবরণ এইভাবে বিবৃত আছে ;—"When the Portugese at last, rounding the Cape of Good Hope burst into the Indian Ocean like a pack of hungry wolves upon a well-stocked sheep walk, they found a peaceful and prosperous commerce, that had been elaborated during three thousand years, being carried on all along its shores."
—*Report on the old Records in the India Office*, p. 165.

হইয়াছিলেন। পরিশেষে ইব্রাহিম খাঁ সুবেদার হইয়া আসিয়া পর্ত্তুগীজগণকে দমন-জন্য বদ্ধ-পরিকর হন। কিন্তু এসময় পর্ত্তুগীজগণ নানাস্থানে আপনাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া বসিয়াছিল। এই সময়ে হুগলীতে পর্ত্তুগীজগণের বাণিজ্য-কুঠী প্রতিষ্ঠিত হয়। বাণিজ্যের অছিলায় তাহারা নানাস্থানে আধিপত্য-বিস্তারে প্রয়াস পায়। পর্ত্তুগীজগণের অত্যাচারে এই সময় সমগ্র বঙ্গদেশ বিশেষভাবে উত্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। পর্ত্তুগীজগণ কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যে লুণ্ঠ-তরাজ করিয়া নিরস্ত ছিল না;—তাহারা এদেশের বালক-বালিকা স্ত্রীলোক প্রভৃতিকে চুরী করিয়া লইয়া দাসদাসী-রূপে দেশান্তরে বিক্রয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। অত্যাচারের রাজত্ব—অধিক দিন স্থায়ী হয় না। সুতরাং অল্পদিন মধ্যেই বঙ্গদেশ হইতে পর্ত্তুগীজগণের বাণিজ্য ও আধিপত্য লোপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার সুবেদার কাশীম খাঁ জোবানি বাঙ্গালা হইতে পর্ত্তুগীজগণকে একেবারে বিদূরিত করেন। ঐ সময়ে মোগল-সৈন্য হুগলীসহর আক্রমণ করায়, তিনি বৎসর কাল পর্ত্তুগীজ-দিগকে অবরুদ্ধ-নগরে অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজগণ আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। পর বৎসর হইতেই বাঙ্গালার সহিত পর্ত্তুগীজগণের সকল সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যায়। যে ভীষণ অত্যাচারে পর্ত্তুগীজগণ বঙ্গদেশকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল, হুগলীতে তাহাদের পরাজয়-সময়ে মোগলগণের নিকট সেইরূপ প্রতিশোধই তাহারা প্রাপ্ত হইয়াছিল। বিধাতার কি নিদারুণ অভিশাপ! আত্মসমর্পণের পূর্ব্বে পর্ত্তুগীজেরা আপনা-দের কতকগুলি অর্ণবপোত আপনারাই অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করে। সেই অর্ণবপোতে দুই সহস্রাধিক নরনারী বালক-বালিকা আশ্রয় লইয়া ছিল। মুসলমানগণের হস্তে আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয় মনে করিয়া, জাহাজের অধ্যক্ষ অগ্নিসংযোগে জাহাজ ভস্মীভূত করেন। চৌষট্টি খানি বৃহৎ পোত এবং এক শত সাতান্ন খানি নাতিক্ষুদ্র নাতিবৃহৎ তরণী, নগরের পরপারে নোঙ্গর করিয়া ছিল। তাহার অধিকাংশই অনলসংযোগে ভস্মীভূত হয়। কেবল তিনখানি ক্ষুদ্র তরণী কোনরূপে পথ পাইয়া গোয়া-সহরে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অধিকাংশ ধন-সম্পত্তি এবং প্রাণ এইরূপে অগ্নিদাহে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর, যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, মোগলদিগের হস্তে নিপতিত হয়। সহস্রাধিক পুরুষ—পূর্ব্বেই যুদ্ধ-ক্ষেত্রে প্রাণদান করিয়াছিল। অবশিষ্ট চুয়াল্লিশ শত স্ত্রীপুরুষ বালক-বালিকা বন্দী হয়। তাহাদের মধ্যে পাঁচ শত বলিষ্ঠ সুন্দর যুবাপুরুষ এবং কয়েক জন ধর্ম্মযাজক আগ্রায় প্রেরিত হইয়াছিল। সুন্দরী বালিকাগণ সম্রাটের ও ওমরাহগণের 'হারামে' আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। ইহার পর হুগলীর ব্যবসা-বাণিজ্যের তত্ত্বাবধানের জন্য মোগল-দরবার হইতে একজন ফৌজদার নিযুক্ত হইয়া আসেন। তখন, ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে ২রা ফেব্রুয়ারীর 'ফারমান' অনুসারে, সাতগাঁ হইতে সকল সরকারী কার্য্যালয় হুগলীতে উঠিয়া আসে। পর্ত্তুগীজ-

বাঙ্গালার ওলন্দাজগণ।

দিগের ভারতাগমনের অব্যবহিত পরে দিনেমারগণ, ওলন্দাজগণ, ইংরেজগণ ও ফরাসিগণ ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে প্রলুব্ধ হন। ওলন্দাজেরা ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা-দেশে প্রথম বাণিজ্য-কুঠী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ আছে। ফরাসিগণ এবং দিনেমারগণ পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গালায়

গতিবিধি আরম্ভ করিয়াছিলেন বটে ; কিন্তু নবাব সায়েস্তা খাঁর শাসন-সময়ে, ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে, তাঁহারা বাঙ্গালাদেশে বাণিজ্য-কুঠী স্থাপনে অনুমতি প্রাপ্ত হন। চুঁচুড়া চন্দননগর এবং শ্রীরামপুর যথাক্রমে ওলন্দাজগণের, ফরাসিগণের এবং দিনেমারগণের বাণিজ্য-কেন্দ্রে পরিণত হয়। ইংরেজ-বণিকগণের মধ্যে যিনি প্রথম বঙ্গদেশে আসেন, তাঁহার পরিচয় পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছি। তিনি—রাল্‌ফ ফীচ। তিনি ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে স্থলপথে ভারত-বর্ষে আসেন। তাঁহার সঙ্গে জেমস্ নিউবেরী ও লীডস্ নামে আরও দুইজন ইংরেজ-বণিক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের পূর্ব্বে (১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে) টমাস্ ষ্টিফেন্স নামক একজন ইংরেজের ভারতবর্ষে আগমনের সংবাদ পাওয়া যায়। অতি পুরাকালে (৮৮৩ খৃষ্টাব্দে) পোপের নিকট হইতে আসিয়া একজন ইংরেজ মাদ্রাজ-প্রদেশে বাণিজ্য করিয়াছিলেন বলিয়া প্রচার আছে। কিন্তু রাল্‌ফ ফীচের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে তাঁহারা যে কেহ আসিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ নাই। 'ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর' প্রতিষ্ঠা হইতেই প্রকৃত বাণিজ্যের সূত্রপাত আরম্ভ হয়। ১৬০০ খৃষ্টাব্দের ৩১ শে ডিসেম্বর ইংলণ্ডের রাজ্ঞী এলিজাবেথের নিকট 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' * প্রাচ্য-দেশে বাণিজ্যের জন্য সনন্দ প্রাপ্ত হন। ১৬১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বার বৎসরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য-পোত বার বার প্রাচ্য-দেশে আগমন করিয়াছিল। ১৬১১ খৃষ্টাব্দে মসলিপত্তনে এবং ১৬১২ খৃষ্টাব্দে সুরাটে কোম্পানী বাণিজ্য করিবার অধিকার লাভ করেন। ইংলণ্ডের অধিপতি প্রথম জেম্‌সের রাজত্বকালে ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে স্যার টমাস রো ইংলণ্ডের দূতরূপে ভারতে আসেন। জাহাঙ্গীর বাদসাহের

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী।

* ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে ভারতে আসিয়া প্রায় এক শত বৎসর কাল পর্ত্তুগীজগণ অপ্রতিদ্বন্দ্বিতার সহিত এ দেশে বাণিজ্য চালাইয়াছিলেন। সেই সময়ে ইংরেজ, ওলন্দাজ, ফরাসী প্রভৃতি ইউরোপের অপরাপর জাতির ভারতের বাণিজ্যে প্রলুব্ধ হন। প্রায় সমসময়ে ইংলণ্ডের লণ্ডন সহরে এবং হলাণ্ডের আম্‌ষ্টার্ডাম্ সহরে দুইটী বাণিজ্য-সংসদ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্য-সংসদের নাম,—'দি গবর্ণর য়্যাণ্ড কম্প্যানী অব্ মার্চেণ্টস্ অব্ লণ্ডন ট্রেডিং টু দি ইষ্ট ইণ্ডিজ' (The Governor and Company of Merchants of London trading to the East Indies)। ঐ সমিতি ১৬০০ খৃষ্টাব্দের ৩১ শে ডিসেম্বর ইংলণ্ডের রাজ্ঞী এলিজাবেথের নিকট হইতে প্রাচ্য-দেশে বাণিজ্যের জন্য সনন্দ প্রাপ্ত হন। ঐ সনন্দে ঐ সমিতি অফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণস্থিত উত্তমাশা ('গুড্ হোপ') অন্তরীপ হইতে দক্ষিণ আমেরিকার 'হর্ণ' অন্তরীপ পর্য্যন্ত সীমানার মধ্যবর্ত্তী অর্থাৎ ভারত মহাসাগরের ও প্রশান্ত মহাসাগরের অন্তর্গত ও পারিপার্শ্বিক সমস্ত স্থানে বাণিজ্য করিবার অধিকার পান। বলা বাহুল্য, কেবল ঐ সমিতিই রাজ্ঞীর নিকট ঐ অধিকার পাইয়াছিলেন ; অন্য কেহ ঐ অধিকার পান নাই। প্রথম সনন্দ পনের বৎসরের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। ঐ সময়ে কোম্পানী প্রধানতঃ সুমাত্রা ও যবদ্বীপে বাণিজ্য-পোত-সমূহ প্রেরণ করিতেন। কেলিকো (রঙ্গিন-বস্ত্র), রেশম, নীল এবং মস্‌লা প্রভৃতি পণ্য লইয়া তাঁহাদের পোত স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইত। এই সময় ভারতবর্ষের উপকূলভাগে বাণিজ্য চালাইবার জন্য কোম্পানীর বিশেষ আগ্রহ হয়। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে বা উহার অব্যবহিত পূর্ব্বে কোম্পানী সুরাট, আমেদাবাদ, কাম্বে ও গোগো প্রভৃতি স্থানে এজেন্সি-স্থাপনে এ দেশের নৃপতিগণের অনুমতি প্রাপ্ত হন। এই কোম্পানীর আদর্শে ইংলণ্ডে অনেক সময় অনেক বাণিজ্য-সংসদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই সকল সংসদ ক্রমশঃ এক হইয়া মিলিয়া গিয়াছিল। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে পরিচিত হইয়া ঐ সংসদ বাণিজ্য-সনন্দ প্রাপ্ত হয়। পরিশেষে সংসদ যে নামে প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিল, সে নাম—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। ঐ কোম্পানী ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে, ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায়, ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই-সহরে আপনাদের প্রধান বাণিজ্য-কুঠী স্থাপন করেন। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস্ ঐ কোম্পানীকে এদেশের রাজন্যবর্গের সহিত যুদ্ধবিগ্রহ ও সন্ধি-স্থাপন প্রভৃতির ক্ষমতা প্রদান করেন। এই সূত্রে ধীরে ধীরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সে রাজত্ব মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শাসনাধীন হয়।

দরবার হইতে ভারতবর্ষে বাণিজ্য-বিষয়ে অধিকার-লাভ ইংলণ্ডেশ্বরের সেই দূত প্রেরণের অভিপ্রায় ছিল। সেই দূত-প্রেরণের ফলে, বাঙ্গালায় ও বিহারে ইংরেজ বাণিজ্য-অধিকার প্রাপ্ত হন। ১৬২০খৃষ্টাব্দে পাটনা-সহরে ইংরেজের বাণিজ্য-কুঠী নির্ম্মিত হয়। তখন প্রধানতঃ স্থলপথেই পাটনা হইতে আগ্রায় ও সুরাটে পণ্যাদি প্রেরিত হইত। কিন্তু তাহাতে ব্যবসায়ে বড় সুবিধা হয় না। সুতরাং বণিকগণ অন্যবিধ উপায় অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হন। ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী ইংরেজেরা বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিবার জন্য সম্রাট সাজাহানের নিকট সনন্দ প্রাপ্ত হন। কিন্তু বাঙ্গালার সুবেদার আজিম খাঁ ইংরেজদিগকে তখন গঙ্গানদীর উপকূলে বাণিজ্য-কুঠী স্থাপনে অনুমতি দেন না। পর্ত্তুগীজেরা হুগলীতে কুঠী-নির্ম্মানের অধিকার পাইয়া দেশ-মধ্যে যে বিপ্লব-বহ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিয়াছিল, তদ্বিষয় স্মরণ করিয়াই তিনি ইংরেজদিগকে দেশাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে অনুমতি দেন নাই। যাহা হউক, ঐ সময় বালেশ্বরের নিকটস্থিত পিপলী-বন্দর পর্য্যন্ত ইংরেজ বাণিজ্য-পোত চলাচলের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে পিপ্‌লী-বন্দরে ইংরেজের বাণিজ্য-কুঠী প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালায় ঐ কুঠীই তাঁহাদের প্রথম কুঠী। বলা বাহুল্য, পিপ্‌লীর কুঠী প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, বাঙ্গালার বাণিজ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিশেষ কোনও সুবিধা সংঘটিত হয় নাই। কিন্তু বিধাতা সহায় হইলে সুবিধা আপনা-আপনিই উপস্থিত হয়। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট সাজাহানের কন্যা অগ্নিদগ্ধ হন;—হঠাৎ তাঁহার কাপড়ে আগুন লাগিয়া তিনি সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হন। এই সময়ে সুরাট বন্দরে মিষ্টার গেব্রিয়েল বাউটন অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি 'হোপওয়েল' নামক অর্ণবপোতের আরোহিগণের চিকিৎসক-রূপে এদেশে আসিয়াছিলেন। সম্রাট-কন্যার চিকিৎসার জন্য উজীর আসাদ খাঁ ইউরোপীয় চিকিৎসকের সাহায্য-গ্রহণে পরামর্শ দিলেন। ফলে ডাক্তার বাউটনের প্রতি সম্রাটের দৃষ্টি পড়িল। সম্রাট সে সময়ে দাক্ষিণাত্যের শিবিরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সুতরাং সুরাট হইতে ডাক্তার বাউটনকে লইয়া গিয়া কন্যার চিকিৎসা করাইবার সুবিধা ঘটিল। ইংরেজের শুভগ্রহ;—বাউটনের চিকিৎসায় অচিরে সম্রাট-নন্দিনী আরোগ্য লাভ করিলেন। বাউটন সম্রাটের প্রিয়পাত্র হইয়া দাঁড়াইলেন। সম্রাট তখন বাউটনকে পুরস্কার দিতে চাহিলেন। বাউটন কি পুরস্কার চাহেন?—বাদসাহ প্রশ্ন করিলেন। বাউটন ইচ্ছা করিলে বিপুল ধনৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে পারিতেন। নিজের জন্য সাহায্য-প্রার্থী হইলে, তাঁহার অদৃষ্ট ফিরিয়া যাইত। কিন্তু বাউটন আপনার সুখ-সম্পদের প্রতি আদৌ দৃকপাত করিলেন না। কিসে জন্মভূমির শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়, কিসে আপনার স্বজাতির উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হয়, তিনি কেবল সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সম্রাটের নিকট পুরস্কার-প্রার্থী হইলেন। তিনি পুরস্কার চাহিলেন,—'সম্রাট যেন বঙ্গদেশে তাঁহার স্বজাতির বাণিজ্যের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন,—ইংরেজ যেন বিনা-শুল্কে বঙ্গদেশে বাণিজ্য-প্রসারে ও বাণিজ্য-কুঠী প্রতিষ্ঠায় অধিকারী হন।' সেই প্রার্থনাই মঞ্জুর হইল। বাউটনের প্রার্থনানুরূপ সনন্দ সম্রাট প্রদান

বাঙ্গালায় ইংরেজ-বণিকগণ।

বাউটনের স্বজাতি-প্রীতি।

করিলেন। * ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্-প্রদত্ত সনন্দের বলে, বঙ্গদেশের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া, বাউটন পিপ্‌লী বন্দরে উপনীত হন। সে সময় সর্ব্ববিধ শুল্ক হইতে ইংরেজের বাণিজ্য-পোত মুক্তিলাভ করিয়াছিল বটে; কিন্তু প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের চক্রান্তে তাঁহারা অন্যত্র কুঠী-স্থাপনে বা বাণিজ্য-বিস্তারে অধিকারী হন নাই। তবে, বলিয়াছি তো, অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইলে, সুযোগ আপনিই উপস্থিত হয়। এই সময় ঘটনাচক্রে সম্রাট-তনয় সুজা বঙ্গদেশের শাসন-কর্ত্তৃত্ব লাভ করেন। পূর্ব্ব-পরিচয়-সূত্রে, সম্মান-প্রদর্শন উপলক্ষে, ডাক্তার বাউটন রাজমহলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। সেই সময়ে রাজ-অন্তঃপুরে কোনও মহিলা সঙ্কট পীড়ায় কাতর ছিলেন। বাউটনের উপর তাঁহার চিকিৎসা-ভার ন্যস্ত হয়। শুভাদৃষ্টক্রমে সে চিকিৎসায়ও বাউটন ফললাভ করেন। তাহাতে রাজমহলে বাউটনের প্রতিপত্তি বাড়িয়া যায়। এই ঘটনার অব্যবহিত পরে, ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে, ইংলণ্ড হইতে একখানি বাণিজ্য-তরী এদেশে আগমন করে। মিষ্টার ব্রিজম্যান প্রমুখ কয়েক জন ইংরেজ সেই পোতে আগমন করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে বাণিজ্যের অধিকার লাভ করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। ব্রিজম্যানকে সঙ্গে লইয়া, ডাক্তার বাউটন রাজমহলে যান। সুজার সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। সুজা এবার ইংরেজদিগকে বালেশ্বরে ও হুগলী-সহরে বাণিজ্য-কুঠী নির্ম্মাণের অধিকার প্রদান করেন। এখন, পিপ্‌লী, বালেশ্বর ও হুগলী—এই তিন বন্দরে বাণিজ্য-কুঠী প্রতিষ্ঠিত হয়। † ইহার পর, মীর জুম্‌লা যখন বাঙ্গালার মস্‌নদে রাজমহলে প্রতিষ্ঠিত, তখন ইংরেজের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। সোরা-বোঝাই ইংরেজের কয়েকখানি নৌকা তিনি আটক করেন। তাহাতে ইংরেজের পাটনায় ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হয়। মীর জুম্‌লার এই ব্যবহারে উত্তেজিত হইয়া, ইংরেজেরা তাঁহার একখানি নৌকা আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইহাতে মীর জুম্‌লা ক্রুদ্ধ হইয়া ইংরেজ বণিকগণকে বিতাড়িত করিতে চেষ্টা পান। তখন, ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়া, ইংরেজ বণিকগণ তাঁহার সহিত সন্ধি-স্থাপনে বাধ্য হন। এই ঘটনার অল্পদিন পূর্ব্বে, হুগলীর ফৌজদার, ইংরেজ বণিকগণের নিকট হইতে বার্ষিক তিন সহস্র মুদ্রা 'পেশকুস' বা শুল্ক গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মীর জুম্‌লা (১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে) সেই শুল্ক যথারীতি আদায়ের আদেশ দেন। ইহার পর, নানা বিঘ্ন-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া, নবাব সায়েস্তা খাঁর শাসন-সময়ে ইংরেজ বণিকগণ বাণিজ্যের বিবিধ সুবিধা প্রাপ্ত হন। ঐ সময় বালেশ্বরে এবং হুগলীতে তাঁহাদের কুঠীর কাজ জোরে চলিতে থাকে; অধিকন্তু পাটনা, কাশীমবাজার ও ঢাকা-সহরে তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ অবস্থিতি করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। ঐ সময়ে একমাত্র সোরার রপ্তানি-পরিমাণ অনুধাবন করিলেই বাণিজ্যের আভাস পাওয়া যাইতে পারে। ঐ সময়ে কোনও কোনও

---

* ১৬৩৩-৩৪ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী এই সনন্দের তারিখ লিখিত আছে বলিয়া প্রচার। 'ষ্টেট পেপার' আফিসে এই সনন্দের বিদ্যমানতার বিষয় অবগত হওয়া যায়।—Stewart's *History of Bengal*, Section VI.

† *East India Records*, Vol. XIV.

বৎসরে হাজার টন (প্রায় আটাইশ হাজার মণ) সোরা বাঙ্গালা-দেশ হইতে বিদেশে রপ্তানি হইত, এবং দশ হাজার পাউণ্ড স্বর্ণমুদ্রা (এখনকার হিসাবে পাউণ্ড = পনের টাকা) প্রতি বৎসর এদেশের বাণিজ্যে 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর' ব্যয় হইত। গঙ্গানদী দিয়া বাণিজ্য-পোত পরিচালনার বাধা-বিঘ্নও এ সময় প্রায় সমস্তই দূর হইয়াছিল। ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে সায়েস্তা খাঁ শুল্ক-প্রদানে পর্য্যন্ত ইংরেজ বণিকগণকে অব্যাহতি দিয়াছিলেন। ১৬৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ বণিকগণ, সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের অনুমত্যনুসারে, বাঙ্গালায় স্থায়ি-রূপে বাণিজ্য করিবার অধিকার পান। বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য-বিষয়ে তাঁহাদিগকে যে সকল অসুবিধা ভোগ করিতে হইত, সম্রাট-প্রদত্ত সনন্দের বলে, এই সময় সে অসুবিধা সমস্তই দূর হইয়াছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এজেণ্ট, সম্রাটের স্বাক্ষরিত সনন্দ লইয়া, ১৬৮০ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুলাই হুগলী নগরে প্রত্যাবৃত্ত হন। ঐ দিন ইংরেজ বণিকগণের আনন্দের অবধি ছিল না। ঐ দিন হুগলীর বন্দরে ইংরেজের অর্ণবপোত হইতে এককালে তিন শত কামান-ধ্বনিতে সে আনন্দ বিঘোষিত হইয়াছিল। ইহার অব্যবহিত পরেই (১৬৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বঙ্গ-দেশের বাণিজ্যের তত্ত্বাবধানের জন্য একজন গবর্ণর বা তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। এক হিসাবে তিনিই বাঙ্গালার প্রথম গবর্ণর। তাঁহার নাম—মিষ্টার হেজেস্। মিষ্টার হেজেস্ পূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন 'ডাইরেক্টর' ছিলেন; এই হইতেই তিনি বঙ্গদেশের বাণিজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া দাঁড়াইলেন। হুগলীতে তাঁহার বাস-স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। তাঁহার সম্মানের জন্য একজন শরীর-রক্ষক ইংরেজ-কর্ম্মচারী ও কুড়ি জন ইউরোপীয় সৈন্য মাদ্রাজের 'ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জ' * কেল্লা হইতে হুগলীতে আসিয়া আশ্রয় লইল। বাঙ্গালা-দেশে 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর' সৈনিক-বিভাগ স্থাপনের ইহাই প্রথম অনুষ্ঠান। এই বাণিজ্য-সম্বন্ধই এদেশে ইংরেজ-শাসনের ভিত্তিভূমি বলা যাইতে পারে। † ইহার পর ১৬৯৯-১৭০০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দুর্গ নির্ম্মিত হয়। ইংলণ্ডের তাৎকালিক অধিপতি চতুর্থ উইলিয়মের নামের অনুসরণে সে দুর্গ 'ফোর্ট উইলিয়ম' সংজ্ঞা লাভ করে। গঙ্গার পূর্ব্ব-তীরে তিন মাইল দৈর্ঘ্য এক মাইল বিস্তৃত ভূখণ্ড—সুতানুটি, গোবিন্দপুর, কালিকোটা ‡ এই পল্লীত্রয়—ইতিপূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী জমিদারদিগের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন। দুর্গসমন্বিত ঐ অংশ এই সময় হইতে কলিকাতা নামে পরিচিত হয়; তার পর ক্রমে

কোম্পানীর প্রথম গবর্ণর।

---

* ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' মাদ্রাজে কুঠী-নির্ম্মাণের (তত্রত্য নৃপতির নিকট) অনুমতি প্রাপ্ত হন। ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে 'ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জ' কেল্লা প্রতিষ্ঠিত হয়।

† এ সকল বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ (1) Orme's Indostan, (2) Bruce's Annals of the East India Company, (3) India Records প্রভৃতি গ্রন্থে বিশেষভাবে বিবৃত আছে।

‡ কালীঘাটের ৺কালী মাতার নামানুসারে গ্রামের নাম 'কালীকোটা' রূপে উচ্চারিত হইয়াছিল। তাহারই অপভ্রংশে কলিকাতা নামের উৎপত্তি। এই কলিকাতা নামের উৎপত্তি বিষয়ে অন্য প্রকার মতও আছে। সে সকল বিষয় যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

এই কলিকাতা বৃটিশ-সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হইয়াছিল। এইরূপে বৃটিশ-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার বাণিজ্যের গতিও অভিনব-পন্থা পরিগ্রহ করে।

বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ ও অধিকার-বিস্তার।

বাণিজ্য-ব্যপদেশে ও ধর্ম্মপ্রচার-উদ্দেশে বিভিন্ন-দেশে গতিবিধি-সূত্রে বাঙ্গালীর উপনিবেশ-স্থাপন ও অধিকার-বিস্তার প্রভৃতির প্রমাণ-পরম্পরারও অসদ্ভাব নাই। সিংহলে কত পূর্ব্বে বাঙ্গালীর অধিকার বিস্তার হয়, যবদ্বীপে কত পূর্ব্বে বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান্বিত ছিলেন, সে আভাস পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছি। সিংহলে বাঙ্গালীর উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেও চীনদেশে বাঙ্গালীর প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল প্রমাণ পাওয়া যায়। চীনদেশের গ্রন্থপত্র আলোড়ন করিয়া অধ্যাপক লাকুপেরি * দেখাইয়াছেন,—খৃষ্টজন্মের ছয় শত আশী বৎসর পূর্ব্বে চীনে ভারতীয়গণের একটী উপনিবেশ ছিল। চীনাদিগের উচ্চারণে সেই উপনিবেশের নাম 'লঙ্গ' বা তদ্রূপ একটা অবয়ব পরিগ্রহ করিয়া আছে। সেই উপনিবেশ স্বাধীন ছিল, সেই উপনিবেশ আপনাদের মুদ্রা পর্য্যন্ত চালাইয়াছিল। কিন্তু সেই উপনিবেশের প্রতিষ্ঠাতা কাহারা? কোন্ দেশের নামানুসারে সেই উপনিবেশের নাম হইয়াছিল? আমরা বলি, বঙ্গদেশের বাঙ্গালিগণ কর্ত্তৃক ঐ উপনিবেশ স্থাপিত হয়, এবং ঔপনিবেশিকগণের জন্মভূমির নামানুসারেই উহার নামকরণ হইয়াছিল। চীনা-ভাষায় প্রায়ই 'ব'-কারের বিকৃত উচ্চারণ দৃষ্ট হয়। বাঙ্গালার রাজা চীনদিগের নিকট 'পাঙ্কোলের রাজা' বলিয়া পরিচিত হন; কর্ণসুবর্ণ 'কি-লো-না-সু-ফা-লা-না' রূপ পরিগ্রহ করে; 'যবন'-শব্দ 'এন্-মো-লো' রূপে চীনাদিগের উচ্চারণে উচ্চারিত হয়। এ সকল দেখিয়া, তাঁহাদের উচ্চারিত 'লঙ্গ' ও 'বঙ্গ' যে অভিন্ন, তাহাই বুঝিতে পারা যায়; বাঙ্গালার সহিতই চীনের প্রথম সম্বন্ধ পূর্ব্ব হইতেই প্রতিপন্ন হয়। 'লঙ্গ' উপনিবেশ—বাঙ্গালীরই বৈদেশিক বাণিজ্যের ও উপনিবেশ-প্রতিষ্ঠার প্রাচীন নিদর্শন। বাঙ্গালার নামে, বাঙ্গালার প্রধান প্রধান নগরের নামে, বাঙ্গালার প্রধান প্রধান রাজবংশের নামে, বাঙ্গালী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বৈদেশিক উপনিবেশ-সমূহের নামকরণ হইয়াছিল,—এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। কোচিন-চায়নায় 'চম্পা' নামে একটী স্থান দৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশের চম্পা-নগরের বণিকগণ কর্ত্তৃক সে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল,—পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণই এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। † মার্টাবান উপসাগরের উপকূলে, ৩০০ খৃষ্টাব্দে, বাঙ্গালার পশ্চিম-উপকূলস্থিত কতকগুলি বণিক গিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। যে সকল স্থানে তাঁহারা বসতি করেন, তাহার একটীর নাম—'সদ্ধম্মনগর'। এই নগর পালি-ভাষা-ভাষী বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, স্বতঃই উপলব্ধি হয়। 'রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে' একজন ইউরোপীয় ধর্ম্মপ্রচারক বাঙ্গালীর এই উপনিবেশের বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন। ‡ কলিঙ্গ-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মূলেও বাঙ্গালীরই প্রভাব প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং কলিঙ্গগণের

বাঙ্গালীর উপনিবেশ।

---

* Professor Lacouperie's *Western Origin of the Early Chinese Civilisation.*

† Rhys David's *Buddhist India.*

‡ R. F. St. Andrew St. John in the *Journal of the Royal Asiatic Society*, 1898.

প্রতিষ্ঠিত উপনিবেশ-সমূহ বাঙ্গালীর উপনিবেশ বলিয়াই অভিহিত করা যাইতে পারে। ব্রহ্মদেশের পেগু-সহরে কলিঙ্গগণের উপনিবেশের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ব্রহ্ম-দেশের ইতিহাসে মিঃ ফেরে * এতদ্বিষয় বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন,—'পেগু প্রভৃতি স্থানে প্রাচীন হিন্দুগণের পরিচয়-চিহ্ন-সমন্বিত মুদ্রা ও পদক আবিষ্কৃত হইয়াছে; সে মুদ্রাগুলি ভারতের।' আমার বলি, কেবল ভারতের নহে, সেগুলি বাঙ্গালীর উপনিবেশের নিদর্শন। মালাক্কা-দ্বীপপুঞ্জে এবং সিঙ্গাপুরে আজিও কলিঙ্গগণের নিদর্শন আছে। এখনও তত্রত্য কতকগুলি অধিবাসী 'ক্লীং' সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। তাহারা কলিঙ্গগণেরই শেষ স্মৃতি। বঙ্গদেশে যে সময় বৌদ্ধগণের উৎপীড়ন আরম্ভ হইয়াছিল, সেই সময় বাঙ্গালী বৌদ্ধগণ ভারত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে এবং ব্রহ্মদেশে গিয়া আশ্রয় লন। তাঁহাদের স্মৃতি এখনও বিদ্যমান আছে। তামিল-দেশের প্রাচীন গৌরবের যে নিদর্শন আছে, এবং অধুনা ইউরোপীয়গণ পর্য্যন্ত অনেকে যে তামিল-দেশের সভ্যতাকে ভারতের আদি-সভ্যতা বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন, বঙ্গদেশান্তর্গত তাম্রলিপ্তের প্রভাব সেখানে বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া বুঝিতে পারি। চোল-রাজগণ বঙ্গদেশেই উদ্ভূত হন। রাজামহেন্দ্রী নগরী সেই বংশেরই কোন ধুরন্ধর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। যবদ্বীপে, বলিদ্বীপে, সুমাত্রায়, জাপানে—বাঙ্গালীর উপনিবেশ-নিদর্শন এখনও একেবারে লোপ পায় নাই। জাপানের 'শিন্তো-ইজ্‌ম্‌' (Shintoism) ধর্ম্ম, হিন্দুদিগের—বাঙ্গালীদিগের পিতৃ-পিতামহের শ্রাদ্ধ-ক্রিয়ার অনুসরণ ভিন্ন অন্য আর কিছুই নহে। কালস্রোতে পরিচয়-চিহ্ন প্রায় সকলই ভাসিয়া গিয়াছে; নচেৎ, প্রাচীন মহাদেশের ও নূতন মহাদেশের সর্ব্বত্রই বাঙ্গালীর গতিবিধি ছিল।

চীনের সহিত বাঙ্গালার বাণিজ্যের বিষয়, বিভিন্ন জনপদে বঙ্গের ধর্ম্মপ্রচারকগণের গতিবিধি এবং বঙ্গদেশের অর্ণবপোত নৌবল প্রভৃতির বিষয় আলোচনা করিলে, বাঙ্গালীর কৃতিত্ব-পরিচয় বিশেষরূপেই প্রাপ্ত হই। প্রাচীনকালে চীন-দেশের বাণিজ্যে যে সকল অর্ণবপোত গতিবিধি করিত, তৎসমুদায় ভারতেরই অর্ণবপোত। এ প্রসঙ্গের আলোচনা পূর্ব্বেই হইয়াছে। এখন আবার বলিতেছি,—সেই সকল পোতের অধিকাংশই বঙ্গদেশের পোত। বঙ্গের নামে যে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, চীনদিগের উচ্চারণের অনুসরণে যে উপনিবেশের 'লঙ্গ' নাম সূচিত হইয়া থাকে, ইদানীন্তন কালে চীনের সহিত বাঙ্গালার বাণিজ্য-সম্বন্ধের সেই বোধ হয় প্রথম সূচনা। যখন বাঙ্গালী কর্ত্তৃক সে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়, বাঙ্গালার নির্ম্মিত অর্ণবপোতই প্রথম গতিবিধি করিয়াছিল বুঝা যায়। বাঙ্গালায় পোত-নির্ম্মাণের প্রতিষ্ঠা—বহু দিন হইতে। এক সময়ে তুরস্কের সুলতান বাঙ্গালা দেশ হইতেই পোত নির্ম্মাণ করিয়া লওয়া সুবিধাজনক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কোথায় সুলতানের রাজধানী, আর কোথায় বাঙ্গালা দেশ! তত দূরদেশ হইতে বাঙ্গালার পোত-নির্ম্মাণের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছিল,—ইহাতেই বঙ্গদেশের অর্ণবপোত ও নৌবল প্রভৃতির আভাস পাওয়া যায়। †

বাণিজ্য-বিনিময় অর্ণবযান প্রভৃতি।

* Sir A. Phayre s *History of Burma.*

† এই পরিচ্ছেদের ১৯৭ পৃষ্ঠায় এতদ্বিবরণ দ্রষ্টব্য।

বাঙ্গালার কত প্রকার জলযান প্রস্তুত হইত এবং কত দূরদেশে তৎসমুদায়ের গতিবিধি ছিল, প্রাচীন বাঙ্গালার কবিগণের কাব্য-গ্রন্থের মধ্যেও সে পরিচয় দেদীপ্যমান দেখিতে পাই। মনসা-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে প্রাচীন কবিগণের গ্রন্থে শ্রীমন্ত সদাগর, চাঁদ সদাগর, ধনপতি সদাগর প্রভৃতির বাণিজ্য-বিবরণ পরিবর্ণিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে প্রোক্ত কবিগণের বিদ্যমানতার বিষয় প্রতিপন্ন হইলেও, তাঁহাদের বর্ণিতব্য ঘটনা যে পূর্ব্ববর্ত্তিকালের, তাহা স্বতঃই প্রতিপন্ন হয়। কবি নারায়ণদেব চাঁদ সদাগরের সমুদ্র-যাত্রার বিশদ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। নারায়ণদেব খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। কবি বংশীদাস পদ্মাপুরাণ বিরচণ করেন। তাহাতেও সমুদ্র-যাত্রায় বাণিজ্যের বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। কেতকা-দাস ও ক্ষেমানন্দ বিরচিত 'মনসার ভাসান' গ্রন্থেও চাঁদ সদাগরের নানা দেশে বাণিজ্যের বিষয় অবগত হই। কবিকঙ্কণ চণ্ডী-কাব্যে ধনপতি সদাগরের ও শ্রীমন্ত সদাগরের সিংহলাদি দূরদেশে বাণিজ্যের বিষয় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। শুক্তি, মুক্তা, গজদন্ত, ঘোটক, হস্তী প্রভৃতির আমদানী রপ্তানি চলিত,—চণ্ডী-কাব্যে এ বর্ণনা দেখিতে পাই। সিংহলে বাণিজ্য করিতে গিয়া শ্রীমন্ত সদাগর কোন্ দ্রব্যের বিনিময়ে কোন্ দ্রব্য পাইবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কবিকঙ্কণে বাণিজ্য-বিনিময়-প্রসঙ্গে এইরূপ বিবৃত আছে;—

"বদল আশে নানা ধন এনেছি সিংহলে। যা দিলে যা বদল হবে শুনহ কুতূহলে॥

কুরঙ্গ বদলে, তুরঙ্গ দিবে, নারিকেল বদলে শঙ্খ।
বিড়ঙ্গ বদলে, লবঙ্গ দিবে, শুঁঠের বদলে টঙ্ক॥
প্লবঙ্গ বদলে, মাতঙ্গ দিবে, পায়রার বদলে শুয়া।
গাছফল বদলে, জায়ফল দিবে, বয়রায় বদলে গুয়া॥
সিন্দূর বদলে, হিঙ্গুল দিবে, গুঞ্জার বদলে পলা।
পাট শণ বদলে, ধবল চামর, কাচের বদলে নীলা॥
লবণ বদলে, সৈন্ধব দিবে, সুফলার বদলে জীরা।
আকন্দ বদলে, মাকন্দ দিবে, হরিতাল বদলে হীরা॥
চইয়ের বদলে, চন্দন দিবে, পাগের বদলে ঘড়া।
শুকুতার বদলে, মুকুতা দিবে, ভেড়ার বদলে ঘোড়া॥
চিনির বদলে, দান কর্পূর, আলতার বদলে লাটী।
সগল্লাদ বদলে, পামরি দিবে, কম্বল বদলে পাটী॥
হলুদ বদলে, গোরোচনা দিবে, কুরুতার বদলে সানা।
সরিষার বদলে পারা দিবে, রাংতার বদলে সোনা॥
মাস, মসূরী, তণ্ডুল, মধুরী, বরবটী বাটুলা চিনা।
বদল শকটে তৈল ঘৃত ঘটে, বহুতর এনেছি কিনা॥
গোধূম যব আর্দ্রক সর্ষপ, মুগ, তিল, মারুয়া ছোলা।
কিনিয়া সদাগর এনেছে বহুতর, লবণের পাতিয়া গোলা॥"

কত দূরদেশে কতপ্রকার পণ্যের বিনিময়-বাণিজ্য চলিত, উদ্ধৃত অংশে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। চীনদেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য-ব্যপদেশে যে উপঢৌকন-প্রদান-প্রথার পরিচয় পাইয়াছি, শ্রীমন্তের বাণিজ্যে সেইরূপ 'ভেট' দান প্রথা দেখিতে পাই।* ইহাতে বঙ্গদেশের বণিকগণ কর্ত্তৃক চীনদেশে রাজতুষ্টির জন্য উপঢৌকন-দানের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল অনুমান হয়। বাঙ্গালীর উপনিবেশ-প্রতিষ্ঠার ও উপঢৌকন-দান-প্রথার প্রভাবেই চীনের সহিত এ দেশের বাণিজ্য-সম্বন্ধ দৃঢ় হইয়া আসিয়াছিল। সে সময় পৃথিবীর যে সকল বিভিন্ন জাতির সহিত বাঙ্গালার বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল, কবিকঙ্কণে তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ অংশে বাঙ্গালী বাণিজ্য করিতে যাইত, তাহারও নিদর্শন দেখিতে পাই। পূর্ব্ব উপকূলের প্রায় সমস্ত বন্দর এবং সিংহল অতিক্রম করিয়া পশ্চিম উপকূলে গুজরাট-দেশে বাঙ্গালার অর্ণবপোত গতিবিধি করিত, —চণ্ডী-কাব্যে সে বর্ণনাও দৃষ্ট হয়। কত প্রকার সুদৃশ্য ও দ্রুতগতিবিশিষ্ট পোত এদেশে প্রচলিত ছিল, বিজয় গুপ্ত প্রণীত 'মনসামঙ্গলে' তাহার একটু বর্ণনা আছে। সে বর্ণনা,

"প্রথম তুলিল ডিঙ্গা নাম মধুকর। শুধাই সুবর্ণে তার বসিবার ঘর।
আর ডিঙ্গা তুলিলেক নাম দুর্গাবর॥ তবে তোলে ডিঙ্গাখানি নাম গুয়ারেখি।
দ্বিপ্রহরের পথে যার মাথা কাঠ দেখি॥ আর ডিঙ্গা তুলিলেক নাম শঙ্খচূড়।
আসি গজপাণি ভাঙ্গি গাঙ্গে লয় কূল॥ তবে ডিঙ্গাখান তোলে নাম সিংহমুখী।
সূর্য্যের সমান রূপ করে ঝিকিমিকি। আর ডিঙ্গা তুলিলেক নাম চন্দ্রপান।
তাথে ভরা দিলে কূলে হয় থান॥ আর ডিঙ্গা তুলিলেক নাম ছোটমুখী।
তাহে চালু ভরা চাহে হাজার এক পুটী॥ সম ধুনা দিয়া তবে গাইল সাত নায়।
তড়িৎ গমনে ডিঙ্গা সাজিয়া চালায়॥ সাতখানি ডিঙ্গা ভাসে ভ্রমরার জলে।
গোঁজে বাঁধি রাখে ডিঙ্গা লোহার শিকলে॥ তার পিছে চলে ডিঙ্গা নাম চন্দ্রপাট।
যাহার উপরে চাঁদ মিলাইছে হাট॥"

বিজয় গুপ্ত চারি শত বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি যে সকল অর্ণবপোতের নাম করিয়াছেন, সেই সকল অর্ণবপোতের বিবরণ অন্যান্য প্রাচীন কবিদিগের গ্রন্থেও দৃষ্ট হয়। 'মধুকর' নামক তিনি যে প্রথম পোতের উল্লেখ করিয়াছেন, কবিকঙ্কণে ধনপতি সদাগরের সিংহল-যাত্রার কালে সেই 'মধুকর' নামধেয় অর্ণবপোতের পরিচয় পাই। তাঁহার ছয়খানি তরী ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতে জলমগ্ন হইলে, এক 'মধুকর' পোত অব্যাহত ছিল। যথা;—

"হংস-ডিম্ব হেন ডিঙ্গা মধুকর ভাসে। ঝলকে ঝলকে জল লয় চারি পাশে।
ঘুরণীয়া ঝড়ে ডিঙ্গা ঘন দেয় পাক। পাকে ফিরে ডিঙ্গা যেন কুম্ভারের চাক॥
সবেমাত্র রহিল একলা মধুকর। গাইল পাঁচালি মুকুন্দ কবিবর॥"

মনসার ভাসান, পদ্মাপুরাণ আর আর যে যে কবি রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের রচনায়ও 'মধুকর', 'মহাজ্ঞান' প্রভৃতি অর্ণবপোতের বর্ণনা আছে। কিবা পশ্চিম-বঙ্গের কবিগণের কিবা পূর্ব্ববঙ্গের কবিগণের সকলেরই বর্ণনায় সমুদ্র-যাত্রার উপযোগী

* যথা,—"গৌড় হইতে আইল সাধু নাম প্রিয়পতি। নানাদ্রব্য ভেট দিয়া করিল প্রণতি।" ইত্যাদি।

তরণী-সমূহের পরিচয় পাই। কেবল বাণিজ্য-তরী বলিয়া নহে;—বাঙ্গালায় জলযুদ্ধের উপযোগী তরণী-সমূহ সর্ব্বদা প্রস্তুত হইত এবং কি স্বদেশে কি বিদেশে বাঙ্গালী নৌযুদ্ধে অতি-বড় পরাক্রান্ত শত্রুরও সম্মুখীন হইতে সমর্থ ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে সকল অর্ণবপোতের এখন আর কোনই অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

বিবিধ কৃতিত্ব-পরিচয়।

প্রাচীন বাঙ্গালার কৃতিত্বের পরিচয় কোন্ বিভাগে না দেখিতে পাই? সমুন্নত সুসভ্য সমাজের স্পর্দ্ধার সামগ্রী যাহা কিছু, প্রাচীন বাঙ্গালায় তাহার সকলই বিদ্যমান ছিল। দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান-কাল-প্রচলিত বাঙ্গালার ইতিহাসে সে পরিচয় অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না;—সে সংবাদ পাইবার জন্য, অন্য দেশের অতীত ইতিহাসের আশ্রয় লইতে হয়। বাঙ্গালার শিল্প—বাঙ্গালার স্থাপত্য কি ভাবে বিভিন্ন-দেশে প্রচারিত হয়, সে আভাস পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছি। অধিক অনুসন্ধানের আবশ্যক নাই;—এক সিংহল-দ্বীপের প্রাচীন ইতিহাস আলোড়ন করিলেই বিভিন্ন-বিভাগে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠার পরিচয় প্রাপ্ত হই। বাঙ্গালীর সিংহল-দ্বীপ অধিকার হইতেই সিংহল জ্ঞান-বিজ্ঞানের নবীন আলোকে আলোকিত হয়। সিংহল-বাসীর প্রায় সকল সদনুষ্ঠানের মূলে বাঙ্গালীর প্রভাব প্রত্যক্ষীভূত। একটী প্রধান দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। অনেকের বিশ্বাস, দাতব্য-চিকিৎসালয়াদি প্রবর্ত্তনার মূল—পাশ্চাত্য-জাতি। অথচ, পাশ্চাত্য-প্রভাবের বহু পূর্ব্বে সিংহলে দাতব্য-চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। সিংহলের ইতিহাসে দেখিতে পাই, খৃষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে * 'রাজা পাণ্ডুকাভয়' সিংহলে দাতব্য-চিকিৎসালয় (হাঁসপাতাল) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহার পর. সিংহল-রাজ 'তিশা' সিংহলে দাতব্য-চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন করেন। ২৯৭-২৫৬ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে রাজা 'তিশার' বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন হয়। ইহার পর, রাজা 'দুথ-গামানী' আঠারটী ভিন্ন ভিন্ন নগরে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া যথারীতি তাহার ব্যয়াদি নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। সেই চিকিৎসালয়-সমূহে রোগীদিগের বাস-স্থান, আহার্য্য-দ্রব্য এবং ঔষধাদি প্রদান করা হইত। অভিজ্ঞ ভিষকগণ সেই সকল চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন। রাজা দুথ-গামানী ১৬১-১৩৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করেন। রাজা 'লাজ্জিতিস্সো' (১১৯-১০৯ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে), রাজা 'বাসব' (৬৬ খৃষ্টাব্দে) প্রভৃতির রাজত্ব-কালেও ঔষধাদি বিতরণের ব্যবস্থা ছিল। রাজা 'বুদ্ধদাস' ৩৪১ খৃষ্টাব্দ হইতে ৩৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার সময়ে সিংহলে প্রায় সমস্ত গ্রামে দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছিল। উক্ত বুদ্ধদাসের দ্বিতীয় পুত্র রাজা 'উপাতিস্স' নানা-শ্রেণীর চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। অন্ধের জন্য, খঞ্জের জন্য, গর্ভবতী স্ত্রীলোকের জন্য, তিনি ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ৩৬৮ হইতে ৪১০ খৃষ্টাব্দ তাঁহার রাজত্ব-কাল। রাজা 'মহানাম' (৪১০

সুসভ্য সমাজের স্পর্দ্ধার সামগ্রী।

সিংহলে হাঁসপাতাল

* টার্ণারের মতে ৪৩৭ হইতে ৩৬৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে এবং মুলায়ের মতে ৩৬৭ হইতে ৩০৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে রাজা পাণ্ডুকাভয় বিদ্যমান ছিলেন।

খৃষ্টাব্দ), রাজা 'ধাতুসেন' (৪৫৯ খৃষ্টাব্দ), রাজা 'উদনায়' (খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে) প্রভৃতিও দাতব্য-চিকিৎসালয়াদি প্রতিষ্ঠায় ও পরিচালনায় যশস্বী হন। রাজা 'দাপ্‌লা' (দ্বিতীয়) পিত্তল-নির্ম্মিত প্রাসাদের এবং অনুরুদ্ধপুরের 'দাগোবা' প্রভৃতির সংস্কার জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি—হাঁসপাতাল-স্থাপনে এবং সিংহলের তাৎকালিক রাজধানী 'পোল্লোনারোয়া' নগরে ভৈষজ্য-বিদ্যালয় (মেডিকেল কলেজ) প্রতিষ্ঠায়। রাজা দ্বিতীয় 'দাপ্‌লা', টার্ণারের মতে ৭৯৫ খৃষ্টাব্দে এবং পার্কারের মতে ৭০৭-৮১০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। * রাজা তৃতীয় 'দাপ্‌লা' ৮২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি 'পুলাস্তি' এবং 'পাণ্ডুভিয়' নগরে দাতব্য-চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অন্ধখঞ্জগণের জন্য তৎকর্ত্তৃক বিভিন্ন স্থানে হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজা 'শীলমেঘ সেন' (৮৪৬-৮৬৬ খৃষ্টাব্দ), 'রাজা সেন' (দ্বিতীয়), 'কশ্যপ' (চতুর্থ), 'কশ্যপ' (পঞ্চম), 'রাজা মাহিন্দ' (চতুর্থ), 'শ্রীসজ্ঞ' প্রভৃতিও সিংহলে দাতব্য-চিকিৎসালয়াদি স্থাপনের জন্য প্রতিষ্ঠান্বিত হন। রাজা 'চতুর্থ মাহিন্দ' (৯৭৫-৯৯১ খৃষ্টাব্দে) দরিদ্রগণকে ভিক্ষাদানের ও আশ্রয়দানের জন্য এবং রোগীদিগের ঔষধ ও শয্যা প্রভৃতির সুব্যবস্থায় যশস্বী হইয়াছিলেন। এইরূপ প্রত্যেকেরই কার্য্যে কিছু-না-কিছু অভিনবত্বের পরিচয় ছিল। পূর্ব্বোক্ত নৃপতিগণের পর রাজা পরাক্রমবাহু (১১৬৪-১১৯৭ খৃষ্টাব্দে) রোগীর চিকিৎসাদির যে সকল সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। রোগিগণের অবস্থিতির জন্য তিনি বিশাল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। সেই অট্টালিকায় শত শত রোগী সর্ব্বদা স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি করিত। প্রত্যেক রোগীর শুশ্রূষার জন্য পরিচারক ও পরিচারিকার ব্যবস্থা ছিল। রাজা পরাক্রমবাহু বিভিন্ন স্থানে ভাণ্ডার-সকল প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সকল ভাণ্ডারে খাদ্য-শস্য প্রভৃতি সংগ্রহ থাকিত এবং ঔষধের উপযোগী দ্রব্য-সমূহ সংরক্ষিত হইত। বিজ্ঞ ও বহুদর্শী চিকিৎসকগণের প্রতিপালনের জন্য তাঁহার সুব্যবস্থা ছিল। রোগের কারণ-নির্ণয়ে-পারদর্শী নিদান-তত্ত্ববিৎ ভিষকগণ তাঁহার রাজধানীতে সমাদৃত ছিলেন। যে রোগীর চিকিৎসায় যেরূপ যত্ন প্রয়োজন, চিকিৎসকগণের প্রতি তিনি সেইরূপ তত্ত্বাবধানের ভারার্পণ করিয়াছিলেন। রাজা পরাক্রমবাহুর পরবর্ত্তী সিংহলের অধিপতিগণের কৃতিত্ব-কাহিনী উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। সে সকল ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য-প্রভাবের কল্পনা মনে স্থান পাইলেও পাইতে পারে ; কিন্তু রাজা পাণ্ডুকাভয় হইতে রাজা পরাক্রমবাহু পর্য্যন্ত যে সকল নৃপতির কৃতিত্ব-কাহিনী উল্লেখ করা গেল, তাঁহাদের কাহারও উপর পাশ্চাত্য-প্রভাব পতিত হইয়াছিল বলিয়া কোনক্রমেই সিদ্ধান্ত করা যায় না। সুতরাং দাতব্য-চিকিৎসালয়াদির প্রতিষ্ঠায় সিংহলে পাশ্চাত্য-প্রভাব কখনও বিস্তৃত হয় নাই বলা যাইতে পারে। এখন কেহ হয় তো জিজ্ঞাসা করিতে পারেন,—'তাহা না হয় নাই হইল ; কিন্তু বাঙ্গালীর কৃতিত্বের কথা এখানে কি করিয়া আসিতে পারে ?' আমরা বলি,—'বঙ্গদেশই সিংহলের সকল সদনুষ্ঠানের মূলীভূত।' পাশ্চাত্য-জাতির সহিত সম্বন্ধ-সংশ্রবের

* Turnour's *Epitome of the History of Ceylon* and Parker's *Ancient Ceylon.*

বহুপূর্ব্বে এই বঙ্গদেশে হাঁসপাতাল বা দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা ছিল। কেবল মনুষ্যের জন্য চিকিৎসালয় নহে;—পশ্বাদির চিকিৎসার জন্যও এদেশে চিকিৎসালয়াদির বিদ্যমানতার প্রমাণ পাওয়া যায়। চৈন-পরিব্রাজক ফা-হিয়ান যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন, তিনি মগধে এবং বঙ্গদেশে দাতব্য-চিকিৎসালয়াদি দর্শন করিয়াছিলেন। দরিদ্রের জন্য, পিতৃমাতৃহীন বালকের জন্য, খঞ্জের জন্য এবং সর্ব্বপ্রকার পীড়িত ব্যক্তির জন্য তখন বাসস্থান, ঔষধ ও পথ্য দিবার ব্যবস্থা ছিল। * দাতব্য-চিকিৎসা প্রভৃতির শেষ-স্মৃতিচিহ্ন—বৃটীশ-রাজত্ব-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে এদেশের হিন্দু-নৃপতিগণের মধ্যে সেদিন পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বিশেষ বিশেষ স্থানে দাতব্য-চিকিৎসালয়াদি প্রতিষ্ঠা করিয়াও তাঁহারা নিরস্ত হন নাই; পরন্তু যে প্রদেশে যে গ্রামে যখনই কোনরূপ ব্যাধির উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে, চিকিৎসক, ঔষধ ও পথ্য প্রেরণ করিয়া সেই সকল স্থানে তাঁহারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। অধিক দিনের কথা নহে; অনেকের পরিদৃষ্ট ঘটনা—অর্দ্ধবঙ্গেশ্বরী মহারাণী ভবানী তাঁহার প্রজাবর্গের সুচিকিৎসার জন্য অনেক সময় এই উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। মহারাণী ভবানীর ইতিবৃত্ত অনুসন্ধানে প্রাচীন কাগজপত্রে এ সকল ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এ প্রসঙ্গ আধুনিক বলিয়া অনেকের নিকট উপেক্ষিত হইতে পারে; সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তিকালের প্রামাণ্য ঘটনা কি আছে, অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক। রাজচক্রবর্ত্তী অশোক খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতে একছত্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি যখন যে দেশ অধিকার করেন, যখন যেদেশে তাঁহার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হয়, তত্তৎদেশে তিনি কতিপয় ঘোষণা-বাণী প্রচার করেন। তাঁহার সে সকল ঘোষণা-বাণী—কতক বা পর্ব্বতগাত্রে, কতক বা স্তম্ভগাত্রে খোদিত হইয়াছিল। অধুনা অশোকের ঘোষণাবাণী-জ্ঞাপক যে সকল খোদিত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে পর্ব্বত-গাত্রে খোদিত চৌদ্দটী এবং স্তম্ভগাত্রে খোদিত আটটী ঘোষণাবাণী বিশেষ প্রসিদ্ধ। প্রথমোক্ত চৌদ্দটী ঘোষণাবাণীর অন্তর্গত পাঁচটী প্রায় একই আদর্শমূলক। সেই পাঁচটী ঘোষণা-বাণী ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নিম্নলিখিত স্থান-সমূহে আবিষ্কৃত হইয়াছে। একটী ঘোষণাবাণী আবিষ্কৃত হয়—'কাপুর-দা-গিরি' সন্নিকটে। সিন্ধু-তীরস্থিত আটক-সহরের উত্তর-পশ্চিমে পঁচিশ মাইল দূরে সীমান্ত-প্রদেশে ঐ গিরিগুহা অবস্থিত। দ্বিতীয় ঘোষণা প্রচারের স্থান—খাল্‌সির সন্নিকট। হিমালয় পর্ব্বতের উচ্চতর ক্ষেত্র হইতে যেখানে যমুনা-নদী বিনির্গত হইয়াছে, সেই অংশ অধুনা খাল্‌সি নামে পরিচিত। খাল্‌সির যে অংশে অশোকের খোদিত-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, মুসোরী হইতে সেই স্থান পনের মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। যমুনার সহিত যেখানে 'টন্‌' নদীর মিলন ঘটিয়াছে, তাহার কিছু উপরে (উত্তরে) ব্যাস ও হরিপুর নামক ক্ষুদ্র পল্লীদ্বয়ের মধ্যস্থলে এই ঘোষণা-বাণী আবিষ্কৃত হয়। এই ঘোষণা-বাণী—আলোচ্য প্রসঙ্গের বিষয়ীভূত। এই ঘোষণা-বাণীতে এদেশে হাঁসপাতাল প্রভৃতির বিদ্যমানতা বিশেষরূপেই হৃদয়ঙ্গম হয়। এতদ্ভিন্ন, অপর যে তিনটী খোদিত লিপির বিষয়

হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠায় বঙ্গের প্রভাব।

অশোকের ঘোষণা-বাণী।

* Vide the *Pilgrimage of Fa-Hian* (Bangabasi edition), chap. xxvii.

উক্ত হইল, তাহার একটী গুজরাট দেশে—'গির্ণার'-পর্ব্বতে। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সোমনাথ-মন্দিরের প্রায় চল্লিশ মাইল উত্তরে উহা অবস্থিত। চতুর্থ ঘোষণাবাণী—উড়িষ্যার 'ধাউলি' নামক স্থানে। কটক-সহরের কুড়ি মাইল দক্ষিণে উহা অবস্থিত। পঞ্চম লিপি চিল্কা-হ্রদের সন্নিকটে 'জৌগর' নামক স্থানে আবিষ্কৃত হয়। ঐ স্থান—বর্ত্তমান গঞ্জাম-সহরের উত্তর-পশ্চিমে আঠার মাইল দূরে অবস্থিত। পর্ব্বত-গাত্রাঙ্কিত চতুর্দ্দশ ঘোষণাবাণীর মধ্যে পূর্ব্বোক্ত পাঁচটী বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের আধিপত্য ঘোষণা করিতেছে। উহার মধ্যে খাল্‌সির দ্বিতীয় ঘোষণাপত্রে কি কি বিষয় লিখিত আছে, অনুধাবন করিয়া দেখুন; তাহাতে এদেশের দাতব্য-চিকিৎসালয়াদির প্রভাব কত দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, বুঝিতে পারিবেন। সেই ঘোষণা-বাণীর মর্ম্ম ;—'রাজা পিয়দসী, দেবগণের প্রিয়; চোল, পাণ্ড্য প্রভৃতি সীমান্ত জাতির, সত্যপুত্রের ও কেরলপুত্রের দেশের, তাম্বপর্ণি প্রভৃতি রাজ্যের এবং গ্রীক-রাজ অ্যান্টিওকস্ শাসিত জনপদের—সকলেরই প্রিয়-পাত্র। দেবগণের এবং সর্ব্বজনের প্রিয়পাত্র পিয়দসী, আপন রাজ্যের সর্ব্বত্র এবং পূর্ব্বোক্ত

মনুষ্যের ও পশ্বাদির চিকিৎসা-ব্যবস্থা।

রাজ্যসমূহে দ্বিবিধ ভেষজ সরবরাহ করেন; তিনি যেমন মনুষ্য-দিগের জন্য ঔষধ বিতরণ করেন, পশ্বাদির জন্যও সেইরূপ ঔষধ বিতরণ করেন। মনুষ্যের কিম্বা পশ্বাদির ভৈষজ্যোপযোগী কোনও বৃক্ষ-লতা প্রভৃতির কোথাও অভাব থাকিলে, তিনি সেই সেই স্থানে তাহা প্রেরণ করেন ও রোপণের ব্যবস্থা করিয়া দেন। কোথাও কোনও ফলমূলের অভাব ঘটিলে, তাহাও তিনি সেই স্থানে প্রেরণ করেন ও উৎপন্ন করাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। তিনি মনুষ্যের ও পশ্বাদির জন্য রাজপথে মধ্যে মধ্যে কূপ খনন করাইয়া দিয়াছেন।' ইত্যাদি। খাল্‌সির খোদিত লিপির ইহাই স্থূল মর্ম্ম। বুঝিয়া দেখুন,—এই ঘোষণাবাণীতে কোন্ তত্ত্ব অবগত হই! তাঁহার ঔষধ-বিতরণ-প্রথা কেবল আপনার রাজ্য-মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না; পরন্তু তিনি পারিপার্শ্বিক রাজন্যবর্গের রাজ্য-মধ্যেও ঔষধাদি বিতরণ করিয়া সকলেরই প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। এই ঔষধ-বিতরণ-উপলক্ষে দাতব্য-চিকিৎসালয় (হাঁসপাতাল) প্রতিষ্ঠার বিষয়ই উপলব্ধি হয়। কেবল মনুষ্যের জন্য নহে;—পশ্বাদির চিকিৎসার জন্যও হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল,—ঘোষণাবাণীতে প্রতিপন্ন হইতেছে। * ইউরোপে খৃষ্ট-জন্মের

---

* খাল্‌সির খোদিত লিপির পাঠোদ্ধার ও অনুবাদ-পক্ষে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অশেষ আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। জেমস্ প্রিন্সেপ প্রথমে একরূপ অনুবাদ করেন। (Vide *Journal of the Royal Asiatic Society*, Vol. vii, p 7,8) তাহার পর উইলসন্, বার্ণুফ, লাসেন, কার্ণ, সেনার্ট প্রভৃতি মস্তিষ্ক আলোড়ন করিয়া সংস্কৃত পাঠ প্রকাশ করিয়াছিলেন। উঁহাদের মধ্যে সেনার্টের অনুবাদই এক সময়ে প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। সে অনুবাদের কিয়দংশ,—"King Piyadasi, beloved of the Gods, has provided medicines of two sorts, medicines for men and medicines for animals." উপরে ঘোষণাবাণীর যে বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, বলা বাহুল্য, তাহা সেনার্টের অনুসরণে লিখিত। কিন্তু ঐরূপ অর্থোপলব্ধি সম্বন্ধে বিতর্ক আছে। কেহ বলেন,—পালিভাষায় যে শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহাতে কেবল ঔষধ বিতরণের বিষয় উপলব্ধি হয়, দাতব্য চিকিৎসালয় বা হাঁসপাতাল প্রভৃতির ভাব মনের মধ্যে আসিতে পারে না। কিন্তু অধ্যাপক বুলার এবং ভিন্সেণ্ট স্মিথ এ সম্বন্ধে পরিশেষে যাহা লিখিয়া

পরবর্ত্তিকালে সপ্তম শতাব্দীতে প্রথম হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারী-নগরে 'মেসন ডিউ' নামক হাঁসপাতালই ইউরোপের প্রথম হাঁসপাতাল বলিয়া পরিচিত। * সুতরাং পাশ্চাত্যের প্রভাব বিস্তৃত হইবার কত পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে দাতব্য-চিকিৎসালয়াদি প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। আরও পূর্ব্বের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে আমরা বুঝিতে পারি, অশোকই যে এদেশে দাতব্য-চিকিৎসালয়াদির প্রবর্ত্তক ছিলেন, তাহা নহে; অশোকের পূর্ব্বপুরুষ চন্দ্রগুপ্তের সময়ে ভারতবর্ষে দাতব্য-চিকিৎসালয়াদির অসদ্ভাব ছিল না। চাণক্য-প্রণীত 'অর্থশাস্ত্রে' সে প্রমাণ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। প্রতি সুরক্ষিত নগরে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল।

নগর-প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি।

নগরের কোন্ স্থানে কোন্ শ্রেণীর লোক বাস করিত, নগরের কোন্ পল্লীতে কোন্ শ্রেণীর কার্য্যালয়াদি স্থান পাইয়াছিল,—অর্থশাস্ত্রে দুর্গ-নিবেশ-প্রসঙ্গে তাহা বিশদভাবে বিবৃত রহিয়াছে। প্রাচীন-কালে নগর-সমূহ কি পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত হইত, নগর-সমূহে কেমন সুশৃঙ্খলায় জনসমাবেশ সন্নিবিষ্ট থাকিত, তাহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। নগরে মধ্যস্থলে রাজকীয় বিভিন্ন-শ্রেণীর প্রাসাদ-সমূহ শোভমান ছিল। নগরের বিভিন্ন কোণে বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্পিগণের বিভিন্ন সমাজ বাস করিত। উত্তরের দিকে, বিভিন্ন অংশে, কোথাও কর্ম্মকারগণ, কোথাও সূত্রধরগণ, কোথাও জহুরিগণ, কোথাও বা ব্রাহ্মণগণ বসতি করিতেন। নগরের পশ্চিমাংশে—পশমী সূত্রের, কার্পাস-সূত্রের, দর্ম্মার, চামড়ার, যুদ্ধ-সজ্জার, অস্ত্র-শস্ত্রের, দস্তানা প্রভৃতির ব্যবসায়ী শিল্পিগণ এবং শূদ্রগণ বাস করিত। নগরের দক্ষিণাংশ—নগরাধ্যক্ষ, পণ্যাধ্যক্ষ, শিল্পশালাধ্যক্ষ এবং সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভৃতির জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল; মদ্যমাংস ও অন্ন-ব্যবসায়িগণ, গণিকাগণ, গায়কগণ এবং বৈশ্যজাতীয় জনগণ ঐ অংশেই বসবাস করিতেন। নগরের পূর্ব্বাংশ—গন্ধদ্রব্যের, পোষাকের, শস্যের, তরল পদার্থের ব্যবসায়িগণের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল; ঐ অংশে সুদক্ষ শিল্পিগণ এবং ক্ষত্রিয়-জাতীয় জনগণ বাস করিতেন। ধনাগার, হিসাব-নিকাশের

করিয়াছেন, তাহাই এখন সর্ব্ববাদিসম্মত। অধ্যাপক বুলারের অনুবাদের কিয়দংশ,—"King Piyadasi beloved of the Gods, founded two kinds of hospitals, both hospitals for men and hospitals for animals."—(*Epigraphia Indica*, Vol. II, p. 449—Professor Buhler's translation of Rock Edict, II.) ভিন্সেণ্ট স্মিথ এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন,—"Those arrangements would include the provision of physicians and surgeons, and veterinary surgeons as well as the erection of hospitals and the supply of drugs and invalid diet. The objection to the translation, hospitals, is more formal than substantial, because a well-equipped hospital includes a supply of drugs and all necessary curative arrangements; but the more general term (curative arrangements) is preferable as comprehending all the measures taken by Asoka's Medical Department for the benefit of the sick and for the purpose of curing diseases."—*Indian Antiquary*, 1905, p. 245-248.

* "The earliest hospital in Europe the *Maison Dieu* of Paris is said to have been opened in the 7th century A. D."—*Early History of India* by Mr. Vincent Smith. এ মত অধুনা প্রচারিত হইতেছে; কিন্তু পূর্ব্বের মত (ভিন্সেণ্ট স্মিথেরই) দশম শতাব্দীতে ইউরোপে প্রথম হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়।

কার্য্যালয় এবং বিভিন্ন শিল্পালয় নগরের দক্ষিণাংশে; পূর্ব্ব-দিকে, প্রতিষ্ঠিত ছিল। নগরের উত্তরের দিকে, পশ্চিমাংশে, দোকান-সমূহ এবং দাতব্য-চিকিৎসালয় (হাঁসপাতাল) দৃষ্ট হইত।* এইরূপ নগরের অন্যান্য অংশেও কোথায় কাহার স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল, অর্থশাস্ত্রে (দ্বিতীয় খণ্ডে, চতুর্থ অধ্যায়ে) তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবৃত আছে। দেশ কত দূর সুসভ্য ও সমুন্নত হইলে নগর-নির্ম্মাণের এবম্বিধ শৃঙ্খলা সাধিত হয়, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। খৃষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্তের বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন হয়। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত এবং তাঁহার মন্ত্রী চাণক্য উভয়েই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ছিলেন। সুতরাং বেশ বুঝিতে পারা যায়, বৌদ্ধ-প্রভাবের পূর্ব্বে, দেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সুপ্রতিষ্ঠার দিনে, সুসভ্য-সমাজের অঙ্গীভূত দাতব্য-চিকিৎসালয়াদির অস্তিত্ব এদেশে ছিল। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে,—'মগধে চন্দ্রগুপ্তের চাণক্যের অভ্যুদয়-সময়ে দাতব্য-চিকিৎসালয়াদির অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয় বটে ; কিন্তু তাহাতে বঙ্গদেশের প্রাধান্য কি প্রকারে বুঝা যায় ?' এ প্রশ্নের উত্তর—বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা চিরদিন এক-সূত্রে সংগ্রথিত ছিল। বঙ্গের নৃপতি মগধাধি দেশের নৃপতি বলিয়া পরিচিত হইতেন, আবার মগধের নৃপতি বঙ্গের নৃপতি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। অনেক সময়ই এইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া থাকি। যিনি যখন একছত্র প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইতেন, তাঁহাকে তখন প্রদেশ-বিশেষের বা নগর-বিশেষের নৃপতি বলিয়া কখনই পরিচিত করা হইত না। সে হিসাবে, চন্দ্রগুপ্ত, অশোক প্রভৃতিকে বঙ্গাধিপতি বলিয়াও নির্দ্দেশ করিতে পারি। মগধের সহিত বঙ্গের চিরদিনই অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ ছিল। অপিচ, বঙ্গদেশে চন্দ্রগুপ্তের আবাস-ভবন ছিল বলিয়াও বুঝিতে পারা যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আলেকজাণ্ডার প্রভৃতির উচ্চারণে 'সান্দ্রোকোট্টাস' নামে যিনি অভিহিত হইয়াছিলেন, বাঙ্গালায় তিনি 'চন্দ্রকেতু' নামে পরিচিত ছিলেন। চন্দ্রকেতু হইতেই 'সান্দ্রোকোট্টাস' উচ্চারণ সম্ভবপর। চন্দ্রকেতু ও চন্দ্রগুপ্ত অভিন্ন-ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। যেমন মগধে, তেমনই বঙ্গদেশেও তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার বংশধরগণ পরবর্ত্তি-কালে বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া মগধে স্থায়ী হন। সুতরাং ক্রমে বঙ্গদেশে তাঁহাদের বাসস্থানের চিহ্ন লোপ পায় ;—মগধই তাঁহাদের পরিচয়ে প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়া উঠে। চন্দ্রগুপ্তের দক্ষিণ-হস্ত চাণক্যও বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত বলিয়া প্রতিপন্ন হন।† এ সকল বিষয়ে নানা বিতর্ক-বিতণ্ডা উপস্থিত হইতে পারে। সুতরাং, সেই বিতর্ক-বিতণ্ডা পরিহার উদ্দেশে, এতৎপ্রসঙ্গে সিংহলের প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করার আবশ্যক হয়। বিজয়সিংহের এবং তাঁহার পরবর্ত্তী বঙ্গীয় নৃপ-বংশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সিংহলে বিবিধ সদনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তনা হইয়াছিল। কাহারও কাহারও বিশ্বাস, বৌদ্ধ-

বঙ্গদেশের প্রাধান্য।

---

* অর্থশাস্ত্রের বঙ্গানুবাদে এই অংশ এখন পরিত্যক্ত দেখিতে পাই। মিঃ আর শ্যামশাস্ত্রী ইংরাজীতে অর্থশাস্ত্রের যে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে এই অংশ বাদ যায় নাই। Vide *Arthasastra* in the *Bibliotheca Sanskrita*, No. 37, edited by R. Shamsastry B. A.

† প্রসঙ্গান্তরে এ সকল বিষয় আলোচনা দ্রষ্টব্য।

প্রভাবের ফলে, সিংহলে দাতব্য-চিকিৎসালয়াদি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বিজয়সিংহের সিংহল অধিকারের পরবর্ত্তি-কালে, প্রায় আড়াই শত বৎসর কাল, খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত, সিংহলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে ঐ দ্বীপে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রথম প্রবেশ-লাভ করে। রাজা পাণ্ডুকাভয় যখন সিংহলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, তখন সিংহলে বৌদ্ধ-প্রভাব আদৌ বিস্তৃত হয় নাই। রাজা পাণ্ডুকাভয় ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের সেবক ছিলেন। বঙ্গদেশ হইতে প্রথমে যে ধর্ম্ম যে শিক্ষা যে ভাব সিংহলে পৌঁছিয়াছিল, তাঁহার সময়ে তৎসমুদায় বিকাশ-প্রাপ্ত হয়। তাহার পর ক্রমে ক্রমে সদ্ভাব-পরম্পরা কি ভাবে স্ফূর্ত্তি-লাভ করিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। রাজা পরাক্রমবাহুর সময়ে সিংহলে দাতব্য-চিকিৎসালয়াদির কিরূপ শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়, ইতিহাস তারস্বরে তাহা ঘোষণা করিতেছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠিতে পারে—'ইহাতেই বা বাঙ্গালীর কৃতিত্বের কথা কি আছে?' এই পরাক্রমবাহুর পরামর্শদাতা দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ কে ছিলেন, তদ্বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখুন;—বাঙ্গালীর কৃতিত্ব-প্রভাব অবশ্যই দেখিতে পাইবেন। তৎকালে সিংহলে ধর্ম্মালয়-সমূহের যিনি অধ্যক্ষ-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহারই সুপরামর্শের ফলে, সিংহলে প্রধানতঃ ঐ সকল সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত হয়। সেই ধর্ম্মাধ্যক্ষ বাঙ্গালী ছিলেন, বঙ্গদেশ হইতে তিনি সিংহলে গিয়াছিলেন, বঙ্গদেশের শিক্ষাই তাঁহার দ্বারা সিংহলে প্রচারিত হইয়াছিল। সেই বাঙ্গালী ধর্ম্মাধ্যক্ষের নাম—রামচন্দ্র কবিভারতী। তবেই বুঝুন, সিংহলের সেই সভ্য-সমুন্নত-সমাজে দাতব্য-চিকিৎসালয়াদি প্রবর্ত্তনার মূলে বঙ্গদেশের প্রভাব কেমন বিদ্যমান রহিয়াছে!

বঙ্গের নৌবল-বাহুবল।

নৌবলে বাহুবলে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব-নিদর্শন দূর-অতীতকাল হইতেই বিদ্যমান আছে। রঘুর দিগ্বিজয়ে বাঙ্গালীর নৌযুদ্ধ প্রভৃতির ইতিহাস, দূর-অতীত-কালের বিষয় বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু আধুনিক ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইবার উপযোগী বিবরণেরও অসদ্ভাব নাই। নৌবলের সাহায্যে বিজয়সিংহ সিংহল-দ্বীপে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, এ প্রসঙ্গ পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি; * পুনরুক্তি বাহুল্য মাত্র। সিংহলের প্রাচীনতম ইতিবৃত্ত 'মহাবংশে' বিজয়সিংহের সিংহল-বিজয় এবং সিংহলে তদ্বংশীয়গণের রাজত্ব-বিবরণ পরিবর্ণিত। বিজয়সিংহ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বংশই 'মহাবংশ' নামে পরিচিত এবং সেই বংশের ইতিহাস বলিয়াই গ্রন্থের নাম 'মহাবংশ'। মহাবংশে প্রকাশ,—'বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির অব্দে বিজয়সিংহ সিংহল-দ্বীপ অধিকার করেন।' বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি-সম্বন্ধে বিবিধ মত প্রচলিত। কোনও মতে, খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৫৪৩ অব্দে এবং কোনও মতে খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৫৭৭ অব্দে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-লাভ হইয়াছিল বলিয়া প্রচার আছে। যে হিসাবেই গণনা করা যাউক, প্রতিপন্ন হয়, যীশু-খৃষ্টের জন্মের প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের যুবরাজ কর্ত্তৃক এই সিংহল-বিজয়-ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। মহাবংশে লিখিত আছে,—সিংহল-বিজয়ী বিজয়ের পিতার নাম—'সিংহবাহু'। 'লাল'-দেশে সিংহবাহুর রাজধানী ছিল। তাঁহার রাষ্ট্রের নাম—'লাড়রট্ঠ।'

---

* এই পরিচ্ছেদের ১৪৩ হইতে ১৫৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

লাড়, লাঢ, লাল অভিন্ন। পালি-ভাষায় উচ্চারিত 'লাল'-দেশ রাঢ়দেশ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। রাঢ়দেশের কোন্ অংশে সিংহবাহুর রাজধানী ছিল, অবিসম্বাদিত-রূপে নির্দ্ধারিত হয় না। 'দেববংশম্' নামক কুল-গ্রন্থে 'লাট-গ্রাম' নামক এক প্রাচীন নগরের উল্লেখ দেখি। সামন্ত-রাজ দমুজারি বন্দ্য-বংশীয় দাশরথীর পঞ্চপুত্রকে পাঁচখানি গ্রাম প্রদান করেন। তাহারই একখানি গ্রামের নাম—'লাট-গ্রাম।' দমুজারি—রাজচক্রবর্ত্তী লক্ষ্মণ-সেনের সামন্ত-রাজ মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। কণ্টকদ্বীপ বা কাটোয়া তাঁহার রাজধানী ছিল। তাহাতে তাঁহার দান-দত্ত 'লাট-গ্রাম' কাটোয়ার সন্নিকটে রাঢ়ভূমের কোনও প্রাচীন গ্রাম বলিয়াই বুঝা যায়। দান-দত্ত গ্রাম-পঞ্চকের মধ্যে নৈহাটী নামক এক গ্রামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। নৈহাটী নামধেয় গ্রাম কাটোয়ার উত্তরে গঙ্গাতীরে আজিও বিদ্যমান আছে। তাহাতে 'লাট-গ্রাম' ঐ অঞ্চলেরই কোন প্রাচীন গ্রাম (এখন লোপ পাইয়াছে) বুঝা যায়। একজন অনুসন্ধিৎসু লেখক কিন্তু হুগলী-জেলার সিঙ্গুর-গ্রামকে সেই রাজধানী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সিংহবাহুর রাজধানী 'সিংহপুর' কালে 'সিঙ্গুর' নাম পরিগ্রহ করিয়াছে—ইহাই তাঁহার সিদ্ধান্ত।* কোন্ বন্দর হইতে যাত্রা করিয়া কোন্ পথে বিজয়সিংহ সিংহলে উপনীত হন, তৎসম্বন্ধে বিবিধ মত প্রচারিত আছে। এক মতে প্রচার,—তিনি সিংহপুর হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন; অন্য মতে প্রচার,—তিনি সমুদ্র-উপকূলস্থিত তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া সিংহলে উপনীত হন। বিজয়সিংহ নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র 'বাসুদেব' বঙ্গদেশ হইতে সিংহলে গমন করিয়া সিংহলের রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। বাসুদেব 'সাগল'-নগর হইতে যাত্রা করেন এবং তাঁহার সঙ্গে দ্বাত্রিংশ জন মন্ত্রী এ দেশ হইতে সিংহলে গিয়াছিলেন। 'সাগল'-নগর কোথায় ছিল? 'সাগল' ও 'সাগর' শব্দ অভিন্ন। সুতরাং মনে হয়, তিনি গঙ্গাসাগর হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন; অথবা, সাগরান্তক (সুখসাগর প্রভৃতি) কোনও গ্রাম হইতে অর্ণবপোতে আরোহণ করেন। বিজয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র যখন সিংহলের সিংহাসনে অধিরূঢ়, সেই সময়ে বঙ্গদেশ হইতে বহুবার বহু লোকজনের সিংহলে গতিবিধির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম, বঙ্গদেশের এক রাজপুত্রী সিংহলে যান। তাঁহার সহিত বিজয়ের সেই ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ হইয়াছিল। সেই রাজ-পুত্রীর অনুসরণে তাঁহার ছয়টি ভাই সিংহলে যাত্রা করেন। রাজপুত্রী এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ গঙ্গাতীরবর্ত্তী 'মোরাপুর'-নগর হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। বলা বাহুল্য, ঐ নগরের এখন স্থান-নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। গঙ্গাতীরে নবদ্বীপের উত্তরে রাঢ়ে 'মাথাপুর' নামে এক প্রাচীন পল্লী দৃষ্ট হয়। তাহাই 'মোরাপুর' রূপ গ্রহণ করিয়াছে কি না—কে বলিতে পারে? যাহা হউক, বিজয়সিংহের সিংহল-অধিকারের পর দ্বাবিংশ শত বৎসর, সিংহলে সিংহ-বংশীয় নৃপতিগণের আধিপত্য ছিল। সেই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বঙ্গদেশের সহিত সিংহলের সম্বন্ধ যে বিচ্ছিন্ন হয় নাই; তাহা বলাই বাহুল্য। দেশ-বিজয় উদ্দেশ্যেই যে বিজয়সিংহ সিংহলাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহা নহে। 'রাজাবলী'

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ত্রয়োদশ বর্ষ; 'রাঢ়দেশের দুই প্রাচীন রাজবংশ' প্রবন্ধ।

নামক সিংহল-দেশের রাজবংশ-সংক্রান্ত-গ্রন্থে প্রকাশ,—'যুবরাজ বিজয়সিংহ বঙ্গদেশে প্রজাবর্গের প্রতি উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার পিতা সিংহবাহু বড়ই বিরক্ত হন। প্রজার মনস্তুষ্টির জন্য শ্রীরামচন্দ্র প্রাণসমা প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীকে বনবাসে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন; সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণে, রাজা সিংহবাহু আপন পুত্রকে নির্ব্বাসিত করেন। যুবরাজ বিজয়সিংহের সাত শত অনুচর ছিল। সেই সঙ্গে তাহারাও নির্ব্বাসিত হয়। বিজয়সিংহের পুত্র-পরিবার পর্য্যন্ত এই সূত্রে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের আত্মরক্ষার উপযোগী অস্ত্র-শস্ত্র এবং আহার্য্য-দ্রব্যাদি প্রদান করিয়া রাজা তাঁহাদিগকে সমুদ্রপথে অর্ণবপোতে নির্ব্বাসিত করেন।' * প্রচার এই,—বিজয় এবং বিজয়ের স্ত্রী-পুত্র বিভিন্ন-পথে পরিত্যক্ত হন। † এইরূপ নির্ব্বাসিত অবস্থায় যাত্রা করিয়াও যে দেশের যুবরাজ রাজত্ব-প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হন, সে দেশের বাহুবল নৌবল কত বিপুল ছিল, স্বতঃই বোধগম্য হইতে পারে। ইউরোপীয়গণের বঙ্গদেশে প্রবেশের বহু পূর্ব্বে—কেবল ইউরোপীয়গণেরই বা বলি কেন, মুসলমানগণেরও ভারতে প্রবেশের বহু পূর্ব্বে—বঙ্গের নৃপতিগণ নৌবলে ও বাহুবলে প্রতিষ্ঠান্বিত ছিলেন। তাঁহাদের সে প্রতিষ্ঠার নিদর্শন মোগল-সাম্রাজ্যের পূর্ণ-প্রভাবের দিনেও প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিল। বাঙ্গালার ইতিহাস নাই বা বঙ্গের ইতিহাস কালের অগাধ-গর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং সে সকল বিবরণ অনুসন্ধান করিতে এখন অন্য দেশের ইতিহাসের আশ্রয় লইতে হইতেছে, এবং ক্বচিৎ কোথাও প্রাচীন তাম্রফলকাদির সাহায্য পাইতেছি। বিগত কয়েক বৎসরে বঙ্গদেশে ও বিহার-প্রদেশে কয়েকখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই তাম্রশাসনগুলির পাঠোদ্ধারে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত আট শত বৎসরের বঙ্গদেশের নৌবল প্রভৃতির আভাস পাওয়া যায়। ঐ সকল তাম্রশাসনের মধ্যে তিনখানি ফরিদপুর জেলায় (১৮৯১-৯২ খৃষ্টাব্দে) আবিষ্কৃত হয়। 'ইণ্ডিয়ান য়্যাণ্টিকোয়ারী' পত্রে (১৯১০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে) মিষ্টার পার্জিটার উহার অনুবাদ প্রকাশ করেন। ঐ তাম্রশাসন তিনখানিতে ভূসম্পত্তিদানের বিষয় উল্লেখ আছে। ঐ তাম্রশাসন তিনখানি সমুদ্রগুপ্তের

তাম্রশাসনোক্ত বঙ্গাধিপের নৌবল।

* মহাবংশে ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৫৫ম, ৫৮ম প্রভৃতি অধ্যায়ে বিজয়ের সিংহল-যাত্রার বিবরণ বিবৃত আছে। 'জাতক' গ্রন্থাদিতেও এ বিবরণ বিভিন্ন-রূপে পরিবর্ণিত। সিংহলের ইতিহাসে এ প্রসঙ্গ নানাস্থানে উল্লিখিত। Turnour's *Mahawans*, Upham's *Sacred and Historical Books of Ceylon* প্রভৃতি গ্রন্থে সকল বিষয় দ্রষ্টব্য।

† বিজয়ের সেই নির্ব্বাসিত স্ত্রী-পুত্রের সহিত তাঁহার পুনর্মিলন ঘটিয়াছিল বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায় না। কোন্ পথে কোথায় গিয়া তাঁহারা কি অবস্থায় পতিত হন, তাহাও প্রকাশ নাই। তবে সিংহলে গিয়া বিজয় পাণ্ড্য-বংশীয় রাজকন্যাকে বিবাহ করেন বলিয়া প্রকাশ। সিংহল অধিকারের পর তিনি পাণ্ড্যরাজের নিকট বহুমূল্য একখণ্ড প্রস্তর উপঢৌকন প্রেরণ করেন। ফলে, পাণ্ড্য-বংশীয় নৃপতির কন্যার সহিত তাঁহার পরিণয় হয়। সেই রাজকন্যার সহিত তাঁহার সাত শত সখী বা পরিচারিকা সিংহলে আসেন। বিজয়ের অনুচরবর্গের সহিত তাঁহাদের বিবাহ হয়। মহাবংশে প্রকাশ,—যে অর্ণবপোতে পাণ্ড্য-রাজকন্যা সিংহলে আসিয়াছিলেন, সে অতি বৃহৎ অর্ণবপোত। সে অর্ণবপোতে আঠার জন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী, পঁচাত্তর জন ভৃত্য, বহুসংখ্যক দাসদাসী এবং সাত শত সখী-সহ রাজকুমারীর স্থান-সঙ্কুলান হইয়াছিল।

রাজত্বকালে (৩২৬-৩৭৫ খৃষ্টাব্দে) খোদিত হইয়াছিল,—ডক্টর হর্ণেল পূর্ব্বে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। * কিন্তু পার্জিটারের সিদ্ধান্ত এই যে, ঐ তাম্রশাসন তিনখানি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে (৫৩১-৫৮৬ খৃষ্টাব্দে) প্রস্তুত হইয়াছিল। এ বিষয়ে তিনি হর্ণেলের সহিত বিতর্ক করিয়াই ঐরূপ সিদ্ধান্ত করেন বলিয়া প্রকাশ। † যাহা হউক, ঐ তাম্রশাসন তিনখানির মধ্যে একখানি যে অতি প্রাচীন, তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। প্রাচীনতম তাম্রশাসনখানিতে দান-প্রদত্ত ভূমিখণ্ডের চৌহদ্দি লিখিত আছে। তাহাতে প্রকাশ,—সেই ভূখণ্ডের উত্তরের দিকে অর্ণবপোত-নির্ম্মাণের উপযোগী পোত-স্থান ছিল; সেই স্থানের পরিচয়—মূলে সংস্কৃত ভাষায় "নাবতাক্ষেণী" শব্দে ব্যক্ত হইয়াছে। ‡ ঐ শব্দের অর্থ—'অর্ণবপোত নির্ম্মাণের স্থান', ইহাই প্রতিপন্ন হয়। দ্বিতীয় তাম্রশাসনে যথাক্রমে পোতাধিষ্ঠ-স্থানের এবং শুল্কাধ্যক্ষের উল্লেখ আছে। প্রথমে দান-দত্ত ভূখণ্ডের সীমানার পরিচয়ে লিখিত হইয়াছে,—সেই ভূখণ্ডের উত্তরে অর্ণবপোতসমূহ অবস্থিত ছিল; পরিশেষে যে রাজ-কর্ম্মচারী সেই ভূখণ্ড হস্তান্তর করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন, তাঁহার পরিচয়ে লিখিত হইয়াছে—তিনি শুল্কালয়াধ্যক্ষরূপে ঐ প্রদেশের কর্তৃপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মূল সংস্কৃতে তাঁহার পরিচয়-জ্ঞাপক শব্দ—"বিষয়াধিনিযুক্তক ব্যাপারকাণ্ডক।" § তৃতীয় তাম্রশাসনে বাণিজ্য-কার্য্যের সুব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত সচিবের, প্রসিদ্ধ বণিকগণের এবং অধস্তন শুল্কাধ্যক্ষের উল্লেখ আছে। সেই শুল্কাধ্যক্ষ ভূখণ্ড-দানের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাণিজ্য-কার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক পূর্ব্বোক্ত সচিবের পরিচয়-জ্ঞাপক মূল সংস্কৃত শব্দ (তাম্রশাসনে লিখিত আছে)—"ব্যাপারণ্ডাধৃতমূলক্রিয়ামাত্যা", এবং প্রসিদ্ধ বণিকগণের পরিচয়মূলক শব্দ—"প্রধানব্যাপারিণঃ।" তাম্রশাসনে "প্রাক্‌সমুদ্রমর্য্যাদা"—একটী শব্দ আছে। ঐ শব্দ দৃষ্টে মিষ্টার পার্জিটার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—ফরিদপুর-জেলার নিকটে সমুদ্র ছিল,—'প্রাক্‌সমুদ্রমর্য্যাদা' শব্দে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। আমরা কিন্তু ঐ শব্দের অন্যরূপ অর্থ নির্দ্দেশ করি। 'পূর্ব্বসমুদ্রে শুল্কগ্রহণের যে পদ্ধতি প্রচলিত ছিল', দেশ-মধ্যেও সেই নিয়মে কার্য্য চলিত,—'প্রাক্‌সমুদ্রমর্য্যাদা' শব্দে ইহাই উপলব্ধি হয়। ইহাতে আরও বুঝা যায়, পূর্ব্বসমুদ্রে ঐ সময়ে বঙ্গাধিপতির অধিকার বিস্তৃত ছিল এবং ঐ সমুদ্র-

---

* *Indian Antiquary*, Vol. XXI, 1892, p 44-45—article by Dr. A. F. R. Hoernle Ph. D., C. I. E.

† Mr. F. E. Pargiter, M. A., I. C. S., in the *Indian Antiquary*, 1910.

‡ 'ডন্' মাসিক পত্রে এই শব্দের পাঠ ও অর্থ লইয়া বহু বিতর্ক উপস্থিত হয়। পণ্ডিত বিধুশেখর উহার পাঠ 'নাববেক্ষণী' নির্দ্দেশ করেন; কিন্তু হারাণ বাবু সিদ্ধান্ত করেন,—'ঐ শব্দ "নাবতাক্ষেণী" হওয়াই সঙ্গত এবং উহার অর্থ 'অর্ণবপোত নির্ম্মাণোপযোগী পোত-স্থান। এ বিষয়ে হারাণ বাবুর উক্তি,—I have found that the word in the original inscription cannot in any way be read as নাববেক্ষণী ...The whole word নাবতাক্ষেণী would mean 'a harbour having frames or enclosures for ships,' that is, 'having docks for building ships.'—*Dawn* (October, 1912.)

§ পার্জিটার ঐ শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন,—"The Customs Officer appointed as such in Chief in this District."—*Indian Antiquary*, July, 1910.

পথে যে সকল পণ্যবাহী পোত গতিবিধি করিত, তৎসমুদায়ের শুল্ক বঙ্গাধিপতির কর্ম্মচারিগণ আদায় করিতেন। ফলতঃ, 'প্রাক্‌সমুদ্রমর্য্যাদা' শব্দে সমুদ্র যে বঙ্গের অভ্যন্তরে বিস্তৃত ছিল, তাহা প্রতিপন্ন না হইয়া বঙ্গের প্রভাব পূর্ব্বসমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল,—ইহাই প্রতিপন্ন হয়। বঙ্গোপসাগরে এবং চট্টগ্রাম ও উড়িষ্যা বিভাগে বহু নদ-নদী বিদ্যমান আছে। সেই সকল নদ-নদীর পথে অন্তর্বাণিজ্যের ও বহির্বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা ছিল। সেই জন্য, যে সকল বাণিজ্য-পোত ঐ পথে গতিবিধি করিত, তাহাদের সম্বন্ধে কর-গ্রহণের নিয়ম হয়। কি বৈদেশিক বাণিজ্যপোতসমূহ, কি দেশীয় বাণিজ্যপোতসমূহ, তখন সকলই এক নিয়মের অধীন ছিল। এ সম্বন্ধে অবশ্য মিষ্টার পার্জিটার এইরূপ মতই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। * বঙ্গদেশের নদনদীসমূহ তখন প্রবল ছিল; সুতরাং সুবৃহৎ অর্ণবপোত-সমূহ দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিত। কিন্তু এখন রেলপথে, বাঁধ-বন্ধনে ও গতি-পরিবর্ত্তনে, নদনদীর সে প্রাবল্য কমিয়া গিয়াছে; আর সেইজন্যই সাগরগর্ভ হইতে বঙ্গদেশের উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া অনেকে ভ্রান্ত-বিশ্বাসে পরিচালিত হইয়া থাকেন। তাম্রশাসনোল্লিখিত দানদত্ত ভূখণ্ড নদীবহুল অংশে বিদ্যমান ছিল বলিয়াও প্রোক্ত ভ্রমধারণা বদ্ধমূল হয়, বুঝিতে পারি। অপিচ, দান-দত্ত ভূখণ্ডের দক্ষিণের সীমায় দূরে বঙ্গোপসাগর তো অবস্থিত বটেই; † কিন্তু তাই বলিয়া বঙ্গদেশ সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল, কখনই বলা যায় না। যাহা হউক, এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে বাঙ্গালার নৌবল, বাহুবল, অন্তর্বাণিজ্য, বহির্বাণিজ্য প্রভৃতির বিষয় বিশেষভাবে উপলব্ধি হয়। রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে 'নৌসাধন' শব্দে বঙ্গদেশের নৌবলের পরিচয়ই প্রাপ্ত হই। ‡ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চৈন-পরিব্রাজকগণের বঙ্গদেশে আগমন প্রসঙ্গে বঙ্গের নৌবাহিনী প্রভৃতির নিদর্শন দেদীপ্যমান। তদ্বিষয়ে

* "The large rivers in this province and the proximity of Orissa and Chittagong coast afforded great facilities for riverine and coastal trade, and the people were largely occupied in boating and shipping as already mentioned. There can be little doubt that they engaged in shipping. Trade must have been very brisk in the province and such a department of commerce must have been a most important source of revenue. Its duties would have been to levy customs-dues on foreign trade and octroi on internal trade; and it would no doubt have been expected to look after harbours and marts in order to maintain trade, and probably to exercise some kind of maritime jurisdiction."—*Indian Antiquary*, July, 1910.

† দান-প্রদত্ত ভূখণ্ড 'ভরাকমণ্ডল' বলিয়া উল্লিখিত আছে। 'ভরাকমণ্ডল' বা 'ভরাক' প্রদেশের সীমানা-বিষয়ে পার্জিটার লিখিয়াছেন,—'ঐ ভূখণ্ডের পশ্চিমে পদ্মা প্রবহমানা, পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র-নদ, উত্তরে বরেন্দ্র ভূমি এবং দক্ষিণে সমুদ্র।' ইহাতে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত গাঙ্গেয় ব-দ্বীপকে বুঝাইতে পারে। কিন্তু মিষ্টার ষ্টেপেলটন ভরাকমণ্ডলকে ডবাক-মণ্ডল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ডবাক—ঢাকা বা ঢাকা-প্রদেশকে বুঝাইয়া থাকে। এলাহাবাদ-দুর্গে অশোক-স্তম্ভে সমুদ্রগুপ্তের লিপি-মধ্যে তাঁহার রাজ্য-সীমান্তে 'ডবাক'-প্রদেশ অবস্থিত ছিল, লিখিত আছে। সেই 'ডবাক', 'ভরাক' ও ঢাকা অভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।—Cf. (1) *Indian Antiquary*, 1910, Mr. F. E. Pargiter's article; (2) *Journal of the Asiatic Society*, Bengal. April, 1910—Mr. H. Stapleton's article; (3) *Inscrip-tions of early Gupta Kings* by Dr. I. E. Fleet. মিষ্টার ষ্টেপেলটন ও মিষ্টার কিলিট ঢাকার অপভ্রংশে 'ডবাক' লিখিত হইয়াছিল বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

‡ রঘুবংশ, চতুর্থ সর্গ, ৩৬শ শ্লোক (এই পরিচ্ছেদের ১১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

অধিক আলোচনা বাহুল্য মাত্র। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সাড়ে চারি শত বৎসর কাল বঙ্গদেশে যথাক্রমে পাল-বংশীয় ও সেন-বংশীয় নৃপতিগণের অভ্যুদয় হয়। তাঁহাদের প্রদত্ত যে সকল তাম্রশাসন অধুনা আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহাতে বঙ্গের নৌ-বলের ও বাহু-বলের বিশিষ্ট বিবরণ প্রাপ্ত হই। পাল-বংশীয় নৃপতি ধর্ম্মপালদেব কয়েকখানি গ্রাম দান করেন। খালিমপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে সেই দান-প্রদত্ত ভূখণ্ডের বর্ণনা প্রসঙ্গে এক স্থলে (তাম্রশাসনের পঞ্চবিংশ হইতে ত্রিংশ পংক্তি দ্রষ্টব্য) এইরূপ লিখিত আছে,—

পাল-বংশের নৌশক্তির পরিচয়।

"স খলু ভাগীরথীপথ-প্রবর্ত্তমান-নানাবিধ-নৌবাটক-সম্পাদিত-
সেতুবন্ধ-নিহিত-শৈলশিখরশ্রেণীবিভ্রমাৎ……পাটলিপুত্রসমবাসিত
শ্রীমজ্জয়স্কন্ধবারাৎ…মহারাজাধিরাজঃ শ্রীমান্ ধর্ম্মপালদেব কুশলী।" *

এই বর্ণনায় প্রকাশ, রাজা ধর্ম্মপালদেব পাটলিপুত্র-নগরের জয়স্কন্ধাবার হইতে ঐ দানপত্র তাম্রশাসন প্রচার করিয়াছিলেন। সেই জয়স্কন্ধাবারের বর্ণনায় নৌবলের বিষয় বিশেষভাবে অবগত হওয়া যায়। বর্ণনায় প্রকাশ,—রাজা ধর্ম্মপালদেবের "নৌবাটক" বা রণতরীসমূহ ভাগীরথী-বক্ষে শৈলশিখরের ন্যায় শোভমান ছিল; সেই রণতরীতে সে পথে বিপক্ষপক্ষের গতিবিধি অবরুদ্ধ হইয়াছিল। এ বর্ণনা নৌবলের প্রকৃষ্টতারই পরিচয় জ্ঞাপন করিতেছে। যাঁহাদের সম্মুখে ঐ দান-পত্র প্রদত্ত হয়, তাঁহাদের পরিচয় উপলক্ষে ঐ তাম্রশাসনের অপর একস্থলে 'নৌকাধ্যক্ষ', 'বলাধ্যক্ষ' প্রভৃতির উল্লেখ আছে। ইহাতে নৌবিভাগের ও নৌ-সমরের সুব্যবস্থার বিষয়ই সূচিত হয়। পাল-বংশের পঞ্চম নৃপতি নারায়ণপালদেব 'মুদ্গগিরি' (মুঙ্গেরের প্রাচীন নাম) হইতে এক দান-পত্র প্রচার করেন। যাঁহাদের সমক্ষে সেই দান-পত্র লিখিত হয়, দানপত্রে তাঁহাদের পরিচয় আছে। গজারোহী, অশ্বারোহী, উষ্ট্রারোহী, পদাতিক ও নৌ-সেনানী প্রভৃতির সম্মুখে সেই দানপত্র প্রদত্ত হইয়াছিল। তাম্রফলকে সংস্কৃত ভাষায় তাঁহাদের পরিচয়-স্বরূপ লিখিত আছে—"হস্ত্যশ্বোষ্ট্র-নৌবলব্যাপৃতক।" † রাজা নারায়ণপালদেবের প্রভাবের বিষয় এবং তদধীন সৈন্যবলের বিষয় ঐ তাম্রফলকেই উপলব্ধি হয়। পাল-বংশীয় নবম নৃপতি মহীপালদেব এবং অন্যতম নৃপতি মদনপালদেব কিরূপ বলসম্পন্ন ছিলেন, তাঁহাদের প্রদত্ত অপর দুই তাম্রফলকে তাহা অবগত হওয়া যায়। সেই দুই তাম্রফলকের প্রথমোক্ত তাম্রফলক দিনাজপুরে এবং শেষোক্ত তাম্রফলক দিনাজপুরের অন্তর্গত মানাহালী নামক স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীমন্মদনপালদেব রামাবতী নগর হইতে যে তাম্রশাসন প্রচার করেন, তাহার কিয়দংশ,—

"স খলু ভাগীরথীপথপ্রবর্ত্তমান-নানাবিধ-নৌবাটক-সম্পাদিত-সেতুবন্ধনিহিত-
শৈল-শিখরিণী-বিভ্রমান্নিরতিশয়ঘনায়ন-করিপট্ট-শ্যামায়মানবাসরলক্ষ্মীসমারব্ধসন্তত-
জলদসময়সন্দেহাদুদিচীনা নেকনরপতিপ্রাভৃতীকৃতাপ্রমেয়হয়বাহিনী-খুরখুরোৎ-

---

* *Epigraphia Indica*, Vol. IV, article on *Khalimpur Plate of Dharmapaladeva* by Dr. F. Kielhorn, Ph. D.

† *Indian Antiquary*, Vol. XV. (1886), article on *the Bhagalpur Plate of Narayanpala* by Dr. E. Hultzsch, Ph. D.

পাতধূলীধূষরিতদিগন্তরালাৎ পরমেশ্বরসেবা সমাগতাশেষজম্বুদ্বীপভূপালানন্ত-পাদভবনমদবনেঃ শ্রীরামাবতীনগরপরিসরসমাবাসিতশ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ। পরম-সৌগতোমহারাজাধিরাজঃ শ্রীরামপালদেবপাদানুধ্যাতঃ পরমেশ্বরঃ পরমভট্টারকো-মহারাজাধিরাজঃ শ্রীমন্মদনপালদেবঃ কুশলী।"

ধর্ম্মপাল-দেব-প্রদত্ত পূর্ব্বোদ্ধৃত দানপত্রে যে নৌবল-বাহুবলের পরিচয় প্রাপ্ত হই, এই তাম্রশাসনেই সেই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যেমন পাটলিপুত্র-নগরে নৌবাহিনীর সাহায্যে পথ অবরুদ্ধ হইয়াছিল, এখানেও শৈল-শৃঙ্গবৎ নৌবাটক সাহায্যে সেইরূপ শত্রুর পথ অবরুদ্ধ ছিল। কুমারপাল—পাল-বংশীয় পঞ্চদশ নৃপতি বলিয়া অভিহিত হন। তাঁহার সেনাপতি বৈদ্যদেব কর্ত্তৃক একখানি তাম্রশাসনে ভূখণ্ড-দানের বিষয় লিখিত আছে। সেই তাম্রশাসনে প্রকাশ,—বৈদ্যদেব দক্ষিণ-বঙ্গ অধিকার করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে বহু গজারোহী সৈন্য গমন করে। দক্ষিণ-বঙ্গের নৌবল প্রথমে তাঁহার সৈন্যদলকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছিল; পরিশেষে তিনি জয়যুক্ত হন। তাম্রফলকে তাঁহার সেই দক্ষিণ-বঙ্গ অধিকারের বিবরণ এইরূপভাবে লিখিত আছে,—"যস্যানুত্তরবঙ্গবিজয়ে নৌবাটহোহোরবত্রস্তৈর্দিক্করিভিশ্চ যন্ন চলিতং চেন্নাস্তি তদ্গম্যভূঃ। কিঞ্চোৎপাতুককে নিপাতপতনপ্রোৎসর্পিতৈঃ শীকরৈরাকাশে স্থিরতা কৃতা যদি ভবেৎ স্যান্নি-ষ্কলঙ্ক শশী॥" * পাল-বংশের প্রদত্ত তাম্রশাসনে যে পরিচয় প্রাপ্ত হই, সেন-বংশের তাম্রশাসন-সমূহেও সেই পরিচয় দেদীপ্যমান্। রাজসাহী-জেলার দেওপাড়া গ্রামে, সেন-বংশীয় নৃপতি বিজয়-সেনের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিজয়-সেন একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার নৌ-বাহিনী পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইয়া, গঙ্গানদীর উপকূলস্থিত সমস্ত দেশে তাঁহার বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল। প্রস্তর-খণ্ডে খোদিত লিপিতে সংস্কৃত ভাষায় † সে বিবরণ এইরূপ পরিবর্ণিত আছে;—

"পাশ্চাত্যচক্রজয়কেলিষু যস্য যাবদ্গঙ্গাপ্রবাহমনুধাবতি নৌবিতানে।
ভর্গস্য মৌলিসরীদম্ভসি ভস্মপঙ্কলগ্নোজ্ঝিতেব তরিরিন্দুকলাচকাস্তি॥"

বিজয়সেনের পুত্র ও উত্তরাধিকারী রাজা বল্লালসেনের একখানি তাম্রশাসন সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। যে সকল সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তির সমক্ষে দান প্রদত্ত হইয়াছিল, সেই তাম্রশাসনে তাঁহাদের পরিচয় লিখিত আছে। তাঁহাদের মধ্যে নৌ-বাহিনীর তত্ত্বাবধায়ক "নৌবলব্যাপৃতক" নামে পরিচিত হইয়াছেন। ‡ রাজা লক্ষ্মণ-সেনের এবং তৎপুত্র রাজা বিশ্বরূপ-সেনের প্রদত্ত চারিখানি তাম্রশাসন অধুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে। লক্ষ্মণ-সেনের প্রদত্ত তাম্রশাসন দুইখানির একখানি দিনাজপুর-জেলায় তর্পণদীঘির সন্নিকটে ও অন্যখানি রাজসাহী-জেলায় মাধাইনগর গ্রামে পাওয়া যায়। বিশ্বরূপ-সেনের তাম্রশাসন

---

* *Epigraphia Indica*, Vol. II, article on the *Copper Plate Grant of Vaidyadeva* by Arthur Venis, M, A.

† *Epigraphia Indica*, Vol. I, article on the Deopara Stone inscription of Vijeyasena by Dr. F. Kielhorn, Ph. D.

‡ 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার' সপ্তদশ খণ্ডে এই তাম্রশাসনের প্রতিলিপি প্রকাশিত হইয়াছে।

দুইখানির একখানি বাখরগঞ্জে এবং অপরখানি মদনপুরে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ঐ চারিখানি তাম্রশাসনেও নৌ-সেনাপতির বা নৌ-বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক প্রভৃতির উল্লেখ আছে।* এইরূপে প্রতিপন্ন হয়, পাল-বংশের ও সেন-বংশের আধিপত্যকালে, বঙ্গদেশ রণতরী-সম্বন্ধে এবং সৈন্যবল-সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। পাল-বংশের ও সেন-বংশের প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে বঙ্গদেশের কোনও কোনও নৃপতির পরিচয় চীনাদিগের গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। 'কুমার' নামধেয় পূর্ব্ববঙ্গের জনৈক নৃপতি চীন-সম্রাটের সহিত মিত্রতা-বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি চীন-সম্রাটের পক্ষাবলম্বনে মগধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। সেই সময়ে রাজমন্ত্রী অর্জ্জুন, অন্যায়-রূপে মগধের সিংহাসন অধিকার করিয়া, চীনের রাজ-দূতের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন। তাহাতে চীনের সহিত তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধে কুমার চীনের পক্ষে অস্ত্রধারণ করেন। মুসলমানগণের বঙ্গদেশ অধিকারের সময়েও বঙ্গদেশ নৌবলের-বাহুবলের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করে। বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গদেশ-প্রবেশের প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে, গয়েসউদ্দিন ইয়াস্ বঙ্গের শাসনকর্ত্তৃ-পদে অধিষ্ঠিত হন। সম্রাট্ আল্‌তামাস তখন দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ়। গয়েসউদ্দিন—সম্রাটের বশ্যতা অস্বীকার করেন। তাহাতে সম্রাটের সৈন্যদল লক্ষ্মণাবতী আক্রমণে অগ্রসর হয়। কিন্তু গয়েসউদ্দিন বঙ্গের নৌ-বাহিনীর সাহায্যে সম্রাটের সেই সৈন্যদলকে বিতাড়িত করেন। সম্রাট্ আল্‌তামাস তখন বাধ্য হইয়া, গয়েসউদ্দিনের সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হন। ১১৯৮ খৃষ্টাব্দ—বক্তিয়ার খিলিজির বাঙ্গালা-দেশ-প্রবেশের সময় নির্দ্ধারিত হয়। গয়েসউদ্দিনের সহিত সম্রাট্ আল্‌তামাসের যুদ্ধ ও সন্ধি ১২২৫ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হইয়াছিল। 'তবকাত-ই-নাশিরী' (তবকাত-নশেরী) নামক পারস্য-ভাষায়-লিখিত ইতিহাস-গ্রন্থ, ‡ এই যুদ্ধের ও সন্ধির বিষয় বর্ণনায় বঙ্গের প্রাধান্যই বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় বুঝা যায়, আল্‌তামাস বাধ্য হইয়াই সন্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্টের বর্ণনায় অন্যভাব প্রকাশ পায়। ষ্টুয়ার্ট বলেন,—'গৌড়াধিপতি গয়েসউদ্দিন আল্‌তামাসের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার কয়েক জন বন্ধু মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ মিটাইয়া দিয়াছিলেন। ফলে, যুদ্ধে জয়-পরাজয় স্থির না হইলেও, আল্‌তামাসের নিকট বশ্যতা-সূচক সন্ধি-সর্ত্তে গয়েসউদ্দিনকে আবদ্ধ হইতে হইয়াছিল।' § যাহা হউক, সন্ধি-সর্ত্তে স্বীকার হইয়া আল্‌তামাস প্রত্যাগমন করিলে, আল্‌তামাসের অধিকৃত বিহার-

মুসলমানাধিকারে নৌ-বল বাহুবল।

---

* *Journal of the Asiatic Society*, Bengal, Vol xliv, (1875)—*A Copper-plate containing a grant of land by Lakshmansen of Bengal* etc. by E. V. Westmacott.; রঙ্গপুর সাহিত্য-পত্রিকা, ৪র্থ খণ্ড; *Journal* of the *Asiatic Society, Bengal*, Vols, VII and xlv.

† এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিবরণ পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে ১৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

‡ *Tabakat-i-Nasiri*: A General History of the Muhammadan Dynasties of Asia including Hindustan etc. by the Maulana Minhaj-ud-din, Abu Umar-i-Usman.*— Translated from Original Persian Manuscripts by Major H. G. Raverty-

§ Stewart's History of Bengal, Sec. iii.

প্রদেশ গয়েসউদ্দিন পুনরধিকার করিয়া লন। আল্‌তামাস বিহারে যে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া যান, গয়েসউদ্দিন কর্ত্তৃক তাঁহার উচ্ছেদ সাধিত হয়। কুড়ি বৎসর পরে মিনহাজ্‌উদ্দিন এই ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া যান। সুতরাং তাঁহার বর্ণনা সমসাময়িক ঐতিহাসিকের বর্ণনা বলিয়া সমাদৃত হইয়া থাকে। বঙ্গের বাহুবলের আর একটী বিবরণ মিনহাজ্‌উদ্দিন লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সে ঘটনা ১২৪২-১২৪৩ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয়। গৌড় বা লক্ষ্মণাবতীর তাৎকালিক শাসনকর্ত্তা আজা-উদ্দিন তোঘন খাঁ (মালিক-ইজ্জুদ্দিন-তুর্গ্রিল-ই-তুঘান-খাঁ) অযোধ্যার নিকটবর্ত্তী 'কাড়া'-সীমান্ত পর্য্যন্ত সৈন্য পরিচালনা করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার নৌবলে ও বাহুবলে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও ঐ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক মিনহাজ্‌উদ্দিন দিল্লী হইতে যাত্রা করিয়া পথে বঙ্গাধিপতির সহিত যোগদান করেন। ঐতিহাসিকের পরিদৃষ্ট ঘটনাই গ্রন্থে পরিবর্ণিত রহিয়াছে। এতদ্বিবরণে বঙ্গদেশীয় মুসলমানগণের নৌবলের বাহুবলের পরিচয় পাইলেও, বাঙ্গালী হিন্দুর কোনও বিশেষ কৃতিত্বের উল্লেখ দেখিতে পাই না। বঙ্গাধিপতির পক্ষ অবলম্বন করিয়া যে সকল হিন্দু তখন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, মুসলমান ঐতিহাসিককে তাঁহাদের সম্বন্ধে নীরব দেখি। তবে কি মুসলমানগণের বঙ্গদেশ-প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার সমস্ত বীরত্ব সমস্ত বাহুবল লোপ পাইয়াছিল? না—তাহা কখনই নহে। পরবর্ত্তী কয়েকটী ঘটনার আলোচনায় সে বিষয় স্বতঃই হৃদয়ঙ্গম হইবে। ১২৭৭ খৃষ্টাব্দে সুলতান মোজিস উদ্দিন তুগ্‌রিল খাঁ লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসন লাভ করেন। ত্রিপুরার অন্তর্গত জাজনগর প্রভৃতি কয়েকটী স্থান অধিকার করিয়া, বলদর্পে দর্পিত হইয়া, তিনি দিল্লীর সম্রাটের সহিত সম্বন্ধ-সূত্র ছিন্ন করিয়া দেন। ফলে, ১২৮১ খৃষ্টাব্দে, সুলতান গয়েসউদ্দিন বলবন, অযোধ্যা-প্রদেশের হিন্দু-মুসলমানের মধ্য হইতে, দুই লক্ষাধিক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, লক্ষ্মণাবতী অভিমুখে অগ্রসর হন। তুগ্‌রিল্ খাঁ, লক্ষ্মণাবতী পরিত্যাগ করিয়া জাজনগরে পলায়ন করেন। রাজকোষের সমুদায় অর্থ এবং রাজধানীর সমস্ত সৈন্যদল তাঁহার সঙ্গে তিনি লইয়া যান। পশ্চাদনুসরণ করিয়া, অনেক দূর পর্য্যন্ত গিয়াও বলবন তাঁহাকে ধরিতে পারেন না; পরন্তু তুগ্‌রিল খাঁ বিদ্রোহী হইয়া নানারূপ উপদ্রব আরম্ভ করেন। সেই সময়ে, সেন-বংশের অন্যতম বংশধর রাজা দনুজমাধব রায় সোনারগাঁয়ে (সুবর্ণগ্রামে) স্বাধীন নৃপতি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তুগ্‌রিল খাঁর অনুসরণে সম্রাটের নৌবাহিনী সোনারগাঁর সন্নিকটে উপস্থিত হইলে, দনুজ রায়ের সহিত সম্রাট্ সন্ধি-সর্ত্তে আবদ্ধ হইলেন। সম্রাটের রণতরী-সমূহ তুগ্‌রিল খাঁর পলায়নে বাধা-প্রদানে অসমর্থ ছিল। রাজা দনুজ রায়ের সহিত সন্ধি হওয়ায় তাঁহার সে অভাব বিদূরিত হইল। রাজা দনুজ রায় একাই তুগ্‌রিল খাঁকে দমন করিবার ভার গ্রহণ করিলেন। বাঙ্গালী দনুজ রায়ের বাহুবলে তুগ্‌রিল খাঁ পরাজিত ও নিহত হন। প্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক জিয়া-উদ্দীন বার্ণি তৎপ্রণীত 'তারিখ-ই-ফিরোজসাহি' গ্রন্থে রাজা দনুজ রায়ের এবম্বিধ কৃতিত্বের বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন। তুগ্‌রিল খাঁ যদি সমুদ্রপথে পলায়ন করিবার চেষ্টা করিতেন, দনুজ

পূর্ব্ববঙ্গাধিপ দনুজ রায়ের নৌবল।

রায়ের নৌবাহিনী সমুদ্রপথে অগ্রসর হইয়াও তাঁহাকে বিপর্য্যস্ত করিতে পারিত ;—বাঙ্গালী হিন্দু-রাজার নৌবল-বাহুবল তখনও এতদুর সামর্থ্য-সম্পন্ন ছিল ! * দনুজ রায়ের পর অর্দ্ধ শতাব্দী অতিবাহিত হয়। ইতিমধ্যে সোনারগাঁ মুসলমানগণের অধিকারভুক্ত হইয়া পড়ে। অবশেষে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গদেশের দুই প্রদেশে দুই জন মুসলমান শাসন-কর্ত্তার অভ্যুদয় ঘটে। তখন একজন গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী প্রদেশে এবং অপর জন সোনারগাঁ প্রদেশে রাজধানী স্থাপন করেন। ইবন-বাতুতা যখন বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন, তখন সোনারগাঁ রাজধানীতে ফাকরুদ্দিন মোবারক সা এবং লক্ষ্মণাবতীতে আলাউদ্দীন আলী—দুই রাজধানীতে দুই জন মুসলমান-শাসনকর্ত্তা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এবং তাঁহাদের দুইজনের মধ্যে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। সেই সময় জলযুদ্ধে সুবর্ণগ্রাম এবং স্থলযুদ্ধে লক্ষ্মণাবতী প্রসিদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। ইবন-বাতুতার বর্ণনায়, বঙ্গদেশের এই দুই রাজধানীর নৌবলের ও বাহুবলের বিশদ বিবরণ দেখিতে পাই।

বঙ্গের দুই রাজধানীর নৌবল-বাহুবল।

বর্ষার সময় নৌবহরের সাহায্যে মোবারক সা যখন লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করিতেন, তখন তাঁহার প্রভাব অপ্রতিহত বলিয়া প্রতীত হইত। আবার যখন বর্ষান্তে স্থলপথে অগ্রসর হইয়া আলি-সা পূর্ব্ববঙ্গ-লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইতেন, তখন তাঁহাকেই লোকে অত্যধিক প্রভাব-সম্পন্ন বলিয়া মনে করিত। † ১৩৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মোবারক-সা গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুবর্ণগ্রামের সহিত লক্ষ্মণাবতীর বিরোধ ঐ সময়েই সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া উপলব্ধি হয়। মোবারক-সার পর সমসুদ্দিন ইলিয়াস্ সা গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি দিল্লীর প্রাধান্য অস্বীকার করিয়াছিলেন। সুতরাং দিল্লীর সুলতান ফিরোজ-সা তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাটের সহিত বঙ্গাধিপতি ইলিয়াস-সার ঘোর সমর উপস্থিত হয়। সম্রাট ফিরোজ-সা সহস্রাধিক রণতরী সজ্জিত করিয়া বঙ্গরাজ্য আক্রমণ করেন। সম্রাটের সঙ্গে সত্তর হাজার খাঁ ও মালিক সম্প্রদায়ভুক্ত যোদ্ধপুরুষ ছিলেন। দুই লক্ষ পদাতিক ও ষাট হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সহ তিনি বঙ্গদেশাভিমুখে অগ্রসর হন। কিন্তু এতাদৃশ সৈন্যবল সত্বেও সুলতান জয়ী হইতে পারেন না। অগত্যা বাঙ্গালাদেশকে স্বাধীন রাজ্য বলিয়া তাঁহাকে স্বীকার করিতে হয়। সম্রাটের সহিত বঙ্গাধি-পতির এই যুদ্ধে বাঙ্গালার বিপুল নৌবলের ও বাহুবলের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার পর সম্রাট ফিরোজ সাহ পুনরায় বঙ্গাধিকারে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ১৩৫৯ খৃষ্টাব্দে সেই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেই অভিযানে দিল্লীর সুলতান সত্তর হাজার অশ্বারোহী, অসংখ্য পদাতিক এবং ৪৭০টী যুদ্ধ-হস্তী ও বহুসংখ্যক রণতরী লইয়া আসেন। সেই সকল রণতরী

* 'তারিখ-ই-ফিরোজসাহী' গ্রন্থ ১৩৫৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত হয়। মেজর রেভার্টি এবং অধ্যাপক ডাউসন তাঁহার গ্রন্থের ঐ অংশের অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। ডাউসনের অনুবাদের কিয়দংশ,—"The Rai of that place (Sunarganw), by name Danuj Rai, met the Sultan, and an agreement was made with him that he should guard against the escape of Tughril by water"'—Prof' J. Dowson's translation in the *Elliot's History of India.*

† *Vide* the Voyages of Ibn Batuta.

'কিস্তিহা-ই-বান্দ-কুশ' নামে অভিহিত হয়। সাধারণতঃ দুর্গাদির অবরোধ ভঙ্গ করিবার জন্য ঐ সকল রণতরী ব্যবহৃত হইত। একডালার ও সোনারগাঁর পাবিপার্শ্বিক নদী-পথ অতিক্রম করিয়া, ঐ সকল রণতরী লক্ষ্মণাবতী অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল। এই যুদ্ধে সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্ত্তা সম্রাটের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। এই দ্বিতীয় বারের যুদ্ধে ইলিয়াস্ সার পরাজয় হয়। তখন, সেকন্দর সা গৌড়ের এবং জাফর খাঁ সোনারগাঁর শাসনকর্তৃত্ব লাভ করেন। 'তারিখ-ই-ফিরোজ-সাহি' গ্রন্থে মুসলমান ঐতিহাসিক সামস-ই-সিরাজ-আফিফ এই বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। * ঐ গ্রন্থকারের পিতা সম্রাটের একজন সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। সুতরাং আফিফের গ্রন্থে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সত্যতা-বিষয়ে সংশয়ান্বিত হইবার কোনই কারণ নাই। ১৩৪০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার মুসলমান নৃপতিগণ স্বাধীন বলিয়া পরিচিত হন। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ সেই স্বাধীন আফ্গান বা পাঠান-নৃপতিগণের শাসনাধীন ছিল। মধ্যে মধ্যে কখনও কখনও দিল্লীর বাদসাহ তাঁহাদের উপর আধিপত্য-বিস্তারের চেষ্টা পাইলেও বাঙ্গালার স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপ অপহরণ করিতে তাঁহারা প্রায়ই সমর্থ হন নাই। সের সাহের বংশীয় দায়ুদ খাঁ বাঙ্গালার শেষ পাঠান-নৃপতি। মোগল-সম্রাট আকবর সাহ ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশ অধিকার করেন। সেই হইতে, স্বাধীন পাঠান-নৃপতিগণের অবসানে, মোগল-সম্রাটের প্রতিনিধি-শাসনকর্ত্তৃগণ বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হন। বঙ্গদেশে মোগলগণের আধিপত্য বিস্তৃত হওয়ার পূর্ব্বে, বঙ্গের স্বাধীন পাঠান-নৃপতিগণ আপনাদের নৌবলের ও বাহুবলের বিশিষ্টরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। সুলতান গয়েসউদ্দিন ইয়াস্, সুলতান হুসেন সাহ এবং সুলতান দায়ুদ খাঁ প্রভৃতির শাসন-কালে, ইতিহাসে এ সম্বন্ধে বিবিধ বিবরণ বিবৃত আছে। তৎকালে বঙ্গের পাঠান-নৃপতিগণ যেরূপ নৌবলে-বাহুবলে বলীয়ান ছিলেন, তাঁহাদের পারিপার্শ্বিক হিন্দু-রাজন্যবর্গও তদ্রূপ শক্তিশালী ছিলেন। পাঠান-নৃপতিগণ বঙ্গের যে অংশ যখনই অধিকার করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তখনই তাঁহাদিগকে সমধিক উদ্বেগ পাইতে হইয়াছে। যেমন পশ্চিম-বঙ্গে ও উত্তর-বঙ্গে—নবদ্বীপে ও লক্ষ্মণাবতীতে—সেন-বংশের রাজধানী ছিল, তেমনই পূর্ব্ব-বঙ্গেও—বিক্রমপুরে—তাঁহাদের রাজধানীর বিষয় অবগত হওয়া যায়। পশ্চিম-বঙ্গের নবদ্বীপ-রাজ্য আফ্গান-গণের অধিকারভুক্ত হইলেও, পূর্ব্ব-বঙ্গ বহুকাল পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিল। রাজচক্রবর্ত্তী লক্ষ্মণ-সেনের বংশধরগণ পূর্ব্ব-বঙ্গে বিক্রমপুরে কেমনভাবে কতদিন পর্য্যন্ত আপনাদিগের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন, ইতিহাস-পাঠকের তাহা অবিদিত নাই। লক্ষ্মণ-সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম—বিশ্বরূপ-সেন। † তিনি প্রধানতঃ

পাঠান-রাজত্বে হিন্দুনৃপগণের প্রভাব।

---

* Prof. John Dowson's translation of the *Tarikh-i-Firoz Shahi* by Shams-i-Siraj-Afif in the Elliot's *History of India*, Vol. iii.

† কুল-গ্রন্থ প্রভৃতিতে লক্ষ্মণ-সেনের তিন পুত্রের পরিচয় পাওয়া যায়; (১) বিশ্বরূপ; (২) মাধব; (৩) কেশব। দনৌজা-মাধব বা দনুজ রায় লক্ষ্মণ-সেনের পৌত্র। সমাজ-বন্ধনে তিনি পিতামহ প্রপিতামহের ন্যায় যশস্বী হইয়া উঠিয়াছিলেন। মতান্তরে বিশ্বরূপ-সেন লক্ষ্মণ-সেনের কনিষ্ঠ পুত্র বলিয়া অভিহিত হন।

'লাক্ষ্মণেয়' নামে পরিচিত। গৌড়-রাজধানী তাঁহার হস্ত-স্খলিত হইলে, তিনি বিক্রমপুরে সেন-বংশের অন্যতর রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। পাঠানগণের সহিত তিনি ঘোর যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। বিশ্বরূপের ভ্রাতা মাধব এবং কাটোয়া-প্রদেশের সামন্ত-রাজ দনুজারি পাঠানগণের সহিত অনেক দিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ করেন। তাঁহাদের বীরত্বে আফগান্-সৈন্যগণ অনেক সময় ঘোর সঙ্কটে পতিত হইয়াছিল। বিশ্বরূপ-সেনের লোকান্তরের পর লক্ষ্মণ-সেনের পৌত্র দনৌজা-মাধব বহুদিন স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। এই দনৌজা-মাধব ও দনুজ রায় অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন হন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুলতান গয়েসউদ্দিন ইঁহার সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং বঙ্গের শাসনকর্ত্তা তুগ্‌রিল খাঁকে দমন-জন্য ইঁহার সহায়তা লইয়াছিলেন। দনৌজা-মাধব বিক্রমপুর হইতে চন্দ্রদ্বীপে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। বঙ্গের শেষ স্বাধীন-নৃপতিগণের যেরূপ নৌবল-বাহুবলের পরিচয় পাই, আসাম-প্রদেশের হিন্দু-নৃপতিগণও এই সময়ে নৌবল-বাহুবলে সেইরূপ প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন। সুলতান গয়েসউদ্দিন ইয়াস্ আসাম অধিকারের জন্য অভিযান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মপুত্র-নদে সাদীয়া পর্য্যন্ত তাঁহার রণতরী-সমূহ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু আসামের নৃপতি এরূপভাবে সুলতানের সৈন্যদলকে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন যে, পরাজয় স্বীকার করিয়া, তাঁহাকে গৌড়ে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। 'তাবকাৎ-ই-নাশিরী' গ্রন্থে পরাজয়ের কথা স্পষ্টভাবে লিখিত নাই। সে মতে প্রকাশ,—'দিল্লীর সম্রাট আল্‌তামাস ঐ সময় গৌড়-আক্রমণে অগ্রসর হইয়াছিলেন; সুতরাং গয়েসউদ্দিন আসাম-জয়ের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন।' যাহা হউক, আসাম-জয় করিতে গিয়া, বাধা প্রাপ্ত হইয়া, তিনি যে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা নানারূপেই প্রতিপন্ন হয়। *

আসামে হিন্দুনৃপগণের প্রভাব।

ত্রয়োদশ-শতাব্দীর প্রথমাংশে সুলতান গয়েসউদ্দিন যে চেষ্টায় বিফল-মনোরথ হন, পরবর্ত্তি-কালে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীতেও সে চেষ্টা চলিয়াছিল; কিন্তু তাহাতেও কেহ সফলকাম হন নাই। 'আলমগীরনামা' নামক মুসলমান-গণের শাসন-সংক্রান্ত ইতিহাসে প্রকাশ,—'১৩৩৭ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ সাহ এক লক্ষ সুসজ্জিত অশ্বারোহী সৈন্য সহ আসাম আক্রমণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার একটী সৈন্যও প্রত্যাবৃত্ত হয় নাই।' † পঞ্চদশ-শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গাধিপতি সুলতান হুসেন সাহ আসাম জয় করিতে যান। 'খেন'-বংশীয় রাজা নীলাম্বর তখন আসাম-প্রদেশে স্বাধীন-ভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। পশ্চিমে করতোয়া-নদীর তীর পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত হয়। কামরূপ তাঁহার রাজধানী ছিল। অসংখ্য রণতরী এবং চব্বিশ সহস্র অশ্বারোহী ও

* আসামের ইতিহাস-গ্রন্থে মিঃ গেইট লিখিয়াছেন;—"In the end he (Ghiyas Uddin) was defeated and driven back to Gour.' —*History of Assam* by Mr. E. A. Gait.

† আলমগীরনামা, ফরিস্তা ই ইরিয়া, রিয়াজুস-সালাতিন প্রভৃতির বর্ণিত উক্ত অংশ-সমূহের ইংরাজী অনুবাদ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে অধ্যাপক ব্লকম্যান প্রকাশ করেন।—Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1872,—Prof. H. Blochman's translation.

পদাতিক সৈন্য লইয়া, হুসেন সাহ নীলাম্বরের রাজ্য আক্রমণ করেন। সেই সময়ে রাজা দল-বলসহ পর্ব্বতে গিয়া আশ্রয় লন। রাজ্য অধিকৃত হইল মনে করিয়া, হুসেন সাহ আপনার পুত্রের উপর ঐ রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করিয়া চলিয়া আসেন। রাজ্য-রক্ষার জন্য বঙ্গাধিপতির বহুসংখ্যক সৈন্য সেখানে অবস্থিতি করে। ইহার পর, বর্ষা আরম্ভ হইলে, রাজা পর্ব্বত হইতে নামিয়া আসেন। তাঁহার যে সকল প্রজা হুসেন সাহের পুত্রের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, তাহারা সকলেই তখন রাজার পক্ষ অবলম্বন করে। ফলে, হুসেন সাহের পুত্র নিহত হন; তাঁহার সৈন্যদল, কেহ অনাহারে, কেহ বা শত্রুহস্তে প্রাণত্যাগ করেন। পারস্য-ভাষায়-লিখিত 'ফতিয়া-ই-ইব্রিয়া' গ্রন্থে ইবন মহম্মদ ওয়ালী (সিহাবুদ্দিন তালিস) বঙ্গাধিপতির আসাম-বিজয়-সংক্রান্ত এই বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের অপর নাম,—'তারিখ ফাত-ই-আসাম' অর্থাৎ আসাম-জয়-সংক্রান্ত ইতিহাস। ১৬৬২-১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে ঐ গ্রন্থ লিখিত হয়। 'রিয়াজুস-সালাতিন' গ্রন্থে হুসেন সাহের আসাম-জয়ের বিবরণ অন্যভাবে লিপিবদ্ধ আছে। তাঁহার বর্ণনায় প্রকাশ,—'বাঙ্গালার উত্তর-পূর্ব্ব-প্রান্তস্থিত আসাম-রাজ্য অধিকার করিতে মনস্থ করিয়া অসংখ্য রণতরী ও বহুসংখ্যক পদাতিক সৈন্য সহ হুসেন সাহ আসাম রাজ্যে উপস্থিত হন। কামরূপ, কামতা এবং অন্যান্য প্রদেশ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। ঐ সকল প্রদেশে তখন রূপনারায়ণ, মালকুঙার, গোসা লক্ষ্মণ ও লছমীনারায়ণ প্রভৃতি প্রতাপশালী রাজন্যবর্গ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।' যাহা হউক, হুসেন সাহ আসাম-প্রদেশের অংশ-বিশেষ অধিকার করিতে সমর্থ হইলেও তাঁহার বিজয়পতাকা যে অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। অপিচ, ঐ সময়ে আসামের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্যের অভ্যুদয় হইয়াছিল বলিয়া বুঝা যায়। তখন, কমতা-বিহার বা কুচবিহারে স্বাধীন নৃপতিগণ রাজত্ব করিতেন; দক্ষিণ-আসাম বা কামরূপ-প্রদেশে 'খেন' রাজগণের আধিপত্য বিস্তৃত ছিল; উত্তর আসামে ব্রহ্মপুত্র-নদের অধিত্যকা-প্রদেশে 'আহোম' * নৃপতিগণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। 'আহোম' রাজবংশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত 'বুরাঞ্জি'-গ্রন্থে এবং সম-সাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিকগণের রচনায়, এ সকল বিষয় অবগত হওয়া যায়। 'বুরাঞ্জি'-গ্রন্থ পুঁথির আকারে অনেক দিন হইতে লিখিত হইয়া আসিতেছিল। যখনই যে রাজা 'আহোম' বংশের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিতেন, পুঁথিতে তাঁহার সমসাময়িক বিবরণ লিখিত হইত। মিষ্টার গেইট বলেন,—আসামের ইতিহাস সম্বন্ধে 'বুরাঞ্জি' অতি বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থ। ঐ গ্রন্থে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক আসাম-আক্রমণের এবং 'আহোম'-বংশের প্রতিষ্ঠার যে বিবরণ বিবৃত আছে, তাহাতে আসামের রাজগণের নৌবল-বাহুবলের অনেক পরিচয়ই পাওয়া যায়। প্রথম, ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে রাজা ধীরনারায়ণের সহিত আহোমগণের ঘোর যুদ্ধ হয়।

'আহোম' নৃপতিগণ।

---

* খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্রহ্মপুত্র-নদের উপত্যকা-প্রদেশে আহোমগণের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। 'আহোমগণের আদি-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে নানা মতান্তর আছে। ব্রহ্মদেশ হইতে আহোমেরা আসামে আসিয়া উপনিবিষ্ট হন বলিয়া সাধারণতঃ প্রচার। সে মতে উঁহারা 'শান'-বংশ সম্ভূত। 'শান'-বংশের এক শাখা শ্যাম-

'বীরনারায়ণ' ছোট রাজা বলিয়া অভিহিত হন। তাঁহাকে খেন-বংশীয় অন্যতর নৃপতি বলিয়া বুঝা যায়। বিদর্ভ বা সাদীয়া নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। আহোমগণের সহিত জলযুদ্ধে 'সেরাতি' নামক স্থানে এবং স্থল যুদ্ধে 'দিখুমুখ' নামক স্থানে তাঁহার পরাজয় হয়। ঐ যুদ্ধে আহোমগণ 'খেন'-বংশের অধিকৃত বহু-প্রদেশ অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রাদেশিক স্বাধীন নৃপতিগণের পরস্পরের মধ্যে এরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রায়ই হইত। এতদ্ভিন্ন মুসলমান সৈন্যগণের বিরুদ্ধে কিরূপভাবে তাঁহারা যুদ্ধ-বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইতেন, নিম্নলিখিত ঘটনাগুলিতে তাহা উপলব্ধি হয়। ১৪৯৮ ও ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে মুসলমান-গণ আসাম-আক্রমণে অগ্রসর হন। ঐ সময় খেন-রাজবংশ এবং আহোম-রাজবংশ মুসলমানদিগকে বাধা প্রদান করেন। শেষোক্ত যুদ্ধে, মুসলমান ঐতিহাসিকগণ (রিয়াজুস-সালাতিন) লিখিয়া গিয়াছেন,—বঙ্গের মুসলমান-নৃপতির অসংখ্য রণতরী ব্রহ্মপুত্র-নদে উপস্থিত হইলেও আহোমগণকে বঙ্গাধিপতি পরাজিত করিতে সমর্থ হন নাই। তখন আহোমগণ ব্রহ্মপুত্র-নদ সম্পূর্ণরূপ সুরক্ষিত রাখিয়াছিলেন। ইহার পর, ১৫৩১-১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে পুনরায় মুসলমানগণ আসাম-আক্রমণে অগ্রসর হন। 'তেমানী' নামক স্থানে ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে আহোমগণের সহিত মুসলমানগণের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধে আহোম-গণ সম্পূর্ণরূপ জয়লাভ করেন। মুসলমান সেনাপতি, পরাজিত হইয়া, রণতরী-সমূহ পরিত্যাগ করিয়া, অশ্বারোহণে পলায়মান হন। পর বৎসর, ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে, মুসলমান সেনাপতি তুর্ব্বাক্ পুনরায় আসাম আক্রমণ করেন। প্রথম কয়েক দিনের যুদ্ধে তাঁহারা জয়যুক্ত হইয়াছিলেন বটে ; কিন্তু পরিশেষে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ 'সুকলেনের' নিকট তাঁহাদের পরাজয় হয়। সুহুংমুঙ বা স্বর্গনারায়ণ এই সময় আহোমগণের রাজা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ঐ বৎসর মার্চ্চ মাসে, 'দুইমণিশীলা' নামক স্থানে পুনরায় আহোম-গণের সহিত মুসলমানগণের ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধে বাঙ্গাল ও তাজু নামক দুইজন মুসলমান-সৈনাধ্যক্ষ এবং অসংখ্য মুসলমান-সেনা নিহত হইয়াছিল। 'বুরাঞ্জি' গ্রন্থে প্রকাশ,—ঐ যুদ্ধে আক্রমণকারিগণের দেড় হাজার হইতে আড়াই হাজার সৈন্য, বাইশখানি যুদ্ধ-জাহাজ এবং কতকগুলি সুবৃহৎ কামান ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বুরাঞ্জি, রাজবংশাবলী এবং কোচ-রাজবংশের বিবরণে এইরূপ আরও বহু যুদ্ধের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। যেমন আসাম-প্রদেশে, তেমনই বঙ্গের বিভিন্ন অংশে—এই সময় বলবীর্য্য-সম্পন্ন নৃপতিগণ বিদ্যমান ছিলেন। বঙ্গের শেষ আফগান নৃপতি দায়ুদ খাঁ পরাজিত ও নিহত হইলে, ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে, বঙ্গদেশে মোগল-সম্রাট্ আকবরের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হয়। সেই হইতে বঙ্গদেশ মোগল-সাম্রাজ্যান্তর্ভুক্ত হইয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে প্রকাশ। কিন্তু প্রকৃত-

---

দেশে ও অপর শাখা আসামে প্রতিষ্ঠিত হয়। আহোমগণ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী। ১২২৮ খৃষ্টাব্দে উঁহারা আসামে প্রবেশ করেন বলিয়া প্রকাশ। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আহোমগণ প্রকারান্তরে আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। 'আহোম্' শব্দ—'অহম্' শব্দের রূপান্তর। হিন্দু-সম্প্রদায়ের অহংবাদী বা ব্রহ্মবাদী ব্যক্তিগণ অহং বা ব্রহ্ম সংজ্ঞা লাভ করেন। তাঁহাদেরই এক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক ব্রহ্মদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ হিসাবে, আহোমগণ এ দেশেরই হিন্দু ;—এ দেশে আসিয়া পুনরায় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

প্রভাবে সমগ্র বঙ্গদেশ তখনও মোগল-সাম্রাজ্যের আধিপত্য স্বীকার করে নাই। বঙ্গের বিভিন্ন অংশের প্রাদেশিক নৃপতিগণ আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তখনও মোগল-সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। দৃষ্টান্ত-স্থলে বঙ্গের 'বার ভূঁইয়াগণের' প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয় উল্লেখ করিতেছি। বারভূঁইয়া বা দ্বাদশ ভৌমিকগণ সামন্ত-রাজ মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন-কাল হইতে সামন্ত-রাজগণের প্রাধান্যের পরিচয় পাই। সম্রাট্ বা রাজচক্রবর্ত্তী নৃপতি সকলের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের অধস্তন সামন্ত-রাজগণও বড় অল্প ক্ষমতা-সম্পন্ন ছিলেন না। অতি পুরাকালে সামন্তগণ 'মণ্ডল' নামে অভিহিত হন। তাঁহাদের উপর যাঁহারা ক্ষমতা-পরিচালনে সমর্থ হইতেন, তাঁহারা মণ্ডলাধিপতি, সম্রাট্ বা রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। প্রধানতঃ দ্বাদশ সামন্তের বা মণ্ডলের অধিপতিরাই রাজচক্রবর্ত্তীর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেন। * মন্বাদি সংহিতা-শাস্ত্রে এবম্বিধ মণ্ডল-গঠনের আভাস পাওয়া যায়। দ্বাদশ জন মণ্ডলের বা সামন্তের উপর মণ্ডলাধিপতি বা সম্রাটের অধিষ্ঠান—ভারতবর্ষের অনুসরণে প্রাচীন গ্রীসে, রোমে ও পারস্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। † 'মধ্যযুগে' ইউরোপে যে 'ফিউডেল'-প্রথা ‡ প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাতেও রূপান্তরে মণ্ডল-গঠনের স্মৃতি বিদ্যমান দেখি। ভূমির সহিত সম্বন্ধ ছিল বা ভূম্যধিকারী ছিলেন বলিয়া মণ্ডলগণ 'ভৌমিক' নামে পরিচিত হন। দ্বাদশ মণ্ডল বা দ্বাদশ ভৌমিক শব্দ হইতেই বারভূঁইয়া (বারভূঞা) শব্দের উৎপত্তি। বঙ্গদেশে অতি প্রাচীন-কাল হইতে মণ্ডল-প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল। বাঙ্গালার প্রাচীন কবিগণের গ্রন্থে 'বারভূঁঞার' উল্লেখ দেখা যায়। ঘনরাম-প্রণীত 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে' বিভিন্ন রাজসভার বর্ণন-প্রসঙ্গে বারভূঁঞার বর্ণনা আছে। পাল-বংশের এবং সেন-বংশের রাজত্বকালে বাঙ্গালার সামন্তগণ বা ভৌমিকগণ বিশেষ প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন ছিলেন। বঙ্গে আফগান-গণের আধিপত্য বিস্তৃত হইলেও ভৌমিকগণের সে প্রতিষ্ঠা লোপ পায় নাই। আফগান-গণ মণ্ডলাধিপতির স্থান অধিকার করেন বটে; কিন্তু সর্ব্ববিষয়েই তাঁহাদিগকে মণ্ডলগণের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইয়াছিল। মণ্ডলগণ পাল-বংশের বা সেন-বংশের রাজত্বকালে যেরূপভাবে আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন, আফগানগণের আধিপত্য-সময়েও তাঁহাদের অনেকের

বার ভূঁইয়াগণ।

* 'মণ্ডল' ও 'সম্রাট' শব্দ সম্বন্ধে 'শব্দকল্পদ্রুমে' এইরূপ বিবৃত আছে। যথা,—"মণ্ডলম্—দ্বাদশ রাজকম্। (ইতি মেদিনী)। সম্রাট—যো মণ্ডলেশ্বরঃ। ..যো মণ্ডলস্য দ্বাদশরাজমণ্ডলস্য ঈশ্বরঃ।"

† গ্রীসের ইতিহাসে 'ডোডেকোপোলিস' বা দ্বাদশ বিভাগ সংক্রান্ত বিবরণে দ্বাদশ ভৌমিকের আভাস পাওয়া যায়। গ্রীস-দেশে যখন দারায়ুসের অধিকার বিস্তৃত হয়, সামন্ত-রাজগণ তখন বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়াছিলেন।

‡ নর্ম্মাণ-বংশের অভ্যুদয়কালে ইংলণ্ডে 'ফিউডেল'-প্রথা (Feudal System) প্রবর্ত্তিত হয়। ঐ প্রথানুসারে রাজা সমস্ত ভূসম্পত্তির অধিকারী হন। রাজার নিকট হইতে আর্ল, ব্যারণ এবং নাইট প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর ভূম্যধিকারিগণ ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হন। যুদ্ধ-বিগ্রহে তাঁহারা পর্য্যায়ক্রমে রাজাকে সহায়তা করিবেন, ইহাই ধার্য্য থাকে। মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে (১১৫—১১৭ শ্লোকে) "একগ্রামদশগ্রামাদ্যধিপতি" প্রভৃতি প্রসঙ্গে 'ফিউডেল'-প্রথার মূল তথ্য অবগত হওয়া যায়।

সে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল। যদিও তখন ভৌমিকের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট দ্বাদশ জন ছিল বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায় না, কিন্তু 'ভৌমিক' বা 'ভূঁইয়া' নামে পরিচিত হইয়া বাঙ্গালার বহু ভূম্যধিকারী স্বাধীনভাবে ক্ষমতা-পরিচালনায় সমর্থ ছিলেন। বাঙ্গালার কোন্ কোন্ ভূম্যধিকারী দ্বাদশ ভৌমিকের অন্তর্ভুক্ত হন, তদ্বিষয়ে মতান্তর আছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজবংশ ভৌমিকত্বের সম্মান বা অধিকার লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং ভৌমিক-রাজবংশের পরিচয় লইতে গেলে, তাঁহাদের সংখ্যা দ্বাদশের অধিক হইয়া পড়ে। এক সময়ে নিম্নলিখিত ভূস্বামিগণ 'ভূঁইয়া' বলিয়া পরিচিত ছিলেন—(১) যশোহরের প্রতাপাদিত্য, (২) চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্প রায়, (৩) সাতৈলের রামকৃষ্ণ, (৪) ভূষণার মুকুন্দ রায়, (৫) বিক্রমপুরের কেদার রায়, (৬) ভুলুয়ার লক্ষ্মণ মাণিক্য, (৭) চন্দ্রপ্রতাপের চাঁদগাজি, (৮) চট্টগ্রামের ইশা খাঁ, (৯) ভাওয়ালের ফজল গাজি। এতদ্ভিন্ন, পুঁটিয়া, সুসঙ্গ-দুর্গাপুর, তাহেরপুর প্রভৃতির বরেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-রাজবংশ এবং দিনাজপুরের ও বিষ্ণুপুরের রাজবংশ দ্বাদশ-ভৌমিকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বলিয়া জানা যায়। তমলুকের রাজারাও ভূঁইয়া বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার সুইট নামক একজন খৃষ্ট-ধর্ম্ম-যাজক পূর্ব্ববঙ্গ-পরিভ্রমণে গমন করেন। তিনি তখন তিন জন হিন্দুকে এবং নয় জন মুসলমানকে দ্বাদশ ভৌমিকের অন্তর্ভুক্ত দেখিয়াছিলেন। মোগলগণ যখন বঙ্গদেশে আধিপত্য-বিস্তারের চেষ্টা করেন, প্রতাপাদিত্য প্রমুখ ভৌমিকগণ সেই সময়ে বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠান্বিত ছিলেন। পাঠানগণের সময়ে ভৌমিকগণের যে স্বাধীনতা ছিল, মোগলগণের বঙ্গাধিকারের পর তাঁহাদের সে স্বাধীনতা খর্ব্ব হইবার উপক্রম হয়। সুতরাং তাঁহারা মোগলগণকে বঙ্গাধিকারে বাধা প্রদান করেন। মোগলগণের বঙ্গাধিকার-পক্ষে সে বাধা বড় বিষম বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বাঙ্গালার কয়েক জন ভূম্যধিকারী সেই সময়ে যদি মোগল পক্ষে সহায়তা না করিতেন, তাহা হইলে বঙ্গদেশের সকল অংশ অধিকার করা তাঁহাদের কঠিন হইয়া দাঁড়াইত। আকবর বাদসাহ যখন দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন, মোগল-গৌরব-রবি যখন মধ্যাহ্ন-কিরণ বিকিরণ করিতেছেন, বঙ্গের কয়েক জন ভৌমিক সেই সময়ে মোগলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। তাহাতে ভৌমিকগণ তখনও কিরূপ বলবীর্য্যসম্পন্ন ছিলেন, স্বতঃই প্রতীত হয়। বাঙ্গালার শেষ পাঠান নৃপতি দায়ুদ খাঁর হস্ত-স্খলিত হইয়া বাঙ্গালার মসনদ মোগলগণের অধিকারে আসিলে, প্রথমে মোগল-দরবার হইতে বাঙ্গালার জন্য মুসলমান-শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই মুসলমান-শাসনকর্ত্তৃগণ বাঙ্গালায় বিশেষরূপ আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন নাই। পাঠান ও মোগল ভূম্যধিকারিগণ, পূর্ব্বে যাঁহারা আসিয়া বাঙ্গালায় প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহেন না; পরন্তু বাঙ্গালার হিন্দু-ভূস্বামিবর্গও অনেকে মোগল-শাসনের বিরুদ্ধাচারে প্রবৃত্ত হন। তখন, সূক্ষ্মদর্শী আকবর বাদসাহ, হিন্দু-শাসন-কর্ত্তার দ্বারা বঙ্গদেশ শাসনে প্রবৃত্ত হন। বাদসাহের প্রতিনিধি-শাসনকর্ত্তৃ-রূপে প্রথমে টোডরমল এবং অবশেষে রাজা মানসিংহ বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা হইয়া আগমন করেন। ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মানসিংহ বঙ্গের শাসনকর্ত্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ছলে-বলে-কৌশলে

বঙ্গের ভৌমিক-গণের উচ্ছেদ-সাধনে কৃতসঙ্কল্প হন। পূর্ব্ববঙ্গের ভৌমিকগণকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য মানসিংহকে বিপুল আয়োজন করিতে হইয়াছিল। প্রধানতঃ সেই উপলক্ষে ঢাকা-নগরে মোগলগণের 'নৌয়ারা' বা নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়। * বাঙ্গালার কোন্ কোন্ ভৌমিক মোগলবাহিনীর সম্মুখীন হইয়া মানসিংহের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া আপনাদের বাহুবল প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কয়েকজনের অল্প অল্প পরিচয় দিতেছি। প্রথম, শ্রীপুরের রাজা কেদার রায়। কেদার রায় নৌবলে বিশেষ বলীয়ান হইয়া উঠিয়াছিলেন। ১৬০২ খৃষ্টাব্দে মোগলদিগের কবল হইতে তিনি সন্দীপ উদ্ধার করেন। পর্ত্তুগীজগণের সহিত কেদার রায়ের বিশেষ মিত্রতা ছিল। সন্দীপ হইতে মোগলগণকে বিতাড়িত করিয়া তিনি পর্ত্তুগীজগণকে ঐ সন্দীপ প্রদান করেন। পর্ত্তুগীজ শাসনকর্ত্তা কারভালিয়াস্ সন্দীপের শাসন-ভার প্রাপ্ত হন। ইহাতে কেদার রায়কে এক সময়ে দুই প্রবল শত্রুর সম্মুখীন হইতে হয়। এক শত্রু—আরাকাণ-রাজ (মগগণ) ; অন্য শত্রু—মানসিংহ-পরিচালিত মোগল-সৈন্য। আরাকাণ-রাজের সহিত পর্ত্তুগীজগণের অনেক দিন হইতে ঘোর শত্রুতা চলিতেছিল। সন্দীপে পর্ত্তুগীজগণ প্রতিষ্ঠিত হইলে, সন্দীপ অধিকারের জন্য আরাকাণ-রাজের ক্ষুদ্র-বৃহৎ দেড় শত রণতরী উপস্থিত হয়। মিত্র পর্ত্তুগীজগণের রক্ষার জন্য কেদার রায় এক শত রণতরী প্রেরণ করেন। সে যুদ্ধে কেদার রায়েরই জয় হয়। তিনি আরাকাণ-রাজের ১৪৯ খানি রণতরী অধিকার করিয়া লন। এই ব্যাপারে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া, কেদার রায়ের বিরুদ্ধে আরকাণ-রাজ এক সহস্র রণতরী প্রেরণ করেন। কিন্তু তাহাতেও কেদার রায় অণুমাত্র বিচলিত হন না ; সেই যুদ্ধেও কেদার রায়ের জয় হয়। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই কেদার রায়কে মানসিংহের বিপুল বাহিনীর সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। প্রথমে মন্দ রায় মানসিংহের সেনাপতি-রূপে কেদার রায়ের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। তিনি এক শত রণতরী লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু কেদার রায় সে যুদ্ধে জয়লাভ করেন ; মন্দ রায় যুদ্ধে নিহত হন।

কেদার রায়।

---

* যেমন ভৌমিকগণকে দমন-জন্য, তেমনই মগ (আরাকাণ), ফিরিঙ্গী (পর্ত্তুগীজ) গণের আক্রমণ নিবারণ জন্য ঢাকা-সহরে 'নৌয়ারা' বা নৌবহর স্থাপিত হইয়াছিল। সেই নৌবহরের ব্যয়-নির্ব্বাহ-জন্য আকবর বাদসাহ কতকগুলি পরগণা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন নৌয়ারা রক্ষার জন্য নৌযানাদির উপর একটী কর ধার্য্য হইয়াছিল। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যে সকল পোত গতিবিধি করিত, তাহাদিগকে সেই শুল্ক দিতে হইত। প্রথমে তিন সহস্র পোত লইয়া নৌয়ারা গঠিত হইয়াছিল। পরিশেষে নৌয়ারার জন্য ৭৬৮ খানি রণতরী নির্দ্দিষ্ট থাকে। তবে, তখন জমিদারগণ জায়গীরদার-হিসাবে আবশ্যক-মত অধিক রণতরী সরবরাহে বাধ্য থাকেন। ৯২৩ জন পর্ত্তুগীজ বা ফিরিঙ্গী নৌবহরের নাবিকের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। নৌবহর-রক্ষায় মাসিক ব্যয় পড়িত—২৯,২৮২ টাকা। পোতাদির সংস্কার প্রভৃতিতে বার্ষিক মোট ব্যয় নির্দ্দিষ্ট ছিল—৮,৪৩,৪৫২ টাকা। চট্টগ্রাম হইতে ব্রহ্মপুত্র-তীরস্থিত রাঙ্গামাটী পর্য্যন্ত প্রদেশ রক্ষার জন্য ৮,১১২ জন সৈন্য এবং ৩,৫৯,১৮০ টাকা ব্যয় নির্দ্দিষ্ট ছিল। শ্রীহট্ট অঞ্চলে তখন পোত-নির্ম্মাণোপযোগী কাষ্ঠাদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাইত। সেই সকল কাষ্ঠে ঐ সকল পোত নির্ম্মিত হইত।—Blochman's *Contributions to the Geography and History of Bengal, Muhammadan Period*, (2) Taylor's *Topography and Statistics of Dacca*, (৩) আইন-ই-আকবরী প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

ইহার পর, ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে, কেদার রায়ের বিরুদ্ধে মানসিংহের বিপুল বাহিনী প্রেরিত হয়। পাঁচ শত সুসজ্জিত রণতরী সহ কেদার রায় এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মোগল-সেনাপতি কিলমাক্ শ্রীনগরে কেদার রায় কর্তৃক আক্রান্ত হন। বিজয়লক্ষ্মী এবারও কেদার রায়ের পক্ষ গ্রহণ করিবেন বলিয়া প্রথমে মনে হইয়াছিল। কিন্তু পরক্ষণে, ঘন ঘন কামান গর্জ্জনের মধ্যে, জয়-পরাজয়ের গতি পরিবর্ত্তিত হইল; কেদার রায় শত্রুহস্তে বন্দী হইলেন। বন্দী অবস্থায় মানসিংহের নিকটে তাঁহাকে উপস্থিত করা হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের অস্ত্রাঘাত-জনিত ক্ষতে অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। কেদার রায়ের পর প্রতাপাদিত্যের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রতাপাদিত্য বহু যুদ্ধেই মোগল-সৈন্যকে পর্য্যুদস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার বীরত্ব-খ্যাতির নিকট গৌড়-রাজধানীর যশ পরিম্লান হইয়াছিল। গৌড়ের যশ অপহরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার রাজধানী 'যশোহর' সংজ্ঞা লাভ করে। প্রতাপাদিত্যের জীবন ঘটনা-বৈচিত্র্য-পূর্ণ। তাঁহার পিতা বিক্রমাদিত্য, বাঙ্গালার সুলতান সুলেমান সাহের ও দায়ুদ খাঁর প্রিয়পাত্র ছিলেন। বর্ত্তমান যশোহর-জেলার দক্ষিণে, এখন যে প্রদেশ সুন্দরবন মধ্যে পরিগণিত—বিক্রমাদিত্য সেই প্রদেশে গিয়া রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। পিতা বিক্রমাদিত্য স্বাধীনরাজ-মধ্যে গণ্য হন,—প্রতাপের মনে বাল্যকাল হইতে এই বাসনা জাগরূক হয়। বিক্রমাদিত্য কিন্তু সে ভাব অন্তরে পোষণ করিতেন না। সামন্ত-ভৌমিকরাজ-মধ্যে পরিগণিত থাকিতে পাইলেই তিনি প্রীত ছিলেন। সেইজন্য, মোগলগণের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রদর্শন করাইবার উদ্দেশ্যে, পুত্র প্রতাপাদিত্যকে তিনি আগ্রায় ও দিল্লীতে প্রেরণ করেন। কিন্তু তাহাতে হিতে বিপরীত ফল হয়। মোগল-সৈন্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা বুঝিতে পারিয়া, প্রতাপাদিত্য স্বাধীন-রাজ্য-স্থাপনে কৃত-সঙ্কল্প হন। দিল্লী ও আগ্রা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর, প্রতাপাদিত্য গৌড়ের গৌরব নষ্ট করিবার চেষ্টা পান। তখন আর তিনি মুসলমানগণকে মণ্ডলাধিপতি রাজা বলিয়া গ্রাহ্য করেন না। বঙ্গের শাসন-ভার প্রাপ্ত হইয়া, প্রতাপাদিত্যকে দমন জন্য, তাই মানসিংহ বড়ই চঞ্চল হইয়া পড়েন। সৈন্যদল-প্রেরণে প্রতাপকে পরাভূত করিতে না পারিয়া, পরিশেষে মানসিংহ নিজেই প্রতাপাদিত্য-দমনে অগ্রসর হন। যুদ্ধে প্রথমে মানসিংহের পরাজয় হয়। তখন, মানসিংহ গৃহ-শত্রুর সন্ধানে ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হন। পিতৃব্য বসন্তরায়কে হত্যা করার জন্য পিতৃব্য-পুত্র কচু রায় প্রতাপের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসানল প্রজ্বলিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই প্রতিহিংসানলে মানসিংহের অভিযান-রূপ ঘৃতাহুতি প্রদত্ত হইল। কচু রায় ষড়যন্ত্র করিয়া প্রতাপাদিত্যকে শত্রু-হস্তে বন্দী করাইলেন। প্রতাপের স্বাধীন-রাজ্য-প্রতিষ্ঠার আশামূল অঙ্কুরে উচ্ছিন্ন হইল। দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ স্থান প্রতাপের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। তিনি বিভিন্ন-স্থানে রণপোত-নির্ম্মাণের কেন্দ্রসমূহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। চণ্ডীখান বা সাগর-দ্বীপে তাঁহার প্রধান পোতাধিষ্ঠ-স্থান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; ধুধালী, জাহাজঘাটা, চাকশ্রী প্রভৃতি বন্দরে তাঁহার পোত-সমূহ নির্ম্মিত হইত। দেশে-বিদেশে আধিপত্য-বিস্তারের জন্য তিনি সমুদ্রপথে জলযুদ্ধের উপযোগী অর্ণবপোত-সমূহ প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু বিধাতা

প্রতাপাদিত্য।

বিমুখ, কর্ম্মফল অলঙ্ঘনীয় ; সুতরাং তাঁহার কোনও আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হইল না। প্রতাপাদিত্য বন্দী ও হৃতসর্ব্বস্ব হওয়ার পর, তাঁহার নবরাজ্য সমূলে উৎপাটিত হইল। কতক বিজয়ী মোগল-সৈন্যের অত্যাচারে, কতক বা প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে, প্রতাপের রাজ্য অরণ্যে পরিণত হয়। সে জনপদ, কি পরিতাপের বিষয়, এখন সুন্দরবনের অন্তর্নিবিষ্ট। প্রতাপ ভিন্ন আর আর যাঁহারা মোগলের প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণ করিয়াছিলেন, ঈশা খাঁ তাঁহাদের অন্যতম। কিন্তু মোগলের প্রচণ্ড প্রতাপের নিকট তিনিও অধিক দিন আপন প্রাধান্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। এতদ্ভিন্ন আর আর যে ভৌমিকগণের পরিচয় পাই, তাঁহারা প্রায় সকলেই মোগলের সহিত যোগদান করেন। বিষ্ণুপুরের রাজা হাম্বীর বা হামীরমল্ল মোগলের পক্ষাবলম্বনে উড়িষ্যায় পাঠানগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ পাঠান-হস্তে বন্দী হইলে, হামীরমল্ল তাঁহার উদ্ধার-সাধন করেন। বাঙ্গালী ভৌমিকের সে বীরত্ব—মুসলমান ঐতিহাসিকগণই কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। বাকলা-চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র রায়ের বীরত্বে প্রতাপাদিত্য পর্য্যন্ত ঈর্ষান্বিত ছিলেন। রামচন্দ্র রায় প্রবল-প্রতাপশালী ও সমাজপতি বলিয়া পরিচিত হওয়ায়, তাঁহার পদ-প্রতিষ্ঠা গ্রহণে উৎসুক হইয়া, প্রতাপাদিত্য তাঁহার সংহার-সাধনে বদ্ধপরিকর হন। কিন্তু, সম্ভবতঃ সম্মুখ-সমরে জয়ের আশা অল্প ছিল বলিয়া, রামচন্দ্রের সংহার-সাধন-কল্পে তিনি কূট বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রতাপাদিত্যের কন্যা বিন্দুমতীর সহিত রামচন্দ্রের বিবাহ-সম্বন্ধ ধার্য্য হয়। বিবাহ-বাসরে রামচন্দ্রকে হত্যা করিয়া প্রতাপাদিত্য বাকলা-চন্দ্র-দ্বীপের আধিপত্য ও সমাজপতিত্ব গ্রহণ করিবেন মনস্থ করেন। কিন্তু বিবাহের পর প্রতাপের কন্যা বিন্দুমতী পতির নিকট পিতার গূঢ়-অভিসন্ধির—নৃশংস সঙ্কল্পের বিষয় ব্যক্ত করিয়া দেন। তখন, প্রতাপের পিতৃব্য বসন্তরায়ের ও আপন অনুচরগণের সহায়তায়, চতুঃষষ্টিদণ্ডযুক্ত পোতে আরোহণ করিয়া, পলায়নে রামচন্দ্র প্রাণ রক্ষা করেন। রামচন্দ্র রায়ের সহিত বিরোধ—প্রতাপের পতনের অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। রামচন্দ্র এবং তাঁহার পুত্র কীর্ত্তিনারায়ণ উভয়েই প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ছিলেন। প্রধানতঃ এই কীর্ত্তিনারায়ণের বাহুবলেই পর্ত্তুগীজগণ মেঘনার মোহানা হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। কীর্ত্তিনারায়ণের সহিত ঢাকার তাৎকালিক শাসনকর্ত্তা সখ্যতা-সূত্রে-আবদ্ধ হন; সুতরাং বঙ্গবিজয়ে তিনি মোগল-পক্ষই অবলম্বন করিয়াছিলেন। নবদ্বীপাধিপতি ভবানন্দ মজুমদার প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে সৈন্য-পরিচালনা করিয়া মানসিংহের সহায়তা করেন। এইরূপ, বাঙ্গালার ভূস্বামিগণের অনেকেরই বীরত্বের খ্যাতি আছে। কিন্তু 'ভুঁইয়া'-প্রথার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সে খ্যাতি লোপ পাইয়া আসে। টোডরমল এবং মানসিংহের কৌশলে বাঙ্গালার ভৌমিকগণের উচ্ছেদ-সাধন হয়।

ভৌমিক-প্রথার উচ্ছেদ-সাধন।

বঙ্গের প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া আসিয়া, টোডরমল প্রথমেই 'ভুঁইয়া'-প্রথার পরিবর্ত্তন-পক্ষে চেষ্টা পান। সেই সময় বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার "অসাল তুমার-জমা" প্রস্তুত হয়। তদনুসারে, ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে, বাঙ্গালা-দেশ ঊনবিংশ সরকারে এবং ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত হইয়াছিল। তখন হইতে

ভূঁইয়া বা সামন্ত-রাজগণ 'জমিদার' আখ্যা লাভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে ভূম্যধিকারীর বা জমিদারের সংখ্যাও বাড়িয়া যায়; ভৌমিক বা সামন্ত-রাজগণের যে ক্ষমতা ছিল, জমিদারগণের ক্ষমতা তাহার অপেক্ষা অনেক কমিয়া আসে। তবে, তখনও জমিদারগণ সৈন্যদল রক্ষা করিতে পারিতেন। জমিদারীর সুশৃঙ্খলা-রক্ষায় এবং আবশ্যকমত বাদসাহের সহায়তায় সেই সৈন্যদল নিযুক্ত হইত। 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে প্রকাশ,—'ভূঁইয়া-প্রথা পরিবর্তিত হওয়ার পরও বাঙ্গালার জমিদারগণ সৈন্যদল পোষণ করিতে পারিতেন। তাঁহাদের অধীনে তখনও ২৩,৩৩০ জন অশ্বারোহী, ৮,০১,১৫০ জন পদাতিক, ১৭০টী হস্তী ৪,২৬০টী কামান, ৪,৪০০ খানি রণতরী রাখার ব্যবস্থা ছিল। এখন ভারতবর্ষের অধিকাংশ করদ-মিত্র রাজন্য যে ক্ষমতার অধিকারী, বাঙ্গালার ভূস্বামিগণ তখনও সেই শক্তির অধিকারী ছিলেন। তখন, কোনও প্রদেশে কোনরূপ বিপ্লব উপস্থিত হইলে, বঙ্গের প্রতিনিধি-শাসনকর্তার ইঙ্গিতক্রমে, বাঙ্গালার ভূস্বামিবর্গই সেই বিপ্লব দমন করিতেন। মুসলমান-শাসনের শেষ সময় পর্য্যন্ত সেই প্রথা অব্যাহত ছিল। অর্দ্ধবঙ্গেশ্বরী মহারাণী ভবানীর রাজত্বকালে সীতারাম রায় প্রভৃতির সহিত যুদ্ধে এ প্রথারই অনুসরণ দেখিতে পাই। সীতারাম রায় যখন মহম্মদপুরে স্বাধীন-হিন্দু-রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন, বাঙ্গালার তাৎকালিক সুবেদার মুর্শিদ-কুলি-খাঁর পক্ষ-অবলম্বনে নাটোর-রাজধানী হইতে দেওয়ান দয়ারাম রায় তখন সসৈন্যে মহম্মদপুরে গমন করেন। সীতারাম রায়ের সহিত যুদ্ধে প্রথমে নবাবের সৈন্যদল প্রমাদ গণিয়াছিল; কিন্তু নাটোরের সৈন্যদল গিয়া সীতারাম রায়কে পরাজিত ও বন্দী করিতে সমর্থ হয়। দয়ারাম রায় প্রভৃতির কৌশলে সীতারাম রায় বন্দী ও হৃতসর্ব্বস্ব হইলেও তাঁহার বীরত্ব-খ্যাতি বঙ্গের ইতিহাসে জাজ্বল্যমান্ থাকিবে। সীতারাম যখন প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়া উঠিলেন, তখন যশোহর-প্রদেশ বারটী চাকলায় বিভক্ত ছিল। তাহার প্রতি চাকলায় এক একজন পরাক্রমশালী ভূস্বামী প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সেই ভূস্বামিগণ প্রত্যেকেই স্বাধীনতা অবলম্বনে প্রয়াসী হন;—প্রত্যেকেই বাদসাহকে রাজস্ব-প্রদানে অস্বীকার করেন। বাদসাহ বাহাদুরসাহের এবং ফেরোক্‌সাহের সময়ে ঐ প্রদেশের এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। তখন বাদসাহ, সেই সকল অবাধ্য ভূস্বামিগণকে বশীভূত করিবার জন্য, সীতারাম রায়ের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। সীতারাম বাহুবলে সেই দ্বাদশ চাক্‌লায় আপন আধিপত্য বিস্তার করেন। ফলে, বাদসাহ তাঁহাকে দ্বাদশ চাক্‌লার অধিপতি 'রাজা' বলিয়া স্বীকার করিয়া লন। ইহাতে বলদৃপ্ত হইয়া সীতারাম রায় বাঙ্গালার নবাবের প্রধান্য উড়াইয়া দিতে চান। সুতরাং নবাবের সহিত তাঁহার বিষম সমর উপস্থিত হয়। নবাবের সৈন্যদল সীতারাম রায়ের সহিত যুদ্ধে পুনঃপুনঃ পরাজিত হওয়ার পর, নবাবের জামাতা আবু তরাব নবাব-পক্ষের সৈন্য-পরিচালনার ভার প্রাপ্ত হন। কিন্তু সীতারাম রায়ের সেনাপতি মেনাহাতী, যুদ্ধে আবু তরাব্‌কে পরাজিত করেন এবং তাঁহার ছিন্ন-মস্তক আনিয়া সীতারাম রায়কে উপহার দেন। এই অপমান-জনক বিষম সমরের বিষয় স্মরণ করিয়া, প্রতিশোধ-প্রবৃত্তি নিবৃত্তির জন্য, নবাব মুর্শিদ-কুলী-খাঁ সীতারাম-দমনে বঙ্গের ভূস্বামিবর্গের সহায়তা

সীতারাম রায়।

গ্রহণ করেন। তাহাতে দয়ারাম রায়ের পরিচালিত নাটোরের সৈন্যদলের কৌশলে সীতারাম সমূলে উৎপাটিত হন। এই যুদ্ধে, জয়-পরাজয়ে, উভয়ত্রই বাঙ্গালীর বীরত্ব বিঘোষিত। বাঙ্গালার পূর্ব্বতন ইতিহাসে বাঙ্গালীর এবম্বিধ বীরত্বের বহু বিবরণ অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায়। কাহাকে রাখিয়া কাহার পরিচয় ঘোষণা করিব? বিক্রমপুরের অন্তর্গত শ্রীপুরের রাজা চাঁদরায়, চন্দ্রদ্বীপের দনৌজামাধব বা দনুজমর্দ্দনের উত্তরাধিকারী কন্দর্পনারায়ণ, ফতেহাবাদ ও ভূষণা-পরগণার মুকুন্দরাম রায়, ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য—ইঁহারা সকলেই 'ভৌমিক'-আখ্যায় অভিহিত এবং বীর বলিয়া পরিচিত ছিলেন। রাজা চাঁদরায় আপন বাহুবলে বিক্রমপুরের রাজধানী হইতে সন্দীপ পর্য্যন্ত আপনার অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই প্রভাবের নিদর্শন—তাঁহার প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর, রাজাবাড়ীর মঠ প্রভৃতি দেবালয় ও বিভিন্ন স্থানের শিব-মন্দিরাদিতে আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। কন্দর্পনারায়ণের প্রসিদ্ধি দেশে-বিদেশে পরিকীর্ত্তিত। রালফ ফীচ, ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে, কন্দর্প-নারায়ণের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রতিপত্তির বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। রাজা কন্দর্পনারায়ণের বহুসংখ্যক সমর-পোত ছিল। তাঁহার ব্যবহৃত পিত্তলের একটী বৃহৎ কামান আজিও তাঁহার রাজধানীতে দৃষ্ট হয়। ঐ কামানে কন্দর্পনারায়ণের নাম ও ৩৮৮ অব্দ খোদিত আছে। প্রতাপাদিত্যের প্রতিযোগী পূর্ব্বোক্ত রামচন্দ্র রায়—এই কন্দর্পনারায়ণেরই পুত্র। ফরিদপুরের নিকটে পদ্মার পরপারে চরমুকুন্দিয়া পল্লী—মুকুন্দরায়ের প্রভাবের বিষয় আজিও স্মরণ করাইয়া দেয়। মুকুন্দ-রায়, মুরাদখাঁ-পরিচালিত মোগল-সৈন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। মুরাদ খাঁ—মুকুন্দ রায়ের হস্তে নিহত হন। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে মুকুন্দরায়ের এই বীরত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল। 'আকবরনামা' প্রভৃতি গ্রন্থে মুকুন্দরায়ের বীরত্বের কথা লিপিবদ্ধ আছে। লক্ষ্মণমাণিক্য—নোয়াখালী-জেলার ভুলুয়া-পরগণার ভূম্যধিকারী ছিলেন। তিনি মেঘনা-নদীর পূর্ব্ব-তীর পর্য্যন্ত আপনার আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন। বর্ত্তমান নারায়ণগঞ্জের উত্তরে, ক্রোশেক ব্যবধান মধ্যে, খিজিরপুর নামে এক পল্লী পরিদৃষ্ট হয়। ঐ পল্লী ঈশা খাঁর ক্রীড়াভূমি ছিল। পরিশেষে তিনি সুবর্ণগ্রামে রাজধানী স্থাপন করেন। বিভিন্ন কেন্দ্রে তাঁহার দুর্গ-সমূহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। আসাম-প্রদেশের রাঙ্গামাটীতে, নারায়ণগঞ্জের পরপারে ত্রিবেণীতে এবং ব্রহ্মপুত্রের লক্ষাশাখামূলে এগার-সিন্ধুতে—তাঁহার দুর্গের পরিচয়-চিহ্ন আজিও পরিলক্ষিত হয়। ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে রালফ ফীচ সুবর্ণগ্রামে গিয়া ঈশা খাঁর প্রভাব লক্ষ্য করেন। ফীচের বর্ণনায় প্রকাশ,—'এক সময় সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গে ঈশা খাঁর প্রাধান্য বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ঈশা খাঁ খৃষ্টানদিগকে বড়ই সমাদর করিতেন।' দিল্লীর বাদসাহের প্রাধান্য স্বীকার না করায়, ঈশা খাঁর বিরুদ্ধে মোগল-সম্রাটের সৈন্যদল প্রেরিত হইয়াছিল। ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে মোগল-সেনাপতি সাহাবাজখাঁ ঈশা খাঁর রাজ্য আক্রমণ করেন। যুদ্ধে ঈশা খাঁ বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাহাতে পরাজিত হইয়া

চাঁদ রায়, কন্দর্পনারায়ণ প্রভৃতি।

ঈশা খাঁ।

সাহাবাজখাঁকে পলায়ন করিতে হয়। ফলে ঈশা খাঁ স্বাধীন নৃপতি বলিয়া পরিচিত হন। কিন্তু তখন আকবর বাদসাহ দিল্লীর সিংহাসনে সমারূঢ়, তাঁহার অমিত প্রভাব দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত। ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি মানসিংহের উপর পূর্ব্ববঙ্গ অধিকারের ভার অর্পণ করিলেন। মানসিংহ প্রথমেই এগারসিন্ধুর দুর্গ অবরোধ করেন। তখন ঈশা খাঁ স্থানান্তরে ছিলেন। দুর্গ অবরোধের সংবাদ পাইয়া ঈশা খাঁ সমরক্ষেত্রে আসিয়া অবতীর্ণ হইলে, কোনও বিশিষ্ট কারণে,মানসিংহের সৈন্যদল যুদ্ধে অনভিলাষ প্রকাশ করে। তখন, ঈশা খাঁর সহিত মানসিংহের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের প্রস্তাব হয়। দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে যে জয়ী হইবে, রাজ্য তাঁহারই অধিকারে আসিবে স্থির হইয়া যায়। মানসিংহ দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে প্রথমে ছলনা করিয়াছিলেন। আপনার অপেক্ষা বলিষ্ঠ-জ্ঞানে আপনার জামাতাকে প্রথমে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে প্রেরণ করেন। মানসিংহ-ভ্রমে ঈশা খাঁ তাঁহারই সহিত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। তাহাতে ঈশা খাঁর হস্তে মানসিংহের জামাতার মৃত্যু ঘটে। তখন মানসিংহ, আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া, পুনরায় ঈশা খাঁকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করেন। মানসিংহের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়া, ঈশা খাঁ পুনরায় দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এবার মানসিংহের—নিজেরও পরাজয় ঘটে। যুদ্ধে প্রথমেই মানসিংহের তরবারি ভগ্ন হয়। ঈশা খাঁ কাপুরুষ হইলে, তদ্দণ্ডেই মানসিংহের জীবন-সংহার করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি আপন হস্তের তরবারি মানসিংহকে প্রদান করিতে চাহিলেন। কিন্তু মানসিংহও প্রকৃত বীরপুরুষ। তিনি সে তরবারি গ্রহণ করিলেন না। তখন, অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া ঈশা খাঁ নিরস্ত্র অবস্থায় মানসিংহের নিকট মল্ল-যুদ্ধের প্রস্তাব করিলেন। মানসিংহ আর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন না। পরন্তু তিনি বীরের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনেব আয়োজন করিলেন। ঈশা খাঁ যথাযোগ্য সম্মান ও উপহার পাইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ইহার পর ঈশা খাঁ আগ্রায় গমন করিলে, তাঁহার বীরত্ব-বিবরণ শ্রবণ করিয়া, আকবর বাদসাহ তাঁহাকে 'দেওয়ান' ও 'মসনদ আলি' প্রভৃতি উপাধি-ভূষণে ভূষিত করিলেন। তখন বাঙ্গালার বহু পরগণায় অপ্রতিদ্বন্দ্বিতার সহিত ঈশা খাঁর অধিকার বিস্তৃত হইল। এই ঈশা খাঁর বীরত্ব-বিবরণ পাঠ করিয়া,কেহ কেহ হয় তো বলিতে পারেন,—'ঈশা খাঁ মুসলমান ছিলেন,তাঁহার বীরত্ব-বিবরণে মুসলমানেরই বীরত্ব-কাহিনী প্রকাশ পাইতেছে; তাহাতে হিন্দুর বা বাঙ্গালীর কৃতিত্বের নিদর্শন কিছু আছে কি ?' ঈশা খাঁর পূর্ব্ব-বিবরণ স্মরণ করিলে, সে তথ্যও নিরূপিত হইতে পারে। ঈশা খাঁর পিতা হিন্দু ছিলেন। তাঁহার নাম—কালিদাস। হুসেন সাহের রাজত্বকালে কালিদাস মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ঈশা খাঁ—সেই সূত্রেই মুসলমান। হিন্দুই হউন আর মুসলমানই হউন, তাঁহার বীরত্ব বঙ্গদেশীয় ভূস্বামীর বীরত্ব বলিয়া চিরদিন বিঘোষিত হইবে। বাঙ্গালীর বীরত্বের ও সাহসের এবম্বিধ আরও কত পরিচয় পাওয়া যায়। আলিবর্দ্দি খাঁর শাসন-সময়ে রাজা কীর্ত্তিচাঁদ ও রাজা রামনারায়ণ নবাবের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিদ্রোহী মুস্তফা খাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। সিরাজউদ্দৌলার রাজত্বকালে দেওয়ান মাণিকচাঁদ ও মোহনলাল যে বীরত্ব প্রদর্শন করেন, ইতিহাস-পাঠকের তাহা অবিদিত নাই। ঐতিহাসিকগণের অনুসন্ধানেই এখন

প্রকাশ পাইতেছে, মাণিকচাঁদ ও মোহনলাল উভয়েই বাঙ্গালী ছিলেন। শারীরিক শক্তি ও অপরিসীম সাহসিকতার জন্যও বাঙ্গালীর খ্যাতির অবধি নাই। ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন বলিয়া, ফরিদসাহ 'সেরসাহ' নামে পরিচিত হন। ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধে পরাক্রম দেখাইয়াই অস্তাজিলো 'সের আফগান' নাম এবং লাবণ্যরূপিণী নুরজাহানকে লাভ করেন। এই দুই বিবরণ ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত আছে। কিন্তু কোনও বাঙ্গালী বীরের ঐরূপ বীরত্বের ও পরাক্রমের পরিচয় পাওয়া যায় না কি? অনেক দৃষ্টান্ত আছে। একটা উল্লেখ করিতেছি। ঢাকা-জেলার উলাইল পরগণার উদয়নারায়ণ—কোনক্রমেই সেরসাহের বা সের আফগানের অপেক্ষা অল্প-শক্তিশালী বা অল্প-পরাক্রমশালী ছিলেন না। উদয়নারায়ণ উত্তরাধিকার-সূত্রে অনেক ভূ-সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু মুর্শিদাবাদের নবাব-বংশীয় এক ব্যক্তি তৎসমুদায় অধিকার করিয়া লন। তাহাতে উদয়নারায়ণ মুর্শিদাবাদে নবাবের নিকট বিচারপ্রার্থী হন। নবাব বলেন,—'তুমি আপন সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিবে কি না—তাহার প্রমাণ না পাইলে, তোমাকে ঐ বিপুল সম্পত্তির অধিকার দান করিতে পারি না।' উদয়নারায়ণ পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হন। নবাব তখন পিঞ্জরাবদ্ধ একটী প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র আনয়ন করাইয়া তাহার সহিত উদয়নারায়ণকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে বলেন। যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিলে তাঁহার সম্পত্তি তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করা হইবে। যুদ্ধে নিহত হইলে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বা তাঁহার বংশধরগণের ঐ সম্পত্তিতে কোনই অধিকার থাকিবে না। উদয়নারায়ণ সেই পরীক্ষা-প্রদানেই প্রবৃত্ত হন। উদয়নারায়ণের সহিত যুদ্ধে ব্যাঘ্র নিহত হয়। একসময়ে বাঙ্গালী এইরূপে আপনার বীরত্ব ও পরাক্রম দেখাইয়া আপনার সম্পত্তি উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কত উল্লেখ করিব? যশোহর চাঁচড়া-রাজবংশের ভবেশ্বর রায়, দিনাজপুর রাজবংশের আদিপুরুষ রামনাথ রায়—ইঁহাদেরও বীরত্ব-খ্যাতি অল্প ছিল না। ফলতঃ, শৌর্য্যে-বীর্য্যে, নৌবলে-বাহুবলে, পরাক্রমে-প্রভাবে পুরাকালে বাঙ্গালী কখনই হীন ছিলেন না।

উদয়নারায়ণ।

উপসংহারে অন্যান্য বক্তব্য।

প্রাচীন বঙ্গের কৃতিত্ব-পরিচয় কোন্ দিকে না সুপরিস্ফুট! বঙ্গদেশের প্রাচীনত্ব-বিষয়ে সংশয়-সন্দেহ ভিত্তিহীন। বঙ্গদেশের পবিত্রতা-বিষয়ে ভূয়সী প্রমাণ বিদ্যমান। জ্ঞান-সূর্য্য বঙ্গদেশেই প্রথম রশ্মি বিস্তার করেন; বঙ্গদেশ হইতে জ্ঞান-বিভা দিকে দিকে বিচ্ছুরিত হয়। সনাতন-ধর্ম্ম এই বঙ্গদেশেই প্রথমে পরিপুষ্ট হইয়াছিল। পুণ্যপূত পবিত্র ক্ষেত্র বলিতে বঙ্গদেশকেই প্রথমে বুঝাইয়াছিল। সচ্চিন্তা সদ্ভাবের বিকাশ এই বঙ্গদেশেই প্রথম দেখিতে পাই। সংসারের শ্রেষ্ঠ-সম্পৎ জ্ঞান-স্ফূর্ত্তি এই বঙ্গদেশেই প্রথম লক্ষ্য করি। বঙ্গদেশ হইতেই ধর্ম্মপ্রচারকগণ দিকে দিকে ধর্ম্মের আলোক বিস্তার করিয়াছিলেন; বঙ্গদেশ হইতেই দিগ্-দিগন্তে কলাবিদ্যার বিস্তার হইয়াছিল। বাঙ্গালী কখনই বলবীর্য্যহীন নিরুদ্যম বা কাপুরুষ ছিলেন না। বাঙ্গালীর বাহুবলে দেশে-বিদেশে বঙ্গের বিজয়পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল। সাগরের পরপারে, দ্বীপ

প্রাচীন বঙ্গের কৃতিত্ব।

দ্বীপান্তরে গিয়া, উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করিয়া, বাঙ্গালী ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইয়াছিলেন,—আপনার অমিত-বিক্রমের অসীম-বাহুবলের পরিচয় দিয়াছিলেন। এ সকল কাহিনী এখন কল্পনা বলিয়া মনে হইতে পারে,—স্বপ্ন বলিয়া প্রতীত হইতে পারে; কিন্তু সত্য—নিঃসন্দেহ সত্য। প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-বিভবের বিষয় পূর্ব্বের কয়েক পৃষ্ঠায় যাহা বিবৃত করা হইল, তাহাতেই সে সত্যের আভাস পাওয়া যাইবে। ভবিষ্যতে 'পৃথিবীর ইতিহাসের' অন্তর্গত 'বঙ্গদেশ' খণ্ডে এ সকল বিষয় বিশদভাবেই বিবৃত করা হইবে। এক্ষণে বঙ্গের প্রাচীনত্বের বিষয়ে দুই এক কথা বলিয়া এতৎপ্রসঙ্গের উপসংহার করা যাইতেছে। প্রাচীন বঙ্গের আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রথমেই প্রশ্ন উঠিতে পারে—বঙ্গের প্রাকৃতিক অবস্থা কিরূপ ছিল? আধুনিক অধিকাংশ পণ্ডিত বঙ্গের প্রাচীনত্ব-সম্বন্ধে সন্দিহান—বঙ্গের আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন করার পক্ষেই প্রযত্নপর। কয়েক জন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের অনুসরণ ভিন্ন, তাঁহাদের এবম্বিধ মতের প্রকৃষ্ট কারণ কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। এই ভূখণ্ড পূর্ব্বে সমুদ্রজলে নিমজ্জিত ছিল, অল্প দিন হইল মৃত্তিকা সঞ্চিত হইয়া এই ভূখণ্ড গঠিত হইয়াছে, সেদিন পর্য্যন্ত এই ভূখণ্ড জলজঙ্গল-পরিপূর্ণ ও অনার্য্য-জাতির বসতি-মধ্যে পরিগণিত ছিল;—অধুনা অধিকাংশ ব্যক্তিই এবম্বিধ মতের পরিপোষক। তাঁহারা বলেন,—'বঙ্গে ব্রাহ্মণগণের আগমন তো সেদিনের ঘটনা! সুর-বংশীয় নৃপতি আদিসুর যজ্ঞ-কার্য্যের জন্য বঙ্গে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন; তাই এখন বঙ্গে ব্রাহ্মণের বাস দেখিতে পাইতেছি। নচেৎ, এদেশ—আধুনিক, অপবিত্র এবং সর্ব্ববিধ প্রতিষ্ঠা-বিরহিত।' অনেক দিন হইতে এই কথা শুনিতে শুনিতে কাণ ঝালপালা হইয়া আসিতেছে। শিশু বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াই এইরূপ শিক্ষা পায়; কেবল বঙ্গদেশ সম্বন্ধে নহে, সমগ্র ভারতবর্ষ-সম্বন্ধেই এইরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। তাহারা শিক্ষা পায়,—'হিমালয়ের পরপারস্থিত উত্তর-দেশ হইতে একদল কৃষিকর্ম্ম-পারদর্শী সুতরাং সুসভ্য লোক আসিয়া এই অসভ্য বর্ব্বর দেশকে সুসভ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। আগন্তুকগণ আর্য্য (ধাত্বর্থ অনুসারে কৃষিকার্য্যক্ষম) * নামে অভিহিত হন। তাঁহারা ভারতবর্ষের যে অংশ আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাদের বসবাস-হেতু সে অংশের নাম আর্য্যাবর্ত্ত হইয়াছিল।' এ শিক্ষায় বালক বঙ্গদেশের অস্তিত্ব কোথায় খুঁজিয়া পাইবে? হিমালয়ের পরপার

আধুনিকত্ব বিষয়ে মত।

* ম্যাক্সমুলার প্রভৃতির অনুসরণে 'প্রকৃতিবাদ' অভিধানকার এ বিষয়ে লিখিয়াছেন,—"লাটিন, গ্রীক স্যাংলোস্যাক্সন্, ইংরেজী, রুশ, আইরিশ, কর্ণিশ, ওয়েলস্, প্রাচীন নর্স, লিথুয়েনিক প্রভৃতি অনেক ইউরোপীয় ভাষায় 'হল' ও 'কৃষিবাচক' কতকগুলি শব্দ আছে। তাহা 'অর' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। ঐ 'অর' ধাতুর অর্থ ভূমিকর্ষণ। ইহাতে বোধ হয়, আর্য্যেরা একত্র সংশ্লিষ্ট থাকিয়া কৃষিকার্য্য করিতেন এবং তদনুসারে তাঁহারা 'অর্য্য' বা 'আর্য্য' বা তদনুরূপ অন্য কোনও নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যদিও সংস্কৃত ভাষায় অবিকল 'অর' ধাতুর উল্লেখ নাই (সংস্কৃত ভাষায় 'ঋ' ধাতু আছে, তাহা হইতে অর্য্য ও আর্য্য উভয় শব্দই নিষ্পন্ন হইতে পারে); কিন্তু অন্য অধিকাংশ ভাষার ঐ সমস্ত কৃষি ও হলবাচক শব্দের পর্য্যালোচনার দ্বারা ঐ ধাতুটা আবিষ্কৃত হইয়াছে।" অন্যান্য জাতিরা শ্রেষ্ঠ আর্য্যজাতির সহিত আপনাদের সম্বন্ধ দেখাইয়া বড় হইবার উদ্দেশ্যে আর্য্য-শব্দের ঐরূপ ধাত্বর্থ নির্দ্ধারণ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু এরূপ অর্থ যে একান্ত অসঙ্গত, তাহা আমরা পূর্ব্বেই (পৃথিবীর ইতিহাস প্রথম খণ্ডে) প্রতিপন্ন করিয়াছি।

হইতে যাঁহারা আসিলেন, তাঁহারা প্রথমে হিমালয়ের নিকটে নিকটে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে থাকিবেন, এবং তত্তৎপ্রদেশে স্থান-সঙ্কুলান না হইলে তবে তো বঙ্গদেশের অভিমুখে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইবেন! এই শিক্ষা—এই চিন্তা মস্তিষ্কে প্রবেশ করিলে, বঙ্গাদি দেশ সাগর-গর্ভে প্রোথিত থাকা ভিন্ন অন্য সিদ্ধান্ত কি আর সম্ভবপর? এই মূলে গলদ যেদিন হইতে প্রবেশ করিয়াছে, সেই দিন হইতেই বঙ্গের অনস্তিত্ব, আধুনিকত্ব, অপবিত্রতা প্রভৃতির কল্পনা মস্তিষ্ক অধিকার করিয়া বসিয়াছে। পাশ্চাত্য-জাতির সহিত সংশ্রবের পূর্ব্বে, বঙ্গাদি দেশের উপর পাশ্চাত্য-প্রভাব বিস্তৃত হওয়ার পূর্ব্বে, এবম্বিধ চিন্তা কখনও কাহারও মস্তিষ্কে স্থান পাইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। কোনও শাস্ত্র-গ্রন্থে কিম্বা কোনও প্রাচীন পুঁথিপত্রে বঙ্গের আধুনিকত্ব বা অপবিত্রতা-মূলক কোন উক্তি দেখিতে পাইবেন না। যদি কোথাও কেহ দেখিতে পান, তাহা বঙ্গাদি দেশের প্রতি বিদ্বেষবিশিষ্ট কোনও ব্যক্তি কর্তৃক পরবর্ত্তিকালে সংযোজিত হইয়াছে বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। তাঁহাদের চাতুর্য্যে ও পাশ্চাত্য-মতের প্রভাবে উক্ত ভাবপ্রবাহ দেশমধ্যে প্রবাহিত হইয়াছে—নিঃসন্দেহ। সাধারণতঃ যে যে যুক্তি অবলম্বনে বঙ্গদেশের আধুনিকত্ব প্রমাণ করা হয়, তাহার দুই-একটী প্রধান যুক্তি নিম্নে প্রকটন করা যাইতেছে। প্রথম, বঙ্গদেশের কতকগুলি গ্রাম-নগরের দ্বীপান্তক নাম দৃষ্ট হয়; যথা নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ, চন্দ্র-দ্বীপ, সন্দ্বীপ ইত্যাদি। সাগর-মধ্যে প্রথমে দ্বীপগুলির সঞ্চার হইয়া ক্রমশঃ এই সকল দ্বীপ বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ 'দিয়া'-সংযুক্ত যে কতকগুলি গ্রাম-নগর দৃষ্ট হয় (কাঁটাদিয়া, জয়দিয়া, সাগরদিয়া প্রভৃতি), সেগুলিও 'দ্বীপ' ছিল। 'দিয়া'—দ্বীপের অপভ্রংশ। 'কাটী' ও 'চর' প্রভৃতি যুক্ত নগর-গ্রামের (চরসংযুক্ত গ্রাম; যথা,—সুখচর, শিবচর, বগচর, পাঁচচর প্রভৃতি; কাটী-সংযুক্ত গ্রাম; যথা,—রায়েরকাটী, স্বরূপকাটী, কলসকাটী, ঝালকাটী, বিদ্যানন্দকাটী ইত্যাদি) নাম দেখিয়াও ঐ সকল স্থান সমুদ্রের গর্ভ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। বাদায় খাল কাটিয়া বাঁধ বাঁধিয়া গ্রাম-পত্তন হয়; নদীর চর, সমুদ্রের চর বসতি-যোগ্য হয়;—ইহা অনেকেরই প্রত্যক্ষীভূত। সুতরাং সেই প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রভাবে বঙ্গের গ্রাম-নগর-সমূহ সেদিন সমুদ্রগর্ভ হইতে উঠিয়াছিল প্রতিপন্ন হয়। সাগব শুষ্ক হইয়া 'শুষ্কসাগর' 'শুষ্কচর' হইতে 'সুখসাগর' 'সুখচর' প্রভৃতি গ্রামের নামোৎপত্তি ঘটিয়াছে। 'দহ'-সংযুক্ত স্থান-সমূহ (চক্রদহ, খড়দহ, এঁড়িয়াদহ প্রভৃতি) সমুদ্রান্তর্গত দহ-পার্শ্বাস্থিত গ্রাম ছিল বলিয়াই এরূপ সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। এই হইল—একবিধ যুক্তি। বলা বাহুল্য, এ প্রকার যুক্তি নিতান্তই ভিত্তিহীন। গ্রামের নামকরণের সহিত ঐরূপ সম্বন্ধ টানিয়া আনিয়া এইরূপ গুরুতর সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কখনই সমীচীন নহে। গ্রামের নাম যদি হয়—রত্নপুর; তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে গ্রামখানি রত্নে পরিপূর্ণ ছিল? গ্রামের নাম—সুবর্ণগ্রাম; বুঝিতে হইবে কি—গ্রামখানি সুবর্ণে মণ্ডিত? এইরূপ দ্বীপান্তক নাম দেখিয়া গ্রামকে কখনও সমুদ্র-মধ্যগত দ্বীপ বলা যাইতে পারে না। 'নয়ন-কমল' বলিতে 'কমলের নয়ন' না বুঝাইয়া 'কমল-বৎ' প্রতীয়মান নয়ন বুঝাইয়া থাকে, 'কুঞ্জর-গতি'

আধুনিকত্বের কারণ-কল্পনা যুক্তিহীন।

ধসিতে 'কুঞ্জর-বৎ' পদে গমন না বুঝাইয়া মন্থর-গমন বুঝায়। দ্বীপ, চর প্রভৃতি শব্দান্তক গ্রামের নাম দেখিয়াও তৎসমুদায়কে সমুদ্রমধ্যস্থিত দ্বীপ বা চর বলিয়া সিদ্ধান্ত না করিয়া 'দ্বীপ-বৎ' বা 'চর-বৎ' প্রতীয়মান গ্রাম-নগর মনে করা যাইতে পারে। বাস্তবিকও তাই। দ্বীপ, চর প্রভৃতি যুক্ত যে সকল গ্রাম-নগর দেখিতে পাই, সেগুলি নদীর পার্শ্বস্থিত জল-পরিবেষ্টিত গ্রাম-নগর ছিল, সম্ভব হইতে পারে ; কিন্তু সমুদ্র-মধ্যগত গ্রাম-নগর ছিল বলিয়া মনে হয় না। পদ্মা প্রভৃতি নদীর কিনারাস্থিত বা মধ্যবর্ত্তী 'চর' বা 'দ্বীপ' সর্ব্বদাই গঠিত হইতেছে, তাহাতে যে গ্রাম বা নগর গঠিত হয়, তাহার দুই একটীর নামে 'চর' বা 'দ্বীপ' শব্দ সংযুক্ত থাকিতে পারে। কিন্তু 'দ্বীপ' বা 'চর' সংযুক্ত ঐসকল স্থান দেখিয়া কালে যদি কেহ অনুমান করেন,—ঐগুলি সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল ; তাহাই কি মানিয়া লইতে হইবে ? অন্যপক্ষে আবার, সমুদ্রগর্ভস্থিত অধিকাংশ দ্বীপের বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখুন ; বুঝিতে পারিবেন,—সেগুলির নাম প্রায়ই দ্বীপান্তক নহে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের সমষ্টিতে যে দ্বীপপুঞ্জ গঠিত হয়, তাহাদেরও প্রত্যেকের এক একটি স্বতন্ত্র নাম আছে ; সে সকল নামের সহিত দ্বীপ-শব্দের ক্বচিৎ সংশ্রব দৃষ্ট হয়। এইরূপ, দহান্তক পল্লীর নাম দেখিয়া, সে পল্লী সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল মনে করিতে গেলে, বিষম গণ্ডগোলে পড়িতে হয়। তাহাতে, বৃন্দাবন পর্য্যন্ত সমুদ্রগর্ভে প্রোথিত ছিল স্বীকার করিতে হয় ; কারণ, বৃন্দাবনে আজিও 'কালীদহ' চিহ্নিত হইয়া থাকে। কালীদহ অর্থাৎ দহান্তক স্থান যখন ছিল,তখন নিশ্চয়ই সমুদ্র ছিল বলিব কি ? এবম্বিধ যুক্তি যে একান্ত অন্তঃসারশূন্য, তাহা বলাই বাহুল্য। একটু সামান্য চিন্তা করিলেই দ্বীপান্তক, চরান্তক, দহান্তক গ্রাম-নগর-সমূহের উৎপত্তি-তত্ত্ব অন্যদিক দিক দিয়াও নির্দ্ধারিত হইতে পারে। এখন যে কারণে পূর্ব্ববঙ্গের পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদনদীর প্রবাহান্তর্বর্ত্তী স্থানসমূহে 'চর' 'দ্বীপ' প্রভৃতি শব্দসংযুক্ত পল্লী-সূচনা হইতেছে, পশ্চিম-বঙ্গেও সেই কারণে ঐ সকল শব্দ-সংযুক্ত গ্রাম-নগরাদির সৃষ্টি হইয়াছিল বলিতে পারি। একটী বিষয় স্মরণ করিলেই এ তথ্য নির্ণীত হইতে পারে। গঙ্গার প্রধান স্রোত পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গ দিয়া প্রবাহিত ছিল, ইহা অবিসম্বাদিরূপে প্রতিপন্ন হয়। কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে ঐ স্রোত পূর্ব্ববঙ্গাভিমুখে প্রবাহিত ও পদ্মা নামে পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। এখন যে জলপ্রবাহের প্রভাবে পূর্ব্ববঙ্গে 'চর' 'দ্বীপ' 'দহ' প্রভৃতি শব্দান্তক পল্লীর উদ্ভব হইতেছে, যখন ঐ প্রধান-স্রোত পশ্চিমবঙ্গ দিয়া প্রবাহিত ছিল, পশ্চিমবঙ্গে তখন যে ঐরূপ সংজ্ঞা-সংযুক্ত নগর-গ্রামের উদ্ভব হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি ? তাহার পর, নদীর ভাঙ্গনের মুখে পড়িয়া নগরের যে অবস্থান্তর ঘটে , তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এক নবদ্বীপের দৃষ্টান্তেই এ কথা বুঝান যাইতে পারে। কিছুকাল পূর্ব্বে নবদ্বীপের পশ্চিমে গঙ্গাস্রোত প্রবাহিত ছিল ; এখন পূর্ব্বদিক দিয়া সে স্রোত প্রবাহিত। নগরের নাম 'যথা পূর্ব্বং তথা পরং' অপরিবর্ত্তিত ; কিন্তু অবস্থান অন্যরূপ দাঁড়াইয়াছে। প্রাচীন অনেক নগরেরই এইরূপ স্থান-পরিবর্ত্তন দেখা যায় বটে ; কিন্তু তাহাতে আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন হয় না, বা সাগর-গর্ভ হইতে সহসা সমুত্থিত হইল বলিয়াও মনে হয় না। এইরূপ আর আর যে সকল যুক্তির অবতারণায় বঙ্গদেশের

আধুনিকত্ব-প্রমাণে প্রয়াস দেখি, আপাতঃদৃষ্টিতে সে প্রমাণগুলিকে হঠাৎ বলবৎ বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু সেগুলিও পূর্ব্বোক্তরূপ অন্তঃসারশূন্য—অসার। এতৎসংক্রান্ত তিনটী প্রধান যুক্তির উল্লেখ করিতেছি। বাঙ্গালার একজন প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারই ভাষায় তাহার আভাস লউন। * 'মহাভারতের বনপর্ব্বে, ১১৩ অধ্যায়ে, পাণ্ডুপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের বিবরণ এরূপ লিখিত আছে যে, যেখানে কৌশিকী তীর্থ, অর্থাৎ যেস্থানে বর্ত্তমান নাম কুশী ও সাবেক নাম কৌশিকী নদী গঙ্গায় আসিয়া সংমিলিত হইয়াছে; রাজা যুধিষ্ঠির তথায় উপস্থিত হইয়া তাহারই কিঞ্চিৎ দূরে পঞ্চশতনদীযুক্ত গঙ্গাসাগরসঙ্গম এবং তথা হইতে সাগরতীরে কলিঙ্গ নামে দেশ দেখিয়াছিলেন। ... কথা যে একেবারে ফেলিবার জিনিষ নহে, তাহা অপর বিধ কয়েকটি প্রামাণিক উপায় দ্বারাও প্রমাণিত হইতেছে। খৃষ্ট জন্মিবার তিন শত বৎসর পূর্ব্বে বা প্রায় চারি শত বৎসর প্রাগব্দে মগধেশ্বর সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের সভায় একজন গ্রীক রাজদূত থাকিতেন, তাঁহার নাম--মিগাস্থিনিস। মিগাস্থিনিস্ তাঁহার ভারতীয় বিবরণে লিখিয়াছেন যে, পাটলিপুত্র অর্থাৎ পাটনা হইতে গঙ্গাসাগরসঙ্গম ন্যূনাধিক তিন শত মাইল হইবে। তাহা হইলে,এই সাগরসঙ্গম,কলিকাতার কত উত্তরে আসিয়া পড়িয়াছে! বর্ত্তমান হিসাবে, গঙ্গাসাগরসঙ্গম পাটনা হইতে রেল-পথের মাপ লইয়া ধরিলে প্রায় ৪৫০ মাইল, প্রচলিত লোক-চলাচলের পথানুসারে ৫০০ মাইলের কম হইবে না। পুনশ্চ, কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীর পঞ্চম তরঙ্গে, রাজা ললিতাদিত্যের দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, রাজা ললিতাদিত্য যখন গৌড়ে আইসেন, তখন গৌড়-নগরের অত্যল্প দেশ পরেই সাগর-তরঙ্গ প্রবাহিত হইত। ... কাশ্মীরপতি রাজা ললিতাদিত্য,যিনি গৌড়-নগরের অত্যল্প দেশ পরেই পূর্ব্ব-সমুদ্র প্রবাহিত হইতে দেখিয়াছিলেন, তিনি বড় বেশী দিনের লোক নহেন। রাজতরঙ্গিণী অনুসারে, তিনি ৬১৯ শকে কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ৬৫৫ শক পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া-ছিলেন। ... অতএব বলিতে হইবে যে, ন্যূনাধিক বার শত বৎসর পূর্ব্বে, গৌড়ের অতি নিকট পর্য্যন্ত, পূর্ণ প্রবাহে না হউক, অন্ততঃ এখন যেমন খুলনা ও বরিশাল জেলার দক্ষিণে সুন্দরবন বিভাগে এবং মেঘনা নদীর মুখে, সেইরূপভাবে মাঝে মাঝে দ্বীপ, চরভূমি ও জলাভূমি-সমন্বিত পূর্ব্ব-সমুদ্র প্রবাহিত ছিল। ... তখনকার কালে এখনকার এই নদীয়া, যশোর, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, চব্বিশ-পরগণা এবং মুর্শিদাবাদের কিয়দংশ এই কয়টী জেলার অস্তিত্ব ছিল না। ক্রমে দ্বীপ ও চরভূমি সকল প্রবল ও প্রশস্ত হইতে থাকায়, যত যেমন সমুদ্র মরিয়া গিয়াছে, ততই দেশ সকল ক্রমাধিবেশিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং কালে উক্ত কয়েকটি জেলাসমন্বিত গাঙ্গেয় দ্বীপের উদয় হইয়াছে। ইত্যাকার ক্রমোত্তর দ্বীপাধিবাস হইতেই অগ্রদ্বীপ, নবদ্বীপ, চক্রদ্বীপ, চন্দ্রদ্বীপ ইত্যাদি দ্বীপান্তক নামের উৎপত্তি হইয়াছে।... এখনকার ইংরেজ ভূতত্ত্ববিদ্‌গণও বলিয়া থাকেন যে, গঙ্গাসাগর এক সময়ে রাজমহল বা তাহার অনতিদূরে অবস্থিত ছিল।'' আর অধিক উদ্ধৃতি অনাবশ্যক। মূল কথা

বঙ্গের আধুনিকত্বের ত্রিবিধ যুক্তি।

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, চতুর্থ বর্ষ, 'বাঙ্গালার প্রাচীন ভূ-তত্ত্ব' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

এই ; ইহারই উপর নূতন নূতন রসান চড়িয়াছে। ফলে, প্রাচীনকালের বঙ্গদেশের অনস্তিত্ব সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যে যুক্তিগুলির ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত সংস্থাপিত, সে যুক্তিগুলি কতদূর দৃঢ়—বিচার করিয়া দেখুন দেখি! প্রথম—মহাভারতের, রাজতরঙ্গিণীর এবং মেগাস্থিনীসের (মিগাস্থিনিস) উক্তির অনুসন্ধান লওয়া যাউক। তাঁহারা সত্য সত্য কি বলিয়াছেন, তাহা দেখা প্রথমে আবশ্যক। তাহা দেখিয়া, পরিশেষে বিচার করাই সঙ্গত নহে কি? অনুসন্ধান করা যাউক, মূল-মহাভারতে এ সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাই ;—

যুক্তিত্রয়ের ভিত্তি-হীনতা।

"বৈশম্পায়ন উবাচ। ততঃ প্রয়াতঃ কৌশিক্যাঃ পাণ্ডবো জনমেজয়। আনুপূর্ব্ব্যেণ সর্ব্বাণি জগামায়তনান্যথ ॥ ১ ॥ স সাগরং সমাসাদ্য গঙ্গায়াঃ সঙ্গমে নৃপ। নদীশতানাং পঞ্চানাং মধ্যে চক্রে সমাপ্লবম্ ॥ ২ ॥ ততঃ সমুদ্রতীরেণ জগাম বসুধাধিপঃ। ভ্রাতৃভিঃ সহিতো বীরঃ কলিঙ্গান প্রতি ভারত ॥ ৩ ॥"

কোনও কোনও মহাভারতে বনপর্ব্বে চতুর্দ্দশাধিকশততম্ অধ্যায়ে এবং কোনও কোনও মহাভারতে ত্রয়োদশাধিকশততম্ অধ্যায়ে ঐ শ্লোক কয়েক পংক্তি দৃষ্ট হয়। * ঐ কয়েক পংক্তির বঙ্গানুবাদ বঙ্গদেশ-প্রচলিত দুই প্রসিদ্ধ মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে ; যথা,—বর্দ্ধমান রাজবাটীর অনুবাদিত মহাভারতে,—"বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতকুল-প্রদীপ জনমেজয়! অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির কৌশিকী হইতে যাত্রা করিয়া আনুপূর্ব্ব্যক্রমে সকল তীর্থে গমন করিলেন। গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে গমন-পূর্ব্বক পঞ্চশত নদী-মধ্যে অবগাহন করিলেন। তৎপরে সেই বীর ভ্রাতৃগণেব সহিত সমুদ্রতীব দিয়া কলিঙ্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন।" কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতে,—"বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির কৌশিকী তীর্থে উপনীত হইয়া অনুক্রমে সমস্ত আয়তনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে উপস্থিত হইয়া পঞ্চশত নদী-মধ্যে স্নান করিলেন। অনন্তর ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সমুদ্রতীর দিয়া কলিঙ্গ-দেশে উপনীত হইলেন।" মূলের বা এই দুই অনুবাদের কোথাও এমন কথা তো দেখিলাম না যে, কৌশিকী-সঙ্গমের গায়েই গঙ্গাসাগর ছিল! পরন্তু দেখিলাম,—'কৌশিকী হইতে যাত্রা করিয়া আনুপূর্ব্ব্যক্রমে সকল তীর্থে গমন করিলেন' এবং পরিশেষে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে উপনীত হইলেন। ইহাতে কি বুঝা যায়? বুঝা যায় না কি—বঙ্গদেশের বিভিন্ন তীর্থ-স্থানেও তাঁহাদের শুভাগমন হইয়াছিল। 'আনুপূর্ব্ব্য' বিশেষণেই বুঝা যাইতেছে,—কৌশিকী-তীর্থ হইতে সাগরসঙ্গমে উপনীত হইবার মধ্যবর্ত্তী পথে যে সকল তীর্থস্থান ছিল, তাঁহারা তাহার সমস্তই দেখিয়াছিলেন। প্রথমোক্ত অনুবাদে 'সমস্ত তীর্থ' এবং শেষোক্ত অনুবাদে 'সমস্ত আয়তন' শব্দ দৃষ্টে, বহু গ্রাম, নগর, যজ্ঞস্থান প্রভৃতি দর্শনের পর তাঁহারা গঙ্গাসাগরসঙ্গমে উপনীত হইয়াছিলেন, প্রতীত হয়। প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণের গ্রন্থে শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতির বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে আগমনের পরিচয় (এই পরিচ্ছেদে

---

* বর্দ্ধমান রাজবাটীর প্রকাশিত মহাভারতে ১১৪ ম অধ্যায়ে এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদিত মহাভারতে ১১৩ম অধ্যায়ে শ্লোক কয়েক পংক্তির অনুবাদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

২০৮ পৃষ্ঠায়) পাইয়াছি। তবেই বুঝা যায়, তাঁহাদের সময় পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের আধুনিকত্বের বিষয় কাহারও মনে উদয় হয় নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, অধুনা ঐ মতই প্রবল। মহাভারতের উক্তিতে ঐ ভ্রান্ত মত কিসে উৎপন্ন হইল, তাহার কারণও অনুসন্ধান করিয়া না পাওয়া যায়, এমন নহে। কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদে পূর্ব্বোক্ত অংশের পর লিখিত আছে,—"তখন লোমশ কহিলেন, মহারাজ! এই সমস্ত প্রদেশকেই লোকে কলিঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করে; এই স্থানে স্রোতস্বতী বৈতরণী প্রবাহিত হইতেছে;" ইত্যাদি। এই অংশের "এই সমস্ত প্রদেশকেই" বাক্যে যত বিভ্রম আনয়ন করিয়াছে। কিন্তু উহার পূর্ব্বে যে 'তখন' শব্দ দ্বারা 'কলিঙ্গ-দেশে উপনীত হওয়ার পর' অর্থ সূচিত হইতেছে, তৎপ্রতি কাহারও লক্ষ্য পড়িতেছে না। বিভ্রম এইরূপেই ঘটিয়া থাকে। 'রাজতরঙ্গিণীতে' ললিতাদিত্যের সমুদ্র-দর্শন-বিষয়ে যাহা বর্ণিত আছে, তাহাতেও গৌড়-রাজধানীর নিম্নেই যে সমুদ্র ছিল—এমন বুঝা যায় না। রাজতরঙ্গিণীর বঙ্গানুবাদ হইতে এতদ্বিষয়ক কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"গৌড়মণ্ডল হইতে অগণিত দন্তিদল যেন নৃপতির রাজলক্ষ্মীর পর্য্যাঙ্কবাহী হস্তীর মিত্রতায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার অগ্রগামী সৈন্যগণ পূর্ব্ব-সমুদ্রে উপস্থিত হইল। যুদ্ধগজবৃন্দ তাহাদের কর দ্বারা সাগরের তরঙ্গমালারূপ কেশরাশি আকর্ষণ করিয়া যেন তাহাকে গ্রহণ করিল। তিনি বনরাজিশ্যামল সমুদ্রতীরমার্গে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ও তাঁহার রিপুকুল অসিধারা-পথে পতিত হইয়া শমন-ভবনে গমন করিল।" রাজতরঙ্গিণীর এক 'গৌড়মণ্ডল' শব্দেই বুঝাইয়া দিতেছে—কেবল রাজধানীটি নহে—সমগ্র 'গৌড়দেশ'। গৌড়দেশ বা বঙ্গদেশের পরেই তো সমুদ্র! গৌড়দেশ হইতে তাঁহারা সমুদ্রতীরে উপনীত হইয়াছিলেন, এ বাক্যে প্রাচীন গৌড় বা মালদহের নিম্নে সমুদ্র ছিল প্রতিপন্ন হয় না। ললিতাদিত্যের বঙ্গদেশ আক্রমণের অব্যবহিত পরেই বা সমসময়ে পাল-বংশ প্রতিষ্ঠান্বিত হন। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানেই তাঁহাদের কীর্ত্তি-স্মৃতি আজিও লোপ পায় নাই। দেশ যদি সমুদ্রগর্ভেই নিমগ্ন থাকিবে, তাহা হইলে পাল-বংশীয় নৃপতিগণের পূর্ব্ববঙ্গে রাজধানী স্থাপনের কি সম্ভাবনা ছিল? এইরূপ, ললিতাদিত্যের গৌড়-জয়-কাহিনী প্রচারের কয়েক বৎসর পরে, নবদ্বীপ যে সেন-বংশের রাজধানী-রূপে পরিণত ও গৌরবান্বিত হইয়াছিল, তাহাতেই বা কি প্রমাণ পাই? ফলতঃ বিবিধ যুক্তি দ্বারাই সপ্রমাণ হয়, ললিতাদিত্যের সময়েও বঙ্গদেশের অস্তিত্ব ছিল। অপর যুক্তি—মেগাস্থিনীসের পাটলিপুত্র-দর্শন। মেগাস্থিনীস প্রকৃত কথা কি লিখিয়াছিলেন, তাহা অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া সুকঠিন। তাঁহার মূল-গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে। সেই লুপ্ত গ্রন্থের অংশ-বিশেষ অনুবাদিত হইয়া জর্ম্মাণ-ভাষায় প্রকাশিত হয়। তাহাই আবার নকলের নকল হইয়া ইংরাজী প্রভৃতি ভাষায় স্থান লাভ করিয়াছে। অপিচ, এ অবস্থায়ও মেগাস্থিনীসের বিবরণ যাহা পাওয়া যায়, তাহা অসম্পূর্ণ। দক্ষিণ-বঙ্গের বর্ণনা-ব্যপদেশে মেগাস্থিনীস বলিয়া গিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ,—কলিঙ্গ-দেশ সমুদ্রের নিকটে অবস্থিত; মান্দু এবং মাল্লিগণ উত্তরাংশে বাস করে; গঙ্গারিদেশ গঙ্গার মোহনায় অবস্থিত; মোদো-কলিঙ্গ গঙ্গান্তবর্ত্তী একটী দ্বীপ-বিশেষ।' এ বর্ণনা হইতে কি বুঝিতে

পারা যায়—দেখুন দেখি? বুঝিতে পারা যায় কি—পাটলিপুত্রের নিম্নে সমুদ্র প্রবাহিত ছিল? মেগাস্থিনীস্ কলিঙ্গ-দেশের তিন বিভাগের বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন।† নানা স্থলে সেই তিন বিভাগের নানারূপ পরিচয় দেন। কিন্তু মেগাস্থিনীসের বিবরণ হইতে আমরা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি? কলিঙ্গ—সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী দেশ। কলিঙ্গ বলিতে প্রধানতঃ উড়িষ্যার উপকূলকে এবং এক সময়ে বঙ্গের দক্ষিণাংশকে বুঝাইত। কলিঙ্গ, সমুদ্রের নিকটে ছিল;—ইহাতে পাটলিপুত্রের অব্যবহিত দক্ষিণেই সমুদ্র ছিল প্রতিপন্ন হয় না। 'গঙ্গারিদেশ' বলিতে রাঢ়দেশকে বুঝাইয়া থাকে। ভাগীরথীর পূর্ব্বাংশ রাঢ়দেশ বলিয়া পরিচিত। এই রাঢ়দেশ সমুদ্র-উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত বলিলেও বলা যাইতে পারে। 'মোদো-কলিঙ্গ' শব্দে গঙ্গার বদ্বীপ অর্থাৎ ভাগীরথীর পূর্ব্ব-উপকূলস্থিত পূর্ব্ববঙ্গ সূচিত হয়। গঙ্গার অন্তবর্ত্তী দ্বীপ বলিতে সমুদ্রান্তর্গত দ্বীপ কখনই বুঝায় না। কলিঙ্গ-সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ে তদন্তর্ভুক্ত রাজ্য-মধ্যে পরিগণিত হওয়ায়, গঙ্গার ব-দ্বীপকে মেগাস্থিনীস্ 'মোদো-কলিঙ্গ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন বুঝা যায়। অধিকন্তু, মেগাস্থিনীস পাটলিপুত্রের নিম্নে যে সমুদ্র দেখেন নাই, তাঁহার গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত ষ্ট্রাবোর বিবরণে তাহা প্রতিপন্ন হয়। সে বিবরণ,—"পশ্চিম হইতে (অর্থাৎ সিন্ধুনদ হইতে) পূর্ব্বদিকের (পালিবোথ্রা পর্য্যন্ত) পরিমাণ-সম্বন্ধে আমরা সঠিক বলিতে পারি; কারণ, ইহা পরিমাণ করা হইয়াছিল। এই স্থানের মধ্যে ১০,০০০ হাজার ষ্টাডিয়া‡ দীর্ঘ একটী রাজপথ আছে। অপর পক্ষে, যে সকল জাহাজ সাগর হইতে গঙ্গানদী দিয়া পালিবোথ্রায় যায়, তাহাদের গতায়াত হইতে পালিবোথ্রার পরবর্ত্তী দেশের আয়তন আন্দাজ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ঐ পথের মোট দৈর্ঘ্য ১৬,০০০ হাজার ষ্টাডিয়ার কম নহে।"§ ইহাতে বুঝা যায়, সমুদ্র হইতে গঙ্গানদী বহিয়া অর্ণবপোত সকল পাটলিপুত্রে পৌঁছিত এবং সিন্ধুনদের উপকূলভাগ হইতে পাটলিপুত্রের (পালিবোথ্রার) যে দূরত্ব ছিল, পাটলিপুত্র হইতে সাগরসঙ্গমের দূরত্ব তাহারও অধিক। তবেই এখন বুঝিয়া দেখুন, মেগাস্থিনীস কোথায় বলিলেন—পাটলিপুত্রের নিম্নেই সমুদ্র অবস্থিত রহিয়াছে? তার পর, সেকালের পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ অনেকেই ভারতবর্ষের বিষয় আংশিক অবগত হইয়া, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ভারতবর্ষের দৈর্ঘ্য-বিস্তার ও আকৃতি-বিষয়ে তাঁহাদের মতামত আলো-

---

* "Speaking of South Bengal, Megasthenes mentions the Calingoe living nearest the sea, the Mandu and the Malli living higher up, the Gangerides, near the mouths of the Ganges, and the Modo-Calingoe is an island in the Ganges."—*Ancient India* by R. C. Dutt.

† "পৃথিবীর ইতিহাস" দ্বিতীয় খণ্ডে ষোড়শ পরিচ্ছেদে কলিঙ্গ-রাজ্যের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

‡ ষ্টাডিয়া বা ষ্টেডিয়ার পরিমাণ নানারূপ নির্দ্দিষ্ট হয়। গ্রীসে একরূপ, রোমে একরূপ। ইংরাজী হিসাবে ৬ শত ৬ ফিট ৯ ইঞ্চিতে ষ্টাডিয়া ধরা হয়। গ্রীসদেশে ৬০০ ফিট, রোমদেশে ৬২৫ ফিট।

§ অধ্যাপক ম্যাক্ ক্রিণ্ডল্ (Mc. Crindle) মেগাস্থিনীস্ প্রমুখ পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের লিখিত ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত বিবরণের ইংরাজী অনুবাদ করেন। তাহাতেই এবংবিধ উক্তি দৃষ্ট হয়।

চনা করিলে, তাঁহাদের ভ্রান্তি অল্পায়াসেই বুঝা যাইতে পারে। * তাঁহাদের একদেশ-দর্শিতার ফলে, কি ভ্রম-সংস্কার কিরূপভাবে বদ্ধমূল হইয়া আছে, তাহার দুই একটী দৃষ্টান্ত এস্থলে উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আলেকজাণ্ডারের ভারত-আগমনের পর হইতে ইউরোপের সহিত ভারতের এক অভিনব সম্বন্ধের সূত্রপাত হয়। পৃথিবীর তাৎকালিক সভ্যজাতি মাত্রেই ভারতবর্ষের জ্ঞান-গৌরবের ও ঐশ্বর্য্য-সম্পদের প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া, ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য প্রলুব্ধ ছিলেন; কিন্তু ভারতবর্ষের সীমানায় প্রবেশ করিবার সৌভাগ্য কখনও কাহারও হয় নাই। আলেক-জাণ্ডারের ভারত-আগমনের পর হইতে ভারতবর্ষের সহিত পাশ্চাত্য-দেশের সম্বন্ধ একটু দৃঢ় হয় বটে; কিন্তু তখনও ভারতবর্ষের সকল তথ্য অবগত হইবার সুবিধা তাঁহাদের ঘটে নাই। হিসাব-মত আলেকজাণ্ডারের ভারত-আগমনের অন্যূন ৪৫০ বৎসর পরে আরিয়ানের বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয়। কিন্তু আরিয়ান ভারতবর্ষের বিবরণ-সংবলিত যে 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ণ অভিজ্ঞতার নিদর্শন নাই। তবে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঐতিহাসিকগণ ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া যান, তৎসংক্রান্ত কয়েকটি ভ্রম-প্রমাদ আরিয়ানের গ্রন্থে সংশোধিত হয়। কিন্তু তাই বলিয়া আরিয়ান নিজে যে ভ্রম-প্রমাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন, তাহা নহে। আরিয়ানের 'ইণ্ডিকা'-গ্রন্থে কীদৃশ ভ্রমের নিরসন হইয়াছে, অপিচ সেই গ্রন্থেই বা কি প্রকার ভ্রম-প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে, তাহার দুই একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি; তাহাতে বিষয়টী বিশেষরূপ বোধগম্য হইতে পারে। হেরোডোটাস—গ্রীসদেশের আদি ঐতিহাসিক। সাধারণতঃ তিনি ইতিহাস-রচনার পিতৃ-স্থানীয় (Father of History) বলিয়া অভিহিত হন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার অনেক কথাই ভ্রম-সঙ্কুল। একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। ভারতবর্ষে বৈদেশিক অধিকার-সম্বন্ধে তাঁহার একটি উক্তি—'পারস্যাধিপতি দারায়ুস আসমুদ্র-হিমাচল ভারতবর্ষের একছত্র আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন।' অধুনা-প্রচলিত ইতিহাসেও দেখিতে পাওয়া যায়,—দারায়ুসের অধিকৃত সমগ্র রাজ্য হইতে যে

ভ্রম-সংস্কার কিরূপে বদ্ধমূল।

* মেগাস্থিনীসের অনুসরণে ষ্ট্রাবো একরূপ লিখিয়াছেন, আরিয়ান একরূপ লিখিয়াছেন, ডায়োডোরাস্ একরূপ লিখিয়াছেন। ষ্ট্রাবো এ বিষয়ে দ্বিবিধ মত প্রকাশ করিয়াছেন। একস্থলে লিখিয়াছেন,—"দক্ষিণসমুদ্র হইতে দূরত্ব কোথাও ২০,০০০ ষ্টাডিয়া, কোথাও ৩০,০০০ ষ্টাডিয়া।" অন্যত্র আবার সে দূরত্ব ১৩,০০০ হাজার হইতে ১৬,০০০ হাজার ষ্টাডিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সে মতে,—ভারতবর্ষের আকৃতি 'রম্বয়ডের' অর্থাৎ অসমবাহু চতুর্ভুজের ন্যায়। ককেসাস্ পর্ব্বত হইতে দক্ষিণসমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত পশ্চিমাংশের পরিমাণ ১৩,০০০ হাজার ষ্টাডিয়া। পূর্ব্বাংশের পরিমাণ ১৬,০০০ হাজার ষ্টাডিয়া। পূর্ব্ব-পশ্চিমের বিস্তৃতি ১০,০০০ ষ্টাডিয়া বা তাহার কিছু অধিক।" ডায়োডোরাস বলিয়াছেন,—'পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ২৮,০০০ হাজার ষ্টাডিয়া, উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃতি ৩২,০০০ হাজার ষ্টাডিয়া।' আরিয়ান বলেন,—'ভারতবর্ষের বিস্তৃতি পূর্ব্ব-পশ্চিমে; উহার পরিমাণ ১৬,০০০, ষ্টাডিয়া; দৈর্ঘ্য উত্তর-দক্ষিণে, উহার পরিমাণ ২২,০০০ ষ্টাডিয়া।" এইরূপ আরও কতজনে কতরূপ পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ড, "পৃথিবীর ইতিহাসে" মানচিত্রে, আলেকজাণ্ডারের বর্ণনায় পরিমাণ কিরূপ হয়, দেখান হইয়াছে। এ সকল বিষয় চিন্তা করিলে, কেহই ঠিক নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

রাজকর সংগৃহীত হইত, তাঁহার এক-তৃতীয়াংশ কর ভারতবর্ষ হইতেই তিনি প্রাপ্ত হইতেন। পারস্য-সাম্রাজ্য যখন সমৃদ্ধির উচ্চ-চূড়ায় সমারূঢ়, তখন যে প্রদেশ হইতে তাঁহার রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ সংগৃহীত হয়, সে প্রদেশ বড় অল্প-ধনৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন নহে; সুতরাং সে প্রদেশ ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য আর কি হইতে পারে? সম্ভবতঃ এই যুক্তির বলে, হেরো-ডোটাস্ এবং তাঁহার অনুসরণকারিগণ সমগ্র ভারতবর্ষই দারায়ুসের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত কথা কি? দারায়ুস্ যে সিন্ধুনদের পূর্ব্ব-পার পর্য্যন্ত উপনীত হইতে পারেন নাই, ইতিহাস তারস্বরে সাক্ষ্য দিতেছে। ষ্ট্রাবোর উক্তিতে পারস্যের ভারত-অধিকার-প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। আরিয়ান স্পষ্টতঃ যদিও সে কথা প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু ভারত-আক্রমণ-সংক্রান্ত অধিকাংশ কাহিনী কল্পিত বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। বিশেষতঃ, 'ভারতবাসিগণ অপর জাতিকে আক্রমণ করে না, কিম্বা অপর জাতিও তাহাদিগকে আক্রমণ করে না',—মেগাস্থিনীসের এই উক্তির পোষকতা করিয়া, তিনি প্রকারান্তরে আলেকজাণ্ডারের ভারত-আগমনের পূর্ব্বে সিন্ধু-নদের পূর্ব্ব-পারে বা দক্ষিণ-পারে বৈদেশিকগণের কেহ কখনও অধিকার বিস্তার করিতে পারেন নাই—ইহাই বলিয়া গিয়াছেন। * আরও, আলেকজাণ্ডারের ভারত-আগমনের পূর্ব্বে বৈদেশিকগণের ভারতাক্রমণের বিবরণ যাঁহারা লিখিয়া গিয়াছেন, ভারতবর্ষের সীমানা-সম্বন্ধে তাঁহাদের অনেকেরই ভ্রম ধারণা ছিল বলিয়া বুঝা যায়। এতৎ-প্রসঙ্গে আরও একটী তত্ত্বের সন্ধান পাই। তাহাতে সপ্রমাণ হয়, দূর অতীত-কালে ভারতীয় নৃপতিগণের প্রাধান্য-প্রভাব এসিয়া-মহাদেশের বিভিন্ন অংশে বিস্তৃত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ এক সময়ে সসাগরা ধরণীর সর্ব্বত্র আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, এবং কালবশে ক্রমশঃ সে প্রভাব হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছিল। হেরোডোটাস প্রমুখ ঐতিহাসিকগণের ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত বিবরণেও তাহা প্রতিপন্ন হয়। হেরোডোটাস্ লিখিয়াছেন—'পারস্য-সম্রাটের অধিকৃত ভারতবর্ষের দক্ষিণে এক স্বাধীন রাজ্য ছিল।' ইহাতে বুঝা যায়, সিন্ধুনদের উত্তরস্থিত ককেসাস্ পর্ব্বত পর্য্যন্ত ভারতীয় নৃপতির অধিকৃত দেশ—দারায়ুসের অধিকারে আসিয়াছিল, এবং ঐ সীমানার বহির্ভূত সমগ্র ভারতবর্ষ তখনও স্বাধীন ছিল। কিন্তু হেরোডোটাস্ তাহাকে ভারতবর্ষের দক্ষিণস্থিত স্বাধীন রাজ্য বলিয়া, ভারতবর্ষের সীমানা-সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতারই পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এই বিষয়ের আলোচনায় মেজর রেণেল প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে, সিন্ধুনদের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রদেশের বিষয়ে ঐতিহাসিক অনভিজ্ঞ ছিলেন; ভারতবর্ষের পরিমাণের বিষয় এবং তাহার কতটুকু অংশ পারস্যের অধিকারভুক্ত ছিল, তাহাও বোধ হয় তিনি জানিতেন না। * ভারতবর্ষের

---

* *Vide* E B. Cowell's *note* in the *History of India*—"The Indians east of the Indus constantly maintained to the followers of Alexander that they had never before been invaded (by human conquerors at least), an assertion which they could not have ventured if they had just been delivered from the yoke of Persia. Arrian, also, in discussing the alleged invasions of Bacchus, Hercules, Sesostris, Semeramis and Syrus, denies them all except the mythological ones ; and Strabo denies even those, adding that the Persians hired mercenaries from India, but never invaded it. (Arrian, *Indica*, *8, 9*, Strabo, lib, xv. See also Diodorus, lib, ii)

সীমানা-সংক্রান্ত এই ভ্রম-ধারণার হস্ত হইতে আরিয়ানও অবশ্য নিষ্কৃতি পান নাই। তিনি ভারতের অধিবাসিগণকে প্রধানতঃ 'পার্ব্বত্য-জাতি' বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আলেকজাণ্ডার যখন "পারোপামিসাস্" প্রদেশ অধিকার করেন, আরিয়ান সেই সময় হইতেই ভারতবাসীর কথা তুলিয়াছেন এবং আলেকজাণ্ডার সিন্ধু-নদের পরপারে আসিবা-মাত্রই আরিয়ান ভারতবাসিগণের বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাতে বেশ প্রতিপন্ন হয়—ভারতবর্ষের এক প্রান্তভাগের বা একাংশের অধিবাসীর বিষয় অবগত হইয়াই, সে সময়ের পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ ভারতবর্ষের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন; অংশমাত্র দেখিয়া কোনও বিরাট্ পদার্থের স্বরূপ-তত্ত্ব বর্ণন করিতে গেলে, এরূপ ভ্রম-প্রমাদই সম্ভবপর। ভারতবর্ষের বিবরণ-প্রসঙ্গে আরিয়ান যে বিষয়-বিশেষে একদেশদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহারও একটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। ভারতীয়গণের পরিচ্ছদ ও অস্ত্র-শস্ত্র সম্বন্ধে আরিয়ান যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কি বুঝিতে পারি? আরিয়ানে ভারতবাসীর যে পরিচ্ছদের বিষয় বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে ভারতের প্রদেশ-বিশেষের এক শ্রেণীর অধিবাসীর পরিচ্ছদের আভাস পাওয়া যায় মাত্র। তাহার পর,—অস্ত্র-শস্ত্রের বিষয়। এ প্রসঙ্গে তিনি কেবল ধনুর্ব্বাণের ও ঢাল-তরবারির কথাই কহিয়া গিয়াছেন। সে সময়ে যে এ দেশে কামান-বন্দুকের প্রচলন ছিল,* তাহার বর্ণনার কোথাও সে আভাস প্রাপ্ত হই না। "পৃথিবীর ইতিহাস" তৃতীয় খণ্ডে দশম পরিচ্ছেদে (৩৭৯-৩৮৭ পৃষ্ঠায়) প্রাচীন ভারতে আগ্নেয়-অস্ত্র কামান-বন্দুক প্রভৃতির বিদ্যমানতার বিষয় আমরা অবিসম্বাদিত-রূপে সপ্রমাণ করিয়াছি। যাহা হউক, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের এ প্রকার বিভ্রম, তাঁহাদের যে একদেশ-দর্শিতার ফল—তাহা বলাই বাহুল্য। মেগাস্থিনীস্ যদি কোথায় লিখিয়া গিয়াও থাকেন যে, পাটলিপুত্রের নিম্নে সমুদ্র ছিল, সেও তাঁহার এইরূপ একদেশদর্শিতার ফল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। যাহা হউক, এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে, বেশ উপলব্ধি হয়, মেগাস্থিনীসের ভারতাগমন-কালে বঙ্গদেশ কখনই সমুদ্র-গর্ভে নিমজ্জিত ছিল না। বঙ্গদেশ সেদিন পর্য্যন্ত সাগরগর্ভে প্রোথিত থাকার আর এক প্রধান যুক্তি,—ভূতত্ত্ববিদ্গণের গবেষণা। ভূতত্ত্ববিদ্গণের গবেষণায় অনেক সময় অনেক তত্ত্বই প্রচারিত হইয়াছে, এবং একের সহিত অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটিয়াছে। এক শ্রেণীর ভূতত্ত্ববিদ্গণ যেমন নির্দ্ধারণ করিয়াছেন,—'গঙ্গাসাগর এক সময়ে রাজমহলে বা তাহার অনতিদূরে অবস্থিত ছিল'; অন্য শ্রেণীর ভূতত্ত্ববিদ্গণ সেইরূপ ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন—"পৃথিবীর ভূপঞ্জর নির্ম্মিত হওয়ার 'ইওসিন'-যুগে হিমালয়ের তটদেশ পর্য্যন্ত সমুদ্রতরঙ্গ প্রবাহিত ছিল। হিমালয়ের কেবল তটভাগ নহে, তাহার বর্ত্তমান উচ্চতার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত তখন জলমগ্ন ছিল।" সুতরাং ভূতত্ত্ববিদ্গণের

ভূতত্ত্ববিদ্গণের মতের আলোচনায়।

* "The Indians whom Herodotus includes within the satrapies of Darius, are probably the more northern ones under Caucasus, for he expressly declares, that those on the south were independent of the Persian monarchy. It is proved by Major Rennele that his knowledge of India did not reach beyond the desert east of the Indus; and he seems to have had no conception of the extent of the country and no clear notion of the portion of it which had beon subjected to Persia."—*Vide* Elphinstone's ***History of India.***

কোন্ উক্তির উপর আস্থা প্রদর্শন করিব ? এক হিসাবে উভয় উক্তিরই সার্থকতা আছে ; এক হিসাবে উভয়বিধ উক্তিই ভিত্তিহীন! সার্থকতা আছে—মনু ও জলপ্লাবন প্রসঙ্গের সঙ্গতি-রক্ষায়। পৃথিবীব্যাপী জলপ্লাবনে যখন সমগ্র ভূখণ্ড জলমগ্ন হইয়াছিল এবং মনুর বহিত্র হিমাচল-শীর্ষে স্থান লাভ করিয়াছিল ;—তখনকার কথা স্মরণ করিলে, তখনকার চিত্র প্রকটিত করিতে গেলে, হিমাচলের এক-তৃতীয়াংশ জললগ্ন হওয়ার সংবাদেও বৈচিত্র্য নাই, আবার রাজমহলের নিম্নে বঙ্গোপসাগর কিছুদিন অবস্থিত থাকাও অসম্ভব নয়। কিন্তু সে কত কালের কথা! যদি বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরের প্রারম্ভেও সেই জলপ্লাবন সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করি, তাহাহইলেও বর্ত্তমান সময়ের অন্ততঃ ৩৮ লক্ষ ৯৩ হাজার ১৪ বৎসর পূর্ব্বে সে বিপ্লব উপস্থিত হয়। কিন্তু মানুষের ধ্যান-ধারণার শক্তি কমিয়া আসায়, ঐ দূর অতীতকালের ঘটনাকে মানুষ কল্যকার ঘটনা বলিয়া প্রচার করিতে প্রবৃদ্ধ হইতেছে। তার পর, যদি 'ইওসিন'-যুগে হিমালয়-পাদমূলে সমুদ্র-জল বিস্তৃত ছিল মনে করি, সেই কি অল্পদিনের কথা! ভূতত্ত্ববিদ্গণ পৃথিবী-সৃষ্টির মনুষ্য-সৃষ্টির কি স্তর-পর্য্যায় নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন, অনুধাবন করিয়া দেখুন। * লক্ষ লক্ষ বৎসরে এক একটী স্তর সঞ্চিত হয়। ভূতত্ত্ববিদ্গণের মতে—সৃষ্টির আদিকাল হইতে এ পর্য্যন্ত পাঁচটী প্রধান স্তর এবং সেই পাঁচ স্তরের পঞ্চদশাধিক উপস্তর নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এক্ষণে পঞ্চম স্তরের অন্তর্গত দ্বিতীয় উপস্তরের কার্য্য চলিতেছে। সেই উপস্তর 'রিসেণ্ট' বা 'পোষ্ট-গ্লেসিয়াল' নামে অভিহিত। এই উপস্তরের অব্যবহিত পূর্ব্বের উপস্তরের নাম—'প্লেষ্টোসিন' বা 'গ্লেসিয়াল' উপস্তর। 'গ্লেসিয়াল' উপস্তরে পৃথিবী তুষারাচ্ছন্ন অবস্থায় ছিল। 'পোষ্ট-গ্লেসিয়াল'—তুষারাচ্ছন্ন অবস্থার পরবর্ত্তিকাল। এই দুই উপস্তর সঞ্চিত হইতে তিন লক্ষ বিশ হাজার বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। 'ইওসিন' উপস্তর—এই দুই (গ্লেসিয়াল ও পোষ্ট-গ্লেসিয়াল) উপস্তরের পূর্ব্ববর্ত্তী আরও তিনটী উপস্তরের পূর্ব্বের কাল। উহা সৃষ্টির চতুর্থ স্তরের প্রথম উপস্তর। দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার বৎসর পোষ্ট-গ্লেসিয়াল উপস্তরের সঞ্চারের ও পূর্ণতা-প্রাপ্তির কাল নির্দ্দিষ্ট হয়। এই হিসাবে, 'প্লিওসিন্,' 'মিওসিন্,' 'অলিগোসিন্'—এই তিন উপস্তরের পূর্ব্ববর্ত্তী 'ইওসিন' উপস্তর কত পূর্ব্বের স্তর, অনুধাবন করিয়া দেখুন দেখি! এ হিসাবে, বর্ত্তমান সময়ের অন্ততঃ দশ লক্ষ চল্লিশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে 'ইওসিন' স্তর পূর্ণতা-প্রাপ্ত হইয়াছিল, বুঝিতে পারা যায়। পাশ্চাত্য-মতে এ অবস্থা মনুষ্য-সৃষ্টির পূর্ব্বের অবস্থা। সুতরাং পাশ্চাত্যমতে মনুষ্য-সৃষ্টি যখন আরম্ভ হইয়াছিল, এদেশেই প্রথম আরম্ভ হয় বুঝিতে পারি। আবার যে ভূতত্ত্ববিদ্গণ বঙ্গদেশ সেদিন মাত্র সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করেন, তাঁহাদেরই এক সম্প্রদায়ের যুক্তিতে অতি প্রাচীনকালে বঙ্গদেশের বিদ্যমানতার বিষয় প্রতিপন্ন হয়। অধিকন্তু, তাহা হইতে বুঝিতে পারি, সমৃদ্ধি-সম্পন্ন বঙ্গদেশের অংশ-বিশেষ প্রাকৃতিক বিপ্লবে একসময়ে ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়াছিল। কলিকাতার ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের ভূ-স্তর পরীক্ষা করিয়া ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ যে সিদ্ধান্তে

* "পৃথিবীর ইতিহাস" তৃতীয় খণ্ডে 'সৃষ্টিতত্ত্ব'-প্রসঙ্গে 'ইওসিন', 'মিওসিন' প্রভৃতির স্তর-পর্য্যায়ের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

উপনীত হইয়াছেন, তাহাই এস্থলে উল্লেখ করিতেছি। "কলিকাতার ভূতত্ত্ব পরীক্ষার দ্বারা জানিতে পারা যায় যে, কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ ফুট নিম্নে এখনও উন্নতশির সুন্দরী ও অন্যান্য বাদাবনসুলভ বৃক্ষাদির স্কন্ধ অর্থাৎ গুঁড়িসকল দণ্ডায়মান্ অবস্থায় রহিয়াছে। ইহা ভিন্ন বহুদিনব্যাপী বন-বৃক্ষাদির স্তর দীর্ঘকাল মাটির নীচে থাকিলে যেরূপ পাথুরিয়া কয়লা হইয়া যায়, এই সকল স্থানের নিম্নে তদ্রূপ অপরিণত পাথুরিয়া কয়লার সামান্য স্তরও লক্ষিত হয়। কলিকাতা শিয়ালদহ রেলওয়ে-ষ্টেশনের মধ্যে যে বৃহৎ পুষ্করিণী আছে, তাহার খনন-কালে ভূতত্ত্ব-শাস্ত্রদর্শী ব্ল্যান্‌ফোর্ড সাহেব ঐ স্থানের যে ভূতত্ত্ব পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাতে জানা যায় যে, ঐ স্থানের ত্রিশ ফুট নিম্নে, অপরিণত অবস্থায় পাথুরিয়া কয়লার স্তর আছে এবং সেই স্তরের মধ্যেও দণ্ডায়মানভাবে কতকগুলি সুন্দরী গাছের গুঁড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। স্তরস্থিত কয়লা এখনও সম্পূর্ণতঃ পাথুরিয়া কয়লায় পরিণত না হওয়ায়, উহাতে এখনও অগ্নি-সংলগ্ন হয় না। এই স্তর সমস্ত কলিকাতা এবং নিকটবর্ত্তী অনেক স্থান লইয়া বিস্তৃত। রাণীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লার স্তরের যেরূপ ধর্ম্ম দেখা গিয়াছে, এখানেও সেইরূপ। ঐ অপরিণত স্তর সর্ব্বত্র সমগভীর মাটির নিম্নে নহে। শিয়ালদহে যাহা ভূপৃষ্ঠ হইতে ত্রিশ ফুট নিম্নে, কেল্লার কাছে তাহাই একান্ন ফুট নীচে নামিয়া গিয়াছে; আবার কোম্পানীর বাগানের কাছে তাহা অতি অল্প মাটির নিম্নেই দৃষ্ট হয়। মাটি এরূপ বসিয়া যাওয়ার পক্ষে ভূকম্পনাদি নানাবিধ নৈসর্গিক কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ভূকম্পন ব্যতীত, পৃথিবীর আভ্যন্তরিক ক্রিয়াতেও ভূপৃষ্ঠের অনেক স্থানই ধীরে ধীরে কোথাও বসিয়া যাইতেছে এবং কোথাও বা উচ্চ হইয়া উঠিতেছে। ভূতত্ত্ববিদ্যার পুস্তকে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। শুনিতে পাই নাকি, ইংলণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ ঐরূপ ধীরে ধীরে বসিয়া যাইতেছে।" * বঙ্গের উপর দিয়া, বঙ্গের এই অংশ-বিশেষের উপর দিয়া, অনেক সময় অনেক বিপ্লব চলিয়া গিয়াছে। মনুষ্য-কৃত বিপ্লব এবং প্রাকৃতিক বিপ্লব—বিবিধ বিপ্লবে বঙ্গের বক্ষ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া আছে। তাই এখন বঙ্গের প্রাচীনত্বের অনুসন্ধান করিতে মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইতেছে। যশোহর ও খুলনা-জেলার দক্ষিণে—এখন যেখানে বাদাবন দৃষ্ট হয়, এখন যে অংশ জল-জঙ্গল-সমাচ্ছন্ন হিংস্র-জন্তুপূর্ণ দেখিতে পাই, কিছুকাল পূর্ব্বে ঐ অংশে লোকের বসতি ছিল, জনকোলাহলপূর্ণ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন নগর-জনপদ ছিল;—এ সকল প্রমাণ ক্রমশঃই পাওয়া যাইতেছে। ফলতঃ প্রাকৃতিক বিপ্লবে এক এক অংশ বিলুপ্ত হইলেও তদ্দ্বারা প্রাচীন-বঙ্গের অনস্তিত্ব সপ্রমাণ হয় না। নদীর এক কূল ভাঙ্গে, অন্য কূলে চর-সঞ্চার হয়। তদ্রূপ, পরিবর্ত্তনে অবস্থান্তর ঘটিতে পারে; কিন্তু তদ্দ্বারা অস্তিত্বাভাব সপ্রমাণ হয় না। বঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের আগমন, বঙ্গের তীর্থস্থানাদিতে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ-পাণ্ডবের পরিভ্রমণ, বঙ্গে সপ্তর্ষিগণের অবস্থান প্রভৃতি বৃত্তান্ত স্মরণ করিলে, স্মৃতিপটে কোন্ চিত্র উদ্ভাসিত হয়? বিরাট্ রাজের 'গো-গৃহ' এই বঙ্গদেশেই চিহ্নিত হয়। শাস্ত্রোক্ত প্রাচীন তীর্থস্থান-সমূহ অনেকই এই বঙ্গদেশে বিদ্যমান রহিয়াছে। তবু কি বলিতে হইবে,—এই বঙ্গদেশ আধুনিক?—সবে মাত্র সে দিন

---

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সুপণ্ডিত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ।

সাগরগর্ভ হইতে সমুত্থিত হইয়াছে? ফলতঃ একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে কেহই বঙ্গদেশের আধুনিকত্বে আস্থা-স্থাপন করিতে পারিবেন না।

এইরূপে সর্ব্বপ্রকারেই প্রতিপন্ন হয় যে, সৃষ্টির আদিকাল হইতেই বঙ্গদেশের অস্তিত্ব ছিল, জ্ঞান-বিজ্ঞানে শৌর্য্য-বীর্য্যে বঙ্গদেশ চিরদিনই বরেণ্য আসন অধিকার করিয়া আসিতেছিল। বঙ্গে ব্রাহ্মণ আগমন, যাঁহারা সেদিনের ঘটনা বলিয়া বঙ্গের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার প্রয়াস পান, তাঁহাদের ভ্রান্ত-মত ছিন্ন করিবার পক্ষে যুক্তির আদৌ অভাব নাই। বঙ্গদেশ কখনই ব্রাহ্মণ-শূন্য ছিল না।

উপসংহার।

বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণের বাস চিরকালই প্রতিপন্ন হয়। কান্যকুব্জ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের আমন্ত্রণ—বঙ্গের প্রাচীনত্বের তুলনায় সেদিনের ঘটনা বটে; কিন্তু তখনই কি বঙ্গে একেবারে ব্রাহ্মণের অভাব ঘটিয়াছিল! ইতিহাস কখনই তাহা বলে না। বঙ্গে তখন ব্রাহ্মণগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এ বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। প্রশ্ন উঠিতে পারে—'তবে পঞ্চ ব্রাহ্মণকে আনার প্রয়োজন কি ছিল? বঙ্গদেশে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিল না বলিয়াই কি তাঁহাদিগকে আনা হয় নাই?' একথা আমরা স্বীকার করি না। 'তবে একথা প্রচার হইল কেন?' তাহার অন্য কারণ নির্দ্দিষ্ট হয়। যে সময়ে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পঞ্চকের আগমনের বিষয় উল্লিখিত হইয়া থাকে, তখন বঙ্গের নৃপতির প্রভাব সুদূর পশ্চিমে এবং দাক্ষিণাত্যে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তৎকালে তিব্বতে, চীনে, নেপালেও সে প্রভাবের রশ্মিরেখা পরিলক্ষিত হয়। তখন যেমন বাঙ্গালায় গৌড়ে রাজধানী ছিল, কনোজেও সেইরূপ বঙ্গাধিপতির এক রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজা যখন যেখানে থাকিতেন, তাঁহার পার্ষদ্‌ পণ্ডিতগণ তখন সেখানেই উপনিবিষ্ট হইতেন। এইরূপে বঙ্গেশ্বরের পার্ষদ্‌ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ কান্যকুব্জে গিয়া সময় সময় বসবাস করিতেন প্রতিপন্ন হয়। যাঁহারা রাজানুগৃহীত বা রাজার পরিচিত, তাঁহারাই চিরকাল বিশিষ্ট পণ্ডিত বলিয়া প্রখ্যাত হন। রাজার কোনও ক্রিয়া-কর্ম্মের প্রয়োজন হইলে, রাজা প্রধানতঃ সেই সকল পণ্ডিতের সহায়তা গ্রহণ করিয়া থাকেন; আর তাহাতে, সেই সকল পণ্ডিতের যশ পরিবর্দ্ধিত হয়। রাজকীয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানে রাজানুগৃহীত এবম্বিধ ব্রাহ্মণগণই আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। নচেৎ, বঙ্গদেশেই তাঁহাদের আদি-বাস ছিল; বঙ্গদেশ হইতেই তাঁহারা রাজ-পারিষদ্‌রূপে কনোজে গিয়াছিলেন এবং পরিশেষে রাজানুষ্ঠিত যজ্ঞকার্য্যের সহায়তার জন্য বঙ্গদেশে পুনরাগমন করিয়াছিলেন। ফলতঃ, এ ঘটনায় বঙ্গদেশ যে তখন ব্রাহ্মণশূন্য হইয়াছিল, তাহা প্রতিপন্ন হয় না। আধুনিক ইংরেজ-রাজত্বেও রাজানুগৃহীত ব্রাহ্মণগণই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হন; অথচ, তাঁহাদের অনেকের অপেক্ষা ন্যায়-নিষ্ঠ স্বধর্ম্মপর ব্রাহ্মণের সংখ্যা কুত্রাপি অল্প নহে। বর্ত্তমান অবস্থার সহিত পূর্ব্বোক্ত অবস্থার তুলনা করিলেই মূলতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্গের অতীত-গৌরবের নিদর্শন বঙ্গের ইতিহাসে বিরল বটে, কিন্তু অন্য দেশের পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে সে নিদর্শন প্রকট দেখিতে পাই। চীনদেশের ইতিহাসের মধ্যে প্রাচীন বাঙ্গালার কৃতিত্ব-কাহিনী কীর্ত্তিত আছে; সিংহলের প্রাচীন ইতিহাস বাঙ্গালীরই গৌরব-বিভায় উদ্ভাসিত;

যবদ্বীপে, আনামে, কাম্বোড়িয়ায় বাঙ্গালীর গৌরব-গাথা আজিও গীত হইতে দেখিতে পাই। তিব্বতে, নেপালে—প্রাচীন বাঙ্গালার অনেক পরিচয়-চিহ্ন এখন অনুসন্ধান করিয়া মিলিতেছে। তিব্বতী ভাষায় 'তেঙ্গুর' নামে এক বিরাট গ্রন্থ আছে। ঐ গ্রন্থ দুই শত বায়ান্ন খণ্ডে বিভক্ত। ভারতীয় ভাষার তিন সহস্রাধিক গ্রন্থের অনুবাদ উহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 'তেঙ্গুর'-গ্রন্থের উপক্রমণিকায়, অনূদিত গ্রন্থ-সমূহের গ্রন্থকারগণের নাম ও পরিচয়সহ অনুবাদকের নাম ও পরিচয় আছে। এক এক জন বাঙ্গালী পণ্ডিতের এবং এক এক জন তিব্বতী পণ্ডিতের সাহায্যে তেঙ্গুরান্তর্গত গ্রন্থ-বিশেষের অনুবাদ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। তাহাতে পঞ্চাশ জন বাঙ্গালী পণ্ডিতের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহারা তিব্বতে গিয়া তিব্বতীয় পণ্ডিতগণকে অনুবাদ-কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন। এই সকল বাঙ্গালী তিব্বতীয়গণের গুরুর স্থান অধিকারে সম্মান-ভাজন ছিলেন।* ৮০০ খৃষ্টাব্দে যে বাঙ্গালী তিব্বতে গিয়া এইরূপ অনুবাদের সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি 'বৃদ্ধকায়স্থ' নামে অভিহিত হন। নেপালে বাঙ্গালার উপনিবেশ ছিল; মুসলমান-শাসনের পূর্ব্বের বঙ্গাক্ষরে লিখিত পুঁথি নেপালে এখনও পাওয়া যাইতেছে এবং তাহাতে বঙ্গের প্রতিষ্ঠার বিষয় অবগত হওয়া যাইতেছে। বাঙ্গালা ভাষার আদিতত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে, কোন্ দেশে কি ভাবে তাহা বিস্তৃত আছে—সন্ধান লইলে, বাঙ্গালার বহু প্রাচীন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে। প্রাচীন বাঙ্গালার ইতিহাসের উপাদান বাঙ্গালায় এখন অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া দুর্ঘট হইয়াছে। সুতরাং অন্যান্য দেশের সহিত বঙ্গের যে কোনরূপ সম্বন্ধ-সংশ্রবের পরিচয় পাওয়া যায়, তদ্বিষয়ের সন্ধান লওয়া এখন একান্ত আবশ্যক। কি স্বদেশে, কি বিদেশে, বাঙ্গালী যতই অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে, অতীত ইতিহাসের উজ্জ্বল-চিত্র ততই তাহাদের নয়ন-সমক্ষে প্রতিভাত হইবে।

---

* পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির অভিভাষণে এই তত্ত্ব প্রকাশ করেন। তাঁহার অভিভাষণে আরও প্রকাশ,—"এখন যাঁহারা সিংহলে বাস করেন, এককালে তাঁহারা বাঙ্গালী ছিলেন। সিংহলে পালিভাষা প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে যে সকল গ্রন্থ ছিল ও সিংহলে যে ভাষায় কথোপকথন করিত, এই দুই ভাষার সমালোচনা আবশ্যক। * * * অতি প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি গান পাইয়াছি এবং কতকগুলি ছড়া পাইয়াছি। এইগুলির অধিকাংশই যে বাঙ্গালীর লেখা, সে বিষয় সন্দেহ নাই। যাঁহারা গান লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে সিদ্ধাচার্য্য বলে। সিদ্ধাচার্য্যদের মধ্যে যিনি আদি, সেই লুইসিদ্ধাচার্য্যেরও গান পাইয়াছি। তিব্বতীয়েরা সিদ্ধাচার্য্যদিগের সকল গ্রন্থই আপনাদিগের ভাষায় তর্জ্জমা করিয়া লইয়াছে এবং তাহারা সিদ্ধাচার্য্যদিগকে আজিও পূজা করিয়া থাকে। সিদ্ধাচার্য্যেরা যে ধর্ম্মপ্রচার করেন, তাহাকে সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম বলে। * * * এই বৌদ্ধ সহজিয়ার মত চৈতন্যদেবের আট নয় শত বৎসর পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল। কারণ, লুই সিদ্ধাচার্য্যের গ্রন্থ ক্রমে দুর্ব্বোধ হইয়া আসিলে, উহার টীকার আবশ্যক হয় এবং দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ১০০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে উহার সংস্কৃত টীকা লেখেন। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বাঙ্গালা হইতে তিব্বতে গিয়া তথায় বৌদ্ধধর্ম্ম সংস্কার করেন।" এইরূপে নানাস্থানে বাঙ্গালীর প্রভাবের বিষয় পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। উপসংহারে তিনি যে বলিয়াছেন,—"বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি; প্রাচীনকালে বাঙ্গালার যে এত প্রভাব এত আত্মগৌরব ছিল, বাঙ্গালীরা এখন সে কথা ভুলিয়া গিয়াছেন";—এ সত্য অবিসম্বাদিত সত্য। আমরা এই কথাই বরাবর বলিয়া আসিতেছি। প্রাচীন বাঙ্গালার গৌরব-বিভবের অবধি ছিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ভারতের সাহিত্য-সম্পৎ।

১। সংস্কৃত-সাহিত্যে—কাব্য-মহাকাব্য।

[ভারতের প্রতিষ্ঠার নিদর্শন—সাহিত্য সম্পৎ;—সংস্কৃত-সাহিত্যে কাব্য-মহাকাব্য;—প্রাচীনকালের শ্রেষ্ঠ কাব্য-মহাকাব্য—রামায়ণ মহাভারত পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থ,—সংস্কৃত-সাহিত্যের ষট্-মহাকাব্য;—সংস্কৃত-কাব্যের ইতিহাসের ধারা.—হর্ষচরিত প্রসঙ্গে,—বৃহৎসংহিতা ও বরাহমিহির,—কালিদাস, সুবন্ধু, ভারবী, গুণাঢ্য প্রভৃতির প্রসঙ্গ,—পতঞ্জলি ও মহাভাষ্য,—অশ্বঘোষ ও বুদ্ধচরিত,—দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও গুপ্ত-শক,—খোদিতলিপির মধ্যে হরিসেন প্রভৃতির কবিত্বের বিকাশ;—পাশ্চাত্য-মতে সংস্কৃত-কাব্যের ক্রমবিকাশ,—এক পক্ষের সহিত অন্য পক্ষের মতান্তর;—সংস্কৃত কাব্যের ক্রমবিকাশের বিষয়ে পাশ্চাত্য-মতের অযৌক্তিকতা;—কালিদাস ও বিক্রমাদিত্য;—মহাকবি কালিদাসের কাল-নির্ণয়ে,—কালিদাসের রঘুবংশ, কুমারসম্ভব;—ভর্তৃহরি ও ভট্টি-কাব্য;—ভারবী ও কিরাতার্জ্জুনীয়,—মাঘ ও শিশুপাল-বধ;—শ্রীহর্ষ ও নৈষধ,—অন্যান্য কাব্যাদি।]

প্রতিষ্ঠা-নিদর্শন—সাহিত্য-সম্পৎ।

প্রাচীন ভারতের প্রতিষ্ঠার প্রকৃষ্ট নিদর্শন—তাহার সাহিত্য-সম্পৎ। ভারতবর্ষ যে পৃথিবীতে কত উন্নত-স্থান অধিকার করিয়া ছিল, তাহার সাহিত্যের মধ্যেই তাহা দেদীপ্যমান্ দেখিতে পাই। যদিও কাল-বিবর্ত্তনে প্রাকৃতিক বিপর্যায়ে অন্যান্য সম্পদের ন্যায় ভারতের অধিকাংশ সাহিত্য-সম্পৎ বিলুপ্ত হইয়াছে, তথাপি অবশিষ্ট যাহা আছে, তাহাতেই প্রাচীন ভারতের অতীত-গৌরবের প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া যাইতেছে; এমন কি, সে তুলনায় পৃথিবীর সকল সভ্য দেশকেই ভারতের নিকট অবনত থাকিতে হইয়াছে। ভারতের সাহিত্য-সম্পদের বিষয় কহিতে হইলে, প্রধানতঃ সংস্কৃত-সাহিত্যেরই পরিচয় দেওয়ার আবশ্যক হয়। কিন্তু, সংস্কৃত-সাহিত্য ভিন্ন, প্রতি প্রাদেশিক সাহিত্যের মধ্যেও যে কত রত্ন কত ভাবে সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এতৎপ্রসঙ্গে আমরা প্রথমে সংস্কৃত-সাহিত্যের সম্পদ-সমূহের কয়েকটির পরিচয় সঙ্ক্ষেপে প্রদান করিতেছি বটে; কিন্তু ক্রমশঃ প্রাদেশিক সাহিত্য-সমূহের অন্তর্নিবিষ্ট রত্নরাজি প্রদর্শন করিবারও আকাঙ্ক্ষা আছে।

প্রাচীনকালের শ্রেষ্ঠ কাব্য-মহাকাব্য।

কবিত্ব-সম্পদে সংস্কৃত-সাহিত্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। কবিকুঞ্জ ভারতভূমি—বীণাপাণির বরপুত্রগণের রম্য ক্রীড়াক্ষেত্র। এমন কবিত্বপূর্ণ মনোহর দেশ বুঝি পৃথিবীর অন্যত্র নাই। তাই কবিচূড়ামণিগণ সকলেই প্রায় ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বীণার যে তারে যে ঝঙ্কার তুলিয়া গিয়াছেন, তাহাতে জগৎ মাতোয়ারা হইয়া আছে। ভারতের কবিত্বে কোন্ দেশের কে না বিমুগ্ধ? কি প্রাচ্যের কি পাশ্চাত্যের যে কোনও পণ্ডিত সে কবিত্ব-রসাস্বাদে অবসর পাইয়াছেন, তিনিই বিভোর হইয়া আছেন,—তিনিই মুক্তকণ্ঠে

ভারতীয় কবিগণের প্রাধান্য খ্যাপন করিয়া গিয়াছেন। 'ভারতের কবিত্ব-ভাণ্ডার অনন্ত—অক্ষয়। ভারতবাসীর হৃদয় কবিত্বময়।' এ সকল কথা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণই পুনঃপুনঃ ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। * তাঁহারা আরও বলিয়াছেন,—'যে কেহ ভারতের বীরত্ব-গাথা মূল কবিতায় পাঠ করিবেন, তিনিই প্রশংসাবাদে উদ্বুদ্ধ হইবেন।' † কবিত্বের সর্ব্ববিধ উৎস ভারতে যেমন অমৃতধারা প্রবাহিত করিয়াছিল, বুঝি পৃথিবীর অন্যত্র তাহা দুর্ল্লভ। সংস্কৃত-সাহিত্যে কাব্য-মহাকাব্য অসংখ্য। শাস্ত্রগ্রন্থ-মাত্রকেই কাব্য-মহাকাব্যের অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। পুরাণ-পরম্পরার মধ্যে কত কাব্য-মহাকাব্য বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। রামায়ণ-মহাভারত—পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য মধ্যে পরিগণিত। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও রামায়ণ-মহাভারতকে শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য বলিয়া উল্লেখ করিতে ত্রুটি করেন নাই। অধ্যাপক মনিয়ার উইলিয়মস্, প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের সাহিত্য-সম্পৎ আলোড়ন করিয়া যশোমুকুট-বিভূষিত হন। প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের কাব্যগ্রন্থসমূহ তুলনায় সমালোচনা করিয়া, রামায়ণ-সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন,তাহা এস্থলে উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি লিখিয়াছেন,—'মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা, সরল প্রস্ফুট বর্ণনা, উৎকৃষ্ট মোহনীয় কবিত্ব—রামায়ণ মহাকাব্যকে বিভূষিত করিয়া রাখিয়াছে। বীরত্বের বিশদ বর্ণনায়, প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর মনোমোহন চিত্রে, অন্তঃকরণে সদসৎ বৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাতে—এই মহাকাব্য অতুলনীয়। পৃথিবীর কোনও দেশে কোনও কালে এমন অত্যুৎকৃষ্ট রচনা প্রকাশ পায় নাই—যাহার সহিত ইহা প্রতিযোগিতায় সমর্থ নহে।' ‡ অধ্যাপক গ্রিফিথ—সংস্কৃত-সাহিত্যের আলোচনার জন্য প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। তিনি ইংরাজী পদ্যে রামায়ণাদির যে অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে পাশ্চাত্য-জাতির মধ্যে তিনি অমর হইয়া থাকিবেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন,—'পৃথিবীর যে কোনও দেশের যে কোনও সাহিত্যের প্রতিযোগিতায় রামায়ণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়। কবিত্বের ও সন্নীতির মোহন সমন্বয়ে এমন উচ্চতর ভাব-সৃষ্টি—এমন পবিত্র কবিত্ব—অন্য আর কোথাও দেখা যায় না।' § যেমন রামায়ণ-সম্বন্ধে, তেমনই মহাভারত-সম্বন্ধেও

* "The treasures of poetry in India are inexhaustible."—*History of Antiquity* by Prof. Max Dunker.

† "All who have read the heroic poems in the original are enthusiastic in their praise, &c."—*History of India* by Elphinstone.

‡ "The classical purity, clearness and simplicity of its style, the exquisite touches of true poetic feeling with which it abounds, its graphic descriptions of heroic incidents, nature's grandest scenes, the deep acquaintance it displays with the conflicting workings and most refined emotions of the human heart, all entitle it to rank among the most beautiful compositions that have appeared in any period or in any country."—*Indian Epic Poetry.*

§ "Well may the Ramayan challenge the literature of every age and country to produce a poem that can boast of such perfect characters as a Ram and a Sita.... Nowhere else are poetry and morality so charmingly united, each elevating the other as in this really holy poem."—Griffith's *Ramayan*

পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ এইরূপ বিস্ময়-বিমুগ্ধ। মহাভারত-সম্বন্ধে অধ্যাপক হীরেণ বলিয়াছেন,—'মহাকাব্য মধ্যে ইহা এক শ্রেষ্ঠ রত্ন।' * ফরাসী-দেশীয় পণ্ডিত সিল্‌ভিয়ান লেভির মত,—'মহাভারত যেমন বৃহত্তম, তেমনই ইহা মহাকাব্য মধ্যে অত্যুৎকৃষ্ট।' † অধিক মতের আলোচনা বাহুল্য মাত্র। রামায়ণ-মহাভারত মহাকাব্য যিনিই পাঠ করিয়া দেখিবেন, তিনিই উহাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিবেন। পুরাণ-পরম্পরা-সম্বন্ধেও সেই কথা। সংস্কৃত-সাহিত্যের সেই অনন্ত ভাণ্ডারে যে কত রত্নরাজি বিরাজ করিতেছে, কে তাহা ইয়ত্তা করিবে? এ সকল বিষয় পূর্ব্বেই আমরা কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং এ প্রসঙ্গে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। দূর-অতীতের শাস্ত্রগ্রন্থ মধ্যে যে সকল সাহিত্য-সম্পৎ নিহিত রহিয়াছে, তত্তদ্বিষয়ের আলোচনায় বিরত থাকিয়া তত্তুলনায় আধুনিক—অথচ এখনকার হিসাবে অন্যান্য জাতির তুলনায় যাহা প্রাচীন—সেই সাহিত্যের কথঞ্চিৎ পরিচয়-প্রদানে এখানে প্রয়াস পাইতেছি। সেই সাহিত্যকে মোটামুটী আমরা সংস্কৃত-সাহিত্যের দ্বিতীয় স্তর বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। প্রথম স্তরে শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের স্থান-নির্দ্দেশে তৎসমুদায়ের সঙ্ক্ষিপ্ত আলোচনা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। এতৎপ্রসঙ্গে এক্ষণে দ্বিতীয় স্তরের অন্যান্য কাব্য-মহাকাব্যাদির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

সংস্কৃত-সাহিত্যের ষট্‌ মহাকাব্য

শাস্ত্রগ্রন্থ ভিন্ন, সংস্কৃত-সাহিত্যের অসংখ্য কাব্য-মহাকাব্যের মধ্যে ছয়খানি মহাকাব্যের প্রকৃষ্ট স্থান নির্দ্দেশ করা হয়। সেই ছয়খানি মহাকাব্যের নাম,—(১) রঘুবংশ, (২) কুমার-সম্ভব, (৩) ভট্টিকাব্য, (৪) কিরাতার্জ্জুনীয়, (৫) শিশুপালবধ, (৬) নৈষধ। এই ছয় মহাকাব্যের অন্তর্গত রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব—মহাকবি কালিদাস বিরচিত। ভট্টিকাব্য—ভর্ত্তৃহরি প্রণয়ন করেন। ভারবী—কিরাত-র্জ্জুনীয়ের রচয়িতা। মাঘ 'শিশুপালবধ' এবং শ্রীহর্ষ 'নৈষধ' কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এই ছয় মহাকাব্য কোন্ কোন্ সময় রচিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে এবং ইহার কোনও কোনও কাব্যের রচয়িতা-সম্বন্ধেও, নানা মতান্তর আছে। খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যে এই ষট্-মহাকাব্য রচিত হয়; সাধারণতঃ এই মত প্রচারিত আছে। কিন্তু ঐ কাব্য-ষটকের অন্তর্গত কোন্ কাব্য কোন্ সময় বিরচিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে বহু বিতর্ক বহু দিন হইতে চলিয়া আসিয়াছে। কেহ বলেন,—উহার কোনও কোনও কাব্য খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর রচনা, কেহ আবার সেই সেই কাব্যকে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর রচনা বলিয়া প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পান। এক মহাকবি কালিদাস-সম্বন্ধেই এইরূপ বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। অপর কাব্যচতুষ্টয়ের রচনা—তাঁহার পরবর্ত্তি-কালের রচনা বলিয়া কথিত হয়। যাহাই হউক, যে মতের উপরই আস্থা স্থাপন করা যাউক, প্রোক্ত ছয় কাব্যের কোনও কাব্যই খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর পরে রচিত হওয়ার কথা কেহই বলেন নাই। কালিদাস

* Hereen's *Historical Researches.*

† "The Mahabharat is not only the largest, but also the grandest of all epics, &c.," —Prof. Sylvian Levi.

প্রভৃতির আবির্ভাব-বিষয়ে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পরের কথা প্রায় শুনা যায় না। তাহা হইলেও, সেই সময়েও পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য-জনপদের অবস্থাই বা কি ছিল—আর ভারতের অবস্থাই বা কি ছিল, সহজেই বুঝিতে পারা যায় না কি? সমুন্নত সভ্যসমাজ ভিন্ন রঘুবংশ কুমারসম্ভব প্রভৃতির ন্যায় কাব্য কখনই রচিত হইতে পারে না। প্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথ * প্রোক্ত কাব্য-ষটকের যে টীকা করিয়া গিয়াছেন, সে টীকাও বড় অল্পদিনের নহে। অপিচ, টীকাকারের বিদ্যমানতার বহু পূর্ব্বে যে ঐ সকল কাব্য রচিত হইয়াছিল, তদ্দ্বারা তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সংস্কৃত-কাব্যের ইতিহাসের ধারা।

পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের চক্ষে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে, ভারতীয় কাব্য-শিল্পের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাঁহাদের মত এই যে,—বাণভট্ট-বিরচিত 'হর্ষচরিত' হইতেই কাব্যের ইতিহাস আরম্ভ করা যাইতে পারে। বাণভট্ট, রাজা হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে 'হর্ষচরিত' বিরচন করেন। 'হর্ষচরিত'—ইতিহাসমূলক রমন্যাস। রাজা হর্ষবর্দ্ধন ৬০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। থানেশ্বরে এবং কনোজে তাঁহার রাজধানী ছিল। রাজা হর্ষবর্দ্ধনের পৃষ্ঠপোষণে, প্রধানতঃ তাঁহারই চরিত্র-কথা অবলম্বনে, 'হর্ষচরিত' বিরচিত হয়। সুতরাং এই 'হর্ষচরিত' গ্রন্থের রচনা-কাল যেমন নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয়, তৎপূর্ব্বের কোনও কাব্যের কাল-নির্দ্দেশে তাদৃশ নিশ্চয়তায় উপনীত হওয়া যায় না। 'হর্ষচরিত' ভিন্ন অন্য আর এক গ্রন্থের কাল-নির্ণয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ঐকমত্য দেখিতে পাই। সে গ্রন্থ—বরাহমিহির-বিরচিত—'বৃহৎসংহিতা।' জ্যোতিষ-গ্রন্থ হইলেও বৃহৎসংহিতা কবিতা-ছন্দে

* তুলনায় মল্লিনাথ সেদিনের লোক, অথচ, মল্লিনাথ সম্বন্ধেও এখন নানা মত প্রচলিত। কোন্ দেশে তাঁহার বসতি ছিল, তৎসম্বন্ধেও মতান্তর আছে। ওরঙ্গলের 'কাকতেয়'-রাজগণের আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি মহাকাব্য-সমূহের টীকা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রচার আছে। একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দাক্ষিণাত্যে 'কাকতেয়' (কাকত্য) রাজবংশের অভ্যুদয় হয়। ১৩২৩ খৃষ্টাব্দে ওরঙ্গলের গণপতি-রাজ মুসলমানগণের হস্তে পরাজিত হন। 'কাকতেয়' রাজবংশের অভ্যুদয় ও অবসান ১০৭৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩২৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শেষ হয়। মল্লিনাথ এই রাজবংশের কোন্ রাজার আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন, যদিও তাহা বিশেষভাবে বিবৃত নাই, কিন্তু প্রথম রাজা 'কাকতিপ্রলয়' তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়াই অনুমান হয়। মল্লিনাথের ডাক নাম ছিল—পেড্ড ভট্ট। তাঁহার মল্লিনাথ নাম দেখিয়া অনুমান হয়, তিনি জৈন-তীর্থঙ্কর মল্লিনাথের মতানুবর্ত্তী ছিলেন। তাই, তিনি 'কোলাচল মল্লিনাথ' নামে পরিচিত হন। তিনি বিভিন্ন সংজ্ঞায় বিভিন্ন গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। অমরকোষ অভিধানের তিনি যে টীকা রচনা করেন, তাহার নাম—'অমরপাদপারিজাত' টীকা। কুমারসম্ভব, মেঘদূত ও রঘুবংশের তিনি যে টীকা করেন, তাহার নাম—'সঞ্জীবনী' টীকা। কিরাতার্জ্জুনীয়-গ্রন্থের তৎকৃত টীকার নাম—'ঘণ্টাপথ' টীকা। নৈষধের টীকার নাম—'জীবাতু'। শিশুপালবধের টীকার নাম—'সর্ব্বঙ্কষা টীকা'। সংস্কৃত-সাহিত্যে একাধিক মল্লিনাথের পরিচয় আছে। আর একজন মল্লিনাথ ছিলেন, তিনি "শব্দেন্দুশেখর" ও "লঘুশব্দেন্দুশেখর" গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করেন। "বৈদ্যরত্নমালা" ও "কল্পতরু" গ্রন্থদ্বয়ের প্রণেতা বলিয়া এক মল্লিনাথের প্রসিদ্ধি আছে। জনৈক হিন্দু-রাজার নাম মল্লিনাথ ছিল। জৈনতীর্থঙ্কর মল্লিনাথের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। মহাকাব্য-ষটকের টীকা রচনায় জন্য যে মল্লিনাথ প্রসিদ্ধিসম্পন্ন, তিনি বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষৎ, দর্শন, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়েই ব্যুৎপত্তি-সম্পন্ন ছিলেন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

লিখিত এবং কবিত্বমূলক বলিয়া কাব্যগ্রন্থের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণের গবেষণা-প্রভাবে নির্দ্দিষ্ট হয়, বৃহৎসংহিতা খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে বিরচিত হইয়াছিল। * কোনও কোনও পাশ্চাত্য-পণ্ডিতের মত,—'বরাহমিহির, আর্য্যভট্টের পরবর্ত্তিকালে আবির্ভূত হন এবং ৫৮৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার লোকান্তর ঘটে; অবন্তী তাঁহার জন্মস্থান।' † এ হিসাবে, বরাহমিহির (বৃহৎসংহিতার প্রণেতা) মহাকবি কালিদাসের সমসাময়িক নহেন। যাহা হউক, হর্ষ-চরিতের এবং বৃহৎসংহিতার রচনা-কাল এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইলেও, কালিদাস, সুবন্ধু, ভারবী,গুণাঢ্য প্রভৃতি কবিগণের কাল-নির্দ্দেশের কোনই ঐতিহাসিক ভিত্তি পাওয়া যায় না। তবে,একথা সকলকেই এক বাক্যে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে,খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রোক্ত কবিগণের যশোজ্যোতিঃতে ভারতবর্ষ পরিব্যাপ্ত ছিল। বাণভট্ট অতি সম্মানের সহিত ঐ কবিগণের নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ৬৩৪ খৃষ্টাব্দের একটী খোদিত-লিপিতেও ঐ কবিগণের যশঃকথা কীর্ত্তিত দেখিতে পাই। এতদ্দ্বারা খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে মহাকবি কালিদাস প্রভৃতির বিদ্যমানতা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে। গুণাঢ্য আবার সুবন্ধুর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বুঝা যায়। কারণ, সুবন্ধু আপন গ্রন্থে গুণাঢ্যের নাম পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সুবন্ধু-রচিত প্রধান গ্রন্থ—'বাসবদত্তা।' দ্বিতীয় শীলাদিত্যের রাজত্ব-কালে (৬১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬৫০ খৃষ্টাব্দে) সুবন্ধুর বিদ্যমানতার বিষয় কথিত হয়। ভারতীয় কবিগণের কাল-নির্দ্দেশের নানা অন্তরায় আছে। রাজানুগৃহীত কবিগণের (যাঁহারা কোনও রাজার সভাসদ-মধ্যে পরিগণিত হইতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই) পরিচয় একটু একটু প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্যান্যের পরিচয় পাওয়া বড়ই কঠিন। প্রাচীন-কালে প্রতিভাশালী কবিগণের বিদ্যমানতা-বিষয়ে পতঞ্জলির ‡ 'মহাভাষ্য' এক বিশেষ প্রমাণ। তাহাতে বহু কবির কাব্যগ্রন্থের অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত আছে। মহাভাষ্য—পাণিনি-ব্যাকরণ-সূত্রের বিশদ ভাষ্য। ভারতে বৌদ্ধপ্রভাবকালে (৩২০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ৫০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বৌদ্ধপ্রভাবের কাল নির্দ্দিষ্ট হয়) 'মহাভাষ্য' লিখিত হইয়াছিল। কাহারও মতে—খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী মহাভাষ্যের রচনা-কাল। কেহ কেহ আবার প্রতিপন্ন করিয়াছেন, খৃষ্টজন্মের বহু পূর্ব্বে এই পতঞ্জলি বিদ্যমান ছিলেন। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার বলিয়াছেন, মহাভাষ্যের কাল নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। কিন্তু গোল্ডষ্টুকার বলেন, পতঞ্জলির গ্রন্থ হইতেই তাঁহার বিদ্যমানতার কাল নির্দ্দেশ করা যায়। পতঞ্জলি কোন্ সময়ে বিদ্যমান ছিলেন এবং কোন্ সময়ে বিদ্যমান ছিলেন না, আপন গ্রন্থে তাহা প্রকাশ করিয়া

* বরাহমিহির প্রণীত 'পঞ্চ-সিদ্ধান্তিকা' নামক একখানি জ্যোতিষ-গ্রন্থ পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থে (সুধাকর দ্বিবেদীর সংস্করণ পঞ্চ-সিদ্ধান্তিকা' প্রথম অধ্যায় অষ্টম শ্লোক দ্রষ্টব্য) লিখিত আছে, ৪২৭ শকে চৈত্র মাসে শুক্লপক্ষে সোমবারে ঐ গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। তাহা হইলে গ্রন্থ-সমাপ্তির কাল ৫০৫ খৃষ্টাব্দে দাঁড়ায়। এ হিসাবে ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমাংশে বরাহমিহিরের বিদ্যমানতা বুঝা যায়।

† *Vide* Kern, *Brihat Sanhita* (Preface).

‡ 'যোগশাস্ত্র'-প্রণেতা পতঞ্জলি এবং 'মহাভাষ্য'-প্রণেতা পতঞ্জলি দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন হন। পাতঞ্জল দর্শনের এবং মহাভাষ্যের রচনার তুলনায় তাহা প্রতীত হয়। ভর্ত্তৃহরি, কৈয়ট প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পতঞ্জলি কৃত মহাভাষ্যের টীকা করিয়া গিয়াছেন।

গিয়াছেন। তাঁহার নিজের উক্তি হইতেই প্রতিপন্ন হয়, তিনি মৌর্য্য-বংশের প্রথম রাজার অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্তের (৩১৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে যাঁহার বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন হয়) রাজত্বকালে বিদ্যমান ছিলেন না; পরন্তু, তিনি ঐ বংশের শেষ রাজার রাজত্বকালে (১৮০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের পর) বিদ্যমান ছিলেন।* গোল্ডষ্টুকারের এ গণনা যে প্রমাদ-পরিশূন্য, তাহা বলা যায় না। কারণ, পতঞ্জলি যে মৌর্য্যবংশের প্রথম ও শেষ রাজার বিষয় বলিয়াছেন, তাঁহারা কোন্ সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, গোল্ডষ্টুকারকে তাহা অনুমানে ঠিক করিয়া লইতে হইয়াছে। পূর্ব্বাপর প্রাচীন ইতিহাসের সামঞ্জস্য রাখিতে গেলে, বিষ্ণুপুরাণাদির কথিত মৌর্য্যবংশের আদিভূত চন্দ্রগুপ্ত আরও পূর্ব্ববর্ত্তী কালের নৃপতি বলিয়া প্রতিপন্ন হন। এ সকল বিষয় পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি; পুনরালোচনা বাহুল্য মাত্র। যাহা হউক, অনুষ্টুপাদিছন্দে লিখিত যে সকল সংস্কৃত-কবিতা মহাভাষ্যে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে তৎপূর্ব্বে এদেশে সংস্কৃত-কবিতার প্রাচুর্য্য সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। পতঞ্জলির মহাভাষ্যোদ্ধৃত কবিতাবলীর পর, অশ্বঘোষ-বিরচিত 'বুদ্ধচরিত' বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়া থাকে। ঐ গ্রন্থ মহাকাব্য বলিয়া অভিহিত এবং কবিতাছন্দে সংগ্রথিত। ৪১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ৪২১ খৃষ্টাব্দে চীনাভাষায় ঐ গ্রন্থের অনুবাদ হয়। সুতরাং অশ্বঘোষ যে পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহাতে সংশয় নাই। বৌদ্ধগণের মধ্যে প্রবাদ,—অশ্বঘোষ, রাজা কনিষ্কের (কনিষ্কের)† সমসাময়িক। সুতরাং তিনি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি যে হিন্দু-কবিগণের কাব্যগ্রন্থ-সমূহের অনুসরণে বুদ্ধচরিত রচনা করেন, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। মহাকবি কালিদাসের রচনার সহিত তাঁহার রচনার তুলনা করিলে, অনেক তথ্য নিরূপিত হইতে পারে।‡ পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের গবেষণা-প্রভাবে যে সকল খোদিত-লিপি আবিষ্কৃত হইতেছে, তৎসমুদায়ের আলোচনায়, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত সময়ে, সেই সকল খোদিত-লিপির মধ্যে বহু কবির কবিত্ব-প্রভার বিকাশ দেখি। "কর্‌পাস্ ইন্‌স্ক্রিপ্‌সনাম্ ইণ্ডিকেরাম" § গ্রন্থে মিষ্টার ফ্লীট এতৎপ্রসঙ্গানুকূল অষ্টাদশাধিক লিপি-ফলকের উদ্ধারসাধন করিয়াছেন। উহার অধিকাংশই কবিতাছন্দে সংগ্রথিত। যে অংশ গদ্যে লিখিত, তাহাও উচ্চ আদর্শমূলক। পাঠোদ্ধারে ঐ সকল লিপি-ফলকের কাল নির্ণয় হইয়াছে; তাহাতে প্রতীত হয়, ঐ লিপিফলকগুলি ৩৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৫৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ে খোদিত হইয়াছিল। এই সমুদায় লিপিফলকে প্রধানতঃ গুপ্তরাজগণ-প্রবর্ত্তিত শকের উল্লেখ আছে। ৩১৯ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত-শকের প্রবর্ত্তনা। বিক্রমাদিত্য-অভিধেয় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত প্রথমে গুপ্ত-শকের ব্যবহার করিয়াছিলেন। তৎপ্রবর্ত্তিত খোদিত-লিপিতে এবং মুদ্রাগাত্রে ৪০০ হইতে ৪১৩ খৃষ্টাব্দের নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। কোনও কোনও লিপিফলকে মালব-শক (নামান্তরে বিক্রম-

* Panini: His Place in Sanskrit Literature by Theodor Goldstucker, page 228.

† কনিষ্কের কাল-সম্বন্ধে বাদানুবাদ আছে। "পৃথিবীর ইতিহাস" পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ডে সে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

‡ স্থানান্তরে কালিদাস ও অশ্বঘোষ বিষয়ক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

§ Mr. Fleet's *Corpus Inscriptionum Indicarum.*

শক) দৃষ্ট হয়। ঐ শক ৫৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। প্রোক্ত খোদিতলিপির অধিকাংশই প্রশস্তি-মূলক অর্থাৎ রাজার যশোঘোষণায় ও মঙ্গল-কামনায় লিখিত। ঐ সকল লিপি-ফলকের কবিতার আলোচনায় বেশ বুঝিতে পারা যায়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ খৃষ্টীয় শতাব্দীর কবিতার রচনা-প্রণালী—প্রাচীনকালের কাব্যগ্রন্থের সহিত সম্পূর্ণ সাদৃশ্যমূলক, সুতরাং অভিন্ন। গুপ্তবংশীয় দ্বিতীয় নৃপতি সমুদ্রগুপ্ত চতুর্থ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বিদ্যমান ছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত স্বয়ং কবিপ্রতিভাসম্পন্ন এবং কবিগণের আশ্রয়দাতা বলিয়া পরিচিত। তাঁহার অনুগ্রহ-প্রাপ্ত কবিগণের মধ্যে হরিসেনের নাম উল্লেখযোগ্য। কবি হরিসেন আপন আশ্রয়দাতা নৃপতি-সম্বন্ধে প্রশস্তিমূলক একটী কবিতা ও কয়েক পংক্তি গদ্য লিপিবদ্ধ করেন। নয়টী শ্লোকে ত্রিশ চরণে কবিতাটী নিবদ্ধ। উহার গদ্যাংশও ত্রিশ ছত্রে সন্নিবিষ্ট। ঐ কয়েক পংক্তি কবিতায় ও গদ্যে,হরিসেনে মহাকবি কালিদাসের এবং দণ্ডীর সমকক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার কবিতা কয়েক-পংক্তিতে সংস্কৃতছন্দের রীতি-পদ্ধতি যথা-যথ অনুসৃত। তাঁহার গদ্য বহু যৌগিক পদবিশিষ্ট। তাহার এক একটী শব্দে বিংশত্যধিক-শততম্ শব্দাংশ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার কবিতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবাপন্ন। তাহার ভাষা সরল ও সমস্তপদবিহীন। হরিসেন যে রচনা-পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছেন, খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে বীরসেন কর্ত্তৃক সেই পদ্ধতির অনুসরণ দেখিতে পাওয়া যায়। বীরসেন, সমুদ্রগুপ্তের উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সচিব-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ৫২৯ মালব শকাব্দের (৪৭৩ খৃষ্টাব্দের) আর এক খোদিত-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে চতুশ্চত্বারিংশাধিক শ্লোকনিবদ্ধ পঞ্চাশদধিকশততম্ চরণবিশিষ্ট একটী কবিতা আছে। দাসপুরে (মান্দাসর) সূর্য্যদেবের মন্দির উৎসর্গ উদ্দেশ্যে কবি বৎসভট্টি কর্ত্তৃক ঐ কবিতা লিখিত হইযাছিল। এই কবিতার আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতের কাব্য-সাহিত্য বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। মহাকবি কালিদাসের রচনার সহিত এই কবিতার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এবম্বিধ সাদৃশ্য-দৃষ্টে মনে হয়, বৎসভট্টি মহাকবি কালিদাসের পরবর্ত্তী লেখক ছিলেন এবং তিনি আপন রচনায় মহাকবির অনুসরণ করিয়া-ছিলেন। বৎসভট্টির ও কালিদাসের রচনার এই সাদৃশ্য-প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কেহ কেহ অনুধাবন করেন, মহাকবি কালিদাস খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য-অভিধেয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে বিদ্যমান ছিলেন। গুপ্তরাজগণের রাজত্বকালে প্রচারিত প্রোক্ত লিপি-সমূহ ভিন্ন, গির্ণারে এবং নাসিকে দুইটী খোদিত লিপি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ দুই লিপি দ্বিতীয় শতাব্দীর গদ্য-কাব্যের নিদর্শন। পৌরাণিক কথা-সাহিত্যের ও রমন্যাসের সহিত ঐ রচনার সাদৃশ্য দেখা যায়। ঐ গদ্য-রচনার মধ্যে যেমন বড় বড় যৌগিক শব্দের সমাবেশ আছে, তেমনই অনুপ্রাস, অলঙ্কার, উপমা, ছন্দ প্রভৃতিতে উহা সুশোভিত। ঐ রচনা হরিসেনের রচনার ন্যায় যৌগিক শব্দাড়ম্বরপূর্ণ নহে; পরন্তু দণ্ডী, সুবন্ধু, বাণ প্রভৃতির রচনার অপেক্ষা শব্দ-সম্পদ-বিশিষ্ট। গির্ণারের খোদিত-লিপি হইতে বেশ বুঝা যায়, ঐ গদ্যাংশের রচয়িতা কবিতা-রচনার নিয়ম-পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপ অবগত ছিলেন; এবং উহাতে আরও বুঝা যায়, ঐ সময়ে ও উহার পরবর্ত্তিকালে রাজানুগৃহীত কবিগণ

কবিতা রচনায় যশস্বী হইয়াছিলেন। এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ সিদ্ধান্ত করেন যে, খৃষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতে কাব্য-সাহিত্যের অঙ্কুরোদ্গম হয়,—খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে কালিদাস প্রভৃতির আবির্ভাবে কবিত্ব স্ফূর্ত্তিলাভ করে। এ হিসাবে সংস্কৃত-সাহিত্যে কবিত্বের ক্রম-বিকাশের ইতিহাস খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত ধরা হইয়া থাকে। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার যদিও শাস্ত্রগ্রন্থাদির প্রাচীনত্ব-বিষয়ে অন্যমত পোষণ করেন ; কিন্তু সংস্কৃত-সাহিত্যের দ্বিতীয় স্তরের কাব্য-মহাকাব্য-সমূহের উৎপত্তি-বিষয়ে তাঁহার মত প্রোক্ত মতেরই অনুসারী। তিনি বলেন,—'খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে সংস্কৃত-সাহিত্য পুনর্জ্জীবন লাভ করে। শকগণের (সিদীয়গণের) এবং অন্যান্য বৈদেশিক জাতির পুনঃপুনঃ আক্রমণের ফলে, খৃষ্টীয় প্রথম দুই শতাব্দীতে ভারতবর্ষে সংস্কৃত-সাহিত্যের চর্চ্চা একেবারে লোপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে উজ্জয়িনীর অধিপতি বিক্রমাদিত্যের পৃষ্ঠপোষণে কালিদাস প্রমুখ কবিগণের অভ্যুদয় হয়।'* তাঁহার মতে ৫৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে বিক্রম-শকের গণনা ধরা হইয়াছিল বটে, কিন্তু ৫৪৪ খৃষ্টাব্দ হইতে বিক্রম-শকের প্রচলন হয়। বলা বাহুল্য, মিষ্টার ফার্গুসান এই মত প্রথম প্রচার করেন। তিনি বলেন,—'উজ্জয়িনী-রাজ বিক্রমাদিত্য খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে (৫৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে নহে) শকদিগকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। এই ঘটনার স্মরণার্থ ছয় শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে গণনা করিয়া বিক্রমাদিত্য শকাব্দের প্রবর্ত্তনা করেন।' উজ্জয়িনীর রাজগণের একটী বংশাবলী সংগ্রহ করিয়া প্রধানতঃ তাহা হইতেই ফার্গুসান এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। তবে, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মধ্যেই এ বিষয়ে এখন নানারূপ বিতর্ক-বিতণ্ডা চলিয়াছে। ফার্গুসান ও ম্যাক্সমুলার প্রভৃতির যুক্তির প্রতিবাদে, বুলার, ফ্লীট, ম্যাক্‌ডোনেল প্রমুখ পণ্ডিতগণ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিক্রমাদিত্যের বিদ্যমানতার বিষয় উড়াইয়া দিতেছেন। পরন্তু খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে সংস্কৃত-সাহিত্যের চর্চ্চা যে লোপ পায় নাই, তাহাই তারস্বরে ঘোষণা করিতেছেন। এ সকল বিষয়ে তাঁহাদের যুক্তি নিম্নে প্রকটিত হইল। গির্ণারে এবং নাসিকে গুপ্তরাজগণের প্রচারিত যে দুই গদ্য খোদিত-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার দ্বারাই ঐ সময়ে সংস্কৃত-ভাষার চর্চ্চার বিষয় প্রতীত হয়। আরও, শকগণ ভারতবর্ষের পঞ্চমাংশ মাত্র অধিকারভুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ; তাহাতে ভারতবর্ষে সংস্কৃত-সাহিত্যের চর্চ্চার কোনই বিঘ্ন ঘটে নাই। শকগণের রাজত্ব পূর্ব্ব-সীমায় মাত্র মথুরা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল ; আর, পঞ্জাব, সিন্ধুদেশ, গুজরাট, রাজপুতানা ও মধ্যভারতের কিয়দংশ মাত্র তাঁহাদের অধিকারে আসিয়াছিল। অধিকন্তু তাঁহারা শীঘ্রই হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক বংশ পরে তাঁহারা প্রায়ই ভারতীয় নামে পরিচিত হন। এক জনের নাম উল্লেখ করিতেছি। সেই নৃপতির বিজয়-বার্ত্তা সংস্কৃত ও প্রাকৃত মিশ্রিত একখানি খোদিত-লিপিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতে তাঁহার নাম 'উষভদত্ত' বা সংস্কৃত 'ঋষভদত্ত' রূপ লিখিত আছে। কনিষ্ক বা কনিক নামেও তাঁহাতে

সংস্কৃত-কাব্যের ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গ।

---

* *India : What can it teaches us ?* By Prof. Max Muller.

ভারতের প্রভাব 'দেখা যায়। তিনি এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ বৌদ্ধধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহাদের রাজত্বকালে মথুরায় ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। ভারতের সামান্যমাত্র অংশ অধিকার করিয়া এবং সেই অংশের বিবিধ শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে রত থাকিয়া, তাঁহারা যে সারা-ভারতের সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, ইহা কোনক্রমেই মনে হইতে পারে না। ৫৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের বিক্রম-শক ৫৪৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়াও মনে করা সঙ্গত নহে। কারণ, মালব-শক নামে একটী শকাব্দের অস্তিত্ব উক্ত খৃষ্টাব্দের এক শতাব্দী পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল প্রতিপন্ন হয়। সেই শক ৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে বিক্রম-শক নামে পরিচিত হইয়াছে। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে শকগণ যে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন, তাহাও সপ্রমাণ হয় না। কারণ, উহার শতাধিক বৎসর পূর্ব্ব হইতে গুপ্ত-নৃপতিগণ পশ্চিম-ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। আরও এক কথা, ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে 'হুণ' অভিধেয় বৈদেশিক আক্রমণকারিগণ পশ্চিম-ভারত হইতে বিতাড়িত হন বটে; কিন্তু তাহাতে বিক্রমাদিত্যের কোনও সম্বন্ধ নাই। 'যশোধর্ম্মন্ বিষ্ণুবর্দ্ধন' নামধেয় নৃপতি শক-গণকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন, ইতিহাসে ইহাই সাক্ষ্য পাওয়া যায়। এইরূপে, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিক্রমাদিত্যের বিদ্যমানতা অসিদ্ধ হয়;—ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, বরাহমিহির, বররুচি প্রভৃতি নবরত্নের রত্ন-সমূহেরও কাল-নির্দ্দেশে অন্তরায় ঘটে। নবরত্ন-সংক্রান্ত উদ্ভট শ্লোক খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর রচনা বলিয়া বুঝা যায়। যখন খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে উজ্জয়িনী-রাজ বিক্রমাদিত্যের বিদ্যমানতাই প্রতিপন্ন হয় না, তখন ঐ সময় নবরত্নের অস্তিত্ব কল্পনামাত্রে পর্য্যবসিত হয়। এবম্প্রকার বিতর্ক-বিতণ্ডার পর, শেষোক্ত পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ কালিদাস প্রভৃতিকে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর কবি বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন; এবং খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ভারতে কবিত্বের বিকাশ আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। বরাহমিহির, হরিসেন প্রভৃতির প্রসঙ্গে এবং প্রশস্তিমূলক লিপি প্রভৃতির আবিষ্কারে, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর অব্যবহিত পূর্ব্বে ভারতে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষণে সংস্কৃত-কবিতা বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল,—ইহাই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত।

প্রাচীন ভারতের অতীত-গৌরবের স্পর্দ্ধার সামগ্রী যাহা কিছু আছে, প্রায় সকল বিষয়েই এইরূপ বাদ-প্রতিবাদ মতান্তর দেখিতে পাই। অপরের অতীত-গৌরবে ঈর্ষান্বিত হইয়াই হউক, আর যে কারণেই হউক, এক শ্রেণীর প্রত্নতত্ত্ববিৎ ভারতের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য যেন বদ্ধপরিকর আছেন। যাঁহারা সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত, তাঁহারাও অনেক সময় ভ্রান্তবুদ্ধি-পরিচালিত হইয়া থাকেন। অধিকাংশ বিষয়েই যখন ভ্রম-প্রমাদ দেখিতে পাই, তখন ভারতে কবিত্ব-স্ফূর্ত্তি বিষয়ে—ধ্যান-ধারণার অনতিক্রম্য বিষয়ে—যে নানা বিভ্রম উপস্থিত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ বা তাঁহাদের অনুসরণকারিগণ যে ভাবে ভারতে কবিত্ব-স্ফূর্ত্তির বিষয় বিবৃত করিয়া গিয়াছেন, যুক্তি-তর্কের সামান্য হিল্লোলে সে ভিত্তি টলিয়া পড়ে। ভারতে কবিত্ব-স্ফূর্ত্তি বিষয়ে তাঁহাদের যুক্তির প্রধান উপাদান—প্রশস্তিমূলক লিপিফলক প্রভৃতি।

কবিত্ববিকাশ বিষয়ে ভ্রান্ত-মত।

সে মতে, ঐ সকল লিপির ক্রমবিকাশেই ভারতে কাব্য-সাহিত্যের প্রবর্ত্তনা। বুলার, ফ্লীট, ম্যাক্‌ডোনেল প্রভৃতি পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের গবেষণার আলোচনায় এই মতই প্রকট দেখি। খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে শিলাফলক প্রভৃতিতে কবিতার সূচনা হইয়া খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে তাহা বিকাশ প্রাপ্ত হয়,—তাঁহাদের মন্তব্যের ইহাই স্থূল সিদ্ধান্ত। এই বিষয় পূর্ব্বপ্রকাশিত তাঁহাদের মন্তব্যে বুঝা গিয়াছে। আর তাঁহারা যাহা খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রবর্ত্তনা বলিয়া স্থির করিয়াছেন, ম্যাক্সমূলার প্রমুখ অপর শ্রেণীর পণ্ডিতগণ তদ্বিষয়ে ষষ্ঠ শতাব্দী নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এতদুভয় মতে শতাধিক বর্ষের পার্থক্য মাত্র দেখিতে পাই। কিন্তু একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে, উভয় মতই যে ভ্রান্তিপূর্ণ, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হয়। শিলালিপির প্রবর্ত্তনা কি আদিম অবস্থার পরিচায়ক? জাতি সভ্য-সমুন্নত ও প্রতিষ্ঠান্বিত না হইলে, কখনই লিপিফলকে তাহার বিজয়বার্ত্তা বিঘোষিত হয় না। আর, লিপিফলক-দৃষ্টে কবিত্বের বা সাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্ব নির্ণয় করিতে যাওয়াও সমীচীন নহে। বর্ত্তমান বৃটীশ-রাজত্বে প্রায় প্রতি সদনুষ্ঠানের পরিচয়-প্রসঙ্গে প্রস্তরলিপির প্রবর্ত্তনা দেখিতে পাই। কোথাও বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবে; দেখুন,—সেখানে প্রস্তরফলকে তদ্বিবরণ খোদিত হইতেছে। কোথাও বিচারালয় প্রতিষ্ঠা হইবে;—সেখানে প্রস্তরফলকে খোদিত-লিপির মধ্যে তাহার পরিচয় রহিয়াছে। এইরূপ, বিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ অনুষ্ঠানের মধ্যেই লিপিফলকের প্রভাব প্রত্যক্ষীভূত। ইংরাজ-রাজত্বে প্রধানতঃ ইংরাজী ভাষাতেই এই সকল লিপিফলক খোদিত হয়। কিন্তু, ইহাতে কি বলিতে হইবে, ইংরাজী-সাহিত্যের বা লিপিফলকে খোদিত ভাষার (সে ভাষা যে ভাষাই হউক) ইহাই আদি-স্তর? অধুনা সংস্কৃত-কবিতায়ও অনেক লিপিফলক লিখিত হইয়া থাকে। মনে করুন,—কেহ একটী শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন; আর সেই মন্দির-গাত্রে প্রস্তরফলকে সংস্কৃত-কবিতায় আত্মপরিচয়-সহ শিবমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া রাখিলেন। কিছুকাল পরে সেই মন্দিরের সেই শিলাফলক আবিষ্কার করিয়া যদি কেহ বলেন,—"সংস্কৃত-কবিতার বিকাশ-প্রাপ্তির ইহাই আদি-স্তর;" তাহাই কি মানিয়া লইতে হইবে? কখনই নয়। এক এই দৃষ্টান্তের অবতারণায় বলিতে পারি, গির্ণার প্রভৃতি স্থানে যে সকল শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা কখনই সংস্কৃত-সাহিত্যের বা সংস্কৃত-কাব্যের আদি-স্তর নহে। সুতরাং ঐ সকল লিপিফলকের ক্রমবিকাশে খৃষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে কালি-দাস প্রমুখ কবিগণের যে অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল, সে সিদ্ধান্ত একান্ত ভ্রমসঙ্কুল। মহাকবি কালিদাস-প্রমুখ কবিগণের কাব্যগ্রন্থ-সমূহের কাল-নির্ণয়ের প্রয়াসে এ ভ্রম বিশদীকৃত হয়।

প্রাচীন ভারতে বহু বিক্রমাদিত্য ও বহু কালিদাস বিদ্যমান ছিলেন। একটু অনু-সন্ধান করিলে বুঝা যায়, 'বিক্রমাদিত্য' শব্দ এক সময়ে রাজচক্রবর্ত্তিত্বজ্ঞাপক সংজ্ঞা-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল, এবং কালিদাস-নামও কবিজনপরিচায়ক বিশেষণ-মধ্যে গণ্য ছিল। রাজগণের মধ্যে যিনিই একটু ক্ষমতাশালী হইতেন, তিনিই আপনাকে রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্য বলিয়া ঘোষণা করিতেন; আবার যিনিই একটু কবিত্বের স্পর্দ্ধা রাখিতেন, তিনিই কালিদাস বলিয়া আপনার পরিচয়

বিক্রমাদিত্য ও কালিদাস।

দিতে প্রলুব্ধ হইতেন। আজিকালিও এতদ্দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই; দেখিতে পাই, কোনও রাজা-মহারাজের গুণের পরিচয়ে তাঁহার স্তাবকগণ তাঁহাকে 'বিক্রমাদিত্য' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন; এবং কথায় কথায় লোকে লেখক-বিশেষকে 'কবি-কালিদাস' বলিয়া ব্যঙ্গ করিতে ত্রুটি করেন না। এইরূপেও অনেক বিক্রমাদিত্য ও অনেক কালিদাসের উদ্ভব হইয়া থাকিবে। যাহা হউক, ইতিহাসে কয় জন প্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্যের এবং কয় জন প্রসিদ্ধ কালিদাসের পরিচয় পাই, প্রথমে দেখা যাউক। প্রথম বিক্রমাদিত্য—সংবৎ-কর্ত্তা নবরত্নের আশ্রয়দাতা। তিনি খৃষ্ট-জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তিকালে বিদ্যমান ছিলেন। * মহাকবি কালিদাস—রঘুবংশ কুমারসম্ভব প্রভৃতি কাব্যপ্রণেতা কালিদাস—এই বিক্রমাদিত্যের আশ্রয়েই পরিপুষ্ট হইয়াছিলেন। আমরা এই মতেরই সমর্থন করি। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য—খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি গুপ্ত-রাজগণের তৃতীয় পর্য্যায়ে অবস্থিত এবং প্রথম চন্দ্রগুপ্ত নামে পরিচিত। ৩১৯ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত তাঁহার এক খোদিত-লিপি পাওয়া গিয়াছে। তৃতীয় বিক্রমাদিত্য—সমুদ্রগুপ্ত-অভিধেয় বিক্রমাদিত্য। কেহ কেহ ইঁহাকে দ্বিতীয় সমুদ্রগুপ্ত বলিয়াও পরিচিত করিয়াছেন। ৩৫০ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত ইঁহার প্রবর্ত্তিত লিপি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এলাহাবাদ-দুর্গে অশোক-লাট-স্তম্ভে এই সমুদ্রগুপ্তের লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে ডবাক্ (ঢাকা) এবং পশ্চিমে সীমান্তদেশ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতাপ বিস্তৃত হইয়াছিল। অধুনা কোনও কোনও পণ্ডিতের গবেষণা-প্রভাবে সিদ্ধান্ত হইতেছে, বঙ্গদেশান্তর্গত সমুদ্রগড় ইহাঁর গড় ছিল এবং মহাকবি কালিদাস ইঁহারই আশ্রয়-লাভে প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছিলেন। চতুর্থ বিক্রমাদিত্য—খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমাংশে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার নাম—দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। ৪০১ হইতে ৪১৪ খৃষ্টাব্দে প্রবর্ত্তিত তাঁহার মুদ্রা ও লিপিফলক প্রাপ্ত হওয়া যায়। পঞ্চম বিক্রমাদিত্য—মিষ্টার ফ্লীট-কথিত বিক্রমাদিত্য। ফ্লীট বলেন,—প্রথম বা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ইত্যাদি রূপ নামে এই বিক্রমাদিত্য পরিচিত ছিলেন। † ৫৪৪ খৃষ্টাব্দে ইনি বিক্রম-শকের প্রবর্ত্তনা করেন। মহাকবি কালিদাস প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষণ জন্যই ইঁহার প্রসিদ্ধি। ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য—ষষ্ঠ শতাব্দীর বিক্রমাদিত্য। পাশ্চাত্য-দেশের ম্যাক্সমুলার এবং অস্মদ্দেশের রমেশচন্দ্র প্রভৃতি এই বিক্রমাদিত্যকেই মহাকবি কালিদাসের পৃষ্ঠপোষক বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। ‡ হুয়েন-সাংয়ের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এবং কাশ্মীর-জয়-উপলক্ষে কহ্লনের রচনায় রাজতরঙ্গিণীতে যে বিক্রমাদিত্যের উল্লেখ আছে, উক্ত পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত ইনিই সেই বিক্রমাদিত্য। হুয়েন-সাং খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আসেন; কহ্লন মিশ্র খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। হুয়েন-সাং লিখিয়া গিয়াছেন,—৫৮০ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় শিলাদিত্য রাজত্ব করেন; বিক্রমাদিত্য তাঁহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী নৃপতি।

* এই বিক্রমাদিত্যের বিদ্যমানতা প্রভৃতির বিষয় "পৃথিবীর ইতিহাস" প্রথম খণ্ডে মহাভারতের কালনির্ণয়-প্রসঙ্গে ২৭৯ হইতে ২৮৬ পৃষ্ঠায় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

† *Corpus Inscriptionum Indicarum*, Vol. iii, p. 37.

‡ *Civilisation in Ancient India* by R. C. Dutt and *India—What can it teaches us ?*—by Prof Max Muller

ঐতিহাসিক কহ্লন বলেন,—'কনিষ্কের পর ত্রিশ জন নৃপতি রাজত্ব করেন; তাহার পর, বিক্রমাদিত্যের আবির্ভাব হয়। সেই বিক্রমাদিত্যের অপর নাম—হর্ষ বিক্রমাদিত্য। তিনি উজ্জয়িনীর অধিপতি ছিলেন। তিনি শক-কুল নির্ম্মূল করেন। কবি মাতৃগুপ্ত তাঁহার অনুগ্রহভাজন হইয়াছিলেন। কাশ্মীর-রাজ্য জয় করিয়া, এই বিক্রমাদিত্য কবি মাতৃগুপ্তের হস্তে সেই রাজ্যের শাসন-ভার অর্পণ করিয়াছিলেন।' কহ্লন-প্রণীত রাজতরঙ্গিণীর তৃতীয় তরঙ্গে এতদ্বিবরণ বিবৃত আছে। ৭৮ খৃষ্টাব্দে কনিষ্কের বিদ্যমানতার বিষয় অনুধাবন করিয়া, তৎপরবর্ত্তী রাজন্যগণের গড়-পড়তা একটা শাসনকাল স্থির করিয়া লইয়া, সেই হিসাবে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিক্রমাদিত্যের এবং কালিদাসের কাল-নির্ণয় করা হয়। এ মতে, মাতৃগুপ্তই কলিদাস বলিয়া প্রতিপন্ন হন। পূর্ব্বোক্ত বিক্রমাদিত্য ভিন্ন রাজতরঙ্গিণীতে আরও এক বিক্রমাদিত্যের উল্লেখ আছে। মাতৃগুপ্তের রাজত্বের ৩৯৪ বৎসর পরে তিনি সিংহাসনারোহণ করেন। ইহার পর—ভোজরাজ বিক্রমাদিত্য। কথিত হয়, উজ্জয়িনী-নগরের অধিপতি ভোজরাজ 'বিক্রমাদিত্য' নামে পরিচিত ছিলেন। ১১০০ খৃষ্টাব্দে সেই ভোজরাজের বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন হয়। এই ভোজরাজেরও নবরত্নের সভা ছিল; আর, সেই নবরত্নে কালিদাস প্রভৃতির সহিত ভবভূতি, সুবন্ধু, মল্লিনাথ, জয়দেব প্রভৃতির নাম সংযুক্ত আছে। এই ভোজরাজ বিক্রমাদিত্যকেই কেহ কেহ শেষ বিক্রমাদিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু পরবর্ত্তিকালেও বিক্রমাদিত্য নামে বহু নৃপতির বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন হয়। যাহা হউক, বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গে তাঁহাদের বিষয় আলোচনার আবশ্যক নাই। উপরে যে কয় জন বিক্রমাদিত্যের উল্লেখ করিলাম, এ প্রসঙ্গে তাহাই যথেষ্ট। এইরূপ, যত বিক্রমাদিত্য, তত কালিদাস; বরং কালিদাসের সংখ্যা আরও অধিক। কালিদাসের নামে কত প্রকারের কত গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করিলে এ তত্ত্ব কতকটা অধিগত হইতে পারে। কতকগুলি পুস্তকের নাম;—রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, ঋতুসংহার, দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা, অভিজ্ঞান-শকুন্তলা নাটক, বিক্রমোর্ব্বশী নাটক, মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক, নলোদয়, শৃঙ্গারতিলক, শ্রুতবোধ, সেতুকাব্য, অম্বাস্তব, কালীস্তোত্র, কাব্যনাটকালঙ্কার, ঘটকর্পর, চণ্ডীকাদণ্ডস্তোত্র, দুর্ঘটকাব্য, নবরত্নমালা, নানার্থকোষ, পুষ্পবাণবিলাস, প্রশ্নোত্তরমালা, রাক্ষসকাব্য, লঘুস্তব, বিদ্বদ্বিনোদকাব্য, বৃত্তরত্নাবলী, বৃন্দাবনকাব্য, শৃঙ্গারসার, শ্যামলাদণ্ডক, কুণ্ডপ্রবন্ধ, ত্রিপুরাসুন্দরীস্তুতিটীকা, জ্যোতির্ব্বিদাভরণ, রত্নকোষ, শুদ্ধিচন্দ্রিকা, গঙ্গাষ্টক, মঙ্গলাষ্টক, শক্রপরাজয়শাস্ত্রসার (শক্রপরাভব), অভিনবভারতচম্পূ, ভাগবতচম্পূ, শৃঙ্গারকোষভাণ, সারসংগ্রহকাব্য ইত্যাদি। এই সকল গ্রন্থের কয়েক খানি গ্রন্থ যে মহাকবি কালিদাসের রচিত গ্রন্থ নহে, তাহা অল্পায়াসেই অবগত হওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্থলে কুণ্ডপ্রবন্ধ, ত্রিপুরাসুন্দরীস্তুতিটীকা গ্রন্থ-দুইখানির নাম উল্লেখ করিতে পারি। ঐ দুই গ্রন্থের রচয়িতার নাম কালিদাস বটে; কিন্তু প্রথমোক্ত গ্রন্থরচয়িতা আপনাকে বলভদ্র-পুত্র বলিয়া এবং দ্বিতীয়োক্ত গ্রন্থরচয়িতা আপনাকে রামগোবিন্দ-পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া

কালিদাসের গ্রন্থ-প্রসঙ্গে।

গিয়াছেন। সুতরাং এ দুই কালিদাস যে স্বতন্ত্র কালিদাস, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইল। এইরূপ, শক্রপরাজয়শাস্ত্রসার (শক্রপরাভব) গ্রন্থের রচয়িতা এবং 'ভারতচম্পূ' ও 'ভাগবত-চম্পূ' গ্রন্থদ্বয়ের প্রণেতৃদ্বয় যথাক্রমে 'কালিদাস গণক' ও 'অভিনব কালিদাস' নামে পরিচিত হইয়া থাকেন। সুতরাং এখানেও আর দুই কালিদাসের পরিচয় পাওয়া গেল। সেতুবন্ধকাব্য কালিদাসের পরবর্ত্তিকালে রচিত হয় বলিয়া কেহ কেহ প্রমাণ করেন। কাশ্মীর-রাজ প্রবর-সেন ঐ গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। রচনা-প্রণালীর তরতম্য দৃষ্টে, বৃত্তরত্নাবলী ও প্রশ্নোত্তরমালা গ্রন্থদ্বয় রঘুবংশাদি কাব্য-রচয়িতা কালিদাসের রচিত নয় বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ঘটকর্পর-কাব্য—কবি ঘটকর্পরের রচিত ; অথচ, কালিদাসের গ্রন্থ-মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। জ্যোতির্ব্বিদাভরণ গ্রন্থকে আমরা যদিও মহাকবি কালিদাসের রচনা বলিয়াই বিশ্বাস করি ; কিন্তু ঐ গ্রন্থকে কেহ কেহ কালিদাসের রচনা বলিয়া মনে করেন না ; কারণ, রঘুবংশাদির রচনার সহিত উহার রচনার সাদৃশ্য নাই। এ সকল ভিন্ন, বিভিন্ন নৃপতির রাজত্বকালে কালিদাস নামধেয় বিভিন্ন কবির বিদ্যমানতার বিষয় অবগত হওয়া যায়। ভোজরাজের সময়ে কালিদাস, বিভিন্ন বিক্রমাদিত্যের সময়ে কালিদাস—কালি-দাস সম্বন্ধে কত মতই প্রচলিত আছে! মধ্যভারতে ধারা-নগরে ভোজরাজের রাজ-ধানী ছিল। কোনও মতে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে, কোনও মতে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে, তাঁহার বিদ্যমানতার বিষয় অবগত হওয়া যায়। তিনি রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্য নামেও পরিচিত হইয়াছিলেন। নবরত্নসভা ও কালিদাস—তাঁহার প্রতিষ্ঠার পরিচয়। তাঁহার সভায় যে কালিদাস ছিলেন, দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা সেই কালিদাসেরই রচনা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ঐ দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা গ্রন্থে উজ্জয়িনী-রাজ বিক্রমাদিত্যের ও তাঁহার প্রতিযোগী শালিবাহন নৃপতির একটু পরিচয় আছে। তদনুসারে উজ্জয়িনীর রাজার নাম ভর্ত্তৃহরি ; বিক্রমাদিত্য তাঁহার অনুজ। ভর্ত্তৃহরি সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিলে, বিক্রমাদিত্য রাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত হন। সেই বিক্রমাদিত্যের প্রতিষ্ঠা-কালে প্রতিষ্ঠান্-নগরে শালিবাহন জন্মগ্রহণ করেন। শালিবাহন বিক্রমাদিত্যের প্রতিযোগী হইবেন, আর তাঁহার হস্তে বিক্রমাদিত্যের নিধন ঘটিবে,—দৈবজ্ঞ-মুখে এই কথা প্রচারিত হয়। তাহাতে বিক্রমাদিত্য শালিবাহন-সংহারে কৃতসঙ্কল্প হন। কিন্তু প্রতিষ্ঠান-নগরে গিয়া শালিবাহনকে হত্যা করিতে চেষ্টা করায়, বিক্রমাদিত্যই শালিবাহন-হস্তে নিহত হইয়া-ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের লোকান্তরের বহু কাল পরে ভোজরাজ জন্মগ্রহণ করেন, এবং উজ্জয়িনীর আধিপত্য প্রাপ্ত হন। দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকার মুখে ভোজরাজ-সমক্ষে বিক্রমা-দিত্যের মহিমা পরিকীর্ত্তিত। দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকার পরিবর্ণিত এবংবিধ ঘটনায় ঐ গ্রন্থ

দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকায় এ বিষয় এইরূপ লিখিত আছে ;—"অস্তি সমস্তবস্তুবিস্মিতদেবা গুণপরাভূতপুরন্দর-নিবাসা উজ্জয়িনী নাম নগরী। তত্র সামন্তসীমন্ত সিন্দূরারুণিতচরণকমলযুগলো ভর্ত্তৃহরির্নাম রাজাভূৎ সকলকলাপ্রবীণঃ সমস্তশাস্ত্রাভিজ্ঞশ্চ তস্যানুজো বিক্রমাদিত্যনামা স্ববিক্রমপরিহৃতবৈরবিক্রমোঽভূৎ। ... ...বেতালঃ সত্বরমুজ্জয়িনীং আগত্য রাজ্ঞে বিক্রমাদিত্যায় সর্ব্বমপি (শালিবাহনস্য) বৃত্তান্তমকথয়ৎ। রাজা পারিতোষিকং দত্ত্বা খড়্গমাদায় প্রতিষ্ঠানগরং গতঃ। যাবৎ খড়্গেন শালিবাহনং হন্তুং প্রবৃত্তস্তাবত্তেন দণ্ডেন তাড়িতঃ প্রতিষ্ঠানগরাদুজ্জয়িন্যাং পতিতঃ বেদনামসহমানঃ শরীরং বিসসর্জ্জ।"

ভোজরাজের সময়ে লিখিত হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। কালিদাস ও বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে এইরূপ মতান্তর ও বিরোধ-বিতণ্ডা যে আজকালই চলিয়াছে, তাহা নহে; খৃষ্ট-জন্মের প্রারম্ভ হইতেই এই বিতণ্ডা দেখিতে পাই। নবরত্নের অন্তর্গত বিভিন্ন পণ্ডিতের বিদ্যমানতার বিষয় বিভিন্ন সময়ে ঘোষিত হইয়া থাকে। নবরত্নের প্রথম উল্লেখ জ্যোতির্ব্বিদাভরণ-গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। বুদ্ধগয়ার একটী প্রাচীন খোদিত লিপিতে (১০১৫ সম্বতের = ৯৪৮খৃষ্টাব্দের) বিক্রমাদিত্যের ও নবরত্নের উল্লেখ আছে। ভোজপ্রবন্ধে * ভোজরাজের সভায় নবরত্নের বিদ্যমানতার বিষয় এবং কোনও কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত নবরত্ন-সংক্রান্ত শ্লোকটীকে যে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর রচনা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এইরূপ মতান্তরের মধ্য হইতে মহাকবি কালিদাসকে এবং তাঁহার পৃষ্ঠপোষক বিক্রমাদিত্যকে অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া—কিরূপ কঠোর সমস্যা, সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। ফলতঃ, ভারতবর্ষে বহু বিক্রমাদিত্য, বহু কালিদাস ও বহু নবরত্নের আবির্ভাব হইয়াছিল। সংস্কৃত-সাহিত্যের গ্রন্থকারগণের ও গ্রন্থ-সমূহের যে সকল তালিকা বিভিন্ন প্রদেশে সংগৃহীত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা হইতে এতদ্বিষয়ে বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। †

বিভিন্ন সময়ে কালিদাস-নামে পরিচিত বিভিন্ন গ্রন্থকারের আবির্ভাব হইয়াছিল; অথবা, ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকার আপনাকে কালিদাস নামে পরিচিত করিয়াছিলেন। প্রধানতঃ এবম্বিধ কারণেই মহাকবি কালিদাসের সময়-নিরূপণ-পক্ষে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে—মতান্তর ঘটিতেছে। কোন্ পক্ষ কিরূপ যুক্তি-সাহায্যে কালিদাসের আবির্ভাব-কাল নিরূপণ করেন, তাহার একটু আলোচনা করিলেই সত্য-তত্ত্ব অনেকটা উপলব্ধি হইতে পারে। যাঁহারা খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে কালিদাসের আবির্ভাব কাল নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদের যুক্তিপরম্পরা প্রথমে উল্লেখ করা যাউক। সে পক্ষের প্রথম যুক্তি—রাজতরঙ্গিণীর বর্ণনা। রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে,—'উজ্জয়িনী-রাজ হর্ষ বিক্রমাদিত্য কাশ্মীর-রাজ্য অধিকার করেন। কবি মাতৃগুপ্ত তাঁহার সভাসদ্ ছিলেন। রাজা হর্ষ বিক্রমাদিত্য কাশ্মীর-রাজ্য অধিকার করিয়া মাতৃগুপ্তকে সেই রাজ্যের শাসনভার প্রদান করিয়াছিলেন।' রাজতরঙ্গিণীর এবম্বিধ বর্ণনা উপলক্ষ করিয়া পণ্ডিতগণ বলেন,—'মাতৃগুপ্ত ও কালিদাস একই ব্যক্তি।' তাঁহাদের গণনা-ক্রমে, মাতৃগুপ্তের রাজত্বকাল খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে; সুতরাং কালিদাস ষষ্ঠ শতাব্দীর কবি। কালিদাসের কাল-নির্ণয়ে দ্বিতীয় যুক্তি—হর্ষচরিত কাব্যের একটী শ্লোক। সেই শ্লোকটী এই;—

মহাকবি কালিদাসের কাল-নির্ণয়ে।

"কীর্ত্তিঃ প্রবরসেনস্য প্রয়াতা কুমুদোজ্জ্বলা সাগরস্য পরং পারং কপিসেনেব সেতুনা।
নির্গতাসু ন বা কস্য কালিদাসস্য সূক্তিষু প্রীতির্ম্মধুরসান্দ্রাসু মঞ্জরীষ্বিব জায়তে॥"

এই কবিতায় প্রবরসেনের এবং কালিদাসের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়,

---

* 'ভোজপ্রবন্ধ' গ্রন্থ মহারাজ বল্লাল-সেন প্রণয়ন করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। স্থানান্তরে ভোজপ্রবন্ধ বিষয়ক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

† Vide *Catalogus Catalogorum* An alphabetical register of Sanskrit works and authors by Theodor Aufrechet.

কাশ্মীররাজ প্রবরসেন এবং কালিদাস একই সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। মাতৃগুপ্ত প্রবর-সেনের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন; প্রবরসেন ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। ইহাই হইল এ পক্ষে দ্বিতীয় যুক্তি। * তৃতীয় যুক্তি—'কুমারসম্ভব' কাব্যে 'যামিত্র' শব্দের উল্লেখ। কুমারসম্ভবে সপ্তম সর্গে প্রথম শ্লোকে 'যামিত্র' (জামিত্র) শব্দ দৃষ্ট হয়। শ্লোকটী,—

"অথৌষধীনামধিপস্য বৃদ্ধৌ তিথৌ চ যামিত্রগুণান্বিতায়াম্।
সমেতবন্ধুর্হিমবান্ সুতায়াঃ বিবাহদীক্ষাবিধিমন্বতিষ্ঠৎ॥"

এই শ্লোকের অর্থ—'শুক্লপক্ষে যামিত্রগুণান্বিত তিথিতে বন্ধুবর্গের সমিত মিলিত হইয়া হিম-বান্ আপন কন্যার বিবাহ-সংস্কার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেন।' জ্যোতিষ-মতে—'যামিত্র' শব্দে লগ্নের সপ্তম স্থানকে বুঝায়। বিবাহ-কার্য্যে এই স্থানের শুদ্ধ দেখিতে হয়। গ্রীক-দিগের জ্যোতিষে 'ডেরা মেট্রণ' (Dera matron) শব্দ দৃষ্ট হয়। 'যামিত্র' ঐ শব্দের অনুসৃতি বলিয়া কাহারও কাহারও ধারণা। গ্রীক জ্যোতিষ-শাস্ত্রের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি—খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে সংসাধিত হইয়াছিল। গ্রীকদিগের অনুসরণে 'যামিত্র' শব্দের সৃষ্টিতে কালিদাসের বিদ্যমানতা ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রতিপন্ন হয় না। † এ মতের পরি-পোষক চতুর্থ যুক্তি—কালিদাসের কাব্যে রঘুবংশে 'হুন' জাতির উল্লেখ। রাজতরঙ্গিণীর প্রথম অধ্যায়ে কাশ্মীর-রাজ্যে যবন-আক্রমণের একটী বিবরণ বিবৃত আছে। ৫৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দে হুন-রাজ মিহিরকুল কাশ্মীরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, যশোধর্ম্মন্ ও বালাদিত্যের নিকট তিনি পরাজিত হন। রঘুর দিগ্বিজয়-ব্যপদেশে রঘুবংশে কালিদাস সেই ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন। এ হিসাবে তিনি ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে কখনই বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া বুঝা যায় না। কালিদাসকে ষষ্ঠ শতাব্দীর কবি বলিয়া প্রতিপন্ন করার আর এক যুক্তি—তাঁহার রঘুবংশে চন্দ্রগ্রহণের বিষয় উল্লেখ। পৃথিবীর ছায়াপাত যে চন্দ্রগ্রহণের কারণ, জ্যোতির্ব্বিদ আর্য্যভট্টের পূর্ব্বে এ তত্ত্ব ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হয় নাই। আর্য্যভট্ট ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আর্য্যভট্টের মতের অনু-সরণ-হেতু, কালিদাস তাঁহার পরবর্ত্তি কালের ষষ্ঠ শতাব্দীর কবি বলিয়া প্রতিপন্ন হন। ‡ ইহাই হইল—এ পক্ষের পঞ্চম যুক্তি। ইহার পর ষষ্ঠ যুক্তি—দিঙ্নাগাচার্য্যের সহিত কালিদাসের সম্বন্ধ। দিঙ্নাগাচার্য্য কালিদাসের সমসাময়িক ও প্রতিযোগী ছিলেন। তিনি ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক। সুতরাং কালিদাসের বিদ্যমান-কাল ষষ্ঠ শতাব্দী নির্দ্দিষ্ট হয়। এ পক্ষে সপ্তম যুক্তি—ফার্গুসান-আবিষ্কৃত বংশলতা। উজ্জয়িনীর নৃপতিগণের বংশ-লতা উদ্ধারে মিষ্টার ফার্গুসান বিক্রমাদিত্যের সুতরাং কালিদাসের যে কালনির্ণয় করিয়া-ছেন,তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী,তাঁহার মতে,কালিদাসের আবির্ভাব-কাল। ইহার পর, কেহ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে, কেহ চতুর্থ শতাব্দীতে, কেহ তৃতীয়

---

* *Vide* Dr. Bhau Daji's *Literary Remains.*

† *Vide* Max Muller's *India—What can it teach us.*

‡ Journal of the Royal Asiatic Society, (Bombay Branch)--Mr. K. B. Pattak's article.

শতাব্দীতে, কেহ দ্বিতীয় শতাব্দীতে, কেহ বা প্রথম শতাব্দীতে, কালিদাসের কাল নির্দ্ধারণ করেন। * প্রথমোক্ত মতের ভিত্তিহীনতার প্রমাণ-প্রসঙ্গে সংক্ষেপে সকল মতই আলোচিত হইবে। সুতরাং কি কারণে ষষ্ঠ শতাব্দীতে কালিদাসের বিদ্যমানতা অসিদ্ধ হয়, এক্ষণে তাহার আলোচনা করা যাউক। প্রথমতঃ—রাজতরঙ্গিণীর হর্ষ বিক্রমাদিত্য, মাতৃগুপ্ত ও প্রবরসেনের প্রসঙ্গ। এখানে দ্বিবিধ প্রতিবাদের কথা উঠিতে পারে। কালিদাসকে ও মাতৃগুপ্তকে অনেকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন বটে; কিন্তু রাজতরঙ্গিণীর কোথাও মাতৃগুপ্ত ও কালিদাস অভিন্ন বলিয়া উল্লেখ নাই। মাতৃগুপ্তই যে কালিদাস, তৎসম্বন্ধে তাই অনেক সংশয়-প্রশ্ন উঠিতে পারে। পরন্তু কালিদাসের নামে এবং মাতৃগুপ্তের নামে ভিন্ন ভিন্ন শ্লোক প্রচারিত আছে। তাহার কতকগুলি শ্লোক সূক্তিকর্ণামৃত, ঔচিত্যবিচারচর্চ্চা ও সুভাষিতাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে ক্ষেমেন্দ্র উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। ক্ষেমেন্দ্র—কাশ্মীরের একজন প্রধান কবি। তাঁহার রচিত ছত্রিশখানি সংস্কৃত-গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১০৫০ খৃষ্টাব্দে ও ১০৬৪ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে তাঁহার 'সময়মাতৃকা' ও 'দশাবতার' গ্রন্থদ্বয় বিরচিত হইয়াছিল, প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজতরঙ্গিণীতে এই ক্ষেমেন্দ্রের উল্লেখ আছে। রাজতরঙ্গিণী-প্রণেতা কবি কহ্লনের বিদ্যমান-কাল ১০৭০ শকে (১১৪৮ খৃষ্টাব্দে) সপ্রমাণ হয়। সুতরাং কবি ক্ষেমেন্দ্র—কহ্লনের পূর্ব্ববর্ত্তী। কবি ক্ষেমেন্দ্রের গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত-ভাবে কালিদাসকে ও মাতৃগুপ্তকে দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে। সুতরাং মাতৃগুপ্ত ও কালিদাস অভিন্ন ব্যক্তি প্রতিপন্ন হন না। রাঘবভট্ট-কৃত শকুন্তলার টীকায় মাতৃগুপ্তাচার্য্যের শ্লোক উদ্ধৃত আছে। কালিদাস ও মাতৃগুপ্ত এক ব্যক্তি হইলে, তাহা তদ্রূপ উদ্ধৃত হইত না। আরও পুরুষোত্তম-প্রণীত 'ত্রিকাণ্ডশেষ' গ্রন্থে কালিদাসের চারিটী নামের উল্লেখ আছে। কিন্তু তন্মধ্যে মাতৃগুপ্ত-নাম নাই। † মাতৃগুপ্তের যে কোনও গ্রন্থ ছিল, রাজতরঙ্গিণী-প্রণেতা কহ্লন তাহা অস্বীকার করেন। মাতৃগুপ্ত রঘুবংশাদি মহাকাব্যের প্রণেতা হইলে, কহ্লন কখনই ঐরূপ মত প্রকাশ করিতেন না। আমরা বলি, এবংবিধ যুক্তির অবতারণায় কালিদাসকে ও মাতৃগুপ্তকে বিভিন্ন ব্যক্তি প্রমাণের চেষ্টা না পাইয়া, যথাযথভাবে মাতৃগুপ্তের বিদ্যমান-কাল নির্ণয় করিতে পারিলেই সকল সমস্যার সমাধান হয়। এই ভ্রমই বিষম ভ্রম। মাতৃগুপ্তের সময়-নিরূপণের সেই ভ্রম দূরীভূত হইলে, কালিদাস ও মাতৃগুপ্ত এক বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতে পারেন,এবং তাহাতে কালিদাসকে ও মাতৃগুপ্তকে খৃষ্ট-পূর্ব্ব শতাব্দীর বলিয়াই বুঝা যাইতে পারে। আমরা রাজতরঙ্গিণী-কথিত মাতৃগুপ্তের যে সময় নির্দ্দেশ করি, তদনুসারে বিচার করিতে গেলে, সে তত্ত্ব আপনিই নিরূপিত হয়। ‡ দ্বিতীয়তঃ, হর্ষচরিতের

* বুলার প্রথম শতাব্দীতে (Dr. Buhler's *Orient and Occident*), লাসেন দ্বিতীয় শতাব্দীতে (Lassen—*Indische Alterthumskunde*), টি ব্লক, পণ্ডিত রামাবতার শাস্ত্রী ও হরিনাথ দে প্রভৃতি চতুর্থ শতাব্দীতে (পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে ১৪৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য), ম্যাক্‌ডোনেল পঞ্চম শতাব্দীতে (Mac Donnel—*Sanskrit Literature*) প্রভৃতি রূপ কালিদাসের কাল নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

† ডক্টর রামদাস সেনের ঐতিহাসিক রহস্য, প্রথম ভাগ।

‡ পরবর্ত্তী অংশে এতদ্বিষয়ক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

দুইটী শ্লোকে কালিদাসের ও প্রবরসেনের নাম আছে বটে, কিন্তু তাহাতে দুই জনকে সম-সাময়িক কবি বলিয়া উল্লেখ নাই। কাশ্মীরের প্রবরসেনও একজন কবি ছিলেন এবং কালিদাসও একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন,—কবিতা-পংক্তিদ্বয়ে ইহাই মাত্র বুঝিতে পারা যায়। তৃতীয়তঃ, অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার 'যামিত্র' শব্দ লইয়া যে বিতর্ক উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা একান্তই ভিত্তিহীন। অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষ জ্যোতিষ-শাস্ত্রের আলোচনায় প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন। ভারতবর্ষে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের স্ফূর্ত্তির পূর্ব্বে পৃথিবীর কোনও দেশের জ্যোতিষ-শাস্ত্রের আলোচনায় প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় না। * জ্যোতিষ-বিষয়ে গ্রীকগণ বরং ভারতবর্ষের নিকট ঋণী, কিন্তু ভারতবর্ষ কখনই গ্রীসের নিকট ঋণী হইতে পারে না। অতএব, ম্যাক্সমুলারের এ যুক্তির কোনই মূল্য নাই। চতুর্থতঃ, হুন-জাতির উল্লেখ। হুনগণ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে পরাক্রমশালী হইয়াছিলেন, সুতরাং কবি তাঁহাদের আদর্শ চক্ষের সমক্ষে রাখিয়া রঘুবংশ কাব্য প্রণয়ণ করেন,—ইহাও এক হাস্যকর যুক্তি। ভারতের সহিত হুনগণের কত দিনের সম্বন্ধ, তাহা নির্ণয় করা যায় না। আচারভ্রষ্ট যে সকল ক্ষত্রিয় ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হন, হুনগণ তাঁহাদের অন্যতম। মন্বাদি সংহিতায় এবং পুরাণ-পরম্পরায় তাহার উল্লেখ আছে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভে হুনগণের গতিবিধি ছিল—এবম্বিধ প্রমাণের অসদ্ভাব নাই। যে রামায়ণের আদর্শ চরিত্র গ্রহণে কালিদাস রঘুবংশ মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন, সে রামায়ণেও হুন-গণের উল্লেখ আছে। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ-কালে মহাভারতে হুন-জাতির বিষয় দেখিতে পাই। সুতরাং ষষ্ঠ শতাব্দীতে হুনগণকে দেখিয়া মহাকবি কালিদাস আপন কাব্য-মধ্যে হুনগণের বর্ণনা সন্নিবেশ করিয়াছেন, ইহা কোন-ক্রমেই মনে করা যায় না। পৃথিবীর ছায়াপাতে চন্দ্রের কলঙ্ক সম্বন্ধে রঘুবংশের বর্ণনা,—

"অবৈমি চৈনামনঘেতি কিন্তু লোকাপবাদো বলবান্ মতো মে।
ছায়া হি ভূমেঃ শশিনো মলত্বেনারোপিতা শুদ্ধিমতঃ প্রজাভিঃ॥"

এই শ্লোকের দ্বিবিধ অর্থ নিষ্পন্ন করা হইয়া থাকে। কেহ বলেন,—এই শ্লোকে চন্দ্রগ্রহণের উপমা দেওয়া হইয়াছে; কেহ বলেন,—চন্দ্রের উপরিস্থিত কৃষ্ণবর্ণ চিহ্নসকলকে বুঝাইয়া থাকে। আমরা কিন্তু গ্রহণের বিষয়ই বুঝিতে পারি। সীতাদেবীর চরিত্র নির্ম্মল বটে; কিন্তু প্রবল লোকাপবাদে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। এই কথা বলিবার উদ্দেশ্যে কবি উপমা দিয়াছেন.—চন্দ্র শুভ্র নিষ্কলঙ্ক বটে; কিন্তু পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পড়িলে তাহা কলঙ্কযুক্ত হয়। এ উপমায় গ্রহণকালের অবস্থাই মনে পড়ে। গ্রহণকালেই পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পতিত হয়। মল্লিনাথের টীকায় যদিও গ্রহণ শব্দ নাই; কিন্তু ছায়া-পাত-জনিত কলঙ্কের উল্লেখ থাকায় গ্রহণের অবস্থার বিষয়ই বুঝা যায়। মল্লিনাথ লিখিয়াছেন,—"কুতঃ হি যস্মাৎ প্রজাভিঃ ভূমেশ্ছায়া প্রতিবিম্বং শুদ্ধিমতো নির্ম্মলস্য শশিনো মলত্বেন কলঙ্কত্বেন আরোপিতা।" ইহাতে, পৃথিবীর ছায়াজনিত কলঙ্কই বুঝা যাইতেছে; চন্দ্রমণ্ডলস্থিত কাল দাগ কিছুতেই বুঝায় না। এই শ্লোকের আলোচনায়,

---

* পৃথিবীর ইতিহাস, প্রথম, দ্বিতীয়, বিশেষতঃ তৃতীয় খণ্ডে প্রাচীন ভারতে জ্যোতিষ-শাস্ত্র প্রসঙ্গে এ সকল বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

কালিদাসের কাল-নির্ণয়-পক্ষে বাদ-প্রতিবাদে, দুই পক্ষই ভ্রমে পড়িয়াছেন। চন্দ্রগ্রহণ-বিষয়ে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্বে ভারতের অভিজ্ঞতা ছিল না, সুতরাং কালিদাস পঞ্চম শতাব্দীর পরে ষষ্ঠ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ;—এরূপ সিদ্ধান্তে যাঁহারা উপনীত হন, তাঁহাদেরও ভ্রান্তি ; আবার যাঁহারা ঐ শ্লোকের অর্থে চন্দ্রগ্রহণ বুঝাইতেছে না বলিয়া পূর্ব্বোক্ত-মতে প্রতিবাদ-পক্ষে প্রয়াস পান,—তাঁহারাও ভ্রমের হস্ত হইতে মুক্ত নহেন। আমরা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি,—অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ জ্যোতিষ-শাস্ত্রের গবেষণায় অশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল। কালিদাসের গ্রন্থ তো তুলনায় সেদিনের রচনা; বেদ-বেদাঙ্গ মধ্যেও ভারতের জ্যোতিষ-জ্ঞানের পরিচয় দেদীপ্যমান। সুতরাং, কালিদাস ঐ কবিতায় গ্রহণের বর্ণনা করিয়াছিলেন, এবং খৃষ্ট-পূর্ব্ব শতাব্দীতে বিদ্যমান থাকিলেও চন্দ্রগ্রহণের কারণ-পরম্পরা তিনি অবগত ছিলেন, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। আরও, 'জ্যোতির্ব্বিদাভরণ' জ্যোতিষ-গ্রন্থ যিনি প্রণয়ন করেন, তিনি যে গ্রহণাদির বিষয় অবগত ছিলেন না, তাহাই বা কি প্রকারে মনে করিতে পারি? তবে কেহ কেহ বলিতে পারেন,—'জ্যোতির্ব্বিদাভরণ' মহাকবি কালিদাসের রচনা নহে। কিন্তু অনেকেই ঐ গ্রন্থকে কালিদাসের রচনা বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। 'জ্যোতির্ব্বিদাভরণ' যে মহাকবি কালিদাসের রচনা, তাঁহার বিদ্যমানতা, কলির প্রবর্ত্তনা, মহাভারতের কাল-নির্ণয় প্রভৃতির সঙ্গতি-রক্ষায় আমরা পূর্ব্বেই প্রমাণ করিয়াছি।* যাহা হউক, যেদিক দিয়াই দেখা যাউক, রঘুবংশের শ্লোকে চন্দ্রগ্রহণের উপমা লিখিত আছে এবং গ্রহণের উপমা লিখিত থাকিলেও মহাকবি কালিদাসের বিদ্যমানতা খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রতিপন্ন হয় না। চতুর্থতঃ, দিঙ্‌নাগাচার্য্য কালিদাসের সমসাময়িক ও প্রতিযোগী বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও তিনি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর বহু পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। ধর্ম্মকীর্ত্তি নামক জনৈক বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ও কবি, দিঙ্‌নাগাচার্য্য কৃত গ্রন্থের টীকা করিয়াছিলেন। সেই ধর্ম্মকীর্ত্তির রচিত 'বৌদ্ধসঙ্গীতি' নামক গ্রন্থ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনা-ভাষায় অনুবাদিত হয়। দিঙ্‌নাগাচার্য্য কত পূর্ব্বের লোক, এই এক দৃষ্টান্তে বুঝিতে পারা যায়। ফলতঃ, মহাকবি কালিদাস যে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর কবি, তাহা কোন প্রকারেই প্রমাণ হয় না। এখন দেখা যাউক, আমরা যে বলিয়াছি, খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে কালিদাস বিদ্যমান ছিলেন, তাহারই বা কি প্রমাণ আছে? প্রথম,—সংবৎ অব্দ ধরিয়া মহাকবির সময় নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। সংবৎ—বিক্রমাদিত্য-প্রবর্ত্তিত। মহাকবি কালিদাস, বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ ছিলেন। সুতরাং সহজেই তাঁহার কাল-নির্ণয় হয়। বর্ত্তমান ১৩২১ সালে ১৯৭১-৭২ সংবৎ চলিতেছে। খৃষ্টাব্দ ১৯১৪-১৫। সংবৎ ও খৃষ্টাব্দের পার্থক্য (সংবতের সহিত খৃষ্টাব্দের বিয়োগ-সাধনে) সহজেই বুঝা যায়। তাহাতে বিক্রমাদিত্যের ও কালিদাসের বিদ্যমান-কাল ৫৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দেই দাঁড়ায়। আপন বিদ্যমান-কালের ৬০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে সংবৎ গণনার যুক্তি ভিত্তিহীন। সুতরাং বিক্রমাদিত্যের বিদ্যমান-কালেই সংবতের প্রবর্ত্তনা হয়—ইহাই যুক্তিযুক্ত। দ্বিতীয়তঃ, শকগণকে পরাভূত ও বিপর্য্যস্ত করার জন্য এবং সম্মুখ-সমরে

* "পৃথিবীর ইতিহাস" প্রথম খণ্ড, বিংশ পরিচ্ছেদ, মহাভারত-প্রসঙ্গে ২৭৯, ২৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অমিত-পরাক্রম প্রদর্শন-হেতু বিক্রমাদিত্য যথাক্রমে 'শকারি' ও 'সাহসাঙ্ক' নামে পরিচিত ছিলেন। (বিক্রমাদিত্য স্বনামখ্যাতো রাজা। স চ সংবৎকর্ত্তা। তৎপর্য্যায়ঃ সাহসাঙ্কঃ শকারিঃ। ইতি জটাধরঃ।) প্রাচীন আভিধানিক জটাধর, বিক্রমাদিত্যের ঐ দুই নামের বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন। বোম্বাই-প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত নাসিক নগরের সন্নিকটে একখানি শিলাফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ শিলাফলকে বিক্রমাদিত্য পূর্ব্বোক্ত 'সাহসাঙ্ক' ও 'শকারি' নামে পরিচিত আছেন। ঐ শিলাফলক—খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্ব্বে খোদিত হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং বিক্রমাদিত্য ও কালিদাস খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে ছিলেন, ইহাই বুঝা যায়। চতুর্থতঃ, প্রসিদ্ধ বৌদ্ধকবি অশ্বঘোষের ও কালিদাসের রচনার সাদৃশ্য-বিষয়ক গবেষণায় কালিদাসের বিদ্যমান-কাল নির্ণীত হইতে পারে। কালিদাসের অনেক কবিতার ছায়া রূপান্তরে বুদ্ধচরিতে পতিত হইয়াছে। রঘুবংশের ও কুমারসম্ভবের কয়েক চরণ এবং বুদ্ধচরিতের কয়েক চরণ মিলাইয়া দেখুন। রঘুবংশে,—

"ততস্তদালোকনতৎপরাণাং সৌধেষু চামীকরজালবৎসু।
বভূবুরিত্থং পুরসুন্দরীণাং ত্যক্তান্যকার্য্যাণি বিচেষ্টিতানি॥
তাসাং মুখৈরাসবগন্ধগর্ভৈঃ ব্যাপ্তান্তরাঃ সান্দ্রকুতূহলানাম্।
বিলোলনেত্রভ্রমরৈর্গবাক্ষাঃ সহস্রপত্রাভরণা ইবাসন্॥"

স্বয়ম্বর সভায় ইন্দুমতীকে লাভ করিয়া নৃপতি অজ যখন নগর প্রবেশ করিতেছেন, তখন পুরমহিলাগণ সুবর্ণময় গবাক্ষ-পথে দণ্ডায়মান থাকিয়া কি-ভাবে বর-বধূর নগর প্রবেশ দর্শন করিতেছেন, কবিতা কয়েক চরণে তাহারই বর্ণনা আছে। বুদ্ধচরিতে শাক্যসিংহকে দর্শন-সম্বন্ধে পুরমহিলাগণের এইরূপ ভাব দেখিতে পাই। বুদ্ধচরিতের বর্ণনা,—

"তত কুমারঃ খলু গচ্ছতীতি শ্রুত্বাস্ত্রিয়ঃ প্রেষ্যজনাৎ প্রবৃত্তিম্।
দিদৃক্ষয়া হর্ম্ম্যতলানি জগ্মুঃ জনেন মান্যেন কৃতাভ্যনুজ্ঞাঃ॥
বাতায়নেভ্যস্তু বিনিঃসৃতানি পরস্পরোপাসিত কুণ্ডলানি।
স্ত্রীণাং বিরেজুর্ম্মুখপঙ্কজানি সক্তানি হর্ম্ম্যেষ্বিব পঙ্কজানি॥"

উভয়ের বর্ণনার কি সাদৃশ্য—উপলব্ধি করুন। কালিদাসের বর্ণনার শেষার্দ্ধে প্রকাশ,—'অতিমাত্র কুতূহলী নারীগণের আসবসৌরভপূর্ণ চঞ্চল-নেত্র-রূপ ভ্রমর দ্বারা শোভিত বদন-সমূহে সমাকীর্ণ হওয়ায় গবাক্ষ-বিবর-সকল যেন কমল-সমূহে সমলঙ্কৃত বলিয়া বোধ হইল।' বুদ্ধচরিতের বর্ণনায়ও এইভাব প্রকটিত। তাঁহারও কবিতার শেষার্দ্ধে প্রকাশ,—'বাতায়ন-পথবিনিঃসৃত কুণ্ডলপরিশোভিত পুরমহিলাগণের বদনশ্রী হর্ম্ম্যসংসক্ত পঙ্কজসমূহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।' এ ভাব এ সাদৃশ্য দর্শনে, একজন অপরের রচনা দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয় না কি? আর একস্থানে দেখুন। কুমারসম্ভবে আছে,—

"কামস্তু বাণাবসরং প্রতীক্ষ্য পতঙ্গবদ্বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ।
উমাসমক্ষং হরবদ্ধলক্ষ্যঃ শরাসনজ্যাং মুহুরামমর্শ॥"

মহাদেব যোগমগ্ন। বহ্নিপ্রবেশেচ্ছু পতঙ্গবৎ মদন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বাণপ্রয়োগ করিতেছেন। প্রোক্ত কবিতা তাহারই বর্ণনা। দেখুন, বুদ্ধচরিতে—ঠিক এই ভাব কি না!

ভবসাগর-পারোদ্দেশ্যে, বুদ্ধত্বলাভের আকাঙ্ক্ষায় ভগবান শাক্যমুনি যোগাসনে সমাসীন। কন্দর্প তাঁহার যোগভঙ্গোদ্দেশ্যে শরাসনে শর-সন্নিবেশ করিতেছেন। যথা, বুদ্ধচরিতে,—

"অথ প্রশান্তং মুনিমাননস্থং পারং তিতীর্ষুং ভবসাগরস্থ।
বিষজ্য সব্যং করমায়ুধাগ্রে ক্রীড়ন্ শরেণেদমুবাচ মারঃ॥"

কেহ কেহ হয় তো বলিতে পারেন, কালিদাস অশ্বঘোষের অনুসরণ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু উভয় কবির কাব্য-গ্রন্থ আলোচনায় তাহা কখনই প্রতিপন্ন হয় না। কালিদাস অশ্বঘোষের অনুকরণ করিবেন, ইহা একান্তই অসম্ভব। বুদ্ধচরিতের একটী উক্তিতে অশ্বঘোষ 'কুমারসম্ভব' কাব্য দেখিয়াছিলেন বলিযা বুঝা যাইতে পারে। বুদ্ধচরিতে আছে,—

"শৈলেন্দ্রপুত্রীং প্রতি যেন বিদ্ধো দেবোঽপি শম্ভুশ্চলিতো বভূব।
ন চিন্তয়ত্যেষ তমেব বাণম্ কিংস্যাদচিত্তো ন শরঃ স এষঃ॥"

বুদ্ধদেবের মাহাত্ম্য-খ্যাপনোদ্দেশ্যে এই কবিতায় বলা হইয়াছে,—'কন্দর্পশরে বিদ্ধ হইয়া দেবদেব মহাদেবের যোগভঙ্গ হইয়াছিল; কিন্তু বুদ্ধদেব তাহাতে আদৌ বিচলিত হন নাই।' এই বলিযা কবি বিস্ময়সহকারে যোগিবর শাক্যসিংহের চৈতন্যে এবং কন্দর্প-শরের সামর্থ্যে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এ বর্ণনা—কুমারসম্ভবের বর্ণনার পর লিখিত হইয়াছিল বলিয়া স্বতঃই প্রতিপন্ন হয় না কি? এইরূপে অশ্বঘোষ কালিদাসের অব্যবহিত পরবর্ত্তী বলিয়াই প্রতিপন্ন হন। অশ্বঘোষ যে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রাজা কনিষ্কের সময় বিদ্যমান ছিলেন, সে আলোচনা অনেক স্থানেই দেখিতে পাই। সুতরাং মহাকবি কালিদাস যে খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর কবি, এতৎপ্রসঙ্গে তাহা প্রতিপন্ন হয়। এ বিষয়ে বোধ হয় আর অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যেমন মহাকবি কালিদাসের বিদ্যমান-কাল সম্বন্ধে, তেমনই তাঁহার জন্মস্থান-সম্বন্ধে ও বর্ণ-ধর্ম্ম বিষয়ে বিতণ্ডা দেখিতে পাই। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অধিবাসিগণ এখন আপন আপন দেশের সহিত মহাকবির সম্বন্ধ সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এইরূপে, ভারতের অন্ততঃ দশ প্রদেশে কালিদাসের জন্মস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। প্রথম, মধ্যভারতের

কালিদাসের জন্মস্থান।

প্রাচীন উজ্জয়িনী নগরী তাঁহার জন্মস্থান বলিয়া কথিত হয়। এ মত সর্ব্বজন-পরিজ্ঞাত। উজ্জয়িনী এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে মহাকবির স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ অনেক নিদর্শন আজিও অনেকে দেখাইয়া থাকেন। উজ্জয়িনীর প্রাচীন বিভবের বিষয় পূর্ব্বেই (পৃথিবীর ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ডে) বিবৃত হইয়াছে। সেখানে, 'মহাকাল' নামক শিবলিঙ্গ আছেন; চামুণ্ডা দেবী বিরাজমান। বিক্রমাদিত্য যে বীণাপাণির মন্দিরে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, সে মন্দির পরিচিহ্নিত। মহাকবির সাধনার স্থান তাই উজ্জয়িনীতে নির্দ্দিষ্ট হয়। মেঘদূতের বর্ণনার কোনও কোনও অংশ উজ্জয়িনীর বর্ণনা বলিয়া বুঝা যায়। উজ্জয়িনীর 'কালীয়দী' নামক দীর্ঘিকার মধ্যস্থলে এক প্রাচীন প্রাসাদ আছে। ঐ প্রাসাদ কোন্ সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে যদিও মতান্তর দৃষ্ট হয়; কিন্তু কালিদাসের ঋতুসংহার কাব্যের নিম্নলিখিত শ্লোক-পংক্তি ঐ

Budhacharita—Prof. Cowell's Edition (Introduction.)

প্রাসাদকে লক্ষ্য করিয়া রচিত হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। শ্লোক পংক্তি,—"নিশাঃ শশাঙ্ক ক্ষতনীলরাজয়ঃ ক্বচিদ্বিচিত্রং জলযন্ত্রমন্দিরম্।" হ্রদমধ্যস্থ প্রাসাদ বিক্রমাদিত্যের গ্রীষ্মাবাস ছিল এবং কালিদাস উহাকে 'জলযন্ত্রমন্দির' বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই প্রসাদে কালীয়দমনের চিত্র কি সুন্দর প্রকটিত! প্রাসাদগাত্রে কালীয়নাগের মস্তকোপরি শ্রীকৃষ্ণ দণ্ডায়মান, আর তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া গোপিনীগণ বন্দনা করিতেছেন। কালিদাসের ও বিক্রমাদিত্যের সহিত সংস্রবযুক্ত এবম্বিধ বহু স্থান উজ্জয়িনী-সন্নিকটে চিহ্নিত হইয়া থাকে। বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ সিংহাসন, তৎপ্রবর্ত্তিত মানযন্ত্র, ভর্ত্তৃহরি-গুহা প্রভৃতি স্থান আজিও লোকে দেখাইয়া থাকে। উজ্জয়িনী এখন সিন্ধিয়ার রাজ্যের অন্তর্গত। দ্বিতীয় মত,—মহাকবির জন্মস্থান 'ধার' বা 'ধারা' নগর। এই নগর উজ্জয়িনী হইতে পঁয়ষট্টি মাইল দক্ষিণে এবং ইন্দোর হইতে ছত্রিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এই নগর এক্ষণে বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত। এই নগরে ভোজরাজ অভিধেয় বিক্রমাদিত্য বাস করিতেন। কালিদাস তাঁহার সভাসদ্ ছিলেন। কাহারও মতে ভোজরাজ ৮৭৫ খৃষ্টাব্দে, কাহারও মতে ২২২ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। কোনও কোনও মতে, কান্যকুব্জে এবং ধারা-নগরে উভয়ত্র এই ভোজরাজের রাজধানী ছিল। * ধারা-নগরের ভোজরাজের ও কালিদাসের সম্বন্ধ বিষয়ে একটী কৌতূহলপ্রদ গল্প প্রচলিত আছে। সেই গল্পটীতে ধারা-নগরীর সহিত কালিদাসের সম্বন্ধের বিষয় বুঝা যায়। গল্পটী এই,—এক সময়ে ভোজরাজের সহিত কালিদাসের মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। কালিদাস তাহাতে ভোজরাজকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। † তখন,কালিদাসের অভাবে রাজসভা শ্রীহীন হইল মনে করিয়া তাঁহাকে পুনরানয়ন জন্য ভোজরাজ এক কৌশল অবলম্বন করেন। সে কৌশল,—আপন মৃত্যু সংবাদ প্রচার করিয়া রাজা ছদ্মবেশে নগর-ভ্রমণে বহির্গত হন। ক্রমে ভোজরাজের মৃত্যুসংবাদ কালিদাসের কর্ণে উপস্থিত হয়। তখন, রাজ্যের অবস্থা কি হইল—জানিবার জন্য, কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কালিদাস ধারা-নগরে পুনরাগমন করেন। রাজ্যমধ্যে কালিদাসের আগমন-সংবাদ প্রচারিত হয়। ছদ্মবেশী ভোজ-রাজ তাঁহার অনুসরণ করেন। রাজহীন রাজ্য স্বতঃই শোভাভ্রষ্ট হয়। তদ্দর্শনে ক্ষুব্ধ হইয়া কালিদাস কবিতায় শোক প্রকাশ করেন,—"অদ্যধারা নিরাধারা নিরালম্বা সরস্বতী। পণ্ডিতা খণ্ডিতা সর্ব্বে ভোজরাজ দিবং গতে॥" ভোজরাজের বিয়োগে কালিদাসের শোকার্ত্ত ভাব বুঝিতে পারিয়া, ছদ্মবেশী ভোজরাজ আত্মপরিচয় প্রকাশ করেন এবং আপন মৃত্যুসংবাদ প্রচারের কারণ বিবৃত করেন। তখন, কালিদাসের হৃদয় আনন্দোচ্ছ্বাসপূর্ণ হয়। তিনি আনন্দ গদগদ কণ্ঠে কবিতা-ছন্দে প্রকাশ করেন,—"অদ্যধারা সদাধারা সদালম্বা সরস্বতী। পণ্ডিতা মণ্ডিতা সর্ব্বে ভোজরাজে ভুবং গতে॥" উভয়ের পুনর্মিলন হয়। কালিদাস ভোজরাজের প্রাড়্বিবাক পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন। এই প্রবাদে ধারা-নগরের সহিত

* কানিংহাম এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

† কেহ কেহ বলেন, উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিত্য এবং ধারা-নগরে ভোজরাজ একই সময়ে রাজত্ব করিতেন। এই বিবাদসূত্রে ভোজরাজের সভা পরিত্যাগ করিয়া কালিদাস বিক্রমাদিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

কালিদাসের সম্বন্ধের বিষয় পরিকীর্ত্তিত হয়। অপিচ, ধারা-নগরের দেড় মাইল পশ্চিমে একটী কালীস্থান আছে। ঐ কালীস্থানে কালীর আরাধনা করিয়া কালিদাস মন্ত্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন,—ধার-নগরে এইরূপ কিম্বদন্তি আছে। এবম্বিধ নানা কারণ প্রদর্শনে ধার-নগর বা তৎসন্নিহিত স্থান কালিদাসের জন্মভূমি বলিয়া কথিত হয়। তৃতীয় মত—কালিদাস দাক্ষিণাত্যবাসী। * তাঁহার গ্রন্থে আর্য্যাবর্ত্ত অপেক্ষা দাক্ষিণাত্যের বর্ণনা প্রচুর দৃষ্ট হয়। চতুর্থ মতে—তিনি সিংহল-দ্বীপের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া প্রতিপন্ন হন। সিংহলের অধিপতি কুমারদাস, মহাকবিকে সিংহলে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। কুমারদাস নিজে কবি এবং কবিত্বের উৎসাহদাতা বলিয়া পরিচিত। তিনি 'জানকীহরণ' নামে সংস্কৃত কাব্য প্রণয়ন করেন। কুমারদাসের আশ্রয়ে কালিদাস বহুদিন সিংহলে বাস করিয়াছিলেন। সিংহলেই মহাকবির মৃত্যু হয়। "কালিন্দী-নদী ও সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পুষ্পিত লতাবেষ্টিত নারিকেল-কুঞ্জের মধ্যে" মহাকবির শ্মশান-ক্ষেত্র আজিও চিহ্নিত হইয়া থাকে। † এই হিসাবে বিক্রমাদিত্যের সভায় মহাকবির বিদ্যমানতা অপ্রতিপন্ন হয় এবং কুমারদাস বিক্রমাদিত্যের স্থান অধিকার করেন। মহাকবির জন্মস্থান সম্বন্ধে চতুর্থ মত—মহাকবি মিথিলার অধিবাসী ছিলেন। মিথিলার দুইটী স্থানে কবির জন্মভূমি নির্দ্দিষ্ট নয়। দ্বারভাঙ্গা-জেলায় মধুবনী-মহকুমায় বেণীপট্টি থানার এলাকায় 'দুর্গাস্থান' নামে একটী গ্রাম আছে। ঐ গ্রামে অতি প্রাচীন কালের এক দুর্গামন্দির দৃষ্ট হয়। প্রচার এই—দুর্গাস্থান-গ্রামই মহাকবির জন্মস্থান ; দুর্গাস্থানের দুর্গামন্দিরে উপাসনা করিয়া দুর্গার বরপ্রসাদে কবির কবিত্বের বিকাশ হইয়াছিল। অন্য মতে—বাগ্মতী নদীতীরস্থ 'উচৈচট' গ্রাম মহাকবির জন্মস্থান। উচ্চপীঠ অধুনা উচৈচট নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উচ্চপীঠে দেবীমন্দিরে কালিদাস সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ‡ মিথিলায় মহাকবির বাসস্থান-বিষয়ে অনেক দিন হইতেই এইরূপ গবেষণা চলিয়াছে। পঞ্চম মত—এই বঙ্গদেশ মহাকবি কালিদাসের জন্মভূমি। এ মতের আলোচনাও অনেক দিন হইতে চলিয়াছে। বাঙ্গালার মধ্যে বিভিন্ন স্থানে মহাকবির সম্বন্ধসূত্র অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায়। রংপুর-জেলায় মহাকবির জন্মস্থান ছিল বলিয়া অনেক দিন হইতে একটা কিম্বদন্তী চলিয়া আসিতেছে। ¶ বীরভূম-জেলায় বেলুঠ-গ্রামের নিকট একটী প্রাচীন পুষ্করিণীর অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। পুষ্করিণীর উত্তর-পূর্ব্ব দুই দিক উচ্চপাহাড়বেষ্টিত। কতকগুলি বৃক্ষে সেই পর্ব্বত-গাত্র নিকুঞ্জ-কাননে পরিণত করিয়া রাখিয়াছে। দেবদেবীর প্রাচীন-মূর্ত্তি এবং ভগ্নমন্দির প্রভৃতির প্রস্তরাদিতে স্থানটী সমাকীর্ণ। কালিদাসের সাধনা-ক্ষেত্র বলিয়া ঐ স্থান পরিচিত। কালিদাসের ন্যায় কবি হইবার

* Vide, *Indian Antiquary*, 1878.

† পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় সিংহল পরিভ্রমণে গিয়া এই বিষয় অবগত হইয়া আসিয়াছেন।

‡ "সাহিত্য-সংবাদ" তৃতীয় বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা এবং "অনুসন্ধান", সপ্তম খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

§ Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1879. Part I, P. 33.

¶ Martin's *Eastern India*, Vol. III, P. 543.

আশায়, বহু বিদ্যার্থী অধুনা ঐ স্থানে গতিবিধি করেন। পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া প্রস্তর-গাত্রে সিন্দুর-লেপন প্রভৃতির দ্বারা কবিত্বের স্ফূর্ত্তি হয়—ইহাই সাধারণের বিশ্বাস। এই প্রাচীন পীঠস্থানের সহিত মহাকবির সম্বন্ধ-তত্ত্ব নির্ণয় করিতে গেলে, বীরভূম-জেলা কবির জন্মস্থান বলিয়া সিদ্ধান্ত হইতে পারে। কবি চণ্ডীদাসের পাট নান্নুর ইহার অতি নিকটেই অবস্থিত। জয়দেবের কেন্দুবিল্ব—সেও এখান হইতে অধিক দূর নহে। কবিত্ব-স্ফূর্ত্তির এই স্বভাবসঙ্গত প্রদেশে মহাকবির জন্ম হওয়াই সম্ভব বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। অপর মত—বঙ্গদেশান্তর্গত নবদ্বীপ-সন্নিকটে মহাকবির লীলাস্থান ছিল। এ মতে,—নবদ্বীপের উত্তর-পশ্চিমে ক্রোশাধিক ব্যবধানে ব্রহ্মাণীতলা নামে যে পীঠস্থান দৃষ্ট হয়, উহাই মহাকবির সিদ্ধিস্থান। প্রাচীন কালে এক সময়ে বঙ্গদেশের ঐ অংশ বিদ্যালোচনার জন্ম প্রসিদ্ধ ছিল। যে নব-দ্বীপ লইয়া নবদ্বীপের সংগঠন, ঐ পীঠস্থান তাহার অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তাহাতে ঐ স্থান বিদ্যামন্দির চতুষ্পাঠী প্রভৃতির জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করে। বাগ্দেবী বীণাপাণি ঐ পীঠস্থানে ব্রহ্মাণী নামে অভিহিত। গঙ্গাতীরে অবস্থিত নব-দ্বীপের অন্তর্ভুক্ত জ্ঞানচর্চ্চার কেন্দ্রস্থান-মধ্যে পরিগণিত ঐ স্থানই কালিদাসের ন্যায় মহাকবির কবিত্ব-স্ফূর্ত্তির প্রকৃষ্ট স্থান। এতৎপ্রসঙ্গে, কালিদাস এই নাম— বাঙ্গালীর নাম, কালিদাসের রচনায়—বাঙ্গালা ভাব ও বাঙ্গালা ভাষা, তাঁহার বর্ণনায়— বাঙ্গালীর চরিত্র-চিত্র ইত্যাদি নানা প্রমাণেরই অবতারণা হইয়া থাকে; এবং সমুদ্রগুপ্ত-অভিধেয় দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের রাজধানীতে সমুদ্রগড়ে' খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে তাঁহার বিদ্যমানতার বিষয় কথিত হয়। * মহাকবির লীলাক্ষেত্র সম্বন্ধে এইরূপ আরও নানা মত আছে। কিন্তু তৎসমুদায় উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। এক্ষণে সর্ব্ববিধ মতের আলোচনা করিয়া আমরা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি, দেখা যাউক। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নৃপতি বিক্রমাদিত্য নামে পরিচিত হইয়াছিলেন; ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রাজসভায় নবরত্নের সমাবেশ ঘটিয়াছিল; এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কালিদাস-নামধেয় ভিন্ন ভিন্ন কবির আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহাদের একের সহিত অন্যের সম্বন্ধসূত্র স্থাপন করিতে গিয়া তাঁহাদের স্বরূপতত্ত্ব নির্ণয়ে এখন গণ্ডগোল ঘটিতেছে; আর তাহাতেই মহাকবি কালিদাসের আদিতত্ত্ব সন্ধান করিয়া পাওয়া দুর্ঘট হইয়া পড়িয়াছে। তবে খৃষ্ট-জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তি-কালে যে তাঁহার যশঃজ্যোতি বিস্তৃত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে আমরা আদৌ সংশয়ান্বিত নহে। পরন্তু, তাঁহার জন্মভূমি যে এই বঙ্গদেশ এবং এই বঙ্গদেশেই যে তাঁহার কবিত্ব-স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল, নানা-কারণে সে ধারণাও আমাদের মনে বলবৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উজ্জয়িনীতে তাঁহার জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত হইয়াছিল, অথবা তিনি সিংহলে গিয়া তনুত্যাগ করিয়াছিলেন,—এবম্বিধ প্রবাদের সার্থকতা থাকিতে পারে; তথাপি, তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া মনে হয়। হইতে পারে, তাঁহার কবিযশঃ তাঁহাকে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জনপদের বিভিন্ন রাজন্যের বরণীয় করিয়া তুলিয়াছিল; হইতে পারে, বঙ্গমাতার অতুজ্জ্বল সন্তানরত্ন অন্য প্রদেশকেও ঔজ্জ্বল্য-সম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন; হইতে পারে, বাঙ্গালার কালিদাস-রত্ন

* সাহিত্য-সংবাদে, তৃতীয় বর্ষে, এতদ্বিষয়ে নানারূপ আলোচনা হইয়াছে।

উজ্জয়িনীতে গিয়া নবরত্নের মধ্য-মণি-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু তাহা হইলেও তিনি বঙ্গমাতার প্রিয়-সন্তান। প্রথম, তাঁহার কালিদাস নামই তাঁহার বাঙ্গালীত্বের পরিচায়ক। নবরত্নের অপর রত্ন কয়টীর সংজ্ঞা দেখুন ; আর, মহাকবি কালিদাসের সংজ্ঞা দেখুন ! তাহাতে রাজা বিক্রমাদিত্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ঐ রত্নগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন—বেশ উপলব্ধি হয়। নবরত্নের নাম—ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট,ঘটকর্পর,বরাহমিহির,বররুচি ও কালিদাস। এই নয় জনের মধ্যে এক কালিদাস ভিন্ন অন্য নাম বাঙ্গালীর মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় না। আবার, বাঙ্গালী ভিন্ন অন্যের মধ্যে কালিদাস নামও দুর্লভ। আরও, উজ্জয়িনী-প্রদেশে প্রচলিত সাধারণ নামের সহিত ঐ সকল নামের সকলগুলির সাদৃশ্য নাই। সুতরাং বেশ বুঝা যায়, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী পণ্ডিতগণকে লইয়া, বিক্রমাদিত্য আপনার নবরত্ন সভা গঠিত করিয়াছিলেন। 'জ্যোতির্ব্বিদাভরণ' জ্যোতিষ-গ্রন্থের কতিপয় শ্লোকে ঐ গ্রন্থ রচনা-সম্পর্কে একটু পরিচয় আছে। কবি বলিয়াছেন, তিনি প্রথমে রঘুবংশ প্রভৃতি কাব্যত্রয় রচনা করিয়াছিলেন ; তার পর, 'শ্রুতিকর্ম্মবাদ' গ্রন্থ রচনা করেন। পরিশেষে, উজ্জয়িনী রাজধানীতে অবস্থান-কালে, ৩০৬৭ কলি গতাব্দে * তিনি 'জ্যোতির্ব্বিদাভরণ' গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। তাঁহার ঐ উক্তিতে বেশ বুঝা যায়, রঘুবংশাদি কাব্য অন্যত্র অবস্থান-কালে রচনা করিয়াছিলেন, এবং তাহাতে তাঁহার যশঃ বিস্তৃত হইলে তিনি রাজদরবারে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সে অন্যত্র—আমরা বঙ্গদেশ বলিয়াই মনে করি। কোনও কোনও পণ্ডিতের মত যে, কালিদাস-নাম উজ্জয়িনীর প্রদত্ত ; কারণ, উজ্জয়িনীতেই কালীপূজার প্রবর্ত্তনা হয়। কিন্তু এ উক্তি নিতান্তই যুক্তিবিগর্হিত। তন্ত্র-শাস্ত্র বঙ্গদেশের নিজস্ব। তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতি বঙ্গদেশ হইতেই অন্যত্র বিস্তৃত হইয়াছে। তন্ত্রোক্ত বীজমন্ত্র বঙ্গীয় বর্ণমালায় অভিব্যক্ত। সুতরাং কালীপূজার প্রবর্ত্তনার স্থান যে উজ্জয়িনী—এ উক্তি একান্তই যুক্তিহীন। আমরা বলি, কালিদাস নামে এবং রঘুবংশাদি কাব্য অন্যত্র অবস্থান-কালে রচনার প্রমাণে, তাঁহার বাঙ্গালীত্ব প্রতিপাদনে সহায়তা করে। দ্বিতীয়তঃ, কালিদাসের অনেক রচনা অনুস্বার-বিসর্গ-বিভক্তি-সংযুক্ত বাঙ্গালা রচনা বলিয়া প্রতীত হয়। রঘুবংশের প্রথম শ্লোক-চতুষ্টয়ের বিষয় প্রথমে অনুধাবন করুন। যথা,—

"বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে। জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ ॥
ক্ব সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়া মতিঃ। তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্ ॥
মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্। প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ ॥
অথবা কৃতবাগ্দ্বারে বংশেঽস্মিন্পূর্ব্বসূরিভিঃ। মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ ॥"

'শব্দ ও অর্থের সম্যক জ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত, বাক্য ও অর্থে যেরূপ নিত্য-সম্বন্ধ,—সেইরূপভাবে যাঁহারা সম্মিলিত, সেই জগতের পিতৃ-মাতৃ-স্বরূপ দেবী পার্ব্বতীকে ও মহেশ্বরকে প্রণাম করিতেছি। কোথায় সেই সূর্য্যপ্রভব বংশ, আর কোথায় বা আমার স্বল্প-বিষয়-গ্রাহিণী প্রজ্ঞা! (সামান্য জ্ঞান লইয়া সুমহান্ সূর্য্যবংশের বর্ণনা করিতে গিয়া) মোহমুগ্ধ আমি ভেলার সাহায্যে সুদুস্তর মহাসাগর পার হইতে উৎসুক হইয়াছি।

আমি মূর্খ হইয়াও কবিদিগের যশোলাভ করিবার চেষ্টা করিতেছি। প্রাংশুলভ্য (উন্নত-জনের লভ্য) ফল প্রাপ্ত হইবার লোভে ঊর্দ্ধবাহু বামনের ন্যায় আমি উপহাসাস্পদ হইতে চলিয়াছি। অথবা (আশঙ্কাই বা করি কেন) মণি বজ্রবিদ্ধ হইলে, সূত্র যেরূপ তাহার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ যখন পূর্ব্ব পূর্ব্ব কবিগণ এই সূর্য্যবংশের বর্ণনার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, তখন আমিই বা ইহার বর্ণনা করিতে কেন না সমর্থ হইব ?' এই অংশে একাধারে মহাকবির কবিত্ব ও উপমার মনোহারিত্ব দৃষ্ট হয় ; আবার, এই অংশে তাঁহার বাঙ্গালিত্বের ভাবও বুঝিতে পারা যায়। শ্লোক কয়েক-পংক্তির সন্ধি ভাঙ্গিয়া শব্দ-পরিচয় লউন ; প্রতি শব্দই বঙ্গদেশ-প্রচলিত শব্দ। মধ্যে কেমন একটী প্রাদেশিক শব্দ—'উড়ুপ'—রহিয়া গিয়াছে ; সে শব্দ বাঙ্গালার নিজস্ব শব্দ। বাঙ্গালী কবির সংস্কৃত-কাব্যে বাঙ্গালার প্রাদেশিক শব্দ স্থান না পাইয়াই থাকিতে পারে না। আরও দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। দেখুন, যেমন উপমা মাধুর্য্য, তেমনই সরল বাঙ্গালাভাব।

"আকারসদৃশপ্রজ্ঞঃ প্রজ্ঞয়া সদৃশাগমঃ। আগমৈঃ সদৃশারম্ভ আরম্ভসদৃশোদয়ঃ॥
জ্ঞানে মৌনং ক্ষমা শক্তৌ ত্যাগে শ্লাঘাবিপর্য্যয়ঃ। গুণা গুণানুবন্ধিত্বাত্তস্য সপ্রসবা ইব॥"

'তাঁহার যেরূপ আকার ছিল, তদনুরূপ ধীশক্তি ছিল ; ধীশক্তিসদৃশ শাস্ত্রাভ্যাস ছিল ; শাস্ত্রাভ্যাসতুল্য কার্য্যারম্ভ ছিল ; এবং কার্য্যারম্ভসদৃশ ফল লাভ হইত। তিনি জ্ঞানী, অথচ মৌনী ছিলেন ; শক্তিশালী, অথচ ক্ষমাপর ছিলেন ; তিনি দানশীল, অথচ আত্মশ্লাঘা-বিবর্জ্জিত। এইরূপ বিরোধী গুণসমূহ অবিরোধে অবস্থান করিয়া পরস্পর সহোদরের ন্যায় তাঁহাতে শোভা পাইয়াছিল।' এখানেও বিভক্তিপরিশূন্য সকল শব্দই বঙ্গদেশ প্রচলিত শব্দ। মহাকবির অন্যান্য গ্রন্থে এ ভাব অধিকতর পরিস্ফুট দেখিতে পাই। মেঘদূত, ঋতু-সংহার ও কুমারসম্ভব প্রভৃতি কাব্য কবির প্রথম রচনা বলিয়া প্রতীত হয়। ঐ তিন কাব্যে বাঙ্গালা ভাব ও বাঙ্গালা ভাষা অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়। যথা, মেঘদুতে—

"তন্বীশ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠি, মধ্যক্ষামা চকিত-হরিণী-প্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।
শ্রোণীভারাদলস-গমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং, যা তত্র স্যাদ্ যুবর্তিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ॥"

ঋতুসংহারের প্রথম শ্লোক,—

"প্রচণ্ডসূর্য্যঃ স্পৃহনীয়চন্দ্রমাঃ সদাবগাহক্ষতবারিসঞ্চয়ঃ।
দিনান্তরম্যোঽভ্যুপশান্তমন্মথো নিদাঘকালোঽয়মুপাগতঃ প্রিয়েঃ॥"

কুমারসম্ভবের প্রথম শ্লোক,—

"অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ॥

কালিদাসের সংস্কতের সহিত বাঙ্গালা ভাষার এইরূপ সাদৃশ্য তো আছেই ; অধিকন্তু, তাঁহার গ্রন্থোল্লিখিত কতকগুলি সামগ্রী বাঙ্গালার নিজস্ব বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। যদিও কাব্যে কবি অপর দেশের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তথাপি বাঙ্গালার ছায়া অনেক স্থলে পতিত হইয়াছে। নবদ্বীপ ও তৎসন্নিহিত স্থান আবহমান কাল হইতে বিদ্যাপীঠ বলিয়া পরিচিত। বিদ্যাচর্চ্চার কেন্দ্রস্থানেই কালিদাসের ন্যায় মহাকবির উদ্ভব হয়। মহাকবির

এবং তাঁহার সমসাময়িক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের নাম-সংযুক্ত কতকগুলি গ্রামের অস্তিত্ব ঐ অংশে সন্ধান করিয়া পাওয়া যায়; তজ্জন্য, কেহ কেহ ঐ অঞ্চলেই কালিদাসের বাস ছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মেঘদূতের একটী শ্লোকে, 'দিঙ্‌নাগ' ও 'নিচুল' শব্দদ্বয় দৃষ্ট হয়। যে শ্লোকে ঐ শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হইয়াছে, তথায় ঐ শব্দদ্বয়ের দ্বিবিধ অর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে। এক অর্থে—'নিচুল' শব্দে বেতস্ বন (বেত বন) এবং 'দিঙ্‌নাগ' শব্দে দিগ্‌গজ অর্থ নিষ্পন্ন হয়। অন্য অর্থে—দিঙ্‌নাগ ও নিচুল শব্দে যথাক্রমে দুই জন দার্শনিক ও কবিকে বুঝাইয়া থাকে। সে অর্থে—দিঙ্‌নাগ মহাকবির প্রতিপক্ষ বৌদ্ধ-দার্শনিক দিঙ্‌নাগাচার্য্য বলিয়া প্রতিপন্ন হন। 'ন্যায়ভাষ্য', 'প্রমাণ-সমুচ্চয়' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়া তিনি প্রসিদ্ধ। নিচুল, মহাকবির সহাধ্যায়ী ছিলেন। তিনি নানার্থশব্দরত্নের টীকা প্রণয়ন করেন। কবিত্বের জন্য তিনি কবিযোগীন্দ্র আখ্যায় অভিহিত হইয়াছিলেন। মেঘদূতের যে শ্লোকে নিচুলের ও দিঙ্‌নাগের উল্লেখ আছে, সেই শ্লোকটী এই,—

"অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি পবনঃ কিং স্বিদিত্যুন্মুখীভির্দৃষ্টোৎসাহশ্চকিতচকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ।
স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলাদুৎপতোদঙ্মুখঃ খং দিঙ্‌নাগানাং পথি পরিহরণস্থূলহস্তাবলেপান্॥"

সাধারণতঃ শ্লোকটীর অর্থ নিষ্পন্ন হয়—কবি মেঘকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—'তুমি যখন সরস স্থূলবেতসপরিশোভিত এই আশ্রমপদ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া গমন করিবে, তখন পথিমধ্যে আর তোমাকে দিগ্‌গজগণের শুণ্ডবিক্ষেপ সহ্য করিতে হইবে না। তোমার প্রয়াণ-কালে মুগ্ধা সিদ্ধাঙ্গনারা ঊর্দ্ধমুখী হইয়া সচকিত-নয়নে সবিস্ময়-হৃদয়ে তোমার উৎসাহ ও অধ্যবসায় পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকিবে, এবং তাহারা মনে মনে চিন্তা করিবে যে—পবনদেব কি চিত্রকূট গিরিশৃঙ্গদেশ উন্মূলন-পূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন!' ইহাই সাধারণ অর্থ। কিন্তু মল্লিনাথের টীকায় প্রকাশ,—কবি এখানে প্রসঙ্গতঃ আপন প্রতিযোগী দিঙ্‌নাগাচার্য্যের প্রতিযোগিতার আভাস উপমায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কোনও কোনও প্রত্নতত্ত্ববিৎ, দিঙ্‌নাগাচার্য্যকে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর বৌদ্ধ দার্শনিক বলিয়া প্রতিপন্ন করার চেষ্টা পাইয়াছেন। মহাকবি কালিদাস যে ষষ্ঠ শতাব্দীর কবি. তাঁহাদের প্রমাণ-পরম্পরার মধ্যে দিঙ্‌নাগাচার্য্যের সহিত তাঁহার এই সম্বন্ধও একটী প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু একটু বিশেষ অনুসন্ধান করিলে, দিঙ্‌নাগাচার্য্যের সহিত কবির সম্বন্ধ-সূত্রেও কবি খৃষ্ট-পূর্ব্ব শতাব্দীর বলিয়াই প্রতিপন্ন হন। কারণ, দিঙ্‌নাগাচার্য্যকৃত গ্রন্থসমূহের টীকাকার ধর্ম্মকীর্ত্তি চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন, প্রমাণ পাওয়া যায়। ধর্ম্মকীর্ত্তির রচিত 'বৌদ্ধসঙ্গীতি' গ্রন্থ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে চীনা-ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। ইহাতে উঁহারও কত পূর্ব্বে দিঙ্‌নাগাচার্য্য বিদ্যমান ছিলেন, সহজেই বুঝা যায়। দিঙ্‌নাগাচার্য্যের এবং কালিদাসের নাম-সংযুক্ত পল্লী একই স্থানে বিদ্যমান থাকিয়া দুই সমসাময়িক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির প্রতিযোগিতার বিষয় খ্যাপন করিতেছে। আবার, উজ্জয়িনী প্রভৃতি প্রদেশে বিক্রমাদিত্যের স্মৃতিজ্ঞাপক যেরূপ স্থানাদি চিহ্নিত হয়, বঙ্গদেশে নবদ্বীপ-সান্নিধ্যে সেইরূপ স্থানের অসদ্ভাব নাই। গঙ্গার পশ্চিমকূলে পূর্ব্বস্থলীর অনতিদূরে 'রাক্ষসীপোতা' নামক একটি স্থান পরিদৃষ্ট হয়। উহা বিক্রমাদিত্যের

সিদ্ধিস্থান বলিয়া প্রবাদ আছে। কালিদাসের সিদ্ধিস্থান বলিয়া কথিত ব্রহ্মাণীতলা হইতে ঐ স্থান অধিক দূরে নহে। সেখানে প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষসমূহও পরিলক্ষিত হয়। এবম্বিধ নানা কারণে আমরা বলিতে পারি, রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্য বিভিন্ন স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিতি করিতেন। বিশাল ভারতসাম্রাজ্যে আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, একস্থানে রাজধানী রাখিলে, সুশাসন সুপালন সুসম্পন্ন হয় না। সুতরাং বঙ্গদেশে, উজ্জয়িনীতে, কনোজে এবং অন্যান্য স্থানে তাঁহাকে রাজধানী রাখিতে হইয়াছিল। বিক্রমাদিত্য বাঙ্গালী ছিলেন, কি উজ্জয়িনীবাসী ছিলেন, তদ্বিষযে বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে, তিনি তান্ত্রিক ধর্ম্মের উপাসক ছিলেন এবং তান্ত্রিক মত বঙ্গদেশের নিজস্ব সম্পত্তি —এই জন্য তাঁহাকে বাঙ্গালী বলা যাইতে পারে। আদিত্য-সংযুক্ত নাম বাঙ্গালায় বিরল নহে। বিক্রমাদিত্য নামও বাঙ্গালায় দৃষ্ট হয়। রাজতরঙ্গিণীতে যে বিক্রমাদিত্যের কাশ্মীর-জয় ও মাতৃগুপ্ত নামক কবির হস্তে সেই রাজ্যের শাসন-ভার অর্পণের বিষয় বর্ণিত আছে এবং তৎপ্রসঙ্গোক্ত মাতৃগুপ্তকে কেহ কেহ যে কবি কালিদাস বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন, তাহাতেও বিক্রমাদিত্যের বাঙ্গালীত্ব-সম্বন্ধে একটী যুক্তি প্রাপ্ত হই। তিনি বঙ্গদেশবাসী ছিলেন বলিয়াই বাঙ্গালীর প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ-বশে বাঙ্গালীর উপর কাশ্মীর-রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করিয়াছিলেন, মনে করা যাইতে পারে। এ বিষয়ে বাদ-প্রতিবাদের কথা অবশ্য আছে। মাতৃগুপ্তের কাশ্মীররাজ্য শাসনের সাধারণতঃ যে কাল নির্দ্দেশ হয়, তদনুসারে বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা কালিদাসকে ও বিক্রমাদিত্যকে খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি। সুতরাং মাতৃগুপ্ত ও কালিদাস এবং উজ্জয়িনী-রাজ বিক্রমাদিত্য ও কালিদাসের পৃষ্ঠপোষক বিক্রমাদিত্য ইঁহাদের পরস্পরকে অভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে গেলে, তাঁহাদের বিদ্যমান-কাল বিষয়েও নূতন সমস্যার সমাধান করার আবশ্যক হয়। সে সমস্যা—বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক কাশ্মীর-জয়—খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর ঘটনা, কি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর ঘটনা! এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য, রাজতরঙ্গিণীর গণনানুসারে কাল-নির্ণয়ে অনেক গণ্ডগোল ঘটিয়াছে। সে গণনার অনুসরণে আমরা দেখাইয়াছি, এক কনিষ্কের (কনিস্কের) রাজ্যকাল-গণনায় কত বিভ্রমই ঘটিয়াছে! সে গণনায় খৃষ্টজন্মের বার শত বৎসর পূর্ব্বেও কনিষ্কের বিদ্যমানতা প্রমাণ করা যায়; আবার খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৩২৭ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি বিদ্যমান ছিলেন, তাহাও বুঝা যায়।* এদিকে অধুনা ৭৮ খৃষ্টাব্দে কনিষ্কের বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। কাশ্মীর-রাজ গোনর্দ্দের (গোনন্দ) কাল-নির্দ্দেশ-উপলক্ষে মূলে গলদ ঘটিয়াছে। তিনি যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক ছিলেন; অথচ, কলির ৬৫৩ বৎসর গতে তাঁহার রাজ্যকাল নির্দ্দিষ্ট হয়। এ বড়ই বিচিত্র কথা! এখানে প্রায় সহস্র বৎসরের পার্থক্য থাকে। † এই হিসাবে সূক্ষ্ম গণনায় প্রতিপন্ন হয়, মাতৃগুপ্ত খৃষ্ট-পূর্ব্ব

---

* পৃথিবীর ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ, ২৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† পৃথিবীর ইতিহাস, প্রথম খণ্ডে, বিংশ পরিচ্ছেদে, মহাভারতের কাল-নির্ণয় প্রসঙ্গে এ আলোচনা দ্রষ্টব্য।

শতাব্দীতে কাশ্মীর-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন; খৃষ্ট-পর শতাব্দীতে কখনই নহেন। বিষয়টী একটু বিশদভাবে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। জরাসন্ধের সহযোগী যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক গোনর্দ্দ (গোনন্দ) খৃষ্ট-জন্মের অন্ততঃ ৩১৫০ বৎসর পূর্ব্বে কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ মত আমরা পূর্ব্বেই (পৃথিবীর ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। ঐ গোনর্দ্দের পর, কাশ্মীরে কত জন রাজা কত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের কোন্ রাজার শাসন-কালে বিক্রমাদিত্য কাশ্মীর-রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, এই বিষয়টী অনুসন্ধান করিলেই সকল তত্ত্ব নিরূপিত হইতে পারে। প্রথম গোনর্দ্দ হইতে অভিমন্যু পর্য্যন্ত বায়ান্ন জন নৃপতির রাজত্বকাল ১২৬৬ বৎসর ধরা হয়। ইহার পর, তৃতীয় গোনর্দ্দ রাজবংশে ২১ জন নৃপতি প্রায় ৯৮৮ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে হর্ষ-প্রমুখ মন্ত্রিগণ কিছু দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহারা কত বৎসর রাজত্ব করেন, তাহার নির্দ্দেশ নাই। তৎপরে, প্রতাপাদিত্য-বংশীয়গণ প্রায় এক শত বৎসর, মেঘবাহন-বংশীয়গণ প্রায় এক শত বৎসর রাজত্ব করেন। ইহার পর—মাতৃগুপ্ত। এ হিসাবে, খৃষ্ট-জন্মের ছয় শত বৎসর পরে তো দূরের কথা, খৃষ্টজন্মের তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বে মাতৃগুপ্তের কাল নির্দ্ধারিত হইতে পারে। মন্ত্রিগণের রাজত্বকালের পরিমাণ ঐতিহাসিক কহ্লন নির্দ্ধারণ করিয়া যান নাই। অপিচ, দ্বিতীয় গোনর্দ্দের সিংহাসনাধিরোহণের পরবর্ত্তিকালে কাশ্মীরে যে পঁয়ত্রিশ জন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সুতরাং ঐ তিন চারি শত বৎসরের হিসাব অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। আর, তাহা হইলে, কালিদাসের ও মাতৃগুপ্তের অভিন্নত্ব এবং খৃষ্টপূর্ব্ব শতাব্দীর বিক্রমাদিত্যের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ স্বতঃই মানসপটে প্রতিফলিত হয়। মাতৃগুপ্তের নামের সহিত সংশ্রবযুক্ত গ্রাম বঙ্গদেশে নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের সন্নিকটে দৃষ্ট হয় বলিয়া কেহ কেহ মাতৃগুপ্ত বাঙ্গালী ছিলেন বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। কিন্তু সে মতে কালিদাসকে বৈদ্যজাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। মাতৃগুপ্তে 'গুপ্ত' শব্দের অস্তিত্বই তাঁহার বৈদ্যত্ব-পরিকল্পনার হেতুভূত। কিন্তু এ হেতুবাদের বিশেষ কোন মূল্য নাই। কারণ, অন্যান্য প্রমাণে কালিদাস ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া প্রতিপন্ন হন। নেপাল হইতে একখানি পুঁথি পাওয়া যায়। পুঁথিখানি প্রায় তিন শত বৎসরের প্রাচীন। বীরপুর-গ্রামের বিশ্বনাথ শর্ম্মা ৪১৭ লসং অব্দে * মাঘী পূর্ণিমার দিন ঐ পুঁথির লিখন-কার্য্য সম্পন্ন করেন। পুঁথিখানি—কালিদাসের রঘুবংশ। পুঁথি-শেষে লিখিত আছে,—"ইতি মিশ্রশ্রীকালিদাসকৃতে রঘুবংশে মহাকাব্যে একোনবিংশ সর্গঃ সমাপ্তঃ॥ লসং ৪১৭ মাঘীপূর্ণিমায়াম তিথৌ কজে এ (?) দিনে বীরপুরগ্রামে লিখিতমিদং পুস্তকং শ্রীবিশ্বনাথ শর্ম্মভিরিতি॥" ইহাতে মহাকবিকে মিশ্র উপাধিধারী ব্রাহ্মণ বলিয়া বুঝা যায়। কাহারও কাহারও বিশ্বাস,—মিশ্রগণ ব্রাহ্মণ বটেন; কিন্তু

* লক্ষ্মণ-সেন প্রবর্ত্তিত অব্দ লসং বলিয়া জানা যায়। লক্ষ্মণ-সেনের জীবিতকালে ঐ অব্দ প্রচলিত হইয়াছিল।

ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের কালিদাস প্রবন্ধ (সাহিত্য, পঞ্চম বর্ষ) দ্রষ্টব্য।

বাঙ্গালায় মিশ্র উপাধিধারী ব্রাহ্মণ নাই ; সুতরাং কালিদাস অন্য দেশের লোক ছিলেন। বলা বাহুল্য, এ যুক্তি ভিত্তিহীন। বাঙ্গালায় মিশ্র-উপাধিধারী ব্রাহ্মণ অনেক আছেন। বরেন্দ্র-সমাজে বরেন্দ্রভূমে মালদহ-জেলায় মিশ্র-উপাধিধারী বহু ব্রাহ্মণ বাস করেন। ফলতঃ, খৃষ্ট-পূর্ব্ব শতাব্দীতে কালিদাসের বিদ্যমানতা এবং তাঁহার বাঙ্গালিত্ব বিবিধ বিধানেই প্রতিপন্ন হয়।

মহাকবি কালিদাসের দুই প্রধান কাব্য—রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব। রঘুবংশ ঊনবিংশ সর্গে বিভক্ত। প্রথম তিন সর্গে রাজা দিলীপের, চতুর্থ হইতে অষ্টম সর্গে রঘুর ও অজের, নবম হইতে পঞ্চদশ সর্গে দশরথের ও শ্রীরামচন্দ্রের এবং শেষ সর্গত্রয়ে লব-কুশ হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্নিবর্ণ পর্য্যন্তের বিবরণ বিবৃত আছে।

রঘুবংশ।

বর্ণিতব্য বিষয় প্রধানতঃ রামায়ণের অনুসারী। কিন্তু বর্ণনার লালিত্যে, উপমার মনোহারিত্বে, কবিত্বের পরিস্ফুটনায়, সেই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার পরিজ্ঞাত রামায়ণী কাহিনী এক অভিনব রূপ ধারণ করিয়া আছে। সর্ব্বজনবিদিত পুরাতন বিষয় কবির তুলিকায় কি মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করে, রঘুবংশ তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ঘটনা-বৈচিত্র্য অথবা উৎকট চরিত্র-চিত্র নাই ; অথচ, উহা পাঠে পাঠকের প্রাণে ঐকান্তিক আগ্রহ আনয়ন করে। সংক্ষেপে দুই চারিটী দৃষ্টান্তের অবতারণা করিতেছি। তাহাতে উচ্চ-আদর্শ, উচ্চ-ভাব, উচ্চ-কবিত্ব, উচ্চ-উপমা আপনিই নয়ন-সমক্ষে প্রতিভাত হইবে। রাজা দিলীপ প্রজার নিকট কর গ্রহণ করিতেন। কবির উপমায় ব্যক্ত হইল,—

"প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ। সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবি ॥"

'যেমন সূর্য্যদেব রস আকর্ষণ করেন—সহস্র গুণ রস-বিতরণের জন্য, সেইরূপ রাজা দিলীপ প্রজাদিগের নিকট যে কর গ্রহণ করেন—তাহাদেরই মঙ্গলের জন্য।' রাজার কর্ত্তব্য বুঝাইবার পক্ষে ইহার অধিক সুন্দর উপমা কি হইতে পারে? রাজা দিলীপ কিরূপ আদর্শ রাজা ছিলেন, তৎসম্বন্ধে কবি আরও বলিয়াছেন,—

"প্রজানাং বিনয়াধানাদ্রক্ষনাদ্ভরণাদপি। স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ ॥"

'তিনি ভরণপোষণ ও শিক্ষাদান জন্য প্রজাগণের পিতৃস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাহাদের পিতামাতা কেবল তাহাদের জন্মহেতুমাত্র ছিল।' রাজা কিরূপ প্রজাপালক হইবেন, এই বর্ণনায় তাহা বুঝা যায়। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন সম্বন্ধে রাজার ব্যবহার কেমন ছিল, কবি কেমন সুন্দর উপমায় তাহা ব্যক্ত করিলেন, দেখুন,—

"দ্বেষ্যোপি সম্মতঃ শিষ্টস্তস্যার্ত্তস্য যথৌষধম্। ত্যাজ্যো দুষ্টঃ প্রিয়োঽপ্যাসীদঙ্গুলীবোরগক্ষতা ॥"

'শিষ্ট ব্যক্তি শত্রু হইলেও রোগীর ঔষধের ন্যায় তাঁহার নিকট সমাদর প্রাপ্ত হইত এবং দুষ্ট ব্যক্তি আত্মীয় হইলেও সর্পদষ্ট অঙ্গুলীর ন্যায় তাঁহার পরিত্যাজ্য ছিল।' যেমন পিতা, তেমনই পুত্র। যেমন দিলীপ, তেমনই রঘু। কবি কেমন বুঝাইতেছেন,—

"মন্দোৎকণ্ঠাঃ কৃতাস্তেন গুণাধিকতয়া গুরৌ। ফলেন সহকারস্য পুষ্পোদ্গম ইব প্রজা।"

'সুমধুর আম্রফল আস্বাদন করিয়া লোকে তাহার মুকুলের বিষয় ভুলিয়া যায়। অধিকতর গুণসম্পন্ন রঘুকে পাইয়া প্রজাগণ সেইরূপ দিলীপের অভাব বিস্মৃত হইল।' আর একস্থলে

দেখুন। বিশ্বজিৎ-যজ্ঞ করিয়া রঘু যখন সর্ব্বস্ব দান করিলেন, কবি তখন কেমন একটী সুন্দর উপমায় নৃপতির অর্থ-সঞ্চয়ের ও অর্থের সদ্ব্যবহারের বিষয় বুঝাইয়া দিলেন! কবি কহিলেন,—"আদানং হি বিসর্গায় সতাং বারিমুচামিব।" অর্থাৎ, পৃথিবী হইতে বাষ্প-গ্রহণে যে মেঘ সঞ্চয় হয়, সে মেঘ বারি-দানে পৃথিবীকেই পরিতৃপ্ত করে। সেইরূপ, দান করিবার জন্যই, মেঘের বারি-গ্রহণের ন্যায়, রাজা অর্থসঞ্চয় করিয়া থাকেন। আদর্শ রাজার চরিত্র এইরূপই বটে! আর একস্থলে দেখুন। বিশ্বজিৎ-যজ্ঞে সর্ব্বস্ব-দানের অব্যবহিত পরে, রঘুর সকাশে কৌৎস ঋষি ভিক্ষার্থী হইয়া উপস্থিত। রঘু স্বর্ণপাত্রের অভাবে মৃৎপাত্রে অর্ঘ্য স্থাপন করিয়া, তপোবনের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রসঙ্গতঃ তাঁহার আপনার নিঃস্ব অবস্থার বিষয়ও নিবেদিত হইল। ঋষি কৌৎস তাহাতে যে উত্তর দিলেন, সে উত্তর ঋষিরই উপযুক্ত; আবার সে উত্তরে আদর্শ রাজার চিত্রও কেমন সুন্দর পরিস্ফুট! ঋষি কহিলেন,—

"সর্ব্বত্র নো বার্ত্তমবেহি হি রাজন্ নাথে কুতস্ত্বয্যশুভং প্রজানাম্।
সূর্য্যে তপত্যাবরণায দৃষ্টে কল্পেত লোকস্য কথং তমিস্রা॥"

'রাজন্! আপনি যখন শাসনকর্ত্তা-রূপে বিরাজমান রহিয়াছেন, তখন প্রজাদিগের অমঙ্গল কি কখনও সম্ভবে? সূর্য্যদেব কিরণমালা বিস্তার করিয়া বিদ্যমান থাকিলে, তিমিরজাল কখনও কি লোকের দৃষ্টি অবরোধ করিতে পারে!' এইরূপে কুশল জ্ঞাপন করিয়া, কহিলেন,—'আপনি ভিক্ষা দিতে পারিলেন না বলিয়া আমি অণুমাত্র ক্ষুব্ধ নহি। আপনি যজ্ঞকার্য্যে সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াছেন। সুতরাং আমি এ সময়ে প্রার্থনায় পরাঙ্মুখ হইলাম।' "স্বস্ত্যস্তু তে নির্গলিতাম্বুগর্ভং শরদ্ঘনং নার্দ্দতি চাতকোঽপি॥" 'আপনার কল্যাণ হউক; দেখুন, অনন্যগতি চাতকও নির্গলিতাম্বু শরদ্ঘনের নিকট জল প্রার্থনা করে না।' কি সুন্দর উপমা! মেঘ যখন জলপূর্ণ থাকে, বর্ষার পূর্ব্বে, চাতক 'ফটিক জল ফটিক জল' বলিয়া জল যাচ্ঞা করে। কিন্তু মেঘ জলশূন্য হইলে, শরতে, চাতক কখনই জল প্রার্থনা করে না। রঘু যতক্ষণ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ছিলেন, ঋষি ততক্ষণ তাঁহার নিকট প্রার্থী হইতে পারিতেন। কিন্তু রাজা যখন সর্ব্বস্ব দান করিয়া রিক্তহস্ত হইয়াছেন, তখন কিছুতেই তাঁহার নিকট প্রার্থী হইতে পারেন না। অন্য পক্ষে, কৌৎস ঋষি গুরুদক্ষিণা পরিশোধের জন্য রাজার নিকট প্রার্থী হইয়াছিলেন। বিদ্যোৎসাহী নৃপ কেমন করিয়া কোন্ প্রাণে তাঁহাকে বিমুখ করিবেন? সুতরাং ঋষি প্রত্যাবৃত্ত হইতে চাহিলেও রাজা তাঁহাকে কয়েক দিন অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন, এবং চেষ্টা করিয়া অর্থসংগ্রহানন্তর ঋষির অভাব পূরণ করিয়া দিলেন। যেমন আদর্শ রাজা, তেমনই আদর্শ ঋষি। প্রার্থীর 'দেহি দেহি' ভাব নাই; অথচ, নিঃস্ব হইয়াও দাতা তাঁহার অভাব-পূরণে আগ্রহান্বিত। রাজা-প্রজার—দাতার ও প্রার্থীর—এমন চরিত্র—এমন চিত্র আর কোথাও আছে কি না, মনে হয় না। স্বভাব-বর্ণনা, কবির তুলিকায় আরও কত সুন্দর অভিব্যক্ত! রঘুবংশের প্রায় প্রতি সর্গেই স্বভাব-বর্ণনায় কবির কবিত্ব পরিস্ফুট। বিশেষতঃ, ত্রয়োদশ সর্গে সে বর্ণনা যেন চরমে উঠিয়াছে! জানকীকে উদ্ধার করিয়া লঙ্কা হইতে শ্রীরামচন্দ্র আকাশপথে পুষ্পক-রথে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিতেছেন। আসিতে আসিতে, একে একে, সীতাদেবীকে দেখাইতে-

ছেন—সেই ফেণপুঞ্জ-সমন্বিত বারিধি, সেই মলয়াচল পর্য্যন্ত বিস্তৃত সেতুবন্ধ, সেই জলজন্তু-সমাকুল সমুদ্রে তিমি-মৎস্যের ভীষণ বদন-ব্যাদান! দেখাইতেছেন—জলহস্তীসকল সহসা জল-মধ্যে ভাসিয়া উঠিয়া ফেণিল-রাশি কেমন দুই ভাগে বিভক্ত করিতেছে; আর সেই ফেণ-রাশি করিকপোলদেশে সংলগ্ন হইয়া কেমন কর্ণ-চামরের ন্যায় শোভা পাইতেছে! দেখাইতেছেন,—বেলানিলপানেচ্ছু ভুজঙ্গমগণ তটভূমি অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে; তাহাতে, তাহাদিগকে কেমন বৃহত্তরঙ্গের ন্যায় দেখাইতেছে এবং সৌরকরসংস্পর্শে তাহাদের ফণা-মণ্ডলস্থ মধ্য-মণি কেমন ঔজ্জ্বল্য বিস্তার করিয়া আছে! দেখাইতেছেন,—তোয়দবৃন্দ সমুদ্র-বারি-পানে প্রবৃত্ত হইবামাত্র আবর্ত্তবেগে ঘূর্ণিত হইতেছে, আর তাহাতে মন্দর-পর্ব্বত দ্বারা যেন পয়োনিধি মথ্যমান হইতেছেন। দেখাইতেছেন,—দূরে তমালবন ও তালীবন শ্রেণীতে নীলবর্ণ বেলাভূমি চক্রনিভ লবণাম্বুরাশির কলঙ্করেখাবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। এইরূপে, মহাসাগরের দৃশ্যপটসমূহ নয়ন-সমক্ষে উত্তোলিত করিয়া, তটপ্রদেশের ও পথের দৃশ্যাবলী দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। কহিলেন—'এই দেখ প্রিয়ে, সেই পরিত্যক্ত জনস্থান – বিঘ্ন দূর হওয়ায় এক্ষণে ঋষিগণের আশ্রম-স্থানে পরিণত হইয়াছে। এই দেখ প্রিয়ে, সেই বনস্থলী—তোমার অন্বেষণে আসিয়া যেখানে তোমার নূপুর পতিত দেখিয়াছিলাম;—তোমার চরণ-স্খলিত হইয়া নূপুর যেখানে মৌনাবলম্বন করিয়া ছিল। দেখ প্রিয়ে—এই সেই পথ!—দুরাত্মা নিশাচর যে পথে তোমায় হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, আর যে পথের তরুলতা বাক্‌শক্তি-হীন হইয়াও অবনত-পল্লব দ্বারা আমায় পথ-প্রদর্শনে সহায়তা করিয়াছিল; অপিচ, যে পথে আমার ব্যাকুলতা দেখিয়া দর্ভাঙ্কুরে বীতস্পৃহ হইয়া দক্ষিণাভিমুখে নয়ন প্রবর্ত্তিত করিয়া মৃগী-গণ আমায় পথ দেখাইয়া দিয়াছিল।' ইহার পর, দেখাইলেন—মাল্যবান পর্ব্বত, দেখাইলেন—গোদাবরী-তীর; দেখাইলেন—পঞ্চবটী বন; দেখাইলেন—অগস্ত্যের আশ্রম; দেখাইলেন—চিত্রকূট পর্ব্বত; দেখাইলেন—অত্রি-মুনির আশ্রম; দেখাইলেন—নিষাদপতি গুহের পুরী; দেখাইলেন—সরযূ নদী। দেখাইতে দেখাইতে কহিলেন—'ঐ যে সন্ধ্যাকালের ন্যায় কপিশবর্ণ ধূলিপটল উড্ডীন দেখিতেছ, আমাদের আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া সসৈন্যে ভরত আমা-দিগকে প্রত্যুদ্গমন করিতে আসিতেছে। দেখ, চীরবাসা ভরত, পশ্চাতে সৈন্যদল ও পুরো-ভাগে কুলগুরু বশিষ্ঠকে রাখিয়া, অর্ঘ্য-হস্তে আমাদের অভ্যর্থনা করিতে আসিতেছে। যুবা হইয়াও অঙ্কগত রাজলক্ষ্মী উপভোগ না করিয়া ভরত কি কঠোর অসিধার-ব্রত অবলম্বন করিয়া আছে!' রঘুবংশের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের এই বর্ণনায় কবিত্বের উৎস উৎসরিত; আবার, এই বর্ণনার মধ্যে লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় আগমনের পথ প্রভৃতির অভিজ্ঞতা—কবির ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিচায়ক। কবি যে সমুদ্র-পথে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, সমুদ্র-বক্ষ হইতে তটভূমি প্রত্যক্ষ করিবার অবসর পাইয়াছিলেন, এই বর্ণনায় তাহাও প্রতীত হয়। "দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী তমালতালীবনরাজিনীলা। আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশের্ধারা-নিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥" এ কবিতা—এ ভাব যে প্রত্যক্ষ-দর্শনের ফল, তাহাতে আদৌ সংশয় থাকিতে পারে না। রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গেও কবির বিভিন্ন জনপদ দর্শন ও তদ্বিষয়ক অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। যাঁহারা সমুদ্রগুপ্ত অভিধেয় বিক্রমাদিত্যের অথবা

চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক বলিয়া কালিদাসকে নির্দ্দেশ করেন, রঘুর দিগ্বিজয়ে তাঁহারা সমুদ্রগুপ্তের বা চন্দ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের ছায়াপাত দেখিতে পান। তাহা হইলেও, সেই সমুদ্রগুপ্তকে বা সেই চন্দ্রগুপ্তকে বঙ্গদেশীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। রঘুর প্রথমেই বঙ্গদেশে আগমন এবং তারপর বঙ্গদেশ হইতে অন্যদেশে গমন ;—ইহাতে কি বুঝা যায় ? কোথায় অযোধ্যা, আর কোথায় বঙ্গদেশ ! জনপদ-সমূহ উল্লঙ্ঘন করিয়া, বঙ্গদেশে আসিয়া, বঙ্গদেশ হইতে অন্যান্য দেশ-জয়ে যাত্রা করায়, কোনও বঙ্গীয় নৃপতির দিগ্বিজয়ের অনুসরণ করা হইয়াছে বলিয়াই মনে হয় না কি ? শিলালিপি প্রভৃতির আবিষ্কারে গুপ্তবংশকে গুর্জর-দেশীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করার প্রয়াস দেখিতে পাই। প্রোক্ত চন্দ্রগুপ্ত বা সমুদ্রগুপ্ত যদি গুর্জর-দেশীয় হইতেন, তাঁহাদের দিগ্বিজয়ে বঙ্গদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ অন্যান্য-দেশ জয়ের প্রসঙ্গ কখনই উত্থাপিত হইত না। কাজেই বলিতে হয়, রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয়ের সঙ্গে যে চন্দ্রগুপ্তের, সমুদ্রগুপ্তের বা কুমারগুপ্তের সম্বন্ধ-সংশ্রব সূচনা করা হইতেছে, তাঁহারা নিশ্চয়ই বঙ্গদেশীয়। এতৎপ্রসঙ্গে আরও বলিতে পারি, যদি সমুদ্রগুপ্তকেই মহাকবির আশ্রয়দাতা বিক্রমাদিত্য বলিয়া কেহ মনে করেন, তাহা হইলে সেই সঙ্গে তাঁহার মনে করা উচিত,—সে সমুদ্রগুপ্ত কখনই পঞ্চম শতাব্দীর সমুদ্রগুপ্ত নহেন,—সে সমুদ্রগুপ্ত খৃষ্ট-পূর্ব্ব শতাব্দীর বঙ্গদেশীয় নৃপতি সমুদ্রগুপ্ত। এক নামের বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনপদে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত থাকায়, এবং দেশ-মধ্যে বিভিন্ন প্রকার শক-সংবতের প্রচলন-হেতু, যত গণ্ডগোল ঘটিয়াছে,—একের কাণ্ড অন্যের স্কন্দে ন্যস্ত হইয়াছে। কুমারসম্ভব-প্রসঙ্গেও এইরূপ সাদৃশ্যের বিষয় আলোচিত হইয়া থাকে। তদনুসারে কুমার কার্ত্তিকেয়, চন্দ্রগুপ্তের পুত্র কুমারগুপ্তের প্রতিচ্ছবি বলিয়া কথিত হন। * আমরা কিন্তু তদ্রূপ মনে করি না। পুরাণাদির অনুসরণে মহাকবির কাব্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। তবে দেশ-কাল-পাত্রের ছায়া ক্বচিৎ কোথাও পতিত হইলেও, আর তদ্দ্বারা বঙ্গদেশের সম্বন্ধ বুঝিতে পারিলেও, তাহাতে কুমারগুপ্তের কি কোনও নৃপতি-বিশেষের স্মৃতি মনোমধ্যে জাগরিত হয় না।

কুমারসম্ভব সপ্তদশ সর্গে বিভক্ত। উহার প্রথম সাত সর্গ সাহিত্য-সমাজে সমাদৃত। ঐ সাত সর্গে হরপার্ব্বতীর পরিণয়-কাহিনী বিবৃত আছে। কবিত্বের স্ফূর্ত্তি, রসের সমাবেশ—ঐ সাত সর্গেই প্রধানতঃ পরিদৃষ্ট হয়। প্রথম সর্গে প্রথমে নগাধিরাজ হিমালয়ের বর্ণনা, মেনকার তপস্যা ও উমালাভ, পার্ব্বতীর জন্ম ও যৌবনোন্মেষ পরিবর্ণিত আছে। গ্রন্থারম্ভে হিমালয়ের বর্ণনায়, হিমালয়ের গাম্ভীর্য্য সৌন্দর্য্য বিশালতা ও ভীষণতা—কি সুন্দর প্রতিফলিত! রঘুবংশে

কুমারসম্ভব।

* যাঁহারা এবম্বিধ মত পোষণ করেন, তাঁহাদের যুক্তি এই,—রঘুবংশে (প্রথম সর্গ, পঞ্চম শ্লোক) "আসমুদ্রক্ষিতীশানামানাকরথবর্ত্মনাম্" শ্লোকার্দ্ধে 'আসমুদ্র' শব্দে সমুদ্রগুপ্ত হইতে উৎপন্ন রাজবংশকে, "তস্মৈ সভ্যাঃ সভার্য্যায় গোপ্ত্রে গুপ্ততমেন্দ্রিয়াঃ" (রঘুবংশ, প্রথম সর্গ, পঞ্চান্ন শ্লোক) শ্লোকে 'গুপ্ত' শব্দে গুপ্তবংশের রাজত্ব-বিষয়, "আকুমারকথোদ্ঘাতং শালিগোপ্যো জগুর্যশঃ" (রঘুবংশ, চতুর্থ সর্গ, ২০শ শ্লোক) শ্লোকে 'কুমার' শব্দে চন্দ্রগুপ্ত পুত্র কুমারগুপ্তের গুণ-গান এবং "কুমারসম্ভবম্" নামে কুমারগুপ্তের জন্ম-বিবরণ পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে বুঝা যায়। "পুপোষবৃদ্ধিং হরিদশ্বদীধিতেরনুপ্রবেশাদিব বালচন্দ্রমা (রঘুবংশ, তৃতীয় সর্গ, ২২শ শ্লোক) শ্লোকে 'চন্দ্রমা' শব্দে চন্দ্রগুপ্তকে বুঝাইতেছে।

বেলাভূমির ও সমুদ্রের সম্বন্ধ-বর্ণন-দৃষ্টে যেমন তাহা কবির প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট সামগ্রী বলিয়া প্রতীত হয়, হিমালয়ের বর্ণনায়ও সেই প্রত্যক্ষ-দর্শনের ভাব মনে আসে। কি স্বভাবসুন্দর মনোহর বর্ণনা! কবির উপমায় একটী শ্লোকে হিমালয়ের অতুল বিভব উপলব্ধি করুন,—

"অনন্তরত্নপ্রভবস্য যস্য হিমং ন সৌভাগ্যবিলোপি জাতম্।
একোহি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেম্বিবাঙ্কঃ॥"

কবি বলিতেছেন,—'শৈত্যাধিক্য-নিবন্ধন হিমালয় সৌভাগ্যহীন নহেন; কারণ, হিমালয় অনন্তরত্নের উৎপত্তি-স্থান। যেরূপ চন্দ্রের একমাত্র কলঙ্ক-দোষ তাহার স্নিগ্ধ কিরণরাশির মধ্যে বিলীন হইয়া থাকে; সেইরূপ হিমাচলের অনন্ত সৌন্দর্য্যরাশির মধ্যে তাহার একমাত্র শৈত্যদোষ কখনই ধর্ত্তব্য নহে।' হিমাচল যেমন রত্নের আকর, হিমাচলে যেমন অপ্সরী, কিন্নরী, বিদ্যাধরীগণ আনন্দে বিচরণ করেন; হিমাচল তেমনই সিংহ, ব্যাঘ্র, গজ, চমরী প্রভৃতির লীলাভূমি। সেখানে যেমন পুষ্পিত উপবন, পদ্মখচিত সরোবর, তেমনই ভীষণ মহারণ্য, ভয়াল গিরিগুহা। হিমাচল যেমন সাধু-সজ্জনের পুণ্য-নিকেতন, হিমাচল তেমনই ভয়-ত্রস্ত পাপীর আশ্রয়-স্থল। এই কঠোরে-কোমলে বিষমে-মধুরে মিশ্রিত নগাধিরাজ,—কবির তুলিকায় একটী উপমায় কেমন চিত্রিত হইয়াছেন, দেখুন,—

"দিবাকরাদ্রক্ষতি যো গুহাসু লীনং দিবাভীতমিবান্ধকারম্।
ক্ষুদ্রেহপি নূনং শরণং প্রপন্নে মমত্বমুচ্চৈঃশিরসাং সতীব॥"

অন্ধকার সূর্য্য-ভয়ে ভীত হইয়া নগাধিরাজের নিকট আশ্রয়প্রার্থী। কবি বলিতেছেন,—'যাঁহারা মহৎ, তাঁহারা সাধু-সজ্জনের প্রতি যেমন মমতাশীল, শরণাগত ব্যক্তি নীচজন হইলেও তাহার প্রতিও তাঁহারা তেমনই মমতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। পেচক যেমন দিবাভাগে গুহা-মধ্যে আশ্রয় লয়, সূর্য্যভয়ভীত অন্ধকার সেইরূপ এই নগাধিরাজের আশ্রয়-প্রার্থী হইয়া, গুহা-মধ্যে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়।' হিমাচলের বর্ণনার পর, কবি, পার্ব্বতীর যৌবনোন্মেষ বর্ণনা করিয়াছেন। অনেক পুত্র-কন্যা সত্বেও গিরিরাজ উমার রূপে আসক্ত ছিলেন। যতই সে রূপ দেখিতেন, ততই দেখিবার ইচ্ছা হইত। কবির উপমায়,—"অনন্ত পুষ্পস্য মধোর্হি চূতে দ্বিরেফমালা সবিশেষসঙ্গা।" বসন্তকালে অশেষ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইলেও ভ্রমর আম্র-মুকুলেই আসক্ত হয়। এবম্বিধ উপমায় পার্ব্বতীর প্রতি গিরিরাজের নির্নিমেষ-দৃষ্টি খ্যাপন করিয়া, কবি, পার্ব্বতীর যৌবনোন্মেষ-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। একে একে সকল অঙ্গের সৌন্দর্য্য-সুষমা প্রকাশ করিয়া, উপসংহারে বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বোপমাদ্রব্যসমুচ্চয়েন যথাপ্রদেশং বিনিবেশিতেন।
সা নির্ম্মিতা বিশ্বসৃজা প্রযত্নাদেকস্থসৌন্দর্য্যাদদৃক্ষয়েব॥"

'সমস্ত উপমা দিবার বস্তু একত্র করিলে কিরূপ সৌন্দর্য্য হয়, তাহা দেখিবার জন্যই বোধ হয় বিধাতা সমস্ত উপমা-বস্তু যথাযোগ্য স্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া পার্ব্বতীকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।' পার্ব্বতীর চরণের নখকান্তি এমন উজ্জ্বল রক্তবর্ণ ছিল যে, তিনি যখন ধরণীতলে পদবিন্যাস করিতেন, বোধ হইত, যেন অলক্তক-রসে ধরণী সিক্ত হইল, যেন ভূমিতলে স্থলপদ্ম প্রস্ফুটিত হইতে চলিল। তাঁহার কণ্ঠস্বরের তুলনায় কোকিলের কণ্ঠস্বর

কর্কশ বোধ হইত। তাঁহার বিশাল লোচনের চঞ্চল-দৃষ্টি বায়ু-আন্দোলিত নীল-পদ্মবৎ প্রতিভাত ছিল। সে দৃষ্টি—কুরঙ্গীর নিকট তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন কি কুরঙ্গীই তাঁহার নিকট গ্রহণ করিয়াছিল, নির্দ্দেশ করা দুঃসাধ্য। তাঁহার অঞ্জনযুক্ত ভ্রূ-যুগল যেন তুলিকার দ্বারা চিত্রিত ছিল। সে ভ্রূ-যুগলে বিলাস-গুণ-সঞ্চালনে কন্দর্পেরও সৌন্দর্য্য-গর্ব্ব খর্ব্ব হইত। তির্য্যগ্‌জাতির লজ্জা যদি কোথাও দেখা যায়, সে এই পার্ব্বতীর সুবিন্যস্ত কেশরাশির নিকট; তাঁহার মনোহর কেশকলাপ দর্শন করিয়া চমরী নিজ পুচ্ছ-লোমের অসম্পূর্ণতা মনে করিয়া লজ্জাবোধ করিত। তাঁহার কমল-মুখে মধুর-হাস্য কি মনোহর!

"পুষ্পং প্রবালোপহিতং যদি স্যান্ মুক্তাফলং বা স্ফুটবিদ্রুমস্থম্।
ততোঽনুকুর্য্যাদ্বিশদস্য তস্যাস্তাম্রৌষ্ঠপর্য্যস্তরুচঃ স্মিতস্য॥"

'যদি নবীন-পল্লবের উপর শ্বেতবর্ণ কুসুম সংস্থাপিত করা যায়, অথবা পবিষ্কৃত প্রবালের উপর মুক্তাফল সন্নিবেশ করা যায়, তাহা হইলে তাঁহার রক্তবর্ণ ওষ্ঠদ্বয়ের উপর বিরাজমান শুভ্র দশনকান্তি-সুশোভিত মধুর হাস্যের সহিত কথঞ্চিৎ তুলনা করা যাইতে পারে।' দ্বিতীয় সর্গে, তারকাসুর-উপদ্রুত দেবগণ ব্রহ্ম-সমীপে আপনাদের দুর্দ্দশা-কাহিনী বর্ণন করিয়া প্রতিকার-প্রার্থী হইয়াছেন এবং ব্রহ্মা তারকাসুর-বধের উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। তৃতীয় সর্গে, যোগমগ্ন মহাদেবের যোগভঙ্গের চেষ্টা—মদনভস্ম। চতুর্থ সর্গে, রতিবিলাপ—রতির মর্ম্মভেদী শোকোচ্ছ্বাস। পঞ্চম সর্গে, তপঃফলোদয়—পার্ব্বতীর তপস্যায় মহাদেবের পরিতুষ্টি। ষষ্ঠ সর্গে উমাসম্প্রদান-প্রসঙ্গ, সপ্তম সর্গে উমা-পরিণয়, অষ্টম সর্গে সম্ভোগ, নবম সর্গে কৈলাস-গমন, দশম সর্গে কুমারোৎপত্তি, একাদশ সর্গে কুমারকৌমারবর্ণন, দ্বাদশ সর্গে কুমার-সেনাপত্য, ত্রয়োদশ সর্গে কুমার-সেনাপত্যাভিষেক, চতুর্দ্দশ সর্গে কুমার-প্রয়াণ, পঞ্চদশ সর্গে সেনাসন্নিবেশ, ষোড়শ সর্গে দ্বন্দ্ব, সপ্তদশ সর্গে তারকাসুরবধ। তারকাসুর-বধের জন্য কুমার কার্ত্তিকেয়ের জন্ম-বৃত্তান্ত লইয়াই এই মহাকাব্য বিরচিত। এই কাব্যে যে সকল স্বভাবসুন্দর মনোহর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার কয়েকটী উল্লেখ করিতেছি। প্রথমেই নগাধিপতি হিমালয়ের বর্ণনা। সে বর্ণনার আভাস পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছি। তার পর, পার্ব্বতীর রূপ-বর্ণনা। এমন রূপ-বর্ণনা কোনও কবির কোনও কাব্যগ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। আভরণ-সজ্জায় সজ্জিত হইলে, সেই লোকললামভূত রূপ আবার কত প্রস্ফুটিত হয়, দেখুন;—

"সা সম্ভবদ্ভিঃ কুসুমৈর্লতেব জ্যোতির্ভিরুদ্যদ্ভিরিব ত্রিযামা।
সরিদ্বিহঙ্গৈরিব লীয়মানৈরামুচ্যমানাভরণা চকাশে।"

'কুসুমোদ্গমে লতার যেমন সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি হয়, নক্ষত্রাভরণে রাত্রি যেমন শোভমানা হয়, চক্রবাকাদি বিহঙ্গম-সমাগমে তরঙ্গিণীর যেমন শোভা বৃদ্ধি হয়, আভরণ-সজ্জায় পার্ব্বতীর সৌন্দর্য্য তদ্রূপ প্রস্ফুটিত হইয়াছিল।' এই উপমায় ত্রিবিধ স্বাভাবিক শোভার উল্লেখে কবি দেখাইলেন, পার্ব্বতীর স্বভাবসুন্দর দেহে অলঙ্কারগুলিও স্বভাবসুন্দর-রূপে শোভমান হইয়াছিল। ইহার পর, কবির অনুপম তুলিকার অনুপম চিত্র—তপোবনে বসন্ত-বিকাশ। ষোড়শ শ্লোকে (তৃতীয় সর্গের ২৪শ হইতে ৪০শ শ্লোক দ্রষ্টব্য) এই বসন্ত-বর্ণনা এমন সুন্দর পরিস্ফুট হইয়া আছে যে, ঋতুরাজ যেন পাঠকের চক্ষের উপর বিরাজমান রহিয়াছেন। মলয়ানিল

প্রবাহিত। অশোক-তরু পল্লব-পুষ্পে সুশোভিত। নবীন-পল্লব-মধ্যস্থিত চূতাঙ্কুরে ভ্রমর-পংক্তি বিন্যস্ত হইল। কর্ণিকার পুষ্প, গন্ধশূন্য হইয়াও, বর্ণশোভায় দিক্ পুলকিত করিয়া তুলিল। স্ফুটনোন্মুখ পলাশ-পুষ্প বনস্থলী-রূপ নায়িকার অঙ্গে বসন্তসমাগমে নখ-ক্ষতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তিলক-পুষ্প-সংলগ্ন ভ্রমরপংক্তি বসন্তলক্ষ্মীর অঞ্জনের ন্যায় শোভা পাইল; আর, তাঁহার চূত-প্রবাল-রূপ ওষ্ঠ, লাক্ষা-রস-সন্নিভ বালারুণ-কিরণে অনুরঞ্জিত হইল। পিয়াল-তরু-মঞ্জরীর পরাগ-কণা-সমূহ মদমত্ত হরিণীগণের নেত্রে নিপতিত হওয়ায় তাহারা সমীর-প্রবাহের বিপরীত দিকে প্রধাবিত হইতে লাগিল। নবোদ্গত চূতাঙ্কুর আস্বাদে কণ্ঠস্বর মধুরতর হইলে পুংস্কোকিলগণ মধুরস্বরে মানিনী রমণীগণকে মান পরিত্যাগে বাধ্য করিল। ভ্রমর-ভ্রমরীগণ পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে মধুপান করিয়া, পরস্পর পরস্পরের অনুগমন করিতে লাগিল। মৃগগণ শৃঙ্গ-দ্বারা মৃগীগণের গাত্র কণ্ডূয়ন করিলে, উহারা স্পর্শ-সুখে নয়ন নিমীলন করিয়া রহিল। পদ্মপরাগ-সুরভিত সরোবর-সলিল গণ্ডূষে গ্রহণ করিয়া করিণীগণ করিবরের গাত্রে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মৃণালার্দ্ধভাগ ভক্ষণানন্তর অপরার্দ্ধভাগ লইয়া চক্রবাক্ চক্রবাকীকে সাদরে প্রদান করিল। কিন্নর-কিন্নরীগণ সঙ্গীতে প্রবৃত্ত হইয়া নানাভাবে প্রেমাবেশে পরস্পর বিভোর হইয়া পড়িল। কেবল জীবজন্তু বলিয়া নহে,—বসন্ত-সমাগমে উদ্ভিজ্জগণেরও ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পাইল। পুষ্পস্তবক-রূপ স্তন-বিশিষ্ট পল্লব-রূপ ওষ্ঠ-সম্বলিত লতাবধূ-সকল আনত-শাখা-রূপ বাহু-দ্বারা তরুদিগকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। কবি এইরূপে বসন্ত-সমাগমের যে বর্ণনা করিয়াছেন, সংক্ষেপে আমরা তাহা বিবৃত করিলাম বটে; কিন্তু ঐ বর্ণনার মধ্যে যে কি কবিত্ব কি কৃতিত্ব কি অলঙ্কার কি উপমার সমাবেশ আছে, তাহার কিছুই দেখাইতে পারিলাম না। 'মলয়ানিল প্রবাহিত'—এই একমাত্র উক্তি কবির কাব্যে কিরূপভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা বুঝাইতেছি। তাহাতে আলোচ্য বিষয়ের কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারিবে। ঐ সম্বন্ধের শ্লোকটী এই,—"কুবেরগুপ্তাং দিশমুষ্ণরশ্মৌ গন্তুং প্রবৃত্তে সময়ং বিলঙ্ঘ্য। দিগ্ দক্ষিণা গন্ধবহং মুখেন ব্যলীকনিশ্বাসমিবোৎসসর্জ্জ॥" অর্থাৎ,—'উষ্ণরশ্মি সূর্য্যদেব, কুবের যে দিকের অধিপতি, সেই উত্তর দিকের প্রতি গমনোদ্যত হইয়া অসময়ে দক্ষিণ দিককে পরিত্যাগ করিলেন, তাহাতে দক্ষিণ-দিক অকারণে পরিত্যক্ত মহিলার ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস-রূপ মলয়-বায়ু আপন মুখ হইতে পরিত্যাগ করিল।' এ বঙ্গানুবাদেও ঠিক ভাবগ্রহণ হইল না। এই শ্লোকের ভাবগ্রহণ করিতে হইলে, সংস্কৃত 'দিক্' শব্দ যে স্ত্রীলিঙ্গ, তাহা স্মরণ করিতে হইবে। সূর্য্য উষ্ণপ্রকৃতি-সম্পন্ন। তাঁহার উষ্ণ-প্রকৃতি ক্রোধ সূচনা করিতেছে। অর্থাৎ, তিনি যেন অকারণে ক্রোধান্বিত হইয়া স্বনায়িকা দক্ষিণ-দিককে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়াছেন, এবং কুৎসিত পুরুষ কুবেরের রক্ষিতা উত্তর-দিকের প্রতি আসক্ত হইয়া উত্তরায়ণে উত্তরদিকে চলিয়া পড়িতেছেন। আর, তাহাতে তদনুগত-প্রাণা দক্ষিণ-দিক ক্ষোভে বিষাদে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। সেই দীর্ঘনিশ্বাসই—মলয়-পবন। এই উপমায় সূর্য্যের দক্ষিণায়ন পরিত্যাগ করিয়া উত্তরায়ণে অগ্রসর হওয়ার ভাব জ্ঞাপন করিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ দিক হইতে মলয় বায়ু প্রবহ-

মান হওয়ার বিষয় অনুভূত হইতেছে; পরন্তু নায়িকার দীর্ঘনিশ্বাসের প্রসঙ্গে বসন্ত-সমাগমে মলয়-বায়ু-সঞ্চারে প্রেমিক-প্রেমিকার অনুরাগ-বৃদ্ধির ভাব বুঝাইতেছে। এইরূপ বসন্তবর্ণনা-সংক্রান্ত প্রতি শ্লোকটীর মধ্যেই নানা ভাব নানা উপমা সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। কর্ণিকার পুষ্প শোভার আধার—নয়ন প্রীতিকর; কিন্তু তাহাতে সদ্গন্ধের অভাব। সেই বর্ণনায় কবি কেমন একটী নিত্য-সত্য কীর্ত্তন করিয়া গেলেন; কহিলেন,—"প্রায়েণ সামগ্র্যবিধৌ গুণানাং পরাঙ্মুখী বিশ্বসৃজঃ প্রবৃত্তিঃ।" অর্থাৎ,—'বিধাতা প্রায়ই কোনও দ্রব্যকে সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন করিয়া সৃষ্টি করেন নাই।' চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, অমৃতে হলাহল আছে,—বিধাতার সৃষ্টির ইহাই মূল নীতি। যাহা হউক, এই চিত্তচাঞ্চল্যকর বসন্ত-সমাগমে মহাযোগী মহেশ্বর কিরূপ অচঞ্চল ছিলেন, একটী শ্লোকে কবি কেমন সুন্দর বুঝাইলেন। শ্লোকটি এই,—

"অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহমপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্।
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধান্নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্॥"

বসন্ত-সমাগমে প্রকৃতি যতই চঞ্চল হউক, কিন্তু মহাদেব অচঞ্চল। তাঁহার দেহমধ্য-স্থিত বায়ু-প্রবাহ নিরুদ্ধ। তিনি যেন বৃষ্টির আড়ম্বরশূন্য মেঘ, তিনি যেন তরঙ্গবিরহিত পয়োনিধি, তিনি যেন বায়ুশূন্যস্থানে অবস্থিত নিষ্কম্প প্রদীপ। যোগাসনে সমাসীন অবস্থা—এ উপমায় কি সুন্দর অভিব্যক্ত। কুমারসম্ভবের আর এক প্রধান বর্ণনীয় বিষয়—রতি-বিলাপ। মহাদেবের রোষানলে মদন ভস্মীভূত হইলে, পতিশোকাতুরা রতির খেদোক্তি বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। পতি-বিরহে চিতা রচনার প্রার্থনা জানাইয়া পতি-শোকাতুরা রতি কি আকুল ভাব প্রকাশ করিয়াছেন! বসন্তকে সম্বোধন করিয়া রতি বলিতেছেন,—

"শশিনা সহ যাতি কৌমুদী সহ মেঘেন তড়িৎ প্রলীয়তে।
প্রমদাঃ পতিবর্ত্মগা ইতি প্রতিপন্নং হি বিচেতনৈরপি॥" *

অর্থাৎ,—'জ্যোৎস্না চন্দ্রের সহিত, সৌদামিনী মেঘের সহিত তিরোহিত হয়। অচেতন বস্তু-বৃন্দও এই নিয়মের অধীন। পতির অনুগমন করাই আমার একান্ত কর্ত্তব্য।' এই বলিয়া রতি চিতা-রচনার জন্য পুনঃপুনঃ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আরও কহিলেন,—'হে ঋতুরাজ! তুমি কুসুম-শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিয়া আমাদের আনন্দের সহায়তা করিয়া আসিয়াছ। এখন কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছি,—তুমি চিতা রচনা করিয়া দিয়া, সেই আনন্দ প্রদান কর। মদন আমা ভিন্ন সুখী হইবেন না।' ইহার পর, পার্ব্বতীর তপশ্চারণা, বিবাহ-সম্বন্ধ, শিব-সহ মিলন—প্রতি চিত্রই জীবন্ত, জলন্ত, দিব্য-প্রভাবিশিষ্ট। মহাদেবকে লাভ করিবার জন্য পার্ব্বতী কি কঠোর তপশ্চারণাই করিয়াছিলেন! গ্রীষ্মে চতুঃপার্শ্বে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া সূর্য্যের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতেন। প্রাবৃটের প্রবল বর্ষণ

* জনৈক ইংরেজ লেখক কালিদাসের এই শ্লোকটী এইরূপভাবে অনুবাদ করিয়াছেন,—

"After the Lord of Night the moon-light goes,
Along with the cloud the lightening is dissolved,
Wives ever follow in their husband's path,
Even things bereft of sense obey this law."

তাঁহার মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া যাইত। শীতে হিমানীর মধ্যে অবগাহন করিয়া থাকিতেন। পার্ব্বতীর 'অপর্ণা' নামের সার্থকতাও—এই সাধনায়। সাধনার প্রথমে পার্ব্বতী গলিত-পত্র ভক্ষণে জীবন-ধারণ করিয়াছিলেন; শেষে তাহাও পরিত্যাগ করেন। তাই তাঁহার নাম—অপর্ণা। ফলতঃ, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধ্য যে যোগানুষ্ঠানে যোগিগণও পরাঙ্মুখ, পার্ব্বতী সে সাধনায় সমর্থ হইয়াছিলেন। আর, সেই সাধনা-প্রভাবেই যোগেশ্বর মহাদেবকে তিনি পতি-রূপে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার এই সাধনার সময় কত ছলনা কত বিঘ্নই ঘটিয়াছিল! পার্ব্বতীর প্রেম পরীক্ষার জন্য, তাঁহাকে তপস্যায় বিমুখ করিবার জন্য, জটাধারী সন্ন্যাসীর বেশে স্বয়ং মহাদেব পার্ব্বতীর সমক্ষে উপস্থিত হইয়া শিবের নিন্দাবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু পার্ব্বতী সন্ন্যাসী-বেশী শিবকে যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা সতী-শিরোমণি পার্ব্বতীরই উপযুক্ত। সন্ন্যাসীবেশী শিব বলিয়াছিলেন,—'পার্ব্বতীর প্রেমপাত্র শিব অজ্ঞাতজন্মা।' কিন্তু পার্ব্বতী তাহাতে উত্তর দেন, —'যিনি ব্রহ্মাদির সৃষ্টিকর্ত্তা অনাদি ঈশ্বর, তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত কেমন করিয়া জানিবে?' এইরূপ প্রতি কথার উত্তর দিয়া, পার্ব্বতী শেষ বলিয়াছিলেন,—'গুরুজনের নিন্দা শ্রবণেও পাপ হয়। (ন কেবলং মহতোঽপভাষতে শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাগ)। এই বলিয়া পার্ব্বতী সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে উদ্যোগী হন। তখন, পার্ব্বতীর প্রেমের গভীরতা উপলব্ধি করিয়া, মহাদেব আত্মপরিচয় প্রদান করেন। এই সকল কাহিনী অনুপম উপমা-অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। 'কুমারসম্ভবের' বিংশত্যধিক টীকা প্রচলিত আছে; তন্মধ্যে মল্লিনাথের টীকাই সমধিক আদরণীয় হইয়া থাকে। 'উপমা কালিদাসস্য' বলিয়া যে প্রবাদ-বাক্য, তাহার সার্থকতা রঘুবংশে ও কুমারসম্ভবে পত্রে পত্রে দৃষ্ট হয়। পৃথিবীর আর কোনও কবি, কালিদাসের ন্যায় উপমা-সম্পদে সম্পৎশালী নহেন।

ভট্টিকাব্য—মহাকাব্যান্তর্গত অন্যতম গ্রন্থ। ভর্ত্তৃহরি ভট্টিকাব্য প্রণয়ন করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি থাকিলেও, এ মহাকাব্যের প্রণেতা-সম্বন্ধে বহু মতান্তর আছে। যদি ভর্ত্তৃহরি এই কাব্যের রচয়িতা হন, তিনি কোন্ ভর্ত্তৃহরি, তাহার মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা ভর্ত্তৃহরির নামে বিভিন্ন গ্রন্থ চলিয়া আসিতেছে। নীতিশতক, শৃঙ্গারশতক, বৈরাগ্যশতক—গ্রন্থত্রয় তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। আবার, পতঞ্জলি-কৃত মহাভাষ্যের 'বাক্যপ্রদীপ' অভিধেয় একখানি কারিকা তাঁহারই রচিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। তিনি বিদ্বান্ ও সুকবি ছিলেন; মহাভাষ্যের কারিকা প্রণয়ন করেন; প্রধানতঃ এই সকল কারণেই ভট্টিকাব্যের রচয়িতা বলিয়া তিনি অভিহিত হন। আর এক ভর্ত্তৃহরি বৈয়াকরণ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি 'বাক্যপদীয়' ব্যাকরণ গ্রন্থের রচয়িতা। ভট্টিকাব্য তাঁহার রচিত বলিয়াও কেহ কেহ নির্দ্দেশ করেন। তৃতীয় ভর্ত্তৃহরি ৬৫১ খৃষ্টাব্দে লোকান্তরে গমন করেন বলিয়া পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—'রাজা শ্রীধর সেন সেই ভর্ত্তৃহরির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি গুর্জ্জরের বল্লভী রাজন্যবর্গের অন্যতম।' কিন্তু গুর্জ্জরের বল্লভী রাজবংশের যে তালিকা অধুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই তালিকায় খৃষ্টীয়

ভট্টিকাব্য।

সপ্তম শতাব্দীতে শ্রীধর নামধেয় কোনও নৃপতির অস্তিত্ব অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। সেই তালিকায় উক্ত শতাব্দীতে চতুর্থ ধর-সেন নামক জনৈক নৃপতির বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয়। * তিনি ৬৪৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। বোধ হয়, শ্রীধর-সেন ও ধর-সেন এক ব্যক্তি বলিয়াই পরিচিত হইয়া থাকিবেন। ভর্ত্তৃহরিকে ভট্টিকাব্যের প্রণেতা বলিয়া মনে করিলে, পূর্ব্বোক্ত তিন জনের মধ্যে কাহার দাবী প্রবল—স্থির করা সুকঠিন। আবার অস্মদ্দেশে ভট্টিকাব্যের প্রণেতার সম্বন্ধে একটী প্রবল প্রবাদ আছে। ভট্ট নামধেয় জনৈক কবি, ছাত্রগণকে ব্যাকরণ-শাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য ভট্টিকাব্য প্রণয়ন করেন—ইহাই সেই প্রবাদ। ব্যাকরণ-শাস্ত্রের অধ্যাপনা-কালে গুরু-শিষ্য সকলেই সম্মুখে একটী 'গজ' দেখিতে পান। গজদর্শনহেতু এক বৎসর ব্যাকরণ-শাস্ত্রের অধ্যাপনা বন্ধ থাকে। শিক্ষক তখন অভিনব পন্থা অবলম্বনে ভট্টিকাব্য রচনায় ছাত্রগণকে ব্যাকরণ-শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হন। ভট্টের রচিত কাব্য; সুতরাং উহার নাম 'ভট্টিকাব্য' হয়। "ভট্টস্য কৃতিঃ ভট্টিঃ। ততঃ ভট্টিনামকং কাব্যম্ ভট্টিকাব্যম্ অথবা ভট্টিনামঃ কবেঃ কাব্যম্।" ভট্টিকাব্য দ্বাবিংশ সর্গে বিভক্ত। সংক্ষেপে রামায়ণের গল্প এই কাব্যে বিবৃত আছে। কাব্যের মধ্য দিয়া ব্যাকরণ-শিক্ষাদান-পক্ষে এই গ্রন্থে যে পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার তুলনা নাই। বিভক্তি-সংযোগে ক্রিয়াপদের যত প্রকার বিবর্ত্তন সম্ভবপর, তাহার অধিকাংশই এই কাব্যে ছন্দোবন্ধ-মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। আবার প্রকৃতি-প্রত্যয়-যোগে শব্দের কিরূপ অভিনব পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, এই কাব্যে ছন্দের লালিত্যের মধ্যে তাহা পরিদৃশ্যমান্। এমন শব্দ-সম্পৎ—এমন রচনা-চাতুর্য্য অন্যত্র ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। সে হিসাবে, এই গ্রন্থকে সংস্কৃত-ব্যাকরণের একখানি দৃষ্টান্ত-গ্রন্থ বলিলেও বলা যাইতে পারে। কালিদাসের মহাকাব্যের ন্যায় এই গ্রন্থ কবিত্ব-সম্পদে সম্পৎশালী না হইলেও ইহার রচনা-চাতুর্য্য ইহাকে উচ্চ আসন প্রদান করিয়া রাখিয়াছে। ব্যাকরণ-শিক্ষাদান-ব্যপদেশে বিরচিত হইলেও ভট্টিকাব্য কি গুণে মহাকাব্যের অন্তর্ভুক্ত হইল, কাব্যের ও মহাকাব্যের স্বরূপ-নির্দ্দেশে পণ্ডিতগণ তাহার সার্থকতা প্রদর্শন করেন। "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্"—রসাত্মক বাক্য কাব্য-নামে অভিহিত হয়। 'কাব্যপ্রকাশে' † কারিকায় কাব্যের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে;—

"কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতর ক্ষতয়ে,
সদ্যঃ পরনির্বৃতয়ে কান্তাসম্মিতযোপদেশযুজে॥"

অর্থাৎ,—'যশের জন্য, অর্থলাভের জন্য, ব্যবহার-জ্ঞানের জন্য, অনর্থ-নিবৃত্তির জন্য, সদ্যঃ পরমানন্দ লাভের জন্য, কান্তামুখনিঃসৃত উপদেশ লাভের জন্য, কাব্যের আবশ্যকতা।'

* *Cf: History of the Sanskrit Literature* by Arthur A Macdonell M.A, Ph.D. and Mr. Fleet's *Corpus Inscriptionum Indicarum*, Vol. III.

† 'কাব্যপ্রকাশ' ভরতমুনির রচিত বলিয়া প্রচারিত। মম্মটাচার্য্য উহার বৃত্তি প্রণয়ন করেন। মতান্তরে কারিকা ও বৃত্তি উভয়ই মম্মটাচার্য্যের রচিত, তিনি ভরতমুনির অনুসরণে ঐ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কাব্য-প্রকাশ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সমাদৃত হয়। এক সময়ে বঙ্গদেশে কাব্যপ্রকাশের বিশেষ চর্চ্চা ছিল। শ্রীচৈতন্যদেব কাব্যপ্রকাশে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন।

কারিকার এই অর্থ বৃত্তির দ্বারা অধিকতর বিশদীকৃত হইয়াছে। কালিদাসাদি কবি কাব্য-প্রণয়নে যশোভাজন হইয়াছিলেন, ধাবকাদি কবি কাব্য-রচনা করিয়া রাজা শ্রীহর্ষের নিকট ধনলাভ করিয়াছিলেন,—ইত্যাদি দৃষ্টান্ত এই উপলক্ষে উক্ত হইয়া থাকে। বেদের সহিত, পুরাণ ইতিহাসের সহিত, উহার পার্থক্যের বিষয়ও বৃত্তিকার সুন্দররূপে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। বেদ শব্দপ্রধান, পুরাণাদি অর্থপ্রধান, * কিন্তু কাব্য শব্দার্থ পরিত্যাগ করিয়া কান্তার ন্যায় মধুর ভাষে ইষ্টানিষ্ট উপদেশ প্রদান করে। কাব্যে শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় পুরুষের আদর্শ গ্রহণে এবং রাবণের ন্যায় রাক্ষসের প্রতি ঘৃণা-প্রকাশে শিক্ষা দেয়। ইহসংসারে তাই কাব্যের উপযোগিতা। পদ্যময় কাব্য দ্বিবিধ, খণ্ডকাব্য ও মহাকাব্য। 'সাহিত্যদর্পণ' † অলঙ্কার-গ্রন্থ মহাকাব্যের লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন,—"সর্গবন্ধো মহাকাব্যং তত্রৈকো নায়কঃ সুরঃ। সদ্বংশঃ ক্ষত্রিয়ো বাপি ধীরোদাত্তগুণান্বিতঃ।

ইতিহাসোদ্ভবং বৃত্তমন্যদ্বা সজ্জনাশ্রয়ম্। আদৌ নমস্ক্রিয়াশীর্ব্বা বস্তুনির্দ্দেশ এব বা।

কবের্বৃত্তস্য বা নাম্না নায়কস্যেতরস্য বা। নামাস্য সর্গোপাদেয় কথয়া সর্গনাম তু।"

এই লক্ষণানুসারে দ্বাবিংশ সর্গে নিবদ্ধ-হেতু ভট্টিকাব্য মহাকাব্য মধ্যে পরিগণিত। সদ্বংশজ ক্ষত্রিয় ধীরোদাত্তগুণান্বিত শ্রীরামচন্দ্র এই মহাকাব্যের নায়ক, সুতরাং ভট্টিকাব্য—মহাকাব্য। রামায়ণ-রূপ ইতিহাস অবলম্বনে ইহার চরিত্র-চিত্র অঙ্কিত, সুতরাং ইহা মহাকাব্য। দশরথ নৃপতির নামোল্লেখে গ্রন্থারম্ভ-হেতু বস্তু-নির্দ্দেশ বশতঃ ইহা মহাকাব্য। আর, কবির নামে গ্রন্থের নামকরণ হওয়াতেও ইহা মহাকাব্যের লক্ষণান্তর্ভুক্ত। সৎকাব্য-পাঠে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ লাভ হয়, বিবেক-জ্ঞানের এবং কলাবিদ্যার উৎকর্ষ সাধিত হয়, কীর্ত্তি ও প্রীতি লাভ করা যায়। "ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বৈচক্ষণ্যম্ কলাসু চ। করোতি কীর্ত্তিং প্রীতিঞ্চ সাধুকাব্যনিষেবণম্॥" এ লক্ষণ অনুসারেও ভট্টিকাব্যকে উচ্চশ্রেণীর মহাকাব্য মধ্যে গণ্য করা হইয়া থাকে। কবি প্রথম শ্লোকের প্রথম অক্ষরে ভগবানের নাম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া এই মহাকাব্যের উৎকর্ষ সূচিত হয়। "অভূন্নৃপো বিবুধসখঃ পরন্তপঃ, শ্রুতান্বিতো দশরথ ইত্যুদাহৃতঃ। গুণৈর্বরং ভুবনহিতচ্ছলেন যং, সনাতনঃ পিতরমুপাগমৎ স্বয়ম্॥" এই শ্লোকের প্রারম্ভে 'অভূৎ' শব্দে যে 'অ'কার, উহা বিষ্ণুর উদ্দেশে। (অ-কারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্ট ইতি) সুকৌশলে সুবিন্যস্ত হইয়াছে। কাব্যের প্রারম্ভে এইরূপভাবে ভগবৎ-স্মৃতি জাগরূক করার চেষ্টায় কাব্যের সার্থকতা খ্যাপন করিতেছে। শ্লোকের প্রতি শব্দের এইরূপ সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। প্রথম ছন্দোবন্ধে লক্ষ্য করিলে যতি-পতনের এক অভিনব পদ্ধতি দেখিতে পাই। 'রুচিরাবৃত্তম্' ছন্দে শ্লোকটী লিখিত। ত্রয়োদশ অক্ষরে উহার এক একটী অংশ এবং প্রতি চতুর্থ ও ত্রয়োদশ

* বৈদিক মন্ত্রাদি যথাযথ উচ্চারণ করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। বিবাহাদিতে মন্ত্রই উচ্চারিত হয়। উহার অর্থ বা ভাবপ্রকাশে কার্য হয় না। তাই বেদ শব্দ প্রধান। পুরাণাদি শাস্ত্রের ব্যাখ্যা হয়, সুতরাং উহা অর্থ প্রধান অর্থাৎ ভাব প্রকাশক।

† সাহিত্যদর্পণ সংস্কৃত ভাষার প্রসিদ্ধ অলঙ্কার গ্রন্থ। বিশ্বনাথ কবিরাজ উহার রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। বঙ্গদেশে সাহিত্যদর্পণের বিশেষ আদর।

অক্ষরে যতি। পাঠে শব্দের ঝঙ্কারে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হয়। শ্লোকের সরলার্থ,—'দশরথ নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি দেবগণের সুহৃৎ, তাঁহার বন্ধুত্বে দেবগণ প্রীত হন। তিনি বীরত্বে শত্রুগণকে সর্ব্বদা সন্তপ্ত রাখিতেন। তিনি বেদাদি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি নানাগুণে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। সেইজন্য সনাতন ভগবান ভুবনহিত-ব্যপদেশে তাঁহার পুত্র-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।' ইহাই স্থূল অর্থ বটে; কিন্তু শ্লোকের এক একটী শব্দ-সমাবেশে কতই ভাব প্রস্ফুটিত হইয়াছে। 'বিবুধসখঃ' শব্দ কত ভাবদ্যোতক। টীকাকারগণ তাহা এইরূপে বুঝাইয়া থাকেন,—'বিবুধ' শব্দে সর্ব্বাভিজ্ঞ (বিবুধ্যন্তে সম্যক্ জানন্তীতি বিবুধাঃ) বুঝায়। দেবগণ সর্ব্বাভিজ্ঞ। সুতরাং বিবুধ শব্দে দেবগণকে নির্দ্দেশ করিতেছে। আবার দেবগণের মধ্যে ইন্দ্রের প্রাধান্য-হেতু ঐ শব্দে দেবরাজ ইন্দ্রকে বুঝাইয়া থাকে। 'বিবুধ' শব্দের সহিত 'সখা' শব্দের সংযোগে সমপ্রাণতা সূচিত হয়। নৃপতি দশরথ ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত সমপ্রাণ ছিলেন, তাঁহাদের সখার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন—ইহাই 'বিবুধসখঃ' শব্দে বুঝাইয়া দিতেছে। সখা, সুহৃৎ, বন্ধু প্রভৃতি শব্দের মধ্যে যে সামান্য পার্থক্য আছে, এস্থলে তাহারও বিচার হইয়া থাকে। যথা,—"অত্যাগসহনো বন্ধু সদৈবানুমত সুহৃৎ। একক্রিয়ং ভবেন্মিত্রং সমপ্রাণঃ সখাগতঃ॥" প্রতি শব্দের আলোচনা বাহুল্য মাত্র। তবে এইরূপভাবে এক একটী শব্দের সার্থকতার বিষয় আলোচনা করিয়া এই গ্রন্থ পাঠে অগ্রসর হইলে সংস্কৃত-সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি-লাভে বিশেষ সহায়তা করে, তাহাতে সংশয় নাই। আর সেই উদ্দেশ্যেই 'ভট্টিকাব্য' রচিত হইয়াছিল।

'কিরাতার্জ্জুনীয়ম্'—মহাকবি ভারবি প্রণীত। কবির নামেও এই মহাকাব্য 'ভারবি' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মহাকবি ভারবি কোন্ সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, তদ্বিষয়ে নানা মত প্রচলিত। কেহ কেহ বলেন,—তিনি মহাকবি কালিদাসের সমসাময়িক। কাহারও মতে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ-শতাব্দীর শেষ-ভাগে তাঁহার বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয়, কারণ, ৬৩৪ খৃষ্টাব্দের একখানি তাম্রফলকে ভারবির উল্লেখ আছে। * আর এক মতে, ভারবি চতুর্থ-শতাব্দীর কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ। ৫০৭ খৃষ্টাব্দে রাজা পুলিকেশীর খোদিত শিলালিপিতে কালিদাসের নামের সহিত ভারবির নাম দৃষ্ট হয়। তাহাতে কালিদাসকে ও ভারবিকে সমসাময়িক চতুর্থ-শতাব্দীর কবি বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়া থাকে। একটী উদ্ভট শ্লোক প্রচলিত আছে। সেই শ্লোকটী এই,—"উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্। নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়োগুণাঃ॥" এই শ্লোকে কালিদাস, ভারবি, নৈষধ ও মাঘ একসঙ্গে উক্ত হইয়াছেন; এজন্য উহাঁদিগকে এক সময়ের কবি বলিয়াও পরিচিত করা হয়। এই সকল কবি প্রায় একই সময়ে (শত বর্ষের মধ্যে) বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া বুঝা যায় বটে; কিন্তু তাহা হইলে, খৃষ্ট-পূর্ব্ব-শতাব্দীতে বা খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে তাঁহারা যে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তাহা

ভারবি ও কিরাতার্জ্জুনীয়।

* "It cannot have been composed later than the sixth century as its author, Bharabi, is mentioned in an inscription of 634 A. D."—*A History of Sanskrit Literature*, by Arthur A Macdonell.

স্বতঃই মনে হয়। কবিত্ব-স্ফুর্ত্তির ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই,—এক এক শ্রেণীর কবি-সম্প্রদায় বিশেষ বিশেষ সময়ে প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়া উঠেন। দৃষ্টান্ত সকল দেশেই দেখিতে পাই। চসার—ইংলণ্ডের আদি-কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার সমসাময়িক ইংলণ্ডীয় অন্যান্য কবিগণের বিষয় অনুধাবন করুন; দেখিবেন,—তাঁহাদের সকলের রচনাই প্রায় এক পথ অনুসরণ করিয়া আছে। লরেন্স মিনো, রিচার্ড রোল, ল্যাংল্যাণ্ড, গাওয়ার—ইহাঁরা সকলেই চসারের সমসাময়িক। রচনার সাদৃশ্য ইহাঁদের মধ্যে বেশ উপলব্ধি হয়। সেক্সপিয়ার যখন প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন, তাঁহার পার্শ্বে তৎশ্রেণীর বহু কবি উদ্ভূত হইয়াছিলেন। মিল্টনের অভ্যুদয়-কালেও ঐ শ্রেণীর কবিত্ব বিকাশ-প্রাপ্ত হয়। আমাদের দেশে—এই বঙ্গদেশে এতদ্দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কৃত্তিবাস-কাশীদাসের সময়ে, বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের সময়ে, বৈষ্ণব কবিগণের সময়ে, এক এক শ্রেণীর কবিত্ব-কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। এই সকল বিষয় অনুধাবন করিলে, কালিদাস প্রভৃতি যে একই সময়ে—অন্ততঃ এক শতাব্দীর মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। উহাঁদের মহাকাব্যের আলোচ্য বিষয় প্রায় একরূপ,—রামায়ণ-মহাভারতের ঘটনা-বিশেষ লইয়াই উহাঁরা আপন-আপন মহাকাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। রচনার মধ্যে কাহারও বা কবিত্ব, কাহারও বা অর্থগৌরব, কাহারও বা পদ-লালিত্য বিকাশ পাইয়াছে। কালিদাসের কল্পনা-কুসুম কবিত্ব-সৌন্দর্য্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ভারবি ভাব-সম্পদে ও ভাষার গৌরবে স্পর্দ্ধান্বিত। কিরাতার্জ্জুনীয় ভিন্ন ভারবির অন্য রচনা সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু কিরতার্জ্জুনীয়েই ভারবির গুণপনা অপ্রতিহত। "কিরাতার্জ্জুনীয়ের" উপাখ্যান-ভাগ মহাভারত হইতে পরিগৃহীত। দ্যুত-ক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া পাণ্ডবগণ বনবাসী হইয়াছেন। দ্রৌপদী তাঁহাদিগকে সন্ধি-সর্ত্ত ভঙ্গ করিবার জন্য উৎসাহিত করিতেছেন। ভীম, দ্রৌপদীর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন; কিন্তু যুধিষ্ঠির সত্য-ভঙ্গ-ভয়ে ভীত হইয়াছেন। ইত্যবসরে ব্যাসদেব দ্বৈতবনে পাণ্ডব-সমীপে উপনীত হইলেন। বিরোধ-ভঞ্জন হইল। তিনি 'পাশুপত-অস্ত্র'-লাভের জন্য অর্জ্জুনকে মহাদেবের তপস্যায় উদ্বুদ্ধ করিলেন। ভ্রাতৃগণের নিকট হইতে বিদায়-গ্রহণে অর্জ্জুন কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। 'কুমার-সম্ভবে' পার্ব্বতীর যে তপস্যা দেখিয়াছি, অর্জ্জুনের তপস্যাও সেইরূপ কঠোর কৃচ্ছ্রসাধ্য। সে তপস্যায় দেবগণ পর্য্যন্ত বিচলিত হইলেন। কি জানি তপস্যার প্রভাবে অর্জ্জুন ইন্দ্রত্বই বা লাভ করেন!—এই আশঙ্কায়, অর্জ্জুনের তপোভঙ্গের জন্য স্বর্গ হইতে অপ্সরীগণ প্রেরিত হইলেন। তাঁহারা মোহনীয় বেশে কুসুম-ভূষণে বিভূষিত হইয়া অর্জ্জুনকে মুগ্ধ করিবার চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু অর্জ্জুন কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। অপ্সরীগণ বিফল-মনোরথ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে যোগিবেশ ধারণ করিয়া, অর্জ্জুনের নিকট আসিয়া, স্বয়ং ইন্দ্র ছলনা দ্বারা অর্জ্জুনের তপস্যাভঙ্গের চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু অর্জ্জুন অচঞ্চল—দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি কিছুতেই তপস্যায় বিরত হইলেন না। অবশেষে, সকল প্রলোভন ব্যর্থ হইল দেখিয়া একজন বৃদ্ধ কিরাতের বেশে স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব অর্জ্জুনকে ছলনা করিতে আসিলেন। এই সময়ে একটি প্রকাণ্ড বন্য-বরাহ অর্জ্জুনকে

উপাখ্যানাংশ।

আক্রমণ করে। বাণাঘাতে সেই বরাহ নিহত হয়। অর্জ্জুন এবং কিরাত-বেশী মহাদেব উভয়েই বরাহের প্রতি বাণ-নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু কাহার বাণে বরাহ নিহত হইল, তখন এই বিতর্কে বিবাদ বাধিল। কিরাত-বেশী মহাদেব কহিলেন,—'এ বরাহ আমার বাণে বিদ্ধ হইয়া নিহত হইয়াছে।' অর্জ্জুন কিন্তু তাহা স্বীকার করিলেন না। এই সূত্রে পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধে প্রতি পদে অর্জ্জুনের বীরত্ব প্রকাশ পাইল। মহাদেব সে বীরত্বে বিস্মিত হইলেন। তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া, তাঁহার নাম স্মরণে, অর্জ্জুন যে বীরত্ব দেখাইলেন, মহাদেবের তাহাতে আনন্দের অবধি রহিল না। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে 'পাশুপত অস্ত্র' প্রদান করিলেন। সেই অস্ত্র-সাহায্যেই অর্জ্জুন উত্তর-কালে পাণ্ডবগণের নষ্ট-রাজ্য নষ্ট-গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 'কিরাতার্জ্জুনীয়' মহাকাব্যের ইহাই গল্পাংশ। এই কাব্যের মধ্যে অর্জ্জুনের তপস্যার এবং তাঁহার প্রতি ছলনা প্রভৃতির বর্ণনা অতুলনীয়। অর্জ্জুনের তপস্যায় ও তাঁহার তপোভঙ্গের চেষ্টায় 'কুমার-সম্ভবের' পার্ব্বতীর তপস্যার ও তপোভঙ্গের চেষ্টার যদিও ছায়াপাত দেখিতে পাই; কিন্তু ভারবির এ বর্ণনার মৌলিকত্ব কখনই স্মৃতিপট হইতে বিলুপ্ত হইবার নহে। ভারবির হিমালয়-বর্ণনা ও শরদ্বর্ণনা—স্বাভাবিক ও মনোহর। তিনি হিমালয়-শিখরে বসিয়া এই মহাকাব্য প্রণয়ন করেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে। বর্ণনায় তাঁহার প্রত্যক্ষ-দর্শনের বিষয়ই উপলব্ধি হয়। গুরুগৃহে অবস্থান-কালে, গুরুর হোমধেনু রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া, ভারবি প্রতি দিন হিমালয়-পাদমূলে গোচারণ করিতে যাইতেন। সেই সময় ভারতের অতীত ইতিহাসের কথা তাঁহার স্মৃতি-পটে প্রতিভাত হইত। ধেনু-সকল ইতস্ততঃ আহারে প্রবৃত্ত হইলে ভারবি নিভৃতে শৈল-শৃঙ্গে উপবেশন করিয়া ভূর্জ্জপত্র লইয়া কবিতা লিখিতেন। সেই কবিতা-সমষ্টি পরিশেষে 'কিরাতার্জ্জুনীয়' মহাকাব্যে পরিণত হয়। হিমালয়ের বর্ণনা যে তাঁহার কাব্যে এত সুন্দর পরিস্ফুট, প্রত্যক্ষদর্শনই তাহার কারণ। ভারবি ভাষাসম্পদে ও শব্দ-সম্পদে অসাধারণ সম্পৎশালী ছিলেন। ভাষা যেন তাঁহার ক্রীড়ার সামগ্রী—শব্দ যেন তাঁহার ক্রীড়নক। 'কিরাতার্জ্জুনীয়' মহাকাব্যে তিনি কত প্রকার ছন্দোবন্ধের সমাবেশ করিয়া গিয়াছেন, এবং তাহাতে তাঁহার যাদৃশী শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। কয়েকটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি; তাহাতে শব্দে ও ভাষায় কবির কত-দূর অধিকার ছিল, কতকটা উপলব্ধি হইবে। 'একাক্ষর' ও 'একাক্ষরপাদ' ছন্দে যথাক্রমে সম্পূর্ণ শ্লোকে এক অক্ষর এবং শ্লোকের এক এক পাদে এক এক অক্ষর ব্যবহৃত। দৃষ্টান্ত,—

ভারবির রচনা চাতুর্য্য।

"ন নোননুন্নোনুন্নোনোনানা নানাননানন্নু।
নুন্নোঽনুন্নোননুন্নেনোনানেনানুন্ননুন্ননুৎ॥"

ইহা একাক্ষর শ্লোক। একমাত্র 'ন' বর্ণের সংযোগে এই শ্লোক বিরচিত। এই শ্লোকের সকলই 'ন'; শেষে একটী মাত্র 'ৎ'। একাক্ষরপাদ শ্লোকের প্রতি পাদে এক এক অক্ষর,—

"স সাসিঃ সাসুসূঃ সাসোয়েয়ায়েয়ায়য়ায়য়ঃ।
ললৌ লোলাং ললোঽলোলঃ শশীশশিশুশীঃ শশন্॥"

এই শ্লোকের পাদ-চতুষ্টয়ে চতুর্ব্বিধ বর্ণ 'স', 'য়', 'ল', 'শ' ব্যবহৃত। 'সমুদ্গক' ছন্দে একই শব্দ-সংগঠিত একই চরণ দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে; অথচ, অর্থ বিভিন্ন। যথা,—

"স্যন্দনানো চতুরগাঃ সুরেভাবা বিপত্তয়ঃ।
সন্দনানো চতুবগাঃ সুরেভাবা বিপত্তয়ঃ॥"

'গোমূত্রিকাবন্ধঃ' ছন্দে প্রথম ও দ্বিতীয় চরণেন মধ্যে প্রথম চরণের প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম প্রভৃতি বর্ণের সহিত দ্বিতীয় চরণেব দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ প্রভৃতি ক্রমে বর্ণের সংযোগ-সাধনে শ্লোকের প্রথম চরণ সংগঠিত হয। আবার এই দুই চরণের দ্বিতীয় চরণ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় চরণের প্রথম ও প্রথম চবণের দ্বিতীয় ইত্যাদি ক্রমে এক একটী বর্ণ বাদ দিয়া পাঠ করিলে দ্বিতীয় চরণ সংগ্রথিত হয়। 'গোমূত্রিকাবন্ধঃ' ছন্দের একটী দৃষ্টান্ত,—

"না সু বো য়ং ন বা না গো ধ র সং স্থো ন রা ক্ষ সঃ।
না সু খো য়ং ন বা ভো গো ধ র ণি স্থো হি রা জ সঃ॥"

প্রথম চবণের প্রথম অক্ষব 'না', দ্বিতীয় চরণের দ্বিতীয় অক্ষর 'সু', প্রথম চরণের তৃতীয় অক্ষর 'রো', দ্বিতীয় চরণের চতুর্থ অক্ষর 'য়ং', প্রথম চরণের পঞ্চম অক্ষর 'ন', দ্বিতীয় চরণের ষষ্ঠ অক্ষর 'বা' প্রভৃতি ক্রমে পাঠ করিলে প্রথম চরণটী প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপ দ্বিতীয় চরণের প্রথম বর্ণ 'না', প্রথম চরণের দ্বিতীয় বর্ণ 'সু', দ্বিতীয় চরণের তৃতীয় বর্ণ 'খো', প্রথম চরণের চতুর্থ বর্ণ 'য়ং' ইত্যাদি ক্রমে পাঠ করিলে দ্বিতীয় চরণ পাইতে পারি। এমনই অভিনব কৌশলে শ্লোকটী বিরচিত হইয়াছে! 'প্রতিলোমানুলোমপাদঃ' ছন্দে এক এক চরণের প্রথম দিক হইতে পাঠ করিলে যে বাক্য হইবে, চরণের শেষ দিক হইতে পাঠ করিলেও সেই বাক্য পাওয়া যাইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ চারিটী চরণ উদ্ধৃত হইল।—

"বেত্রশাককুজে শৈলেঽলেশৈজেঽকুকশাত্রবে।
যাত কিং বিদিশোজেতুং তুংজেশোদিবি কিংতয়া॥
নমু হো মথনাবাধোধোরানাথ মহোমু ন।
তয়দাতবদাভীমামাভীদাবত দায়ত॥"

উপরি-উদ্ধৃত চারি চরণের প্রতি চরণের প্রথম হইতে পাঠ করিলেও যে ভাব, যে ভাষা, যে শব্দ পাওয়া যাইবে শেষ হইতে পাঠ করিলেও সেই ভাব, সেই ভাষা, সেই শব্দ প্রাপ্ত হইবেন। এই শ্রেণীর আব এক শ্লোকে আর এক প্রকার কৃতিত্ব পরিদৃষ্ট হয়। 'প্রতিলোমানু-লোমেন শ্লোকদ্বয়ম্'—আরও অভিনব পদ্ধতিতে নিবদ্ধ। উহার দুইটী শ্লোকের মধ্যে শেষের শ্লোকের শেষ দিক হইতে পাঠ করিলে, প্রথম শ্লোক পাওয়া যাইবে। আবার প্রথম শ্লোকের শেষ চরণের শেষ দিক হইতে পাঠ করিলে দ্বিতীয় শ্লোক পাওয়া যায়।

"নিশিতাসিরতোঽভীকোন্যেজতেঽমরণারুচা।
সারতোন বিরোধী ন স্বাভাসোভরবামুত॥
তমুবারভসোভাস্বানধীরোবিনতোরসা।
চারুণা রমতে জন্যে কোঽভীতোরসিতাশিনি॥"

'অর্দ্ধভ্রমক' ছন্দে বিভিন্ন পাদ কত বিভিন্ন ভাবে সন্নিবিষ্ট আছে! একটী দৃষ্টান্ত, যথা,—

"স স ত্ব র তি দে নি ত্যং
স দ রা ম র্ষ না শি নি
ত্ব রা ধি ক ক সং না দে
র ম ক ত্বং ম ক র্ষ তি॥"

এই শ্লোকের প্রথম চরণটী অর্থাৎ "সসত্বর তিদেনিত্যং" যেমন সর্ব্বপ্রথমে আছে, তেমনই চরণ-চতুষ্টয়ের প্রথম চারি অক্ষরে (উপর হইতে নীচের দিকে পড়িলে) এবং শেষ চারি অক্ষরে (নীচের দিক হইতে পাঠ আরম্ভ করিয়া উপরের দিকে উঠিলে) প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেবল প্রথম চরণ বলিয়া নহে; পর পর প্রত্যেক চরণটী অভিনব-ভাবে সন্নিবিষ্ট। দ্বিতীয় চরণ "সদরামর্ষনাশিনি" চরণ-চতুষ্টয়ের প্রতি চরণের দ্বিতীয় অক্ষর-সমূহে (উপর হইতে নীচের দিকে পড়িয়া গেলে) এবং চরণ-চতুষ্টয়ের প্রত্যেকের সপ্তম অক্ষর-সমূহে (নীচের দিক হইতে উপরের দিকে পাঠ করিলে) নিবদ্ধ রহিয়াছে। তৃতীয় এবং চতুর্থ চরণও ঐরূপ ভাবে চরণ-চতুষ্টয়ের তৃতীয় ও ষষ্ঠ অক্ষর-সমূহে এবং চতুর্থ ও পঞ্চম অক্ষর-সমূহে, উল্লিখিত প্রণালীতে, বিদ্যমান আছে। ভারবিতে এইরূপ আরও বহু ছন্দোবন্ধের অবতারণা দৃষ্ট হয়। দুইটী-মাত্র ব্যঞ্জন-বর্ণে নিবদ্ধ 'দ্ব্যক্ষর' ছন্দের একটী দৃষ্টান্ত,—

"চারচুংচুঃ চিরারেচী চংচচ্চীররুচা রুচঃ।
চচার রুচির চারু চারৈরাচারচংচুর॥"

'মহাযমকম্' ছন্দ; যথা,—

"বি কা শ মী য়ু র্জ গ তী শ মা র্গ ণা
বি কা শ মী য়ু র্জ গ তী শ মা র্গ ণা।
বি কা শ মী য়ু র্জ গ তী শ মা র্গ ণা
বি কা শ মী য়ু র্জ গ তী শ মা র্গ ণা॥"

এই ছন্দোবন্ধে 'বিকাশমীয়ুর্জগতীশমার্গণা' বাক্যটী নানা ভাবে নানা প্রকারে পাঠ করা যাইতে পারে। প্রথম পংক্তির প্রথম বর্ণ, দ্বিতীয় পংক্তির দ্বিতীয় বর্ণ, তৃতীয় পংক্তির তৃতীয় বর্ণ, চতুর্থ পংক্তির চতুর্থ বর্ণ ধরিয়া, তাহার পর চতুর্থ পংক্তির শেষাংশ পাঠ করুন; ঐ চরণ প্রাপ্ত হইবেন। আবার চারি পংক্তির যে কোনও পংক্তির প্রথম অক্ষর ধরিয়া যে দিক দিয়া পাঠ করিবেন, সেই দিক দিয়াই ঐ পংক্তি পাওয়া যাইবে। সর্ব্বতোভদ্র ছন্দ,—

"দে বা কা নি নি কা বা দে
বা হি কা স্ব স্ব কা হি বা
কা কা রে ভ ভ রে কা কা
নি স্ব ভ ব্য ব্য ভ স্ব নি॥"

এই শ্লোকের চারিটী পাদ শ্লোকের মধ্যে নানা ভাবে পাঠ করা যায়। পূর্ব্বোদ্ধৃত 'অর্দ্ধ-ভ্রমক' যে ভাবে পাঠ করার পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে, এ শ্লোক সে পদ্ধতিতেও পাঠ করা যায়; আবার, প্রতি পংক্তির শেষ দিক হইতে পাঠ করিলেও সোজাসুজি পাঠের ফললাভ

হয়। প্রথম দিক হইতে পড়িলেও 'দেবাকানি নিকাবাদে', আবার শেষ দিক হইতে পড়িলেও 'দেবাকানি নিকাবাদে' ইত্যাদি রূপ হয়। এইরূপ আরও বিবিধরূপ ছন্দে বিবিধ কৃতিত্ব বিদ্যমান। তাহা প্রদর্শন করা বাহুল্য মাত্র। 'কিরাতার্জ্জুনীয়' মহাকাব্যে দ্রৌপদীর ও ভীমের উত্তেজনা-বাক্যে হতাশ-প্রাণে উদ্দীপনার সঞ্চার করে। দ্রৌপদী বলিতেছেন,—

"ভবাদৃশেষু প্রমদাজনোদিতং ভবত্যধিক্ষেপ ইবানুশাসনম্।
তথাপি বক্তুং ব্যবসায়য়ন্তি মাং নিরস্তনারীসময়া দুরাধয়ঃ॥
অখণ্ডমাখণ্ডলতুল্যধামভিশ্চিরং ধৃতা ভূপতিভিঃ সবংশজৈঃ।
ত্বয়াত্মহস্তেন মহী মদচ্যুতা মতঙ্গজেন স্রগিবাপবর্জ্জিতা॥
ব্রজন্তি তে মূঢ়ধিয়ঃ পরাভবন্তবন্তি মায়াবিষু যে ন মায়িনঃ।
প্রবিশ্য হি ঘ্নন্তি শঠাস্তথাবিধানসংবৃতাঙ্গানিশিতা ইবেষবঃ॥"

অর্থাৎ,—'ভবাদৃশ গুরুজনের প্রতি অজ্ঞ নারীর বাক্য ভর্ৎসনা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কিন্তু অন্তর এতই বিচলিত হইয়াছে যে, আমি নারীজনোচিত কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া, এই কঠোর বাক্য বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি; তজ্জন্য আমায় ক্ষমা করিবেন। আলস্য পরিহার করুন। পুরুষোচিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হউন। শত্রু-সংহারের উপায় সত্বর উদ্ভাবন করুন। ক্ষমা—সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম হইতে পারে; কিন্তু বলদর্পিত নৃপতির ধর্ম্ম নহে। আত্মগৌরব এবং উচ্চস্পৃহা পরিহার-পূর্ব্বক যদি ক্ষমাই আপনার একমাত্র অবলম্বনীয় হয়, তাহা হইলে সংসারীর কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, যতির ধর্ম্ম অগ্নির উপাসনায় প্রবৃত্ত হউন।' ভীমের বাক্য অনলবর্ষী। দ্রৌপদীর উক্তির পর, ভীম যুক্তিযুক্ত উৎসাহ-পূর্ণ বাক্য কহিলেন,—

"তদলং প্রতিপক্ষমুন্নতেরবলম্ব্য ব্যবসায়বন্ধতাম্।
নিবসন্তি পরাক্রমাশ্রয়া ন বিষাদেন সমং সমৃদ্ধয়ঃ॥"

অর্থাৎ,—'উদ্যোগ ভিন্ন কখনও উন্নতি হয় না। বিনা উদ্যোগে সময়ক্ষেপে কি ফল আছে? যাহার বিক্রম আছে, সম্পৎ তাহারই করতলগত। যে বিষাদকে অবলম্বন করিয়াছে, সে কখনই সম্পদের অধিকারী হইতে পারে না।' এইরূপ উদ্দীপনার ফলে নষ্টরাজ্য পুনরুদ্ধারের প্রয়াস এবং তাহাতে সাফল্যলাভ ঘটিয়াছিল। 'কিরাতার্জ্জুনীয়ম্' মহাকাব্য অষ্টাদশ সর্গে বিভক্ত। প্রতি সর্গের শেষে 'লক্ষ্মী' শব্দ অতি সুকৌশলে সন্নিবিষ্ট। দৃষ্টান্ত, যথা,—

"বাক্যোদিতস্মিতময়ূখবিভাসিতোষ্ঠস্তিষ্ঠন্মুনেরভিমুখং স বিকীর্ণধাম্নঃ।
তন্বন্তমিদ্ধমভিতো গুরুমংশুজালং লক্ষ্মীমুবাহ সকলস্য শশাঙ্কমূর্ত্তেঃ॥"

মাঘ—'শিশুপালবধ' কাব্যের রচয়িতা। কবির নামানুসারে 'শিশুপালবধ' মহাকাব্য 'মাঘ' নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শিশুপাল-বধ—মহাভারতোক্ত এই ঘটনা অবলম্বনে এই কাব্য বিরচিত। 'শিশুপালবধ' মহাকাব্য—বিংশ সর্গে বিভক্ত। কিংবদন্তী আছে—ভারবির প্রভাব নাশ করিবার উদ্দেশ্যে এই মহাকাব্য বিরচিত হইয়াছিল। সে মতে, 'কিরাতার্জ্জুনীয়'-প্রণেতার প্রকৃত নাম ভারবি নহে, এবং 'শিশুপালবধ' মহাকাব্যের প্রণেতার প্রকৃত নামও মাঘ নহে। 'ভারবি' শব্দে 'সূর্য্য—প্রভাবিশিষ্ট' বুঝাইয়া থাকে। 'মাঘ' শব্দে 'শৈত্য—

মাঘ ও শিশুপালবধ।

শ্রুর্য্যপ্রভাববিধ্বংসী' অর্থ সূচিত হয়। ভারবির গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য মাঘ নাম দিয়া এই কাব্য রচিত হইয়াছিল। যাহাই হউক, সে তথ্য নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। 'শিশুপালবধ' কাব্যের উপসংহারে, 'অথ কবিবংশবর্ণনম্' প্রসঙ্গে মাঘের পরিচয় পাওয়া যায়। তদনুসারে তাঁহার পিতার নাম 'দত্তক', পিতামহ 'সুপ্রভদেব'। সুপ্রভদেব—'শ্রীধর্ম্মনাভ' রাজার মন্ত্রী ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। * গুর্জ্জর-দেশে তাঁহাদের বসতি ছিল। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মতে, খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে মাঘ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 'শিশুপালবধ' মহাকাব্যে কবিত্বের ও ভাবুকতার সঙ্গে সঙ্গে ছন্দালঙ্কারের ঘনঘটা দেখিতে পাওয়া যায়। 'শিশুপালবধ' কাব্যের আরম্ভে—কৃষ্ণ-নারদ-সম্ভাষণ। মহর্ষি নারদ ব্যোমপথ হইতে সহসা কৃষ্ণ-সমীপে অবতরণ করিলেন। কি ভাবে, কিরূপ অবস্থায়, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মহর্ষির মিলন হইল, প্রথম সর্গের প্রথমেই কবি তাহার এক উজ্জ্বল চিত্রপট আঁকিয়াছেন।

"শ্রিয়ঃ পতিঃ শ্রীমতি শাসিতুং জগজ্জগন্নিবাসোবসুদেবসদ্মনি।
বসন্ দদর্শাবতরন্তমম্বরাদ্ধিরণ্যগর্ভাঙ্গভুবং মুনিং হরিঃ॥
গতং তিরশ্চীনমনূরুসারথেঃ প্রসিদ্ধমূর্দ্ধজ্বলনং হবির্ভুজঃ।
পতত্যধোধাম বিসারি সর্ব্বতঃ কিমেতদিত্যাকুলমীক্ষিতং জনৈঃ॥
চয়স্ত্বিষামিত্যবধারিতং পুরা ততঃ শরীরীতি বিভাবিতাকৃতিম্।
বিভুর্বিভক্তাবয়বং পুমানিতি ক্রমাদমুং নারদ ইত্যবোধি সঃ॥"

'জগন্নিবাস শ্রীপতি জগৎ-শাসন জন্য বসুদেব-গৃহে আবির্ভূত হইয়াছেন। হিরণ্যগর্ভাঙ্গ-সমুদ্ভূত মুনি সহসা বিমান-পথে অবতরণ করিলেন। চতুর্দ্দিকে তেজোরাশি বিকীর্ণ হইল; যেন ঊর্দ্ধ-শিখাযুত হুতাশন অথবা বক্রগতিবিশিষ্ট তপনদেব ভূতলাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাহা দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য সকলে বিস্মিত হইলেন। প্রথমে তেজোরাশি ছিল; ক্রমশঃ আকার প্রকাশ পাইল। পরিশেষে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বিশিষ্ট পুরুষ-মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। সে মূর্ত্তি—মহর্ষি নারদ। শ্রীপতি নারদকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন।' এইরূপে নারদের আবির্ভাব বর্ণনার পর, কবি তাঁহার রূপচ্ছটা বর্ণনা করিলেন। শরচ্চন্দ্রের ন্যায় তাঁহার কান্তি, কোমল কেশর-দ্যুতি পীত-জটাভার; তাহাতে, তুষারমণ্ডিত হিমগিরি যেন

---

* 'শিশুপালবধ' মহাকাব্যে 'কবিবংশবর্ণনম্' অংশে কবির নিম্নরূপ পরিচয় লিখিত আছে,—

"সর্ব্বাধিকারী সকৃতাধিকারঃ শ্রীধর্ম্মনাভস্য বভূব রাজ্ঞঃ।
আসক্তদৃষ্টির্বিরজাঃ সদৈব দেবোঽপরঃ সুপ্রভদেবনামা॥
কালে মিতং বাক্যমুদর্কপথ্যন্তথাগতস্যেব জনঃ সুচেতাঃ।
বিনানুরোধাৎসহিতেচ্ছয়ৈব মহীপতির্যস্য বচশ্চকার॥
তস্যাভবদ্দত্তক ইত্যুদাত্তঃ ক্ষমী মৃদুর্ধর্ম্মপরস্তনুজঃ।
যং বীক্ষ্য বৈয়াসমজাতশত্রোর্বচোগুণগ্রাহি জনৈঃ প্রতীয়ে॥
সর্ব্বেণ সর্ব্বাশ্রয়ইত্যনন্দমানন্দভাজা জনিতঞ্জনেন।
যশ্চ দ্বিতীয়ং স্বয়মদ্বিতীয়োমুখ্যঃ সতাঙ্গৌণমবাপ নাম॥
শ্রীশব্দরম্যকৃতসর্গসমাপ্তিলক্ষ্ম লক্ষ্মীপতেশ্চরিতকীর্ত্তনচারু মাঘঃ।
তস্যাত্মজঃ সুকবিকীর্ত্তিদুরাশয়াদঃ কাব্যং ব্যধত্ত শিশুপালবধাভিধানম্॥"

ব্রততী-মালায় আবৃত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। মহর্ষির অমলধবল দেহ কৃষ্ণাজিনে আবৃত, কটিতটে পীতমুঞ্জদাম। কবি উপমায় বুঝাইলেন,—বলরামের শ্বেতাঙ্গে যেন পীতবাস বিলম্বিত, অন্তরীয় স্বর্ণ-মেখলায় আবদ্ধ। "সুবর্ণসূত্রাকলিতাধরাম্বরাং বিড়ম্বয়ন্তং শিতিবাসসস্তনুম্।" মুনির শুভ্রদেহে গরুড়ের পক্ষ সম বিস্তৃত উপবীত, নন্দনের স্বর্ণলতার ন্যায় অথবা শরতের মেঘকোলে বিজলীর ন্যায় শোভমান ছিল। "বিহঙ্গরাজাঙ্গরুহৈরিবায়তৈর্হিরণ্ময়োর্ব্বীরুহবল্লিতন্তুভিঃ। কৃতোপবীতং হিমশুভ্রমুচ্চকৈর্ঘনং ঘনান্তে তড়িতাং গুণৈরিব॥" স্ফটিক-নির্ম্মিত জপমালা, তদুপরি বীণাতার-কর্ষণে-লোহিত নখ-প্রভায় যেন অর্দ্ধগ্রথিত প্রবাল-মালার ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। মহর্ষির এবম্বিধ বেশভূষা ও রূপ-বর্ণনার পর শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার মিলনের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। মহর্ষিকে বিমান-পথ হইতে নিম্নে অবতরণ করিতে দেখিয়া পীতাম্বর সিংহাসন হইতে অবতরণ করিলেন। তাহাতে বোধ হইল, যেন গিরি-শৃঙ্গ হইতে বিজলী চমকিল। যথাবিধি পাদ্যঅর্ঘ্যদানে নারায়ণ মহর্ষির অভ্যর্থনা করিলেন। পরস্পরের মিলন হইল। সে মিলন কি সুন্দর!—

'মহামহানীলশিলারুচঃ পুরো নিষেদিবান্ কংসকৃষঃ স বিষ্টরে।
শ্রিতোদয়াদ্রেরভিসায়মুচ্চকৈরচূচুরচ্চন্দ্রমসোঽভিরামতাম্॥
স তপ্তকার্ত্তস্বরভাস্বরাম্বরঃ কঠোরতারাধিপলাঞ্ছনচ্ছবিঃ।
বিদিদ্যুতে বাড়বজাতবেদসঃ শিখাভিরাশ্লিষ্ট ইবাম্ভসাং নিধিঃ॥
রথাঙ্গপাণেঃ পটলেন রোচিষামৃষিত্বিষঃ সংবলিতা বিরেজিরে।
চলৎপলা[illegible]বগোচরাস্তরোস্তুষারমূর্ত্তেরিব নক্তমংশবঃ॥
প্রফুল্লতাপিচ্ছনিভৈরভীষুভিঃ শুভৈশ্চ সপ্তচ্ছদপাংশুপাণ্ডুভিঃ।
পরস্পরেণচ্ছুরিতামলচ্ছবী তদৈকবর্ণাবিব তৌ বভূবতুঃ॥"

'নীলমণি-নিভ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে শুভ্র-কান্তি ঋষিবর উচ্চাসনে উপবেশন করিলে, কি শোভাই বিকাশ পাইল। যেন শ্যাম সন্ধ্যাকালে উদয়াচলে শশধরের উদয় হইল। চন্দ্রের শ্যামিকা-লাঞ্ছনকারী শ্রীকৃষ্ণের শ্যাম অঙ্গে তপ্তকাঞ্চনবৎ পীতবাসে যেন নীলসমুদ্রগর্ভে বাড়বানলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। শ্যামসুন্দরের সেই জ্যোতির্ম্ময় শ্যাম-দেহে মহর্ষির শুভ্রদেহজ্যোতিঃ মিলিত হইয়া, নিশাকালে কম্পিত তরুপত্র-মাঝে জ্যোৎস্নার ন্যায় শোভমান হইল। সপ্তপর্ণ-রেণু-সন্নিভ মহর্ষির শ্বেত-বর্ণের সহিত তমালকুসুমপ্রভ শ্রীকৃষ্ণের শ্যাম-দেহভাতি মিলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব বর্ণ ধারণ করিল।' মহর্ষির আগমনে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া শ্রীপতি তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সেই প্রশ্নের মধ্যে মহর্ষি নারদের চরিত্রের একটী মোহনীয় চিত্র প্রস্ফুটিত দেখি। ভগবান কহিলেন,—"গতস্পৃহোঽপ্যাগমনপ্রয়োজনং বদেতি বক্তুং ব্যবসীয়তে যথা।" 'আপনি নিস্পৃহ; সুতরাং আপনার আগমনের কারণ কি করিয়া জিজ্ঞাসা করি?' আদর্শ ঋষির চরিত্রই এইরূপ! তাহারা স্পৃহাশূন্য, তাঁহাদের নিজের আকাঙ্ক্ষার বিষয় কিছুই নাই। শ্রীহরি তাহা জানিতেন,—তাহা অবগত ছিলেন। তাই অতি সঙ্কোচে তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহার পর মহর্ষি আপনার আগমনের কারণ বিবৃত করেন। হিরণ্যকশিপু ও দশানন যেরূপ

উচ্ছৃঙ্খল হইয়া দেব-দ্বিজের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন, বীরমদে প্রমত্ত হইয়া শিশুপাল সেইরূপ উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার অত্যাচারে দেবগণ বিপন্ন হইয়াছেন। ভগবান বিষ্ণু রাম-নৃসিংহাদি অবতারে যেরূপভাবে রাবণ-হিরণ্যকশিপুর সংহার-সাধন করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ অবতারে সেইরূপভাবে শিশুপালের বিনাশ-সাধন আবশ্যক হইয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্রের অভিপ্রায় অনুসারে দেবকার্য্য-সমাধানোদ্দেশ্যে মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে আগমন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ সমীপে এই কথা ধীর-স্থির-ভাবে মহর্ষি জ্ঞাপন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ দেবগণের আকাঙ্ক্ষা-পূরণে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। শিশুপাল-বধে ভগবানের সম্মতি-লাভান্তে মহর্ষি ব্যোমপথে প্রস্থান করেন। মাঘ-কাব্যের ইহাই প্রথম সর্গ। দ্বিতীয় সর্গে—মন্ত্রণা। বলদেব ও উদ্ধব প্রমুখ আত্মীয়-অন্তরঙ্গগণের সহিত শিশুপাল-বধে শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রণায় দ্বিতীয় সর্গের পরিসমাপ্তি। এই মন্ত্রণার মধ্যে বহু রাজনৈতিক তথ্য বিবৃত এবং বহু নিত্য-সত্য-মূলক বাক্যের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। শত্রুর প্রাবল্য নষ্ট করা সর্ব্বথা প্রয়োজন। এই সম্বন্ধে ঐ সর্গে যে কয়েকটী বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে, সকল বাক্যই বিশেষ উৎসাহ-ব্যঞ্জক। শত্রুর সহিত বর্দ্ধমান রোগের তুলনায় বুঝান হইয়াছে,—ব্যাধিকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে দেওয়া যেমন উচিত নয়, শত্রুকেও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে দেওয়া তেমনই অনুচিত। ধূলিকে পঙ্কে পরিণত না করিয়া জলরাশি যেরূপ কখনই সুস্থির হয় না, সেইরূপ শত্রুকে বিমর্দ্দিত না করিয়া কখনই নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে। এক শত্রু যদি প্রবল হয়, সকল সুখ—সকল শান্তি লোপ করিতে পারে। একা রাহু চন্দ্রমণ্ডল গ্রাস করে। দেবগণও তাহার কোনরূপ প্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হন না।

"বিপক্ষমখিলীকৃত্য প্রতিষ্ঠা খলু দুর্ল্লভা।
অনিত্বা পঙ্কতাং ধূলিমুদকং নাবতিষ্ঠতে॥
ধ্রিয়তে যাবদেকোঽপি রিপুস্তাবৎকুতঃ সুখম্।
পুরঃ ক্লিশ্নাতি সোমং হি সৈংহিকেয়োঽসুরদ্রুহাম্॥"

তৃতীয় সর্গে 'পুরী-প্রস্থান' অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণের গমন-বৃত্তান্ত; চতুর্থ সর্গে রৈবতক-বর্ণন, ষষ্ঠ সর্গে ঋতু-বর্ণন, সপ্তম সর্গে বনবিহার, অষ্টম সর্গে জলবিহার, নবম সর্গে প্রদোষ-বর্ণন, দশম সর্গে সুরথবর্ণন, একাদশ সর্গে প্রত্যুষ-বর্ণন, দ্বাদশ সর্গে প্রয়াণ-বর্ণন, ত্রয়োদশ সর্গে শ্রীকৃষ্ণ-সমাগম, চতুর্দ্দশ সর্গে কৃষ্ণার্ঘ্যদান। ইহার পর শিশুপাল কর্ত্তৃক যদুবংশের নিন্দাবাদ এবং উপসংহারে শিশুপাল-বধ। ভারবির গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য প্রতিযোগিতা-সূত্রে যে এই মাঘ কাব্য বিরচিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ-স্বরূপ

মাঘের রচনা-চাতুর্য্য।

মাঘ-মহাকাব্যে বিবিধ ছন্দ-চাতুর্য্যের অবতারণার বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিরাতার্জ্জুনীয়ের যেমন পঞ্চদশ সর্গ, শিশুপাল-বধের তেমনই উনবিংশ সর্গ ছন্দোবন্ধের সমস্যা-সমাকুল। ঐ স্বর্গে একাক্ষরঃ, একাক্ষরপাদঃ, দ্ব্যক্ষরঃ, গতপ্রত্যাগতম্, যুগ্মম্, প্রতিলোমানুলোমপাদঃ, প্রতিলোমযমকম্, গোমূত্রিকাবন্ধঃ, সমুদ্গঃ, সমুদ্গযমকম্, অর্দ্ধভ্রমকঃ, সর্ব্বতোভদ্রঃ, মুরজবন্ধঃ প্রভৃতি বিবিধ ছন্দের অবতারণা আছে। সে ছন্দোবন্ধ কবির অপূর্ব্ব কৃতিত্ব-কৌশলের পরিচায়ক।

ভারবির ছন্দোবন্ধের দৃষ্টান্ত পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। মাঘেরও কয়েকটী দৃষ্টান্ত এস্থলে প্রকটিত করা যাইতেছে। মাঘ মহাকাব্যে একাক্ষরঃ ছন্দের দৃষ্টান্ত ; যথা,—

"দাদদোদ্দুদ্দদুদ্দাদী দাদাদোদূদদীদদোঃ।
দুদ্দাদং দদদে দুদ্দে দদাদদদদোঽদদঃ॥"

একাক্ষরপাদঃ ছন্দের দৃষ্টান্ত ; যথা,—

"জজৌ জোজা জিজিজ্জাজী তন্ততোঽতিততাতিতুৎ।
ভাভোঽভীভাভিভূভাভূ রারারিররিরীররঃ॥"

'দ্ব্যক্ষরঃ' ছন্দের দৃষ্টান্ত ; যথা,—

"বিভাবী বিভবী ভাভোবিভাভাবী বিবোবিভীঃ।
ভবাভিভাবী ভাবাবোভবাভাবোভুবোবিভুঃ॥
নীলেনানালনলিন নিলীনোল্ললনালিনা।
ললনালালনে নালং লীলালোলেন লালিনা॥"

'যুগ্মম্' ছন্দের দৃষ্টান্ত (এই ছন্দ প্রতিলোমানুলোমপাদঃ ছন্দ নামেও অভিহিত হয়।),—

"বারণাগগভীরা সা সারাঽভীগগণারবা।
কারিতারিবধা সেনা নাসেধা বরিতারিকা॥"

'গতপ্রত্যাগতম্' ছন্দের একটী দৃষ্টান্ত ; যথা,—

"তং শ্রিয়া ঘনয়াঽনস্তরুচা সারতয়া তয়া।
যাতয়া তরসা চারুস্তনয়াঽনঘয়া শ্রিতম্॥"

'প্রতিলোমানুলোমপাদঃ' ছন্দের অপর একটী দৃষ্টান্ত ; যথা,—

"নানাজাববজানানা সা জনৌঘঘনৌজসা।
পরানিহাঽহানিরাপ তান্বিয়াততয়াঽন্বিতা।

'যুগ্মম্' ছন্দের সহিত এই 'প্রতিলোমানুলোমপাদঃ' ছন্দের পার্থক্য এই যে, ইহার চারি পাদের এক এক পাদের শেষ হইতে পড়িলে, সেই সেই পাদের বাক্য পাওয়া যাইবে। যেমন,—"নানাজাববজানানা" ; এ অংশ কি প্রথম দিক হইতে, কি শেষ দিক হইতে—যে দিক হইতেই পাঠ করিবেন, ঐ "নানাজাববজানানা" বাক্য প্রাপ্ত হইবেন। "সা জনৌঘঘনৌজসা", প্রভৃতিতেও ঐরূপ ছন্দোবন্ধ দৃষ্ট হইবে। 'প্রতিলোমযমকম্' ছন্দ ভারবির গ্রন্থে 'প্রতিলোমানুলোমেন শ্লোকদ্বয়ম্' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মাঘে দৃষ্টান্ত,—

"বাহনাজনি মানাসে সারাজাবনমা ততঃ
মত্তসারগরাজেভে ভারীহাবজ্জনধ্বনি।
নিধ্বনজ্জবহারীভা ভেজে রাগরসাত্তমঃ
ততমানবজারাসা সেনা মানিজনাহবা॥"

'গোমূত্রিকাবন্ধঃ' ছন্দের দৃষ্টান্ত ; যথা,—

"প্র ব্র ত্তে বি ক স দ্ধা নং সা ধ নে প্য বি ধা দি ভিঃ।
ধ ব্র বে বি ক স দ্ধা নং দ্ধু ধ্ধ ন্মা প্ল বি ধা ণি ভিঃ॥"

'সমুদ্গঃ' ও 'সমুদ্গযমকম্' ছন্দদ্বয়ের দৃষ্টান্ত ; যথা,—

"সদৈব সম্পন্নবপুরণেষু
স দৈবসম্পন্নবপুরণেষু।
মহোদধেস্তারি মহানিতান্তং
মহোদধেঽস্তারিমহা নিতান্তম্ ॥"

"অয়শোভিদুরা লোকে কোপধ্মামরণাদৃতে।
অয়শোভিদুরালোকে কোপধা মরণাদৃতে ॥"

'সমুদ্গে' ও 'সমুদ্গযমকে' পার্থক্য এই যে, প্রথমোক্তে এক এক চরণের অংশ বা পাদ দুইবার উক্ত হইয়াছে ও তাহাতে দ্বিবিধ অর্থোৎপত্তি ঘটিয়াছে ; এবং শেষোক্তে একই চরণ দুই বার উক্ত হইয়াছে ও তদ্দ্বারা দুই প্রকার অর্থ সূচিত হইতেছে। 'অর্দ্ধভ্রমক' ছন্দ,—

"অ ভী ক ম তি কে নে দ্বে
ভী তা ন ন্দ স্থ না শ নে।
ক ন ৎস কা ম সে না কে
ম ন্দ কা ম ক ম স্থ তি ॥"

'সর্ব্বতোভদ্রঃ' ছন্দের দৃষ্টান্ত ; যথা,—

"স কা র না না র কা স
কা য় সা দ দ সা য় কা
র সা হ বা বা হ সা র
না দ বা দ দ বা দ না ॥"

'মুরজবন্ধঃ' ছন্দের দৃষ্টান্ত ; যথা,—

"সা সে না গ ম না র ম্ভে
র সে না সী দ না র তা।
তা র না দ জ না ম ত্ত
ধী র না গ ম না ম য়া ॥"

এই 'মুরজবন্ধঃ' ছন্দ অর্দ্ধভ্রমকের ন্যায়ও পাঠ করা যায় ; আবার অন্য এক অভিনব পদ্ধতিতেও পঠিত হয়। সে পদ্ধতি,—প্রথম পংক্তির প্রথম, দ্বিতীয় পংক্তির দ্বিতীয়, তৃতীয় পংক্তির তৃতীয়, চতুর্থ পংক্তির চতুর্থ বর্ণ সমূহ পাঠান্তে চতুর্থ পংক্তির পঞ্চম হইতে আরম্ভ করিয়া তৃতীয় পংক্তির ষষ্ঠ, দ্বিতীয় পংক্তির সপ্তম এবং প্রথম পংক্তির অষ্টমাদিক্রমে পাঠ করিলে প্রথম পংক্তি পাওয়া যায়। এইরূপ শেষ পংক্তির প্রথম বর্ণ হইতে ধরিয়া, তৃতীয় পংক্তির দ্বিতীয়, দ্বিতীয় পংক্তির তৃতীয়, প্রথম পংক্তির চতুর্থ ও পঞ্চম, দ্বিতীয় পংক্তির ষষ্ঠ, তৃতীয় পংক্তির সপ্তম ও চতুর্থ পংক্তির অষ্টম বর্ণাদি ক্রমে পাঠ করিলে কবিতার শেষ পংক্তি পাওয়া যায়। এইরূপভাবে কবিতার পংক্তি-চতুষ্টয় বিভিন্নভাবে পাঠ করা যায়,— 'মুরজবন্ধ' ছন্দের ইহাই বিশেষত্ব। মাঘের কবিত্ব-সম্বন্ধে অনেকগুলি উদ্ভট শ্লোক প্রচলিত আছে। একটী শ্লোকে (৩০৭ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) কালিদাস উপমায়, ভারবি অর্থগৌরবে, নৈষধ পদ-লালিত্যে এবং

মাঘ উক্ত ত্রিবিধ গুণেই গুণান্বিত ছিলেন বলিয়া অভিহিত হন। অন্য একটী শ্লোকে পুষ্পের মধ্যে জাতি. নগরের মধ্যে কাঞ্চী, নারীর মধ্যে রম্ভা, পুরুষের মধ্যে বিষ্ণু, নদীর মধ্যে গঙ্গা, নৃপতির মধ্যে রাম এবং কাব্যের মধ্যে মাঘ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত দেখি। যথা,—

"পুষ্পেষু জাতী নগরেষু কাঞ্চী, নারীষু রম্ভা পুরুষেষু বিষ্ণু।
নদীষু গঙ্গা নৃপতৌ চ রামঃ, কাব্যেষু মাঘ কবি কালিদাসঃ॥"

ভোজ-প্রবন্ধ-মতে মাঘ ভোজ-রাজের সমসাময়িক বলিয়া কথিত হন। তাহা হইলে, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে তাঁহার বিদ্যমানতার বিষয় প্রতিপন্ন হয়।

নৈষধ-কাব্য—শ্রীহর্ষ-রচিত। শ্রীহর্ষ নামে বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কান্যকুব্জের অধীশ্বর হর্ষবর্দ্ধন—শ্রীহর্ষ নামে অভিহিত হইতেন। কাশ্মীরাধিপতি হর্ষদেব, শ্রীহর্ষ বলিয়া পরিচিত হন। 'নাগানন্দ' ও 'রত্নাবলী' নাটক-দ্বয়ের রচয়িতা বলিয়া এক শ্রীহর্ষ প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন। বঙ্গাধিপতি আদিশূর যজ্ঞকার্য্য জন্য বঙ্গদেশে যে পাঁচ জন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, তাঁহাদের এক জনের নাম শ্রীহর্ষ। চীন-পরিব্রাজক হুয়েন-সাঙের বর্ণনানুসারে প্রথমোক্ত শ্রীহর্ষ (রাজা শ্রীহর্ষ—হর্ষবর্দ্ধন) খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। আদিশূরের আনীত পঞ্চ-ব্রাহ্মণের মধ্যে যে শ্রীহর্ষের নাম দেখিতে পাই, তিনি শূর-বংশের রাজত্ব-কালে প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন হন। * শ্রীহর্ষ মিশ্র নামক আর এক শ্রীহর্ষের পরিচয় পাই। তিনি 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য' নামক ন্যায়-শাস্ত্র-সংক্রান্ত দার্শনিক গ্রন্থের প্রণেতা। † ইহাঁদের মধ্যে "নৈষধ"-কাব্য কাহার রচিত, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে সাধারণতঃ শেষোক্ত শ্রীহর্ষ মিশ্রই 'নৈষধ'-কাব্যের রচয়িতা বলিয়া অভিহিত হন। আর এক মত প্রবল আছে। সে মতে—'রত্নাবলী' প্রভৃতির প্রণেতার নাম ধাবক। রাজা শ্রীহর্ষ তাঁহাকে অর্থদান করিয়া আপনার নামে ঐ গ্রন্থ লিখাইয়া লন। শত সর্গ বিশিষ্ট 'নৈষধীয়-চরিত' রচনা করিয়া তিনি রাজার নিকট নিষ্কর-ভূমি পুরস্কার স্বরূপ পাইয়াছিলেন বলিয়াও প্রচারিত আছে। যাহা হউক, নৈষধ-রচয়িতা শ্রীহর্ষ ও রত্নাবলী প্রভৃতির রচয়িতা শ্রীহর্ষ অভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। কান্যকুব্জাগত শ্রীহর্ষই যে নৈষধ মহাকাব্যের রচয়িতা,—শ্রীহর্ষ-বিরচিত নৈষধ-মহাকাব্যে (এই মহাকাব্য 'নৈষধীয়-চরিতম্' নামেও অভিহিত হইয়া থাকে) সে পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাতে তাঁহার পিতার নাম ও মাতার নাম জানিতে পারি এবং তিনি আর আর যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহারও আভাস পাই। নৈষধ মহাকাব্যের প্রতি সর্গের উপসংহারে কবির এইরূপ আত্ম-পরিচয় দৃষ্ট হয়,—

শ্রীহর্ষ
ও
'নৈষধ' কাব্য।

"শ্রীহর্ষং কবিরাজরাজিমুকুটালঙ্কারহীরঃ সুতং।
শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মামল্লদেবী চ যম্।"

* আদিশূর সম্বন্ধে অনেক মত আছে। এক মতে, তিনি বিক্রমাদিত্যেরও পূর্ব্ববর্ত্তী, অন্য মতে, তিনি নবম শতাব্দীর লোক ছিলেন। এই আদিশূর সংক্রান্ত আলোচনা "পৃথিবীর ইতিহাসের" দ্বিতীয় খণ্ডের ২৪৪ম—২৪৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† আদিশূর-আনীত শ্রীহর্ষকে এবং এই শ্রীহর্ষকে কেহ কেহ অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন।

এই প্রকার আত্ম-পরিচয়ের মধ্যে কবির কয়েকখানি গ্রন্থের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা,—'নবসাহসাঙ্কচরিত', 'অর্ণববর্ণন', 'বিজয়প্রশস্তি', 'গৌড়োর্ব্বীশকুলপ্রশস্তি', 'ছিন্দপ্রশস্তি', 'শিবশক্তিসিদ্ধি', 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য' প্রভৃতি। * কান্যকুব্জাধিপতির রাজত্বে তাঁহাদের বসতি ছিল এবং কান্যকুব্জাধিপতির নিকট তিনি সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, গ্রন্থ শেষে (দ্বাবিংশ সর্গের উপসংহারে) একটী শ্লোকে, তাহা দেখিতে পাই। শ্লোকটী এই,—

"তাম্বুলদ্বয়মাসনঞ্চ লভতে যঃ কান্যকুব্জেশ্বরা-
দ্যঃ সাক্ষাৎকুরুতে সমাধিষু পরং ব্রহ্ম প্রমদার্ণবম্।
যৎ কাব্যং মধুবর্ষি ধর্ষিতপরাস্তর্কেষু যস্যোক্তয়ঃ
শ্রীশ্রীহর্ষ কবেঃ কৃতিঃ কৃতিমুদে তস্যাভ্যুদীয়াদিয়ম্॥"

কান্যকুব্জেশ্বরের নিকট সম্মানসূচক তাম্বুল ও আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহাতে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য' ন্যায়-গ্রন্থেও এই শ্লোকটী অবিকল উদ্ধৃত আছে। এই দুই গ্রন্থের উক্ত অংশ পাঠ করিলে উভয় গ্রন্থ একই ব্যক্তির রচিত বলিয়া বুঝিতে সংশয় থাকে না। আরও এক কারণে উভয় গ্রন্থ একই ব্যক্তির রচিত সপ্রমাণ হয়। সে কারণ—উভয় গ্রন্থেই, গ্রন্থকারের একটু অহমিকার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ঐ একটী শ্লোক বলিয়া নহে; 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য' ন্যায-গ্রন্থের প্রারম্ভে গ্রন্থকাব লিখিযাছেন,—

"শব্দার্থনির্ব্বচন খণ্ডনয়ানয়ন্তঃ সর্ব্বত্র নির্ব্বচনভাবমখর্ব্বগর্ব্বান্।
ধীরা যথোক্তমপি কীরবদেতদুক্ত্বা লোকেষু দিগ্বিজয়কৌতুকমাতনুদ্ধং॥"

অর্থাৎ,—'শুক পক্ষীর ন্যায় কেবল মুখস্থ করিয়া গেলেও এই গ্রন্থের সাহায্যে গর্ব্বস্ফীত ব্যক্তির গর্ব্ব খর্ব্ব করা যাইবে।' যাহা হউক, শ্রীহর্ষ যে কান্যকুব্জ হইতে আনীত, এবং বঙ্গেশ্বরের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া, বঙ্গদেশে অবস্থিতিকালে 'নৈষধ'-মহাকাব্য বিরচন করেন, তাহা বিবিধ প্রকারে সপ্রমাণ হয়। নৈষধ-কাব্যে কান্যকুব্জাধিপতির নিকট তাম্বুল-প্রাপ্তির ঘটনার উল্লেখ এবং 'গৌড়োর্ব্বীশপ্রশস্তি' নামক গৌড়েশ্বরের যশোমূলক গ্রন্থের উল্লেখ—এ পক্ষে বিশিষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। গৌড়ে না আসিলে তিনি কখনই গৌড়েশ্বরের গুণকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হন নাই। নৈষধ মহাকাব্যেব তেইশ জন টীকাকারের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সকল টীকাকার—আনন্দরাজানক, ঈশানদেব, উদয়নাচার্য্য, গোপীনাথ, চাণ্ডুপণ্ডিত, চারিত্রবর্দ্ধন, জিনরাজ, নরহরি (নরসিংহ), নারায়ণ, ভগীরথ, ভরত মল্লিক

---

* কয়েকটী বিশেষ বিশেষ সর্গের শেষে আত্মপরিচয়মূলক পংক্তিদ্বয়ের উপসংহারে, কবি গ্রন্থ-সমূহের নাম অতি সুকৌশলে প্রদান করিয়াছেন। যথা—'নবসাহসাঙ্কচরিত' দ্বাবিংশ সর্গে (দ্বাবিংশে নবসাহসাঙ্কচরিতে চম্পূকৃতোঽয়ং মহাকাব্যে তস্য কৃতৌ নলীয়চরিতে সর্গোনিসর্গোজ্জ্বলঃ), অর্ণববর্ণন'—নবম সর্গে (সন্দৃব্ধার্ণববর্ণনস্য নবমস্তস্য ব্যরংসিন্মহাকাব্যে চারুণি নৈষধীয়চরিতে সর্গোনিসর্গোজ্জ্বলঃ), 'বিজয়প্রশস্তি'—পঞ্চম সর্গে (তস্য শ্রীবিজয়প্রশস্তি রচনাতাতস্য নব্যে মহাকাব্যে চারুণি নৈষধীয়চরিতে সর্গোঽগমৎ পঞ্চমঃ), 'গৌড়োর্ব্বীশকুলপ্রশস্তি'—সপ্তম সর্গে (গৌড়োর্ব্বীশকুলপ্রশস্তি ভণিতি ভ্রাতর্যয়ং তন্মহাকাব্যে চারুণি বৈরসেনীচরিতে সর্গোঽগমৎ সপ্তমঃ), 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য'—ষষ্ঠ সর্গে (ষষ্ঠঃ খণ্ডনখণ্ডতোপি সহজাৎক্ষোদক্ষমে তন্মহাকাব্যেঽয়ং ব্যগলন্নলস্য চরিতে সর্গোনিসর্গোজ্জ্বলঃ), 'ছিন্দপ্রশস্তি'—সপ্তদশ সর্গে (যাতঃ সপ্তদশঃ স্বসুঃ সুসদৃশি ছিন্দপ্রশস্তের্মহাকাব্যে তদ্ভুবি নৈষধীয়চরিতে সর্গোনিসর্গোজ্জ্বলঃ।) ইত্যাদি।

(ভরতসেন), ভবদত্ত, মথুরানাথ, মল্লিনাথ, মহাদেব বিদ্যাবাগীশ, রামচন্দ্র শেষ, বংশীবদন শর্ম্মা, বিদ্যাধর, বিদ্যারণ্য যোগী, বিশ্বেশ্বরাচার্য্য, শ্রীদত্ত, শ্রীনাথ ও সদানন্দ। এই সকল টীকাকারের মধ্যে অনেকেই সুপ্রসিদ্ধ। ইহাঁরা এক একজন অনেকানেক গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। কেহ কেহ গ্রন্থ-প্রণেতা বলিয়াও প্রসিদ্ধ। রাজ-শেখরের মতে নৈষধ-প্রণেতা শ্রীহর্ষের জন্মস্থান ৺বারাণসী-ধামে। কিন্তু সাধারণতঃ শ্রীহর্ষ বঙ্গদেশের বলিয়াই পরিচিত আছেন। বুলার প্রমুখ পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মতে 'নৈষধ'-কাব্য-রচয়িতা শ্রীহর্ষের বিদ্যমান-কাল দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্দ্দিষ্ট হয়। মহাভারতোক্ত নলদময়ন্তীর উপাখ্যান অবলম্বন করিয়াই 'নৈষধ' এই কাব্য বিরচিত। রাজা নল নিষাদদিগের অধিপতি ছিলেন। তদনুসারেই কাব্যের নাম—'নৈষধ' হইয়াছে। এই নৈষধ-মহাকাব্য দ্বাবিংশ সর্গে বিভক্ত। গ্রন্থের প্রারম্ভে নলের চরিত্র বর্ণনায় কবি বিবিধ অলঙ্কারের অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম শ্লোক,—

"নিপীয় যস্য ক্ষিতিরক্ষিণঃ কথাস্তাদ্রিয়স্তে ন বুধাঃ সুধামপি।
নলঃ সিতচ্ছত্রিতকীর্ত্তিমণ্ডলঃ স রাশিরাসীন্মহসাং মহোজ্জ্বলঃ॥"

টীকাকারগণ নলের পরিচয় স্বরূপ এই শ্লোক লইয়া কত ভাবেরই বিকাশ করিয়াছেন; সূর্য্যসম প্রভাবসম্পন্ন নল রাজার চরিত্র সুধার অপেক্ষা তৃপ্তিপ্রদ। পণ্ডিতগণ সুধা পরি-ত্যাগ করিয়া এই নল রাজার চরিত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। সে চরিত্র এতই মনোহর! এই শ্লোকের এক একটী শব্দ লইয়া নানারূপ ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। "ক্ষিতিরক্ষিণঃ" শব্দে প্রজাপালন ভাব সূচনা করে, আবার ঐ শব্দে কলিনাশক ভাব উপলব্ধি হয়; অপিচ, 'ক্ষিতিরক্ষিণঃ' শব্দে পাশ-ক্রীড়ায় পারদর্শিতার ভাব মনে আসে। কবি ঐ "ক্ষিতিরক্ষিণঃ" শব্দ ব্যবহার করিয়া নলের নানাবিধ ক্ষমতার আভাস দিয়াছেন। এইরূপ, 'মহোজ্জ্বল', 'সিতচ্ছত্রিত' প্রভৃতি শব্দেও বিবিধ অর্থ সূচিত হয়। কবির শব্দ-ব্যবহারে কৃতিত্বের নিদর্শন স্বরূপ এই সকল শ্লোক উক্ত হইয়া থাকে। দণ্ডী-প্রণীত 'কাব্যাদর্শ'-নামক অলঙ্কার-গ্রন্থে মহাকাব্যের যে সকল লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে, নৈষধে তাহার সকল লক্ষণই নিরাকৃত হয়। 'কাব্যাদর্শের' সূত্রক্রমে (১৪শ—১৯শ সূত্র) রামায়ণ-মহাভারতাদি ইতিহাস-মূলক মহা-কাব্যের অনুসরণে এই গ্রন্থ বিরচিত। গ্রন্থ-কলেবর সুবৃহৎ। নগর, সমুদ্র, পর্ব্বত, সূর্য্যোদয়, ঋতুসমূহ, বিবাহ, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতির বিশদ বর্ণনা উহার অন্তর্নিবিষ্ট।

আর আর প্রসিদ্ধ কাব্য-গ্রন্থের মধ্যে 'হরবিজয়', 'নলোদয়', 'রাঘবপাণ্ডববিজয়', 'নব-শশাঙ্ক-চরিত', 'সেতুবন্ধ' প্রভৃতি প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। 'হরবিজয়' মহাকাব্য—পঞ্চদশ সর্গে বিভক্ত। কবি রত্নাকর ঐ গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি কাশ্মীর-দেশীয়। 'নলোদয়'—কালিদাসের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। নলদময়ন্তীর উপা-খ্যান লইয়া ইহা লিখিত। চারি সর্গে এই কাব্য বিভক্ত। এই কাব্যে বিবিধ ছন্দের প্রবর্ত্তনা দেখিতে পাই। শব্দ-বিন্যাস-আড়ম্বরও ইহাতে প্রচুর দৃষ্ট হয়। 'রাঘবপাণ্ডববিজয়' কাব্য—কবিরাজ নামধেয় জনৈক কবির রচিত। সেই কবি ৮০০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া উক্ত হন। এই কাব্যে এক দিকে রাঘবের বা শ্রীরাম-

অন্যান্য কাব্য-গ্রন্থ।

চন্দ্রের এবং অপর দিকে পাণ্ডবদিগের কার্য্যকলাপ বিবৃত আছে। এরূপ সুবিন্যস্ত শব্দ-চাতুর্য্যপূর্ণ কাব্য এক সংস্কৃত-ভাষা ভিন্ন পৃথিবীর কোনও দেশের কোনও ভাষায় দৃষ্ট হয় না। কবি এমন সুকৌশলে শব্দ-সমাবেশ করিয়াছেন যে, একই শব্দ এক অর্থে পাণ্ডবের এবং আর এক অর্থে রাঘবের কীর্ত্তি-কাহিনী ঘোষণা করিতেছে। শব্দ-সম্পদে এবং বাক্য-সম্পদে এই গ্রন্থ অতুলনীয়। * 'নবশশাঙ্ক-চরিত' গ্রন্থের রচয়িতার নাম—পদ্মগুপ্ত। তিনি খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া পরিচিত। সিন্ধুরাজ নব-শশাঙ্কের কীর্ত্তি-কাহিনী কীর্ত্তন করাই এই মহাকাব্যের উদ্দেশ্য। অষ্টাদশ সর্গে, দেড় সহস্রাধিক শ্লোকে, এই কাব্য সম্পূর্ণ। ঊনবিংশ বিধ ছন্দ এই কাব্যে প্রযুক্ত হইয়াছে। 'সেতুবন্ধ' কাব্য প্রাকৃত ভাষায় লিখিত। উহার অপর নাম—রাবণবধ। শ্রীরামচন্দ্র সেতুবন্ধন করিয়া রাবণ বধ করেন; সেই বৃত্তান্ত অবলম্বনে এই কাব্য বিরচিত। কালিদাসের নামে এই গ্রন্থ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, —কাশ্মীর-রাজ প্রবরসেনের অভিযান উপলক্ষে ইহা লিখিত হইয়াছিল। বিতস্তা নদী পার হইবার সময় যে নৌসেতু গঠিত হয়, তদুপলক্ষে এই কাব্যের 'সেতুবন্ধ' নামকরণ হইয়াছে। অশ্বঘোষ-বিরচিত 'বুদ্ধ-চরিত' মহাকাব্যের বিষয় পূর্ব্বেই (কালিদাস-প্রসঙ্গে ২৮৬ম—২৮৭ম পৃষ্ঠায়) উল্লেখ করিয়াছি। অশ্বঘোষ একজন অশেষ শক্তিশালী কবি ছিলেন। বুদ্ধচরিত ভিন্ন তাঁহার আরও অনেকগুলি গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। অশ্বঘোষ দার্শনিক বলিয়াও প্রতিষ্ঠান্বিত। তিনি দর্শন-শাস্ত্র-সম্বন্ধে পাঁচ খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে 'মহাযানশ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র' প্রধান। অশ্বঘোষ 'পুণ্যাদিত্য' নামেও পরিচিত হন। তাঁহার 'সৌন্দরনন্দ' নামক একখানি মহাকাব্য আছে। যদিও বুদ্ধদেবের জীবন-বৃত্তান্ত ঐ গ্রন্থে পরিবর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু রাজা নন্দ ঐ গ্রন্থের প্রধান নায়ক। তাঁহার নামানুসারেই গ্রন্থের 'সৌন্দরনন্দ' নামকরণ হয়। অধুনা প্রতিপন্ন হইতেছে, —ঐ কাব্য অশ্বঘোষ বিরচিত। 'সৌন্দরনন্দ' কাব্য অষ্টাদশ সর্গে বিভক্ত। এই কাব্যের ভাষা ও ভাব অনেকাংশে 'বুদ্ধচরিত' মহাকাব্যের ভাষা ও ভাবের সহিত সাদৃশ্যসম্পন্ন। অনেক স্থলে, বুদ্ধচরিতের ও সৌন্দরনন্দের ভাষা অভিন্ন বলিয়াও প্রতিপন্ন হয়। ভট্টিকাব্যে যেরূপ ব্যাকরণের কৃতিত্ব দৃষ্ট হয়, সৌন্দরনন্দ কাব্যেও সে দৃষ্টান্ত প্রচুর আছে। এতৎসম্বন্ধে একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতেছে; যথা,—

"অশ্রান্তঃ সময়ে যজ্বা যজ্ঞভূমিমমীমপৎ।
পালনাচ্চ দ্বিজান্ ব্রহ্ম নিরুদ্বিগ্নামমীমপৎ॥
গুরুভির্বিধিবিৎ কালে সৌম্যঃ সোমমমীমপৎ।
তপসা তেজসা চৈব দ্বিষৎসৈন্যমমীমপৎ॥"

এখানে এক 'মা' ধাতু চতুর্ব্বিধ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রথম ছত্রে, 'নির্ম্মাণ করিয়াছিল' অর্থে, দ্বিতীয় ছত্রে 'উচ্চারণ করিয়াছিল' অর্থে, তৃতীয় ছত্রে 'পরিমাণ করিয়াছিল' অর্থে

---

* "A *tour de force* of this kind is doubtless unique in the literatures of the world."
—*A History of the Sanskrit Literature,*

এবং চতুর্থ ছত্রে 'হিংসা করিয়াছিল' অর্থে,—'অমীমপৎ' ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইয়াছে। 'সৌন্দরনন্দ' মহাকাব্য যে উদ্দেশ্যে লিখিত হয়, কবি উপসংহারে তাহা বিবৃত করিয়াছেন,—

"ইত্যেষা ব্যুপশান্তয়ে ন রতয়ে মোক্ষার্থ গর্ভাকৃতিঃ
শ্রোতৃণাং গ্রহণার্থমন্যমনসাং কাব্যোপচরাৎ কৃতা।
যন্মোক্ষাৎ কৃতমন্যদত্র হি ময়া তৎ কাব্য ধর্ম্মাৎ কৃতং
পাতুং তিক্তমিবৌষধং মধুযুতং হৃদ্যং কথং স্যাদিতি ॥"

এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য—নিবৃত্তি-শিক্ষাদান। রতি বা আনন্দ-দানোদ্দেশ্যে ইহা লিখিত হয় নাই। তবে কাব্যাকারে ইহা যে সংগ্রথিত হইয়াছে, ইহার কারণ,—রোগীকে মধু-সংযোগে তিক্ত ঔষধ সেবন করান মাত্র। এই নির্ব্বাণ-মোক্ষের পথে জীবকে অগ্রসর করার উদ্দেশ্যেই কবির 'বুদ্ধচরিত' মহাকাব্যও বিরচিত হয়।

জয়দেব-বিরচিত "গীত-গোবিন্দ"—কাব্য-জগতের আর এক কৌস্তভ-মণি। নবদ্বীপাধিপতি রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে, বর্ত্তমান বীরভূম-জেলার কেন্দুবিল্ব গ্রামে, এই কবির আবির্ভাব হয়। 'গীত-গোবিন্দের' মাধুর্য্য ও প্রাণস্পর্শী ভাব-গাম্ভীর্য অতি-বড় নাস্তিকের বিশুষ্ক প্রাণেও প্রেমের পবিত্র প্রবাহ প্রবাহিত করে। জয়দেবের পিতার নাম ভোজদেব, মাতা বামাদেবী। গ্রন্থের উপসংহারে আত্ম-পরিচয়ে কবি ইহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। 'গীতগোবিন্দের" কবিত্বের বিষয় কীর্ত্তন করিতে হইলে, কবির উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়াই বলিতে হয়,—

শ্রীশ্রীগীত-গোবিন্দ।

"যদ্গান্ধর্ব্বকলাসু কৌশলমনুধ্যানঞ্চ যদ্বৈষ্ণবম্,
যচ্ছৃঙ্গারবিবেকতত্ত্বমপি যৎ কাব্যেষু লীলায়িতম্।
তৎ সর্ব্বং জয়দেবপণ্ডিতকবেঃ কৃষ্ণৈকতানাত্মনঃ,
সানন্দাঃ পরিশোধয়ন্তু সুধিয়ঃ শ্রীগীতগোবিন্দতঃ ॥
সাধ্বীমাধ্বীকচিন্তা ন ভবতি ভবতঃ শর্করে কর্করাসি,
দ্রাক্ষেদ্রক্ষ্যন্তিকেত্বামমৃতমৃতমসি ক্ষীর নীরং রসস্তে।
মাকন্দ ক্রন্দ কান্তাধর ধরণিতলং গচ্ছ যচ্ছন্তি
যাবচ্ছাবং শৃঙ্গারসারস্বতমিহজয়দেবস্য বিষ্বগ্বচাংসি ॥"

অর্থাৎ,—'হে বুধমণ্ডলি! হে ভক্তবৃন্দ! যদি সঙ্গীত-শাস্ত্রালোচনার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-মাধুর্য্য-রস আস্বাদন করিতে চান, তবে শ্রীকৃষ্ণগত-প্রাণ কবিপ্রবর জয়দেব গোস্বামী রচিত এই 'গীতগোবিন্দ' গ্রন্থ আনন্দে পাঠ করুন। যে দিন হইতে জয়দেব-কবি-বিরচিত এই 'গীতগোবিন্দ' ধরাধামে শৃঙ্গার-সারস্বত রস বিতরণ করিয়াছে, সেই দিন হইতে হে মধু! তোমার চিন্তায় আর মাধুর্য্য নাই; হে শর্করা! তুমি কঙ্কররূপে প্রতীয়মান হইতেছ; হে অমৃত! তুমি মৃতবৎ হইয়া আছ; হে ক্ষীর! তোমার আস্বাদ জলের ন্যায় হইয়া গিয়াছে; হে দ্রাক্ষা! তোমার প্রতি আর কে চাহিয়া দেখিবে; হে আম্রবৃক্ষ! তুমি কাঁদ; হে কান্তাধর! তুমি পৃথ্বীতলে প্রবেশ কর।'

—*—

নবম পরিচ্ছেদ।

ভারতের সাহিত্য-সম্পৎ।

২। সংস্কৃত-ভাষায়—নাট্য-সাহিত্য।

[ভারতের নাট্য-সাহিত্য,—প্রকার ভেদ ও লক্ষণ,—সাধারণ লক্ষণ,—প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের সাদৃশ্য;—সংস্কৃত-সাহিত্যের বিলুপ্ত নাটকাদি;—নাটকে কালিদাসের স্থান,—অভিজ্ঞান শকুন্তল,—মালবিকাগ্নিমিত্র,—বিক্রমোর্ব্বশী,—রত্নাবলী,—নাগানন্দ,—মৃচ্ছকটিক,—মালতীমাধব;—উত্তররামচরিত,—মহাবীরচরিত;—মুদ্রারাক্ষস;—বেণী সংহার,—প্রবোধচন্দ্রোদয়,—মহানাটক,—হনুমান নাটক প্রভৃতি,—বিবিধ বক্তব্য।]

প্রাচীন ভারতের সমুন্নতির এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন—নাট্যকলার পূর্ণ-বিকাশ। স্মৃতির বহির্ভূত কোন্ দুব অতীত কাল হইতে ভারতে নাট্য-সাহিত্যের বিকাশ হইয়াছিল, কেহ তাহা নির্ণয় করিতে পারেন নাই, কখনও পারিবেনও না। তুলনায় আধুনিক-কালে—অন্যান্য দেশের অভ্যুদয়ের হিসাবে সৃষ্টির আদি-কালে—ভারতে নাট্য-কলা কিরূপ স্ফূর্ত্তি-লাভ করিয়াছিল, তদ্বিষয় আলোচনা করিলেও পৃথিবীর সকল সভ্য-জনপদের শীর্ষ-স্থানে ভারতের আসন নির্দ্দিষ্ট হয়। কালিদাস, শ্রীহর্ষ, ভবভূতি প্রভৃতি যে সকল নাটক প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তুলনায় সে দিনের হইলেও, তৎসমুদায়ের পূর্ব্বে পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে যে তদ্রূপ নাট্য-সাহিত্যের অস্তিত্ব ছিল, তাহা কোনরূপেই প্রতিপন্ন হয় না। নাট্য-কলার উৎকর্ষ-সাধন সম্বন্ধে ভারতবর্ষ যে কখনও কাহারও নিকট কোনও বিষয়ে ঋণী নহেন, ভারতের অতি-বড় বিদ্বেষীকেও তাহা স্বীকার করিতে হইবে। বেদে নাট্য-কলার আভাস পাই, মহাভারতে নাট্য-কলার উল্লেখ আছে, পুরাণেতিহাসে নাটকাভিনয়ের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হই। নাটকের লক্ষণ এবং নাট্য-সাহিত্যের প্রকার-ভেদ প্রভৃতির বিষয় অনুধাবন করিলে, উহার উৎকর্ষের ও প্রাচীনত্বের বিষয় অনুভূত হয়। অগ্নিপুরাণে সপ্ত-বিংশতিবিধ এবং সাহিত্য-দর্পণে অষ্টাবিংশতি-বিধ অভিনেয় দৃশ্য-কাব্যের স্বরূপ পরিবর্ণিত হইয়াছে। * সাহিত্য-দর্পণোক্ত অষ্টাবিংশতি-বিধ অভিনেয় দৃশ্যকাব্য, রূপক (রূপকের সংখ্যা—দশ) ও উপরূপক (উপরূপকের সংখ্যা—অষ্টাদশ) ভেদে নিম্নলিখিত অভিধানে অভিহিত হইয়া থাকে। যথা,—

ভারতের নাট্য-সাহিত্য।

"নাটকমথ প্রকরণং ভাণ-ব্যায়োগ-সমবকার-ডিমাঃ।
ঈহামৃগাঙ্কবীথ্যঃ প্রহসনমিতি রূপকাণি দশ॥
নাটিকা ত্রোটকং গোষ্ঠী সট্টকং নাট্যরাসকং। প্রস্থানোল্লাপ্যকাব্যানি প্রেঙ্খণং রাসকং তথা॥
সংলাপকং শ্রীগদিতং শিল্পকঞ্চ বিলাসিকা। দুর্ম্মল্লিকা প্রকরণী হল্লীশো ভাণিকেতি চ॥
অষ্টাদশ প্রাহুরুপরূপকাণি মনীষিণঃ। বিনা বিশেষং সর্ব্বেষাং লক্ষ্ম নাটকবন্মতং॥"

* "পৃথিবীর ইতিহাস", তৃতীয় খণ্ডে, প্রাচীন ভারতের 'গীত-বাদ্য-নৃত্য-নাট্য' সম্বন্ধে (৩৯৪ম পৃঃ—৪০০ম পৃঃ) এ সকল বিষয়ের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

দশবিধ রূপকের মধ্যে প্রধান ও প্রথম—নাটক। নাটকের লক্ষণ 'সাহিত্য-দর্পণ'কার পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। * তন্মধ্যে প্রধান লক্ষণ এই যে, উহা প্রসিদ্ধ বৃত্তান্ত অবলম্বনে লিখিত হইবে; পাঁচ অঙ্ক হইতে দশ অঙ্কে বিভক্ত থাকিবে এবং ধীর, উদাত্ত, দিব্যগুণসম্পন্ন ব্যক্তির বিষয় উহাতে বিবৃত হইবে। শৃঙ্গার ও বীর রস উহাতে প্রধান স্থান অধিকার করিবে। অন্যান্য রসের অবতারণাও মধ্যে মধ্যে থাকিবে। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল', বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস', ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার', মুরারি মিশ্র বিরচিত 'অনর্ঘরাঘব' প্রভৃতি প্রকৃষ্ট নাটক মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। নাটকের পর 'প্রকরণ'। লৌকিক বা কল্পিত বিষয় লইয়া প্রধানতঃ ইহা রচিত হয়। শৃঙ্গার রস ইহার প্রধান অবলম্বন। প্রকরণের নায়ক—ব্রাহ্মণ, বণিক, অথবা রাজমন্ত্রী, এবং নায়িকা বেশ্যা বা কোনও পর-প্রতিপালিতা রমণী নির্দ্দিষ্টা হন। 'মৃচ্ছকটিক', 'মালতী-মাধব' প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। প্রথমোক্তে ব্রাহ্মণ নায়ক ও বেশ্যা নায়িকা এবং শেষোক্তে নায়ক অমাত্য ও নায়িকা প্রতিপালিতা কামিনী। তৃতীয়—ভাণ। ইহা এক অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং একই ব্যক্তি নানা স্বরে নানা ভাবে বিভিন্ন অংশের অভিনয় করেন। 'সারদাতিলক' ও 'লীলামধুকর' প্রভৃতি 'ভাণ'-শ্রেণীর অন্তর্গত। চতুর্থ—ব্যায়োগ। ইহা এক অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং পৌরাণিক বিষয় লইয়া লিখিত। যুদ্ধ-বর্ণনাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। 'সৌগন্ধী-হরণ', 'ধনঞ্জয়-বিজয়', 'জামদগ্ন্যে-জয়' প্রভৃতি এই ব্যায়োগ শ্রেণীর অন্তর্গত। পঞ্চম—সমবকার। দেবাসুরের যুদ্ধ-বর্ণন-ব্যপদেশে বীর-রসের অবতারণায় ইহা লিখিত; তিন অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহাতে অভিনয়-কালে হস্তি-রথাদি পরিপূর্ণ সমর-ক্ষেত্র, সংগ্রাম ও নগরাদির ধ্বংস প্রদর্শিত হয়। প্রধানতঃ উষ্ণিক ও গায়ত্রী ছন্দে ইহা লিখিত। 'সমুদ্র-মন্থন' নামক গ্রন্থ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ষষ্ঠ—ডিম; চারি অঙ্কে বিভক্ত; দেবতা বা অসুর নায়ক। বীর ও ভয়ানক রস প্রধান। 'ত্রিপুরদাহ' এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সপ্তম—ঈহামৃগ; প্রেম ও কৌতুক বর্ণনার উদ্দেশ্যে লিখিত। ইহা করুণ-রসপ্রধান রূপক। দেবদেবী ইহার নায়ক-নায়িকা। ঈহামৃগ চারি অঙ্কে বিভক্ত। 'কুসুম-শেখর-বিজয়' এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। অষ্টম—অঙ্ক; পৌরাণিক বিষয় অবলম্বনে লিখিত; করুণরস-প্রধান ও এক অঙ্কে বিভক্ত। 'শর্ম্মিষ্ঠা যযাতি' এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। নবম—বিথী। এক অঙ্কে বা দুই অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং অনেকাংশে 'ভাণের' লক্ষণাক্রান্ত। দশম—প্রহসন। স্বভাবতঃ ইহা হাস্য-প্রধান রূপক;—এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। সমাজ-সংশোধন উদ্দেশ্যে ইহা লিখিত। কুরীতি-সংশোধন জন্য রহস্যজনক বিবরণ ইহাতে বর্ণিত হইয়া থাকে। রাজা, রাজ-পারিষদ, ধূর্ত্ত, উদাসীন, বেশ্যা, ভৃত্য প্রভৃতি লইয়া 'প্রহসন' পরিপুষ্ট হয়। 'হাস্যার্ণব', 'কৌতুক-সর্ব্বস্ব' এবং 'ধূর্ত্ত-সমাগম' প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। উল্লিখিত দশ প্রকার রূপক ভিন্ন যে অষ্টাদশ প্রকার উপ-রূপক আছে, তাহারও সংক্ষিপ্ত পরিচয় অবগত হওয়া আবশ্যক। উপরূপক মধ্যে নাটিকা প্রথম ও প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। 'সাহিত্য-দর্পণ' মতে 'নাটিকার' লক্ষণ,—

"নাটিকা কৢপ্তবৃত্তা স্যাৎ স্ত্রীপ্রায়া চতুরঙ্কিকা। প্রখ্যাতো ধীরললিতস্তত্র স্যান্নায়কো নৃপঃ ॥

---

* এই সম্বন্ধে লক্ষণের কিঞ্চিৎ আভাস "পৃথিবীর ইতিহাস", তৃতীয় খণ্ডের ৪০৭ম পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে

স্যাদন্তঃপুরসম্বন্ধা সঙ্গীতব্যাপৃতাঽথবা। নবানুরাগা কন্যাত্র নায়িকা নৃপবংশজা ॥
সম্প্রবর্ত্তেত নেতাস্যাং দেব্যাস্ত্রাসেন শঙ্কিতঃ। দেবী পুনর্ভাবেজ্জ্যেষ্ঠা প্রগল্ভা নৃপবংশজা ॥
পদে পদে মানবতী তদ্বশঃ সঙ্গমো দ্বয়োঃ। বৃত্তিঃ স্যাৎ কৌশিকী স্বল্প বিমর্ষা সন্ধয়ঃ পুনঃ ॥"
কল্পিত বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া নাটিকা চারি অঙ্কে সমাপ্ত হইবে। স্ত্রী-বহুলা, নায়ক ধীর ললিত ও প্রখ্যাত, অন্তঃপুরচারিণীরা সঙ্গীতনিপুণা, নায়িকা নৃপবংশজা ও নবানুরাগিণী, নায়ক দেবীভয়ে শঙ্কিত—প্রভৃতি নাটিকার লক্ষণ। প্রগল্ভা ও অভিমানিনী নায়ক-নায়িকার মিলনে ইহার উপসংহার। 'রত্নাবলী', 'বিদ্ধশালভঞ্জিকা' প্রভৃতি এই নাটিকা শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট। দ্বিতীয়—তোটক। পঞ্চম হইতে নবম অঙ্কে, পার্থিব ও স্বর্গীয় বিষয় বর্ণনোদ্দেশ্যে বিরচিত। 'বিক্রমোর্ব্বশী' এই শ্রেণীভুক্ত। তৃতীয়—গোষ্ঠী; এক অঙ্কে, নয় দশ জন পুরুষ ও পাঁচ ছয় জন স্ত্রীলোকের সমবায়ে ইহা গঠিত। 'রৈবতমদনিকা' এই শ্রেণীর অন্তর্গত। চতুর্থ—সট্টক; প্রাকৃত ভাষায় রচিত ও অদ্ভুত গল্প সমন্বিত। 'কর্পূরমঞ্জরী' এই শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। পঞ্চম—নাট্যাসক; প্রেম ও কৌতুকমূলক, আদ্যোপান্ত নৃত্য ও সঙ্গীত পূর্ণ, একাঙ্কভুক্ত। 'নর্ম্মবতী' ও 'বিলাসবতী' প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। ষষ্ঠ—প্রস্থান। অনেকটা নাট্যরাসকের অনুরূপ। পার্থক্য এই যে, ইহার নায়ক-নায়িকা নীচ-জাতীয়। সপ্তম—উল্লাপ্য। পৌরাণিক বৃত্তান্ত অবলম্বনে এক অঙ্কে গ্রথিত; প্রেম ও হাস্য রসাত্মক। কথোপকথন মধ্যে সঙ্গীতের অবতারণা দেখা যায়। 'দেবী-মহাদেবম্' এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। অষ্টম---কাব্য, প্রেম-বিষয়ক; এক অঙ্কে সম্পূর্ণ; সঙ্গীত ও কবিতায় সংগ্রথিত। 'যাদবোদয়' কাব্যান্তর্ভুক্ত। নবম—প্রেঙ্খণ। একাঙ্কক ও বীর-রসাত্মক; নায়ক—নীচ শ্রেণীর। 'বালী-বধ' প্রেঙ্খণ মধ্যে পরিগণিত। দশম—রাসক; হাস্য-রসোদ্দীপক, একাঙ্কক; নায়ক মূর্খ, নায়িকা বুদ্ধিমতী; অভিনেতা পঞ্চ ব্যক্তি। 'মেনকাহিত'—'রাসক'-শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হয়। একাদশ—সংলাপক। এক হইতে চারি অঙ্কে বিভক্ত। যুদ্ধ-বর্ণনার জন্য প্রসিদ্ধ। নায়ক দেশপ্রচলিত ধর্ম্মের বিদ্বেষ্টা। 'মায়াকাপালিক' এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। দ্বাদশ—শ্রীগদিত; সঙ্গীতময় একাঙ্কক; লক্ষ্মী নায়িকা। 'ক্রীড়ারসাতল' এই পর্য্যায় মধ্যে পরিগণিত। ত্রয়োদশ—শিল্পক; চারি অঙ্কে বিভক্ত; শ্মশান রঙ্গস্থল; ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল যথাক্রমে নায়ক ও প্রতিনায়ক। ঐন্দ্রজালাদি প্রদর্শন ইহার অঙ্গীভূত। 'কণকাবতী-মাধব'—এই শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট। চতুর্দ্দশ—বিলাসিকা;—প্রেম ও কৌতুক-বর্ণনোদ্দেশ্যে এক অঙ্কে গ্রথিত। পঞ্চদশ—দুর্ম্মল্লিকা;—চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ, হাস্য-প্রধান উপরূপক। 'ইন্দুমতী' এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ষোড়শ—প্রকরণিকা; অনেকাংশে নাটিকার লক্ষণা-ক্রান্ত। সপ্তদশ—হল্লীষা;—আদ্যোপান্ত সঙ্গীত ও নৃত্যপূর্ণ; একাঙ্কক। এক জন পুরুষ ও আট দশ জন স্ত্রীলোক ইহার অভিনেতা। 'কেলিরৈবতক'—এই শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট। অষ্টাদশ—ভাণিকা। হাস্য-রস-প্রধান, একাঙ্কক। 'কামদত্তা'—ভাণিকা-শ্রেণীভুক্ত। এই অষ্টাদশ উপরূপক এবং পূর্ব্বোক্ত দশবিধ রূপক যে পদ্ধতিতে যে ভাবে রচিত ও অভিনীত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে বিচার করিলে, আজি পর্য্যন্ত উহা হইতে নাট্যাভিনয়ের কেহ কোনও নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয়

না। ইউরোপে অধুনা ট্রাজেডি (Tragedy), কমিডি (Comedy), অপেরা (Opera), ব্যালেট (Ballet), বারলেটা (Burletta), মেলোড্রামা (Melo-drama), ফার্স (Farce), প্রভৃতি নাট্য-সাহিত্যের যে কোনও রূপ দৃষ্ট হয়, তাহা রূপক ও উপরূপকের এবং তদন্তর্গত উপবিভাগের অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

রূপক-উপরূপকের অন্তর্গত বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হইলেও, সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ আছে। সংস্কৃত-সাহিত্যের কোনও নাটকই বিয়োগান্ত নহে।

সাধারণ লক্ষণ।

শোক, দুঃখ, ভয়, সংশয় প্রভৃতি নাটকের বিভিন্ন অংশে প্রকটিত হইলেও উপসংহারে মিলনের মধুর দৃশ্যে দর্শকের চিত্তে শান্তি আনয়ন করে। কোনও লোমহর্ষণ ঘটনাও দৃশ্য-কাব্যে প্রদর্শন করা রীতিবিগর্হিত। মরণের দৃশ্য কোনও নাটকে প্রদর্শিত হয় না। অশ্লীল ভাষাপ্রয়োগ, নির্ব্বাসন, জাতীয় অগৌরব, চুম্বন, আহার, নিদ্রা, আঁচড়-কামড় প্রভৃতিও নাট্য-সাহিত্যে স্থান পায় না। সামাজিক পদ-মর্য্যাদা অনুসারে নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ বিভিন্ন ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন। নায়ক, রাজা, ব্রাহ্মণ এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করেন; স্ত্রীলোক এবং নিম্নশ্রেণীর জনগণ প্রাকৃত-ভাষায় কথাবার্ত্তা কহেন। প্রাকৃত-ভাষাভাষী নাট্যোল্লিখিত জনগণের মধ্যেও প্রাদেশিক ভাষা ব্যবহারের পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। "সাহিত্য-দর্পণ"-মতে, উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীলোক কবিতা-ছন্দ উচ্চারণ কালে 'মহারাষ্ট্র'-ভাষা ব্যবহার করিতেন; সাধারণতঃ তাঁহারা ও বালকগণ এবং উচ্চশ্রেণীর ভৃত্যগণ 'শৌর-সেনী'-ভাষা ব্যবহার করিতেন। রাজান্তঃপুরচারী ব্যক্তিগণ 'মাগধী', ধূর্ত্ত-প্রবঞ্চকগণ 'অবন্তী'-ভাষা, অঙ্গারকার প্রভৃতি নীচব্যবসায়িগণ 'আভিরী' এবং কুৎসিৎ-বাক্ মূর্খগণ 'পৈশাচী'-ভাষা ব্যবহার করিতেন। নাটকে এইরূপ কত শ্রেণীর লোকে কত রকম ভাষা ব্যবহার করিত, 'সাহিত্য-দর্পণ'-কারের বর্ণনায় তাহার নিম্নোক্তরূপ আভাষ পাওয়া যায়,—

"পুরুষাণামনীচানাং সংস্কৃতং স্যাৎ কৃতাত্মনাং। শৌরসেনী প্রযোক্তব্যা তাদৃশীনাঞ্চ যোষিতাং॥
আসামেব তু গাথাসু মহারাষ্ট্রীং প্রযোজয়েৎ। অত্রোক্তা মাগধী ভাষা রাজান্তঃপুরচারিণাং॥
চেটীনাং রাজপুত্রাণাং শ্রেষ্ঠিনাং চার্দ্ধমাগধী। প্রাচ্যা বিদূষকাদীনাং ধূর্ত্তানাং স্যাদবন্তিকা॥
যোধনাগরিকাদীনাং দাক্ষিণাত্যা হি দীব্যতাং। শকারাণাং শকাদীনাং শাকারীং সম্প্রযোজয়েৎ॥
বাহ্লীকভাষা দিব্যানাং দ্রাবিড়ী দ্রবিড়াদিষু। আভীরেষু তথাভীরী চাণ্ডালী পুক্কসাদিষু॥
আভীরী শাবরী চাপি কাষ্ঠপত্রোপজীবিষু। তথৈবাঙ্গারকারাদৌ পৈশাচী স্যাৎ পিশাচবাক্॥
চেটীনামপ্যনীচানামপি স্যাৎ শৌরসেনিকা। বালানাং ষণ্ডকানাঞ্চ নীচগ্রহবিচারিণাং॥
উন্মত্তানামাতুরাণাং সৈব স্যাৎ সংস্কৃতং ক্বচিৎ। ঐশ্বর্য্যেণ প্রমত্তস্য দারিদ্র্যোপপ্লুতস্য চ॥
ভিক্ষুবন্ধধরাদীনাং প্রাকৃতং সম্প্রযোজয়েৎ। সংস্কৃতং সম্প্রযোক্তব্যং লিঙ্গিনীষুত্তমাসু চ॥
দেবীমন্ত্রিসুতাবেশ্যাস্বপি কৈশ্চিত্তথোদিতং। যদ্দেশং নীচপাত্রন্তু তদ্দেশং তস্য ভাষিতং॥
কার্যতশ্চোত্তমাদীনাং কার্য্যো ভাষাবিপর্য্যয়ঃ॥ যোষিৎসখীবালবেশ্যাকিতবাপ্সরসাং তথা।
বৈদগ্ধ্যার্থং প্রদাতব্যং সংস্কৃতং চান্তরান্তরা॥"

এই বর্ণনায় বুঝা যায়,—নাটকে কিরূপ পাত্রাপাত্র প্রদর্শিত হইত, কত দেশের কত ভাষা

নাটককারের আয়ত্ত রাখা প্রয়োজন ছিল এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ কত বিভিন্ন ভাষার উচ্চারণে অভ্যস্ত ছিলেন। এ কৃতিত্ব-কৌশল অন্য কোনও দেশের অন্য কোনও ভাষার নাটকে পরিদৃষ্ট হয় না। সংস্কৃত-ভাষার অধিকাংশ নাটক প্রেম-ভালবাসা-মূলক। অনেক স্থলেই কোনও নৃপতি নায়ক এবং তাঁহার একাধিক সহধর্ম্মিণী সত্ত্বেও তিনি কোনও এক সুন্দরী কুমারীর রূপে বিমুগ্ধ। প্রথম দর্শনেই নায়ক-নায়িকার প্রেম-সঞ্চার। নায়কের জন্য ব্যাকুল হইলেও নায়িকা আপনার অনুরাগ অব্যক্ত রাখিয়া নায়ককে সংশয়ের যন্ত্রণায় অধীর করিয়া তুলেন। মিলনের পথে নানা অন্তরায় উপস্থিত হয়। তাহাতে বিলম্ব-জনিত হতাশে নায়ক-নায়িকা উভয়েই আকুল হইয়া পড়েন। নায়িকার একজন সহচরী এবং নায়কের একজন বিদূষক থাকেন। তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তায় যথাক্রমে উভয়ের প্রাণ কতকটা আশ্বস্ত হয় বটে; কিন্তু মিলন পর্য্যন্ত বিষম উদ্বেগে প্রেমিক-প্রেমিকা উভয়কেই উন্মাদ করিয়া তুলে। বিদূষক সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণ বটেন; কিন্তু ব্রাহ্মণোচিত গাম্ভীর্য্যাদি গুণের পরিবর্ত্তে তাঁহার অঙ্গভঙ্গী এবং বাচালতাই প্রকাশ পায়। বিশুদ্ধ হাস্য-রসের বিকাশের জন্যই প্রধানতঃ বিদূষকের অবতারণা। ভারতীয় নাট্য-সাহিত্যের সহিত গ্রীক-ভাষার নাটকাবলীর বহু সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। পুরাণাদি নাটকের ঘটনা গ্রহণ এবং নাটকের নায়ক ধীর উদাত্ত চরিত প্রভৃতি লক্ষণ গ্রীস-দেশের প্রাচীন নাটকেও পরিগৃহীত। ভবভূতি প্রণীত 'উত্তররামচরিত' এবং 'মহাবীরচরিতের' সহিত গ্রীসদেশের নাট্যকার এস্কাইলাসের 'আগামেম্‌নন্', 'ইউমেনাইডিস্' প্রভৃতির অনেক সাদৃশ্য আছে। উভয়ত্রই শোকের বিষম প্রবাহ প্রবাহমান। চরিত্র-সাদৃশ্যও আশ্চর্য্য নৈকট্যসম্পন্ন। এবম্বিধ সাদৃশ্য আবার ইংলণ্ডের নাট্য-সাহিত্যে অতিমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। ইংলণ্ডের রাজ্ঞী এলিজাবেথের সমসাময়িক সেক্সপিয়ার প্রমুখ প্রসিদ্ধ কবি-নাট্যকারগণের মধ্যে এ সাদৃশ্য অতি প্রবল। সেক্সপিয়ারের অনেক নাটকের অনেক চরিত্রে ও অনেক নাট্য-কৌশলে ভারতের নাট্য-চাতুর্য্যের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। অভিনব চরিত্র-সৃষ্টিতে লক্ষ্য নাই, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির চরিত্র প্রস্ফুটিত করাই লক্ষ্য;—সেক্সপিয়ারের নাটকে এবং ভারতবর্ষের নাটকে এ সম্বন্ধে বিশেষ সাদৃশ্য আছে। কিবা সেক্সপিয়ারের নাটকে কিবা ভারতীয় নাট্যে সময়ের এবং স্থানের সমতা-রক্ষার প্রয়াস প্রায়ই দেখা যায় না! উভয়ত্রই কাল্পনিক এবং অনৈসর্গিক ঘটনার সমাবেশ আছে। উভয়বিধ রচনাতেই গদ্যের ও পদ্যের সংমিশ্রণ দেখা যায়। উভয়বিধ নাটকেই গাম্ভীর্য্যের পার্শ্বে চাপল্য,—হাস্য-বীভৎসাদি রসের সহিত বীর-করুণ রসাদির অবতারণা আছে এবং উভয়ের মধ্যেই শব্দ-চাতুর্য্যে হাস্যকর ও দ্ব্যর্থভাব প্রকাশ পাইয়াছে। সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের বিদূষক, সেক্সপিয়ারের নাটকে 'ফুল' বা ভাঁড় রূপে প্রকটিত। নাটকে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত প্রদর্শন জন্য উভয়ত্রই নানা কৌশল পরিগৃহীত। পত্র-লেখা, এক অভিনয়ের মধ্যে অন্য অভিনয়ের অবতারণা, মৃত ব্যক্তির পুনর্জ্জীবন-প্রাপ্তি, হাস্য-রসের অবতারণার উদ্দেশ্যে উন্মত্ত-ভাব প্রকাশ প্রভৃতি সেই সকল কৌশলের অন্তর্নিবিষ্ট। এবম্বিধ সাদৃশ্যের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া পণ্ডিতগণ বিস্ময়-বিমুগ্ধ হন। বিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ দুই দূরদেশের নাট্যকারের মধ্যে রচনার এ অভিনব সাদৃশ্য কি প্রকারে

সংঘটিত হইল,—ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়! বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে একই চিন্তাস্রোত যে স্বাধীন-ভাবে, একে অন্যের মুখাপেক্ষী না হইয়া, প্রবাহিত হইতে পারে,—এ সাদৃশ্যের বিষয় আলোচনায় তাহাই উপলব্ধি হয় না কি? * সংস্কৃত নাটকের প্রারম্ভে একটী করিয়া 'প্রস্তাবনা' থাকে। প্রস্তাবনায় 'নান্দী' অর্থাৎ ভগবানের নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করা হয়। ইহার পর 'নট' এবং তাঁহার সহচরগণের, প্রধানতঃ নটীর, মধ্যে নাট্যাভিনয় সম্পর্কে আলোচনা চলে। সে আলোচনায় অভিনীতব্য নাটকের ও নাট্যকারের পরিচয়াদি প্রকাশ পায়। ঐ উপলক্ষে নাটকীয় ঘটনার আভাস-প্রদানে দর্শকগণের গুণগ্রাহিতার প্রশংসাবাদ কীর্ত্তিত হয়। ইহার পর সুকৌশলে নাট্যোলিখিত ব্যক্তির অবতারণা হইয়া থাকে। বিভিন্ন অঙ্কে নাটক বিভক্ত হইলেও অভিনয়-কালে নাট্যমঞ্চ একেবারে অভিনেতা-অভিনেত্রী শূন্য থাকে না। এক জন চলিয়া গেলেই অন্য জন আসিয়া সে স্থান পূরণ করে। নূতন অঙ্ক আরম্ভের পূর্ব্বে প্রায়ই 'বিষ্কম্ভক' বা একটী গর্ভাঙ্ক অবতারিত হয়। তাহাতে এক বা একাধিক ব্যক্তি স্বগতে বা পরস্পর কথাবার্ত্তায় পূর্ব্বাঙ্কে বর্ণিত ঘটনার পরবর্ত্তী ঘটনা-বিশেষ সংক্ষেপে প্রকাশ করেন। তাহাতে, পরে যে অভিনয় আরম্ভ হইবে, দর্শকগণ তাহার সূত্র প্রাপ্ত হন। নাট্য-শেষে জাতির মঙ্গলের জন্য দেবতার নিকট প্রার্থনা করা হয়। একজন প্রধান অভিনেতা-কর্তৃক সেই প্রার্থনা-বাক্য উচ্চারিত হইয়া থাকে। প্রধানতঃ এক দিনের বা এক রাত্রির ঘটনা উপলক্ষ করিয়া এক একটী অঙ্কের সমাবেশ হয়। কোনও কোনও স্থলে এক এক অঙ্কের ঘটনার মধ্যে বহু বর্ষের ব্যবধানও থাকিয়া যায়। কালিদাসের 'শকুন্তলার' ও 'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটকের প্রথম ও শেষ অঙ্কদ্বয়ের ঘটনায় বহু বর্ষের ব্যবধান আছে। ভবভূতির 'উত্তররামচরিতে' প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের ঘটনার মধ্যেই দ্বাদশ বর্ষের ব্যবধান রহিয়া গিয়াছে। স্থান-পরিবর্তন সম্বন্ধেও যথেচ্ছভাব দৃষ্ট হয়। এই পৃথিবীতে, পরক্ষণেই স্বর্গে;—অনেকস্থলে এক অঙ্কের মধ্যেই স্থানের এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে। রঙ্গালয়ে হয়, হস্তী, সিংহাসন, রথ প্রভৃতি প্রদর্শিত হইত। কিন্তু কি প্রকারে তৎসমুদায় রঙ্গমঞ্চে আনীত হইত, তাহা বুঝা যায় না। স্বর্গের সহিত মর্ত্ত্যের সর্ব্বদা সম্বন্ধ-সূত্রে কোনও অলৌকিক রথের অবতারণার বিষয় মনে আসিতে পারে। কিন্তু তাহারও স্বরূপ-তত্ত্ব নির্ণয়ে কল্পনা পর্য্যুদস্ত হয়।

সংস্কৃত-সাহিত্যে যেমন কাব্য অসংখ্য, তেমনই দৃশ্য-কাব্য অসংখ্য। সেই সকলের মধ্যে কতকগুলি নাটক-নাটিকা পৃথিবীর নাট্য-সাহিত্য মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া আছে। দূর অতীত-কালে, মহাকবি কালিদাস প্রভৃতির আবির্ভাবের পূর্ব্বে, ভারতে যে নাট্য-সাহিত্যের বিকাশ পাইয়াছিল, শাস্ত্রাদিতে তাহার আভাস পাই বটে; ভাষ্যকারগণের ও টীকাকারগণের উক্তিতে তাহার উল্লেখ দেখি বটে; কিন্তু তৎসমুদায়ের নামমাত্রই অবশিষ্ট আছে,—অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। ভরত-মুনি—ভারতের নাট্যকলার প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রসিদ্ধ; তাঁহার কোনও

সংস্কৃত-সাহিত্যের বিলুপ্ত নাটকাদি।

"While the Indian Drama shows some affinities with Greek comedy, it affords more striking points of resemblance to the productions of the Elizabethan play-

নাটকই এখন আর অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে 'কংসবধ' এবং 'বালিবন্ধ' নাটকের উল্লেখ আছে। কিন্তু ঐ দুই নাটকের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। কালিদাস প্রভৃতির পূর্ব্বে দণ্ডী নামক জনৈক নাট্যাচার্য্যের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্য —দণ্ডীর সে নাটক এখন আর অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। এখন 'দণ্ডী' নামে বিভিন্ন কবির অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়। কোনও মতে 'মৃচ্ছকটিক' শূদ্রকের রচিত; কিন্তু কেহ কেহ ঐ গ্রন্থ দণ্ডীর রচনা বলিয়া প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। * 'ভাস'—জনৈক প্রসিদ্ধ নাট্যকার ছিলেন। 'প্রসন্ন-রাঘবে' উল্লেখ আছে,—"ভাসো হাসঃ কবিকুলগুরুঃ কালিদাসো বিলাসঃ।" ভাস-প্রণীত একখানি প্রধান নাটক—'স্বপ্নবাসবদত্তা।' সেই স্বপ্নবাসবদত্তা অবলম্বনে সুবন্ধু 'বাসবদত্তা' উপন্যাস লিখিয়া গিয়াছেন। সুবন্ধু—কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া প্রতিপন্ন হন। সুতরাং ভাস কতকাল পূর্ব্বের নাট্যকার, সহজেই উপলব্ধি হয়। মহাকবি কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্রে' সৌমিল্ল এবং ধাবক তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রসিদ্ধ-যশঃসম্পন্ন নাট্যকার বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের নাটকও এখন আর অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। ভারতের নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস আরম্ভ করিতে হইলে, এখন তাই কালিদাসকেই প্রথম অবলম্বন-স্বরূপ গ্রহণ করিতে হয় এবং তাঁহার পরে আর আর নাট্যকারগণের পরিচয় প্রদত্ত হইয়া থাকে। প্রাকৃতিক নৈসর্গিক নিয়মে একের বিলয়ে অন্যের উদ্ভব সংঘটিত হয়; এক স্তর দৃষ্টি-বহির্ভূত হওয়ায় অন্য স্তর তাহার স্থান অধিকার করে। ভারতের শিল্প-সাহিত্যে—গৌরব-বিভবে এইরূপ স্তরের পর স্তরের সমাবেশ হইয়াছে;—একের বিলোপে অন্যের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। কালিদাস প্রভৃতির পূর্ব্ববর্ত্তী কবি-নাট্যকারগণের বিলোপেও সেই নৈসর্গিক নিয়মের নির্দ্দিষ্ট লীলা পরিদৃশ্যমান্। কালিদাস প্রভৃতির আবির্ভাবে পূর্ব্বের স্তর কালগর্ভে প্রোথিত হইয়া নূতন স্তর গঠিত হয়। আধুনিক নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস তাই কালিদাস প্রভৃতির প্রসঙ্গ লইয়াই পরিপূর্ণ।

wrights, and in particular of Shakespeare .... Such a series of coincidences, in a case, where influence or borrowing is absolutely out of the question is an instructive instance of how similar developements can arise independently."—*A History of the Sanskrit Literature.*

* 'কাব্যাদর্শ'—দণ্ডী রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। 'কাব্যাদর্শের' একটী শ্লোকের প্রথমার্দ্ধের সহিত 'মৃচ্ছকটিকের' একটী শ্লোকের মিল দৃষ্ট হয়। সে শ্লোকটী এই — 'লিম্পতীব তমোঽঙ্গানি বর্ষতীবাঞ্জনং নভঃ। অসৎপুরুষসেবেব দৃষ্টির্বিফলতাং গতা॥' এই শ্লোক দৃষ্টে এবং দণ্ডী-রচিত 'দশকুমারচরিত' গ্রন্থের ন্যায় মৃচ্ছকটিকের ঘটনা-বৈচিত্র্য দৃষ্ট হওয়ায়, ঐ তিন গ্রন্থই দণ্ডীর রচিত বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। অধ্যাপক পিস্কেল প্রথমে এই মত প্রকাশ করিয়া যান। *Vide,* Pischel's Edition of *Cringartilak.* বলা বাহুল্য, এ মতের প্রতিবাদ হইয়াছে। কাব্যাদর্শ-রচয়িতা দণ্ডী বিবিধ গ্রন্থ হইতে দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়াছেন,—প্রমাণ পাওয়া যায়। একটী শ্লোকে সে কথা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। শ্লোকটী এই,—"পূর্ব্বশাস্ত্রাণি সংহৃত্য প্রয়োগানুপলভ্য চ। যথাসামর্থ্যমস্মাভিঃ ক্রিয়তে কাব্যলক্ষণং॥" ইহা দ্বারা বেশ বুঝা যায়,— দণ্ডী পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের ও শাস্ত্রকারগণের অনুসরণে দৃষ্টান্তাদি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। 'কাব্যাদর্শে' মহাভারতের, শকুন্তলার ও শিশুপালবধের শ্লোকাদি উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং কাব্যাদর্শ-রচয়িতা দণ্ডী এবং নাট্যকার দণ্ডী অভিন্ন নহেন।

যেমন কাব্য-মহাকাব্যে কালিদাস শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়া আছেন, নাটক-নাটিকা রচনায়ও তাঁহার সেই প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত। 'শকুন্তলা', 'বিক্রমোর্ব্বশী', 'মালবিকাগ্নিমিত্র'—কালিদাস-বিরচিত এই তিন খানি নাট্য-কাব্য এখন প্রাপ্ত হওয়া যায়। পৃথিবীর সভ্যজাতিগণের প্রায় সকলের ভাষাতেই এই সকল নাটকের অনুবাদ হইয়াছে এবং প্রায় সকলেই এই সকল গ্রন্থের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া মুক্তকণ্ঠে কবির কৃতিত্বের ও কল্পনা-কৌশলের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। অধ্যাপক উইল্‌সন্‌ হিন্দুদিগের নাট্য-শালা সম্বন্ধে যে গ্রন্থ-রচনা করিয়াছেন, তাহাতে লিখিয়া গিয়াছেন,—'এমন সুশ্রাব্য সুবিন্যস্ত পদাবলীতে এই সকল গ্রন্থ সমলঙ্কৃত যে, তাহা অনুভব করা যায় না।' * গেটে, শ্লেজেল ও হামবোল্ট প্রমুখ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ ভারতীয় কবিগণের কবিত্ব-প্রভায় বিমুগ্ধ হইয়া কি প্রশংসাই করিয়া গিয়াছেন। জর্ম্মণীর প্রসিদ্ধ কবি গেটে (Gœthe) কবিতা-ছন্দে কালিদাসের শকুন্তলার মহিমা কীর্ত্তন করেন। শকুন্তলা-পাঠে বিমুগ্ধ হইয়া ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি যে চারি পংক্তি কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন, পাশ্চাত্য-জাতির মধ্যে সর্ব্বত্রই সে কবিতা-পংক্তি-চতুষ্টয় বিঘোষিত হইয়া থাকে। গেটের উক্তি,—'যদি প্রস্ফুট-যৌবনের কমনীয়তা এবং বার্দ্ধক্যের পরিপূর্ণতা একাধারে দেখিতে চাও, যদি আত্মাকে পুলকিত পরিতৃপ্ত ও পরিপুষ্ট করিতে অভিলাষী হও, আর যদি একাধারে স্বর্গের ও মর্ত্ত্যের সুষমা সম্ভোগ করিতে চাও, আমি শকুন্তলা পাঠ করিতে বলি। শকুন্তলা একাধারে সকল আনন্দ প্রদান করিবে।' † বৈদেশিক সর্ব্বপ্রধান কবি-দার্শনিক যে ভাষায় যে বিশেষণে শকুন্তলার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহার উপর আর অধিক পরিচয়ের আবশ্যক করে না। শকুন্তলার গল্পাংশ মহাভারত হইতে পরিগৃহীত এবং প্রায় সকলেরই নিকট পরিচিত। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ঔরশে মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম হয়। মেনকা সদ্যোজাত কন্যাকে বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া যান। একটী 'শকুন্ত' (পক্ষী) পক্ষাচ্ছাদনে বালিকাকে রক্ষা করে। তদবস্থায় বালিকাকে প্রাপ্ত হইয়া মহর্ষি কণ্ব তাহাকে আপন আশ্রমে লইয়া আসেন। তদবধি কণ্ব মুনি তাহাকে কন্যাবৎ লালন-পালন করিতে থাকেন। শকুন্ত (পক্ষী) কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন বলিয়া কন্যার নাম 'শকুন্তলা' হয়। ইহাই শকুন্তলার

নাটকে কালিদাসের স্থান।

শকুন্তলা।

---

* "It is impossible to conceive language so beautifully musical or so magnificently grand as that of the verses of Bhababhuti and Kalidasa."—*Theatre of the Hindus*, Vol. I, by H. H. Wilson.

† "On the Continent such men as Gœthe, Schlegel, Humboldt have all expressed their admiration of the Hindu Poet's greatest work. Gœthe's four well-known lines, written in 1792, are —

'Willst du die Bluthe des fruhen, die Fruchte des Spateren Jahres,
Willst du was reizt und entzuckt, willst du was sattigt und nahrt,
Willst du den Himmel, die Erde, mit einem Namen begreifen :
Nemi ich Sa' ontala dich, und so ist Alles gesagt.'

বাল্য-জীবন। নাটকের সহিত অবশ্য ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই। নাটকারম্ভ—শকুন্তলার যৌবনোন্মেষের সময় হইতে। শকুন্তলা সখীগণ-সহ উদ্যানে জলসেচন করিতেছেন, কুসুম-শোভা-সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া আছেন; সহসা মৃগয়া-উপলক্ষে রাজা দুষ্মন্ত সেখানে উপস্থিত হইলেন। রাজার দৃষ্টি শকুন্তলার প্রতি পতিত হওয়ায় তিনি অলক্ষ্যে থাকিয়া সেই রূপ মাধুরী দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার মনে হইল,—'এই স্বভাব-সুন্দরীকে ঋষি কেন কঠোর তপস্যা-কার্য্যে ব্রতী করিলেন?' শকুন্তলার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে রাজা যখন অলক্ষ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে, পরিধেয় বল্কল কটিদেশে দৃঢ়-সম্বদ্ধ-হেতু শকুন্তলা কষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন। সখী অনসূয়া শকুন্তলার পরিধান-বল্কল শিথিল করিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"বল্কল আঁটিয়া বাঁধা হয় নাই। তোমার পয়োধর-বিস্তার হেতুই ঐরূপ বোধ হইতেছে।" এই সময় রাজা দুষ্মন্তের মনে অভিনব চিন্তার উদয় হইল। তিনি একবার ভাবিলেন,—'বল্কল-আচ্ছাদনে এ দেহের কমনীয়তা বিলুপ্ত হইতেছে;—পাণ্ডুবর্ণ পত্রের মধ্যস্থিত কুসুমের ন্যায় আপনার কান্তির পুষ্টিতা-সাধনে সমর্থ হইতেছে না।' কিন্তু পরক্ষণেই মনে মনে কহিলেন,—'না, তা নয়। বল্কল অযোগ্য হইলেও উহাতে শোভার হানি কিছুই হয় নাই। শৈবাল-সংযুক্ত সরোজের মনোহারিত্ব কবে না প্রত্যক্ষীভূত! হিমাংশুর চিহ্ন-মলিন সরোজও শোভান্বিত। আকৃতি মধুর হইলে, সকল ভূষণই সুন্দর দেখায়।' যথা,—

"সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবালেনাপি রম্যং মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী কিমিবহি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্॥"

শকুন্তলা জলসেচন-কালে সখীদ্বয়ের সহিত যতই কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন; রাজা দুষ্মন্ত তাঁহার রূপে ও স্বরে ততই মাধুর্য্য অনুভব করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে কুসুম-মধুপান-প্রমত্ত এক মধুকর শকুন্তলার মুখ-কমলের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া, তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। দুষ্মন্ত এইবার আত্ম-প্রকাশের অবসর পাইলেন। যেন মধুকরকে প্রতি-নিবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যে শকুন্তলার সম্মুখীন হইয়া কহিলেন,—"কঃ পৌরবে বসুমতীং শাসতি শাসিতরি দুর্ব্বিনীতানাম্। অয়মাচরত্যবিনয়ং মুগ্ধাসু তপস্বিকন্যাসু॥" 'দুর্ব্বলের সহায় পুরুবংশীয় রাজার শাসনকালে অবলা সরলা তপস্বিকন্যার প্রতি কে দুষ্ট-আচরণ করিতেছে?' রাজা যেন তাহার শাসনের জন্য সম্মুখীন হইলেন। শকুন্তলা প্রভৃতি রাজাকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। পরিচয়াদির পর রাজা দুষ্মন্ত কণ্ব-মুনির আশ্রমে অতিথি হইলেন। শকুন্তলার মনে অভিনব অননুভূত ভাবের উদ্রেক হইল। সেই সময়ে রাজা

Thus translated by Mr. E. B. Eastwick :—

"Wouldst thou the young year's blossoms and the fruits of its decline,
And all by which the soul is charmed, enraptured, feasted, fed,
Wouldst thou the earth, and heaven itself in one sole name combine ?
I name thee, O Sakuntala ! and all at once said."

Vide Aufrecht (Theodor) *Catalogus Catalogorum*, An Alphabetical Register of Sanskrit Works and Authors, Leipzig, 1891.

দুষ্মন্ত শকুন্তলার পরিণয়-প্রার্থী হইলেন। শকুন্তলার চিত্ত রাজাকে দর্শনাবধি রাজার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। দুই চারি বার বাদ-প্রতিবাদের পর, দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলা পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। পরিণয়—গান্ধর্ব্ব-মতে সম্পন্ন হইল। বিবাহের পর, রাজা দুষ্মন্ত কিছুদিন ঋষির আশ্রমে অবস্থান করিলেন। এই সময়ে রাজা শকুন্তলাকে একটী অঙ্গুরী প্রদান করেন। রাজচিহ্ন-সমন্বিত সেই অঙ্গুরী রাজা দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার পরিণয়ের নিদর্শন-মধ্যে গণ্য হয়। রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে রাজা শকুন্তলাকে অচিরাৎ রাজধানীতে লইয়া যাইবেন,—এইরূপ বলিয়া যান। রাজা দুষ্মন্ত প্রস্থান করিলে, শকুন্তলা তাঁহার চিন্তায় ব্যাকুল হইলেন। আবার কতদিনে কখন তাঁহার সাক্ষাৎ পাই-বেন,—এই দুশ্চিন্তায় শকুন্তলার বাহ্যজ্ঞান একরূপ বিলুপ্ত হইল। এই সময়ে সহসা দুর্ব্বাসা ঋষি আশ্রমে আতিথ্য-গ্রহণে উপস্থিত হইলেন! নেপথ্যে ঋষিকণ্ঠ কহিল,—"অয়মহং ভো ;"—'দ্বারে অতিথি ; আশ্রমবাসী, অতিথি-সৎকার কর।' দুষ্মন্তের চিন্তায় অনন্যমনা শকুন্তলা ঋষির সে স্বর শুনিতে পাইলেন না। ঋষি অবমাননা বোধ করিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে অভিসম্পাৎ দিলেন ; নেপথ্যে ধ্বনিত হইল,—"বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা তপোনিধিং বেৎসি ন মামুপস্থিতম্। স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপি সন্ কথাং প্রমত্ত প্রথমং কৃতা-মিব॥" 'কি আস্পর্দ্ধা! আমি অতিথি, দ্বারে উপস্থিত। আমাকে তুই অবমাননা করিলি! তুই যে পুরুষকে অনন্যমনে চিন্তা করিতে কবিতে অতিথি-রূপে উপস্থিত এই তপস্বীকে জানিতে পারিলি না, তাহার ফল নিশ্চয় পাইবি! মত্তপ ব্যক্তি যেমন অব্যবহিত-পূর্ব্বে-উচ্চারিত প্রথম বাক্য স্মরণ রাখিতে পারে না, তোর প্রিয় ব্যক্তিও সেইরূপ তোর বিষয় আর স্মরণ করিবে না।' ঋষির এই অভিসম্পাৎ শকুন্তলার কর্ণে প্রবেশ করিল না বটে ; কিন্তু তাঁহার সখীদ্বয় তাহা জানিতে পারিলেন। অনসূয়া ঋষির অনুসরণ করিয়া চরণে ধরিয়া কত মিনতি করিলেন। কিন্তু দুর্ব্বাসা কিছুতেই প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না। তবে অনসূয়ার একান্ত অনুনয়ে ঋষি বলিয়া গেলেন—'আমার বাক্য কখনই লঙ্ঘন হইবে না। তবে কোনও আভরণ-রূপ অভিজ্ঞান দেখাইতে পারিলে, এই অভিসম্পাতে শকুন্তলা মুক্তি-লাভ করিবে।' এই বলিয়াই ঋষি অন্তর্হিত হন। ঋষির আগমন বা অভিসম্পাত যদিও নাটকে সাক্ষাৎ-ভাবে প্রদর্শিত হয় নাই ; যদিও নেপথ্যে অভিসম্পাত হয় এবং পরিশেষে অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার কথোপকথনে ঋষির রোষের বিষয় প্রকাশ পায় ; কিন্তু দুর্ব্বাসার এই অভিসম্পাতই নাটকের মেরুদণ্ড, এই অভিসম্পাতের ফলেই নাটকের গতি ভিন্ন পন্থা পরিগ্রহ করে, এই নেপথ্যে-সংঘটিত ঘটনাই নাটকের নাটকত্ব। রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার অঙ্গুলিতে যে অঙ্গুরীয়ক পরাইয়া দিয়া যান, রাজার নামাঙ্কিত সেই অঙ্গুরীয়কটী ঋষি-কথিত অভিজ্ঞানের কাজ করিবে, এই মনে করিয়াই তখন সখীদ্বয়ের চিত্ত প্রবুদ্ধ হইল। তবে শকুন্তলাকে তাঁহারা সে দুঃসংবাদের বিষয় কিছুই জ্ঞাপন করিলেন না। কেন-না,—"কো দাব উণ্হোদএণ ণোমালিঅং সিঞ্চদি।" 'কোন্ ব্যক্তি উষ্ণোদক দ্বারা নবমালিকাকে সেচন করিয়া থাকে?' এই বলিয়া সখীদ্বয় সে ঘটনা অন্তরে রাখিয়া দিলেন। যেমন দুষ্মন্তের অভিসম্পাত, তেমনই অঙ্গুরীয়ক অভিজ্ঞান,—এই দুই ঘটনাই নাটকের প্রাণভূত।

রাজা দুষ্মন্ত যে সময়ে কণ্ব মুনির আশ্রমে আসিয়া অতিথি হইয়াছিলেন এবং শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, কণ্ব মুনি সে সময়ে আশ্রমে ছিলেন না। তিনি তীর্থযাত্রায় গমন করিয়াছিলেন। রাজা রাজধানীতে চলিয়া গেলে, শকুন্তলার ও সখীদ্বয়ের মনে নানা দুশ্চিন্তার উদয় হয়। মুনির অজ্ঞাতসারে এই বিবাহ হইয়াছে, প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি কি বলিবেন,—এই চিন্তায় তাঁহারা অধীর হইয়া উঠেন। কিন্তু মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তদ্বিষয়ে অন্য মত প্রকাশ করেন না; বরং শকুন্তলা গান্ধর্ব্ব-বিবাহে রাজা দুষ্মন্তের সহিত পরিণীতা হইয়াছেন জানিয়া মহর্ষি সন্তোষ প্রকাশ করেন, এবং শকুন্তলাকে দুষ্মন্তের রাজধানীতে প্রেরণের জন্য উৎসুক হন। ইহার পর শকুন্তলার রাজধানীতে যাত্রা। আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া শকুন্তলা যখন রাজধানীতে গমন করিতেছেন, সে দৃশ্য বড়ই মর্ম্মভেদী। সেখানে স্বভাবের বর্ণনাও যেমন পরিস্ফুট, বিচ্ছেদের বেদনাও তেমনই মর্ম্মস্পর্শী। মহর্ষি কণ্বের নয়নদ্বয় বাষ্পভরে অবরুদ্ধ হইয়া আসিল। তিনি মনে মনে কহিলেন,—'বনবাসী তপস্বী হইয়াও স্নেহ-বশে আমি যখন এত ব্যাকুল হইয়াছি, না-জানি তনয়া-বিচ্ছেদে সংসারীরা কত ব্যথাই অনুভব করে!' ইহার পর মহর্ষি শকুন্তলাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন,—'মা, তুমি যযাতির শর্ম্মিষ্ঠার ন্যায় ভর্ত্তার আদরণীয়া হও এবং রাজচক্রবর্ত্তী-লক্ষণাক্রান্ত একটী তনয় লাভ কর।' এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া হোমাগ্নির চতুষ্পার্শ্বে শকুন্তলাকে পরিক্রমণ করাইলেন। তদনন্তর মহর্ষি বনদেবতা-সমন্বিত তপোবনস্থিত বৃক্ষসকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—'তোমাদের জলসেক না করিয়া যে শকুন্তলা অগ্রে জলপান করিতে ইচ্ছা করিতেন না, এবং ভূষণপ্রিয়া হইয়াও স্নেহপ্রযুক্ত যে শকুন্তলা তোমাদের একটীমাত্র পল্লব ছিন্ন করিতেন না, তোমাদের পুষ্পোদ্গম-সময়ে প্রথমেই যাঁহার উৎসব হইত, সেই শকুন্তলা অদ্য পতিগৃহে গমন করিতেছেন; অতএব তোমরা সকলে এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান কর।' তখন আকাশ-বাণীতে মঙ্গলধ্বনি উত্থিত হইল। বনদেবতাগণ যেন শকুন্তলার পতিগৃহে গমনে অনুমতি করিলেন। এই সময়ে আশ্রম-পরিত্যাগে শকুন্তলার কষ্টের বিষয় অনুধাবন করিয়া প্রিয়ম্বদা কহিলেন,—'এই তপোবন-বিরহে তুমিই যে কেবল কাতর হইয়াছ, তাহা নহে। তোমার বিরহে তপোবনের অবস্থা অবলোকন কর। ঐ দেখ! হরিণীগণ কুশগ্রাস-উদ্গীরণ করিতেছে! ময়ূরী-সকল আনন্দের সহিত নৃত্য করিয়া থাকে; কিন্তু ঐ দেখ!—আজ তাহারা তোমার বিরহ-আশঙ্কায় সে আনন্দ পরিত্যাগ করিয়াছে! আরও দেখ,—পরিণত-পত্র পতন-ছলে তোমার বিরহে লতা-সকল যেন অশ্রুপাত করিতেছে।' শকুন্তলা মাধবী-লতা-সমীপে গমন করিয়া আলিঙ্গন করিলেন; কহিলেন,—'লতাভগিনী! শাখা-রূপ বাহুযুগল দ্বারা আমাকে প্রত্যালিঙ্গন কর। আজ হইতে তোমাদিগের দূরবর্ত্তিনী হইলাম।' পিতাকে কহিলেন,—'পিতঃ! আমার ন্যায় ইহাদিগকে স্নেহের চক্ষে দেখিবেন।' ইহার পর শকুন্তলা কখনও সখীদিগের হস্ত ধারণ করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিলেন, কখনও বা আশ্রমের সংবাদ পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ইত্যবসরে এক মৃগশিশু আসিয়া, তাঁহার চরণ আক্রমণ-পূর্ব্বক বসন-প্রান্তে সংলগ্ন হইল। এই মৃগশিশুকে মাতৃহীন

অবস্থায় পাইয়া শকুন্তলা প্রতিপালন করিয়াছিলেন। শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছেন বুঝিয়া, সে যেন পথ আবরোধ করিয়া দাঁড়াইল। শকুন্তলা তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন; বুঝাইয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন,—'আমার পিতা মহর্ষি কণ্ব তোমার বিষয় চিন্তা করিবেন; তুমি ব্যাকুল হইও না;—আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হও।' অবশেষে, শিষ্যদ্বয় সহ শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ সময়ে মহর্ষি উপদেশ দিলেন,—

"শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্ত্তুর্ব্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভোগেবনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃকুলাস্থধয়ঃ॥"

'পতিগৃহে গমন করিয়া গুরুজনের সেবা-শুশ্রূষায় ব্রতী হইবে। সপত্নীগণের প্রতি প্রিয়-সখীর ন্যায় ব্যবহার করিবে। পতি তিরস্কার করিলেও কদাচ ক্রুদ্ধ হইবে না বা তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিবে না। আপনার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, পরিজনগণের সুখের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবে। এইরূপ আচরণ করিলেই যথার্থ গৃহিণীপদবাচ্য হইতে পারিবে। ইহার বিপরীত আচরণে কুলের পীড়াদায়িনী হইতে হইবে।' ইহার পর, পিতা কণ্বের, মাতা গৌতমীর ও সখীগণের নিকট বিদায় লইয়া, শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত নামক কণ্বের শিষ্যদ্বয়ের সমভিব্যাহারে শকুন্তলা পতি-গৃহে গমন করিলেন। পতিগৃহে গমন-কালে শকুন্তলা সখীদ্বয়ের উপদেশ-ক্রমে অভিজ্ঞান-রূপ রাজপ্রদত্ত অঙ্গুরী সঙ্গে লইয়া গেলেন। শিষ্যগণ সহ শকুন্তলা রাজ-সমীপে উপনীত হইলে, দুর্ব্বাসার অভিশাপ-ক্রমে রাজা শকুন্তলাকে চিনিতে পারিলেন না। শকুন্তলার অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয়ক রাজধানীতে আগমন-কালে জলমধ্যে নিপতিত হয়। সুতরাং শকুন্তলা সে অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয়ক প্রদর্শনেও সমর্থ হইলেন না। রাজা দুষ্মন্ত কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়া শকুন্তলা শোকাভিভূতা হইয়া পড়েন। সেই সময়ে অপ্সরার ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্টা তেজোসম্পন্না স্ত্রী-মূর্ত্তি আসিয়া, তাঁহাকে অজ্ঞাত-অজ্ঞানিত দেশে লইয়া যায়। শকুন্তলা অদৃশ্যা হইলে, এক ধীবরের নিকট রাজকর্ম্মচারীরা সেই অঙ্গুরীয়ক প্রাপ্ত হন। ধীবর মৎস্যের উদরে সেই অঙ্গুরীয়ক প্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন অঙ্গুরীয়ক-দৃষ্টে রাজার পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগরুক হয়। রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন। কণ্ব-শিষ্যদ্বয় যখন শকুন্তলাকে সঙ্গে লইয়া রাজার নিকট উপস্থিত হন, রাজা দুষ্মন্ত তখন বলিয়াছিলেন,—'ইহাঁকে যে কোন কালে বিবাহ করিয়াছি, তাহা স্মরণ হয় না। সুতরাং কিরূপে এই গর্ভবতী কামিনীকে গ্রহণ করিয়া অক্ষত্রিয় বলিয়া হই!' ইহার পর শকুন্তলা অদৃশ্য হইলে রাজা যখন ধীবরপ্রদত্ত অঙ্গুরীয়ক দেখিতে পাইলেন, তখন একে একে সকল কথা তাঁহার স্মৃতি-পথে জাগিয়া উঠিল। অঙ্গুরীয়ক-দৃষ্টে বিদূষকের সহিত রাজার কথোপকথনে তাঁহার অনুশোচনা পরিস্ফুট। রাজা কহিলেন,—"যখন তপোবন হইতে রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হই, প্রিয়া বাষ্পাকুল-লোচনে কহিতে লাগিলেন,—'আর্য্যপুত্র! আবার কত বিলম্বে আমাকে স্মরণ করিবেন?' আমি তখন প্রিয়ার কোমল কর-পল্লব ধরিয়া বলিলাম,—'আমার নামাঙ্কিত এই অঙ্গুরীয়ক

তোমার অঙ্গুলিতে রহিল। এই অঙ্গুরীয়কে আমার যে নামাক্ষর লিখিত আছে, সেই অক্ষর এক এক দিন এক একটী গণনা করিবে। যেদিন গণনা শেষ হইবে, তুমি নিশ্চয় জানিও, সেই দিন আমার অন্তঃপুরস্থিত লোক আসিয়া তোমায় লইয়া যাইবে।* 'একৈকমত্র দিবসে দিবসে মদীয়ং নামাক্ষরং গণয় গচ্ছসি যাবদন্তম্। তাবৎ প্রিয়ে মদবরোধনিদেশবর্ত্তী নেতা জনস্তব সমীপমুপৈষ্যতীতি॥' কিন্তু আমি অতি নিষ্ঠুর, অতি পাপাত্মা, তাই মোহবশতঃ প্রিয়াকে আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করিতে বিস্মৃত হইলাম!" রাজা যখন শকুন্তলার চিন্তায় এইরূপ ব্যাকুল, সেই সময়ে দৈত্যগণের উপদ্রবে অধীর হইয়া, ইন্দ্রের সারথি মাতলি রাজা দুষ্মন্তের নিকট দৈত্য-দমনে সাহায্যপ্রার্থী হন। ইন্দ্রের রথে আরোহণ করিয়া রাজা দুষ্মন্ত যখন গন্ধর্ব্বাবাসে হেমকূট-পর্ব্বতে উপনীত হন, সেই সময়ে অদূরে একটী বালককে সিংহ-শিশুর সহিত ক্রীড়া করিতে দেখিতে পান। বালককে দেখিয়াই রাজার মনে অপত্য-স্নেহের উদয় হয়। রাজা সবিস্ময়ে মনে মনে কহিলেন,—

"মহতস্তেজসো বীজং বালোঽয়ং প্রতিভাতি মে।
স্ফুলিঙ্গাবস্থয়া বহ্নিরেধোঽপেক্ষ ইব স্থিতঃ॥"

'এই বালক মহত্তেজের বীজ-স্বরূপ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। এখন স্ফুলিঙ্গ অবস্থায় থাকিয়া কাষ্ঠের অপেক্ষায় রহিয়াছে।' বালকের ক্রিয়া-কলাপ দেখিয়া রাজার মন বালকের প্রতি ক্রমে আকৃষ্ট হইল। সিংহশিশুকে মুক্তিদান জন্য রাজা বালকের হস্ত ধরিলেন; অঙ্গ-স্পর্শে রাজার দেহে যেন বিদ্যুৎ-সঞ্চার হইল। রাজা মনে মনে কহিলেন,—

"অনেন কস্যাপি কুলাঙ্কুরেণ স্পৃষ্টস্য গাত্রে সুখিতা মমৈবম্।
কাং নির্ব্বৃতিং চেতসি তস্য কুর্য্যাদ্যস্যায়মঙ্গাৎকৃতিনঃ প্রসূতঃ॥"

'এ কোন্ ব্যক্তির কুলাঙ্কুরকে স্পর্শ করিয়া আমার এমন সুখ অনুভব হইল! এ বালক যাহার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই কৃতকৃত্য ব্যক্তি যে কত সুখ লাভ করে, তাহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না।' প্রথমে শিশুকে তপস্বি-পুত্র বলিয়া রাজার ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল; কিন্তু ক্রমশঃ তত্রত্য তাপসগণের সহিত কথাবার্ত্তায় বালককে পৌরব-বংশীয় রাজপুত্র বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। বালকের নাম—সর্ব্বদমন। বালক মাতার নিকট যাইবার জন্য ব্যাকুল হইল। এই সময় বালকের জননী শকুন্তলা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের মিলন ঘটিল। অনুশোচনায় রাজার বক্ষঃস্থল অশ্রু-প্লাবিত হইল। যাহা হউক, এই মিলনের পর শকুন্তলার সহিত রাজা দুষ্মন্ত শেষজীবন

---

* রাজার এই উক্তিতে রাজা ঠিক কত দিন পরে শকুন্তলাকে লইয়া যাইবেন বলিয়াছিলেন, বুঝা যায় না। তাঁহার নাম—সহজ-দৃষ্টিতে তিন অক্ষর বিশিষ্ট হইলেও, যুক্তাক্ষর হিসাবে অথবা তাঁহার উপাধি প্রভৃতির হিসাবে, অধিক অক্ষর-বিশিষ্টও হইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ এ স্থলে দুই চারি দিন মধ্যে অর্থই সূচিত হয়। তবে এখানে কেহ কেহ কবির এক কৌশলের উল্লেখ করেন। পুরুবংশীয় রাজা দুষ্মন্ত মিথ্যাবাদী না হন, অথচ নাটকীয় ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত অক্ষুন্ন থাকে,—এই উদ্দেশ্যেই তিনি দুষ্মন্তের মুখে ঐরূপ উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু শকুন্তলার সহিত রাজার পুনর্ম্মিলন পাঁচ বর্ষ পূর্ব্বে সংঘটিত হয় নাই। সুতরাং রাজা দুষ্মন্ত যে প্রতিজ্ঞা-পালনে সমর্থ হন নাই, তাহাই বুঝা যায়।

সুখে অতিবাহিত করেন। ইহাই শকুন্তলা-নাটকের স্থূল ঘটনা। মহাভারত হইতে এই নাটকের উপাদান পরিগৃহীত হইয়াছে বলিয়া সাধারণতঃ প্রকাশ।* শকুন্তলা-নাটক যেমন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে হৃদয় উদ্বেলিত করে, তেমনই ইহার বর্ণনা-মাধুর্য্যে প্রাণ পুলকিত করিয়া তুলে। একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। কণ্ব-শিষ্য উষাকালে শয্যা-ত্যাগ করিয়া গুরুর হোমাগ্নির উপাদান সংগ্রহ করিতেছেন। সেই সময়ে নিশাশেষে প্রভাতাগমে প্রকৃতির যে মনোহর দৃশ্য, শিষ্যের স্বাগতোক্তিতে তাহা সুপরিস্ফুট। যথা,—

"যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনামাবিস্কৃতারুণপুরঃসরঃ একতোঽর্কঃ।
তেজোদ্বয়স্য যুগপদ্ব্যসনোদয়াভ্যাং লোকো নিয়ম্যত ইবৈষ দশান্তরেষু॥

অপিচ। অন্তর্হিতে শশিনি সৈব কুমুদ্বতীয়ং দৃষ্টিং ন নন্দয়তি সংস্মরণীয়শোভা।
ইষ্টপ্রবাসজনিতান্যবলাজনেন দুঃখানি নূনমতিমাত্রদুরুব্বহানি॥

অপিচ। কর্কন্ধুনামুপরি তুহিনং রঞ্জয়ত্যগ্রসন্ধ্যা দার্ভং মুঞ্চত্যুটজপটলং বীতনিদ্রো ময়ূরঃ।
বেদিপ্রান্তাৎ খুরবিলিখিতাদুত্থিতশ্চৈষ সদ্যঃ পশ্চাদুচ্চৈর্ভবতি হরিণঃ স্বাঙ্গমায়চ্ছমানঃ॥

অপিচ। পাদন্যাসং ক্ষিতিধর গুরোর্মূর্দ্ধ্নি কৃত্বা সুমেরোঃ
ক্রান্তং যেন ক্ষয়িততমসা মধ্যমং ধাম বিষ্ণোঃ।
সোঽয়ং চন্দ্রঃ পততি গগনাদল্পশেষৈর্ময়ূখৈ-
রত্যারূঢ়ির্ভবতি মহতামপ্যপভ্রংশনিষ্ঠা॥"

'এক দিকে ওষধিপতি চন্দ্র অস্তাচল শিখরে গমন করিতেছেন, অন্যদিকে অরুণ-সারথিকে অগ্রে করিয়া সূর্য্যদেব প্রকাশিত হইতেছেন। এইরূপে একেবারেই চন্দ্র ও সূর্য্যরূপ তেজোদ্বয়ের বিপদ ও অভ্যুদয়ের দ্বারা এই ভুবনস্থিত লোকদিগকে যেন সুখ-দুঃখাত্মক অবস্থা-বিশেষে নিয়মিত করিতেছে। ফলতঃ, লোকসকলের অবস্থা চিরদিন সমানভাবে যায় না—ইহাতেই বোধ হইতেছে। আরও, চন্দ্র যখন নয়ন-পথ হইতে অন্তর্হিত হইলেন, তখন এই কুমুদিনীর শোভা দর্শনীয় না হইয়া স্মরণীয় হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এক্ষণে ম্লান হইয়া আর নয়নের আনন্দ জন্মাইতে পারিতেছে না। অতএব ইহাতে বোধ হইতেছে যে, জনগণের প্রিয়জনের প্রবাস-জনিত দুঃখভার একান্তই অসহ্য হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। আরও, এই প্রাতঃসন্ধ্যা, পরিপক্ক বদরী ফলের উপরে নিপতিত শুভ্র তুষারকে লোহিতবর্ণ করিয়া তুলিতেছে, এবং ময়ূরগণ নিদ্রার অপগমন হইলে পর, কুশ-বিরচিত পর্ণশালার উপরিপটল (চাল) হইতে ভূমিতলে নামিয়া আসিতেছে, ও হরিণী-গণ স্বকীয় খুরক্ষুণ্ন বেদিপ্রান্ত হইতে উত্থিত হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় অঙ্গ অগ্র ও পশ্চাৎভাগে প্রসারিত করিয়া দণ্ডায়মান হইতেছে। আরও, যিনি ধরাধরের গুরু সুমেরুর বা পূজার্হ

* কবিবর শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার মহাশয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন,—'শকুন্তলা' নাটকের গল্পাংশ 'পদ্মপুরাণ' হইতে পরিগৃহীত। পদ্মপুরাণের বর্ণনার সহিত 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকের যেরূপ সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়, মহাভারতের সহিত তাদৃশ সামঞ্জস্য দেখা যায় না। এখানে কেহ কেহ পদ্মপুরাণের ঐ অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন। যাহা হউক, বিহারিলাল বাবুর পূর্ব্বে পদ্মপুরাণের বর্ণনার সহিত এই সামঞ্জস্যের বিষয় অপর কেহই প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।

ব্যক্তির মস্তকে কিরণবিন্যাস পক্ষে পদবিন্যাস করিয়া ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর মধ্যম ধাম (অর্থাৎ আকাশমণ্ডল) আক্রমণ করিয়াছেন, সেই এই চন্দ্র এক্ষণে অল্পাবশিষ্ট কিরণ সহিত গগন তল হইতে নিপতিত হইতেছেন। যেহেতু অতিশয় প্রধান হইলেও যে ব্যক্তি অতি উন্নত ব্যক্তির মস্তকে অধিরোহণ করে, তাহার এইরূপই পতন হইয়া থাকে।' আর অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এরূপ বর্ণনা অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়। শকুন্তলা নাটকে সমসাময়িক কতকগুলি চিত্র প্রকটিত দেখিতে পাই। সেই সময়ে এ দেশের বাণিজ্য ও শিল্প যে বিশেষ প্রতিষ্ঠান্বিত ছিল, রাজা দুষ্মন্তের কয়েকটী উক্তিতে তাহা বেশ প্রতিপন্ন হয়। শকুন্তলা-দর্শনে রাজার চিত্ত তৎপ্রতি প্রধাবিত। রাজা চিত্তকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিতেছেন না। তিনি কার্য্যান্তরে যাইতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহার চিত্ত শকুন্তলার পশ্চাৎ প্রধাবিত হইতেছে। নাটকের প্রথম অঙ্কের শেষে রাজার কথায় তাহা এইভাবে ব্যক্ত আছে,—

"গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য॥"

অর্থাৎ,—'আমার শরীর অগ্রে অগ্রে যাইতেছে বটে, কিন্তু চঞ্চল চিত্ত প্রতিকূল পবন দ্বারা নীয়মান ধ্বজস্থিত চীনদেশোৎপন্ন সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ডের ন্যায় পশ্চাদ্ভাগে ধাবিত হইতেছে।' এই উপমায়, চীনদেশোৎপন্ন রেশমী বস্ত্র রথধ্বজে ব্যবহৃত হইত, তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। বাণিজ্য-সম্বন্ধ বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত না থাকিলে, বস্ত্রাদির একরূপ আদান-প্রদান কদাচ সম্ভবপর নহে। ইহাতে বৈদেশিক বাণিজ্যের যেরূপ পরিচয় পাই, অন্য এক স্থলের একটী উক্তিতে এ দেশের তাৎকালিক চিত্র-শিল্পের উৎকর্ষের প্রমাণও তদ্রূপ প্রাপ্ত হই। শকুন্তলার শোকে রাজা দুষ্মন্ত যখন মুহ্যমান, চেটী তখন তাঁহাকে একখানি চিত্র প্রদর্শন করেন। সেই চিত্র—শকুন্তলার প্রতিকৃতি। চিত্র এতই স্বাভাবিক হইয়াছিল যে, চিত্র দর্শনে রাজা তাহাতে শকুন্তলাকে যেন প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন। শকুন্তলার সেই চিত্র-দর্শনে রাজার উক্তি,—

"দীর্ঘাপাঙ্গবিসারিনেত্রযুগলং লীলাঞ্চিতভ্রূলতাং
দন্তান্তঃ পরিকীর্ণহাসকিরণজ্যোৎস্নাবিলিপ্তাধরম্।
কর্কন্ধুদ্যুতিপাটলোষ্ঠরুচিরং তস্যাস্তদেতন্মুখং
চিত্রেপ্যালপতীব বিভ্রমলসৎপ্রোদ্ভিন্নকান্তিদ্রবম্॥
অস্যাস্তুঙ্গমিব স্তনদ্বয়মিদং নিম্নেব নাভিঃ স্থিতা
দৃশ্যন্তে বিষমোন্নতাশ্চ বলয়ো ভিত্তৌ সমায়ামপি।
অঙ্গে চ প্রতিভাতি মার্দ্দবমিদং স্নিগ্ধপ্রভবাচ্চিরং
প্রেম্না মন্মুখমীষদীক্ষত ইব স্মেরা চ বক্তীব মাম্॥"

অর্থাৎ,—'ইহাঁর নয়নযুগল আকর্ণগামী অপাঙ্গ-দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, ভ্রূ-লতা—বিলাস দ্বারা অতি মনোহর হইয়াছে; অধর—দন্তপংক্তির হাস্য-কিরণচ্ছটায় বিলুপ্ত, ওষ্ঠ—বদরীফলের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট; এই সকল দ্বারা মনোহর এবং পরম শোভান্বিত ও বিলসিত স্বেদবিন্দু-বিশিষ্ট প্রিয়ার এই মুখমণ্ডল চিত্রগত হইলেও, আমার সহিত তিনি যেন আলাপ করিতেছেন। আরও, এই চিত্র-ফলক সমতল হইলেও ইহার স্তনযুগল উন্নতের ন্যায় এবং নাভিদেশ উচ্চ-

নীচ বলিয়া প্রতীত হইতেছে। আর তৈলাক্ত বর্ণের শক্তিবিশেষ হেতু এই দৃশ্যমান্ মৃদুতা স্থায়িত্বরূপে প্রকাশমান হইতেছে, এবং প্রণয়বশে প্রিয়া যেন আমার মুখমণ্ডল ঈষৎ অবলোকন করিতেছেন এবং মৃদু মৃদু হাস্য-সহকারে আমাকে যেন কি বলিতেছেন।' চিত্র কিরূপ স্বাভাবিক হইয়াছিল, এ বর্ণনায় বেশ উপলব্ধি হয়। পরন্তু এ বর্ণনা—সুন্দর তৈলচিত্র-প্রস্তুতের কৃতিত্বের পূর্ণ নিদর্শন। শকুন্তলা নাটকের দুই প্রকার সংস্করণ অধুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে। একবিধ সংস্করণ দাক্ষিণাত্যে পাওয়া গিয়াছে; অন্যবিধ সংস্করণ বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে। দাক্ষিণাত্য-প্রচলিত সংস্করণ কিছু সংক্ষিপ্ত এবং নাটকের বিশেষ বিশেষ অংশ উহার মধ্যে নিবদ্ধ আছে। ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন, বঙ্গদেশ-প্রচলিত সংস্করণে যে সকল অতিরিক্ত পাঠ দৃষ্ট হয়, তাহা প্রক্ষিপ্ত। আমরা কিন্তু সেরূপ মনে করি না। গ্রন্থকারগণ নাটক যেরূপভাবে রচনা করেন, অভিনয়-কালে তাহা ঠিক সেরূপ-ভাবে অভিনীত হয় না। অভিনয়ের সময় প্রায়ই স্থান-বিশেষ বা অংশ-বিশেষ পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যে অভিনয়ের জন্য ঐ নাটক গিয়াছিল বলিয়াই উহার অংশ-বিশেষ বাদ পড়িয়া গিয়াছে। এই বিষয় একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেও নাটককারকে বঙ্গদেশীয় বলিয়া বুঝা যায়। তিনি নাটকখানি যে ভাবে লিখিয়াছিলেন, সেই ভাবে উহা বঙ্গদেশে প্রচলিত থাকে; অন্য প্রদেশে অভিনেতা-অভিনেত্রীর মুখে অভিনীতব্য অংশমাত্র প্রচারিত হইয়া পড়ে।

মহাকবি কালিদাসের অপর একখানি দৃশ্য-কাব্য—বিক্রমোর্ব্বশী। বিক্রমোর্ব্বশী—ত্রোটক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। উহা পাঁচ অঙ্কে সম্পূর্ণ। সুরাঙ্গনা উর্ব্বশী কৈলাসপতি কুবেরের নিকট গমন করিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্ত্তন-কালে পথে দৈত্যগণ তাঁহাকে বন্দী করে। তাঁহার সঙ্গিনী অপ্সরা-সকল 'পরিত্রাণ কর—পরিত্রাণ কর' বলিয়া মহারাজ পুরুরবার শরণাপন্ন হয়। নেপথ্যে ক্রন্দন-ধ্বনি ও পরিত্রাহি রব এবং পরিশেষে প্রকাশ্যে রঙ্গ-স্থলে রাজার আবির্ভাব ও অপ্সরাগণকে অভয়-প্রদান,—ইহাই নাটকের উপক্রমণিকা। অসুরগণ কোন্ দিকে উর্ব্বশীকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহা অবগত হইয়া, রাজা পুরুরবা অশ্বারোহণে তৎপ্রতি প্রধাবিত হন। পুরুরবার বাহুবলে উর্ব্বশীর উদ্ধার-সাধন হয়। অল্পক্ষণ পরেই রাজা উর্ব্বশীকে সঙ্গে লইয়া রঙ্গস্থলে অবিভূর্ত হন এবং অপ্সরাগণকে আশ্বাস প্রদান করেন। উর্ব্বশী ত্রাসে সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছিলেন। শুশ্রূষায় তাঁহার সংজ্ঞা লাভ হয়। উর্ব্বশীর সংজ্ঞালাভ কালে রাজা হর্ষ-সহকারে তাঁহার সখীগণকে বলেন,—

বিক্রমোর্ব্বশী।

"আবির্ভূতে শশিনি তমসা রিচ্যমানেব রাত্রি-
নৈশস্যার্চ্চি র্হুতভূজ ইব চ্ছিন্নভূয়িধূমা।
মোহেনান্তর্বরতনুরিয়ং লক্ষ্যতে মুচ্যমানা,
গঙ্গারোধঃ পতনকলুষা গচ্ছতীব প্রসাদম্॥"

'দেখ,—শীতাংশুর উদয় হইলে যামিনী যেমন ক্রমে ক্রমে অন্ধকার-মুক্ত হয়, নিশাকালে অনলের শিখা যেমন প্রভূত ধূম হইতে বিমুক্ত হইয়া উজ্জ্বল হয়; সেইরূপ তোমাদের শোভনাঙ্গী প্রিয়সখী অন্তর্গত মোহ হইতে ক্রমে ক্রমে নির্ম্মুক্ত হইতেছেন। অবরোধ-মুক্তা গঙ্গার ন্যায় ইনি চিত্তপ্রসাদ লাভ করিতেছেন। শুশ্রূষার সময় উর্ব্বশীর প্রতি নৃপতির এবং

নৃপতির প্রতি উর্ব্বশীর প্রেম-সঞ্চার হয়। ইহার পর উভয়ে আপন আপন আবাসে প্রস্থান করেন। পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় সস্পৃহ নয়নে উর্ব্বশী রাজাকে অবলোকন করিতে থাকেন। রাজাও মনে মনে বলেন,—'রাজহংসী যেমন খণ্ডিতাগ্র মৃণাল হইতে সূত্র নিষ্কাষণ করে, এই সুরাঙ্গনা সেইরূপ আমার দেহ হইতে মানস আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিল।' দ্বিতীয় অঙ্কে এক দিকে বিদূষকের সহিত রাজার কথোপকথনে উর্ব্বশীর প্রতি রাজার প্রেম-সঞ্চারের বিষয় পরিস্ফুট; অন্য দিকে সখী চিত্রলেখার সহিত উর্ব্বশীর কথোপকথনে রাজার প্রতি উর্ব্বশীর একান্তানুরাগের ভাব প্রকাশ। রাজা পুরুরবা উদ্যান মধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, উর্ব্বশী সহসা সেখানে উপস্থিত হইলেন। পরস্পরের পুনরায় সাক্ষাৎকালে প্রণয় ঘনীভূত হইল। এই সময় সহসা নেপথ্যে দেবদূত চিত্রলেখাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"মহর্ষি ভরত অষ্টরসপ্রধান 'লক্ষ্মী-স্বয়ম্বর' নামক রূপক (নাটক) রচনা করিয়া তোমাদের শিক্ষার্থ সমর্পণ করিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র লোকপালগণের সহিত সেই নাটকের অভিনয়-দর্শনে সমুৎসুক হইয়াছেন। অতএব তোমরা উর্ব্বশীকে শীঘ্র স্বর্গপুরে প্রেরণ কর।" বিচ্ছেদ ঘটিল। উর্ব্বশীকে দেবধামে নাট্যাভিনয়ের জন্য গমন করিতে হইল। ভূর্জ্জপত্রে লিখিত উর্ব্বশীর একখানি প্রেমপত্র রাজার হস্তে ছিল। উর্ব্বশীর সহিত কথোপকথনে রাজার অজ্ঞাতসারে সে পত্র তাঁহার হস্ত-স্খলিত হয়। উর্ব্বশী চলিয়া গেলে, সেই পত্রের বিষয় হঠাৎ রাজার মনে পড়িল। রাজা ও বিদূষক উভয়েই পত্রের অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু পত্র মিলিল না। বিদূষক প্রবোধ দিলেন,—"মহারাজ! সে ভূর্জ্জপত্র স্বর্গীয়; অতএব তাহা উর্ব্বশীর সঙ্গে গিয়াছে।' এই সময় সঙ্গিনী চেটী সমভিব্যাহারে ঔশীনরী তথায় উপস্থিত হইলেন। ঔশীনরী—মহারাজ পুরুরবার সহধর্ম্মিণী। চেটী ও ঔশীনরী লতা-বিটপের অন্তরালে থাকিয়া রাজার ও বিদূষকের কথোপকথন শুনিতে পাইলেন। অল্পক্ষণ পরেই সেই ভূর্জ্জপত্র তাঁহাদের নয়নপথে পতিত হইল। তাঁহারা সেই পত্র পাঠ করিয়া দেখিলেন,—উর্ব্বশী মহারাজের উদ্দেশ্যে কাব্য রচনা করিয়া অক্ষর-বিন্যাস করিয়াছে। মর্ম্মানুধাবনে বুঝিলেন,—রাজা অপ্সরার প্রতি অনুরক্ত; অপ্সরাও তাঁহাতে অনুরাগিণী। রাজ্ঞী ঔশীনরী ও চেটী আরও কিছুক্ষণ অলক্ষ্যে থাকিয়া রাজার কথাবার্ত্তা হাবভাব লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। তাঁহারা শুনিলেন, দেখিলেন—রাজা অপ্সরার মোহে উন্মত্তপ্রায়! রাজা মলয় পবনকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—"বাসার্থং হরসম্ভৃতং সুরভিতং পৌষ্পং রজো বিরুধাং, কিং কার্য্যং ভবতো হৃতেন দয়িতা-স্নেহস্বহস্তেন মে। জানাত্যেয় ভবান্‌বিনোদন শতৈরেবম্বিধৈ ধারিতং, কামার্থং জনমঞ্জসাভিভবিতু নালম্বিতা শ্বাসনং।" অর্থাৎ,—'হে বসন্তসহায় মলয়পবন! পুষ্পের সুরভি অপহরণ করিয়া আপনি সৌগন্ধযুক্ত হন। আমার দয়িতা আমার প্রতি স্নেহপ্রকাশে যে পত্র প্রদান করিয়াছিলেন, সেখানি অপহরণ করিয়া আপনার কি লাভ হইল! এবম্বিধ পত্র বিরহিগণের জীবন দান করে। আপনি জগৎপ্রাণ হইয়া কেন বিরহিগণের প্রাণভূত লিপি অপহরণ করিলেন!' এইরূপ ব্যাকুলতার সহিত রাজা ভূর্জ্জপত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এই সময় সহসা রাজ্ঞী ঔশীনরী সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—"অজ্জউত্ত! অলং আবেএণ; এদং তং ভুজ্জবত্তং।" 'আর্য্যপুত্র! উদ্বিগ্ন হইতেছেন কেন? এই সেই ভূর্জ্জপত্র!' রাজা লজ্জায় অধোবদন

হইলেন,—রাজ্ঞীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অতঃপর ঔশীনরী রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলেন। তৃতীয় অঙ্কে গালব ও পৈলব নামধেয় ভরতের শিষ্যদ্বয়ের মুখে ইন্দ্রালয়ে উর্ব্বশীর অভিনয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। উহাতে প্রকাশ,—ইন্দ্রালয়ে লক্ষ্মী-স্বয়ম্বর নাটকের অভিনয় করিতে গিয়া, উর্ব্বশী লক্ষ্মীর অংশ অভিনয়ে প্রবৃত্ত হন। সেই সময় লক্ষ্মীবেশধারিণী উর্ব্বশীকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল,—'তুমি কাহার প্রতি অনুরাগিণী?' কিন্তু উত্তরে উর্ব্বশী 'পুরুষোত্তম' নামের পরিবর্ত্তে 'পুরুরবার' নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন। ইহাতে মহামুনি ভরত উর্ব্বশীকে অভিসম্পাত দেন,—'আমার আদেশ লঙ্ঘন জন্য তোমার দিব্যজ্ঞান লোপ পাইবে, তুমি স্বর্গভ্রষ্ট হইবে।' কিন্তু ইন্দ্র তাহাতে উর্ব্বশীকে আশীর্ব্বাদ করেন,—'পুরুরবার সহিত তোমার মিলনে যতদিন না তোমার সন্তান-সন্ততি হয়, ততদিন তোমাকে অভিশপ্ত থাকিতে হইবে।' ইহার পর পুনরায় রাজার সহিত উর্ব্বশীর মিলন হয়। এই সময়ে রাজার প্রতি রাজ্ঞীর যে ব্যবহার, তাহাতে আদর্শ হিন্দুরমণীর উজ্জ্বল চিত্র প্রকটিত। রাজার নিকট হইতে অভিমান করিয়া চলিয়া আসার পর রাজ্ঞীর মনে অনুশোচনা উপস্থিত হয়। রাজার প্রাণে ব্যথা দিয়া দুর্ব্বাক্য বলিয়া চলিয়া আসা নিতান্ত গর্হিত কার্য্য হইয়াছে বলিয়া রাজ্ঞী বুঝিতে পারেন। এক্ষণে রাজ্ঞী ব্রতচারিণী হইয়া শুভ্রবসন পরিধানে পুষ্প চন্দন লইয়া রাজার চরণ-পূজায় প্রবৃত্ত হন। রাজা বিস্মিত বিমুগ্ধ। রাজ্ঞীর ঐকান্তিক প্রেম ভালবাসার পরিচয়ে বিমুগ্ধ হইয়া রাজা পুরুরবা রাজ্ঞী ঔশীনরীকে সাদরে গ্রহণ করেন। এই সময় রাজ্ঞী রাজার চরণ-পূজা করিয়া প্রণতিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দেবগণকে সাক্ষী করিয়া বলেন,—"এসা দেবদামিহুণং রোহিণীমিঅলঞ্ছণং সক্খী করিঅ অজ্জউত্তং প্পসাদেমি, অজ্জপ্পহুদি অজ্জউত্তো জং ইত্থিঅং কামেদি জা অ অজ্জউত্তসমাগমপ্পইণী, তাএ সহ অপ্পদিবন্ধেন বট্টিদব্বং।" 'আমি রোহিণী ও মৃগলাঞ্ছন দেবতামিথুনকে সাক্ষ্য করিয়া মহারাজকে প্রসাদিত করিতেছি। আজ হইতে আর্য্যপুত্র যে স্ত্রীকে কামনা করিবেন এবং যে রমণী আর্য্যপুত্রের প্রণয়িনী হইবেন, তাঁহার প্রতি কোনও প্রতিবন্ধকতা প্রদান করিব না।' রাজ্ঞীর অনুষ্ঠিত ব্রতের নাম—'প্রিয়প্রসাদন' ব্রত, অর্থাৎ—যে ব্রতে প্রাণপ্রিয় পতির পরিতুষ্টি-সাধন করিতে পারা যায়, সে ব্রতের তাহাই একমাত্র লক্ষ্য। রাজ্ঞী ঔশীনরী আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়া একমাত্র পতিসুখসাধন-কামনায় এই ব্রতে দীক্ষিত হন। রাজ্ঞীর এবম্বিধ পতিভক্তি দর্শনে উর্ব্বশী ও উর্ব্বশীর প্রিয়সখী চিত্রলেখা উভয়েই বিস্ময়বিমুগ্ধ হন। 'প্রিয়প্রসাদন ব্রত' সমাপনান্তে রাজ্ঞী পরিচারিকাগণ সহ প্রস্থান করেন। প্রস্থানকালে রাজাকে জ্ঞাপন করেন,—'আর্য্যপুত্র। এই ব্রতনিয়মে আমায় বিশেষ সংযতভাবে থাকিতে হইবে। এক্ষণে আপনার সমীপে আমার অবস্থান করা কর্ত্তব্য নহে।' এই বলিয়া, উর্ব্বশীর পার্শ্বে রাজাকে দেখিয়া, অণুমাত্র বিচলিত না হইয়া, রাজ্ঞী অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলেন। উর্ব্বশী ও চিত্রলেখা সহ রাজা প্রমোদোদ্যানে যথেচ্ছভাবে প্রমোদে প্রমত্ত হইলেন। তৃতীয় অঙ্কে উর্ব্বশীর সহিত পুরুরবার মিলন,—এইরূপে সংসাধিত হয়। মিলনের পর রাজা পুরুরবা রাজকার্য্যের ভার অমাত্যের উপর ন্যস্ত করিয়া উর্ব্বশীকে লইয়া কৈলাস-গিরিশিখরে আনন্দে বিহার করিতে থাকেন। সেই সময়ে উদকবতী নামে এক বিদ্যাধর

কন্যা মন্দাকিনী-তীরে বালুকার ক্রীড়া-পর্ব্বত রচনা করিয়া ক্রীড়া করিতেছিল। রাজা অনুরাগ ভরে উদকবতীর প্রতি লোলুপ-দৃষ্টি সঞ্চালন করেন। উর্ব্বশীর ইহাতে অভিমান হয়। রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া উর্ব্বশী বনান্তরে প্রয়াণ করেন। রাজার অনুনয়-বিনয়ে অবহেলা করিয়া, উর্ব্বশী যে কাননে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কুমার কার্ত্তিকেয় সে কাননেব অধিকারী। সে কাননে কোনও রমণীর প্রবেশাধিকার ছিল না। মোহবশে সেই কাননে প্রবেশ করায় উর্ব্বশীর প্রতি ভরত মুনির অভিসম্পাতের ফল ফলিল। কুমারেব উপবনে প্রবেশমাত্র উর্ব্বশী লতারূপে পরিণত হইলেন। উর্ব্বশীর অনুসরণে পুরুরবা কাননাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু উর্ব্বশীকে আর দেখিতে পাইলেন না। উর্ব্বশীর বিবহে রাজা উন্মাদপ্রায় হইলেন। তিনি কখনও তরুরাজিকে সম্ভাষণ করিয়া, কখনও দেবতাগণকে আহ্বান করিয়া, কখনও গিরি-নির্ঝরিণীকে ডাকিয়া, উর্ব্বশীর সন্ধান লইতে ব্যাকুল হইলেন। চতুর্থ অঙ্কের মনোহর অংশ—উর্ব্বশীর অনুসন্ধানে রাজার এই ব্যাকুলতা। রাজা পর্ব্বতকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—'হে মহীধর! তোমার স্ফটিকময় শিলাতলে নির্ম্মল নির্ঝর সকল প্রবাহিত হইতেছে, তোমার শিখরদেশ বহুবিধ কুসুমকুলে সুশোভিত, কিন্নরগণ তোমাতে অবস্থিত হইয়া মনোহর গান করিতেছে। তুমি কি আমার প্রিয়তমাকে দেখিয়াছ?' সরিৎ-সুন্দরীকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—'হে সুন্দরি! আমি তোমায় প্রণতি করিতেছি, তুমি প্রসন্না হও। তোমার সলিল-মধ্যে বিহগগণ ক্ষুব্ধ-চিত্তে ককণ-ধ্বনি করিতেছে। তোমার তীরে মৃগগণ সমুৎসুক-চিত্তে অবস্থিতি করিতেছে। পূর্ব্বদিকগত পবনাহত কল্লোল-রূপ বাহু তুলিয়া নীবনিধি মনোহর নৃত্য কবিতেছে। তুমি বলিয়া দাও—আমার প্রিয়া কোথায় গেল।' এই বলিতে বলিতে হঠাৎ তাঁহার মনে হইল,—তাঁহার প্রিয়া যেন অভি-মানিনী হইয়া তবঙ্গিণীর রূপ পরিগ্রহ কবিয়াছেন। হংস-চক্রবাক-শঙ্খ-কূর্ম্ম যেন তাঁহার আভরণ, জলহস্তী ও মকরাদি দ্বাবা পবিব্যাপ্ত নীল সলিল যেন তাহার উত্তরীয়, তীরদেশে উদ্গত সলিল-সঞ্চালন যেন তাঁহাব হস্ততল, তাহার বর্ণ নবীন মেঘের ন্যায় এবং রূপ দশ দিক আচ্ছাদিত করিয়াছে। তিনি তরঙ্গিণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"প্রিয়ে। আমি প্রিয়বাদী,—তোমাতে নিরুদ্ধচিত্ত। কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলে?" নদী নিরুত্তর! রাজা আবার কহিলেন,—'এ যে মৌনাবলম্বনেই রহিল! অথবা এ যথার্থ ই নদী, উর্ব্বশী নহেন! তাহা না হইলে, পুরুরবাকে পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিবে কেন?' ইহার পর যাহাকে দেখিলেন, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তুমি কি আমার প্রিয়াকে দেখিয়াছ?' রাজা উন্মাদের ন্যায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন, সম্মুখে একখণ্ড শিলা দৃষ্ট হইল। তাহা দেখিয়া রাজার মনে হইল,—'দিনমণি যেন উহাকে তুলিয়া লইবার জন্য নিদেশ করিতেছেন।' কিন্তু পরক্ষণেই প্রস্তবখণ্ডের প্রতি বীতস্পৃহ হইলেন। মনে হইল,—'মন্দারকুসুমে অধিবাসিত হইয়া এ মণি যাহার উত্তমাঙ্গে অর্পণ করিবার যোগ্য, সেই প্রিয়াই যখন নাই, এ মণি কি হইবে?' এই ভাবিয়া মণিখণ্ড পরিত্যাগ করিলেন। এমন সময় নেপথ্যে দৈববাণী হইল,—'বৎস! মণি গ্রহণ কর। এই সঙ্গম-মণি-গ্রহণে প্রিয়জনের সঙ্গম লাভ হইবে।' মণি-গ্রহণের পরই সেই লতার প্রতি রাজার দৃষ্টি পড়িল। রাজা কহিলেন,—'আমার মনে হইতেছে,—

এই সেই। ইহার পল্লব মেঘজালে আর্দ্র হইয়াছে বলিয়া যেন ইহা অশ্রুজলে ধৌতাধর হইয়াছে। কাল-বিরহে পুষ্পোদ্গম না হওয়ায় ইহা যেন আভরণ-শূন্য হইয়া রহিয়াছে। আমার কোপনা প্রিয়তমা, আমি পাদপতিতা হইলেও যেমন আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন; ইহাকেও যেন তাঁহার মত বোধ হইতেছে।' এই বলিয়া রাজা প্রেমভরে লতিকাকে আলিঙ্গন করিলেন। রাজার আলিঙ্গন মাত্রে লতিকা উর্ব্বশীতে পরিণত হইল। এই মিলনের পর রাজা ও উর্ব্বশী রাজধানী প্রতিষ্ঠান-নগরে গমন করেন। ইহার পর কয়েক বৎসর অতীত হইলে উর্ব্বশীর গর্ভে রাজার এক পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। পুত্রের নাম—আয়ু। আয়ুর জন্ম-গ্রহণের পর উর্ব্বশী শাপমুক্ত হন;—ইন্দ্রলোক চলিয়া যান। ইহার পর দৈত্য-দলনে ইন্দ্রের সহায়তার জন্য পুরুরবার প্রতি প্রীত হইয়া ইন্দ্র উর্ব্বশী-পুরুরবার পুনর্ম্মিলন সংঘটন করিয়া দেন। দৈত্যদমনে বিক্রম-প্রদর্শন হেতু উর্ব্বশীকে লাভ করিয়াছিলেন,—এই ঘটনা পরিবর্ণিত আছে বলিয়াই এই নাটকের নাম—'বিক্রমোর্ব্বশী' হইয়াছে।

'মালবিকাগ্নিমিত্রম্'—কাহারও কাহারও মতে কালিদাসের রচনা নহে। অভিজ্ঞান-শকুন্তলোর এবং বিক্রমোর্ব্বশীর সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে বটে। কিন্তু সে সাদৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে কবিত্বের স্ফূর্ত্তি ও সৌন্দর্য্যের বিকাশ তাদৃশ লক্ষিত হয় না; তজ্জন্যই ঐ নাটককে অপরের রচনা বলিয়া কেহ কেহ প্রচার করিয়া থাকেন। কিন্তু কি অভিজ্ঞান-শকুন্তল, কি বিক্রমোর্ব্বশী, কি মালবিকাগ্নিমিত্র, তিনেরই প্রস্তাবনায় কালিদাসের নাম একইভাবে সূত্রধারের মুখে উক্ত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা তিন গ্রন্থই একজনের রচিত বলিয়া সপ্রমাণ হয়। কিন্তু একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিতে গেলে, মালবিকাগ্নিমিত্রকে রঘুবংশ-শকুন্তলা প্রভৃতি কাব্য-নাটকের রচয়িতা মহাকবি কালিদাসের রচনা বলিয়া মনে হয় না। যে যে কারণে বিপরীত ভাব মনে আসে, তাহার কয়েকটীর উল্লেখ করিতেছি। প্রথম,—রঘুবংশ-রচয়িতা কালিদাস গ্রন্থ-সূচনায় যে বিনয়-সৌজন্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন,—এই ক্ষুদ্র দৃশ্যকাব্য-প্রণেতা কালিদাসে তাহার সম্পূর্ণ অসদ্ভাব লক্ষিত হয়। পরন্তু তিনি এই গ্রন্থের সূচনায় অহঙ্কারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। রঘুবংশের প্রথম কয়েকটী শ্লোক (এই খণ্ডের ২৬১ম পৃষ্ঠায়) দেখুন; আর মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রস্তাবনায় সূত্রধারেব মুখে শুনুন—"পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্। সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ভজন্তে মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ॥" ধাবক, সৌমিল্ল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ-যশঃসম্পন্ন আদি-কবিগণের রচিত নাটককে উপেক্ষা করিয়া কেন মালবিকাগ্নিমিত্রের অভিনয় হইতেছে, তাহারই কারণ-প্রদর্শন ব্যপদেশে সূত্রধার ঐ কথা বলিলেন। তিনি কহিলেন,—'সদসৎবিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সর্ব্বপ্রকার দোষগুণ বিচার করিয়া পুরাতন-নূতনের মধ্যে একের আদর করেন। কেবল মূর্খেরাই পরের কথায় নির্ভর করিয়া পুরাতনের অনুসরণ করে। ভালমন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা তাহাদের অতি অল্প।' রঘুবংশ-রচয়িতা কালিদাস মালবিকাগ্নিমিত্র লিখিতে গিয়া যে এরূপ দম্ভের পরিচয় দিবেন, কখনই মনে হয় না। বিশেষতঃ, ধাবকাদি কবি মহাকবি কালিদাসের পরবর্ত্তী বলিয়াও কেহ কেহ প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে স্বতঃই মনে হয়,—মালবিকাগ্নিমিত্রের রচয়িতা তবে কোন্ কালিদাস? ভোজ-প্রবন্ধ মতে ভোজরাজের সভাসদ

মালবিকাগ্নিমিত্র।

এক কালিদাসের পরিচয় পাই। মালবিকাগ্নিমিত্র সেই কালিদাসের রচনা বলিয়াই তাই কেহ কেহ অনুমান করেন। যাহা হউক, মালবিকাগ্নিমিত্রের বর্ণনীয় বিষয় কি, এক্ষণে দেখা যাউক। মালবিকা এবং অগ্নিমিত্রের প্রণয়-কাহিনীই মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রাণভূত। অগ্নিমিত্র এবং তাঁহার পিতা পুষ্পমিত্র—ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। পুষ্পমিত্র—মৌর্য্য-রাজবংশের সেনাপতি ছিলেন। নৃপতিকে হত্যা করিয়া তিনি মগধে সুঙ্গ-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। বিষ্ণুপুরাণে ভবিষ্যরাজবংশ-বর্ণন প্রসঙ্গে পুষ্পমিত্রকে এবং অগ্নিমিত্রকে মগধের অধিপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু নাটকে বিদিশার অধিপতি বলিয়া অগ্নিমিত্র পরিচিত হইয়াছেন। ঐতিহাসিক অগ্নিমিত্র এবং নাটকীয় অগ্নিমিত্র অভিন্ন ছিলেন বলিয়াই প্রতীত হয়। বিদিশায় এবং মগধে উভয়ত্র তাঁহার রাজধানী থাকা অসম্ভব নহে। অগ্নিমিত্রের বিদিশায় অবস্থিতি-কালে যে ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, কবি তাহাই অবলম্বন করিয়া এই দৃশ্যকাব্য প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, ইহাই মনে করা যাইতে পারে। মালবিকাগ্নিমিত্র—পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত। অগ্নিমিত্রের প্রধানা মহিষীর নাম—ধারিণী। মালবিকা—তাঁহার সহচারিণী। মালবিকা—রূপসী—নবযৌবন-সম্পন্না। রাজ-অন্তঃপুরে আবস্থান-কালে নাট্যাচার্য্য গণদাসের নিকট মালবিকা গীত-বাদ্য-নৃত্যে নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন। একে সুন্দরী, তাহাতে নৃত্য-গীতে সুনিপুণা; রাজ্ঞী ধারিণী সেই জন্য মালবিকাকে রাজার দৃষ্টির অন্তরালে রাখিয়াছিলেন। একদিন হঠাৎ রাজ-চিত্রশালার একখানি চিত্রপটের প্রতি রাজার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। সেই চিত্রপটে মালবিকার প্রতিকৃতি অঙ্কিত ছিল। রাজ্ঞী ধারিণীই সেই চিত্রপট অঙ্কিত করাইয়াছিলেন। চিত্রপট-দর্শনে রাজার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। রাজা মনে মনে ভাবিলেন,—যাহার চিত্রপট এত সুন্দর, না-জানি সে নিজে কি অপরূপ সৌন্দর্য্যশালিনী! ঔৎসুক্য বাড়িল। রাজা মালবিকার স্বরূপ পরিচয়ের সন্ধান লইলেন। মালবিকার চাক্ষুস প্রত্যক্ষ লাভের জন্য রাজার ঐকান্তিক আগ্রহ জন্মিল। কিন্তু রাজ্ঞী ধারিণীর কৌশলক্রমে মালবিকা রাজার দৃষ্টি বহির্ভূত রহিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে গণদাস ও হরদত্ত নামক রাজকীয় সঙ্গীতাচার্য্যদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। উভয়েই নৃপতির নিকট সেই বিরোধের মীমাংসা করাইতে গেলেন। অতঃপর রাজা ও রাণী উভয়ে উপস্থিত থাকিয়া দুই নাট্যাচার্য্যের উপর এক নাট্যাভিনয়ের ভার অর্পণ করিলেন। সে নাটক—শর্ম্মিষ্ঠা-প্রণীত চতুষ্পদীযুক্ত 'ছলিক' নাটক। সে নাটকের অভিনয়-প্রদর্শন দুঃসাধ্য। সুতরাং সেই নাটকের অভিনয়ে দুই জনের গুণপনার মীমাংসা হইবে, ইহাই ধার্য্য হইল। যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে নাট্যাচার্য্যগণ অভিনয় আরম্ভ করিলেন। মনোহর মৃদঙ্গধ্বনিতে অভিনয়ের সমাচার বিঘোষিত হইল। নেপথ্যে মালবিকা বাদিত্র-বাদনে ব্রতী ছিলেন। মধুবর্ষী মৃদঙ্গের ধ্বনি কোথা হইতে উত্থিত হইতেছে,—তাহা দেখিবার জন্য রাজা উৎসুক হইলেন। তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন, মালবিকাই মৃদঙ্গ বাজাইতেছিলেন। সুতরাং মালবিকাকে দেখিবার উপযুক্ত অবসর উপস্থিত বুঝিতে পারিয়া, রাজা সঙ্গীতশালায় প্রবেশোন্মুখ হন। রাজার ভাব-বিপর্য্যয়-দর্শনে রাজ্ঞী ধারিণী উদ্বিগ্ন হইলেন। রাজার ব্যস্ততার জন্য বিদূষক রাজাকে অনুযোগ করিলেন। প্রকারান্তরে রাজাকে বাধা দিবার চেষ্টা

উপাখ্যান।

হইল। কিন্তু রাজা কহিলেন—'আমি ধৈর্য্যাবলম্বন করিতেছি বটে ; কিন্তু বাদ্যের শব্দ আমার অভিলাষ-সিদ্ধির পথ-প্রদর্শনে আমাকে ত্বরান্বিত হইবার জন্য যেন আহ্বান করিতেছে।'

"ধৈর্য্যাবলম্বিনমপি ত্বরয়তি মাং মুরজবাদ্যরাবোহয়ম্।
অবতরতঃ সিদ্ধিপথং শব্দং স্বমনোরমস্তেব ॥"

ইহার পর সঙ্গীতশালায় প্রবেশপূর্ব্বক রাজা অগ্নিমিত্র মালবিকার দর্শনলাভ করেন। মালবিকাকে দেখিয়াই রাজা অগ্নিমিত্রের মোহ উপস্থিত হইল। মালবিকার রূপে অগ্নিমিত্র অধিকতর আকৃষ্ট হইলেন। তিনি বয়স্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—'চিত্রপট দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল, বুঝি বা মালবিকা এত সুন্দরী নহেন। কিন্তু এখন মালবিকাকে প্রত্যক্ষ করিয়া বুঝিতে পারিলাম,—চিত্রকর মালবিকার আকৃতি যথাযথ চিত্র করিতে পারেন নাই। চিত্রকর তাদৃশ অভিজ্ঞ হইলে, চিত্রপট না জানি আরও কত মনোহর হইত!'—

"চিত্রগতায়ামস্যাং কান্তিবিসংবাদশঙ্কি মে হৃদয়ম্।
সম্প্রতি শিথিলসমাধিং মন্যে যেনেয়মালিখিতা ॥"

মালবিকার প্রতি অঙ্গে সৌন্দর্য্য-সুষমা প্রকাশ পাইতেছিল। মালবিকা যখন রাগালাপনে প্রবৃত্ত হইলেন, মালবিকার জন্য রাজা একেবারে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। অভিনয়ান্তে মালবিকা যথাস্থানে গমন করিলে, রাজা মালবিকার জন্য অধিকতর অধীর হইলেন। তাঁহাকে দর্শন করিতে পাইতেছেন না বলিয়া, রাজার নেত্র যেন অশ্রুভারাক্রান্ত হইতে লাগিল। রাজ্ঞী মালবিকাকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। রাজা সুকৌশলে মালবিকার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিলেন। প্রণয় ঘনীভূত হইল। মালবিকার সৌন্দর্য্যের উপমা রাজা যেন কোথাও দেখিলেন না। মালবিকাকে পাইয়া রাজা তখন এতই প্রীতিলাভ করিলেন যে, তাঁহার মনে হইল,—

"সূর্য্যোদয়ে ভবতি যা সূর্য্যাস্তময়ে চ পুণ্ডরীকস্য।
বদনেন সুবদনারাস্তে সমরস্তে ক্ষণাদূঢ়ে ॥"

'সূর্য্যের উদয়ে পদ্মের বিকাশ। আর সূর্য্যের অস্তগমনে পদ্মের মলিনতা। কিন্তু মালবিকার সৌন্দর্য্য দিবারাত্রি বিকশিত।' যাহা হউক, উদ্যানমধ্যে মালবিকার সহিত অগ্নিমিত্রের যখন প্রেমালাপ হয়, দ্বিতীয়া মহিষী ইরাবতী অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহা দেখিতে পান। প্রধানা মহিষী ধারিণীর কর্ণে সেই সংবাদ উপস্থিত হয়। ধারিণী ক্রোধ-পরবশ হইয়া মালবিকাকে কারারুদ্ধ করেন। মালবিকার বিচ্ছেদে রাজা অগ্নিমিত্র অধিকতর অধীর হইয়া পড়েন। এই সময় সিন্ধু-নদের তীরে যবনগণের সহিত যুদ্ধে রাজকুমার জয়লাভ করেন। কুমারের বিজয়-সংবাদ রাজ্যমধ্যে বিঘোষিত হইলে, মহিষী ধারিণীর অপরিসীম আনন্দ হয়। তখন তাঁহার মনে হয়,—এ আনন্দোৎসবে সকলেই যখন মাতোয়ারা হইবার অবসর পাইয়াছে, রাজা আর মালবিকাই বা কেন অসুখী থাকেন! এই মনে করিয়া রাজ্ঞী ধারিণী রাজার সহিত মালবিকার মিলন সংঘটন করাইয়া দেন। ইহার পর জানিতে পারা যায়,—মালবিকা—রাজা মাধবসেনের ভগিনী। মাধবসেন রাজ্যচ্যুত হইয়া, মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া, মালবিকাকে বিদিশা-রাজ্যে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল—মালবিকাকে রাজা পত্নীরূপে গ্রহণ করিবেন। কিন্তু পথিমধ্যে মালবিকা দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃতা হয়।

দস্যুহস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া মালবিকা পরিচারিকা-রূপে রাজ-অন্তঃপুরে আশ্রয় লইয়াছিলেন। সেই পরিচয় প্রকাশ পাইলে, রাজার সহিত মালবিকার পরিণয়ে আর কোনই বাধা রহিল না। রাজ্ঞী রাজার করে মালবিকাকে উপঢৌকনস্বরূপ প্রদান করিয়া বলিলেন,—"অজ্জউত্ত! ইঅং পতিচ্ছিয়ত্ত। আর্য্যপুত্র!—এই উপঢৌকন প্রতিগ্রহ করুন।" রাজ্ঞীর এবম্বিধ উচ্চ-অন্তঃকরণ দেখিয়া সকলেই ধন্য ধন্য করিলেন। পরিব্রাজিকা কহিলেন,—"পতিপ্রাণা সাধ্বী রমণীর লক্ষণই এই। তাঁহারা প্রতিপক্ষরূপা সপত্নীর সহিত মিলিত হইয়া পতির সেবায় নিরত থাকেন। সাগর-সঙ্গতা স্রোতস্বিনীরা যেমন ক্ষুদ্র তরঙ্গিণী-সমূহের জলও অনন্ত সাগরে লইয়া যায়, পতিপরায়ণা সাধ্বী রমণীগণের প্রকৃতিও সেইরূপ।

"প্রতিপক্ষেনাপি পতিঃ সেবন্তে ভর্ত্তৃসেবনা নার্য্যঃ।
অন্য সরিতামপিজলং সমুদ্রগাঃ প্রাপয়ন্ত্যুদধিম্॥"

সংস্কৃত দৃশ্য কাব্যের এক কৌস্তুভ মণি—রত্নাবলী। কিন্তু রত্নাবলীর প্রকৃত রচয়িতা কে, তাহা নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। মম্মটাচার্য্য প্রণীত কাব্য-প্রকাশে দেখিলাম, রাজা শ্রীহর্ষ অর্থদানে কবি ধাবকের দ্বারা 'রত্নাবলী' নাটক লিখাইয়া লইয়াছিলেন।*

রত্নাবলী। কেহ কেহ আবার বাণভট্টকেই রত্নাবলী নাটকের রচয়িতা বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। এদিকে স্বয়ং শ্রীহর্ষরাজই রত্নাবলী নাটিকার রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। রাজা শ্রীহর্ষের নামেই রত্নাবলী প্রচারিত। প্রস্তাবনায় সূত্রধারের মুখেও সেই বার্ত্তাই বিঘোষিত। সুতরাং আমরা তাঁহাকেই গ্রন্থকার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলাম। কবি ধাবকই লিখিয়া দেন, বা অপর কেহই লিখিয়া দেন, যখন রাজার নামে উহা প্রচারিত, তখন সেই পরিচয়ই অক্ষুণ্ণ থাকুক। দরিদ্র সাহিত্য-সেবীদিগকে এ বিড়ম্বনা চিরদিনই ভোগ করিতে হইবে। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসেও এ দৃষ্টান্ত যে বিরল নহে, রত্নাবলী—রাজা শ্রীহর্ষের নামে প্রচারিত হইয়া, কাব্যপ্রকাশ প্রভৃতি অলঙ্কার-শাস্ত্রের টীকা টীপ্পনী মূলে, সে সংবাদ ঘোষণা করিতে থাকুক, আর প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ আবহমানকাল সত্য-তত্ত্বের অনুসন্ধানে মস্তিষ্ক আলোড়ন করুন। 'রত্নাবলী'—নাটিকা। চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ,—অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থ। উহার গল্পাংশও অভাবনীয় অননুভূত নহে। শকুন্তলায়, মালবিকাগ্নিমিত্রে বা বিক্রমোর্ব্বশীতে, যে প্রেমিক-প্রেমিকার প্রণয়-চিত্র দেখিতে পাই,

* মম্মটাচার্য্য-প্রণীত 'কাব্য-প্রকাশে', "কাব্যংযশসেহর্থকৃতে" ইত্যাদি কারিকার বৃত্তি-স্থলে লিখিত আছে—"কালিদাসাদীনামিব যশঃ, শ্রীহর্ষাদের্ধাবকাদীনামিব ধনং, রাজাদিগতোচিতাচারপরিজ্ঞানং আদিত্যাদের্ময়ূরাদিনামিব অনর্থনিবারণং, সকল প্রয়োজন-মৌলিভূতং সমনন্তরমেব রসাস্বাদনসমুদ্ভূত বিগলিতবেদ্যান্তর আনন্দং, (কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে...) (স্বরোতীত্যাগ্রিমেণ, পদেনান্বয়ঃ)।" এই বৃত্তি অনুসারে কবি ধাবক রাজা শ্রীহর্ষের সমসাময়িক বলিয়া প্রতিপন্ন হন। কান্যকুব্জাধিপতি শ্রীহর্ষ বা হর্ষবর্দ্ধন (দ্বিতীয় শিলাদিত্য নামেও ইঁনি পরিচিত) খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে (৬০৮ খৃঃ—৬৩৮ খৃঃ) বিদ্যমান ছিলেন বলিয়াও প্রতিপন্ন হয়। সেই হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে চীন পরিব্রাজক হুয়েন-সাং তাঁহার দরবারে উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং, এ হিসাবে ধাবক সপ্তম শতাব্দীর কবি বলিয়া বুঝা যায়। তবে যদি এই শ্রীহর্ষ, হর্ষবর্দ্ধন বা দ্বিতীয় শিলাদিত্য না হইয়া, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও শ্রীহর্ষ হন, সে স্বতন্ত্র কথা। সৌমিল্ল ও ধাবক পূর্ব্ববর্ত্তী কবি হওয়াও বিচিত্র নহে, কারণ, তাঁহাদের গ্রন্থ কালিদাসের সময়ে বিদ্যমান থাকিলেও পুরাতনের যে দশা—সেই দশা প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ লোপ পাইয়াছে।

রত্নাবলীতে তাহারই বিকাশ দেখি। সেই রাজা, সেই পরিচারিকা, সেই প্রেম-সঞ্চার,—সেই সকলই আছে। পড়িলেই সহসা মনে হয়, যেন রত্নাবলীতে কালিদাসের নাটকাবলীর ছায়াপাত ঘটিয়াছে। অথচ, কয়েকটি বিশেষ গুণে, নাট্যকারের কতকগুলি কলা-কুশলতায়, 'রত্নাবলী' যেন অধিকতর মনোহারিণী হইয়াছে। প্রথমে রত্নাবলীর বর্ণনীয় বিষয় বলিতেছি। কৌশাম্বীর অধিপতি—উদয়ন বা বৎসরাজ। তাঁহার মহিষীর নাম—বাসবদত্তা। রাজা ও রাজমহিষী বসন্তোৎসবে উন্মত্ত আছেন, সেই উৎসবে রাজ্ঞীর পরিচারিকা সাগরিকাও উপস্থিত হন। রাজমহিষী যখন পতির পূজায় ব্রতী ছিলেন; সাগরিকা পুষ্পচয়ন করিতে করিতে রাজার প্রতি লক্ষ্য করেন। সাগরিকার মনে হয়,—সে রূপের তুলনা নাই। সাগরিকা পিত্রালয়ে কামদেবের চিত্র দেখিয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইল,—এই জীবন্ত চিত্রের নিকট সে চিত্র তুচ্ছ। সাগরিকা অন্তরালে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে রাজার রূপ-সুধা পান করিতে লাগিলেন;—তাঁহার প্রতি প্রাণমন সমর্পণ করিয়া বসিলেন। তখন কত পুরাতন স্মৃতিই তাঁহার মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিল। তিনি যে সিংহল-রাজকন্যা, তাঁহার পিতা সিংহলাধিপতি তাঁহাকে যে বৎসরাজের সহিত বিবাহের জন্য কৌশাম্বীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, আর সিংহল হইতে কৌশাম্বী আসিবার পথে পোতমগ্নে তাঁহার যে ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটে এবং ঘটনাচক্রে পরিচারিকারূপে রাজগৃহে আশ্রয় লইতে হয়,—এই সকল কথা তাঁহার অন্তরে তখন জাগরুক হইল। উৎসব ভঙ্গ হইলে, সকলে চলিয়া গেলে, সাগরিকা যে রাজা উদয়নকে আর অধিকক্ষণ দেখিতে পাইলেন না, তাহাতেই তাঁহার মন অস্থির হইয়া উঠিল। ইহার পর সাগরিকা উদ্যানে প্রবেশ করিয়া রাজা উদয়নের একখানি প্রতিকৃতি অঙ্কিত করেন। সাগরিকার সখী সুসঙ্গতা সহসা সেই উদ্যানে প্রবেশ করিয়া, সাগরিকার হস্তে সেই চিত্র দেখিতে পায়। সাগরিকা সেই চিত্র লইয়া, চিত্রের প্রতি চাহিয়া কখনও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিলেন, কখনও বা চিত্রের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল ভাসাইতেছিলেন। সুসঙ্গতা সেই চিত্র দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—'মহারাজের এ চিত্র কে আঁকিল,—সাগরিকা?' সাগরিকা অশ্রু-সম্বরণ করিয়া উত্তর দিলেন,—'সে দিন কামদেবের উৎসব হইতেছিল; তাই দেখিয়া আমি কামদেবের এই প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছি।' সুসঙ্গতা ঈষৎ হাসিয়া কহিল,—'ভাল, আমিও তবে কামদেবের সহিত রতির মিলন করিয়া দেই।' এই বলিয়া চিত্রপটখানি গ্রহণ করিয়া উদয়নের সেই প্রতিকৃতির পার্শ্বে সুসঙ্গতা সাগরিকার মূর্ত্তি আঁকিয়া দিল। সে অঙ্কনে সত্য সত্যই যেন রতি-মদনের মিলন হইল। এই সময় রাজার অশ্বশালা হইতে একটী প্লবঙ্গম কনক-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া উদ্যান অভিমুখে পলায়নপর হয়। রাজ-অনুচরগণ তাহার পশ্চাদনুসরণ করে। সেই সময়ে সন্ত্রস্ত হইয়া ব্যস্তসমস্তে সাগরিকা ও সুসঙ্গতা তমাল-শাখার অন্ধকারে লুক্কায়িত হন। উদ্যানে রাজ্ঞীর একটি শারিকা ছিল। বানর সেই সারিকার পিঞ্জরদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়। শারিকা উড়িয়া পলায়ন করে। শারিকা যে কথা শুনিত, তাহাই বলিতে পারিত। সুতরাং সাগরিকার ও তাঁহার সহচরীর বিষম আশঙ্কা হয়। রাজার সম্বন্ধে সাগরিকার কথোপকথনের বিষয় শারিকা পাছে রাজ্ঞীর কাছে প্রকাশ করে,—ইহাই আশঙ্কার প্রধান কারণ। এই সকল কারণে চিত্ত উদ্বিগ্ন হওয়ায়, অপিচ

শারিকাকে ধরিতে যাওয়ায়, চিত্র-ফলকখানি তাঁহারা উদ্যানে কদলীকুঞ্জে ফেলিয়া যান। এই সময় রাজা ও তাঁহার বিদূষক বসন্তক সেই উদ্যানে প্রবেশ করেন। উদ্যানে পরিভ্রমণ-কালে চিত্রফলকের প্রতি প্রথমে বিদূষকের দৃষ্টি-সঞ্চালিত হয়। বিদূষক চিত্রফলকখানি কুড়াইয়া লইলে, রাজা তাহা চাহিয়া লন। চিত্র-দর্শনে রাজার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। বিধাতার অপূর্ব্ব-সৃষ্টি পূর্ণ-সুধাংশুপ্রভ সাগরিকার মুখচ্ছবি দেখিয়া, রাজা তাঁহার রূপে আকৃষ্ট হন। মালবিকাগ্নিমিত্রে চিত্রশালায় চিত্রপট দেখিয়া রাজা অগ্নিমিত্র যেরূপ মালবিকার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, সাগরিকার চিত্র-দর্শনেও সাগরিকার জন্য বৎসরাজ সেইরূপ ব্যাকুল হইয়া পড়েন। কাননে পরিভ্রমণ করিতে করিতে সাগরিকাব ও তাঁহার সখী সুসঙ্গতার সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎকার ঘটে। সাগরিকা রাজাকে দেখিয়া আনন্দে অবসন্ন হন, রাজাও সাগরিকাকে দেখিয়া মোহগ্রস্ত হইয়া পড়েন। তখন রাজার সহিত সাগরিকার মিলন হয়। সুসঙ্গতার পরামর্শ অনুসারে রাজা সাগরিকার হস্তধাবণ করেন। সাগরিকার হস্তধারণ করিয়া রাজা যখন তাঁহার বচন-সুধা পান করিবার জন্য আগ্রহান্বিত, আর সাগরিকা লজ্জাবনতবদনা, সেই সময়ে হঠাৎ বিদূষকের মুখ হইতে বাসবদত্তার নাম উচ্চারিত হইল। রাজা তাহাতে মনে করিলেন,—তবে বুঝি বা রাজ্ঞী বাসবদত্তা এ সকল দেখিতে পাইলেন। তিনি সসঙ্কোচে চকিতভাবে সাগরিকার হস্ত পরিত্যাগ করিলেন। বাসবদত্তা আসিতেছেন—আশঙ্কা হওয়ায়, সাগরিকা ও সুসঙ্গতা তমাল-শাখার আড়াল দিয়া পলায়মান হইলেন। বিদূষক যে বাসবদত্তার নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন,—তাহার সহিত 'অপরা' শব্দের সংযোগ ছিল। তাহাতে তিনি যেন সাগরিকাকে দ্বিতীয় বাসবদত্তার স্থলাভিষিক্ত বলিয়া অভিহিত করিতেছেন,—এই অর্থই বুঝা যাইত। কিন্তু রাজার চিত্ত তখন কলুষিত; সুতরাং তাঁহার মনে হইল—বুঝি বা বাসবদত্তাই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্রমশঃ ঘটনাও তাহাই দাঁড়াইল;—বাসবদত্তা আসিয়া মাহারাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। বিদূষক চিত্রফলক লুকাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহার আনন্দোচ্ছ্বাসে সে চিত্রফলক তাঁহার হস্তস্খলিত হইয়া পড়িল। মহিষী চিত্রফলক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। তাঁহার আর কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না। দুই চারিটী কথার পর বাসবদত্তা ক্রোধভরে চলিয়া গেলেন। লজ্জায় এবং অনুশোচনায় রাজার চিত্ত ব্যথিত হইল; পরন্তু সাগরিকার জন্যও তিনি উন্মত্ত হইলেন। মালবিকাগ্নিমিত্রে রাজ্ঞী ঔশীনরীর সমক্ষে রাজা পুরুরবার যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, বাসবদত্তা-সন্নিধানে রাজা উদয়নেরও সেই অবস্থা উপস্থিত হইল। বৎসরাজ উদয়ন সাগরিকার জন্য উন্মাদ। বাসবদত্তা ক্রোধে অধীরা। রাজার সান্ত্বনার জন্য রাজার সহিত গোপনে সাগরিকার মিলন। অবশেষে রাজ্ঞী বাসবদত্তা কর্ত্তৃক সাগরিকা অবরুদ্ধা। মিলনের পর এই বিচ্ছেদে রাজা ও সাগরিকা উভয়েই যখন অভিভূত, সহসা অন্তঃপুরে লক লক অগ্নিশিখা উত্থিত হইল। অগ্নি-সংযোগে পুরী দগ্ধীভূত হইতে চলিয়াছে। অন্তঃপুরে রাজ্ঞী বাসবদত্তা ছিলেন; রাজা ও রাজ-পারিষদগণ ব্যস্ত-সমস্তে তাঁহার উদ্ধারার্থে অগ্রসর হইলেন। তখন বাসবদত্তা কাঁদিতে কাঁদিতে রাজাকে কহিলেন,— 'রক্ষা করুন,—রক্ষা করুন।' রাজা অভয় প্রদান করিলেন। রাজ্ঞী উত্তর দিলেন,—"আমি নিজের জন্য ভাবিতেছি না। আমি সাগরিকাকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি; সে

বাহির হইতে পারিবে না। আপনি তাহাকে রক্ষা করুন। সাগরিকা পুড়িয়া মরিল।” রাজার অনুশোচনার অবধি রহিল না। রাজা স্বয়ং ছুটিয়া গিয়া সাগরিকার উদ্ধারের জন্য চেষ্টা পাইলেন। জলন্ত অগ্নিমধ্যে মহারাজকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সকলে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু রাজা তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। তিনি সেই অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া সাগরিকার উদ্ধার-সাধনে প্রযত্নপর হইলেন। রাজা উদয়ন, যখন শৃঙ্খলাবদ্ধা সাগরিকার পার্শ্বে গিয়া উপস্থিত হইলেন, সাগরিকা যখন ‘মহারাজ আমায় রক্ষা করুন’ বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, সাগরিকাকে বক্ষে ধারণ করিয়া মহারাজ যখন অগ্নিকুণ্ড হইতে বাহিরে আসিলেন, কিবা মহারাজের, কিবা সাগরিকার,—কাহারও শরীরে অনলের শিখা মাত্র স্পর্শ করিল না। কিন্তু আশ্চর্য্য ঘটনা!--অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়া!—সে তো আগুন নয়। যাদুকরের যাদুপ্রভাবে মনে হইতেছিল,—যেন অগ্নিসংযোগে রাজপুরী ভস্মীভূত হইতেছে। মহারাজ সাগরিকাকে লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন, ঐন্দ্রজালিকের অগ্নিও অপসৃত হইল। সকলের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। বাসবদত্তা আনন্দে উৎফুল্লা হইলেন। তিনি তখন আপনিই উদ্যোগী হইয়া সাগরিকার সহিত রাজার মিলন করাইয়া দিলেন। তখন সাগরিকার পরিচয় প্রকাশ পাইল। সাগরিকার প্রকৃত নাম—রত্নাবলী। তাঁহার পিতা দাসদাসী ও মন্ত্রী সহ তাহাকে কৌশাম্বী-রাজ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বৎসরাজের সহিত তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব হয়। বৎসরাজের মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ কোনও এক সিদ্ধ যোগীর নিকট শুনিয়াছিলেন, সিংহল-রাজদুহিতার সহিত যাহার বিবাহ হইবে, তিনি দেশপতি সম্রাট হইবেন। সেই জন্য মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ সিংহল রাজের নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। সেই প্রতিনিধি প্রেরণের ফলে সিংহলরাজ কন্যার বিবাহে সম্মত হন। কিন্তু কি দৈবদুর্বিপাক!—পথিমধ্যে বিষম ঝঞ্ঝাবাতে পোতমগ্নে সকল সঙ্কল্প ব্যর্থ হইয়া যায়। মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ রত্নাবলীকে প্রাপ্ত হন এবং রাজমহিষীর নিকট তাঁহাকে আনিয়া দেন। সাগর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই রত্নাবলীর নাম—সাগরিকা হয়। পরিচয়ের পর এই মিলন বড়ই সুখের হইয়াছিল। এই মিলনে সিংহলরাজমন্ত্রী বসুভূতির নিকট সাগরিকার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনিও রত্নাবলীর সহিত কৌশাম্বী নগরে আগমন কালে পোতমগ্নে বিপর্য্যস্ত হইয়াছিলেন। মিলনের অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি আসিয়া রাজধানীতে উপনীত হন। ঐন্দ্রজালিক-ক্রিয়া মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের কৌশলেই সম্পাদিত হইয়াছিল। ‘রত্নাবলী’ নাটকে যেমন ঘটনার বৈচিত্র্য, তেমনই কবিত্বের স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। দ্ব্যর্থভাব এই নাটিকার অনেক কথোপকথনেই প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথমাঙ্কে প্রস্তাবনার যে “নান্দী”, তাহার কতকাংশ দ্ব্যর্থপ্রকাশক। তাহার এক অর্থ শিবপক্ষে অপর অর্থ বিষ্ণুপক্ষে প্রযুক্ত হইয়াছে। সেই শ্লোকটী এই,—

“সংপ্রাপ্তং মকরধ্বজেন মথনং ত্বত্তো মদর্থে পুরা,
তত্যাক্তং রত্নমার্গগাং মম পুরো নির্লজ্জ বোঢ়স্তব
তামেবাস্তুনয়স্ব ভাবকুটিলাং হে কৃষ্ণকণ্ঠগ্রহ
মুগ্ধে ত্যাজ কথা যমাদিভনয়, লক্ষ্মীশ্চ, পায়াৎস বঃ।”

এই শ্লোকের এক অর্থে শিবের নিকট এবং অপর অর্থে বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করা

হইয়াছে। শ্লোকোক্ত 'মকরধ্বজেন', 'মথনং', বহুমার্গগাং, 'বোঢ়ুং', 'ভাবকুটিলাং', 'কৃষ্ণ-কণ্ঠগ্রহং',—এই কয়েকটী শব্দের অর্থ উপলব্ধি করিলেই শ্লোকের দ্ব্যর্থভাব অনুভূত হইবে। 'মকরধ্বজ' শব্দে—মদন এবং সমুদ্র অর্থ সূচিত হয়। 'মথন' শব্দে—বিনাশ এবং মন্থন বুঝায়। পূর্ব্বকালে মকরধ্বজ তোমার কর্ত্তৃক মথনপ্রাপ্ত হইয়াছিল বলিলে, মহাদেব কর্ত্তৃক মদন-ভস্মের ও বিষ্ণু কর্ত্তৃক সমুদ্র-মন্থনের স্মৃতি যুগপৎ মনোমধ্যে উদয় হয়। সুতরাং ঐ বাক্যে বিষ্ণুকেও স্তব করা যায়, আবার উহা মহাদেবের স্তবরূপেও প্রযুক্ত হইতে পারে। এইরূপ 'বহুমার্গগাং' শব্দে গঙ্গা ও সরস্বতী এবং 'বোঢ়ুং' শব্দে ধারণ ও বিবাহ অর্থ সূচিত হয়। তাহাতে শিবপক্ষে গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ এবং বিষ্ণুপক্ষে সরস্বতীর পাণিগ্রহণ অর্থ-উপলব্ধি হইতে পারে। 'ভাবকুটিলাং' শব্দে শিবপক্ষে 'স্বভাবতঃ বক্র' এবং বিষ্ণুপক্ষে 'অভিপ্রায় দুর্জ্ঞেয়' অর্থ সূচিত হয়। 'কৃষ্ণকণ্ঠগ্রহং' একবার কৃষ্ণকণ্ঠ ও গ্রহ এই দুই শব্দ স্বতন্ত্রভাবে এবং অন্যবার 'কৃষ্ণ' ও 'কণ্ঠগ্রহ' এই দুই শব্দ স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করিয়া অর্থ করিলে, প্রথম দুই শব্দে সিতিকণ্ঠ-শিব ও 'আগ্রহ' অর্থ এবং শেষ দুই শব্দে 'কৃষ্ণ' সম্বোধন-সূচক ও 'কণ্ঠগ্রহ' 'কণ্ঠালিঙ্গন' ভাব উপলব্ধি হয়। শ্লোকে বলা হইতেছে,—'যাঁহার উক্তবিধ পরিচয় শুনিলে পার্ব্বতী বা লক্ষ্মী রুষ্ট হন, তিনিই তোমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। ইহাই শেষ পংক্তির অর্থ। প্রথম তিন পংক্তিতে তাঁহার সেই পরিচয় আছে। পরিচয় এই যে, পূর্ব্বকালে মকরধ্বজ তোমার কর্ত্তৃক মথনপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তুমি বহুমার্গগাকে বহন কর, সেই ভাব-কুটিলার অনুনয় কর, (কৃষ্ণকণ্ঠ!) তুমি তাহার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ কর অথবা (হে কৃষ্ণ!) তাহার কণ্ঠালিঙ্গন পরিত্যাগ কর। এইরূপ দ্ব্যর্থমূলক আরও অনেক কবিতা রত্নাবলীতে দেখিতে পাওয়া যায়। কবিত্ব ও উপমা সৌন্দর্য্য নাটকে বহুল দৃষ্ট হয়। কয়েকটী দৃষ্টান্ত—

"তীব্রঃ স্মরসন্তাপো ন তথাদৌ বাধতে যথাসন্নে
তপতি প্রাবৃষি নিতরামভ্যর্ণজলাগমো দিবসঃ।"

রাজা উৎকণ্ঠিত-চিত্তে সাগরিকার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। সমাগমের সময় যতই নিকটবর্ত্তী, চিত্তচাঞ্চল্য ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। কবি তাই বলিতেছেন,—মদনের তীব্র তাপ অপেক্ষাও আসন্ন-মিলন চিত্তকে অধিকতর উদ্বিগ্ন করে। বারিবর্ষণের অব্যবহিত পূর্ব্বে বর্ষাকালে গ্রীষ্মের উত্তাপ যেমন বৃদ্ধি পায়, আসন্ন-মিলনের সন্তাপও সেইরূপ প্রখরতর হয়। বৎসরাজ উদয়নের মুখে সাগরিকার রূপ-বর্ণনায় কবিত্বের উৎস উৎসারিত হইয়াছে। তাঁহার এক স্থলের উক্তি,—

"শীতাংশুর্মুখমুৎপলে তব দৃশৌ, পদ্মানুকারৌ করৌ,
রম্ভাগর্ভ-নিভং তবোরুযুগলং, বাহূ মৃণালোপমৌ ;
ইত্যাহ্লাদকরাখিলাঙ্গি, রভসান্নিঃশঙ্কমালিঙ্গ্য মা-
মঙ্গানি ত্বমনঙ্গতাপবিধুরাণ্যেহ্যেহি নির্ব্বাপয়।"

উপমার ঘনঘটা! 'শীতাংশুর ন্যায় মুখকমল, উৎপলের ন্যায় নয়ন, কমলের ন্যায় করতল, রম্ভাগর্ভনিভ উরুযুগল, মৃণালোপম ভুজ-যুগল,—তোমার এই সকল সুন্দর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমার আনন্দ-বর্দ্ধন করুক। তুমি নিঃশঙ্ক-চিত্তে আমায় আলিঙ্গন করিয়া আমার অঙ্গ-তাপ নিবারণ কর।' উপবনে বৎসরাজ যখন সাগরিকার অনুধ্যানে নিমগ্ন, সেই সময় সহসা অবগুণ্ঠনে

বদন আবৃত করিয়া রাজ্ঞী বাসবদত্তা রাজ-সন্নিধানে উপস্থিত হন। প্রেমোন্মত্ত রাজা তাঁহাকেই সাগরিকা মনে করিয়া, এইরূপভাবে সম্বোধন করিয়াছিলেন। আরও বলিয়াছেন,—

"আরুহ্য শৈলশিখরং ত্বদ্বনাপহৃত কান্তি সর্ব্বস্বঃ,
কুৎকর্ত্তুমিবোর্দ্ধকরঃ স্থিতঃ পুরস্তান্নিশানাথঃ।"

অর্থাৎ,—'তোমার মুখ জগতের সকল সুষমা অপহরণ করিয়াছে। নিশামণি তাই তাহার প্রতিকার জন্য ঊর্দ্ধদেশে গিয়া অমৃত কিরণ সহ অবস্থান করিতেছেন।' এই বলিয়া রাজা আরও বলিলেন,—'চন্দ্র কি আপন জড়ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন না? তোমার এই মুখশশী পদ্মের শোভা ম্লান করিয়াছে। এ মুখ অপেক্ষা নয়নতৃপ্তিকর পদার্থ জগতে আর কি আছে? এ মুখদর্শনে ফুলশর কি প্রবল হয় না? শীতাংশু যদি সুধার গরবেই গরবিত হন, এ মুখশশিবিম্বাধরে সে সুধাও ধরে না কি? তবে কি কারণে অন্য শশধর উদয় হও?

"কিং পদ্মস্য রুচিং ন হন্তি, নয়নানন্দ বিধত্তে ন কিং
বৃদ্ধিং বা ঋষকেতনস্য কুরুতে নালোকমাত্রেণ কিং;
বক্ত্রেন্দ্রৌ তব সত্যয়ং যদপরঃ শীতাংশুরুজ্জৃম্ভতে,
দর্পঃ স্যাদমৃতেন চেদিদ তদপ্যস্তেববিম্বাধরে।"

রাজ্ঞীকে সাগরিকা মনে করিয়া রাজা যখন এইরূপ ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছেন, রাজ্ঞী সরোষে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া বলিলেন,—"অজ্জউত্ত! সঞ্চং এব্ব অহং সাঅরিআ। আর্য্যপুত্র! সত্যই আমি সাগরিকা। সাগরিকার জন্য আপনি পাগল হইয়াছেন কিনা? তাই সকলকেই সাগরিকা দেখিতেছেন!" ইহার পর রাজ্ঞী রোষভরে চলিয়া যান। গ্রন্থশেষে মিলনের পর রাজার প্রার্থনা সহৃদয়তার পূর্ণ পরিচায়ক। তিনি বলিতেছেন,—'মিলন হইল; সুখী হইলাম। ইহার অধিক আকাঙ্ক্ষা কি থাকিতে পারে? তথাপি আকাঙ্ক্ষা এই,—

"উর্ব্বীমুদ্দামশস্যাং জনয়তু বিসৃজন্বাসবো বৃষ্টিমিষ্টা
মিষ্টৈস্তৈর্ব্বিষ্টপানাং বিদধতু বিধিবৎপ্রীণনং বিপ্রভুখ্যাঃ;
আকল্পান্তঞ্চ ভূয়াৎসমুপচিতসুখসঙ্গমঃ সজ্জনানাং,
নিঃশেষা যান্তু শান্তিং পিশুনজনগিরো দুর্জ্জয়া বজ্রলেপাঃ।"

ইন্দ্রদেব প্রয়োজনমত বারিবর্ষণ করুন। বসুন্ধরা শস্যশ্যামলা হউন। বিপ্রগণ দেবোদ্দেশে যজ্ঞাহুতি দানে ব্রতী থাকুন। প্রলয়কাল পর্য্যন্ত সজ্জনগণ-সম্মিলনে লোকের সুখবৃদ্ধি হউক এবং দুর্জ্জয় খলের বচন পৃথিবী হইতে দূরীভূত হউক।

শ্রীহর্ষ-প্রণীত অপর একখানি নাটকের নাম—নাগানন্দ। নাগানন্দ নাটকে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব পরিবর্ণিত হইয়াছে। নাটকের প্রস্তাবনায় বুদ্ধদেবের স্তুতিবাদ, নায়ক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী।

নাগানন্দ।

এই বিষয় স্মরণ করিলে, যে শ্রীহর্ষদেব রত্নাবলী নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তিনিই এই 'নাগানন্দ' নাটকের প্রণেতা কি না,—তদ্বিষয়ে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হয়। কেহ কেহ বলেন,—যুবা বয়সে, উচ্ছৃঙ্খল অবস্থায়, ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া গ্রন্থকার নাগানন্দ নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 'রত্নাবলী'—তাঁহার শেষ-জীবনের পরিণত মস্তিষ্কের ফল। রত্নাবলীর উপাখ্যানভাগ এবং নাগানন্দের

উপাখ্যানভাগ—উভয়ই সোমদেব প্রণীত 'কথাসরিৎসাগর' গ্রন্থের ছায়াবলম্বনে রচিত হইয়াছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এই নাগানন্দ ভিন্ন বৌদ্ধধর্ম্ম-সংক্রান্ত নাটক সংস্কৃত-সাহিত্যে আর দৃষ্ট হয় না। সেইজন্য এক সময়ে নাগানন্দ নাটক বিশেষ আদরণীয় হইয়াছিল। বৌদ্ধ নাটক বলিতে সাধারণতঃ হিন্দুদিগের প্রতি বিদ্বেষভাবপূর্ণ গ্রন্থ বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু এই নাটকের বিশেষত্ব এই যে, হিন্দুদিগের দেবদেবীগণও এই নাটকে সম্মানের আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। জীমূতবাহন—বিদ্যাধরদিগের যুবরাজ। তিনি বয়স্যগণ সহ মলয়-পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে গৌরী-মন্দিরে মলয়াবতী গৌরী-পূজায় ব্রতী ছিলেন। মলয়াবতী—সিদ্ধদিগের রাজকুমারী। মলয়-পর্ব্বতে পরিভ্রমণকালে গৌরীপূজা-নিরতা মলয়াবতীর প্রতি যুবরাজ জীমূতবাহনের দৃষ্টি পতিত হয়। অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকে, তপোবনে শকুন্তলা সন্নিধানে, সহসা যেমন রাজা দুষ্মন্তের আবির্ভাব হইয়াছিল, গৌরী-মন্দিরে মলয়াবতী সন্নিধানে জীমূতবাহনও সেইরূপভাবে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজকুমারী এবং তাঁহার সহচরীগণ যুবরাজকে সহসা সেখানে দেখিতে পাইয়া অভ্যর্থনা করেন। এই সাক্ষাতেই কুমার ও কুমারী—পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন। দুষ্মন্তকে দেখিয়া শকুন্তলার যেমন মোহ উপস্থিত হইয়াছিল, প্রেমানুরাগে মলয়াবতীও সেইরূপ মোহগ্রস্ত হন। তখন চন্দনানুলেপনে এবং কদলীপত্র-ব্যজনে মলয়াবতীর মোহাপসারণ করা হয়। ইত্যবসরে জীমূতবাহন তাঁহার সেই হৃদয়মনহরণকারিণী মলয়াবতীর একখানি চিত্র অঙ্কিত করেন। চিত্রাঙ্কনকালে রক্তিম রঙের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার সহচরগণ তাঁহাকে কয়েক খণ্ড মৃত্তিকা প্রদান করেন। সেই মৃত্তিকা দ্বারা নীল, পীত, লোহিত, পাংশুল প্রভৃতি বিবিধ বর্ণের সমাবেশ হয়। এই চিত্রাঙ্কণ-প্রসঙ্গে রং-ব্যবহারের প্রণালীতে প্রাচীন পম্পি-সহরের চিত্রকরদিগের স্মৃতি জাগরুক হয়। তাঁহারা যেমন মৃত্তিকা ও মৃত্তিকা-ভ্যন্তরস্থিত পদার্থের সমবায়ে চিত্রকার্য্য সম্পাদন করিতেন, এই বর্ণনায় সেকালে ভারতবর্ষেও ঐরূপ প্রথার প্রচলন ছিল, বুঝিতে পারা যায়। যাহা হউক, জীমূতবাহন যখন মলয়াবতীর চিত্র অঙ্কন করেন, মলয়াবতীর তখন মনে হয়,—কুমার যেন আপন প্রেমের পাত্রী অপর কাহারও চিত্র অঙ্কন করিতেছেন। ইহাতে মলয়াবতীর বড় ঈর্ষা হয়। ঈর্ষার আবেগে তাঁহার মূর্চ্ছা আসে। অতঃপর, উভয়ে উভয়ের অজ্ঞাতসারে পরস্পরের প্রতি প্রাণ সমর্পণের পর, উহাঁদের বিচ্ছেদ ঘটে। তখন মলয়াবতীর পরিচয় কুমার জানিতে পারেন না; অপিচ, মলয়াবতীর নিকটও কুমারের পরিচয় অপরিজ্ঞাত থাকে। ইতিমধ্যে মলয়াবতীর পিতা মলয়াবতীর বিবাহের জন্য কুমার জীমূতবাহনের নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠান। কিন্তু জীমূতবাহন সে প্রস্তাবে সম্মত হন না। গৌরীদেবীর মন্দিরে তিনি যাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, সেই সুন্দরীকে না পাইলে, তিনি আর বিবাহ করিবেন না,—মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করেন। তিনিও জানিতে পারেন না, রাজাও বুঝিতে পারেন না, যে মলয়াবতীর প্রেমে জীমূতবাহন আত্মহারা, সেই মলয়াবতীর সহিতই বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছিল। কিছুকাল এইরূপ সংশয় সন্দেহে কাটিয়া যায়। অবশেষে প্রণয়ী-প্রণয়িনী উভয়েই আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারেন। কুমার জীমূতবাহন

যাঁহার প্রেমে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন, তিনিই যে সেই রাজকুমারী; আর মলয়াবতী তাঁহাকে যে চিত্র অঙ্কন করিতে দেখিয়াছিলেন, সে যে তাঁহারই নিজের চিত্র,—এ বিষয়ে উভয়েরই সংশয় তখন দূরীভূত হইল। তখন মহা সমারোহে পরস্পর পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। নাটকের প্রথম চারি অঙ্কে জীমূতবাহনের সহিত মলয়াবতীর মিলনের ঘটনাবলী সন্নিবিষ্ট। কিন্তু পঞ্চম ও ষষ্ঠ অঙ্কে বৌদ্ধ-প্রভাব পূর্ণ-প্রকটিত দেখি। মলয়াবতীর সহিত বিবাহের পর জীমূতবাহন একবার সমুদ্রতীরে পরিভ্রমণ করিতে যান। সেই সময় সমুদ্রতীরে পর্ব্বত-প্রমাণ নাগাস্থি দৃষ্ট হয়। তদ্দর্শনে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জীমূতবাহন কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। জানিতে পারেন,—পক্ষিরাজ গরুড়কে প্রত্যহ একটি করিয়া নাগ প্রদান করিতে হয়। সেই নাগ ভক্ষণান্তে গরুড় তাহার অস্থি-সমূহ সমুদ্র-তীরে নিক্ষেপ করেন। তাহাতেই ঐ অস্থিস্তূপ সঞ্চিত হইয়াছে। জীমূতবাহন যখন সেই অস্থি-পুঞ্জের পার্শ্বে উপস্থিত হন, এক বৃদ্ধাকে রোদন করিতে দেখিতে পান। বৃদ্ধা কেন রোদন করিতেছে,—জানিবার জন্য জীমূতবাহনের কৌতূহল জন্মে। তিনি বৃদ্ধার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন,—'মা! এরূপভাবে সমুদ্র-তীরে বসিয়া তুমি কাঁদিতেছ কেন?' বৃদ্ধা কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার দুঃখ-কাহিনী বর্ণন করিল। বৃদ্ধার একমাত্র পুত্র —অন্ধের নয়নমণি—শঙ্খচূড়; তাহার সেই পুত্রকে আজ গরুড়ের নিকট বলি দিতে হইবে। জীমূতবাহন কারণ জানিতে চাহেন। বৃদ্ধা অশ্রুমার্জ্জনা করিতে করিতে বলে,—'খগরাজ গরুড় পাতালে নাগগণের উপর বড়ই অত্যাচার করিত;—যখন তখন যাহাকে তাহাকে ধরিয়া গ্রাস করিত। তাহার সেই অত্যাচার-নিবারণোদ্দেশ্যে নাগাধিপতি বাসুকি তাহার সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছেন,—এক এক দিন পর্য্যায়ক্রমে এক একটি নাগ তাহার ভক্ষণার্থ প্রদান করিতে হইবে। আজ আমার সর্ব্বনাশের দিন—আজ আমার পুত্রের পালা।' এই বলিয়া বৃদ্ধা আকুলি-ব্যাকুলি কাঁদিতে লাগিল। জীমূতবাহন বৃদ্ধাকে অভয় দিলেন; কহিলেন,—'মা! আপনি নিশ্চিন্ত মনে প্রস্থান করুন; আপনার পুত্রকে আমি আজ রক্ষা করিব।' রাজপুত্রের আশ্বাস-বাক্যে বৃদ্ধা কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিল। অতঃপর ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে শঙ্খচূড়ের প্রতি কুমারের দৃষ্টি পড়িল। তিনি দেখিলেন,—রক্তাম্বর ও রক্তমাল্য ধারণ করিয়া শঙ্খচূড় একটি শিলা-পার্শ্বে শয়ন করিয়া আছে। জীমূতবাহন কৌশল অবলম্বন করিলেন; শঙ্খচূড়কে কহিলেন,—'আমি বড় তৃষ্ণার্ত্ত। তুমি আমায় একটু পানীয় জল আনিয়া দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর।' শঙ্খচূড় প্রথমে ইতস্ততঃ করিল; কহিল,—'গরুড়ের আসিবার সময় হইয়াছে। তিনি আহারার্থ আসিয়া আমায় না দেখিলে, ঘোর অনর্থ সংঘটন করিবেন।' জীমূতবাহন অভয়প্রদানে কহিলেন, —'জল আনা পর্য্যন্ত আমি তাঁহাকে প্রসন্ন করিব। মৃত্যুর পূর্ব্বে তুমি আমার তৃষ্ণা-নিবারণ করিয়া একটি পুণ্য সঞ্চয় করিয়া যাও।' শঙ্খচূড় অগত্যা সম্মত হইল;—নাগকপাল গ্রহণে বারি-আনয়নে গমন করিল। এদিকে শঙ্খচূড়ের ন্যায় বেশ-ভূষায় ভূষিত হইয়া জীমূতবাহন গরুড়ের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। অনতিবিলম্বেই গরুড় উপস্থিত হইলেন;—শঙ্খচূড় ভ্রমে জীমূতবাহনকে চঞ্চুপুট দ্বারা ছিন্ন করিয়া আহার করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ

পরেই মানুষের মাংস বলিয়া গরুড়ের প্রতীতি জন্মিল। গরুড় মাংসভক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। কিন্তু জীমূতবাহন তখনও ক্ষীণকণ্ঠে পক্ষিরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন,—

"শিরামুখৈঃ স্যন্দত এব রক্তং অদ্যাপি দেহে মম মাংসমস্তি।
তৃপ্তিং ন পশ্যামি চ তে গরুত্মন্ কিং ভক্ষণাৎ ত্বং বিরতোঽসি তার্ক্ষ্য॥"

'এখনও আমার শিরামুখে রক্তবিন্দু নির্গত হইতেছে, এখনও আমার দেহে মাংস আছে। আমার মাংসাহারে আপনার তৃপ্তিলাভ হইতেছে; তবে কেন আহারে বিরত হইতেছেন?' এই সময়ে শঙ্খচূড় বারি লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল। গরুড় ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। শঙ্খচূড়ের অনুশোচনার অবধি রহিল না। তাঁহার পরিবর্তে জীমূতবাহন প্রাণ দিলেন!—ইহাতে তিনি নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। জীমূতবাহন অনেক বুঝাইয়া শঙ্খচূড়কে বিদায় দিলেন। যথাসময়ে জীমূতবাহনের পিতামাতার নিকট ও তাঁহার সহধর্মিণী মলয়াবতীর নিকট জীমূতবাহনের প্রাণদানের সংবাদ সংবাহিত হইল। শঙ্খচূড়ই এই দুঃসংবাদ তাঁহাদিগের নিকট প্রদান করিয়াছিল। জীমূতবাহনের আত্মীয়-স্বজন সকলে আসিয়া ক্রন্দন-কোলাহলে দিক প্রকম্পিত করিয়া তুলিলেন। গরুড়ের দারুণ অনুশোচনা উপস্থিত হইল,—'হায়, আমি কি করিলাম! একজন নাগের প্রাণরক্ষার জন্য যিনি আত্মপ্রাণ বিসর্জন দিলেন, আমি কি মহাপাপী, সেই মহাপুরুষকে ভক্ষণ করিলাম! আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। যিনি অন্যের জন্য এমনভাবে আত্মসমর্পণ করেন, তিনি নিশ্চয়ই বোধিসত্ত্ব। হায়!—হায়!—আমি বোধিসত্ত্বকে হত্যা করিলাম!' গরুড় যখন এবম্প্রকার অনুশোচনায় আর্তনাদে দিক প্রকম্পিত করিয়া তুলিয়াছেন, জীমূতবাহন তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিলেন,—'এ পাপে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় আছে। সে উপায়—এখন হইতেও প্রাণিহত্যায় বিরত হউন। পূর্বকৃত পাপের জন্য অনুতাপ করুন। প্রাণিমাত্রকেই আপনার ভাবিতে শিখুন; তাহাদের বিশ্বাসভাজন হউন। সৎকর্মের সঞ্চয় হউক। তদ্দ্বারা এ পাপে মুক্ত হইতে পারিবেন।' এই উপদেশ প্রদান করিতে করিতে অর্দ্ধভক্ষিত যুবরাজ প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। তখন, তাঁহার পিতামাতা শোকে অধীর হইয়া তাঁহার সহিত চিতা-শয্যায় প্রাণত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইলেন। রাজকুমারী মলয়াবতীর আর্তনাদে গগন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে গৌরীদেবীর নিকট পতির প্রাণভিক্ষা প্রার্থনা করেন। দেবীর কৃপায় জীমূতবাহন নবজীবন লাভ করিলেন। এদিকে গরুড়েরও নির্বেদ উপস্থিত হইল। তিনি ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন। ইন্দ্রের অনুগ্রহে পূর্বনিহত সমুদায় নাগ নবজীবন লাভ করিল। 'অহিংসা পরমোধর্ম্ম'—বুদ্ধদেবের মূল মন্ত্র—চারিদিকে বিঘোষিত হইল। নাগানন্দ নাটকের ইহাই স্থূল ঘটনা। সাধারণতঃ নাগ শব্দে সর্প এবং গরুড় শব্দে পক্ষিরাজ বুঝায়। কবি উভয়কেই মানুষ-রূপে কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। অথবা, নাগ-সম্প্রদায়ভুক্ত একটী করিয়া মনুষ্যকে গরুড়-নামধেয় কোনও অসুরের নিকট বলি দেওয়া হইত,—এইরূপ ঘটনার কল্পনাও এতদ্দ্বারা সূচিত হইতে পারে। অভিজ্ঞান-শকুন্তল, রত্নাবলী প্রভৃতিতে হাস্য-রসের বিকাশ জন্য বিদূষক ব্রাহ্মণের অবতারণা আছে। কিন্তু সে বিদূষক মদ্যপ বা কলুষিত চরিত্র বলিয়া বুঝা যায় না। নাগানন্দে শেখরক নামধেয় রাজ-শ্যালকে তাহার ব্যত্যয় দেখিতে পাই। শেখরক মদ্যপান করিয়া

প্রস্তাবনায়ও শূদ্রকের নাম সেইরূপভাবে বিঘোষিত। মৃচ্ছকটিক 'প্রকরণ'-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সূত্রধার এই নাটকের প্রণেতার পরিচয় সম্বন্ধে এইরূপ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন,—

"দ্বিরদেন্দ্রগতিশ্চকোরনেত্রঃ পরিপূর্ণেন্দুমুখঃ সুবিগ্রহশ্চ,
দ্বিজমুখ্যতমঃ কবির্বভূব, প্রথিতঃ শূদ্রকইত্যগাধসত্ত্বঃ।"

সকল বিশেষণেই তিনি বিশেষিত হইয়াছেন। রাজা শূদ্রক ঐরাবতের ন্যায় গতিশীল, চকোরের ন্যায় নয়ন-বিশিষ্ট, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বদন-সমন্বিত, অগাধ-সত্ত্ব, সুবিগ্রহ, দ্বিজমুখ্যতম, সুপ্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। এ বর্ণনায় শূদ্রককে ব্রাহ্মণ বলিয়াই মনে হয়। মৃচ্ছকটিক নাটক দশ অঙ্কে সম্পূর্ণ। এই নাটকে নানা ঘটনার ও নানা চরিত্রের সমাবেশ আছে।

"অবন্তিপুর্য্যাং দ্বিজসার্থবাহোযুবা দরিদ্রঃ কিল চারুদত্তঃ,
গুণানুরক্তা গণিকা চ যস্য বসন্তশোভেব বসন্তসেনা,
তয়োরিদং সৎসুরতোৎসবাশ্রয়ং নয়প্রচারং, ব্যবহারদুষ্টতাং,
খলস্বভাবং, ভবিতব্যতাং, তথা চকার সর্ব্বংকিল শূদ্রকোনৃপঃ।

অবন্তী-নগরে চারুদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ যুবক বাস করিতেন। সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশে তাঁহার জন্ম হয়; কিন্তু তিনি বসন্তসেনা নাম্নী বেশ্যার প্রেমে বিমুগ্ধ ছিলেন। সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ব্রাহ্মণ-তনয় চারুদত্ত গণিকা বসন্তসেনাকে লইয়া প্রকাশ্যে বসবাস আরম্ভ করেন। রাজ-শ্যালক সংস্থানক সুন্দরী বসন্তসেনাকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হন। কিন্তু বসন্তসেনা অর্থের বা পদ-মর্য্যাদার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া চারুদত্তের প্রেমেই মুগ্ধ হইয়া থাকেন। সংস্থানক উপেক্ষিত হন। বসন্তসেনাকে লাভ করিবার জন্য সংস্থানক নানা ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করেন। মৃচ্ছকটিক নাটকের এই এক দিক। আর এক দিক—শর্ব্বিলক নামক ব্রাহ্মণ-কুমারের অধঃপতন। শর্ব্বিলক যে কুলে জন্মগ্রহণ করেন, সে কুল অতি পবিত্র। তাঁহার পিতৃপিতামহগণ পরিগ্রহে অর্থাৎ দান-গ্রহণে পর্য্যন্ত কুণ্ঠিত ছিলেন। সেই কুলের শর্ব্বিলক মদনিকা-নাম্নী এক বেশ্যার প্রণয়ে আবদ্ধ হন। মদনিকা—বসন্তসেনার ক্রীতদাসী। উচিত মূল্য না পাইলে বসন্তসেনা মদনিকাকে ছাড়িবেন না; সুতরাং শর্ব্বিলকের মস্তকে বজ্রপাত হইল। কি উপায়ে অর্থ সংগ্রহ হয়? গভীর চিন্তার পর, শর্ব্বিলক চৌর্য্য-বিদ্যা শিক্ষা করিলেন। চুরি করিয়া অর্থ-সংগ্রহানন্তর সেই অর্থ বসন্তসেনাকে প্রদান করিবেন এবং অর্থের বিনিময়ে বেশ্যা মদনিকাকে লাভ করিবেন;—ব্রাহ্মণ-সন্তান শর্ব্বিলকের পরিশেষে এমনই মতিচ্ছন্ন ঘটিল। চৌর্য্য-বিদ্যা শিক্ষার জন্য শর্ব্বিলক রীতিমত অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। এক দিকে শর্ব্বলিকের চৌর্য্য-বিদ্যার কলা-কৌশল, অন্য দিকে বসন্তসেনা-লাভে সংস্থানকের ষড়যন্ত্র।' এই দুই সমাজ-গ্লানিকর চিত্রের পার্শ্বে সমসাময়িক বিবিধ চিত্র মৃচ্ছকটিকে প্রকটিত দেখি। এই নাটকের প্রধান ঘটনা—চারুদত্তের সহিত বসন্তসেনার মিলন ও তাহাতে প্রতিবন্ধক। অন্যান্য নাটকের সহিত মৃচ্ছকটিক নাটকের আখ্যান-বস্তুর পার্থক্য এই যে, মৃচ্ছকটিক সমাজ-চিত্র,—সমাজের সাধারণ লোকের ক্রিয়া-কর্ম্ম ইহাতে

—"শ্রীশ্রীহর্ষদেবেনাপূর্ব্ববস্তুরচনালঙ্কৃতারত্নাবলী নাম নাটিকা।" যদি 'রত্নাবলী' শ্রীহর্ষের রচনাই হয় এবং 'মৃচ্ছকটিক' রাজা শূদ্রকেরই রচনা হয়, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যেই অহমিকা সমভাবে বিদ্যমান ছিল, বুঝা যায়।

পরিবর্ণিত। অন্যান্য নাটকে যেমন রাজার বা যুবরাজের সহিত কোনও রাজপুত্রীর বা অপ্সরীর প্রণয়-কাহিনী পরিবর্ণিত, মৃচ্ছকটিকে তাহার পরিবর্তে একজন ব্রাহ্মণ-সন্তান বেশ্যার প্রেমে বিমুগ্ধ। মৃচ্ছকটিকে মিলনের পথে অন্তরায়—পত্নী বা কোনও দৈব-দুর্ঘটনা নহে; এখানে মিলনের পথে অন্তরায়—রাজশ্যালক সংস্থানক। সংস্থানক যখন দেখিলেন,—বসন্তসেনাকে পাইবার আর কোনও আশা নাই, চারুদত্তের প্রেমেই বসন্তসেনা আত্মহারা হইয়াছেন; তখন, প্রতিহিংসার প্ররোচনায় অধীর হইয়া, তিনি বসন্তসেনাকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কেবল হত্যা করা নহে; বসন্তসেনাকে হত্যা করিয়া সেই হত্যাপরাধে চারুদত্তকে অপরাধী সাব্যস্ত করাও তাঁহার সঙ্কল্প হইল। তিনি রাজশ্যালক; তাঁহার লোকবলের ও অর্থবলের অসদ্ভাব নাই: সুতরাং তিনি অনায়াসে বসন্তসেনার হত্যাপরাধে চারুদত্তকে রাজদ্বারে অভিযুক্ত করিলেন। তাঁহার গুরুতর প্রহারে বসন্তসেনা হতচৈতন্য হন। তার পর, বসন্তসেনার আর কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না। ফলে চারুদত্ত বসন্তসেনার হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হন। আধিকরণিক (বিচারপতি) চারুদত্তের বিরুদ্ধে উপযুক্তরূপ সাক্ষ্য প্রাপ্ত হন; শোক-সন্তাপে উদ্বেলিত-চিত্ত হইয়া চারুদত্ত নিজেও হত্যাপরাধ স্বীকার করেন। সুতরাং বিচারকের মনে সংশয় উপস্থিত হইলেও, চারুদত্তের প্রতি দণ্ডাজ্ঞা বিহিত হয়। ঐ হত্যাপরাধে চারুদত্তের প্রাণদণ্ড হইত; কিন্তু বিচারক দয়াপরবশ হইয়া, স্মৃতি-শাস্ত্রের উপদেশ অনুসরণ করেন। মন্বাদি স্মৃতি-সংহিতার মতে ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড বিধিবিগর্হিত। সেই অনুশাসন মান্য করিয়া, বিচারক চারুদত্তের প্রতি নির্ব্বাসন-দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করেন। রাজার নিকট সেই দণ্ডাজ্ঞা যখন অনুমোদন জন্য প্রেরিত হয়, শ্যালকের মনস্তুষ্টির জন্য, রাজা বিচারকের আদেশ রহিত করিয়া, চারুদত্তের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। রাজার এই অন্যায় বিচারে, নিরপরাধ ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ডের আদেশে, প্রজাপুঞ্জ সংক্ষুব্ধ হয়। ফলে, দেশব্যাপী ভীষণ বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠে। সে বিদ্রোহে রাজা বিপর্য্যস্ত হয়। পুরাতন রাজার পরিবর্তে নূতন রাজা সিংহাসন লাভ করেন। ইত্যবসরে সত্য-ঘটনা প্রকাশ পায়। রাজ-শ্যালকের বিষম প্রহারে হতচৈতন্য হইয়া, তদবস্থায় বসন্তসেনা এক বৌদ্ধ-ভিক্ষুর আশ্রয় পাইয়াছিলেন। সেই ভিক্ষুর অনুকম্পায়, ঐকান্তিক শুশ্রূষায়, বসন্তসেনা নবজীবন লাভ করেন। এই ঘটনা প্রকাশ পাইলে, বসন্তসেনার সহিত চারুদত্তের পুনর্ম্মিলন সংঘটিত হয়। চারুদত্ত ও বসন্তসেনা অবশেষে পতিপত্নীরূপে জীবনযাপন করেন। রত্নাবলী প্রভৃতি নাটকে নায়িকার সহিত মিলনের পর, নায়ক যেমন দেশের ও দশের হিতাকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন এবং ভগবৎ-সমীপে তদ্রূপ প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন; মৃচ্ছকটিকের উপসংহারেও সেই প্রার্থনা দেখিতে পাই। চারুদত্তের সে প্রার্থনা,—

"ক্ষীরিণ্যঃ সন্তু গাবো, ভবতু বসুমতী সর্ব্বসংপন্নশস্যা,
পর্জ্জন্যঃ কালবর্ষী, সকলজনমনোনন্দি নোবান্তবাতাঃ,
মোদন্তাং জন্মভাজঃ সততমভিমতাব্রাহ্মণাঃ সন্তু সন্তঃ,
শ্রীমন্তঃ পান্তু পৃথ্বীং প্রশমিতরিপবোধর্ম্মনিষ্ঠাশ্চ ভূপাঃ।"

'গাভী সকল দুগ্ধবতী হউক, ধরণী শস্যশালিনী হউন, পর্জ্জন্যদেব যথাসময়ে বারিবর্ষণ করুন,

সর্ব্বজন-আনন্দ-প্রদায়ক পবন প্রবহমান হউন, জীবগণ আনন্দলাভ করুক, জনগণ দেবদ্বিজে ভক্তিমান হউক, শত্রুদমন ধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রীমন্ত নৃপতি পৃথিবীর অধীশ্বর হউন। চারুদত্তের অনেক সদগুণ ছিল, তাঁহার সেই গুণাবলীর মধ্যে একটি গুণ—তিনি শরণাগত শত্রুর প্রতি অনুকম্পা-প্রদর্শনে কদাচ পরাঙ্মুখ হন নাই। প্রজা বিদ্রোহের ফলে পূর্ব্বতন নৃপতি যে সময় উত্তেজিত জনসঙ্ঘ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন, তাঁহার সেই প্রাণসঙ্কট বিপদে চারুদত্ত তাঁহার প্রাণরক্ষা করেন। রাজা নিরপরাধ চারুদত্তের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু রাজাকে জনসঙ্ঘের আক্রমণ হইতে মুক্ত করিয়া চারুদত্ত আপন মহাপ্রাণতার পরিচয় দেন,—আশ্রয়প্রার্থী শত্রুর প্রতি কিরূপ অনুকম্পা প্রদর্শন করিতে হয়, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন,—"শত্রুঃ কৃতাপরাধঃ শরণমুপেত্য পাদয়োঃ পতিতঃ শস্ত্রেণ ন হন্তব্যঃ।" শর্ব্বিলক সম্বন্ধেও চারুদত্তের এবম্বিধ ব্যবহার দেখা যায়। শর্ব্বিলক চারুদত্তের বাড়িতেই চুরি করিতে গিয়াছিলেন। তিনি কি ভাবে কি কৌশলে চারুদত্তের অন্দরে প্রবেশ করেন, সে বর্ণনা মৃচ্ছকটিকের এক প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয়। চৌর্য্য-বিদ্যা শিক্ষার জন্য তখন বিদ্যালয় ছিল এবং সে বিদ্যালয়ে রীতিমত শিক্ষালাভ করিয়া শর্ব্বিলক চৌর্য্যবিদ্যায় পারদর্শিতা-লাভ করিয়াছিলেন। নাটকের এ ঘটনা যদি প্রকৃত সমাজ-চিত্র হয়, তবে সে সমাজ যে কতদূর কলুষিত সমাজ,—তাহা মনে করিতেও চিত্ত অবসন্ন হয়। কি-ভাবে শর্ব্বিলক চুরি করিতে প্রবেশ করেন এবং সে সময় তাঁহার মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, নূতন চোরের নূতন কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণের সে চিত্র বড়ই কৌতুকোদ্দীপক। বিচারালয়ের দৃশ্যও বড় স্বাভাবিক। চারুদত্ত বিচারালয়ে প্রবেশ করিয়া দেখিতেছেন,—তিনি যেন এক মহাসমুদ্রের মধ্যে নিপতিত হইয়াছেন। মন্ত্রিগণ চিন্তাসলিলে নিমগ্ন, ব্যবহারাজীবিগণ—সাগরোর্ম্মির ন্যায় লহরীলীলায় ভাসিতেছেন; চারগণ—মকরনক্রের ন্যায় আহারান্বেষণে উন্মুখ রহিয়াছেন, নাগ-অশ্ব-রূপ হিংস্র জীবগণ প্রাণীর প্রাণহননের প্রতীক্ষা করিতেছেন, এক দিকে নানাবাশক ও কঙ্ক পক্ষিরূপী গোয়েন্দাগণ, অন্য দিকে পেস্কারাদিরূপী সর্পগণ আপন আপন শিকার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন। ন্যায়-বিচাররূপ তটদেশ অবক্ষিত; অত্যাচাররূপ বাত্যাপ্রবাহে সে তট বিভঙ্গপ্রায়। যথা,—

> "চিন্তাশক্তনিমগ্নমন্ত্রিসলিলং, দূতোর্ম্মিশঙ্খাকুলং,
> পর্য্যন্তস্থিতচারনক্রমকরং, নাগাশ্বহিংস্রাশ্রয়ং,
> নানাবাশককঙ্কপক্ষিরুচিরং কায়স্থসর্পাস্পদং,
> নীতিক্ষুণ্ণতটঞ্চ রাজকরণং হিংস্রৈঃ সমুদ্রায়তে।"*

এইরূপ উপমার প্রাচুর্য্য মৃচ্ছকটিকে অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়। এ নাটকে উজ্জয়িনী রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি-সময়ের চিত্র অঙ্কিত আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু কোন্ সময়ে উজ্জয়িনী

---

* ডক্টর উইলসন এই কয়েক পংক্তির বড় সুন্দর একটী ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন। সে অনুবাদে বিচারালয়ের চিত্র অধিকতর উজ্জ্বলভাবে প্রকটিত হইয়াছে। যথা,—

> "The prospect is but little pleasing.
> The court looks like a sea, its councillors
> Are deep engulphed in thought; its tossing waves

প্রদেশের ঐরূপ অবস্থা ছিল, তদ্বিষয়ে মতান্তরের অবধি নাই। এক হিসাবে এ চিত্র আধুনিক-কালের চিত্র বলিয়া মনে হয়; অন্য হিসাবে, কালিদাস প্রভৃতির আবির্ভাবের পূর্ব্বের চিত্র বলিয়া কেহ কেহ প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ও হিন্দু-ধর্ম্মের সংঘর্ষের ফলে যখন উভয় সমাজ বিকৃত ভাব ধারণ করিয়াছিল, মৃচ্ছকটিক সেই সমাজের একখানি চিত্রপট বলিয়াই প্রতীত হয়। মৃচ্ছকটিক নামের সহিত এই নাটকের সম্বন্ধ অতি অল্প। ষষ্ঠ অঙ্কের একটী সামান্য ঘটনা উপলক্ষে গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে। বসন্তসেনার একখানি শকট ছিল। সেই শকটারোহণে তিনি প্রমোদ-কাননে চারুদত্ত-সন্নিধানে গমন করিতেন। সেই শকটের একটী ঘটনা অনুসারেই মৃচ্ছকটিক নামকরণ হয়।

ভবভূতি।

ভারতের আর এক সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার—মহাকবি ভবভূতি। ভবভূতি একজন বড় কবি—বড় নাট্যকার। এমন কি, অনেক সময়, কালিদাস বড়—কি ভবভূতি বড়,—এই লইয়া তর্ক-বিতর্ক চলিয়া থাকে। একজন কবি কালিদাসের ও ভবভূতির উভয়ের তুলনা করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—"কবয়ঃ কালিদাসাদ্যা ভবভূতি-র্মহাকবিঃ।" বলা বাহুল্য, এ উক্তি ভবভূতির পক্ষীয় কোনও কবিরই উক্তি। কারণ, ইহার প্রতিবাদে আবার আর এক কবি বলিয়া গিয়াছেন,—"তরবঃ পারিজাতাদ্যাঃ স্নুহিবৃক্ষো মহাতরুঃ।" ভবভূতির পক্ষীয় কবি যেমন একের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া অন্যের যশোঘোষণায় উন্মুখ হন, কালিদাসের পক্ষীয় কবিও তাহার তেমনি উত্তর দেন। ভবভূতির পক্ষীয় কবি যেমন বলেন,—'কালিদাসাদি কবি, আর ভবভূতি মহাকবি'; ভবভূতির পক্ষীয় কবিও সেইরূপ উত্তর দিয়া বলেন,—"পারিজাত আদি যেমন 'তরু' পর্য্যায়ভুক্ত, আর সিজু (স্নুহি) গাছ যেমন 'মহাতরু' পর্য্যায়ের অন্তর্নিবিষ্ট; কালিদাস ও ভবভূতি সেই তুলনায় কবি ও মহাকবি।" আমরা অবশ্য এ বিতর্কে প্রবৃত্ত হইতেছি না। তবে এবম্বিধ বিতর্ক যে চলিয়া আসিতেছে এবং তদ্দ্বারা ভবভূতির গৌরব যে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, তাহাই উল্লেখ করিতেছি মাত্র। ভবভূতির রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে তিন খানি নাটক সংস্কৃত-সাহিত্যে উচ্চস্থান লাভ করিয়া আছে। সেই নাটকত্রয়—মালতীমাধব, উত্তররামচরিত ও মহাবীর-চরিত। নাটকত্রয়ের পরিচয় লইবার পূর্ব্বে ভবভূতির একটু পরিচয় লওয়া যাউক। মালতীমাধব এবং মহাবীরচরিত নাটকদ্বয়ের প্রস্তাবনায় মহাকবি ভবভূতি আত্ম-পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সে পরিচয়ে উপলব্ধি হয়,—'ভারতবর্ষের দক্ষিণভাগে পদ্মনগর নামে এক নগর ছিল। কশ্যপ-বংশীয় কতিপয় বেদপারগ ব্রাহ্মণ তথায় বাস করিতেন। তাঁহারা নিয়ত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় ব্যাপৃত থাকায় সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারা নিরত যাগ-

---

Are wrangling advocates ; its brood of monsters
Are these wild animals, Death's ministers.
Attorneys skim like willy snakes the surface.
Spies are the shell fish cowering midst its weeds,
And vile informers, like the hovering curlew
Hang fluttering o'er, then pounce upon their prey.
The beach that should be justice is unsafe,
Rough, rude, and broken by oppression's storms."

যজ্ঞাদি এবং ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেন। ঐ শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা তত্ত্ববিনিশ্চয়ের নিমিত্ত নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন; যজ্ঞ ও খাতাদি কর্ম্মের নিমিত্ত অর্থসংগ্রহ করিতেন; অপত্য-উৎপাদনার্থ দারপরিগ্রহ করিতেন; এবং তপশ্চর্য্যার নিমিত্ত পরমায়ুর যত্ন করিতেন। ঐ বংশে ভট্টগোপাল নামা এক সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির জন্ম হয়। নীলকণ্ঠ নামে অতি পবিত্র-কীর্ত্তি তাঁহার এক পুত্র ছিলেন। তাঁহার ঔরশে যাতুকর্ণীর গর্ভে মহাকবি ভবভূতি জন্মগ্রহণ করেন। ভবভূতির অপর নাম—শ্রীকণ্ঠ।' মহাকবি ভবভূতির সহিত নটদিগের অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্য থাকায় তিনি নানা-গুণালঙ্কৃত নাটক প্রস্তুত করিয়া নটদিগকে সমর্পণ করেন। কবির জন্মস্থান ঐ পদ্মপুর কোথায় ছিল এবং কোন্ সময়ে কবি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এখন তদ্বিষয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা চলিয়া থাকে। পদ্মপুর নগর—বিদর্ভ-দেশে (বর্ত্তমান বেরারের অন্তর্গত বিদারের নিকটে) অবস্থিত ছিল। ঐ বিদর্ভ রাজ্যের রাজধানীর নাম—কুণ্ডিনপুর বলিয়া কবি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সেই কুণ্ডিনপুর এখন বিদার নগর বলিয়া চিহ্নিত হয়। পদ্মপুরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে। কেহ বলেন,—ভবভূতি কালিদাসের সমসাময়িক ছিলেন; কেহ বলেন,—ভবভূতি ষষ্ঠ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। কোনও মতে তিনি অষ্টম শতাব্দীর কবি। ভবভূতির বিদ্যমানতা সম্বন্ধে এইরূপ বিবিধ মত প্রচলিত আছে। রাজতরঙ্গিণীতে দৃষ্ট হয়,—রাজা যশোবর্ম্মণ্ যখন কান্যকুব্জের অধীশ্বর ছিলেন, মহাকবি ভবভূতি তাঁহার সভাপণ্ডিতের পদ সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে রাজতরঙ্গিণীর উক্তি এই,—"কবির্বাক্পতিরাজশ্রীভবভূত্যাদি সেবিত। জিতো যযৌ যশোবর্ম্মা তদ্গুণস্তুতিবন্দিতাম্॥" রাজতরঙ্গিণীর বর্ণনায় দেখিতে পাই,—কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য কনোজ অধিকার করেন। সেই সময়ে যাশাবর্ম্মণের আশ্রয়ে বহু কবি ও সাহিত্যিক প্রতিপালিত হইতেন। ভবভূতি তাঁহাদেরই অন্যতম। ভবভূতিকে ললিতাদিত্য কাশ্মীরে লইয়া যান। ভবভূতি ব্যতীত যশোবর্ম্মণের দরবারে আর যে সকল পণ্ডিত আশ্রয় পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বাক্পতি ও রাজশ্রী নামক দুই কবির নাম পাওয়া যায়। ললিতাদিত্যের কান্যকুব্জ অধিকার—খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর ঘটনা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। সে মতে, যশোবর্ম্মণ—৭০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৭৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এ হিসাবে ভবভূতি অষ্টম শতাব্দীর কবি বলিয়া প্রতিপন্ন হন। ফলতঃ, ভারতের অপরাপর প্রাচীন কবি-মহাকবিগণের কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে যেরূপ মতান্তর ঘটিয়াছে, ভবভূতির সম্বন্ধেও সেই মতান্তর দেখিতে পাই। এবম্বিধ বিতর্কের মীমাংসা নাই। 'কালপ্রিয়নাথ' মহেশ্বর সন্নিধানে ভবভূতির নাটকের অভিনয় হইয়াছিল,—এইরূপ প্রচার আছে। মহাদেবের মহোৎসব উপলক্ষে যাত্রাগান হইত এবং দিগন্তবাসী জনগণ তথায় সমবেত হইতেন। ভবভূতির নাটকের (বিশেষতঃ মালতীমাধবের) প্রথম অভিনয় সেই উৎসবক্ষেত্রেই সম্পন্ন হইয়াছিল। ঐ 'কালপ্রিয়নাথ' মহাদেব, কাহারও কাহারও মতে, উজ্জয়িনীর প্রসিদ্ধ বিগ্রহ। কালপ্রিয়নাথ যদি উজ্জয়িনীরই হন, সে কতকাল পূর্ব্বের কথা স্মরণ করিলে, কতকাল পূর্ব্বে উজ্জয়িনী সমৃদ্ধিশালিনী ছিল অনুসন্ধান করিলে, মহাকবি ভবভূতির বিদ্যমান-কালের একটু আভাস পাওয়া যায়। এতৎপ্রসঙ্গে সে বিষয়ের আলোচনা বাহুল্য মাত্র। তবে এক হিসাবে বলা যাইতে পারে,

যে কয়েকখানি সংস্কৃত নাটক প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন, তাহার প্রায় সকলগুলিরই রঙ্গভূমি উজ্জয়িনীতে বা তৎসন্নিহিত স্থানে চিহ্নিত হয়, আবার, সকলগুলিরই রচনা-পদ্ধতি প্রায় সাদৃশ্য সম্পন্ন। সুতরাং পরস্পরের আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে কিছু অগ্র পশ্চাৎ থাকিলেও শত বর্ষের মধ্যে যে ঐ সকল নাটককার ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, নানা কারণে তদ্বিষয়ে আমাদের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে। ভবভূতি— কালিদাসের সমসাময়িক, পরবর্ত্তী বা পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। ভবভূতির 'মালতীমাধব' নাটকে একস্থানে কামন্দকীর সহিত মালতীর কথোপকথন প্রসঙ্গে, কামন্দকী উপদেশ দিতেছেন, 'দেখ, কুমারীদের পিতাই প্রভু ও দেবতা। তবে, কণ্বদুহিতা শকুন্তলার দুষ্মন্তের বরণ, উর্ব্বশীর পুরূরবাকে আত্ম-সমর্পণ ও পিতৃবাসনা উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক বাসবদত্তার বৎসরাজের পাণিগ্রহণ ইত্যাদি যে সকল উপাখ্যান আখ্যানবেত্তাদিগের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, সে সকল সাহসের কথা উপদেশ দেওয়া উচিত হয় না।' মালতীর প্রতি কামন্দকীর এবম্বিধ উপদেশ-বাক্য অনুসরণ করিয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন যে, কালিদাসের বহু শতাব্দী পরবর্ত্তী কালে ভবভূতির বিদ্যমানতাই সম্ভবপর। কিন্তু এ সঙ্কুচিত দৃষ্টিভঙ্গির উক্তি পাণ্ডিত্য বলিয়া মনে হয় না। কারণ, যে ঘটনাত্রয়ের দৃষ্টান্ত কামন্দকী দেখাইয়াছেন, সে কাহিনী বহু দিন হইতে প্রচলিত ছিল। শকুন্তলার বা উর্ব্বশীর পাণিগ্রহণ বিবরণ দিয়াছেন বলিয়াই যে কালিদাসের অনুসরণ বুঝিতে হইবে, তাহার কোনও কারণ নাই। বাসবদত্তার গল্প পূর্ব্ব হইতে প্রচারিত ছিল। অপিচ, যদি এরূপ উপদেশ কালিদাসের সম্বন্ধে অনুসরণ বলা যায়, তাহাতেও ভবভূতি যে তাঁহাদের বহু পরবর্ত্তী, তাহা স্থির করা যায় না। তবে স্থির করা যায়,— সে এক শুভ দিন আসিয়াছিল যে দিনে ভারতে কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি কাব্যপ্রতিভা প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। প্রকৃতির নৈসর্গিক নিয়মে সংসারে এক এক সময় এক এক ভাব-প্রবাহ ঘটনাস্রোতে প্রবাহিত হয়। সংস্কৃত সাহিত্যে এই সকল কবি নাট্যকারগণের অভ্যুদয়—সেই প্রাকৃতিক পদ্ধতির অবশ্যম্ভাবী সংঘটন। কেবল ভারতবর্ষ বলিয়া নহে, একরূপ এক এক শ্রেণীর ভাব-প্রবাহ, একরূপ এক এক স্তরের সৌন্দর্য্য সৃষ্টি, পৃথিবীর সকল দেশেই এক এক সময়ে প্রত্যক্ষীভূত হয়। পাশ্চাত্যের প্রতি লক্ষ্য করুন, প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যে সম্রাট অগাষ্টাসের সময় এক শ্রেণীর অভিনব কল্পনা কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া রোম-সাম্রাজ্যের সাহিত্য কানন শোভমান করিয়াছিল। অগাষ্টাসের সমসাময়িক সাহিত্য (Augustan Age of Literature) বলিতে মনোমধ্যে কি এক উচ্চ ভাবের সঞ্চার হয়, বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই তদ্বিষয় অবগত আছেন। ইংলণ্ডের ইতিহাসেও ইংরাজী সাহিত্যে নবজীবন-সঞ্চারের সেইরূপ এক দিন আসিয়াছিল। রাজ্ঞী এলিজাবেথের শাসনকালের সাহিত্য— ইংরেজ-জাতিকে কতদূর গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছে, ইতিহাস পাঠকের তাহা অবিদিত নাই। এইরূপ বিশেষ বিশেষ সময়ে, বিশেষ বিশেষ দেশে, বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর সাহিত্য সম্পৎ অভ্যুত্থিত ও পরিপুষ্ট হয়। ভারতবর্ষেরও সংস্কৃত-সাহিত্যের এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যের উপর তদ্রূপ এক এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রভাব দেখিতে পাই। আমরা তাই মনে করি, ভারতের এই সকল নাট্যসাহিত্যের অভ্যুদয় এক বিশেষ সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল। সে

সময়ের বা সে যুগের (যদি যুগই বলিতে হয়) পরিমাণ শত বর্ষের মধ্যে বলিয়াই অনুমান হয়। সেই সময়ের বা সেই যুগের মধ্যে ভারতে হয় তো সহস্র সহস্র কবি-নাট্যকারের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল, কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশই জলবুদ্‌বুদের ন্যায় উঠিযাই বিলীন হইয়া গিয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে কেবল কালিদাস ও ভবভূতি প্রমুখ কয়েকজন অসাধারণ-প্রতিভাশালী কবিই আপনাপন অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিরূপ উন্নতির দিন উপস্থিত হইলে কত জনের মধ্যে এতগুলি রত্ন সঞ্চিত থাকিতে পারে, দুই একটী দৃষ্টান্তের প্রতি লক্ষ্য করিলেই তাহা প্রতীত হইতে পারে। ইংলণ্ডে রাজ্ঞী এলিজাবেথের সমসাময়িক সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বিষয়টা বেশ বোধগম্য হয়। ঐ সময়ে মহাকবি সেক্সপিয়রের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং ঐ সময়ে আরও বহু কবিনাট্যকারের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। পিল, গ্রীণ, মার্লো, বেন জন্সন প্রভৃতি কবিনাট্যকারগণের সে সময়ে কতই প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কিন্তু এখন তাঁহাদের সকলের স্মৃতিই বিলুপ্তপ্রায়, আর মহাকবি সেক্সপিয়র দিন দিনই অধিকতর যশোভাজন হইতেছেন। সেই কত জনের মধ্যে যেমন এক জন অমর হইয়া রহিলেন, সে তুলনায় ভারতবর্ষের কত শত জনের মধ্যে যে এই কয় জন অক্ষয়কীর্ত্তিমান্ হইয়া আছেন, কে তাহার হয়ত্তা করিবে! ফলতঃ, সে এক দিন আসিয়াছিল,—সে এক যুগ আসিয়াছিল, সেই এক যুগে—সেই এক সময়ে এই সকল মহাকবির আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। ভবভূতির প্রণীত নাটকত্রিতয়ও সেই সময়েরই রচনা। * মালতীমাধব নাটকের আখ্যান বস্তু—মাধবের সহিত মালতীর প্রণয় ও সে পথে অন্তরায়। বিদর্ভদেশে কুণ্ডিনপুর নগরের রাজমন্ত্রীর নাম দেবরাত। মাধব—তাঁহার পুত্র, রূপবান ও অসাধারণ বুদ্ধিমান। মালবদেশে পদ্মাবতী নামে আর এক নগর ছিল। সেই নগরের রাজমন্ত্রীর নাম—ভূরিবসু। তাঁহার কন্যা মালতী পরমা রূপবতী। বাল্যকালে দেবরাত ও ভূরিবসু একত্রে বিদ্যাভ্যাস করিতেন। সেই সময়ে তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রতিজ্ঞা হয়,—যদি তাঁহাদের পুত্রকন্যা জন্মে, তাঁহারা বৈবাহিক-সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবেন। তনয় পরিণয়োচিত বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইলে, দেবরাত আপন পুত্র মাধবকে তর্কশাস্ত্রাধ্যয়ন জন্য পদ্মাবতী নগরে প্রেরণ করেন। সঙ্গে মাধবের এক ভৃত্য ও এক মিত্র ছিল। মিত্রের নাম—মকরন্দ, আর ভৃত্যের নাম—কলহংস। দেবরাত ও ভূরিবসুর প্রতিজ্ঞার বিষয় মালতী ও মাধব কিছুই জানিতেন না। পদ্মাবতী নগরের অধিপতি, নন্দন নামক আপনার সহচরের সহিত মন্ত্রি-কন্যা মালতীর বিবাহ দিবেন,—স্থির করেন। নৃপতির ইচ্ছা, সুতরাং মন্ত্রী

মালতীমাধব। (উপাখ্যান)

---

* ভবভূতির নাটকত্রয়ের মধ্যে মালতীমাধবে ও মহাবীরচরিতে একরূপ ভাষায় যে ভাবে তাঁহার আত্মপরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, উত্তররামচরিতে সে পরিচয়ের কিছু বিভিন্নতা দেখা যায়। উত্তররামচরিতের প্রস্তাবনায় তাঁহার পরিচয়,—"অস্তি খলু তত্র ভবান কাশ্যপ শ্রীকণ্ঠপদলাঞ্ছনো ভবভূতির্নাম।" কিন্তু অন্য দুই গ্রন্থের প্রস্তাবনায় সূত্রধার-মুখে ভবভূতির আত্মপরিচয়,—"অস্তি দক্ষিণাপথে পদ্মপুরং নাম নগরম। তত্র কেচিত্তৈত্তিরীয়িণঃ কাশ্যপাশ্চরণগুরবঃ পঙ্‌ক্তিপাবনা পঞ্চাগ্নয়ো ধৃতব্রতাঃ সোমপীথিনঃ উডুম্বরা ব্রহ্মবাদিনঃ প্রতিবসন্তি। তদামুষ্যায়ণস্য তত্রভবতো বাজপেয়যাজিনো মহাকবেঃ পঞ্চমঃ সুগৃহীতনাম্না ভট্টগোপালস্য পৌত্রঃ পবিত্রকীর্ত্তের্নীলকণ্ঠস্যাত্মসম্ভবঃ শ্রীকণ্ঠপদলাঞ্ছনঃ ভবভূতির্নাম জাতুকর্ণীপুত্রঃ কবির্নিসর্গসৌহৃদেন ভরতেষু বর্ত্তমানঃ স্বকৃতিমেবংপ্রায়গুণভূয়সীমস্মাকমির্পিতবান্।" বিদ্যা কুলমস্ত

ভূরিবসু তাহাতে আপত্তি করিতে পারেন না। দেবরাতের সহিত প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ থাকিলেও ভূরিবসু নন্দনের সহিতই কন্যার বিবাহ দিতে সম্মত হন। মন্ত্রিদ্বয়ের প্রতিজ্ঞার বিষয় কামন্দকী নাম্নী এক পরিব্রাজিকা অবগত ছিলেন। রাজার প্রস্তাবে সম্মত হইলেও প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়া ভূরিবসু কামন্দকীর পরামর্শপ্রার্থী হন। গ্রন্থ-সূচনায় কামন্দকীর সহিত তাঁহার শিষ্যা অবলোকিতার কথোপকথনে, নন্দনের সহিত মালতীর বিবাহ সম্বন্ধের বিষয়ে আলাপ হয়। ইতিমধ্যে মদনোৎসবে মালতীর সহিত মাধবের সাক্ষাৎকার ঘটে। তাহাতে পরস্পরের প্রাণ মন পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। মাধব দেখেন,—মালতীর ন্যায় রূপবতী সংসারে বুঝি আর দ্বিতীয় নাই, মালতীর মনে হয়,—রূপে মাধব কন্দর্পকান্তি। নাটকের প্রথম অঙ্কে মালতী মাধবের প্রণয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হই। মাধবের সহিত মকরন্দের কথোপকথনে, কোথায় কেমন ভাবে মাধব সেই সুন্দরীকে দেখিয়াছিলেন, সেই কথা ব্যক্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে ভৃত্য কলহংস একখানি চিত্রপট আনিয়া মাধবকে প্রদান করে, পরিচয় দেয়,—'সেই চিত্রপট—মাধবের প্রতিকৃতি—মালতী অঙ্কন করিয়াছেন। চিত্রপট দর্শনে মালতী অদর্শনের উৎকণ্ঠা নিবারণ করেন।' বয়স্যের পরামর্শ অনুসারে, মাধবের প্রতিকৃতি পার্শ্বে, মালতীর চিত্র অঙ্কিত করিবার কল্পনা হয়। তখন মাধব মালতীর চিত্র অঙ্কিত করিয়া সেই চিত্রের নিম্নে একটা শ্লোক রচনা করিয়া লিখিয়া দেন। সেই শ্লোকের মর্ম্ম এই যে, যে রূপ দেখিয়াছি, সে রূপ—স্বভাব মধুর নব শশিকলা প্রভৃতি মনোহর পদার্থের অপেক্ষা নয়নমনোহর। কলহংস যাহার নিকট মাধবের প্রতিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, সহসা সে (বিহারদাসী মন্দারিকা) আসিয়া উপস্থিত হইল। মাধবের অঙ্কিত শ্লোকযুক্ত চিত্র লইয়া মন্দারিকা চলিয়া গেল। সেই শ্লোক সেই চিত্র যথাকালে মালতীর নিকট উপস্থিত হয়। তাহাতে মালতীর প্রতি মাধব যে একান্ত অনুরক্ত, তৎসম্বন্ধে মালতীর সকল সংশয় দূরীভূত হয়। মালতী মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে,—'মাধবকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও সে আর বিবাহ করিবে না।' ইতিমধ্যে কামন্দকার চেষ্টায় মালতী মাধবে গোপনে একবার মিলন হইয়া গেল। মালতী মাধবে যখন এইরূপ প্রণয় সঞ্চার, সেই সময়ে পদ্মাবতী নগরের অধিপতির আদেশে নন্দনের সহিত মালতীর পরিণয়ের বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। তখন মালতী লাভের আর কোনই আশা নাই বুঝিয়া, মাধব সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া নিভৃতে গৃহত্যাগ করিলেন। পরিভ্রমণ করিতে করিতে তিনি এক শ্মশানে গিয়া উপনীত হন। সেই শ্মশানে এক চামুণ্ডা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। অঘোরঘণ্ট নামক জনৈক কাপালিক ও তাহার শিষ্যা কপালকুণ্ডলা সিদ্ধিলাভের জন্য সেই কালীর উপাসনা করিতেন। তান্ত্রিকাচারে ব্যাভিচার প্রবেশ করিলে যে মতিচ্ছন্ন ঘটে, কাপালিকের ও কপালকুণ্ডলার সেইরূপ মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছিল। তাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া মালতীকে অপহরণ করে। মালতী যখন মাধবের জন্য আত্মহারা, অথচ তাহার পিতা যখন তাহাকে নন্দনের করে সমর্পণ করিবার জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ, সেই সময়েই প্রলোভনে কাপালিক তাহাকে স্থানান্তরিত করিয়াছিল। যে মুহূর্ত্তে মাধব সেই শ্মশানক্ষেত্রে পদার্পণ করিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই মালতীর আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণপটহ প্রতিধ্বনিত করিল। মাধব অগ্রসর হইয়া দেখিলেন,—

কাপালিক ও কপালকুণ্ডলা চামুণ্ডার সমক্ষে মালতীকে বলিদানের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। কুমারী মালতীকে চামুণ্ডার সম্মুখে বলিপ্রদান করিতে পারিলে, তাহাদের সিদ্ধিলাভ হইবে,—এই বিশ্বাসেই তাহারা ঐ নৃশংস হত্যাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সহসা মাধব শ্মশানে উপস্থিত হইয়া, তাহাদের অভীষ্ট-সিদ্ধির পক্ষে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইলেন। কাপালিক নিহত হইল; মালতী মুক্তিলাভ করিলেন। ইহার পর কামন্দকীর আশ্রমে মাধব ও মালতী পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। কামন্দকীর চক্রান্তে মালতী-বেশধারী মকরন্দের সহিত নন্দনের বিবাহ হইয়া যায়। যথাসময়ে প্রকৃত ঘটনা রাজার কর্ণগোচর হইলে, রাজা মাধবকে ও মালতীকে ধরিবার জন্য রাজপ্রহরিগণকে প্রেরণ করেন। কিন্তু মাধবের বাহুবলে তাহারা পর্য্যুদস্ত হয়। তখন নৃপতি মাধবের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া মাধবের সহিত মালতীর মিলনের সহায়তা করেন। এতাদৃশ পরীক্ষা-পারাবার উত্তীর্ণ হওয়ার পর মালতী মাধবে যে মিলন সংঘটিত হয়, সে মিলনেও পুনরায় এক অন্তরায় উপস্থিত হইল। কাপালিকের সহচারিণী কপালকুণ্ডলা কাপালিকের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে মালতীকে পুনরায় অপহরণ করিয়া লইয়া গেল। তখন মালতীর অনুসন্ধানে মাধব পুনরায় বহির্গত হইলেন। বিন্ধ্য পর্ব্বতের সন্নিধানে মালতীর সন্ধানে উপস্থিত হইয়া তিনি এক যোগিনীর সাক্ষাৎ পান। সে যোগিনীর নাম—সৌদামিনী। সৌদামিনী—বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিনী। সৌদামিনীর অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে এবার মালতীর উদ্ধার-সাধন হয়। তদনন্তর মালতী-মাধবের পুনর্ম্মিলন বড়ই সুখময় হইয়াছিল। মালতী-মাধবে ভবভূতির কবিত্বের ও ভাবুকতার পরিচয় পদে পদে প্রত্যক্ষীভূত। শ্মশান-বর্ণন, বিন্ধ্যাচল-বর্ণন প্রভৃতিতে তিনি কবিত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহার শ্মশানের বর্ণনা পাঠ করিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও বিস্ময়-বিমুগ্ধ। মাধব যে রাত্রিতে শ্মশানে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, সে কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর রাত্রি। দিঙ্মণ্ডল নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। তাহার মনে হইল—যেন গগন হইতে কজ্জল বৃষ্টি হইতেছে, আর সেই কজ্জলে প্রকৃতি যেন পরিলিপ্তা হইয়াছেন। দুঃসময়ে দিবাকর নিশাকর দুই-ই অন্তর্হিত। তাঁহাদের স্থলে এখন নক্ষত্রগণ জ্যোতিঃ বিস্তার করিতে আসিয়াছে, ক্ষণবিনশ্বর জ্যোতিষ্মান খদ্যোৎগণ জ্যোতিঃ-সঞ্চার করিতেছে। ঝিল্লীরবে দিক মুখরিত। শিবাগণ ভীষণ রবে চীৎকার করিতেছে, উল্কামুখেরা ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। মাধবের মনে হইল,—চারিদিকেই যেন ডাকিনী-প্রেতিনী-পিশাচ-পিশাচীগণ বিকট বদন ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। মাধব নদী-তীরে অগ্রসর হইলেন। দেখিলেন,—

"গুঞ্জৎকুঞ্জকুটীরকৌশিকঘটা ঘুৎকারসংবল্গিতক্রন্দৎ ফেরব

চণ্ডাৎকৃতিভৃতপ্রাগ্‌ভারভীমৈস্তটৈঃ।

অন্তঃশীর্ণ করঙ্ক-কর্পরপয়ঃ সংরোধকূলঙ্কষ।

স্রোতোনির্গমঘোরঘর্ঘররবা পারে শ্মশানং সরিৎ।"

"কুঞ্জকুটীরস্থিত পেচককুলের চীৎকার ও জম্বুককাদম্বের চণ্ডরবদ্বারা নদীর তটভাগ অতীব ভয়াবহ! প্রবাহ মধ্যে গলিত শীর্ণ শবকঙ্কালে বারিরোধ বশতঃ ঘোর ঘর্ঘররবে স্রোত নির্গত হইতেছে।" এই অবস্থায় নিঃসঙ্কোচে মাধব যখন শ্মশান-মধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন, সহসা তাঁহার কর্ণে করুণ আর্ত্তনাদ প্রতিহত হয়। তিনি শুনিতে পান, কে যেন কাতর-

কণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে,—'নির্দ্দয় পিতঃ! নৃপতির সন্তোষ-বিধানার্থ যে উপকরণ সংগ্রহ করিতেছিলে, একবার দেখ, সে সামগ্রী এখন কিরূপভাবে বিনষ্ট হয়!' স্বর শুনিয়াই মাধব চিনিতে পারেন; দৌড়াইয়া গিয়া মালতীর উদ্ধার-সাধন করেন। বর্ণনা-চাতুর্য্য, উপমা-সৌন্দর্য্য এবং নীতিকথা প্রভৃতিতেও মালতীমাধব নাটক সমলঙ্কৃত। মালতী যখন কপালকুণ্ডলা কর্ত্তৃক অপহৃতা; মাধব যখন অনুচর মকরন্দ সহ বিন্ধ্য-পর্ব্বত-সান্নিধ্যে ব্যাকুল হইয়া অনুসন্ধানে ফিরিতেছেন,—সময় সময় যখন তাঁহার প্রাণধারণ অসহনীয় বোধ হইতেছে; মকরন্দ তখন তাঁহাকে প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করাইয়া শান্ত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন; বলিতেছেন,—"আশাই জীবনের অদ্বিতীয় অবলম্বন, আশাই উন্নতির প্রধান হেতু এবং আশাই উৎসাহ-শিখার প্রধান উদ্দীপক। অতএব ধৈর্য্যের শরণাপন্ন হও, আশার অনুগামী হও, মনের ক্ষোভ শান্তি কর এবং যাহাতে আসন্ন বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তাহার চেষ্টা কর।" ইহাতেও যখন মাধবের চিত্ত প্রবোধ মানিতেছে না, মকরন্দ দেখাইতেছেন,—"ঐ অচিরোপস্থিত বর্ষাশোভা অবলোকন কর। গ্রীষ্মবিগম ও বর্ষাগম কাল অতি মনোরম। ঐ দেখ—বেতসকুসুমে নিকুঞ্জ-সরিজ্জল সুবাসিত। তটভাগে যূথিকা কুসুমজাল বিকশিত ও অভিনব কন্দলীদল উদ্ভিন্ন। গিরিতট কূটজ-পুষ্পে সুশোভিত; কদম্ব-তরুসকল অনবরত শীতল-জলসেকে প্রীত হইয়া কুসুমবিকাশব্যাজে কণ্টকিত হইয়াছে! ধরণী ধারাপাত হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্তই যেন শত শত শিলীন্ধ্র ছত্র ধারণ করিয়াছেন। কেতকী-প্রসূন-সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত। এই সমস্ত দেখিলে বোধ হয় যেন, বন-শ্রী অভিমত জলদ-সমাগম-লাভে প্রীত হইয়া হাস্য করিতেছে। দিক্-সকল মেঘমালায় শ্যামল; তাহাতে নানা বর্ণ ইন্দ্র-ধনু উদিত; বোধ হয়, যেন শিখিকুলের নৃত্য নিমিত্ত বিচিত্র নীল চন্দ্রাতপ প্রসারিত হইয়াছে। সুবাসিত পৌরস্ত্য ঝঞ্ঝাবায়ু নীল-জলদজাল আন্দোলিত করিয়া নববারিশীকর বিকীরণ করিতেছে। মদমত্ত ময়ূরগণের কেকারবে দিক-সকল মুখরিত। বসুন্ধরা ধারাসেকে সুরভি হইয়া লোকের মনে আনন্দ বিতরণ করিতেছে। এই কালে মেঘের স্নিগ্ধ, গভীর ও মধুর গর্জ্জন শুনিয়া কাহার মনে না ভীতি ও প্রীতি রসের সঞ্চার হয়? মধ্যে মধ্যে দুর্লক্ষ্য অচিরপ্রভা বিনিঃসৃত হইতেছে। বোধ হয়, যেন স্বর্গলোক ভূলোকের অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি-দর্শন-বাসনায় চক্ষুরুন্মেষ করিতেছে ও তখনই যেন লজ্জিত হইয়া নিমীলিত ও সমধিক মলিন হইয়া যাইতেছে। এ সমস্ত মনোরম ব্যাপার অবলোকন কর ও চিত্ত-ব্যাসঙ্গ পরিত্যাগ কর।" এবম্প্রকার বর্ণনা—ভবভূতির রচনার অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়। দুই এক স্থলে একই ভাব—একই উপমা কবির একাধিক গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। মাধবের সহিত মালতীর পুনর্ম্মিলন ঘটিলে, মাধব কপালকুণ্ডলাকে বলিতেছেন,—'স্ত্রী-রত্নের প্রতি অনাদর অতি গর্হিত কর্ম্ম। সুরভি কুসুম শিরে ধারণ করাই বিহিত, চরণদ্বারা তাড়িত করা যুক্তিযুক্ত নহে।' ঠিক এই কথাই উত্তররামচরিতেও দৃষ্ট হয়। সীতাদেবীর নির্ম্মল চরিত্রে শ্রীরামচন্দ্রের এমনই প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল যে, প্রজাপালনরূপ কর্ত্তব্যানুরোধে তাঁহাকে বনবাসে বিসর্জ্জন দিবার পূর্ব্বে শ্রীরামচন্দ্র বলিয়াছিলেন,—"নৈসর্গিকী সুরভিণঃ কুসুমস্য সিদ্ধা। মূর্দ্ধ্নি স্থিতির্নচরণৈরবতাড়নানি।" মালতী-মাধবেও মাধবের মুখে মালতীর

সম্বন্ধে সেই উক্তি। মালতী-মাধবে দ্ব্যর্থমূলক বাক্যও একাধিক স্থলে দৃষ্ট হয়। ভবভূতির ভাষা অধিকাংশ স্থলে সমস্তপদবিশিষ্ট। তজ্জন্য কেহ কেহ তাঁহাকে বাণভট্ট ও দণ্ডী প্রভৃতির সমসাময়িক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ভবভূতির মহাবীরচরিত এবং উত্তররামচরিত—এই দুই নাটক শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র লইয়া রচিত। মহাবীরচরিতে শ্রীরামচন্দ্রের বাল্যজীবন হইতে আরম্ভ করিয়া লঙ্কার সমরে বিজয়লাভের বিষয় পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে। উত্তররামচরিতে তাঁহার শেষজীবন, সীতার নির্ব্বাসন, বাল্মীকির তপোবনে লব-কুশের জন্ম এবং শেষ মিলনের দৃশ্য প্রদর্শিত। মহাবীর-চরিত সাত অঙ্কে বিভক্ত। লঙ্কাবিজয়ের পর শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকে উহার উপসংহার। কবিবাক্যে নটমুখে যদিও সূচনায় প্রকাশ,—কবি বাল্মীকির অনুসরণে এই নাটক রচনা করিয়াছেন ; কিন্তু নাটক-রচনার নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া দুই এক স্থলে তাঁহার কল্পনা ভিন্ন-পথেও প্রধাবিত হইয়াছে। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলেই তদ্বিষয় হৃদয়ঙ্গম হয়। নাটকমাত্রেই পরিণয়েব পূর্ব্বে নায়ক-নায়িকার একবার সাক্ষাৎ ঘটে। সেই সাক্ষাতে নায়ক-নায়িকা পরস্পর পবস্পরের প্রতি আসক্ত হন। কবি বোধ হয় নাটকের এই রীতির অনুসরণ করিতে গিয়াই সিদ্ধাশ্রমের পথে সীতাদেবীর ও উর্ম্মিলার সহিত রাম-লক্ষ্মণের সাক্ষাৎকার ঘটাইয়াছেন। বাল্মীকির রামায়ণে কিন্তু হরধনুর্ভঙ্গের পূর্ব্বে জানকীর বা উর্ম্মিলার সহিত রামের বা লক্ষ্মণের সাক্ষাৎকারের কোনই উল্লেখ নাই। কুশধ্বজ জনকের সমভিব্যাহারে সীতা ও উর্ম্মিলা বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ-ক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞক্ষেত্রে রাম-লক্ষ্মণের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয় ; তাড়কাদির নিধন-ব্যাপার তাঁহারা প্রত্যক্ষ করেন। যেমন রূপ-সৌন্দর্য্য, তেমনই শৌর্য্য-বীর্য্য—এই দেখিয়া সীতা ও উর্ম্মিলা যথাক্রমে রামের ও লক্ষ্মণের প্রতি অনুরাগিণী হইয়া পড়েন। ঐ সময় রাবণের দূত এক রাক্ষস আসিয়া যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হন। রাবণের পক্ষ হইয়া তিনি বলেন,—'ত্রিভুবনবিজয়ী দশানন সীতাদেবীর পাণিগ্রহণে উৎসুক। তিনি বলপ্রয়োগেই সীতাদেবীকে অপহরণ করিতে পারিতেন ; কিন্তু মাতুল মাল্যবানের নিষেধক্রমে তিনি বলপ্রকাশে বিরত হইয়া আমায় প্রেরণ করিয়াছেন। যদি তাঁহার হস্তে সীতাকে সমর্পণ না করেন, বিষম অনর্থ ঘটিবে।' এক দিকে এই সকল বিভীষিকা, অন্য দিকে হরধনুর্ভঙ্গে জানকীকে লাভ—ইহাই প্রথম অঙ্কের বর্ণিতব্য বিষয়। সুবাহু, মারীচ প্রভৃতি বহু রক্ষ-সৈন্য রাবণের পক্ষ হইতে সীতাকে লইতে আসিয়া বিপর্য্যস্ত হয়। এ ঘটনাও প্রথম অঙ্কের অন্তর্নিবিষ্ট। দ্বিতীয় অঙ্কে রাবণের ভগিনী শূর্পনখা মাতুল মাল্যবানের সহিত পরামর্শ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের সংহার-সাধন জন্য জামদগ্ন্য পরশুরামকে উত্তেজিত করার পরামর্শ করিতেছেন ; অন্য দিকে সাক্ষাৎ অনলসম পরশুরাম শ্রীরামচন্দ্র-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে বিপর্য্যস্ত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। জামদগ্ন্যের বীরত্ব-কাহিনী স্মরণ করিয়া সকলে ভীত ত্রস্ত ;—সীতাদেবী শ্রীরামচন্দ্রকে পরশুরামের সম্মুখে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিতে-ছেন। জামদগ্ন্যের দর্প, তৎপ্রতি শ্রীরামচন্দ্রের মিষ্টবাক্য এবং অপরের কৃপা-প্রার্থনা—প্রধানতঃ ইহাই দ্বিতীয় অঙ্কের বর্ণিতব্য বিষয়। এই অঙ্কে প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয়—শ্রীরামচন্দ্রের ক্রোধানল ভার্গবের রোষাভাষ-রূপ অনিল-সঞ্চারে ধীরে ধীরে কেমন জ্বলিয়া উঠিতেছে। তৃতীয়

মহাবীরচরিত।

অঙ্কও পরশুরাম-শ্রীরামচন্দ্রের সংঘর্ষ-বিষয়ক। জনক, দশরথ প্রভৃতি সকলের জামদগ্ন্যকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টায় অকৃতকার্য্যতা। জামদগ্ন্য রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া অন্তঃপুরের মর্য্যাদা লঙ্ঘন পূর্ব্বক রাজর্ষি জনককেও উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছেন। জনক বলিতেছেন,—'আমার সমস্ত শত্রু বিনষ্ট, বার্দ্ধক্য উপস্থিত, চিত্ত পরব্রহ্মতত্ত্বে নিমগ্ন, ক্ষত্রোতেজ প্রশমিত; তথাপি জামদগ্ন্যের অত্যাচার দেখিয়া, কর্কশ বচন শুনিয়া, আমার প্রাণ শরাসন গ্রহণে উত্তেজিত হইতেছে।' চতুর্থ অঙ্কে,—রাম-লক্ষ্মণের শৌর্য-বীর্য্যে শূর্পনখার ঈর্ষা, মাল্যবান কর্তৃক শূর্পনখার নিকট শ্রীরামচন্দ্রের ভবিষ্য-জীবন বর্ণন, শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস প্রভৃতি। এই অঙ্কে প্রকাশ,—রাক্ষসী শূর্পনখাই মন্থরার শরীরে প্রবেশ করিয়া, শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসরূপ অনর্থ ঘটাইয়াছিল। অভিষেক-উৎসবের আয়োজন চলিয়াছে। মন্থরারূপী শূর্পনখা একখানি পত্র আনিয়া রাম-লক্ষ্মণকে প্রদান করিল। সে পত্র—যেন কৈকেয়ী বর-প্রার্থনা করিয়া রাজা দশরথকে লিখিতেছেন। অর্থাৎ,—কৈকেয়ী দশরথের সম্মুখে যে কোনও কথা বলিয়াছিলেন, অথবা কৈকেয়ী যে সে বিষয় অবগত ছিলেন, তাহা বুঝা যায় না। দশরথ যখন উৎসব উপলক্ষে কল্পতরুরূপে, যে যাহা চাহিতেছে—তাহা দান করিতেছেন, শ্রীরামচন্দ্র সেই সময় আসিয়া তাঁহার নিকট কৈকেয়ীর প্রার্থিত বরের বিষয় জ্ঞাপন করিলেন এবং সে প্রার্থনা পূরণ জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। লক্ষ্মণ সেই পত্র পাঠ করিয়া দশরথকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন। পত্র শ্রবণে দশরথ মূর্চ্ছিত হন। যুধাজিৎ, ভরত, জনক—সকলেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন; এই অবস্থায় শ্রীরামচন্দ্রের বনগমন হয়। ভরত ঐ বরপ্রদান নিবারণ পক্ষে বিধিমতে চেষ্টা করিয়াছিল; পরিশেষে তিনি শ্রীরামচন্দ্রের অনুগমন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের অনুরোধে পাদুকা অভিষেকে রাজ্যপালনের ভারগ্রহণে সম্মত হইয়া ভরত প্রত্যাবৃত্ত হন। মাতুল যুধাজিৎ এবং প্রজাবর্গ পর্য্যন্ত শ্রীরামচন্দ্রের বনগমনে সঙ্গী হইতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। চতুর্থ অঙ্কে এই সকল বিষয় পরিবর্ণিত আছে। পঞ্চম অঙ্কে প্রথমে বিষ্কম্ভকে জটায়ুর ও তাঁহার ভ্রাতা সম্পাতির কথোপকথনে সীতাহরণের পূর্ব্বাভাস সূচিত হইয়াছে। ঐ অঙ্কে, সীতাহরণ, বালিবধ, বিভীষণ-সম্মিলন প্রভৃতি বর্ণিত আছে। ষষ্ঠ অঙ্কে,—লঙ্কাদাহন প্রভৃতির বর্ণনা, সীতার সম্বন্ধে রাবণের দুশ্চিন্তা, বিপক্ষ-সেনার লঙ্কাপুরে প্রবেশের অবস্থা, যুদ্ধ প্রভৃতি পরিবর্ণিত। সপ্তম অঙ্কে,—লঙ্কা-বিজয়ের পর পুষ্পক-রথে, বিমান-পথে শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতির অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন ও রাজ্যাভিষেক। কালিদাসের রঘুবংশে লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় গমনের যে আলেখ্য প্রকটিত দেখি; মহাবীর-চরিতেও তদনুরূপ এক চিত্রপট অঙ্কিত হইয়াছে। বিমান-পথে আগমন-কালে শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, সুগ্রীব প্রভৃতির বাক্যে সেই পথের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। সীতাকে সকলে পূর্ব্ব-পরিচিত স্থান-সকল দেখাইতে দেখাইতে অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন। গ্রন্থের উপসংহারে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীরামচন্দ্র রাজ্যের মঙ্গল-কামনা করিতেছেন। সে প্রার্থনা, নাটকের লক্ষণ অনুসারেই প্রকটিত দেখি। এ গ্রন্থে কবিত্বের স্ফূর্ত্তি অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়। কি মহাবীরচরিত, কি উত্তররামচরিত,—উভয়েরই ঘটনাবলী যদিও সর্ব্বজনবিদিত, কিন্তু কবিত্ব-প্রভায় উভয়েই পাঠকের হৃদয় পুলকিত করিয়া রাখিয়াছে।

মহাবীরচরিত অপেক্ষাও উত্তররাম-চরিতের কবিত্ব অধিকতর প্রস্ফুট। উত্তররামচরিতের আরম্ভ—লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর রামসীতা সিংহাসনে সমারূঢ়; আনন্দোচ্ছ্বাসে রাজভবন উচ্ছ্বসিত। প্রথম অঙ্কে প্রথম দৃশ্যে রাম-সীতা সিংহাসনে উপবিষ্ট। কঞ্চুকী আসিয়া অষ্টাবক্র ঋষির আগমন সংবাদ প্রদান করিল। ঋষির আগমন-সংবাদ শ্রবণ মাত্র সীতাদেবী কহিলেন,—"আর্য্য! তাঁহাকে অবিলম্বে এখানে আনয়ন করাই বিধেয়।" শ্রীরামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ অষ্টাবক্র ঋষিকে তাঁহাদের সম্মুখে আনয়ন করিতে কঞ্চুকীকে আদেশ কহিলেন। অষ্টাবক্র ঋষি কুলগুরু বশিষ্ঠ দেবের নিকট হইতে আগমন করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠদেব যজ্ঞকার্য্যে ব্রতী থাকায় রাজ্যাভিষেক উৎসবে উপস্থিত হইতে পারেন নাই; তাই অষ্টাবক্রের দ্বারা সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন ও আশীর্ব্বাদ জানাইয়াছিলেন। বশিষ্ঠের পক্ষ হইয়া অষ্টাবক্র জ্ঞাপন করেন,—মহর্ষি জানাইয়াছেন, আপনি প্রজাপালনে যশস্বী হইলেই আমরা পরম লাভবান হইব। ফলতঃ, শ্রীরামচন্দ্র আদর্শ প্রজাপালক বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করুন, ইহাই সকলের ঐকান্তিক কামনা। বশিষ্ঠ প্রভৃতির ঐরূপ আকাঙ্ক্ষার পরিচয় পাইয়া শ্রীরামচন্দ্র তাহাতে উত্তর করিলেন,—

উত্তররামচরিত।

"স্নেহং দয়াঞ্চ সখ্যঞ্চ যদি বা জানকীমপি।
আরাধনায় লোকানাং মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা॥"

এই উত্তরটী কবি এমনই কৌশলে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, এই উক্তিতে যুগপৎ শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র এবং ভবিষ্যৎ ঘটনার আলেখ্য চিত্রিত হইয়া আছে। ঐ দুই পংক্তিই নাটকের প্রাণ-স্বরূপ। বুঝিতে পারা যায়, উহাতেই কবি প্রকারান্তরে বলিয়া দিলেন, কি অবস্থা হইতে কি ঘটনা সংঘটিত হইবে। অষ্টাবক্র প্রস্থান করিলে, লক্ষ্মণ কতকগুলি চিত্রপট লইয়া রামসীতার সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন; কহিলেন,—'আর্য্য! সেই চিত্রকর এই চিত্রপট-সমূহ অঙ্কিত করিয়াছেন। ইহাতে আপনার অতীত জীবনের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে।' এই বলিয়া লক্ষ্মণ এক-একখানি চিত্রপট দেখাইতেছেন, আর সেই চিত্রপটের বিষয় বুঝাইয়া দিতেছেন। এক একটী চিত্রপটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের ও সীতাদেবীর মনে কত ভাবেরই উদয় হইতেছে! কখনও অতীত দুঃখের কাহিনী স্মরণ করিয়া তাঁহাদের নয়ন অশ্রুপ্লাবিত হইতেছে; কখনও বা শ্রীরামচন্দ্রের শৌর্য্য-বীর্য্যের বিষয় অবগত হইয়া সীতাদেবী আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছেন। এই সময়ে শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রে তাঁহার মহত্ত্বের একটী উজ্জ্বল চিত্র প্রকটিত দেখি। চিত্রের বিষয় বর্ণন করিতে করিতে করিতে লক্ষ্মণ একবার শ্রীরামচন্দ্রের প্রশংসা-কীর্ত্তন করিলেন। আত্ম-প্রশংসা-শ্রবণে একটু যেন বিরক্তি বোধ হইল। শ্রীরামচন্দ্র তাই আক্ষেপ করিয়া কহিলেন,—"বহুতরং দ্রষ্টব্যমন্যতো দর্শয়।—দেখাইবার জিনিষ আরও অনেক আছে; তৎসমুদায় দেখাইয়া যাও।" যে চিত্র প্রসঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের ঐরূপ আক্ষেপোক্তি প্রকাশ পায়,—সে চিত্র ভার্গবের পরাজয়-সংক্রান্ত। লক্ষ্মণ দেখাইতেছেন,—'আর্য্য! এই একটী দ্রষ্টব্য জিনিষ দেখুন। এই দেখুন,—ভগবান ভার্গব।' ভার্গবের নাম শুনিয়াই সীতা-দেবী সসম্ভ্রমে কহিলেন,—'ইহাঁকে দেখিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।' লক্ষ্মণ তাহাতে উত্তর দিলেন,—'কিন্তু এই দেখুন, আর্য্য কি ভাবে তাঁহার দর্প চূর্ণ করিতেছেন!' এবম্বিধ প্রশংসা

বাক্যেই ক্ষুণ্ণ হইয়া শ্রীরামচন্দ্র অন্য চিত্র দেখাইতে বলেন। এইরূপভাবে চিত্র-প্রদর্শন-কালে কত স্মরণীয় ঘটনাই তাঁহাদের মনোমধ্যে জাগিয়া উঠে! লক্ষ্মণ যখন গোদাবরী-তটের প্রতিচ্ছবি প্রদর্শন করিয়া কহিলেন,—"অয়মবিরলানোকহনিবহ নিরন্তরস্নিগ্ধ নীলপরিসরারণ্যপরিণদ্ধগোদাবরীমুখরকন্দরঃ সন্ততমভিষ্যন্দমানমেঘমেদুরিতনীলিমা জনস্থানমধ্যগো গিরিঃ প্রস্রবণো নাম"; স্মরণ করাইলেন,—প্রকৃতির সেই রম্যনিকেতন গোদাবরী-তীরের স্বভাব-সুন্দর চিত্র; তখন শ্রীরামচন্দ্রের মনে একটী অতীত কাহিনী জাগিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন,—

"স্মরসি সুতনু তস্মিন্ পর্ব্বতে লক্ষ্মণেন প্রতিবিহিতসপর্য্যাসুস্থয়োস্তান্যহানি।
স্মরসি সুরসনীরাং তত্র গোদাবরীং বা স্মরসি চ তদুপান্তেষ্বাবয়োর্ব্বর্ত্তনানি॥"
"কিমপি কিমপি মন্দং মন্দমাসত্তিযোগাদবিরলিতকপোলং জল্পতোরক্রমেণ
অশিথিল পরিরম্ভব্যাপৃতৈকৈকদোষ্ণোরবিদিতগতযামা রাত্রিরেব ব্যরংসীৎ॥"

তাঁহার স্মরণ হইল,—সেই নিসর্গ সুন্দরীর ক্রোড়ে কেমন করিয়া তাঁহারা সুখে কালযাপন করিতেন। স্মরণ করিতে করিতে তিনি কহিলেন,—'এই স্থানে যখন আমরা গাঢ় আলিঙ্গনে সম্মিলিত ছিলাম, পরস্পর পরস্পরকে বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়া, গণ্ডস্থলে গণ্ডস্থল মিশাইয়া, সুখে কথোপকথনে কাল কাটাইয়াছিলাম, তখন যেন আমাদের অজ্ঞাতসারে রাত্রি কাটিয়া গিয়াছিল।' আর এক স্থানের আর এক চিত্রে এইরূপ আর এক স্মৃতি উজ্জ্বল দেখি। যখন সীতাদেবীকে চিত্রকূট-পর্ব্বত-সান্নিধ্যে কালিন্দী-তটে শ্যাম-বট প্রদর্শিত হইল, শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন,—'প্রিয়ে, এই সেই প্রদেশ, যেখানে তুমি পথ-শ্রান্তে কাতর হইয়া তোমার অলস-শিথিল মৃণাল দেহ আমার বক্ষে রাখিয়া, আমায় গাঢ় আলিঙ্গনে নিদ্রা গিয়াছিলে!

"অলসলুলিতমুগ্ধান্যধ্বসঞ্জাতস্বেদাদশিথিলপরিরম্ভৈর্দত্তসংবাহনানি।
পরিমৃদিতমৃণালীদুর্ব্বলান্যঙ্গকানি ত্বমুরসি মম কৃত্বা যত্র নিদ্রামবাপ্তা॥"

উত্তররামচরিতের বর্ণনীয় বিষয় ভারতের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই পরিজ্ঞাত; কিন্তু সেই সর্ব্বজনবিদিত পুরাতন কাহিনীতে কবি এতই সরস মধুর রসের সঞ্চার করিয়াছেন যে, উহা এক অভিনব মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। ঘটনার ঘনঘটা অপেক্ষা ভাবের লহর-লীলায় উত্তররামচরিত প্রাণ উদ্বেলিত করিয়া তুলে। পবিত্র প্রেমের সহিত কর্ত্তব্য-পালনের বিষম দ্বন্দ্ব—উত্তররামচরিতের প্রাণভূত। এক দিকে প্রেমের পবিত্র মূর্ত্তি সতী সাধ্বী সীতাদেবী, অন্য দিকে প্রজামণ্ডলীর মনস্তুষ্টি। এই ভাব পরিস্ফুট করিবার জন্য কবি প্রথমে দেখাইলেন,—মিলনের চিত্র, সুখের সংসার, পবিত্র প্রেমের বিমল নির্ঝর। কত প্রেম, কত ভালবাসা,—অভিন্ন হৃদয়, অভিন্ন প্রাণ! তখন ভ্রমেও কাহারও মনে হয় নাই,—সে প্রশান্ত, স্নিগ্ধ, রমণীয়, নির্ম্মল প্রকৃতি, লোকাপবাদের ঘোর ঝঞ্ঝাবাতে বিপর্য্যস্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। প্রণয়ের অনাবিল উজ্জ্বল চিত্র আঁকিয়া সীতাদেবীর চরিত্রের প্রতি শ্রীরামচন্দ্রের প্রগাঢ় বিশ্বাস দেখাইয়া, যিনি হৃদয়ের অধীশ্বরী, মস্তকে রাখিবার উপযোগী কুসুম-প্রাণ, (কুসুমের উপমা ৩৬৫ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) তাঁহারই নির্ব্বাসন! কি ঘটনায় কি প্রকারে সে নির্ব্বাসন সংঘটিত হইল, কবি তার পর তাহা অঙ্কিত করিলেন। কোথায় কোন্ কোণে একটু অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ছিল; বিষম বাত্যায় সে স্ফুলিঙ্গ উড়িয়া আসিয়া সুখের সংসার—পবিত্র

প্রণয়ের বিমল সৌধ—ভস্মীভূত করিয়া দিল। প্রজাগণের অভাব অভিযোগের বিষয় অবগত হইবার জন্য দুর্ম্মুখ (গুপ্তচর) নিযুক্ত ছিল। অপ্রীতিকর হইলেও যথাযথ চিত্র বর্ণন করিবে,—মিথ্যা মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করিবার চেষ্টা পাইবে না,—দুর্ম্মুখের ইহাই কার্য্য। প্রজাবর্গের মনোভাব অবগত হইয়া এক দিন দুর্ম্মুখ শ্রীরামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইল। শ্রীরামচন্দ্র দুর্ম্মুখের নিকট রাজ্যের সমাচার অবগত হইতে চাহিলেন। দুর্ম্মুখ সে দিন যেন একটু সঙ্কোচের ভাবে উত্তর দিল,—"উপচ্চ অস্তি দেঅং পৌরজানবদা, বিস্সুমরিদা অম্হে মহারাঅ দসরহস্স, রামদেএনত্তি।" কিন্তু এ উত্তর শ্রীরামচন্দ্রের মনোমত হইল না। পৌরজানপদ তাঁহার প্রশংসাবাদ কীর্ত্তন করিতেছে, তাঁহাকে পাইয়া রাজা দশরথকে বিস্মৃত হইয়াছে,—এ উত্তর শ্রীরামচন্দ্রের নিকট যেন স্তোক বাক্য বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তিনি উত্তর দিলেন,—"অর্থবাদ এষঃ। দোষস্তু মে কশ্চিৎ কথয়, যেন স প্রতিবিধীয়তে।" তিনি যে পিতা দশরথের অধিক গুণসম্পন্ন হইয়াছেন,—এ বিশ্বাস তাঁহার আদৌ ছিল না। সুতরাং তিনি কহিলেন,—"স্তোকবাক্য পরিত্যাগ কর। আমার ত্রুটি-বিচ্যুতির বিষয় যদি কিছু জানিয়া থাক, তাহা বলিয়া যাও। তাহা হইলে আমি তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা পাইতে পারি।" দুর্ম্মুখ ইহার পর যে উত্তর দিল, সে উত্তরে বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইল। সীতাদেবীর চরিত্রে প্রজামণ্ডলী সন্দিহান, এ মর্ম্মচ্ছেদী শেলবাক্য শ্রীরামচন্দ্রকে মুহ্যমান করিয়া দিল। কুলগুরু বশিষ্ঠ-দেবের আশীর্ব্বাদের উত্তরে কি কুক্ষণেই শ্রীরামচন্দ্রের মুখ হইতে বহির্গত হইয়াছিল,—'প্রজাগণের তুষ্টির জন্য জানকীকে পর্য্যন্ত যদি পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও আমি কুণ্ঠিত হইব না,' আজ দুর্ম্মুখের মুখে প্রজার মনোভাব অবগত হইয়া, তাহাই কার্য্যে পরিণত হইল। শ্রীরামচন্দ্র প্রজাগণের মনস্তুষ্টির জন্য সীতাদেবীর প্রতি নির্ব্বাসন-দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলেন। এই দণ্ডাজ্ঞা-প্রদানের সময় তাঁহার চিত্ত যেরূপ উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল, সাধারণ মনুষ্য হইলে সে উদ্বেগে কখনই অচঞ্চল থাকিতে পারিতেন না। হৃদয়ের মধ্যে তখন কি বিষম দ্বন্দ্বই উপস্থিত হইয়াছিল। দেবীর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় প্রণয়ের চিত্রও সেখানে পরিস্ফুট, আবার প্রজাপালনরূপ কর্ত্তব্য-পরায়ণতাও সেখানে উজ্জ্বলীকৃত। শ্রীরামচন্দ্র তখন কি বলিয়া বিলাপ করিতেছেন এবং সীতাদেবীর স্মৃতি কি ভাবে তাঁহার মনে উদয় হইতেছে, নিম্নোদ্ধৃত কয়েক পংক্তিতে তাহা বোধগম্য হইবে,—"হা দেবি দেবযজনসম্ভবে! হা স্বজন্মানুগ্রহপবিত্রীকৃত বসুন্ধরে। হা জনকবংশনন্দিনি! হা পাবকবশিষ্ঠারুন্ধতী প্রশস্তশীলশালিনি। হা রামৈকজীবিতে! হা মহারণ্যবাস প্রিয়সখি। হা তাতপ্রিয়ে! হা স্তোকপ্রিয়বাদিনি! কথ মেবংবিধায়াস্তবায়মীদৃশঃ পরিণামঃ। ত্বয়া জগন্তি পুণ্যানি ত্বয্যপুণ্যা জনোক্তয়ঃ। নাথবন্তস্ত্বয়া লোকস্ত্বমনাথা বিপৎস্যাম॥" এই বিলাপোক্তিতে সীতাদেবীর প্রতি যে সকল বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার তুলনা নাই। তাঁহার দ্বারা বসুন্ধরা পবিত্রীকৃত, তিনি পারকারশিষ্টা অরুন্ধতীর ন্যায় শীলতাসম্পন্না, শ্রীরামচন্দ্রকে ভিন্ন তিনি আর কাহাকেও জানেন না—তিনি 'রামৈকজীবিতে', তাঁহার এই পরিণাম সংঘটিত হইল! যাঁহার দ্বারা স্বর্গ-মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিভুবন পবিত্রীকৃত, তাঁহারই প্রতি কুৎসাবাদ! পৃথিবীর যিনি সহায়-স্বরূপিণী, তিনিই সহায়হীনা। এবম্বিধ খেদোক্তিতে, সীতাদেবীর প্রতি তাঁহার কি প্রগাঢ় বিশ্বাস, সহজেই

বুঝা যায়। প্রজাবর্গের মনোভাবের সংবাদ লইয়া দুর্ম্মুখ যখন শ্রীরামচন্দ্র সমীপে উপস্থিত হন, তাহাব অব্যবহিত পূর্ব্বে সীতাদেবীর তন্দ্রালসভাব প্রকাশ পায়। শ্রীরামচন্দ্র তখন আপনার বাহুমূল উপাধানরূপে ন্যস্ত করিয়া তদুপরি সীতাদেবীকে শায়িত করেন; বলেন,—

"আবিবাহসময়াদ্‌গৃহে বনে শৈশবে তদনু যৌবনে পুনঃ।
স্বাপহেতুরনুপাশ্রিতোঽন্যথা বামবাহুরুপাধানমেষ তে॥"

'শুভ পরিণয়ে শুভ মিলনেব সঙ্গে সঙ্গে এই বাহু প্রিয়াব উপাধান মধ্যে গণ্য হইয়াছে। কিবা নিবিড় নির্জ্জন অবণ্যে, কিবা সুসজ্জিত বহুজনপূর্ণ বাজ-প্রাসাদে, কি কৌমারে, কি যৌবনে, কি বার্দ্ধক্যে—সর্ব্বত্র সকল সময়ে—এ বাহু-রূপ উপাধান প্রিয়াব শ্রান্তি-অপনোদনের জন্য প্রস্তুত আছে।' ইহাব পব দেবী নিদ্রাভিভূতা হইলে, শ্রীবামচন্দ্র মনে মনে বলেন,—

"ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্ত্তির্নয়নয়ো
রসাবস্যাঃ স্পর্শো বপুষি বহুলশ্চন্দনরসঃ।
অয়ং কণ্ঠে বাহুঃ শিশিরমসৃণো মৌক্তিকসরঃ
কিমস্যা ন প্রেয়ো, যদি পরমসহ্যস্তু বিরহঃ॥"

'যিনি আমাব গৃহেব লক্ষ্মীস্বরূপিণী, যিনি আমাব নয়নেব অঞ্জনশলাকা-সদৃশী, যাঁহাব স্পর্শে চন্দন-রসেব স্নিগ্ধতা অনুভব করি, যাঁহাব বাহুযুগলে মুক্তাহারের শীতলতা ও মসৃণতা চিব-অনুভূত, তাঁহাব আনন্দময় মিলনে যদি কখনও বিচ্ছেদ না ঘটিত, তবে না জানি জীবন কত সুখেই সুখী হইত।' শ্রীরামচন্দ্রেব বাহুমূলে সীতাদেবী নিদ্রা যাইতেছেন, সীতাদেবীর বিচ্ছেদ না ঘটিলে জীবন কত সুখেরই হইত,—শ্রীবামচন্দ্র এইরূপ চিন্তা করিতেছেন; সহসা প্রতিহারী আসিয়া দুর্ম্মুখের আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন করিল। কি হরিষে কি বিষাদ!—কি আনন্দে কি বিঘ্ন! পর পব এবম্বিধ ঘটনাব সমাবেশ কি প্রাণস্পর্শী হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে,—তাহা বুঝাইবাব নহে। তাহা কেবল অনুভূতিব বিষয়। দুর্ম্মুখ মুখে দুঃসংবাদ অবগত হইবাব অল্পক্ষণ পূর্ব্বে শ্রীবামচন্দ্র সীতাদেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"ম্লানস্য জীবকুসুমস্য বিকাশনানি সন্তর্পণানি সকলেন্দ্রিয়মোহনানি।
এতানি তে সুবচনানি সরোরুহাক্ষি কর্ণামৃতানি মনসশ্চ রসায়নানি॥"

'প্রিয়ে পদ্মপলাশাক্ষি! তোমার বাক্য-সুধা আমাব সংসার-চিন্তা পরিম্লান জীবন-কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিয়া দিয়াছে। তোমাব সুবচন আমার ইন্দ্রিয়গণের মোহ উৎপাদন করে, তদ্দ্বারা আমার কর্ণে অমৃত সিঞ্চিত হয়, আব শক্তিসঞ্চারক রসায়নের ন্যায় আমার মনঃপ্রাণ উৎসাহান্বিত করে।' যে সীতার সহিত শ্রীরামচন্দ্রের এবম্বিধ প্রগাঢ় প্রণয় বন্ধন, লোকাপবাদ-রূপ বিষম কুঠারাঘাতে তাহা ছিন্ন হইতে চলিল! শ্রীরামচন্দ্রের প্রশ্নে দুর্ম্মুখ যখন তাঁহার কাণে কাণে চুপি চুপি লোকাপবাদের কথা কহিল; বজ্রাহতের ন্যায় শ্রীরামচন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ক্ষণপরে সংজ্ঞালাভান্তে অনুশোচনায় অশ্রুজলে তাঁহার হৃদয় প্লাবিত হইল। তিনি সীতাদেবীর উদ্দেশ্যে কতই আক্ষেপ করিলেন! কিন্তু পরক্ষণেই মনকে সান্ত্বনা দিলেন; কহিলেন,—"সতাং কেনাপি কার্য্যেণ লোকস্যারাধনং ব্রতম্। যৎপূরিতং হি তাতেন মাঞ্চ প্রাণাংশ্চ মুঞ্চতা॥ লোক-রঞ্জনই সজ্জনগণেব ব্রত। সেই কার্য্যেই আমার

পিতৃপিতামহগণ জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন। আমারও সেই কার্য্যে জীবনপাত করা কর্ত্তব্য।" ইহার পর দুর্ম্মুখকে কহিলেন,—'যাও দুর্ম্মুখ, লক্ষ্মণকে নূতন রাজার নূতন আদেশ জ্ঞাপন কর।' দুর্ম্মুখ চলিয়া গেলে, শোকের প্রবল ধারায় তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল। শ্রীরামচন্দ্র যখন সীতাদেবীর ভবিষ্য চিন্তায় অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন, নেপথ্যে ঋষিকণ্ঠে ধ্বনিত হইল,—"যমুনাতীরে লবণাসুরের উপদ্রবে ঋষিগণের যাগ-যজ্ঞ পণ্ড হইতে চলিয়াছে। রক্ষা করুন—রক্ষা করুন।" আবার রাক্ষসের ত্রাস! আবার ব্রাহ্মণের যজ্ঞে বিঘ্ন! কর্ত্তব্য-পালনের আবার এক নূতন কর্ম্মক্ষেত্র! প্রজাপালক নৃপতি শ্রীরামচন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সীতা নিদ্রাভিভূতা শায়িতা রহিলেন। শ্রীরামচন্দ্র দৈত্য-সংহারে চলিয়া গেলেন। নিদ্রাভঙ্গে পার্শ্বে প্রাণপতিকে না দেখিতে পাইয়া, সীতাদেবী যখন বিষম চিন্তাসাগরে নিমগ্ন, সহসা দুর্ম্মুখ প্রবেশ করিয়া কহিলেন,—'কুমার লক্ষ্মণ রথ সজ্জা করিয়া প্রস্তুত আছেন; আপনি আসুন।' সীতাদেবী গাত্রোত্থান করিয়া যুক্তকরে দেবগণের উদ্দেশ্যে প্রণতি জানাইলেন, উদ্দেশ্যে পতির চরণকমলে প্রণতি করিলেন, উদ্দেশ্যে সকল গুরুজনের প্রতি প্রণত হইলেন। বিদায়ের পূর্ব্বে যুক্তকরে নিবেদন করিলেন,—"ণমো ণমো তপোধণাণং, ণমোণমো রঘু-উলদেবদাণং, ণমোণমো অজ্জউত্তচরণকমলাণং, ণমোণমো সঅলগুরুঅণাণং।" ইহাই উত্তররাম-চরিতের প্রথম অঙ্ক। আরম্ভে পতিপার্শ্বে সতী অবস্থিত, উপসংহারে বিচ্ছেদের বিষম ব্যবধান। এই প্রথম অঙ্কেই, এই সর্ব্বজনবিদিত ঘটনাবলীর মধ্যেই, কবি এমনই কলা-কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন—এমনই লিপি-চাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন যে, তাহার তুলনা অন্যত্র বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দ্বিতীয় অঙ্কে, প্রথমে বিষ্কম্ভকে আত্রেয়ীর ও বাসন্তীর কথোপকথনে শম্বুক নামক শূদ্রের তপস্যায় সংসারে অনিষ্টোৎপত্তির বিষয়—ব্রাহ্মণ-সন্তানের অকাল-মৃত্যু প্রভৃতির প্রসঙ্গ এবং শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক শূদ্র-তপস্বীর বধ-বৃত্তান্ত পরিবর্ণিত আছে। শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক গতজীবন হইয়া শম্বুক দিব্য-দেহ প্রাপ্ত হন। সেই শম্বুক শ্রীরামচন্দ্রকে দণ্ড-কারণ্য দেখাইতে দেখাইতে পঞ্চবটী অভিমুখে লইয়া যান। তখন আবার পুরাতন স্মৃতি মনোমধ্যে জাগিয়া উঠে। এইভাবে পূর্ব্বপরিচিত জনস্থান দেখাইতে দেখাইতে শম্বুক শ্রীরামচন্দ্রকে পঞ্চবটীতে পৌছাইয়া দেন। এইখানে তৃতীয় অঙ্কের আরম্ভ। এখানে কবি কল্পনা-কৌশলে এক অভিনব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রথমে বিষ্কম্ভকে মুরলা ও তমসা সখিদ্বয়ের কথোপকথনে সীতাদেবীর তাৎকালীন অবস্থার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। গর্ভবতী সীতা অরণ্যে আসিয়া, লব-কুশ পুত্র সন্তান লাভ করিয়াছেন; পতির চিন্তায় তাঁহার মুখ-পঙ্কজ পরিম্লান হইয়াছে; তাঁহাতে একাধারে করুণা ও দুঃখ মূর্ত্তিমান হইয়া আছে। তমসার ও মুরলার কথোপকথনে কবি প্রথমে সীতাদেবীর সেই চিত্র অঙ্কিত করিলেন। তাঁহারা বলিতেছেন,—

"পরিপাণ্ডুদুর্ব্বলকপোলসুন্দরং দধতী বিলোলকবরীকমাননম্।
করুণস্য মূর্ত্তিরথবা শরীরিণী বিরহব্যথেব বনমেতি জানকী॥"
"কিশলয়মিব মুগ্ধং বন্ধনাদ্বিপ্রলূনং হৃদয়কুসুমশোষী দারুণো দীর্ঘশোকঃ।
গ্লপয়তি পরিপাণ্ডুক্ষামমস্যাঃ শরীরং শরদিজইব ঘর্ম্মঃ কেতকীগর্ভপত্রম্॥"

তাঁহার মুখকমল বিশুষ্ক পাণ্ডুবর্ণ, নয়নে জলধারা নিপতিত; তিনি যেন মানবীবেশধারিণী

করুণার মূর্ত্তি। অথবা, বিরহ-বিধুরা সাক্ষাৎ বিষাদ-রূপিণী। তিনি বৃন্তছিন্ন কিশলয়ের ন্যায় বিমলিন, দারুণ দীর্ঘ শোকে তাঁহার হৃদয়কুসুম বিশুষ্ক, শরৎকালীন কেতকী কুসুমের গর্ভপত্রের ন্যায় তাঁহার শরীর ক্ষীণ, পাণ্ডুবর্ণ ও ক্লান্তিযুক্ত। বিষ্কম্ভকে বাসন্তীর সহিত মুরলার যখন এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, সেই সময় সীতাদেবী তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হন। তখন পঞ্চবটী-দর্শনে শ্রীরামচন্দ্রের প্রাণ বড়ই বিচলিত হইয়াছে। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিতেছেন,—'পঞ্চবটী দর্শন করিয়া আমার অন্তরস্থিত শোকানল ঘনীভূত ধূমের ন্যায় হইয়াছে, আর সেই ধূম-মোহে আমার জ্ঞান আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে!' এই বলিয়া বিলাপ করিতে করিতে তিনি উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—"হা প্রিয়ে জানকি!" নেপথ্যে উত্থিত সেই স্বর তমসার ও সীতাদেবীর কর্ণে প্রবেশ করিল। শ্রীরামচন্দ্র যখন নেপথ্যে কহিলেন,—

"অন্তর্লীনস্য দুঃখাগ্নেরদ্যোদ্দামং জ্বলিষ্যতঃ।
উৎপীড় ইব ধূমস্য মোহ প্রাগাবৃণোতি মাম্॥"

তখন সীতাদেবী ও তাঁহার সখীদ্বয়ের হৃদয় মন তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইল। বরপ্রভাবে সীতাদেবী শ্রীরামচন্দ্রের অদর্শনীয়া ছিলেন। তাঁহার সখী তমসাও অদৃশ্যভাবে অবস্থিত থাকেন। ক্ষণপরে বাসন্তী শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হন। এই সময় সীতাদেবীর শোকে অভিভূত হইয়া, শ্রীরামচন্দ্র মূর্চ্ছা-ভাবাপন্ন হইয়া পড়েন;—সাশ্রুনয়নে ভূপতিত হইয়া সীতাদেবীর বিষয় চিন্তা করিতে থাকেন। দেবী তখন আর স্থির থাকিতে পারেন না। তিনি অদৃশ্যভাবে নিকটে গিয়া করপল্লব দ্বারা তাঁহার শুশ্রূষায় রত হন। এই সময়ের কল্পনা-কৌশল বড়ই মনোহর! শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে দেখিতে পাইতেছেন না, অথচ তাঁহার অঙ্গস্পর্শজনিত অনুপম আনন্দ অনুভব করিতেছেন! আনন্দে গদগদ হইয়া শ্রীরামচন্দ্র কহিতেছেন,—

"প্রশ্চোতনং নু হরিচন্দনপল্লবানাং নিষ্পীড়িতেন্দুকরকন্দলজোনু সেকঃ।
আতপ্তজীবতিমনঃপবিতর্পণোমে সঞ্জীবনৌষধিরসো নু হৃদি প্রসিক্তঃ॥
স্পর্শঃ পুরা পরিচিতোনিয়তং স এষ সঞ্জীবনশ্চ মনসঃ পরিমোহনশ্চ।
সন্তাপজ্রাং সপদি যঃ প্রতিহত্য মূর্চ্ছামানন্দেন জড়তাং পুনরাতনোতি॥"

'এ কি হরিচন্দন-পল্লবের অমৃতক্ষরণ! অথবা, এ কি সুধাংশুকিরণ-সমুদ্ভূত নির্য্যাসের ধারা! অথবা, এ কি সন্তাপদগ্ধ জীবনের শান্তিদায়িনী সঞ্জীবনী সুধা আমার হৃদয়ে প্রলিপ্ত হইল! প্রাণানন্দদায়িনী সঞ্জীবনী-শক্তিশালিনী এ স্পর্শানুভূতি যেন পূর্ব্বপরিচিত! জানকীকে পরিত্যাগ-জনিত অবসাদ দূর হইয়া এ স্পর্শে আনন্দজনিত কি যেন এক অভিনব অবসাদ আনয়ন করিতেছে।' এই স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে জানকীর স্মৃতি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভূত হইতে লাগিল। এই সময়ে বাসন্তী শ্রীরামচন্দ্রের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। জানকীর বির[illegible] অধিকতর-রূপে তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত করিবার জন্য, বাসন্তী একে একে পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাবলী তাঁহাকে দেখাইতে আরম্ভ করিলেন; কহিলেন—"এই দেখুন, সেই কদলীকুঞ্জ! এইখানেই এই মর্ম্মরোপরি সীতাসহ আপনি কত সুখে কালযাপন করিয়াছিলেন! এই মর্ম্মর-বেদীতে বসিয়াই দেবী মৃগশাবককে আহার দিতেন, আর তাহারা নিঃশঙ্কে আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইত। মনে পড়ে কি—সে স্মৃতি!" শ্রীরামচন্দ্র আর সহ্য করিতে পারিলেন না। অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইল।

তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"বাসন্তী! আর এ দৃশ্য দেখিতে পারি না!" বাসন্তীর এই কঠোর ব্যবহারে সীতাদেবী বড়ই ব্যথিত হইলেন। তিনি বলিলেন,—"বাসন্তী! তুই বড়ই নিষ্ঠুর! আমার প্রাণপ্রিয় পতি সকলেরই সম্মানভাজন। বিশেষতঃ, যাহারা আমাকে ভালবাসে, তাহাদের ভালবাসা পাইবার তিনি তো পূর্ণ অধিকারী।' বাসন্তী যখন শ্রীরাম-চন্দ্রকে সেই কদলীকুঞ্জ দেখাইতেছিলেন, সীতাদেবী যখন অদৃশ্যভাবে থাকিয়া বাসন্তীর প্রতি ঐরূপ অনুযোগ করিতেছিলেন, শ্রীরামচন্দ্র তখন কাতর-কণ্ঠে কহিলেন,—'প্রিয়ে জানকী! তুমি কোথায়? চারিদিকে তোমায় দেখিতেছি, তবু যে তোমায় দেখিতে পাই না? দেবী! সদয় হও—সদয় হও। দেহ অবসন্ন, হৃদয় বিদীর্ণ, অন্তর জ্বলিতেছে! অবসন্ন অন্তরাত্মা মোহাচ্ছন্ন, অন্ধকারে নিমজ্জিত। আমি মন্দভাগ্য!—এখন কি করি—উপায় কি?' এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে, শ্রীরামচন্দ্র যখন মূর্চ্ছিত হইলেন; 'হা ধিক—হা ধিক! আর্য্যপুত্র পুনরায় মূর্চ্ছিত"—এই বলিয়া সীতাদেবী পুনরায় শ্রীরামচন্দ্রকে আলিঙ্গন করিলেন। সীতাদেবীর স্পর্শে অতুলনীয় আনন্দে শ্রীরামচন্দ্রের মনে হইল,—যেন অন্তরে বাহিরে অমৃতময় প্রলেপ প্রলিপ্ত হইয়াছে, স্পর্শসুখে হর্ষজনিত মোহে তিনি যেন অবস্থান্তর লাভ করিয়াছেন। এ দৃশ্য কবির তুলিকায় কি মর্ম্মস্পর্শীই হইয়াছে। একটু পরিচয় নিম্নে প্রদান করিতেছি। বাসন্তী একটী ময়ূরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—

"অতরুণমদতাণ্ডবোৎসবান্তেষ্বয়মচিরোদ্গতমুগ্ধলোলবর্হঃ।
মণিমুকুটইবোচ্ছিখঃ কদম্বে নদতি স এষ বধূসখঃ শিখণ্ডী॥"

'সীতাদেবী পুত্রের ন্যায় স্নেহে যে ময়ূরকে প্রতিপালন করিতেন, ঐ দেখুন, সেই চঞ্চল-শিখাযুক্ত ময়ূর নৃত্যাদি মহোৎসব সম্পন্ন করিয়া মণি-মুকুট-ধারী কদম্ব বৃক্ষে বসিয়া কেকারব করিতেছে।' বাসন্তী ময়ূরের কথা স্মরণ করাইলে, শ্রীরামচন্দ্র ময়ূরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—

"ভ্রমিষু কৃতপুটান্তর্মণ্ডলাবৃত্তি চক্ষুঃ প্রচলিতচতুরভ্রূতাণ্ডবৈর্মণ্ডয়ন্ত্যা।
করকিসলয়তালৈর্মুগ্ধয়া নর্ত্তমানং সুতমিব মনসা ত্বাং বৎসলেন স্মরামি॥"

'তুমি আমার প্রিয়ার করকিসলয়ের তালে তালে মণ্ডলাকারে নৃত্য করিতে; তোমার সেই নৃত্যের অনুসরণে প্রিয়ার নয়নকমল চক্রাকারে বিঘূর্ণিত হইত; আর তাহাতে বিলাসময় ভ্রূ-যুগল সঞ্চালিত হওয়ায় প্রিয়ার নয়নে অপূর্ব্ব শোভার বিকাশ পাইত। সেই দিনের কথা স্মরণ করিয়া আমি তোমায় স্নেহপূর্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছি।' অতঃপর শ্রীরামচন্দ্র যতই পাদচরণা করিতে লাগিলেন, পূর্ব্বপরিচিত, সীতার সহিত সম্বন্ধযুক্ত, কত সামগ্রীই দেখিতে পাইলেন! দেখিলেন,—সীতার রোপিত বৃক্ষ-সমূহ; দেখিলেন,—সীতার পালিত কুরঙ্গাদি ও পক্ষিসমূহ। অবশেষে শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে কদলী-বনমধ্যে শিলাতলে উপবেশন করিলেন। বাসন্তী তখন পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিলেন,—সেই শিলাতলে উপবেশন করিয়া, সীতাদেবী কেমন করিয়া হরিণ-শাবকগুলিকে আহার্য্য দিতেন—পালন করিতেন! বাসন্তী কহিলেন,—

"এতত্তদেব কদলীবনমধ্যবর্ত্তিকান্তাসখস্য শয়নীয়শিলাতলন্তে।
অত্র স্থিতা তৃণমদাদ্বহুশো যদেভ্যঃ সীতা, ততোহরিণকৈর্ন বিমুচ্যতে স্ম॥"

'এই স্থানে, এই কদলীকুঞ্জ মধ্যে, ঐ সেই মর্ম্মর-বেদী। ঐখানে বসিয়া, স্মরণ করিয়া

দেখুন, সীতাদেবীর সহিত কি আনন্দেই দিন কাটাইয়াছিলেন! ঐ মর্ম্মর-বেদীর উপর বসিয়াই সীতাদেবী স্বহস্তে হরিণীগণকে আহার প্রদান করিতেন; আর তাহারা নির্ভয়ে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া, তাঁহার হস্ত হইতে আহার্য্য গ্রহণ করিত।' এ চিত্র যখন অন্তরে প্রতিভাত হইল, শ্রীরামচন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। 'আর দেখিতে পারি না' বলিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। ইহার পর শ্রীরামচন্দ্র অভিভূত হইয়া কহিলেন,—

"করকমলবিতীর্ণৈরম্বুনীবারশষ্পৈস্তরুশকুনিকুরঙ্গান্ মৈথিলী যানপুষ্যৎ।
ভবতি মম বিকারস্তেষু দৃষ্টেষু কোঽপি দ্রবইব হৃদয়স্য প্রস্তরোদ্ভেদযোগ্যঃ॥"

সীতাদেবী যাঁহাদিগকে সস্নেহে পালন করিতেন, সেই বৃক্ষ, সেই পক্ষী, সেই হরিণগুলি দেখিয়া, তাঁহার প্রস্তরবৎ হৃদয়ও দ্রবীভূত হইল। এই বলিয়া শ্রীরামচন্দ্র আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বাসন্তী তথাপি বিরত হইলেন না। শ্রীরামচন্দ্র যতই ব্যাকুল হইতে লাগিলেন, বাসন্তীও ততই অতীত কথা অধিকতর মর্ম্মস্পর্শী করিয়া প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বাসন্তী কহিলেন,—'সীতা যদি আপনার জীবন স্বরূপিণীই ছিলেন, সীতা যদি আপনার হৃদয়ের অর্দ্ধাংশই ছিলেন, সীতা যদি আপনার নয়নের কৌমুদী-স্বরূপিণীই ছিলেন, সীতা যদি আপনার আত্মায় অমৃত-সঞ্চারণই করিতেন, তবে আপনি কোন্ প্রাণে কেমন্ করিয়া আপনার সেই প্রিয়তমা সীতাকে বনবাসে বিসর্জ্জন দিলেন!' আপনি না বলিতেন!—

"ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং, ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে।
ইত্যাদিভিঃ প্রিয়শতৈরনুরুদ্ধ্য মুগ্ধাং তামেব, শান্তমথবা কিমিহোত্তরেণ॥"

এই কথা বলিতে বলিতে আবেগে বাসন্তী মূর্চ্ছিতা হন। তখন শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া সীতাদেবীর সমাচার অবগত হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু বাসন্তী যে উত্তর দেন, শ্রীরামচন্দ্র তাহাতে সীতার সম্বন্ধে হতাশ্বাস হন। তাঁহার মনে হয়, তবে নিশ্চয়ই সেই কুরঙ্গনয়না স্নেহ-লাবণ্যময়ী সীতা হিংস্র শ্বাপদের গ্রাসেই প্রাণদান করিয়াছেন!

ত্রস্তৈকহায়নকুরঙ্গবিলোলদৃষ্টেস্তস্যাঃ পরিস্ফুরিতগর্ভভরালসায়াঃ।
জ্যোৎস্নাময়ীচ মৃদুবালমৃণালকল্পা ক্রব্যাদ্ভিরঙ্গলতিকা নিয়তং বিলুপ্তা॥"

এই সময়ে শ্রীরামচন্দ্রের মুখে আরও যে সকল কাতরোক্তি প্রকাশ পায়, তাহার সকল-গুলিই সীতাদেবীর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগের এবং অভিন্ন-হৃদয়ত্বের পরিচায়ক। যথা,—

"দলতি হৃদয়ং গাঢ়োদ্বেগোদ্বিধা নতু ভিদ্যতে
বহতি বিকলঃ কায়োমোহং ন মুঞ্চতি চেতনাম্।
জ্বলয়তি তনুমন্তর্দাহঃ করোতি ন ভস্মসাৎ
প্রহরতি বিধির্মর্ম্মচ্ছেদী ন কৃন্ততি জীবিতম॥"

"দেব্যা শূন্যস্য জগতোদ্বাদশঃ পরিবৎসরঃ।
প্রনষ্টমিব নামাপি ন চ রামোন জীবতি॥"

'দারুণ উৎকণ্ঠায় হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, কিন্তু দ্বিধাবিভক্ত হইতেছে না। দেহ মোহাচ্ছন্ন ও বিকল হইতেছে বটে; কিন্তু চৈতন্য একেবারে লোপ পাইতেছে না! অন্তর্দাহ উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু একেবারে ভস্মসাৎ হইতেছি না! বিধাতা মর্ম্মচ্ছেদী প্রহার করিতেছেন;

কিন্তু জীবন ছিন্ন করিতেছেন না! কি পরিতাপের বিষয়!...সীতা-শূন্য অবস্থায় দ্বাদশ বর্ষ অতিবাহিত করিলাম; সীতার নাম বিলুপ্ত হইতে চলিল; কিন্তু রামচন্দ্রের এখনও মৃত্যু হইল না!' বাসন্তী তথাপি আরও দুই একটী অতীত কথার অবতারণা করেন। তাহাতে শ্রীরামচন্দ্র শোকাভিভূত ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন এবং শ্রীরামচন্দ্রকে শুশ্রূষার জন্য সীতাদেবী অলক্ষ্যে তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করেন। কবির বর্ণনায় এই অংশ এই ভাবে প্রকটিত আছে,—

"বাস। অস্মিন্নেব লতাগৃহে ত্বমভবস্তন্মার্গদত্তেক্ষণঃ
সা হংসৈঃ স্থিরকৌতুকা চিরমভূদ্গোদাবরীরোধসি।
আযান্ত্যা পরিদুর্ম্মনায়িতমিব ত্বাং বীক্ষ্য বদ্ধস্তয়া
কাতর্য্যাদরবিন্দকুট্মলনিভোমুগ্ধঃ প্রণামাঞ্জলিঃ॥

সীতা। দারুণাসি সহি বাসন্দি! দারুণাসি, জা এদেহিং হিঅঅসম্মগূঢ় সল্লসরিসেহিং পুণো পুণো মং মন্দভাইণীং অজ্জউত্তং বি দুণাবেসি।

রামঃ। চণ্ডি জানকি! ইতস্ততোদৃশ্যসইবনচানুকম্পসে।
হাহা দেবী স্ফুটতি হৃদয়ং স্রংসতে দেহবন্ধঃ
শূন্যং মন্যে জগদবিরতজ্বালমন্তর্জ্জলামি।
সীদন্নন্ধে তমসি বিধুরোমজ্জতীবান্তরাত্মা,
বিষঙ্মোহঃ স্থগয়তি, কথং মন্দভাগ্যঃ করোমি॥ (ইতি মূর্চ্ছতি)

সীতা। হদ্দী হদ্দী পুণোবি পমূঢ়ো অজ্জউত্তো।
বাস। দেব সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি!

সীতা। হা অজ্জউত্ত! মং মন্দভাইণীং উদ্দিসিঅ সঅলজীঅলোঅমঙ্গলাধারস্স দে জম্মলাহস্স বারংবারং সংসইদ জীবিদদারুণো দসাপবিণামোত্তি হাহদহ্মি। (ইতি মূর্চ্ছতি)

রামঃ (মূর্চ্ছাভঙ্গে)। আলিম্পন্নমৃতময়ৈরিব প্রলেপৈরন্তর্বা বহিরপি বা শরীরধাতূন্।
সংস্পর্শঃ পুনরপি জীবয়ন্নকস্মাদানন্দাদপরবিধং তনোতি মোহম্॥"

স্পর্শসুখানুভূতিসূচক শ্রীরামচন্দ্রের এবম্বিধ উক্তিতে বাসন্তী শ্রীরামচন্দ্রকে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরামচন্দ্র বলেন,—'আমি জানকীকে পাইয়াছি, জানকী আমার সম্মুখেই রহিয়াছেন; তাই আমার আনন্দের অবধি নাই।' বাসন্তী তাহাতে উত্তর দেন,—'কেন আর সে মর্ম্মচ্ছেদকারী কথা কহিয়া আমার প্রিয়সখীবিরহদুঃখদগ্ধ হৃদয়কে বিদগ্ধ করিতেছেন? এ আপনার কি প্রলাপ বাক্য!' ইহাতে শ্রীরামচন্দ্র উত্তর দেন,—"সখি! আমি এ প্রলাপ বকিতেছি না। পরিণয়-বাসরের কঙ্কণ-শোভিত যে কর স্পর্শ করি, সে সুখস্পর্শ আমার চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। মৃণালসন্নিভ সর্ব্বসন্তাপনাশক সেই করস্পর্শ আমি এখন সত্যই অনুভব করিতেছি।' বাসন্তী-সম্বোধনে শ্রীরামচন্দ্রের সেই উক্তি,—

"গৃহীতো যঃ পূর্ব্বং পরিণয়বিধৌ কঙ্কণধর
শ্চিরং স্বেচ্ছাস্পর্শৈরমৃতশিশিরৈর্যঃ পরিচিতঃ।
সএবায়ং তস্যাস্তহিননিকরৌপম্যসুভগো
ময়া লব্ধঃ পাণির্লিতলবলীকন্দল নিভঃ।"

ইহার পর দেবী যখন অন্তর্হিত হন, তখন শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপের অবধি থাকে না;—ভাবান্তর উপস্থিত হয়। তিনি বলেন,—'তবে বুঝি বাসন্তীর কথাই সত্য। সীতা আর ইহজগতে নাই। আমি কল্পনায় বা স্বপ্নে সে মূর্ত্তি দর্শন করিলাম।' তখন বাসন্তী পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত স্মরণার্থ আরও দুই একটী পুরাতন কাহিনীর উল্লেখ করিলেন। এই অঙ্কে ছায়া-সীতার মিলনে যে প্রেমানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়, বাসন্তী কর্ত্তৃক প্রদর্শমান দৃশ্যাবলীর চিত্রে শ্রীরামচন্দ্রের সেই অনুরাগের পূর্ণ-বিকাশ দৃষ্ট হয়। বিলাপ করিতে করিতে শ্রীরামচন্দ্র ক্রমশঃ অতিমাত্র কাতর হইয়া পড়েন; তাঁহার মূর্চ্ছা আসে। তখন ছায়ারূপিণী সীতাদেবী তাঁহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হন। এই স্মরণ—এই মিলন বড়ই প্রাণস্পর্শী। এই মিলনের পর বিশেষ মাঙ্গলিক কার্য্যের জন্য সীতাদেবীকে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হইল। তিনি পুনঃপুনঃ পতিচরণে প্রণত হইয়া অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহার প্রতিগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে শ্রীরামচন্দ্র যখন বুঝিতে পারিলেন, সীতাকে আর পাওয়ার আশা দুরাশা মাত্র, তখন দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কহিলেন,—"অস্তি চেদানীমশ্বমেধায় সহধর্ম্মচারিণী মে। অর্থাৎ,— অশ্বমেধ-যজ্ঞ সমাপনের জন্য আমার সহধর্ম্মিণী আছেন।" সেই সময়ে দেবী আক্ষেপ করিয়া মনে [illegible],—"কে সে?" শ্রীরামচন্দ্র আপনা-আপনি উত্তর দেন,—"হিরণ্ময়ী সীতায়াঃ প্রকৃতি। সীতাদেবীর স্বর্ণ-প্রতিমা প্রস্তুত করাইয়াছি। অশ্বমেধ-যজ্ঞে সেই প্রতিমূর্ত্তিই আমার সহধর্ম্মিণীর স্থান অধিকার করিবে।" কি প্রেমে কি বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, ভবভূতি উত্তরচরিতে যেমন পরিস্ফুট-ভাবে অঙ্কন করিয়াছেন, তেমনটী অন্য আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। চতুর্থ অঙ্কে কবি সুকৌশলে বাল্মীকির তপোবনে কৌশল্যা, অরুন্ধতী ও জনক প্রভৃতির সহিত সীতাপুত্র লবের সাক্ষাৎকার ঘটাইয়াছেন। সেখানে সাক্ষাৎ পরিচয় না ঘটিলেও তাঁহারা লবের নিকট রামচরিতের যে বর্ণনা শুনিতে পান, তাহাতে তাঁহাদের হৃদয়ে স্নেহ-প্রস্রবণ আপনিই উৎসারিত হয়। পঞ্চম অঙ্কে অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব লইয়া লব-কুশের সহিত চন্দ্রকেতু-প্রমুখ শ্রীরামচন্দ্রের অনুচরগণের যুদ্ধ, বালকদ্বয়ের বীরত্ব দেখিয়া সকলে বিমুগ্ধ। ষষ্ঠ অঙ্কে, শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যস্থতায় শান্তি-স্থাপন। শ্রীরামচন্দ্র লব-কুশকে দেখিতেছেন, কিন্তু পুত্র বলিয়া পরিচয় পাইতেছেন না। প্রাণ স্নেহে আপ্লুত হইতেছে, কিন্তু স্নেহ প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। কেন তাঁহার হৃদয়ে সেই স্নেহভাব উদয় হইতেছে, তজ্জন্য তিনি বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছেন। এ সম্বন্ধে শ্রীরামচন্দ্রের উক্তি,—

"ব্যতিষজতি পদার্থানান্তরঃ কোঽপি হেতুর্নখলু বহিরুপাধীন্ প্রীতয়ঃ সংশ্রয়ন্তে।
বিকসতি হি মতঙ্গস্যোদয়ে পুণ্ডরীকং দ্রবতি চ হিমরশ্মাবুদ্গতে চন্দ্রকান্তঃ॥"

কোনও প্রাণের সম্বন্ধ না থাকিলে পরস্পর পরস্পরের প্রতি কখনও আকৃষ্ট হয় না। সূর্য্যোদয়ের পর পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়, হিমাংশুর উদয়ে কুমুদ দ্রবীভূত হয়। অর্থাৎ, অন্তরস্থ সম্বন্ধ ভিন্ন একের সংসর্গে অন্যের কখনও ভাবান্তর উপস্থিত হয় না। দর্শনে অভিনব ভাবান্তর উপস্থিত হয়; তার পর কথোপকথনে স্নেহালিঙ্গনের অভিলাষ জন্মে। প্রথমে লবকে দেখিয়া যে ভাবের উদয় হয়, অল্পক্ষণ পরেই কুশ আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলে, শ্রীরামচন্দ্রের প্রাণে সেই ভাব অধিকতর ঘনীভূত হইয়া আসে। কুশের মুখ দেখিয়া তাঁহার মনে হয়, যেন

সীতাদেবীর সমস্ত লক্ষণই তাহাতে প্রকটিত। তিনি সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া বলেন,—

"অয়ে ন কেবলমস্মদঙ্গসংবাদিন্যাকৃতিঃ।
অপি জনকসুতায়াস্তচ্চ তচ্চানুরূপং
স্ফুটমিহ শিশুযুগ্মে নৈপুণোন্নেয়মস্তি।
ননু পুনরিব তন্মে গোচরীভূতমক্ষ্ণো-
রভিনবশতপত্রশ্রীমদাস্যং প্রিয়ায়াঃ॥
মুক্তাচ্ছদন্তচ্ছবিদন্তবেয়ং মৈবৌষ্ঠমুদ্রা স চ কর্ণপাশঃ।
নেত্রে পুনর্যদ্যপি রক্তনীলে তথাপি সৌভাগ্যগুণঃ স এব॥"

সীতাদেবীর সকল সৌন্দর্য্য-সুষমা যেন এই লব-কুশে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র একে একে সে সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করিলেন। হৃদয়ের আবেগে একবার তাহাদিগকে ক্রোড়ে লইলেন। সে আলিঙ্গনে কি অনুপম আনন্দই হইল! পরিচয় হইল না; অথচ প্রাণ পরিচয় পাইল;—এমনই ভাবে কবি ষষ্ঠ অঙ্কের পরিসমাপ্তি করিলেন! এই স্থানেই মহর্ষি বাল্মীকি কৌশলে সীতার সহিত রামের মিলন সংঘটন করাইয়া দেন। লব-কুশ রামায়ণ গান করিয়া শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতির তৃপ্তি সাধন জন্য আদিষ্ট হন। সেই রামায়ণ-গানের সময় রাম-লক্ষ্মণ সকলেই উপস্থিত। তখন লব-কুশের মুখে রাম-চরিত্র কীর্ত্তন শুনিয়া, শ্রীরামচন্দ্রের সকল মোহ অপসারিত হয়। তিনি 'সীতা—সীতা' বলিয়া জানকীর জন্য ব্যাকুল হন। উপসংহারে বাল্মীকি শ্রীরামচন্দ্রের করে জানকীকে সমর্পণ করেন। এই মিলনেই নাটকের সপ্তম অঙ্কের পরিসমাপ্তি। মিলনের পর অন্যান্য নাটকে নায়ক সংসারের হিতকামনা করেন। কিন্তু ভবভূতির উপসংহার,—

"পাশভ্যশ্চ পুনাতি বর্দ্ধয়তি চ শ্রেয়াংসি যেয়ং কথা
মঙ্গল্যা চ মনোহরা চ জগতোমাতেব গঙ্গেব চ।
তামেতাং পরিভাবয়ন্ত্বভিনয়ৈর্বিন্যস্তরূপাবুধাঃ
শব্দব্রহ্মবিদঃ কবেঃ পরিণতপ্রজ্ঞস্য বাণীমিমাম্॥"

রামায়ণে রাম-সীতার মিলনের চিত্র যে ভাবে অঙ্কিত আছে, উত্তররামচরিতে ভবভূতি তাহাতে অভিনব কল্পনার সমাবেশ করিয়াছেন। রামায়ণ গানে সীতা-নির্ব্বাসন-প্রসঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের ভাবান্তর এবং তাহার ফলে মিলন,—এ ঘটনা ভবভূতির মৌলিক কল্পনা। বাল্মীকি সীতার পাতাল-প্রবেশে বিষাদের দৃশ্যে সীতার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাইয়াছেন। কিন্তু ভবভূতি মিলনের আনন্দোচ্ছ্বাসে নাটকের পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। ভবভূতির উত্তররামচরিতের দুই একটী কল্পনা সেক্সপিয়ারের নাটকের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। রাজপুত্র লব-কুশ যেমন বাল্মীকির আশ্রমে অজ্ঞাতসারে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, সেক্সপিয়ারের 'সিম্বেলিন' নাটকে গুইডেরিয়াস ও আরভিরেগস যুবরাজদ্বয় সেইরূপ সন্ন্যাসী বেলারিয়সের আশ্রমে প্রতিপালিত হন। এ দুই ঘটনায় বড়ই সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। লব-কুশের রামায়ণ-গান প্রসঙ্গে 'হ্যামলেটের' একটী দৃশ্যের বিষয় মনে আসে। হ্যামলেটের খুল্লতাত ক্লডিয়াস কতকটা এইভাবেই শিক্ষা পাইয়াছিলেন। উপমা-বর্ণনায়ও অনেক স্থলে মিল দেখা যায়। এ সকল সাদৃশ্যে যে একে অন্যের অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা মনে হয় না। পূর্ব্বে যে বলিয়াছি, একই চিন্তা—একই ভাব

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে পরিস্ফুট হইতে পারে, এ সকল তাহারই দৃষ্টান্ত মাত্র। যাহা হউক, ভবভূতির উত্তররামচরিত ভাষায়, ভাবে, কল্পনায়, চরিত্র-বিকাশে—সর্ব্ব বিষয়েই আদর্শ নাটক মধ্যে পরিগণিত। কবি যেন সকল বিষয়ের আদর্শ সৃষ্টি করিবার জন্যই এই নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন।

মুদ্রারাক্ষস—সংস্কৃত ভাষার প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নাটক। বিশাখদত্ত এই নাটকের প্রণেতা বলিয়া প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। নাটকে সূত্রধাব মুখে বিশাখদত্তেব সামান্য একটু পরিচয় পাওয়া যায়। তদনুসারে, বিশাখদত্ত—সামন্ত বটেশ্বর দত্তেব পৌত্র এবং মহারাজ পৃথুর পুত্র। এই পরিচয় পাইয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত কবেন যে, বিশাখদত্ত দিল্লীব শেষ হিন্দুবাজ পৃথ্বীরাজ চৌহানেব পুত্র। মুদ্রারাক্ষসের শেষ শ্লোকে বিদেশী রাজার বাজ্যাধিকাবেব যে চিত্র অঙ্কিত আছে, তাহাতে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক দিল্লী-বিজয়ের ছায়াপাত দৃষ্ট হয়। প্রধানতঃ এই কারণেই বিশাখদত্ত চৌহান পৃথ্বীরাজের পুত্র বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন। কিন্তু এ সিদ্ধান্তে একটা অন্তরায়ের কথা আছে। পৃথ্বীবাজেব পিতার নাম—সোমেশ্বব বলিয়া পরিচয় পাই। তাহাতে কেহ বলেন, চাঁদ কবির ভাষায় সামন্ত বটেশ্বর সোমেশ্বব নাম পরিগ্রহ করিয়া আছেন। তাহা হইতেই বটেশ্বর 'সোমেশ্বর' হইয়া পড়িয়াছেন; ফলে, বটেশ্বর ও সোমেশ্বর অভিন্ন ব্যক্তি। এই যুক্তি মানিয়া লইলে, বিশাখদত্ত চৌহান বংশীয় পৃথ্বীবাজেব পুত্র বলিয়াই প্রতিপন্ন হন। এ দিকে এই বিতণ্ডা, অন্যদিকে আবাব মুদ্রাবাক্ষসেব প্রণেতাব নাম লইয়াও মতান্তর! মেজর উইলফোর্ড প্রতিপন্ন কবিয়াছেন, মুদ্রাবাক্ষসের রচয়িতার নাম—অনন্ত; গোদাবরী তীবে তাঁহার বাস ছিল। যাহা হউক, আমবা কিন্তু রচয়িতাব নাম বিশাখদত্ত বলিয়াই প্রমাণ পাইতেছি। অনন্ত-নামধেয় কোনও কবি যে মুদ্রাবাক্ষসের বচয়িতা, তাহার কোনও নিদর্শন দেখিতে পাই না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—মুদ্রারাক্ষস একখানি ঐতিহাসিক নাটক। অন্যান্য নাটকের ন্যায় ইহা প্রেমিক-প্রেমিকার—প্রণয়ী-প্রণয়িনীব বিচ্ছেদ মিলনেব বিচিত্র-ব্যাপাবে পরিপূর্ণ নহে। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র এবং তাহার ফলাফল বর্ণনায় মুদ্রারাক্ষসের নাটকীয় সৌন্দর্য্য অধিকতর প্রস্ফুট। মগধে নন্দ-বংশের উচ্ছেদে মৌর্য্য-বংশের প্রতিষ্ঠা—এই নাটকের বর্ণনীয় বিষয়। কি সূত্রে কি ষড়যন্ত্রে এই রাষ্ট্র-বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল, সে ইতিহাস যেমন কৌতূহলপ্রদ, তেমনই লোমহর্ষক। পুরাণেতিহাসে প্রচার,—মগধে নন্দ-বংশ ১৩৮ বৎসর রাজত্ব কবিয়াছিলেন। মহানন্দ—ঐ বংশের প্রসিদ্ধ ও প্রতাপ-শালী নৃপতি। মহাবীর আলেকজান্দার (শিকন্দব) যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন; তখন অসংখ্য গজারোহী, বিংশ সহস্র অশ্বারোহী এবং দুই লক্ষ পদাতিক সৈন্য লইয়া মহানন্দ আলেকজান্দারকে বাধা-প্রদান জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। * ফলতঃ, সে সময়ে মহানন্দের ন্যায় প্রতাপশালী রাজা ভারতবর্ষে দ্বিতীয় কেহ ছিলেন না। মহানন্দের দুই মন্ত্রী,—প্রধান মন্ত্রীর নাম—শকটার; দ্বিতীয় মন্ত্রীর নাম—রাক্ষস। শকটার শূদ্র, আর রাক্ষস ব্রাহ্মণ ছিলেন।

মুদ্রারাক্ষস।

ইতিহাস।

---

* আলেকজান্দার কান্যকুব্জ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাহাব পূর্ব্বভাগে তিনি অগ্রসর হইতে পারেন নাই। সুতরাং মহানন্দের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহাব সাক্ষাৎকার ঘটে নাই।

উভয় মন্ত্রীই বুদ্ধিমান ও মহা-প্রতিভাসম্পন্ন বলিয়া প্রখ্যাত। তবে রাক্ষস ধীর গম্ভীর প্রকৃতির এবং শকটার অত্যন্ত উদ্ধত-স্বভাব। উভয়ের মধ্যে ইহাই পার্থক্য ছিল। মন্ত্রী শকটার সেই ঔদ্ধত্য বশে সময় সময় রাজা মহানন্দের উপরও প্রভুত্ব চালাইবার চেষ্টা পাইতেন। মহানন্দও উগ্রস্বভাব ও অসহিষ্ণু ছিলেন। সুতরাং শকটারের সহিত মহানন্দের প্রায়ই দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইত। ইহার ফলে রাজা ক্রোধান্ধ হইয়া এক নির্জ্জন বন্দিস্থানে সপরিবার শকটারকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। তাঁহাদের সকলের আহারের জন্য দুই সের মাত্র ছাতু দিবার বন্দোবস্ত হয়। বহুদিন প্রধান অমাত্যের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, অত্যধিক সম্মানলাভ করিয়া আসিয়া, শেষ জীবনে এইরূপ অবজ্ঞাত হওয়া শকটারের পক্ষে বড়ই কষ্টদায়ক হয়। তিনি ছাতুর পাত্র হস্তে লইয়া প্রতিদিনই পরিবারবর্গকে বলিতেন,—'যতদিন নন্দবংশের মূলোচ্ছেদ করিতে না পারিব, ততদিন ছাতু স্পর্শ করিব না।' শকটারের এবম্বিধ মর্ম্মভেদী কথা শুনিয়া তাঁহার পরিবারবর্গের কেহই সে ছাতু স্পর্শ করিতেন না। এইরূপে কারাগারে অনশনে থাকিয়া, বিষম পীড়ায় পীড়িত হইয়া, শকটারের পরিবারবর্গ একে একে সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। একে অপমান, তাহাতে আত্মীয় স্বজনের বিনাশ,—শকটারের মন ইহাতে বড়ই ব্যথিত হয়। কিন্তু শকটার এ শোকাবহ ব্যাপারেও আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হন। যতদিন না মহানন্দের বংশের মূলোচ্ছেদে সমর্থ হইবেন, ততদিন তিনি আপনার জীবন রক্ষা প্রয়োজন মনে করেন। অপিচ, কি উপায়ে কারাগৃহ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন, তাহারই সুযোগ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। কথিত আছে, এক দিন রাজা মহানন্দ হস্তমুখ প্রক্ষালনের পর উচ্চ হাস্য-সহকারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন। বিচক্ষণা নাম্নী তাঁহার এক দাসী ছিল। রাজার হাসি দেখিয়া ধৃষ্টতাবশে সে হাসিয়া ফেলে। মহানন্দ তাহাতে ক্রোধান্বিত হইয়া দাসীকে হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করেন। দাসী উত্তর দেয়, 'আপনি যে কারণে হাসিতেছিলেন, আমিও সেই কারণেই হাসিতেছি।' ইহাতে মহানন্দ অধিকতর ক্রুদ্ধ হন। তিনি ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে বলেন,—'তুই কি কারণে হাসিয়াছিস্, এখনই বল। নচেৎ, তোর প্রাণদণ্ড হইবে।' দাসী সহসা কোনও উত্তর খুঁজিয়া পাইল না, অথচ, একেবারে হতবুদ্ধিও হইল না। দাসী কহিল,—'মহারাজ, আমাকে এক মাসের সময় দেন, আমি এক মাস পরে উত্তর দিব।' রাজা কহিলেন,—'ভাল, তাই দিলাম। কিন্তু ঠিক জানিস, আজি হইতে এক মাসের দিন যদি উত্তর দিতে না পারিস, কেহ তোর প্রাণরক্ষায় সমর্থ হইবে না।' সে দিন বিচক্ষণার প্রাণ বাঁচিল বটে; কিন্তু মৃত্যু চিন্তায় সে দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল। সে এক দিন শকটারের নিকটে খাদ্য প্রদান করিতে গেল। খাদ্য প্রদান করিতে গিয়া সে কাঁদিতে কাঁদিতে আপনার দারুণ বিপদের কথা বিবৃত করিল। শকটার আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—'তোমার উত্তর মিলিয়াছে। রাজা কি জন্য হাসিতেছিলেন,—শুনিবে? মুখপ্রক্ষালনের সময় ক্ষুদ্র জলবিন্দু-সমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়। তদ্দর্শনে রাজা মনে মনে বলেন,—অতি ক্ষুদ্র বট বীজে এই জলবিন্দু পতিত হইলে, মহান্ মহীরুহের উৎপত্তি হইতে পারে; কিন্তু মৃত্তিকায় পড়িয়া এ বিন্দু বিশুষ্ক হইয়া গেল। এই মনে হওয়াতেই রাজা হাসিতেছিলেন।' উত্তর শুনিয়া বিচক্ষণা যুক্তকরে নিবেদন করিল,—'আপনার

এই উত্তর যদি সত্য হয়, আর আমার প্রাণ যদি তাহাতে রক্ষা পায়, আপনি নিশ্চয় জানিবেন, যে প্রকারেই হউক, আমি আপনার কারামুক্ত করিব এবং চিরদিন আপনার দাসী হইয়া থাকিব।' যথানির্দ্দিষ্ট দিনে রাজা বিচক্ষণার নিকট আপনার সেই প্রশ্নের উত্তর চাহিলেন। শকটার যাহা বলিয়া দিয়াছিলেন, বিচক্ষণা ধীরে ধীরে সেই কথা প্রকাশ করিল। রাজা তাহাতে বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি কহিলেন,—'সত্য করিয়া বল্, এ উত্তর কোথায় পাইলি!' দাসী সত্য-বৃত্তান্ত বিবৃত কবিল। রাজা শতমুখে শটকারের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দাসী অবসর পাইল। বিনীতভাবে শটকারের মুক্তি-প্রার্থনা জানাইল। দাসীর প্রার্থনা মতে রাজা শটকারকে মুক্তি দিলেন। সেই হইতে শটকার দ্বিতীয় মন্ত্রী মধ্যে গণ্য হইলেন। রাক্ষস—প্রধান মন্ত্রীর স্থান অধিকার করিলেন। এই ব্যাপারে রাজার বিষম বিভ্রম ঘটিল। কাহারও অত্যন্ত প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করা নীতিবিগর্হিত। যদি কেহ আপনা-আপনিই প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সতর্কতার সহিত তাহাকে পরিচালিত করিতে হইবে, অথবা অতি সাবধানে তাহার সহিত ব্যবহার করিতে হইবে। যদি কখনও প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিকে অনাদর করা হয়, এবং উহার মূলোচ্ছেদের চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে পুনরায় উহাকে আর বিশ্বাস করিতে নাই। আমত্যগণকে সামান্য সামান্য কারণে প্রতিষ্ঠান্বিত করিয়া দিয়া, পরিশেষে কারণ বিশেষে তাঁহাদের গর্ব্ব খর্ব্ব করায় নিয়তই অনর্থ ঘটিতেছে। অনেক রাজার ও রাজ্যের এই কারণেই উচ্ছেদ ঘটিয়াছে। নন্দ-বংশের সর্ব্বনাশের ইহাই প্রধান কারণ। শকটার মুক্তিলাভ করিলেন বটে; শকটার দ্বিতীয় মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হইলেন বটে; কিন্তু আপনার অপমানের বিষয় এবং পরিবারবর্গের বিনাশজনিত শোক তাঁহার অন্তরে চিরজাগরূক হইয়া রহিল। কি প্রকারে সেই অব্যবস্থিতচিত্ত উদ্ধত রাজার বিনাশ-সাধন করিয়া অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাইবেন, দিন-রাত্রি তিনি সেই চিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন। শকটার এক দিন অশ্বারোহণে বায়ুসেবনে বাহির হইয়াছেন। নগর-প্রান্তে দেখিলেন,—এক কৃষ্ণকায় ব্রাহ্মণ, আপন কুটীর-সম্মুখস্থ পথের কুশ উৎপাটন করিতেছেন এবং কুশগুলি উৎপাটন করিয়া তাহার মূলদেশে তক্র ঢালিতেছেন। শকটার একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আপনি কে? আপনি একমনে এ কি করিতেছেন?' ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন,—'আমার নাম বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্য; * আমি ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে নীতিশাস্ত্র, বৈদ্যক-শাস্ত্র, জ্যোতিষ-শাস্ত্র, রসায়ন-শাস্ত্র প্রভৃতি সংসারের সকল বিদ্যা অধিগত করিয়াছি। এক্ষণে বিবাহ করিয়া সংসারী হইবার ইচ্ছায় এই নগরে আসিয়াছি। কিন্তু এই কুশগুলি ধ্বংস না হইলে আমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে না। সুতরাং আমি ইহাদের মূলোচ্ছেদ না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না। কুশগুলি উৎপাটন করিয়া, তাহার মূলদেশে এই যে তক্র ঢালিতেছি, তাহার কারণ—ইহাতে উহাদের মূল ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।' কুশের মূলোচ্ছেদে চাণক্যের এবম্বিধ অনুষ্ঠানের কারণ সম্বন্ধে একটী কিংবদন্তী আছে। চাণক্যের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে

* চাণক্য আরও অনেক নামে প্রসিদ্ধ। বিষ্ণুগুপ্ত, দ্রোমিল বা দ্রোহীন, অংশুল, কৌটিল্য প্রভৃতি তাঁহার নাম পরিচয়।

পথ চলিবার সময়, তাঁহার পদে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হওয়ায়* রক্তপাত হয়। সেই জন্য বিবাহ স্থগিত থাকে। তদবধি কুশকুল নির্ম্মূল করার পক্ষে চাণক্যের দৃঢ় সংকল্প হয়। এই অবস্থায় চাণক্যকে দেখিয়া শকটারের মনে অভিনব আশার সঞ্চার হইল। ঐ ব্রাহ্মণ যদি কোনও রাজার প্রতি ক্রুদ্ধ হন, তাহা হইলে সে রাজার মূলোচ্ছেদ করিতে পারিবেন,—এই মনে করিয়া শকটার চাণক্যের সহিত মিলিত হন। তাঁহাকে বলেন,—'আপনি যেরূপ পণ্ডিত ব্যক্তি, আপনি যদি এই নগরে পাঠশালা স্থাপন করেন, ছাত্রগণের উপকার হয়, আপনারও প্রতিষ্ঠা বাড়ে।' চাণক্য সম্মত হন। রাজধানীতে চাণক্যের পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। বহু বিদ্যার্থী সেই পাঠশালায় স্থান পায়। বহু প্রতিষ্ঠার সহিত পাঠশালার কার্য্য চলিতে থাকে। এই সময়, কি প্রকারে রাজার প্রতি চাণক্যের বিরাগ উপস্থিত হয়,—শকটার তাহারই অবসর অনুসন্ধান করিতে থাকেন। রাজবাড়ীতে একটী শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সেই অবসর ঘটিল। শকটারের কৌশলে চাণক্য সেই শ্রাদ্ধে আমন্ত্রিত হইলেন। শকটারই চাণক্যকে রাজবাড়ীতে আনিয়া একখানি আসনে বসাইয়া রাখিয়া গেলেন। শকটার বুঝিয়াছিলেন,—চাণক্যের কৃষ্ণবর্ণ, রক্তচক্ষু এবং কৃষ্ণদন্ত প্রভৃতি দেখিয়া রাজা মহানন্দ তাঁহাকে আসন হইতে উঠাইয়া দিবেন, আর তাহা হইলেই মহানন্দের সর্ব্বনাশের বিষ-বীজ বপন করা হইবে। ঘটনাও তাহাই দাঁড়াইল। মন্ত্রী রাক্ষসের সমভিব্যাহারে রাজা মহানন্দ যখন সেই শ্রাদ্ধশালায় উপনীত হইলেন, হঠাৎ চাণক্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি চাণক্যকে পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই এবং চাণক্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন বলিয়াও জানিতেন না। একজন অনিমন্ত্রিত ব্যক্তি শ্রাদ্ধ-ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের আসনে উপবিষ্ট আছেন দেখিয়া, রাজা বড়ই ক্রুদ্ধ হইলেন। রাজা আদেশ দিলেন,—'কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক উহাকে সভাস্থল হইতে বিতাড়িত করা হউক।' রাজাদেশে প্রহরীরা চাণক্যকে অপমান করিয়া বিদায় করিয়া দিল। অপমানিত হইয়া চাণক্য প্রতিজ্ঞা করিলেন,—ঐ দুষ্ট রাজার সর্ব্বনাশ না করিয়া, তিনি আর শিখা বন্ধন করিবেন না। এইরূপ প্রতিজ্ঞার পর চাণক্য রাজভবন হইতে চলিয়া যান। ইহার পর শকটার আসিয়া চাণক্যের সহিত সাক্ষাৎ করেন, রাজার নিন্দাবাদে এবং তাঁহার প্রতি রাজার ব্যবহারের বিষয় উল্লেখে, তিনি চাণক্যের রোষানলে ইন্ধন নিক্ষেপ করিলেন। অবশেষে উভয়ে একযোগে রাজার সর্ব্বনাশ-সাধনে সঙ্কল্পবদ্ধ হইলেন। বিচক্ষণা তাঁহাদের সহিত যোগদান করিল। বিচক্ষণাকে উৎসাহিত করিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়া, তাহার দ্বারা সঙ্কল্প সাধনের পথ প্রশস্ত করা হইল। মহানন্দের নয়টী পুত্র ছিল। তাঁহার বিবাহিতা রাণীর গর্ভে আট পুত্রের জন্ম হয়। মুরা নাম্নী দাসীর গর্ভে তাঁহার প্রথম বা জ্যেষ্ঠপুত্র চন্দ্রগুপ্তের * জন্ম হইয়াছিল। মুরার পুত্র বলিয়াই তিনি 'মৌর্য্য' ও 'বৃষল' (বা শূদ্র) সংজ্ঞা লাভ করেন। চন্দ্রগুপ্ত অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন। সুতরাং অন্যান্য রাণীরা তাঁহার প্রতি হিংসাপরায়ণ হন। এই কারণে রাজা মহানন্দও চন্দ্রগুপ্তের প্রতি বিরক্ত ছিলেন। শকটার ও চাণক্য এক্ষণে চন্দ্রগুপ্তের

* চন্দ্রগুপ্ত বহু নামে প্রসিদ্ধ। গ্রীকদিগের উচ্চারণে সান্ড্রোকোটস (Sandrocottus) বলিয়া তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়। অপিচ, তিনি প্রিয়দর্শী প্রিয়দর্শন, চন্দ্র, চন্দ্রগুপ্ত, শ্রীচন্দ্র, চন্দ্রশ্রী, মৌর্য প্রভৃতি নামেও অভিহিত হইতেন।

সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহারা চন্দ্রগুপ্তকে বুঝাইলেন,—তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র, সুতরাং তিনিই রাজ্যাধিকারী। ষড়যন্ত্র হইল—রাজা মহানন্দকে হত্যা করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হইবে। এই পরামর্শের পর চাণক্য নগর পরিত্যাগ করিয়া আপনার পূর্ব্বতন কুটিরে প্রস্থান করিলেন। সেই কুটিরে বসিয়া এক প্রকার খাদ্য-দ্রব্য প্রস্তুত করা হইল। সে খাদ্য বিষম বিষ-মিশ্রিত ; অথচ, পরীক্ষা দ্বারা সে বিষ ধরিবার উপায় ছিল না। বিচক্ষণার দ্বারা সেই খাদ্য-দ্রব্য মহানন্দকে এবং তাঁহার পুত্রগণকে খাইতে দেওয়া হয়। ফলে রাজা ও তাঁহার অন্যান্য পুত্রগণ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। * চন্দ্রগুপ্ত এই সময় চাণক্যের আশ্রয়ে অবস্থিতি করেন। শকটার মনোদুঃখে এবং পাপজনিত মনস্তাপে নিবিড় অরণ্যে গমন করিয়া অনশনে প্রাণ বিসর্জ্জন দেন। রাজা মহানন্দের ও তাঁহার পুত্রগণের বিনাশ-সাধন হইলেও চন্দ্রগুপ্ত সহসা সিংহাসনে অধিরোহণ করিতে সমর্থ হন না। তখন জীবসিদ্ধি নামক তাঁহাদের একজন অন্তরঙ্গ মিত্র ক্ষপণকের (বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীর) বেশ ধারণ করিয়া মন্ত্রী রাক্ষসের নিকট অবস্থিতি করেন। জীবসিদ্ধির দ্বারা গুপ্ত সন্ধান লইবার ব্যবস্থা হয়। এ দিকে চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্য ভারতের প্রান্তস্থিত পার্ব্বতীয় ম্লেচ্ছ রাজন্যবর্গের সহায়তা গ্রহণের চেষ্টা পান। আফগনিস্থানে অথবা তাহার উত্তর সীমান্তে পর্ব্বতক নামক এ লোভপরতন্ত্র ম্লেচ্ছ রাজার বসতি ছিল। সেই রাজা চন্দ্রগুপ্ত-চাণক্যের সহিত যোগদান করেন। সর্ত্ত হয়, মগধ-রাজ্য অধিকৃত হইলে, অর্দ্ধাংশ পর্ব্বতক প্রাপ্ত হইবেন। পর্ব্বতকের পুত্রের নাম—মলয়কেতু ও ভ্রাতার নাম বৈরোধক। পর্ব্বতকের পক্ষাবলম্বনে আরও পাঁচ জন ম্লেচ্ছ রাজা চাণক্য-চন্দ্রগুপ্তের সহিত যোগদান করেন। এদিকে মহানন্দের ও তাঁহার পুত্রগণের মৃত্যুর পর রাজ-ভ্রাতা সর্ব্বার্থসিদ্ধিকে সিংহাসনে বসাইয়া মন্ত্রী রাক্ষস রাজকার্য্য পরিচালনায় প্রবৃত্ত হন। ইতিমধ্যে চাণক্যের ষড়যন্ত্রে পর্ব্বতকের সৈন্যদল আসিয়া মগধের রাজধানী কুসুমপুর নগর আক্রমণ করে। পঞ্চদশ দিবস ঘোরতর যুদ্ধ চলে। তাহাতে রাক্ষসের সৈন্যদল ও নাগরিকগণ হতাশ হইয়া পড়ে। এই সময়ে জীবসিদ্ধির চক্রান্তে রাজা সর্ব্বার্থসিদ্ধি বৈরাগ্য-অবলম্বনে অরণ্যে প্রয়াণ করেন। রাজার বনগমনে রাক্ষসও উদাস হন। নগরে চন্দনদাস নামক একজন ধনী জহুরীর এবং শকটদাস নামক একজন রাজনীতিজ্ঞ কায়স্থের বাস ছিল। তাঁহারা বড়ই বিশ্বাসপাত্র। চন্দনদাসের গৃহে আপনার আত্মীয়-স্বজনকে রক্ষা করিয়া এবং শকটদাসের হস্তে আবশ্যকমত রাজকার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া, রাক্ষস নূতন রাজার অনুসন্ধানে অরণ্যে বহির্গত হন। সর্ব্বার্থসিদ্ধিকে ফিরাইয়া আনিবেন,—ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প হয়। জীবসিদ্ধির নিকট এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, চাণক্য চক্রান্ত করিয়া বনমধ্যে সর্ব্বার্থসিদ্ধির সংহার সাধন করেন। সর্ব্বার্থসিদ্ধির হত্যার বিষয় জানিতে পারিয়া রাক্ষস শোকে অধিকতর মুহ্যমান হন। তিনি তখন আর অরণ্য হইতে গৃহ-প্রত্যাগমন করেন না। এই সময় চাণক্যের মনে আর এক নূতন চিন্তার উদয় হয়। নন্দ-বংশের উচ্ছেদ-সাধন করিতে হইলে, রাক্ষসের সহায়তা আবশ্যক

* মতান্তরে লিখিত আছে,—চাণক্য স্বহস্তে মহানন্দকে ও তাঁহার পুত্রগণকে নিহত করেন ; অথবা, মারণ অভিচার দ্বারা তাঁহাদিগের সংহার-সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু দাসীর সহায়তায় বিষ-প্রয়োগে রাজাকে ও রাজপুত্রগণকে নিহত করার সংবাদই প্রধানতঃ প্রচার আছে।

বলিয়া চাণক্য বুঝিতে পারেন। প্রথমে তিনি রাক্ষসকে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিত্ব-গ্রহণে অনুরোধ করিয়া পাঠান। কিন্তু প্রভুভক্ত রাক্ষস সে প্রস্তাবে সম্মত হন না। ক্রমে কিছু দিন গত হইলে, রাক্ষসের ঔদাসীন্য দূর হইল; তিনি পর্ব্বতকের নিকট চাণক্যের শত্রুতার বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। মগধ-রাজ্য অধিকৃত হইলে চাণক্য যে পর্ব্বতককে অর্দ্ধেক রাজ্য প্রদান করিবেন না, তাহা বুঝাইয়া দিলেন। তখন, আপন বৃদ্ধ মন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে পর্ব্বতক গোপনে গোপনে রাক্ষসের সহিত মিলিত হইলেন। মুখে চাণক্যের সহিত সদ্ভাব থাকিলেও অন্তরে পর্ব্বতক রাক্ষসের পক্ষাবলম্বন করিলেন। মগধ-রাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্র অধিকৃত হইলে চাণক্য পর্ব্বতককে রাজ্যাংশ প্রদানে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। ইহাতে পর্ব্বতকের মন অধিকতর সন্দেহযুক্ত হইতে লাগিল। পর্ব্বতকের সহিত রাক্ষসের মিলনের বিষয় গুপ্তচর জীবসিদ্ধির সহায়তায় চাণক্যের গোচরীভূত হইল। চাণক্য অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করিলেন। তখন কেবলমাত্র পর্ব্বতকের সহায়তায় রাজ্যোদ্ধারের আশা পরিত্যাগ করিয়া রাক্ষস বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রাজার সহায়তা প্রার্থী হইলেন। কুলুৎ, * মলয়, কাশ্মীর, সিন্ধু ও পারস্য—এই পাঁচ দেশের রাজা রাক্ষসের সহায় হইলেন। ইহার পর তপোবন-সন্নিধানে শিবির সন্নিবেশ করিয়া চন্দ্রগুপ্তের নিকট পর্ব্বতক এক 'বিষকন্যা' † পাঠাইয়া দিলেন। জীবসিদ্ধিকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহারই সহিত সেই কন্যাকে পাঠান হয়। পর্ব্বতক যেন চন্দ্রগুপ্তের সহিত মিত্রতা রক্ষার জন্য সুন্দরীকে প্রদান করিতেছেন;—'বিষকন্যা' প্রেরণের এইরূপ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করা হইল। কিন্তু জীবসিদ্ধির দ্বারাই চাণক্য ঐ কন্যা-প্রেরণের গূঢ় তাৎপর্য্য অবগত হইলেন। উপহার-প্রাপ্তির পর, পর্ব্বতকের নিকট চাণক্য প্রত্যুপহার প্রেরণ করিলেন। সেই সঙ্গে অনেক মূল্যবান সামগ্রী প্রেরিত হইল। অপিচ, পর্ব্বতক যেমন এক সুন্দরীকে উপহার-স্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন, চাণক্যও সেইরূপ এক উপহার পাঠাইলেন। সন্ধ্যার সময় সেই উপহার-প্রেরণের বন্দোবস্ত হইল। উপহারে পর্ব্বতক যে সুন্দরীকে পাঠাইয়াছিলেন, সেই সুন্দরীকেই অভিনব বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া পর্ব্বতকের জন্য প্রেরণ করা হইল। পর্ব্বতক তাহা বুঝিতে পারিলেন না; মোহবশে তিনি সেই সুন্দরীর সংসর্গে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাহাতে তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। ঐ সংবাদ চাণক্যই রূপান্তরে মলয়কেতুকে জ্ঞাপন করাইলেন। চাণক্যেরই বিশ্বস্ত অনুচর ভাগুরায়ণ মলয়কেতু-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বৃত্তান্ত অন্য ভাবে প্রকাশ করিল। শয়নাগারে পিতার মৃতদেহ-দর্শনে ক্ষুব্ধ ও ত্রস্ত হইয়া ভাগুরায়ণের পরামর্শ ক্রমে মলয়কেতু সেই রাত্রেই রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। পর্ব্বতকের মৃত্যু-

---

* কুলুৎ-দেশ—কুলুদেশ বা কিলাৎ বলিয়া অভিহিত হয়। বর্ত্তমান 'খেলাত' উচ্চারণে ঐ রূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকিবে।

† দুই প্রকার বিষকন্যার বিষয় উল্লেখ আছে। বিশেষ কোনও লগ্নে বিশেষ কোনও গ্রহের সংযোগ-কালে কন্যার জন্ম হইলে, সেই কন্যা বিষকন্যা বলিয়া গণ্য হয়। এই কন্যার যাহার সহিত বিবাহ হইবে বা যে পুরুষ সংসর্গ করিবে, তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। দ্বিতীয় প্রকার বিষকন্যা বৈদ্যক রীতি অনুসারে সংগঠিত হয়। গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীকে পানের সহিত অথবা জাত-কন্যাকে বালিকা বয়স হইতে দুগ্ধের সহিত বিশেষ কোনও বিষ পান করাইলে, কন্যা বিষময়ী হয়। সেই কন্যার সসংর্গও প্রাণঘাতক।

সংবাদে রাক্ষস বড়ই ক্ষুণ্ণ হইলেন। এদিকে চাণক্য কর্ত্তৃক পর্ব্বতকের মৃত্যু-সংবাদ রূপান্তরে প্রচারিত হইল। তাহাতে চন্দ্রগুপ্তের সহিত পর্ব্বতকের মিত্রতা ছিল বলিয়া, রাক্ষস বিষকন্যা প্রেরণে তাঁহার সংহার-সাধন করিয়াছেন,—এই সংবাদ প্রচারিত হইয়া পড়িল। ইহার পর চাণক্যের এবং রাক্ষসের রাজনীতির মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। সেই সংঘর্ষই এই নাটকের প্রাণভূত। এই শ্রেণীর রাজনৈতিক নাটক আর দ্বিতীয় নাই। রাজনীতির কিরূপ পরিচালনায় জয়-পরাজয় সংঘটিত হয়, ইহাই এই নাটকের নিগূঢ় শিক্ষা। 'মুদ্রারাক্ষস' নাটক সাত অঙ্কে সম্পূর্ণ। প্রথম অঙ্কে, সূত্রধারের উক্তিতে ও নেপথ্যে তাঁহার উত্তরে, কেতু ও চন্দ্রমণ্ডলের উপমায়, আভাষে নাটকের মূল তথ্য বিবৃত করা হইয়াছে। সূত্রধার কহিতেছেন,—"ক্রুরগ্রহঃ সকেতুশ্চন্দ্রং সম্পূর্ণমণ্ডলমিদানীম্। অভিভবিতুমিচ্ছতি বলাৎ—"ক্রুর গ্রহ-সমূহ কেতুর সহিত মিলিত হইয়া বলপূর্ব্বক চন্দ্রমণ্ডলকে অভিভব করিবার ইচ্ছা করিয়াছে। সূত্রধার এই পর্য্যন্ত, বলিতে বলিতে নেপথ্যে উত্তর হইল,—"আঃ, ক এষ ময়ি স্থিতে চন্দ্রগুপ্তমভিভবিতুমিচ্ছতি বলাৎ?" অর্থাৎ,—"আমি বিদ্যমান থাকিতে বলপূর্ব্বক চন্দ্রগুপ্তকে কে অভিভব করিতে ইচ্ছা করিয়াছে?" সূত্রধার উত্তর দিলেন,—"রক্ষত্যেনন্তু বুধযোগঃ। অর্থাৎ,—বুধযোগ কর্ত্তৃক তিনি রক্ষিত হউন।" সূত্রধারের দুই বারের উক্তিতে পূর্ণ একটী শ্লোক পাওয়া গেল। যথা,—

"ক্রুরগ্রহঃ সকেতুশ্চন্দ্রং সম্পূর্ণমণ্ডলমিদানীম।
অভিভবিতুমিচ্ছতি বলাৎ রক্ষত্যেনন্তু বুধযোগঃ॥"

এই শ্লোকটীর দুই প্রকার অর্থ সিদ্ধ হয়। সাধারণতঃ দেখিতে গেলে, এই শ্লোকে যেন চন্দ্রগ্রহণের বিষয় বলা হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। বুঝা যায়,—চন্দ্রমণ্ডলকে অভিভূত করিবার জন্য কেতুর সহিত ক্রুর গ্রহ-সমূহের মিলন ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু বুধযোগ ঘটায় গ্রহণ হইবে না। এখানে, কি কারণে চন্দ্রগ্রহণ হয়, তাহা বুঝা প্রয়োজন; আর চন্দ্রগ্রহণ পক্ষে অন্তরায়ই বা কি আছে, তাহাও বুঝা আবশ্যক। পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রমণ্ডলে পতিত হইলেই চন্দ্রগ্রহণ হয়। সাদাসিদা এই কারণে গ্রহণ সংঘটিত হইলে, প্রতি পূর্ণিমাতেই গ্রহণ হইতে পারিত। কারণ, ঐ সময়ে সূর্য্য ও কেতু এক সঙ্গে মিলিত হন। কিন্তু ইহার মধ্যে একটু অবস্থান্তর আছে। সূর্য্য ও কেতুর যোগের সহিত যদি কয়েকটী বিশেষ বিশেষ রাশির সংযোগ ঘটে, তাহা হইলেই গ্রহণ হয়; নচেৎ গ্রহণ হয় না। বুধযোগ ঘটিলে ঐ আবশ্যক রাশির মিলনে বিঘ্ন ঘটে। এই উপমায়, গ্রহণের সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু বুধযোগ হেতু গ্রহণ হইবে না;—কবি তাই এই কথা বলিয়া গেলেন। শ্লোকের ইহাই স্থূল অর্থ। কিন্তু মূল তাৎপর্য্য অন্যরূপ। বুধযোগ অর্থে—পণ্ডিতের সহিত মিলন। রাজা চন্দ্রগুপ্ত, কেতু গ্রহের অর্থাৎ মন্ত্রী রাক্ষসের সহিত গ্রহান্তরের অর্থাৎ পর্ব্বতকাদি বৈদেশিক রাজন্যবর্গের সংযোগে অভিভব বা বিপন্ন হইতেন বটে; কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর চাণক্যের সহায়তায় তাঁহার সে বিপদ ঘটিল না;—তিনি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়ই প্রভান্বিত রহিলেন। সূত্রধারের উক্তিতে এই যে আভাষ পাওয়া গেল, নাটকে এই ব্যাপারই বিবৃত হইয়াছে। এক দিকে চন্দ্রগুপ্তের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র-জাল-বিস্তার, অন্য দিকে চাণক্যের বুদ্ধিরূপ অস্ত্রে সে জাল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। চাণক্য যে প্রতিজ্ঞা করিয়া রাজভবন হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, নাটকের শেষে তাঁহার

সেই প্রতিজ্ঞার পূরণ—শিখা বন্ধন হয়। সাম, দান, ভেদ প্রভৃতি নীতির অনুসরণে যেরূপে নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, এই গ্রন্থে তাহারই চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-প্রতিষ্ঠায় চাণক্যের নীতি কোন্ পথে কি ভাবে কার্য্যকরী হইয়াছিল, এই নাটকে তাহার উজ্জ্বল আলেখ্য দেখিতে পাই। তৃতীয় অঙ্কে চাণক্যের ও চন্দ্রগুপ্তের কথোপকথনে, যেখানে যে উদ্দেশ্যে চাণক্য যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা বিবৃত আছে। কূটনীতিজ্ঞ রাজমন্ত্রীর কার্য্যপরম্পরা সেখানে অতি সুন্দররূপে বুঝান হইয়াছে। এক হিসাবে এ নাটক নায়িকা-শূন্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নায়ক-নায়িকার প্রণয়, বিচ্ছেদ ও মিলন,—এই সাধারণ নিয়মানুসারে বিচার করিতে গেলে, মুদ্রারাক্ষস এক নূতন সামগ্রী হইয়া পড়ে। এ নাটকে মিলন অপরূপ; চাণক্যের কৌশলে রাক্ষস পরাজয় স্বীকার করিলেন, সন্ধি হইল, মিলন হইয়া গেল। মিলনের পর উভয় পক্ষের হয়, হস্তী, বন্দী প্রভৃতিকে বন্ধন মুক্ত করা হয়। চাণক্য বলেন,--অমাত্য রাক্ষসের সহিত এই মিলনের ফলে গজ, তুরঙ্গ, সৈন্য প্রভৃতি সকলেরই বন্ধন মুক্ত হউক; কেবল আমার শিখা, এতদিন যাহা স্খলিত ছিল, আজ হইতে বাঁধা হউক। রাক্ষসের সহিত মিলনেই প্রকারান্তরে এ নাটকের নাটকোচিত বিচ্ছেদের পর মিলনের নিয়ম রক্ষিত হইয়াছে।

ভট্টনারায়ণ ও বেণীসংহার।

'বেণীসংহার' নাটক—ভট্টনারায়ণ প্রণীত। ভট্টনারায়ণ নামে বহু প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন হয়। তাঁহাদের মধ্যে বঙ্গের সাণ্ডিল্য-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ-বংশের আদিভূত ভট্টনারায়ণই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন। গৌড়াধিপতি অদিশূর যজ্ঞ-কার্য্যের জন্য কনৌজ হইতে পাঁচ জন সাগ্নিক ব্রাহ্মণকে বঙ্গদেশে আনয়ন করেন। এই ভট্টনারায়ণ তাঁহাদেরই অন্যতম। ভট্টনারায়ণ, সাণ্ডিল্য-গোত্রীয় বরেন্দ্র-ব্রাহ্মণগণের ও রাঢীয়-ব্রাহ্মণগণের—উভয়েরই আদি-পুরুষ। এই ভট্টনারায়ণ হইতে বরেন্দ্র ও রাঢীয় ব্রাহ্মণগণের বঙ্গদেশে বিস্তৃতি। ইঁহার পিতার নাম—ক্ষিতীশ। দ্বিতীয় ভট্টনারায়ণ—উত্তররামচরিতের 'আপেক্ষিতব্যাখ্যানম্' নামক টীকা রচনা করেন। তাঁহার পিতার নাম—রঘুনাথ দীক্ষিত। তৃতীয় ভট্টনারায়ণ 'প্রয়োগরত্ন' গ্রন্থ প্রণেতা। ইঁহার পিতার নাম—ভট্ট রামেশ্বর সূরি। ইনি বারাণসী-ধামে অবস্থান-কালে ঐ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ আছে। চতুর্থ ভট্টনারায়ণ—'স্তবচিন্তামণিবিবৃতি' নামক গ্রন্থ প্রণয়নে যশস্বী হন। ইনি কাশ্মীর-দেশের অধিবাসী ছিলেন। রাজার নিকট ইনি 'মহা-মহেশ্বর' উপাধি প্রাপ্ত হন। ভট্টনারায়ণ নামে অভিহিত এই সকল পাণ্ডিতের মধ্যে প্রথমোক্ত ভট্টনারায়ণ (অর্থাৎ বঙ্গের সাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের আদিভূত ভট্টনারায়ণ) বেণীসংহার নাটকের প্রণেতা বলিয়া প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন। এই ভট্টনারায়ণের বিদ্যমানকাল সম্বন্ধেও নানা মতান্তর আছে। এক হিসাবে ৪২৯ সালে (১০২২ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার বিদ্যমানতার বিষয় অবগত হওয়া যায়। অপর হিসাবে, কেহ কেহ তাঁহাকে দশম শতাব্দীর কবি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আবার একখানি তাম্রফলকের আবিষ্কারে অধুনা প্রতিপন্ন হইতেছে, তিনি ৮৪০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। কারণ, ঐ সময়ে তাঁহাকে যে দানপত্র প্রদত্ত হয়, পূর্ব্বোক্ত তাম্রফলক তাহারই নিদর্শন। বেণীসংহার নাটকের বর্ণনীয় বিষয়—কুরু-পাণ্ডবের মহা-সমরের শেষাঙ্ক। দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণে দুঃশাসন তাঁহাকে দুর্যোধনের রাজ সভায়

লইয়া গিয়াছিলেন। তদবধি, দ্রৌপদী আলুলায়িত কুন্তলা ছিলেন,—বেণী বন্ধন করেন নাই, প্রতিজ্ঞা ছিল,—দুর্য্যোধনের রক্তে বেণী বন্ধন না হইলে দ্রৌপদী আর বেণী-বন্ধন করিবেন না।* বেণীসংহার—বেণীবন্ধন-মূলক। বেণী বন্ধন ব্যপদেশেই কুরুবংশের ধ্বংস-সাধন হয়; দুর্য্যোধনের রক্তে সে বেণীবন্ধন হইয়াছিল। বেণী সংবরণ হইয়াছিল বলিয়াই নাটকের নাম—বেণীসংহার। বেণীসংহার নাটক—ছয় অঙ্কে বিভক্ত। অন্যান্য নাটকে কবির যেরূপ আত্ম পরিচয় থাকে, বেণীসংহারেও সেই আত্ম-পরিচয় আছে বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে কবির প্রকৃত পরিচয় পাইবার কোনই উপাদান নাই। কেবল সূত্রধার এইমাত্র বলিয়াছেন যে,—মহাভারতের অমৃতনিঃস্যন্দিনী রচনার অনুসরণে এই নাটক রচিত হইল, ইহার রচয়িতা কবি ভট্টনারায়ণ; তিনি সিংহ-লক্ষণান্বিত। রচয়িতার নামটী এবং 'সিংহ-লক্ষণান্বিত' বিশেষণটী ব্যতীত গ্রন্থে তাঁহার আর কোনও পরিচয় নাই। রচয়িতার আত্ম-গর্ব্ব অল্প, তিনি বলিয়াছেন,—এই গ্রন্থের গুণ অল্প। তবে মধুকরগণ যেমন বিন্দু বিন্দু মধু সংগ্রহ করে, গুণিগণ সেইভাবে বিন্দু বিন্দু মধু ইহা হইতে গ্রহণ করিবেন। প্রস্তাবনার পরই সহদেবের সহিত কথোপকথনে ভীমের রোষ প্রকাশ। ভীম কোনক্রমেই সন্ধিতে প্রস্তুত নহেন। প্রতিশোধ গ্রহণই—তাঁহার যেন মূল মন্ত্র। যুধিষ্ঠিরের ইচ্ছা—সন্ধি হয়। সহদেব সেই ইচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছেন, কিন্তু ভীমের ক্রোধানল নিবৃত্ত হইতেছে না। ইহার পর দ্রৌপদীর সহিত সাক্ষাৎ। সে সাক্ষাৎ—অনলে ঘৃতাহুতি-প্রক্ষেপ। দ্রৌপদীর ছলছল নেত্রদর্শনে, ভীম সহদেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,—'পঞ্চগ্রাম-লাভে কখনই সন্ধি হইবে না। শত শত কৌরবের সংহার সাধন করিব, দুঃশাসনের হৃদয়-শোণিত পান করিব, দুর্য্যোধনের ঊরুস্থল গদাঘাতে বিচূর্ণ করিব,—মহারাজ সন্ধি করুন, আর নাই করুন।' ভীমের ঐ প্রতিহিংসা-ব্যঞ্জক বাক্য পুনঃপুনঃ শ্রবণের জন্য দ্রৌপদীর মন আগ্রহান্বিত হইতে লাগিল। তিনি সহর্ষে জনান্তিকে কহিলেন,—'নাথ! বলুন—বলুন,—ঐ কথা আবার বলুন।' ভীম পুনঃ-পুনঃ সেই কথাই বলিতে লাগিলেন। এই সময় সহদেব পুনরায় যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতে চেষ্টা পাইলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহাকে যাহা বলিতে পাঠাইয়াছিলেন, সহদেব তাহা প্রকাশ করিলেন। যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন,—'ইন্দ্রপ্রস্থ, বৃকপ্রস্থ, জয়ন্ত, বারণাবত—এই চারি গ্রাম এবং পঞ্চমেতে আর কোনও গ্রাম আমাদিগকে প্রদান করা হউক।' এখন যুধিষ্ঠিরের সেই উক্তির উঁহারা অপর অর্থ গ্রহণ করিলেন। উঁহারা বুঝিলেন,—ইন্দ্রপ্রস্থের নামে যুধিষ্ঠির নির্ব্বাসনের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। বৃকপ্রস্থে ভীমসেনের বিষপানের বিষয়, জয়ন্ত নামের উল্লেখে দ্যূত-ক্রীড়ায় পরাজয়ের কথা এবং বারণাবত নামে জতুগৃহ-দাহের স্মৃতি সঞ্জীবিত করা হইয়াছে। শেষ 'পঞ্চম গ্রাম' অর্থে সমরে পঞ্চত্ব ঘটাইবার আকাঙ্ক্ষা বুঝা যাইতেছে। এইরূপভাবে অর্থ করিয়া লইয়া ভীম যুদ্ধার্থ উৎসাহ প্রকাশ করিলেন; দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা-দান-ছলে কহিলেন,—'দেবি! আর দুঃখ করিও না। আমি এই যে বাহির হইলাম; প্রত্যাবর্ত্তন-কালে দেখিবে,—আমার এই বিঘূর্ণিত প্রচণ্ড গদার আঘাতে দুর্য্যোধনের ঊরু চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছে; আর দুর্য্যোধনের রক্তরঞ্জিত এই হস্তে তোমার ঐ মুক্তবেণী-

বেণীসংহার।
(আখ্যান বস্তু)

বন্ধন করিয়া দিতেছি।' এই সময় সহসা সংবাদ আসিল,—'দুর্য্যোধন চক্রান্ত করিয়া বাসুদেবকে বন্দী করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে গমনের জন্য যুধিষ্ঠিরের আদেশ-গ্রহণের পূর্ব্বে এই সংবাদ পাইয়া ভীম অধিকতর বিচলিত হইলেন। প্রথম অঙ্কে এইরূপে ভীমের যুদ্ধ-গমন-প্রসঙ্গ পরিবর্ণিত। দ্বিতীয় অঙ্কে উদ্যানস্থ মন্দিরে দুর্য্যোধনের স্ত্রী ভানুমতীর অশুভ স্বপ্ন-দর্শনের উল্লেখ। পরিশেষে দুর্য্যোধনের অভয় দান। এই অঙ্কের উপসংহারে পাণ্ডবগণকে দণ্ড-দানের জন্য দুর্য্যোধন যুদ্ধযাত্রায় অগ্রসর হন। তৃতীয় অঙ্কে রণস্থল, কুরুপক্ষের সৈন্য-সজ্জা। চতুর্থ অঙ্কে—ভীমের গদাঘাতে মূর্চ্ছিত অবস্থায় দুর্য্যোধন ও তাঁহার সারথির প্রবেশ। রণ-কোলাহলের অবসান। দুঃশাসনের রক্তপান জন্য ভীমের আনন্দ। ভীম কৌরব পক্ষকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—'তোমাদের আর আশঙ্কার কারণ নাই। আমি আর এখন তোমাদিগকে দণ্ড দিব না। আমার প্রতিজ্ঞাপালনের এখনও এক অংশ অবশিষ্ট আছে। দুঃশাসনের রক্ত পান করিয়াছি, এখন দুর্য্যোধনের ঊরু ভঙ্গ করিয়া, সেই রক্ত-রঞ্জিত হস্তে পাঞ্চালীর বেণীবন্ধন করিতে পারিলেই আমার কর্ত্তব্য পালন হয়। ইহার পর দুর্য্যোধনের বিলাপ প্রভৃতিতে এই অঙ্কের পরিসমাপ্তি। পঞ্চম অঙ্কের প্রথমাংশে গান্ধারী, সঞ্জয়, ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির আক্ষেপ। দুর্য্যোধনের পুনর্ব্বার যুদ্ধসজ্জা। ষষ্ঠ অঙ্কে—যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে পাঞ্চালক দুর্য্যোধনের ঊরুভঙ্গের বর্ণনা করিতেছেন। প্রথমে কিরূপে যুদ্ধ হইয়াছিল, তার পর কিরূপে কোথায় গিয়া দুর্য্যোধন লুক্কায়িত হইয়াছিলেন, পরিশেষে কেমন করিয়া তাঁহার সন্ধান পাইয়া ভীমসেন তাঁহাকে পরাজিত করেন,—এই সকল কথা পাঞ্চালক বিবৃত করেন। উপসংহারে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ভীম দ্রৌপদীর বেণী বন্ধন করিয়া দেন, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক হয়। বেণীসংহার নাটকে প্রণয়ের বা পূর্ব্ব-রাগের প্রবর্ত্তনা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ নাটক প্রতিহিংসার জ্বলন্ত উদ্দী-পনায় পূর্ণ। গ্রন্থকারের কবিত্ব, বর্ণনা ও রচনা—সর্ব্বত্রই বিকাশমান। স্থানে স্থানে দুর্ব্বোধ্য পদাবলী বিন্যস্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু অর্থগ্রহে তাহাতে মিষ্ট রস প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ নাটকে গদ্যাংশের বাহুল্য দৃষ্ট হয়। এক এক জনের বক্তব্য বহু-বিস্তৃত, বহু উপমা যুক্ত ও বহু সমস্তপদসমন্বিত।

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক—কৃষ্ণমিশ্র প্রণীত। রাজা কীর্ত্তিবর্ম্মার সম্মুখে অভিনয় করিবার জন্য এই নাটক প্রণীত হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কীর্ত্তিবর্ম্মা ও কৃষ্ণমিশ্র কোন্ সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, তাহা নির্ণয় করার পক্ষে নানা অন্তরায় আছে। প্রথম অন্তরায়,—কীর্ত্তিবর্ম্মা নামধেয় প্রাচীন ভারতের বহু নৃপতির বিদ্যমানতার বিষয় অবগত হওয়া যায়। তাঁহাদের কোন্ কীর্ত্তিবর্ম্মার সময়ে কৃষ্ণমিশ্র 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। তবে সাধারণতঃ স্থির হয়, চান্দেল্য রাজ-বংশীয় বিজয়পালের পুত্র কীর্ত্তিবর্ম্মাই 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' রচয়িতার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সেই কীর্ত্তিবর্ম্মার সেনাপতির নাম—গোপাল। তিনি ঐ নাটক প্রণয়নে গ্রন্থকারকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। শ্রীমান্ গোপালের আদেশে যে এই নাটক লিখিত হয়, সূত্রধারের মুখে সে কথা প্রকাশ আছে বটে; কিন্তু তাহাতে তিনি যে

প্রবোধচন্দ্রোদয়।

কোন্ কীর্ত্তিবর্ম্মার সেনাপতি ছিলেন, তাহা বুঝা যায় না। যাহা হউক, মোটামুটি গোপালের এবং কীর্ত্তিবর্ম্মার নাম দেখিয়া পণ্ডিতগণ চান্দেল্য-বংশীয় কীর্ত্তিবর্ম্মার বিষয়ই সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন। ঐ কীর্ত্তিবর্ম্মা ১০৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ৪৮ বর্ষ কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এই নাটক প্রণয়নের একটী ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস এই যে, সেনাপতি গোপাল, রাজার সহিত দিগ্বিজয় ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকায়, অনেক দিন ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনা করিবার অবসর পান নাই। রণক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তনানন্তর তিনি তাই কবিকে আদেশ করেন,—কবি যেন একখানি শান্তিরসপ্রদ নাটক-প্রণয়নে চিত্ত-বিনোদন করেন। সেনাপতিব সেই বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য এই নাটক প্রণীত হইয়াছিল। পাপের ও পুণ্যের দ্বন্দ্বে পাপের পরাজয় ও পুণ্যের প্রতিষ্ঠা—এই নাটকের প্রধান লক্ষ্য। অন্তঃকরণের বৃত্তি প্রভৃতিকে নরনারীরূপে কল্পনা করিয়া লইয়া, কবি এই নাটকে তাহাদের প্রভাব-পতিপত্তির ও জয়-পরাজয়ের বিষয় বিবৃত করিয়াছেন। নাটকের পাত্র-পাত্রীর বিষয় অনুধাবন করিলে, এই নাটকের গুরুত্ব অনেকাংশে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। এই নাটকের পুরুষবর্গ—কামদেব, বিবেক, দম্ভ, অহঙ্কার, বটু, মহামোহ, চার্ব্বাক, লোভ, ক্রোধ, দিগম্বর সিদ্ধান্ত, বৌদ্ধভিক্ষু, কাপালিক সোমসিদ্ধান্ত, বস্তুবিচার, সন্তোষ, বিনীত, মন, সঙ্কল্প, বৈরাগ্য, আত্মা, নিদিধ্যাসন, প্রবোধচন্দ্র; স্ত্রীবর্গ—রতি, মতি, উপনিষৎ, তৃষ্ণা, হিংসা, বিভ্রমবতী, মিথ্যাদৃষ্টি, শান্তি, করুণা, সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা, ব্যাস-সরস্বতী, মৈত্রী, ক্ষমা, ত্রিবিধা তামসী শ্রদ্ধা (দিগম্বর সিদ্ধান্তের মতাবলম্বিনী, সোম সিদ্ধান্তের মতাবলম্বিনী, বৌদ্ধভিক্ষুর মতাবলম্বিনী)। এই সকল পাত্র-পাত্রীর মধ্যে কবি আত্মাকে মনের পিতারূপে কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। মনের দুই স্ত্রী—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। মনের প্রবৃত্তি পক্ষে তিনি পুত্র,—মহামোহ, কামদেব, ক্রোধ; আর নিবৃত্তিপক্ষে দুই পুত্র—বিবেক ও বৈরাগ্য। প্রবৃত্তি-পক্ষের রাজা মহামোহ; অহঙ্কার লোভ, কামদেব প্রভৃতি তাঁহার অনুচর। এই মহামোহের পক্ষে চার্ব্বাক, পাষণ্ডমতাবলম্বী দিগম্বর সিদ্ধান্ত, বৌদ্ধভিক্ষু, কাপালিক প্রভৃতি অনুচররূপে পরিকল্পিত। অহঙ্কারের পুত্র লোভ এবং লোভের পুত্র দম্ভ প্রভৃতিও ঐ পক্ষাবলম্বী। নিবৃত্তি-পক্ষের রাজা—বিবেক। তাঁহার অনুচর—বস্তুবিচার ও সন্তোষ, দূত—বিনীত, পুত্র—প্রবোধচন্দ্র, সঙ্কল্প—মনের মন্ত্রী, নিদিধ্যাসন বিষ্ণুভক্তির আত্মীয়। স্ত্রী-বর্গের মধ্যেও এইরূপ পক্ষাপক্ষ আছে। রতি—কামদেবের স্ত্রী। মতি ও উপনিষৎ—বিবেকের স্ত্রী। তৃষ্ণা—লোভের, হিংসা—ক্রোধের স্ত্রী। মিথ্যাদৃষ্টি—মহামোহের উপপত্নী; বিভ্রমবতী—মিথ্যাদৃষ্টির বা নাস্তিকতার সহচরী। বিষ্ণুভক্তির দুই সহচরী ও দুই দাসী। সহচরীদ্বয়—সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা ও ব্যাস-সরস্বতী; দাসীদ্বয়—মৈত্রী ও ক্ষমা। শান্তি—শ্রদ্ধার কন্যা; আর করুণা শান্তির সখী। পূর্ব্বোক্ত অপর তিন প্রকার শ্রদ্ধা তামসিক শ্রদ্ধার অন্তর্ভুক্ত। নাটকীয় পাত্র-পাত্রীগণের এই পরিচয়ের বিষয়, রতি ও কামের কথোপকথনে প্রকাশ পাইয়াছে। ঐরূপে রূপকে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার ও তাঁহার আত্মীয়বর্গের কল্পনা করিয়া লইয়া উভয় পক্ষের দ্বন্দ্ব সংঘটিত হইয়াছে। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক ছয় অঙ্কে বিভক্ত। প্রথম অঙ্কে বিষ্কম্ভকে কাম ও রতির কথোপকথনে বিবেক মহারাজের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার প্রসঙ্গ আছে। কাম বলিতেছেন,—'কমললোচনা সুন্দরী ললনাদিগের কটাক্ষ-শর যতক্ষণ

না পতিত হয়, ততক্ষণ শাস্ত্র সমুদ্ভূত বিবেকের প্রভাব জ্ঞানীর চিত্তে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু যেই রমণীর বাসস্থান, সুনয়না নবীনা নায়িকা, প্রস্ফুটিত নবমল্লিকা, ভ্রমরগুঞ্জিত লতা প্রভৃতি অমোঘ অস্ত্র-সমূহ নিক্ষেপ করি, বিবেকের প্রভাব তখন লোপ পায়,—প্রবোধ উদয়েও বিঘ্ন ঘটে।' এরূপ কথোপকথনে বিবেকের পক্ষে বা কিরূপ বল আছে এবং আত্মপক্ষেই বা কিরূপ বল আছে, তাহার আলোচনা হয়। পরিশেষে কি প্রকারে আত্মপক্ষের বিনাশ সাধন হইতে পারে, সে প্রসঙ্গও উত্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে কামদেবের মুখে প্রকাশ পায়,—'আর কোনরূপে তাহারা আমাদের ধ্বংস করিতে পারিবে না। তবে কিংবদন্তী আছে, আমাদের এই বংশে বিদ্যা নামক এক রাক্ষসী জন্মগ্রহণ করিবে; তাহার দ্বারাই আমাদের সর্ব্বনাশ-সাধন হইবে। যে বংশে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সেই বংশেই বিদ্যার জন্ম হইবে। সে পিতামাতা ভ্রাতাদিগকে গ্রাস করিবে।' এই সময় রতির বড়ই শঙ্কা হইল। কাম তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া সান্ত্বনা দান করিলেন; অভয় দিলেন যে, কামদেব বিদ্যমান থাকিতে বিদ্যাব উৎপত্তি কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে। এই সময় বিদ্যাব উৎপত্তি-বিবরণ জানিবার জন্য এবং প্রতিপক্ষ কেন কুলধ্বংস-কারিণী বিদ্যার আকাঙ্ক্ষা করে—তাহা অবগত হইবার জন্য, রতি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তাহাতে কামদেব উত্তর দেন,—'উপনিষৎ নাম্নী পত্নীতে বিবেকের প্রবোধচন্দ্র নামক পুত্র ও বিদ্যা নাম্নী কন্যাব উৎপত্তি হইবে। যাহারা ক্রূরমনা, মলিনচিত্ত, মলিন-হৃদয়, জনক জননীব এবং নিজের বিনাশের জন্য তাহাদের উৎপত্তি। ধূমের উৎপত্তি অনল হইতে। সেই ধূম মেঘরূপে পরিণত হইয়া বারি বর্ষণ কবে। তাহাতে তাহার জন্মদাতা অগ্নিরও ধ্বংস হয় এবং আপনিও বিনষ্ট হয়। ক্রূর জনের স্বভাবই এইরূপ।' এই সময় নেপথ্যে উত্তর প্রদত্ত হয়,—বিবেক যেন সে উত্তর প্রদান করেন,—"আমাদেব কুৎসা ঘোষণা করিতেছিস্ বটে; কিন্তু গুরু যদি বিপথগামী হন, তিনিও পরিত্যজ্য।" এই বলিয়া তিনি দেখাইলেন,—এ দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্রই আছে। তাঁহাদের পিতা মন অহঙ্কারের অনুসরণ করিয়া জগৎপতি পিতাকে বন্দী করেন; আবার মন নিজেও মহামোহের নিকট বন্দী আছেন। এই কথা বলিতে বলিতে পত্নী মতি-দেবীর সহিত বিবেক যেন সেইখানে উপস্থিত হন। কাম তাঁহাদিগকে দেখিয়া বলেন,—'ঐ দেখ মতি-দেবীর সহিত বিবেক আসিতেছেন। রাগের বশীভূত হওয়ায় ইঁহাদের কিরূপ কান্তিভ্রষ্ট হইয়াছে, দেখ! শশাঙ্কদেব যেন শিশিরে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছেন।' ইহার পর মতি ও বিবেক রঙ্গস্থলে উপস্থিত হন। তাঁহাদের কথাবার্ত্তায় কি প্রকারে বিপক্ষ-পক্ষকে পরাজয় করা যায়, তাহারই আভাস প্রকাশ পায়। আত্মা-পুরুষ বন্ধনগ্রস্ত হইয়াছেন, তাঁহার বন্ধন মোচন করিতে হইবে। শত্রুগণ তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বিদ্যাযোগে সেই ভেদবাদী-দিগের সংহার সাধন করিয়া ব্রহ্মের একত্ব-স্থাপন করার প্রয়োজন। সেই জন্য বিবেক মতি-দেবীর সহায়তা-প্রার্থী হইলেন। মতি-দেবী যদি প্রসন্না থাকেন, তাহা হইলে শম-দমাদির সাহায্যে কার্য্যোদ্ধার হইতে পারে। এবম্বিধ পরামর্শ প্রথম অঙ্কের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় অঙ্কে মহামোহের প্রাধান্য-খ্যাপন বিষয়ে পরামর্শ। বিরুদ্ধকে দম্ভ ও অহঙ্কারের [illegible] কো কি ভাবে

বিবেকের আধিপত্য লোপ করা হইবে, তাহারই আভাষ দেওয়া হইয়াছে। দম্ভ বারাণসী-ধামে প্রবেশ করিয়া সেই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ মুক্তি-ক্ষেত্রকে কলুষিত করিতেছেন। বিবেক মহারাজ সেখানে শম-দম প্রভৃতিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। দম্ভের চেষ্টায় সেখানে ধূর্ত্ত বারাঙ্গনাগণ ফাঁদ পাতিয়া বসিয়াছে, তাপসেরা অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়াছেন, পদে পদে প্রবঞ্চনা আরম্ভ হইয়াছে। এই স্থলে অহঙ্কার আসিয়া উপস্থিত হন। উভয়ের কথোপকথনে প্রকাশ পায়, কাম-ক্রোধে সকলকে অভিভূত করিতে হইবে। তাহাতে কাহারও জ্ঞানোদয় হইবে না। ফলে বিবেকের রাজ্য ধ্বংস পাইবে। বিভ্রমবতী, মিথ্যাদৃষ্টি, হিংসা, তৃষ্ণা, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতির সাহায্যে কেমন করিয়া মহামোহের প্রাধান্য স্থাপিত হইতে পারে, এই অঙ্কে তাহারই আভাষ পাই। এইরূপ এক এক অঙ্কে রূপকে পাপের ও পুণ্যের দ্বন্দ্ব-বিষয়ক আলোচনা আছে। উপসংহারে জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতির প্রভাবে পরিশেষে বিবেক মহারাজের বিজয় পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। সদ্‌বৃত্তির ও অসদ্‌বৃত্তির মধ্যে সংসারে যে প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব চলিয়াছে, সেই দ্বন্দ্বে সতের জয় কি প্রকারে সিদ্ধ হয়, ইহাতে তাহার আভাষ পাওয়া যায়। নাটকীয় সৌন্দর্য্য অপেক্ষা 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ে' দার্শনিক তত্ত্বের সমাবেশ অধিক। উপমা ও শিক্ষা প্রায় প্রতি কথোপকথনেই ন্যস্ত রহিয়াছে। বিষ্ণুভক্তির সহিত আত্মার মিলন হইলেই বিবেক কৃতার্থ, অরাতিবৃন্দ নির্ম্মূল এবং আত্মা সদানন্দে অধিষ্ঠিত হন,—ইহাই এই নাটকের শিক্ষণীয় বিষয়।

মহানাটকেরই অপর নাম—হনুমান নাটক। এই নাটকের রচয়িতা সম্বন্ধে ত্রিবিধ মত প্রচলিত আছে। প্রথম মত এই যে, স্বয়ং হনুমান এই নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন, এবং এই নাটক প্রথমে প্রস্তর-গাত্রে খোদিত হয়। সেই খোদিত প্রস্তরের কিয়দংশ সমুদ্র-গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। রাজা বিক্রমাদিত্যের যত্নে উহার উদ্ধার সাধন হয় এবং মধুসূদন মিশ্র উহার পাঠ উদ্ধার করেন। পাঠোদ্ধার-কালে মিশ্র মহাশয় অনেক অংশ নূতন করিয়া লিখিয়া দিয়াছিলেন; আর তদনুসারে মধুসূদন মিশ্রই ঐ নাটকের প্রণেতা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। মহানাটকের শেষ শ্লোক দেখিলে এই উক্তিরই সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। সে শ্লোকটী এই,—

মহানাটক বা হনুমান নাটক।

"এষ শ্রীলহনূমতা বিরচিতে শ্রীমন্ মহানাটকে
বীর শ্রীযুক্ত রামচন্দ্রচরিতে প্রত্যুদ্ধৃতে বিক্রমৈঃ।
মিশ্র শ্রীমধুসূদনেন কবিনা সন্দর্ভ সজ্জীকৃতে
স্বর্গারোহণনামকোত্রে নবমো যাতোঽঙ্ক এবেত্যসৌ॥"

কিন্তু পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মত এই যে, ভোজরাজের রাজত্ব-কালে এই নাটক রচিত হইয়াছিল। সে হিসাবে, এ নাটকের রচয়িতার নাম—দামোদর মিশ্র। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই ভোজরাজ মালব-দেশে রাজত্ব করিতেন। ধারা এবং উজ্জয়িনী নগরীদ্বয়ে তাঁহার রাজধানী ছিল। দামোদর মিশ্র ভোজ-রাজের আশ্রয়েই এই নাটক রচনা করিয়াছিলেন। এই নাটক চতুর্দ্দশ অঙ্কে সমাপ্ত। অনেক স্থলেই এক অংশের সহিত অন্য অংশের রচনার মিল দেখা যায় না। তজ্জন্যও এই নাটকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির

রচনা একত্র সম্মিলিত হইয়াছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। নাটকের রচয়িতা সম্বন্ধে ইহাই তৃতীয় মত। এ নাটকের বর্ণনীয় বিষয়—রামচরিত। মহাবীর হনুমানের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের মিত্রতা-স্থাপন—এই নাটকের বর্ণনীয় বিষয়। আর আর যে সকল প্রাচীন কালের রচিত সংস্কৃত দৃশ্য-কাব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার মধ্যে বিদ্ধশালভঞ্জিকা, কর্পূর-মঞ্জরী, বালরামায়ণ, প্রচণ্ড পাণ্ডব, চণ্ডকৌশিক প্রভৃতি প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত নাটক-চতুষ্টয়ের রচয়িতার নাম—রাজশেখর। রাজশেখর নামে বিভিন্ন গ্রন্থকারের পরিচয় পাওয়া যায়। অলঙ্কার-শাস্ত্র-রচয়িতা রাজশেখর সুপরিচিত। জৈনাচার্য্য ও জৈন ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে রাজশেখরের নাম দৃষ্ট হয়। তৃতীয় রাজশেখর নাটককার বলিয়া প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। কিন্তু কর্পূরমঞ্জরী এবং বিদ্ধশালভঞ্জিকা নাটকে সূত্রধার-মুখে নাটককারের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতেও দুই স্থলে দুই রূপ পরিচয় লিখিত আছে। কর্পূরমঞ্জরীতে দেখিতে পাই,—কবি রাজশেখর নৃপতি মহেন্দ্রপালের উপাধ্যায় (শিক্ষক) ছিলেন; রাজশেখরের পত্নী অবন্তীসুন্দরী 'চাহুবান' কুলে জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে এই নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। বিদ্ধশালভঞ্জিকায় দেখিতে পাই,—কবি রাজশেখরকে পরিব্রাজক সন্ন্যাসী দুহিক-সন্তান বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে; যুবরাজের আদেশে এই নাটক অভিনীত হয়। অন্যত্র আবার এই নাটককারের পিতার নাম—দর্দ্দুক এবং মাতার নাম শীলাবতী বলিয়া পরিচয় পাই। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মতে, এই রাজশেখর খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। বিদ্ধশালভঞ্জিকা ও কর্পূরমঞ্জরী—

বিদ্ধশালভঞ্জিকা, কর্পূরমঞ্জরী প্রভৃতি।

দুই গ্রন্থই প্রণয়-ঘটিত। দুইখানিই চতুরঙ্কে সমাপ্ত। ত্রিলিঙ্গের অধিপতি বিদ্যাধর মল্ল, লাটাধিপতি চন্দ্রবর্ম্মার দুহিতা মৃগাঙ্কাবলীর প্রেমে মুগ্ধ হন। চিত্রে এবং দারুময়ী প্রতিমায় চিত্রশালায় তিনি মৃগাঙ্কাবলীর মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। সেই হইতে রাজা মৃগাঙ্কাবলীকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হন। বহু বাধা-বিঘ্নের পর মৃগাঙ্কাবলীর সহিত রাজার মিলন হয়। ইহাই বিদ্ধশালভঞ্জিকা নাটকের মূল ঘটনা। কর্পূরমঞ্জরী নাটকের বর্ণনীয় বিষয়—রাজার সহিত কর্পূরমঞ্জরীর মিলন। সন্ন্যাসী ভৈরবানন্দ-স্বামী কর্পূরমঞ্জরী নাম্নী একটী সুন্দরী কন্যাকে বিমান-পথে উড়াইয়া আনেন। রাজাকে ধ্যানযোগের শক্তি দেখাইবার জন্য এই আশ্চর্য্য ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। রাজগৃহে আসিয়া কর্পূরমঞ্জরী পনের দিন বাস করিয়াছিলেন। কর্পূরমঞ্জরীকে দেখিয়াই রাজা তৎপ্রতি অনুরক্ত হন। কর্পূরমঞ্জরী সম্পর্কে রাজ্ঞীর ভগিনী ছিলেন। কর্পূরমঞ্জরীকে রাজ্ঞী নিভৃতে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। এদিকে রাজার ষড়যন্ত্রে কর্পূরমঞ্জরী সুরঙ্গ-পথ দিয়া রাজার সহিত দুই এক বার সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় ভৈরবানন্দের পক্ষ হইতে প্রচারিত হয়,—লাট-দেশে চন্দ্রসেন রাজার এক কন্যা আছে; সেই কন্যার নাম—ধনসারমঞ্জরী। তাঁহার সহিত যাঁহার বিবাহ হইবে, তিনি রাজচক্রবর্ত্তী হইতে পারিবেন। ইতিমধ্যে রাজ্ঞী ভৈরবানন্দের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। পূর্ব্বোক্ত ভবিষ্য-বাণী প্রচার করিয়া ভৈরবানন্দ গুরুদক্ষিণা স্বরূপ ধনসারমঞ্জরীর সহিত রাজার বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। একে গুরুদক্ষিণা দান, তাহাতে রাজার সম্রাটপদ-লাভ;—এই উভয় উদ্দেশ্য-সাধনের অভিলাষিণী হইয়া, রাজ্ঞী

ভৈরবানন্দের প্রস্তাবে সম্মত হন। চামুণ্ডাদেবীর মন্দির সম্মুখে বিবাহের বন্দোবস্ত হয়। কর্পূরমঞ্জরী যেখানে আবদ্ধা ছিলেন, সেখান হইতে একটী সুরঙ্গ-পথে রাজ্ঞীর অলক্ষিতভাবে চামুণ্ডার মন্দিরে উপস্থিত হইবার সুবিধা ছিল। বিবাহ-দ্রব্যাদি লইয়া রাজ্ঞী আসিয়া ধনসার-মঞ্জরীর সন্ধান করিতে গিয়া সম্মুখে কর্পূরমঞ্জরীকে দেখিতে পাইলেন। কর্পূরমঞ্জরী সেখানে কেমন করিয়া আসিবেন,—রাজ্ঞীর এ বিশ্বাস হইল না। তিনি পুনরায় রক্ষাগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এদিকে সন্ন্যাসীর ইঙ্গিতে কর্পূরমঞ্জরীও সুরঙ্গ-পথ দিয়া তথায় ফিরিয়া গেলেন। রাজ্ঞী ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি পুনরায় চামুণ্ডামন্দির সন্নিকটে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার ফিরিবার পূর্ব্বেই আবার কর্পূরমঞ্জরী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। বার বার বিভ্রম ঘটাইয়া এইবার ভৈরবানন্দ কহিলেন,—'এই কর্পূরমঞ্জরীর অপর নাম—ধনসারমঞ্জরী।' সুতরাং রাজার সহিত কর্পূরমঞ্জরীর বিবাহ হইয়া গেল; রাজ্ঞী স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন করাইলেন। চণ্ডকৌশিক নাটকের রচয়িতার নাম ক্ষেমীশ্বর। ক্ষেমীশ্বরের পরিচয়ের মধ্যে—তাঁহার পিতামহের নাম বিজয়কোষ্ঠ এবং তিনি নৈষধানন্দ কাব্য ও চণ্ডকৌশিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন,—এই মাত্র জানা যায়। কৌশিক ঋষির ক্রোধের বিষয় এই নাটকে বর্ণিত আছে। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে চণ্ডকৌশিক প্রণীত হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন। দুই এক খানি নাটক আজিও খোদিত লিপির অন্তর্ভুক্ত হইয়া রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন কত দৃশ্য-কাব্য হস্তলিখিত অবস্থায় লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে!

নাট্যকার ভাস।

ভারতের এক অতি প্রাচীন নাট্যকার—ভাস। মহাকবি কালিদাস 'মালবিকাগ্নিমিত্রের' প্রস্তাবনায় এই ভাসের নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তিনি কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া প্রতিপন্ন হন। হর্ষচরিতেও ভাসের উল্লেখ আছে। যথা,—"সূত্রধার কৃতারম্ভৈর্নাটকৈর্বহুভূমিকৈঃ। সপতাকৈর্যশোলেভে ভাসো দেবকুলৈরিব॥" রাজশেখর বিরচিত শুক্তিমুক্তাবলীতে লিখিত আছে,—"ভাস নাটকচক্রেঽপিচ্ছেকৈঃ ক্ষিপ্তে পরীক্ষিতুম্। স্বপ্নবাসবদত্তস্য দাহকোঽভূন্ন পাবকঃ॥" অর্থাৎ,—অগ্নি-পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হইলেও ভাসের স্বপ্নবাসবদত্তা অক্ষুণ্ণ থাকে; স্বপ্নবাসবদত্তা এমনই উৎকৃষ্ট নাটক। এতদিন এই ভাসের নাম মাত্র উল্লিখিত হইতেছিল; কিন্তু তাঁহার কোনও গ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় নাই। * সম্প্রতি মলয়ালম্ অক্ষরে লিখিত তালপত্রের কতকগুলি প্রাচীন (তিন শত বৎসর পূর্ব্বের) পুঁথি হইতে ভাসের কয়েকখানি নাটকের উদ্ধার সাধন হইয়াছে। † সেই পুঁথি-পত্রের মধ্যে ভাসের এগার খানি নাটক পাওয়া

* ঐ গ্রন্থ লোপ পাইয়াছে বলিয়াই এতকাল সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। অনুসন্ধিৎসু পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ সুবন্ধু-প্রণীত 'বাসবদত্তার ভূমিকায় এই কথাই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন,—"The *Vasavdatta* of Subandhu, the oldest romantic novel in India, seems to be derived from that of a long-lost drama by Bhasa, the *Svapna-vasavadatta*, or Dream-Vasavadatta."—*Vâsavadatta* : A Sanskrit Romance by Subandhu, (Columbia University, Indo-Eranian Series, Vol VIII.)

† ত্রিবাঙ্কোর রাজ্যের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রী মহাশয় গত ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে মলয়ালম্ ভাষায় লিখিত মহাকবি ভাস প্রণীত কয়েকখানি নাটকের উদ্ধার-সাধন করেন। পদ্মনাভপুরের অন্তর্গত মংলিকর মঠে ঐ পুঁথি তিনি প্রাপ্ত হন। এক শত পঞ্চাশ খানি তালপত্র, প্রতি পত্রে দশটী করিয়া পংক্তি—এই ভাবে লিখিত পুঁথি হইতে

গিয়াছে ;—(১) স্বপ্নবাসবদত্তা, (২) প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ, (৩) পঞ্চরাত্র, (৪) চারুদত্ত, (৫) দূত-ঘটোৎকচ, (৬) দূতবাক্য, (৭) অবিমারক, (৮) বালচরিত, (৯) মধ্যমব্যয়োগ, (১০) কর্ণভার, (১১) উরুভঙ্গ। ইহার পরে ভাসের নামে প্রচারিত আরও দুই খানি নাটক আবিষ্কৃত হয় ; সে দুই খানির নাম—অভিষেক নাটক ও প্রতিমা নাটক। এই সকল নাটকের বর্ণনীয় বিষয়, ঘটনা, উপমা প্রভৃতির সহিত পরবর্ত্তী অনেক নাটকের আশ্চর্য্য মিল দেখা যায়। তাহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন,—পরবর্ত্তী কবি-নাট্যকারগণ ভাসের অনুসরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা সে মতে—সে মন্তব্যে আস্থা-স্থাপন করিতে পারি না। আমাদের মনে হয়, অধুনা-আবিষ্কৃত নাটকগুলির মধ্যে ভাসের রচনার সহিত লিপিকারগণ পরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার-গণের রচনার সংযোগ করিয়া দিয়া থাকিবেন। বিশেষতঃ, চারুদত্ত প্রভৃতি নাটকগুলি আধুনিক বা অন্যের লিখিত বলিলেও বলা যাইতে পারে। চারুদত্তে যেন শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক অন্য মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া আছে। কয়েকটী শ্লোকে 'চারুদত্ত' ও 'মৃচ্ছকটিক' নাটকদ্বয়ের পরস্পরের সাদৃশ্য উপলব্ধি হইতে পারে।

মৃচ্ছকটিকে,—	চারুদত্তে,—
"যাসাং বলিঃ সপদি মদগৃহদেহলীনাং হংসৈশ্চ সারসগণৈশ্চ বিলুপ্তপূর্ব্বঃ। তাস্বেব সংপ্রতি বিরূঢ়তৃণাঙ্কুরাসু বীজাঞ্জলিঃ পততি কীটমুখাবলীঢ়ঃ॥"	যাসাং বলির্ভবতি মদ্গৃহদেহলীনাং হংসৈশ্চ সারসগণৈশ্চ বিভক্তপুষ্পঃ। তাস্বেব পূর্ব্ববলিরূঢ়যবাঙ্কুরাসু বীজাঞ্জলি পততি কীটমুখাবলীঢ়ঃ॥"
হংস, সারস প্রভৃতি পক্ষিসমূহ পূর্ব্বে আমার গৃহ-অলিন্দে আসিয়া ভূতযজ্ঞে প্রদত্ত আমার বলি অল্পক্ষণেই ভক্ষণ করিত। তাহাদের ভক্ষ্যাবশিষ্ট বলি হইতে যে তৃণাঙ্কুর উৎপন্ন হয়, এখন তাহার উপর কীটমুখ-ভ্রষ্ট বীজাঞ্জলি নিপতিত হইতেছে।	হংস, সারস প্রভৃতি পক্ষিসমূহ পূর্ব্বে আমার গৃহ-অলিন্দে আসিয়া পুষ্প-স্তবকের মধ্য হইতে ভূতযজ্ঞে প্রদত্ত আমার বলি গ্রহণ করিত। তাহাদের ভক্ষ্যাবশিষ্ট বলি হইতে উৎপন্ন যবাঙ্কুরে এখন কীটমুখভ্রষ্ট বীজাঞ্জলি নিপতিত হইতেছে।

উভয় শ্লোকেই অবস্থা-বিপর্য্যয়ের ভাব ব্যক্ত করিতেছে। একের সহিত অন্যের বর্ণনার পার্থক্য অতি সামান্য। মৃচ্ছকটিকের 'তৃণাঙ্কুর' চারুদত্তে 'যবাঙ্কুর' এবং মৃচ্ছকটিকের 'বিলুপ্তপূর্ব্ব' স্থলে চারুদত্তে 'বিভক্তপুষ্প' মাত্র পাঠ পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই। এইরূপ আর একটী শ্লোক,—

মৃচ্ছকটিকে,—	চারুদত্তে,—
"মার্জ্জারঃ ক্রমণে মৃগঃ প্রসরণে শ্যেনো গৃহালুঞ্চনে সুপ্তাসুপ্ত মনুষ্যবীর্য্য তুলনে শ্বা সর্পণে পন্নগঃ। মায়ারূপ শরীরবেশরচনে বাগদেশ ভাষান্তরে দীপো রাত্রিষু সংকটেষুডুডুমো বাজীস্থলে নৌর্জলে॥	"মার্জ্জার প্লবনে বৃকোঽপসরণে শ্যেনো গৃহালোকনে নিদ্রা সুপ্তমনুষ্যবীর্য্যতুলনে সংসর্পণে পন্নগঃ। মায়া বর্ণশরীরভেদকরণে বাগ্‌দেশ ভাষান্তরে দীপো রাত্রিষু সংকটে চ তিমিরং বায়ুস্থলে নৌর্জলে॥

দশ খানি নাটক পাওয়া যায়। পুঁথির প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা নষ্ট হইয়াছে, অবশিষ্টগুলির পাঠ উদ্ধারে কোনই বিঘ্ন ঘটে নাই। ঐ নাটকগুলি যদি প্রকৃতই ভাসের রচিত নাটক হয়, তাহা হইলে যে এক লুপ্ত-রত্নের উদ্ধার সাধন হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য।

উভয় শ্লোকই প্রায় এক ; পরিবর্ত্তন সামান্য মাত্র। তস্কর কীদৃশ শক্তিসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক শ্লোকে তাহাই বলা হইতেছে। মার্জ্জারের ন্যায় অতিক্রমণে (লম্ফনে), বৃকের (মৃগের) ন্যায় পলায়নে, শ্যেনের ন্যায় গৃহাবলোকনে (গৃহের দ্রব্যাদি দর্শনে), কুকুরের ন্যায় মনুষ্যের নিদ্রা ও জাগরণ নির্দ্ধারণে (অথবা নিদ্রার ন্যায় সুপ্ত মনুষ্যের সামর্থ্যাবধারণে), সর্পের ন্যায় দ্রুতগমনে, মায়ার ন্যায় বর্ণবিবর্ত্তনে, বাগ্মীর ন্যায় বিভিন্ন দেশীয় ভাষার অভিজ্ঞতায়— তাহারা ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে। রাত্রিতে দীপবৎ, সঙ্কটে বৃকবৎ (তিমিরবৎ), স্থলে অশ্বের (বায়ুর) ন্যায় এবং জলে নৌকার ন্যায় তাহারা কার্য্য করিতে পারিবে। এইরূপ, মহাকবি কালিদাসেরও বহু শ্লোকের সহিত ভাসের আবিষ্কৃত গ্রন্থসমূহের রচনার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এই সকল সাদৃশ্যের বিষয় অনুধাবন করিলে কোন্ কবি কাহার অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে। যাহা হউক, ভাস রচিত স্বপ্নবাসবদত্তা এবং প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ নাটক দুইখানিই বিশেষ প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। সুতরাং এই দুই নাটকের বর্ণনীয় বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে। এই দুইখানি নাটকই ইতিহাসমূলক। আবার নাটক-দুইখানিতে ঘটনার সম্বন্ধও বড় অল্প নহে। দুই নাটকেরই নায়ক —বৎসরাজ উদয়ন। স্বপ্নবাসবদত্তায় প্রকাশ,—উজ্জয়িনীর অধিপতি মহাসেনের কন্যা বাসবদত্তাকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। এই বিবাহের পর উদয়ন রাজ্যভ্রষ্ট হন। কোনও সিদ্ধ-পুরুষ বলিয়াছিলেন,—যদি মগধ-রাজ দর্শকের ভগিনী পদ্মাবতীর সহিত উদয়নের বিবাহ হয়, তাহা হইলে পুনরায় তিনি রাজ্যেশ্বর হইতে পারিবেন। মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ এই বিশ্বাসে বিশ্বাসবান হইয়া, পদ্মাবতীর সহিত বৎসরাজের বিবাহের পক্ষে চেষ্টান্বিত হন। কিন্তু সহজে সে বিবাহে উদয়ন সম্মত হন না বলিয়া মন্ত্রী এক কৌশল অবলম্বন করেন। রাজ্য মধ্যে রাষ্ট্র হয়, রাজ্ঞী বাসবদত্তা অগ্নিদাহে লাবাণক গ্রামে দগ্ধীভূত হইয়াছেন। তাঁহাকে উদ্ধার করিতে গিয়া মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণকেও প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে। এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার অল্প দিন পরে যৌগন্ধরায়ণ ও রাজ্ঞী বাসবদত্তা ছদ্মবেশে মগধে গমন করেন। সেখানে বাসবদত্তাকে আপনার ভগ্নী বলিয়া পরিচয় দিয়া পদ্মাবতীর নিকট তাঁহার অবস্থিতির ব্যবস্থা করিয়া দেন। এই সময় ঘটনাচক্রে উদয়নকে মগধে আসিতে হয়। তিনি বিপত্নীক, অথচ রাজোচিত গুণসম্পন্ন ; সুতরাং মগধরাজ দর্শক তাঁহার সহিত আপনার ভগিনী পদ্মাবতীর বিবাহ দেন। ইহার পর মগধরাজের সৈন্য-সাহায্যে উদয়নের হৃত-রাজ্যের উদ্ধার-সাধন হয় ; স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই রাজা উদয়ন বাসবদত্তাকে এবং মন্ত্রীকে প্রাপ্ত হন। ইহাই 'স্বপ্নবাসবদত্তা' নাটকের স্থূল ঘটনা। 'প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ' নাটকে বাসবদত্তার সহিত উদয়নের পরিণয়-কাহিনী পরিবর্ণিত আছে। বৎসরাজ উদয়ন নাগবনে মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। অবন্তীরাজ প্রদ্যোৎ তাঁহাকে রাজধানীতে বন্দী করিয়া লইয়া যান। বন্দী করার উদ্দেশ্য ছিল,—আপন কন্যা বাসবদত্তার সহিত উদয়নের বিবাহ-প্রদান। অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ অবস্থায় বাসবদত্তার সহিত সাক্ষাতে রাজা ও বাসবদত্তা পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন। বাসবদত্তার পিতা প্রদ্যোৎও তাহা জানিতে পারেন না ; উদয়নের মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণও রাজাকে বন্দী করার

উপাখ্যান।

কারণ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন না। যৌগন্ধরায়ণ রাজার উদ্ধারের জন্য এক কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি ছদ্মবেশে নগরে প্রবেশ করিয়া এক দিন বাসবদত্তাকে ও উদয়নকে হস্তিপৃষ্ঠে চড়াইয়া নগরের বাহিরে লইয়া আসেন। রাজা প্রদ্যোৎ তাঁহাদের অনুসরণে সৈন্যদল প্রেরণ করেন; যৌগন্ধরায়ণ ও তাঁহার দলবল বন্দী হন। পরিশেষে সত্য ঘটনা—মূল উদ্দেশ্য ব্যক্ত হইয়া পড়িলে, পরস্পরের মিলন হয়। তখন বৎসরাজের করে বাসবদত্তাকে সমর্পণ করিয়া রাজা প্রদ্যোৎ তাঁহাদিগকে কৌশাম্বী নগরে প্রেরণ করেন। বলা বাহুল্য, এই দুই নাটকের ঘটনার সহিত রত্নাবলী নাটকের কোনও কোনও ঘটনার মিল আছে। নাটকীয় উপাদান-গ্রহণে রত্নাবলী নাটকের রচয়িতা কিংবা স্বপ্নবাসবদত্তা-প্রণেতা কেহ যে কাহারও নিকট ঋণী আছেন, এ কথা আমরা অবশ্য বলিতেছি না। কারণ, ঘটনার অনেকাংশ ইতিহাসমূলক বলিয়া মনে হয়। বাসবদত্তার অপহরণ-বৃত্তান্ত বৌদ্ধ-গ্রন্থাদিতেও লিখিত আছে। সেখানে বাসবদত্তা—'বাসুলদত্তা' নামে পরিচিত। আরও প্রতিপন্ন হয়, ঐ সময়ে অবন্তী, মগধ, বৎস, কোশল প্রভৃতি রাজ্যের রাজন্যবর্গ পরস্পর বৈবাহিক-সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন। অনেক সময় এই বিবাহ-ব্যাপার লইয়া বিবাদ-বিসম্বাদ ঘটিয়াছিল। সেই ঐতিহাসিক ভিত্তির অবলম্বনেই এই সকল নাটক রচিত হইয়া থাকিবে, মনে করা যায়। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করেন,—এই ভাস খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর পরে কখনই প্রাদুর্ভূত হন নাই। * কিন্তু তিনি যখন কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া প্রতিপন্ন হন, তখন তাঁহার বিদ্যমান-কাল খৃষ্ট-পূর্ব্ব শতাব্দী ভিন্ন অন্যরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। যাহা হউক, এইরূপ কত কবি কত নাট্যকার যে স্মৃতির অন্তরালে আপনাদের অস্তিত্ব বিলীন করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা যায় না। ফলতঃ, যেমন করিয়াই দেখি না কেন, ভারতের নাট্য-সাহিত্য যে সমুন্নত ও সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

যে দেশে এবম্বিধ নাট্য-সাহিত্য বিকাশ পায়, সে দেশ যে সর্ব্ববিধ উন্নতির অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল,—সে দেশ যে সকল কলা বিদ্যায় উৎকর্ষ-লাভ করিয়াছিল, তাহা আপনা-আপনিই প্রতীত হয়। এই দিক দিয়া দেখিলেও বুঝা যায়, পাশ্চাত্যের সভ্যতার কত পূর্ব্বে ভারতবর্ষ সভ্য-সমুন্নত ছিল। কারণ, ভারতবর্ষের নাট্য-সাহিত্যের লোপ-প্রাপ্তির অনেক পরে ইউরোপে নাট্য-সাহিত্যের অভ্যুদয় দেখা যায়। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ইউরোপে নাট্য-সাহিত্য বিকাশ-প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু এ সময়ে ভারতের নাট্য-সাহিত্যের কি অবস্থা, কাহারও অবিদিত নাই। † ভারতের নাট্য-সাহিত্যের এবম্বিধ বিকাশ যে প্রাচীন ভারতের সভ্যতার পূর্ণ-

বিবিধ বক্তব্য।

* Prof. Macdonell in the *Journal* of the *Royal Asiatic Society*, January, 1913.

† ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহারা ভারতের নাট্য-সাহিত্যের আলোচনায় সমর্থ হইয়াছেন, এ সম্বন্ধে তাঁহাদের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। হিন্দুগণের নাট্যশালা-সংক্রান্ত গ্রন্থে অধ্যাপক উইলসন এ সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন,—'The nations of Europe possessed no dramatic literature before the fourteenth or fifteenth century at which period the Hindu Drama had passed into its decline."—*Theatre of the Hindus* by H. H. Wilson. জর্ম্মণীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্লেজেল এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া

পরিচায়ক, অনুসন্ধিৎসু ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহারাই বলেন,—এ সকল রচনা সভ্যতারই পরিচায়ক। * সকল দেশে সাহিত্যের সকল অঙ্গ পরিস্ফুট হয় না। আবার এক সময়েও কোনও সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গ স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে দেখা যায় নাই। পারস্য ভাষায় নাটক নাই; কিন্তু গীতি-কবিতায় পারসিক সাহিত্য উচ্চ-স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইউরোপের স্পেন ও পর্ত্তুগাল নৈকট্য-সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত। অথচ স্পেনে অভাবনীয়রূপে নাট্য-সাহিত্য বিকাশ পাইয়াছিল; কিন্তু পর্ত্তুগালে তাহার সম্পূর্ণ অভাব। লোপ-ডি-ভেগো, কাল্ডেরণ, সার্ভেন্টিস্ প্রভৃতি স্পেনের নাটক-রচয়িতাগণ কত নাটকই লিখিয়া গিয়াছেন! এক লোপ-ডি-ভেগোই পনের শত নাটক প্রণয়ন করেন। কিন্তু পর্ত্তুগালের নাটক নাই; কবিত্বের স্ফূর্ত্তি আছে। এইরূপ, একই সময়ে কাব্য-মহাকাব্য এবং নাটক যুগপৎ কোনও দেশে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়াও প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু ভারতবর্ষ কি কাব্যে, কি নাটকে—সর্ব্ব-বিষয়েই কৃতিত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে; আবার, একই সময়ে ভারতে উভয়বিধ সাহিত্যই স্ফূর্ত্তি-লাভ করিয়াছিল। কাব্য-মহাকাব্যের প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, ভারতের নাট্য-সাহিত্যের বিষয়ই যদি আলোচনা করি, তাহাতে একাধারে দুই ভাবেরই সমাবেশ দেখি। ভারতের নাট্য-সাহিত্যে কবিত্বের স্ফূর্ত্তিও আছে, আবার নাটকীয় সৌন্দর্য্যও বিকাশ পাইয়াছে। যুগপৎ এই উভয় ভাবের অভিব্যক্তিতে জাতির বহির্দৃষ্টির ও অন্তর্দৃষ্টির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ বলিয়া কাব্য-মহাকাব্যে প্রকৃতির কমনীয় কান্তি—রম্য ছবি আপনিই উদ্ভাসিত হইয়াছে। কবিত্বের এবম্বিধ স্ফূর্ত্তি সংসর্গের ফল বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি প্রগাঢ় না হইলে কোনও জাতিই নাট্যকলার বিকাশে সমর্থ হয় না। অনুপম কবিত্ব-কুসুমে সজ্জিত হইয়া ভারতে যে নাট্য-কলার বিকাশ পাইয়াছে, তাহাতে বহির্দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি দুইয়েরই পরিচয় দিতেছে। কবি যেমন স্বভাবের সৌন্দর্য্য-সুষমা দেখিয়া তাহার উজ্জ্বল প্রতিকৃতি আঁকিয়াছেন, আর তাহাতে যেমন তাঁহার সৌন্দর্য্যানুভূতির নিদর্শন দেদীপ্যমান রহিয়াছে; বিভিন্ন প্রকৃতির কুটিল ও সরল চরিত্রের নিগূঢ়-তত্ত্ব-প্রকাশে তাঁহার সেইরূপ অন্তর্দৃষ্টি দেখিতে পাই। কাব্য-মহাকাব্যে এবং নাটক-নাটিকায় প্রতিভার এই যে পূর্ণ নিদর্শন রহিয়া গিয়াছে, তাহা কখনও মলিন হইবার নহে। উহা দ্বারা ভারতের শৌর্য্য, বীর্য্য, গৌরব, গাম্ভীর্য্য—সকলই প্রকাশ পাইতেছে—স্মৃতি সমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে।

গিয়াছেন, তাহাও এতৎপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার উক্তির ইংরাজী অনুবাদ,—"Among the Indians whose social institutions and mental cultivation descend unquestionably from a remote antiquity, plays were known long before they could have experieneed any foreign influence. They possess a rich dramatic literature which goes backwards through nearly two thousand years."—A. W. Schlegel's *Dramatic Art and Literature.*

"They are the works of a civilized people."—Mill's *India.*

দশম পরিচ্ছেদ

ভারতের সাহিত্য-সম্পৎ।

৩। সংস্কৃত ভাষায়—খণ্ড-কাব্য ও গদ্য-কাব্য।

[কালিদাসের মেঘদূত, ঋতুসংহার—দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা—পুষ্পবাণবিলাস প্রভৃতি,—ভর্তৃহরি বিরচিত শতগ্রন্থসমূহ—বৈরাগ্যশতক, শান্তিশতক, নীতিশতক প্রভৃতি,—ঘটকর্পর—বিদ্যাপতি বিহ্লণ,—চোরকবি;—বাণভট্ট বিরচিত কাদম্বরী ও হর্ষচরিত প্রভৃতি,—দণ্ডী বিরচিত দশকুমারচরিত, কাব্যাদর্শ প্রভৃতি,—সুবন্ধু-প্রণীত বাসবদত্তা,—বিষ্ণুশর্ম্মার পঞ্চতন্ত্র,—সোমদেবের কথা সরিৎ সাগর,—সংস্কৃত ভাষার অন্যান্য বিবিধ গ্রন্থ।]

কাব্য-মহাকাব্য ভিন্ন সংস্কৃত-সাহিত্যে খণ্ড-কাব্য অনেক আছে। কালিদাস, ভর্তৃহরি, ঘটকর্পর প্রভৃতি ভারতীয় কবিগণ খণ্ডকাব্যে অতুলনীয় কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মহাকবি কালিদাস যেমন কাব্যে, মহাকাব্যে ও নাটকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিগণের মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া আছেন, খণ্ড-কাব্যেও তাঁহার যশঃপ্রভা সেইরূপই সমুজ্জ্বল হইয়া আছে। কালিদাসের মেঘদূত ও ঋতু-সংহার খণ্ড কাব্য মধ্যে উজ্জ্বল রত্ন-বিশেষ। তাঁহার মেঘদূত-কি কাব্যাংশে, কি ছন্দোবন্ধে, কি পদলালিত্যে সর্ব্ব-বিষয়েই অভিনবত্ব-পূর্ণ। মেঘদূত—মন্দাক্রান্তা ছন্দে লিখিত। সেই ছন্দের লক্ষণ এই যে, শ্লোকের চারি চরণের প্রতি চরণে সতেরটী করিয়া বর্ণ থাকিবে। তাহার মধ্যে প্রথম চারি বর্ণ, দশম একাদশ ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ ষোড়শ ও সপ্তদশ বর্ণ গুরু হইবে এবং চতুর্থ ষষ্ঠ ও সপ্তম বর্ণে যতি পড়িবে। এবম্বিধ ছন্দে পূর্ব্বমেঘ ও উত্তর মেঘ দুই অংশে এক শত কুড়িটী শ্লোকে মেঘদূত সম্পূর্ণ। এই খণ্ড-কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়—বিরহীর বিরহোচ্ছ্বাস। কার্য্যে অনবধানতা বশতঃ এক যক্ষ অভিশাপগ্রস্ত হয়। যক্ষরাজ অভিশাপ দেন, এক বৎসর সে প্রিয়তমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবে না। যক্ষরাজ কুবেরের এই অভিসম্পাতের বা আদেশের ফলে যক্ষ মধ্য-ভারতের অন্তর্গত রামগিরি পর্ব্বতের অরণ্যে নির্ব্বাসিত হয়। কয়েক মাস সেই স্থানে অবস্থিতির পর বর্ষাগমে প্রিয়া-বিরহে যক্ষের প্রাণ বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠে। আষাঢ় মাসের প্রথম দিবসে মত্তমাতঙ্গের ন্যায় রমণীয়-দর্শন নবজলধর অবলোকন করিয়া যক্ষ আত্মহারা হয়। শ্রাবণের প্রারম্ভে বিরহ-বিধুরা প্রণয়িনীর অবস্থা স্মরণ করিয়া, কাতর হইয়া, সে মেঘের শরণ লয়। তাহার বিরহে তাহার প্রণয়িনী কতই কাতরা হইয়া আছে—কতই কষ্ট পাইতেছে, তাহার নিকট সংবাদ পাঠাইতে না পারিলে তাহার প্রাণধারণই অসম্ভব হইবে—মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া, যক্ষ মেঘের দ্বারা প্রিয়তমার নিকটে সংবাদ পাঠাইতে ব্যগ্র হয়। প্রার্থনা করিয়া বলে,—

"জাতং বংশে ভুবনবিদিতে পুষ্করাবর্ত্তকানাং, জানামি ত্বাং প্রকৃতিপুরুষং কামরূপং মঘোনঃ।
তেনার্থিত্বং ত্বয়ি বিবিধশাদ্দূর বন্ধুর্গতোঽহং, যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা॥"

এই শ্লোকে যক্ষ বলিতেছে,—'হে মেঘ। তুমি মহদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাই তোমার নিকট আমি প্রার্থী হইতেছি। মহদ্বংশোদ্ভব মহাত্মার নিকট প্রার্থনা করিয়া বিফল হইলেও

ক্ষোভ নাই; কিন্তু হীনজনের নিকট যাচ্ঞা করিয়া ফললাভ হইলেও, সে যাচ্ঞা কর্ত্তব্য নহে।' এই বলিয়া মেঘকে সম্বোধন করিয়া যক্ষ একে একে আপন কাহিনী নিবেদন করিল। মেঘ দক্ষিণ দিক হইতে উত্তরাভিমুখে চলিয়াছে সুতরাং রামগিরি হইতে কুবের-ভবনাভিমুখেই গমন করিতেছে, মেঘ নিশ্চয়ই তাহার প্রণয়িনীর নিকট দিয়া গমন করিবে; তাই যক্ষ আপনার সমাচার মেঘের সাহায্যে প্রেরণ করিয়া প্রণয়িনীকে আশ্বস্ত করিতে ও সান্ত্বনা দিতে চায়। রামগিরি হইতে কুবেরালয়ে অলকায় যাইতে হইলে, কোন্ কোন্ নগর-জনপদ, নদ-নদী-পর্ব্বত অতিক্রম করিতে হইবে, পূর্ব্বমেঘে যক্ষ তাহারই বর্ণনা করিতেছে। চিত্রকূট পর্ব্বত হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পথে প্রথমে মেঘ আম্রকূট গিরি-প্রান্তে অবস্থিতি করিবে। তথায় বারিবর্ষনানন্তর ক্রমে ক্রমে বিন্ধ্য-পর্ব্বত-বিনির্গতা রেবা নদী অতিক্রম করিয়া একে একে দশার্ণ, অবন্তী, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন স্থানে বিশ্রাম করিতে করিতে কৈলাস পর্ব্বতে অলকা-নগরীতে উপনীত হইবে। উত্তর-মেঘে অলকা-নগরীর বর্ণনা এবং সেখানে আপন আলয়ে কি ভাবে বিরহিণী দিনযাপন করিতেছে, তাহার বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। বিরহিণী একাকিনী পতিবিরহে কি ভাবে অবস্থিতি করিতেছে কবির তুলিকায়, যক্ষের বর্ণনায়, তাহার জীবন্ত ছবি দেখিতে পাই। যথা,—

"আধিক্ষামাং বিরহশয়নে সন্নিকীর্ণৈকপার্শ্বাং, প্রাচীমূলে তনুমিব কলামাত্রশেষাং হিমাংশোঃ।
নীতা রাত্রিঃ ক্ষণমিব ময়া সার্দ্ধমিচ্ছারতৈর্যা, তামেবোষ্ণৈর্বিরহমহতীমশ্রুভির্যাপয়ন্তীম্॥
নিশ্বাসেনাধরকিশলয়ক্লেশিনা বিক্ষিপন্তীং, শুদ্ধস্নানাৎ পরুষমলকং নূনমাগণ্ডলম্বম্।
মৎসম্ভোগঃ কথমুপনয়েৎ স্বপ্নজোঽপীতি নিদ্রা,-মাকাংক্ষন্তীং নয়নসলিলোৎপীড়রুদ্ধাবকাশাম্॥
আদ্যে বদ্ধা বিরহদিবসে যা শিখা দাম হিত্বা, শাপস্যান্তে বিগলিতশুচা তাং ময়োদ্বেষ্টনীয়াম্।
স্পর্শক্লিষ্টামযমিতনখেনাসকৃৎ সারয়ন্তীং, গণ্ডাভোগাৎ কঠিনবিষমামেকবেণীং করেণ॥
পাদানিন্দোরমৃতশিশিরান্ জালমার্গপ্রবিষ্টান্, পূর্ব্বপ্রীত্যা গতমভিমুখং সন্নিবৃত্তং তথৈব।
চক্ষুঃ খেদাৎ সলিলগুরুভিঃ পক্ষ্মভিশ্ছাদয়ন্তীং সাভ্রেঽহ্নীব স্থলকমলিনীং ন প্রবুদ্ধাং ন সুপ্তাম্॥
সা সন্ন্যস্তাভরণমবলা পেশলং ধারয়ন্তী, শয্যোৎসঙ্গে নিহিতমসকৃৎ দুঃখদুঃখেন গাত্রম্।
ত্বামপ্যস্রং নবজলময়ং মোচয়িষ্যত্যবশ্যং, প্রায়ঃ সর্ব্বো ভবতি করুণাবৃত্তিরার্দ্রান্তরাত্মা॥
জানে সখ্যাস্তব ময়ি মনঃ সম্ভৃতস্নেহমস্মা,-দিত্থম্ভূতাং প্রথমবিরহে তামহং তর্কয়ামি।
বাচালং মাং ন খলু সুভগম্মন্যভাবঃ করোতি, প্রত্যক্ষন্তে নিখিলমচিরাৎভ্রাতরুক্তং ময়া যৎ॥"

যক্ষ বলিতেছে,—তুমি দেখিবে, প্রিয়তমা বিরহ-যাতনায় একান্ত ক্ষীণ হইয়া বিরহ-শয্যার এক পার্শ্বে শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হইবে যেন পূর্ব্বদিকের প্রান্তভাগে কলামাত্রাবশেষ সুধাংশু বিরাজ করিতেছে। হায়, প্রিয়তমা আমার সহিত স্বেচ্ছা-বিহারে প্রবৃত্ত হইয়া মুহূর্ত্তের ন্যায় যে যামিনী অতিবাহন করিতেন, অধুনা বিরহ-নিবন্ধন সেই যামিনী যার পর নাই সুদীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছে। তুমি দেখিতে পাইবে, তিনি বিরহসন্তপ্ত অশ্রু বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তাদৃশ রজনী অতিবাহিত করিতেছেন। হে পয়োদ! তুমি দেখিবে, সুদীর্ঘ নিশ্বাস-ভরে প্রিয়তমার অধর-কিশলয় একান্ত ক্লিষ্ট ও গণ্ড পর্য্যন্ত লম্বিত অলকাজাল আন্দোলিত হইতেছে, সন্দেহ নাই। অবিরল নয়নাশ্রু নিপতিত হওয়াতে নিদ্রা তাঁহার

নিকটবর্ত্তিনী হইতে পারিতেছে না! পরন্তু তিনি কেবল স্বপ্নাবেশে আমার সহিত সম্ভোগ-বাসনায় মুহুর্মুহু মিলন প্রার্থনা করিতেছেন। তুমি দেখিতে পাইবে, যে দিন প্রথম বিরহ-ঘটনা উপস্থিত হয়, প্রিয়তমা সে দিবস মাল্যদাম বিসর্জ্জন দিয়া যে শিখা বন্ধন করিয়াছেন, শাপান্তে প্রত্যাগমনানন্তর আমি যাহা খুলিয়া উদ্বেষ্টন করিয়া দিব, তিনি স্পর্শক্লিষ্ট নখদ্বারা সেই কঠিন বিষম একশ্রেণীস্বরূপ শিখা গণ্ডদেশ হইতে পুনঃপুনঃ অপসারিত করিতেছেন! স্থলপদ্মিনী যেমন মেঘাচ্ছন্ন দিবসে বিকশিত বা অমুদিত থাকে না, অধুনা আমার প্রিয়তমাও তদনুরূপ অবস্থাপন্ন হইতেছেন, সন্দেহ নাই। কারণ, তদীয় নয়নদ্বয় পূর্ব্বপ্রীতিনিবন্ধন গবাক্ষ-রন্ধ্রাগত সুধাংশু-করের অভিমুখেও পুনর্ব্বার সন্নিবৃত্ত হইয়া দারুণ দুঃখ-সলিলে আপ্লাবিত হইতেছেন। তিনি পক্ষ্ম দ্বারা পুনঃপুনঃ চক্ষু আচ্ছাদন করিতেছেন। হে জলদ! সেই অবলা নিরতিশয় দুঃখনিবন্ধন যাবতীয় বিভূষণ পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর শয্যাশায়িনী হইয়া রহিয়াছেন। দেখিবামাত্র তুমিও অভিনব সলিল রূপ বাষ্পরাশি বিসর্জ্জন করিবে, সন্দেহ নাই। কারণ, যাঁহাদিগের হৃদয় কোমল, তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ প্রায়ই করুণার্দ্র হইয়া থাকে।' এই বলিয়া, প্রিয়তমার বিষাদের চিত্র আঁকিয়া যক্ষ আপন পক্ষ হইয়া তাহার প্রিয়তমাকে কি বলিতে হইবে, মেঘকে তাহাই বলিয়া দিতেছে। যক্ষ বলিতেছে,—

"শ্যামাসঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং, বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্, হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি ন তে চণ্ডি সাদৃশ্যমস্তি॥ *
ত্বামালিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়ামা, আত্মানং তে চরণপতিতং যাবদিচ্ছামি কর্ত্তুম্।
অস্রৈস্তাবন্মুহুরুপচিতৈর্দৃষ্টিরালুপ্যতে মে, ক্রূরস্তস্মিন্নপি ন সহতে সঙ্গমং নৌ কৃতান্তঃ॥"

'শ্যামালতার ন্যায় তোমার অঙ্গ-সৌন্দর্য্য, চকিত হরিণীগণের দৃষ্টিতে তোমার দৃষ্টিপাত, শশাঙ্কে তোমার বদন-শ্রী, শিখিপুচ্ছের ন্যায় তোমার কেশদাম, তরঙ্গিণীর বীচি-বিলাসে তোমার ভ্রূ-বিলাস প্রভৃতির কতক সাদৃশ্য দেখিতে পাই বটে; কিন্তু সম্যক সাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হয় না। আমি ধাতুরাগ দ্বারা শিলাপরে তোমার প্রণয়-কুপিত মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া তাহার চরণতলে নিপতিত হইবার চেষ্টা করি; কিন্তু অমনি অশ্রুজলে আমার দৃষ্টিপথ অবরুদ্ধ হয়; ক্রূর-হৃদয় দুর্দ্দৈব চিত্রপটেও তোমার সহিত আমার মিলন যেন সহ্য করিতে পারে না।' মেঘমুখে যক্ষের প্রণয়-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া যক্ষরাজ তাহাকে মুক্তিদান করেন; প্রণয়ী-প্রণয়িনীর পুনর্ম্মিলন সাধিত হয়। মেঘদূত খণ্ড-কাব্যে মেঘের উৎপত্তি, স্থিতি ও গতি সম্বন্ধে কবি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে মহাকবি কালিদাসের বিজ্ঞান-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ইউরোপীয় সাহিত্যে মেঘদূতের একটী অনুকৃতির বিষয় অবগত হওয়া যায়। সিলারের প্রণীত 'মেরিয়া ষ্টুয়ার্ট' নামক নাটকে বন্দী রাজ্ঞী আপনার প্রণয়ী সম্পর্কে দক্ষিণগামী মেঘের নিকট এইরূপভাবেই আপনার বিরহ-বেদনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

---

* এই শ্লোকের একটী সুন্দর পদ্যানুবাদ দেখা যায়। যথা,—

"In creepers I discern thy form, in eyes of startled hinds thy glances,
And in the moon thy lovely face, in peacock's plumes thy shining tresses;
The sportive frown upon thy brow in flowing water's tiny ripples;
But never in one place combined can I, alas! behold thy likeness."

কালিদাসের ঋতু-সংহার—খণ্ড-কাব্য মধ্যে আর এক শ্রেষ্ঠ রত্ন। এই খণ্ড-কাব্যে বিভিন্ন ছন্দে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শিশির, বসন্ত—এই ষড়্ঋতুর বর্ণনা আছে। কবি যেন আপনার প্রণয়িনীকে সম্বোধন করিয়া এই ষড়্-ঋতুর বর্ণনা করিয়াছেন।

ঋতু-সংহার। সে বর্ণনায় ঋতুভেদে প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন এবং সেই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীব-জন্তুর ও মনুষ্যের স্বভাবের পরিবর্ত্তন, অতি সুন্দর-ভাবে পরিবর্ণিত। তাহাতে সময় সময় আদি-রসের একটু আধিক্য ঘটিয়াছে। শরদ্বর্ণনার প্রথমাংশ উদ্ধৃত করিতেছি; তাহাতে একাধারে সকল ভাবেরই আভাষ পাওয়া যাইবে। সে বর্ণনা,—

কাশাংশুকা বিকচপদ্মমনোজ্ঞবক্ত্রা সোন্মাদহংসরবনূপুরনাদরম্যা।
আপক্বশালিরুচিরা তনুগাত্রযষ্টিঃ প্রাপ্তা শরন্নববধূরিব রূপরম্যা॥
কাশৈর্ম্মহী শিশিরদীধিতিনা রজন্যো হংসৈর্জলানি সরিতাং কুমুদৈঃ সরাংসি।
সপ্তচ্ছদৈঃ কুসুমভারনতৈর্বনান্তাঃ শুক্লীকৃতান্যুপবনানি চ মালতীভিঃ॥
চঞ্চলমনোজ্ঞশফরীরসনাকলাপাঃ পর্য্যন্তসংস্থিতসিতাণ্ডজপঙ্‌ক্তিহারাঃ।
নদ্যো বিশালপুলিনান্তনিতম্ববিম্বা মন্দং প্রয়ান্তি সমদাঃ প্রমদা ইবাদ্য॥
ব্যোম কচিদ্রজতশঙ্খমৃণালগৌরৈস্ত্যক্তাম্বুভির্লঘুতয়া শতশঃ প্রয়াতৈঃ।
সংলক্ষ্যতে পবনবেগচলৈঃ পয়োদৈঃ রাজেব চামরবরৈরুপবীজ্যমানঃ॥”

প্রস্ফুট কমল-সদৃশ বদন-শোভা বিকাশ করিয়া, কাশকুসুম-রূপ বসনে সজ্জীভূত হইয়া, নববধূবেশে মধুরিমাময়ী শরৎসুন্দরী আসিতেছেন। মত্তমরাল-রবে যেন তাঁহার নূপুর-ধ্বনি সূচিত হইতেছে; পক্বশালি তাঁহার মনোহারিণী ক্ষীণা দেহ-লতার শোভাবর্দ্ধন করিয়াছে। ধরণী কাশ-কুসুমে বিভূষিতা, নিশি চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিতা, তটিনী মরালে শোভান্বিতা, সরোবর কুমুদ-কুসুমে সজ্জীকৃত। সপ্তচ্ছদ ফুলভারাবনত, বনপ্রান্ত ফুলদলে সুশোভিত, উপবন মালতী প্রভৃতি কুসুমে শুক্লীকৃত। প্রবাহিণী মদমত্তা কামিনীর ন্যায় মন্থর-গামিনী; চঞ্চলা শফরী-রূপা রসনা, প্রান্তস্থিত হংসমালারূপ হার, বিশাল সৈকতরূপ নিতম্ব, তাহার শোভাবর্দ্ধন করিয়াছে। নভোদেশ নৃপতির ন্যায় শোভমান। মেঘমালারূপ উৎকৃষ্ট চামর তাঁহাকে বিজন করিতেছে। সেই মেঘসমূহ আবার শঙ্খ-মৃণালের ন্যায় শ্বেত বর্ণ, জলবর্ষণ হেতু লঘুতাবশতঃ শতখণ্ডে ধাবমান এবং বায়ুবেগ দ্বারা চাঞ্চল্য-সম্পন্ন। এবম্প্রকারে শরতের বর্ণনা করিয়া কবি বলিয়াছেন,—“মর্দ্দিত কজ্জল-রাশি তুল্য মনোহর আকাশ-মণ্ডল, বন্ধুক-পুষ্প দ্বারা অরুণাভ ভূমি ও মনোহর কমলাবৃত বপ্রভূভাগ প্রভৃতির সমাবেশ পৃথিবীর কোন্ যুবকের মন উৎকণ্ঠিত না করে?” ‘এই সুন্দর শরতে যুবক-যুবতীর মন কখনও কি অচঞ্চল থাকিতে পারে? বসন্তের উপসংহারে এই ভাব আরও যেন বিশদ দেখি! “অতি রমণীয় সন্ধ্যাকাল, নির্ম্মল চন্দ্রকিরণ, পুংস্কোকিলের রব, সুগন্ধী বায়ু, মদমত্ত ভ্রমরগুঞ্জন এবং রাত্রিতে মদ্যপান প্রভৃতি ভোগবিলাস উদ্দীপন করে। এই সময়ে মনুষ্যগণ দিবায় বৃক্ষছায়া ও নিশায় চন্দ্রকিরণ ভালবাসে, সুখশীতল অট্টালিকায় শয়ন করে এবং শীতল বলিয়া কান্তাকে গাঢ় আলিঙ্গন করে।” কোনও কোনও সংস্করণে ঋতু-সংহারের উপসংহার অন্যরূপ। তদনুসারে অষ্টাবিংশতি শ্লোকে বসন্ত-বর্ণন সম্পূর্ণ। কিন্তু সাধারণতঃ আমরা

অষ্টাত্রিংশ শ্লোকে বসন্ত-বর্ণনের পরিসমাপ্তি দেখি। প্রথমোক্ত সংস্করণের শেষ শ্লোক,—

"আম্রীমঞ্জুলমঞ্জরীবরশরঃ সৎকিংশুকং যদ্ধনু-
র্জ্যায়স্যালিকুলং কলঙ্করহিতং ছত্রং সিতাংশুঃ সিতম্।
মত্তেভো মলয়ানিলঃ পরভৃতো যদ্বন্দিনো লোকজিৎ
সোঽয়ং বো বিচরীতুচৈব বিতনুর্ভদ্রং বসন্তান্বিতঃ॥"

এ শ্লোকটীও বসন্ত-বর্ণনার অঙ্গবিশেষ। অপিচ, এই শ্লোকে কবি মঙ্গল-প্রার্থনা করিয়াছেন। শ্লোকে কবি বলিতেছেন,—'মনোহর আম্র-মুকুলরূপ শর, কিংশুক পুষ্পরূপ ধনু, অলিকুলরূপ উৎকৃষ্ট ধনুর্গুণ, চন্দ্ররূপ শ্বেত ছত্র, মলয়-বায়ুরূপ মত্ত গজ এবং কোকিলকুলরূপ বন্দিগণকে লইয়া নিজ সহচর বসন্তেব সহিত কামদেব তোমাদের মঙ্গল বিধান করুন।' এক হিসাবে এই শ্লোককেই শেষ শ্লোক বলা যাইতে পারে; কারণ, অন্যান্য ঋতুর নিকটও এই ভাবেরই প্রার্থনা আছে। সেই জন্য বসন্তবর্ণনাব শেষ আটটি শ্লোক কেহ কেহ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন। মেঘদূত ও ঋতুসংহার ভিন্ন কালিদাসের 'পুষ্পবাণবিলাস', 'শ্রুতবোধ', 'দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা' প্রভৃতিও এক হিসাবে খণ্ড-কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। 'দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা'—গদ্যে লিখিত আছে বটে; কিন্তু উহার মধ্যে যে নীতি-বাক্যগুলি আছে, তাহা কবিত্বের, উপমার ও উপদেশের উৎসস্বরূপ। পঞ্চতন্ত্রে যেরূপ নীতি-উপদেশ আছে, উহার নীতিবাক্যগুলি প্রায় তদনুরূপ। চাণক্যের সংগৃহীত এবং অগ্নিপুরাণের অন্তর্গত নীতিবাক্য-সমূহ দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকায় দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, কুমার-সম্ভব প্রভৃতিতেও যে সকল উপমা ও নীতিবাক্য দেখিতে পাইয়াছি, তাহারও কতকগুলি দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকায় দৃষ্ট হয়। সংহিতার কতকগুলি শ্লোক ও নীতিবাক্য এতন্মধ্যে স্থান পাইয়াছে। এ সকল দেখিয়া, দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা রঘুবংশ-রচয়িতা কালিদাসের রচনা কিনা, তদ্বিষয়ে অনেকেই সংশয়ান্বিত। যাহা হউক, যেথান হইতেই সংগৃহীত হউক, ঐ নীতিকথাগুলি যে চিরদিনই মূল্যবান, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। প্রথমেই বলা হইয়াছে,—"যজ্জীব্যতে যশোধর্ম্মসহিতং তদ্ধি জীবিতঃ"; অর্থাৎ,—'যশ ও ধর্ম্মের সহিত যিনি জীবিত থাকিতে পারেন, তাঁহার জীবন-ধারণই সার্থক। যাহারা আপন ভরণ-পোষণ-ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিয়া কেবল নিজেদের মাত্র উদর পূরণ করে, তাহারা ক্ষুদ্র ও নীচাশয়; এরূপ ব্যক্তি সহস্র সহস্র বিদ্যমান্ আছে। কিন্তু পরার্থই যাহার স্বার্থ, সেরূপ সজ্জনাগ্রগণ্য পুরুষ এক একটি মাত্র। দেখ, বাড়বানল আপন দুষ্পূরণীয় উদর পূরণার্থ সমুদ্র পান করিয়া তৃপ্ত হয় না; আবার মেঘ নিদাঘসন্তপ্ত বিনষ্টপ্রায় জগতের তাপ-শান্তির নিমিত্ত সমুদ্র-বারি পান করিয়া থাকে।' এইরূপ নীতিশিক্ষায় নীতি-উপদেশে গ্রন্থের আরম্ভ। এখানেও বুঝা যায় না যে, কবির রচনায় অন্যের ছায়াপাত ঘটিয়াছে। কিন্তু ইহার পর যখন গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে দেখিতে পাই, নীতিসার ও অন্যান্য নীতিগ্রন্থ হইতে,—

দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকায় নীতিকথা।

"নদীনাঞ্চ নখীনাঞ্চ শৃঙ্গিনাং শস্ত্রপাণিনাম্। বিশ্বাস নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ॥
ক্ষণং তুষ্টাঃ ক্ষণং রুষ্টা ন তুষ্টাচ ক্ষণে ক্ষণে। অব্যবস্থিতচিত্তানাং প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ॥
সহসা বিদধিত ন ক্রিয়ামবিবেকঃ পরমা পদং পদম্। বৃণতেহি বিমৃষ্যকারিণং গুণলুব্ধাঃ স্বয়মেব সম্পদঃ॥

মন্ত্রে তীর্থে দ্বিজে দেবে দৈবজ্ঞে ভোজনে গুরৌ। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী॥

অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাম্। উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥

উদ্যমঃ সাহসং ধৈর্য্যং শক্তির্বুদ্ধিঃ পরাক্রমঃ। ষড়েতে যস্য তিষ্ঠন্তি তস্য দেবোঽপি শঙ্কতে॥

গতশোকো ন কর্ত্তব্য ভাবিনং নৈব চিন্তয়েৎ। বর্ত্তমানেষু কার্য্যেষু চিন্তয়ন্তি বিচক্ষণাঃ॥

ভবিতব্যং ভবত্যেব নারিকেলফলাম্বুবৎ। গন্তব্যং গতমিত্যাহুর্গজভুক্তকপিত্থবৎ॥

উদয়তি যদি ভানু পশ্চিমে দিগ্বিভাগে প্রচলতি যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বহ্নিঃ।
বিকশতি যদি পদ্মং পর্ব্বতাগ্রে শিলায়াং ন ভবতি পুনরন্যৎ ভাষণং সজ্জনানাং॥

যথা চিত্তং তথাবাক্যং যথাবাক্যং তথা ক্রিয়া। চিত্তে বাচি ক্রিয়ায়াঞ্চ সাধূনামেকরূপতা॥"

প্রভৃতি শ্লোক দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া আছে; তখন মনে সংশয় আসে বৈ কি! বিশেষতঃ, স্মৃতিশাস্ত্রের সহমরণ-সংক্রান্ত শ্লোক কয়টী অবিকল উদ্ধৃত হওয়ায় সংশয় আরও দৃঢ়ীভূত হয়। তবে ঐ ভাবের রচনা কালিদাসের নাটকাদিতে বহুত্র দেখিত পাওয়া যায়। কথায় কথায় উপমার অবতারণা তাঁহার প্রতি নাটকেই প্রত্যক্ষীভূত। সে উপমাগুলি যে তাঁহার নিজস্ব, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কুমারসম্ভবে রতিবিলাপে একটি শ্লোক আছে। কৌমুদী শশীর সহিত এবং তড়িৎ মেঘের সহিত যেরূপ মিলিত হয়, পতিপরায়ণা সাধ্বীগণও সেইরূপ পতির অনুগামিনী হইয়া থাকেন। (৩০৩ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকায় সহমরণের প্রসঙ্গে তাহারই পুনরুক্তি দেখিতে পাই। তবেই বুঝা যায়, এ গ্রন্থের উপমা-মূলক শ্লোকগুলি গ্রন্থান্তর হইতে সঙ্কলিত হইয়াছিল।

খণ্ড-কাব্য-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পৎ—ভর্ত্তৃহরির শতকগ্রন্থ সমূহ। তাঁহার অমরশতক, সূর্য্য-শতক, শৃঙ্গারশতক, শান্তিশতক, নীতিশতক, বৈরাগ্যশতক প্রভৃতি এক একখানি অমূল্য রত্ন। শত শ্লোকে গ্রথিত বলিয়া ঐ সকল গ্রন্থ শতক নামে অভিহিত। প্রতি শতকেই ভাবের উৎস, ভাষার ঝঙ্কার, কবিত্বের নির্ঝর সমভাবে প্রবহমান। 'শৃঙ্গার-তিলক' নামক ভর্ত্তৃহরি-প্রণীত প্রণয়-ঘটিত আর এক-খণ্ড-কাব্য আছে। কাহারও কাহারও মতে, উহা কালিদাসের রচিত। কিন্তু সাধারণতঃ উহা ভর্ত্তৃহরির রচনা বলিয়া প্রচারিত। এইরূপ ভর্ত্তৃহরির নামের সহিত আরও যে বহু গ্রন্থের সম্বন্ধ আছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যদি একমাত্র ভর্ত্তৃহরিই ঐ সকল গ্রন্থের প্রণেতা হন, তাহা হইলে ভর্ত্তৃহরি একাধারে কবি, মহাকবি, দার্শনিক ও বৈয়াকরণ ছিলেন। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ এই মতেরই পরিপোষক। তাঁহারা বলেন,—'একাধারে এতাধিক শক্তির সমাবেশ একমাত্র ভারতবর্ষেই সম্ভবপর; আবার ভারতেও ভর্ত্তৃহরির দ্বিতীয় নাই।' আমরা অবশ্য সর্ব্বথা এ উক্তির অনুমোদন করি না। ভারতবর্ষেই একাধারে সকল শক্তির সমাবেশ সম্ভবপর সত্য; কিন্তু এক ভর্ত্তৃহরিতেই যে সকল শক্তির সমন্বয়

ভর্ত্তৃহরি।

পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ একজন ভর্ত্তৃহরিরই অস্তিত্ব মানিয়া লন। খণ্ড-কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে ম্যাকডোনাল্ড তাই লিখিয়াছেন,—"The most eminent of these authors is Bhartrihari, grammarian, philosopher and poet in one. Only the literary training of India could make such a combination possible, and even there it has hardly a parallel."

ঘটিয়াছিল, তাহা নহে,—ভারতের বহু কবি-দার্শনিকই একাধারে বহু শক্তির বহুগুণের আধার ছিলেন। দৃষ্টান্ত কি আর দেখাইব? এক কালিদাসেই সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার বিকাশ দেখিতে পাই। শতক-গ্রন্থাদি প্রণেতা ভর্ত্তৃহরি যদি স্বতন্ত্র ভর্ত্তৃহরিও হন, ভট্টিকাব্য বা পাতঞ্জল-ভাষ্যের কারিকা প্রভৃতি যদিও তাঁহার রচিত না হয়, অথবা তন্মাধ্যের অন্য ব্যক্তির রচনা বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইলেও কয়েক খণ্ড ক্ষুদ্র শতক গ্রন্থেই তাঁহার যশঃ-জ্যোতি চিরসমুজ্জ্বল থাকিয়া যাইবে। ভর্ত্তৃহরি—বিক্রমাদিত্যের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বলিয়া পরিচিত। স্ত্রীর চরিত্রে সন্দিহান হইয়া তিনি সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। যে স্ত্রী তাঁহার নয়নের মণি-স্বরূপিণী ছিলেন, যাঁহার সৌন্দর্য্যের মধ্যে তিনি জগতের সকল সৌন্দর্য্য একাধারে দেখিতে পাইতেন; সেই স্ত্রীর চরিত্র যখন তাঁহার সন্দেহের বিষয় হইল, তখন তিনি তাহারই রূপের মধ্যে যত কিছু কদর্য্য কুভাব—অনিষ্টের উপাদান দেখিতে পাইলেন। তাঁহার এই শতক-গ্রন্থে দুই দিকের দুই চিত্র কি সুন্দর পরিস্ফুট! যখন তিনি প্রণয়িনীর রূপ-মোহে মুগ্ধ, তখন তিনি বলিতেছেন,—'প্রদীপের আলোক আলোক নহে; সূর্য্য-চন্দ্র-তারকার রশ্মিও তেমন আনন্দপ্রদ নহে; যে আলোক যে আনন্দ সেই সুন্দরীর নয়নে প্রতিভাত দেখি। সেই কুরঙ্গ-নয়নের দীপ্তি ভিন্ন আমার নিকট পৃথিবী অন্ধকারময়।' কিন্তু যখন তিনি প্রণয়িনীর প্রণয়ে সন্দিহান, তাঁহার প্রতি বীতস্পৃহ, তখন আবার বলিতেছেন,—'রমণীর রূপ ভীষণ অরণ্য। প্রাণিহন্তা দুরন্ত দস্যু প্রাণহনন জন্য সেখানে প্রতীক্ষা করিতেছে।' অন্যত্র আবার বলিয়াছেন,—'পৃথিবীরূপ সমুদ্রে রমণীরূপ বড়শি নিক্ষেপ করিয়া কামদেব বসিয়া আছেন। মনুষ্য-রূপী প্রলুব্ধ মৎস্য রমণীর বিম্বাধর রূপ চার ভক্ষণ করিতে ছুটিয়াছে। ফলে, প্রেম-বহ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া তাহাদিগকে দগ্ধীভূত হইতে হইয়াছে।' ভর্ত্তৃহরির 'বৈরাগ্য-শতক' সংসারের মায়া-বন্ধন ছিন্ন করিবার পক্ষে অমোঘ অস্ত্র। এই ভীষণ সংসার-মহারণ্যে কেমন করিয়া মানুষ আত্মরক্ষায় সমর্থ হইবে, শতকের প্রতি শ্লোকে মায়ামুগ্ধ জীবের প্রতি সেই উপদেশ। কয়টী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যথা,—

"চূড়োত্তংসিতচন্দ্রচারুকলিকাচঞ্চচ্ছিখাভাস্বরো
লীলাদগ্ধবিলোলকামশলভঃ শ্রেয়োদশাগ্রে স্ফুরন্।
অন্তঃস্ফূর্জ্জদপারমোহতিমিরপ্রাগ্‌ভারমুচ্চাটয়ং-
শ্চেতঃসদ্মনি যোগিনাং বিজয়তে জ্ঞানপ্রদীপো হরঃ ॥ ১ ॥
ভ্রান্তং দেশমনেকদুর্গবিষমং প্রাপ্তং ন কিঞ্চিৎফলং
ত্যক্ত্বা জাতিকুলাভিমানমুচিতং সেবা কৃতা নিষ্ফলা।
ভুক্তং মানবিবর্জ্জিতং পরগৃহেষ্বাশঙ্কয়া কাকবৎ
তৃষ্ণে জৃম্ভসি পাপকর্ম্মপিশুনে নাদ্যাপি সন্তুষ্যসি ॥২॥
উৎখাতং নিধিশঙ্কয়া ক্ষিতিতলং ধ্মাতা গিরের্ধাতবো
নিস্তীর্ণঃ সরিতাংপতির্নৃপতয়ো যত্নেন সন্তোষিতাঃ।
মন্ত্রারাধনতৎপরেণ মনসা নীতাঃ শ্মশানে নিশাঃ
প্রাপ্তঃ কাণবরাটকোঽপি ন ময়া তৃষ্ণে সকামা ভব ॥ ৩ ॥

স্খলালাপাঃ সোঢ়াঃ কথমপি তদারাধনপরৈ-
নির্গৃহ্যান্তর্বাষ্পং হসিতমপি শূন্যেন মনসা।
কৃতো বিত্তস্তম্ভপ্রতিহতধিয়ামঞ্জলিরপি
ত্বমাশে মোঘাশে কিমপরমতো নর্ত্তয়সি মাম্॥ ৪॥
অমীষাং প্রাণানাং তুলিতবিসিনীপত্রপয়সাং
কৃতে কিং নাস্মাভির্বিগলিতবিবেকৈর্ব্যবসিতম্।
যদাঢ্যানামগ্রে দ্রবিণমদনিঃসঙ্গমনসাং
কৃতং মানব্রীড়ৈর্নিজগুণকথাপাতকমপি॥ ৫॥
ক্ষান্তং ন ক্ষময়া গৃহোচিতসুখং ত্যক্তং ন সন্তোষতঃ
সোঢ়া দুঃসহশীতবাদোতপনক্লেশা ন তপ্তং তপঃ।
ধ্যাতং বিত্তমহর্নিশং নিয়মিত প্রাণৈর্ণ শম্ভো পদং
তত্তৎকর্ম্ম কৃতং যদেব মুনিভিস্তৈস্তৈঃফলৈর্বঞ্চিতাঃ॥ ৬॥
ভোগা ন ভুক্তা বয়মেব ভুক্তাস্তপো ন তপ্তং বয়মেব তপ্তাঃ।
কালো ন যাতো বয়মেব যাতাস্তৃষ্ণা ন জীর্ণা বয়মেবজীর্ণাঃ॥ ৭॥
বলীভির্মুখমাক্রান্তং পলিতেনাঙ্কিতং শিরঃ।
গাত্রাণি শিথিলায়ন্তে তৃষ্ণৈকাতরুণায়তে॥ ৮॥
নিবৃত্তা ভোগেচ্ছা পুরুষবহুমানোঽপি গলিতঃ
সমানাঃ স্বর্যাতাঃ সপদিসুহৃদো জীবিতসমাঃ।
শনৈর্যষ্ট্যুত্থানং ঘনতিমিররুদ্ধে চ নয়নে
অহোমূঢ়ঃকায়স্তদপি মরণাপায়চকিতঃ॥ ৯॥
আশা নাম নদী মনোরথজলা তৃষ্ণা তরঙ্গাকুলা
রাগগ্রাহবতী বিতর্কবিহগা ধৈর্য্যদ্রুমধ্বংসিনী।
মোহাবর্ত্তসুদুস্তরাতিগহনাপ্রোত্তুঙ্গ চিন্তাতটী
তস্যাঃপারগতাবিশুদ্ধমনসোনন্দন্তিযোগীশ্বরাঃ॥ ১০॥”

প্রথম শ্লোকে মঙ্গলাচরণে কবি মহাদেবের জয়োচ্চারণ করিতেছেন। যোগিগণের হৃদয়-মন্দিরে যিনি জ্ঞানালোকরূপে মূর্ত্তিমান্, সূর্যোদয়ে নৈশ-অন্ধকার দূরীকরণের ন্যায় যিনি মনুষ্যের অন্তরের অনন্ত অজ্ঞান-অন্ধকার দূরীভূত করেন, যিনি ক্রীড়ার ছলে অবহেলায় পতঙ্গের ন্যায় কামকে ভস্মীভূত করেন, যিনি সকল মঙ্গলের ও সকল সম্পদের বিধানকর্ত্তা, অর্দ্ধপ্রস্ফুট কুসুম-কোরকের ন্যায় জ্যোতিষ্মান চঞ্চল রশ্মিমালায় যাঁহার শিরোভূষণ সুশোভিত, সেই দেবাদিদেব মহাদেব মঙ্গলবিধান করুন। ১॥ কত দুরধিগম্য বিপদসঙ্কুল স্থান পরিভ্রমণ করিলাম; কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করিতে পারিলাম না! বংশগৌরব পদমর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিয়া বৃথাই আমি ধনবানের সেবা করিলাম! ফলপ্রাপ্তির আশায় আত্ম-মর্যাদা বিসর্জ্জন দিয়া পরের দ্বারে প্রার্থী হইয়া কাকের ন্যায় উদরপূরণ করিয়া বেড়াইলাম; কিন্তু কি ফললাভ হইল! মন্দকর্ম্মপ্রবর্ত্তনকারিণী কামনা!—তোমার তৃপ্তি-সাধনে এখনও সমর্থ হইলাম না; বরং

দিন দিনই উৎকট লালসা পরিবর্দ্ধমানা। ২॥ রত্ন-অন্বেষণে ক্ষিতিতল খনন করিলাম; ধাতুর সন্ধানে গিরি-গাত্র বিদীর্ণ করিয়া দেখিলাম, সমুদ্র উলঙ্ঘন করিয়া রাজানুগ্রহ লাভের জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা পাইলাম; পূজামন্ত্রে অন্তর পূর্ণ করিয়া হোমাগ্নি-পার্শ্বে রাত্রি অতিবাহিত কবিলাম; কিন্তু হে কামনা!—তোমার তৃপ্তিসাধন পক্ষে কপর্দ্দক-কণাও প্রাপ্ত হইলাম না! ৩॥ ক্রূরমনা ধনবানগণের দ্বারে ক্রীতদাসের ন্যায় দিনযাপন করিলাম; তাঁহাদের জঘন্য আচরণ এবং কটু-কাটব্য অবহেলায় সহ্য করিলাম; মর্ম্মন্তুদ যাতনায় অন্তর-বিনিঃসৃত অশ্রুধারা লুকাইয়া রাখিয়া কাষ্ঠহাসি হাসিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলাম; ধনৈশ্বর্য্য-প্রমত্ত কলুষিত-চিত্ত দুরাত্মার প্রতি সম্মানের একশেষ প্রদর্শন করিলাম; কিন্তু হে চির-অতৃপ্ত কামনা!—তোমার তৃপ্তির পক্ষে কিছুই করিতে পারিলাম না! ৪॥ পদ্মপত্রস্থিত জল-বিম্ববৎ এই যে ক্ষণভঙ্গুর প্রাণ, ইহার জন্য বিবেককে বলিদান দিয়া কি না অপকর্ম্ম করিলাম! ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত ধনীর সমক্ষে আত্ম-প্রাধান্য খ্যাপনের জন্য নির্লজ্জের ন্যায় আত্মহত্যা-তুল্য কি আত্মপ্রশংসাই না করিলাম! ৫॥ ক্ষমা করিয়াছি বটে; কিন্তু ক্ষমার জন্য ক্ষমা করি নাই; অন্যায়াচরণের প্রতিকার পক্ষে অসামর্থ্য হেতুই ক্ষমা করিয়াছি। গার্হস্থ্য সুখ পরিবর্জ্জন করিয়াছি বটে; কিন্তু সন্তোগান্তে সন্তোষের সহিত নহে,—শুধুই ধন অন্বেষণে! শীত, গ্রীষ্ম, বাতাতপ সহ্য করিয়াছি বটে; কিন্তু ধর্ম্ম-কর্ম্মের বিধি-নিয়ম পালনের জন্য নহে। অর্থের অনুসন্ধানে দিবারাত্রি প্রাণসমর্পণ করিয়া ফিরিয়াছি বটে; কিন্তু মহাদেবের চরণে কখনও আত্ম-সমর্পণ করিতে পারি নাই। ৬॥ পার্থিব সুখভোগ হইল না বটে; কিন্তু ভোগের অবধি নাই। ধর্ম্মানুষ্ঠানে তপশ্চারণ করিলাম না বটে; কিন্তু উদ্বেগে দুঃখে প্রতপ্ত হইলাম। কাল গত হইল না, কাল অনন্ত; কিন্তু আমি গত হইতে (মৃত্যুমুখে পতিত হইতে) চলিলাম! তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইল না; কিন্তু আমি জীর্ণ ধ্বংস হইতে চলিলাম! ৭॥ বদন বিলুলিত, মস্তক পলিতকেশ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিলতা-প্রাপ্ত; কিন্তু তৃষ্ণা দিনদিনই বৃদ্ধি পাইতেছে! ৮॥ যাহারা জীবনের সঙ্গী ছিল,—প্রাণপ্রিয় ছিল, তাহারা সব একে একে চলিয়া গেল; সম্মানলাভের ক্ষমতা লোপ পাইতে চলিল, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিল; শরীর যথেচ্ছচালিত হইতে অসমর্থ হইয়া পড়িল; কিন্তু কি নির্ব্বুদ্ধিতা!—শরীর এখনও মৃত্যুভয়ে মুহ্যমান হইতেছে! ৯॥ আশারূপ নদীপ্রবাহে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষারূপ অনন্ত জলস্রোত প্রবাহিত হইতেছে; তৃষ্ণারূপ তরঙ্গে সে নদী বিচঞ্চল; অনুরাগরূপ হিংস্র জন্তুতে সে নদী পরিপূর্ণ; বিতর্করূপ জলচর পক্ষিগণ তাহাকে ঘেরিয়া আছে; আর সেই তরঙ্গে তীরভঙ্গে তীরদেশস্থিত ধৈর্য্যরূপ তরুসকল সমূলে উৎপাটিত হইতেছে। অজ্ঞানরূপ ঘূর্ণাবর্ত্তহেতু এ নদীতে গতিবিধি সঙ্কট-সমাকুল। নদীগর্ভ গভীরতাপূর্ণ; উত্তুঙ্গ চিন্তাতট দুরবগাহ; কেবল বিশুদ্ধ-চিত্ত যোগিগণই এই দুস্তর নদী অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হন। ১০॥ শতকের প্রতি শ্লোকই এইরূপ বৈরাগ্যভাবোদ্দীপক তত্ত্বকথায় পরিপূর্ণ। তবে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত শতক-গ্রন্থ সমূহের পাঠ লইয়া আলোচনা করিলে বড়ই-সমস্যায় পড়িতে হয়। বাঙ্গালা-দেশে একরূপ পাঠ, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে একরূপ পাঠ, দাক্ষিণাত্যে একরূপ পাঠ, বোম্বাই-প্রদেশে একরূপ পাঠ। উপরে বৈরাগ্য-শতকের যেটী

প্রথম শ্লোক বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে, বোম্বাই-প্রদেশে প্রচলিত সংস্করণে উহার পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত শ্লোকটী নীতিশতকে ও বৈরাগ্য-শতকে—উভয় শতকেই দেখিতে পাই।

"দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্নানন্তচিন্মাত্রমূর্ত্তয়ে।
স্বানুভূত্যেকসারায় নমঃ শান্তায় তেজসে॥"

পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকে দেবাদিদেব মহাদেবকে সম্বোধন করা হইয়াছে। কিন্তু এই শ্লোকে অনাদি অনন্ত চিন্ময়কে আহ্বান করা হইতেছে। দ্বিবিধ সংস্করণের এই দুই প্রকার প্রারম্ভে কবি শৈবমতাবলম্বী ছিলেন, কি অদ্বৈতবাদী ছিলেন,—তদ্বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হয়। প্রথমোক্ত শ্লোকটী (চূড়োত্তংসিত ইত্যাদি শ্লোক) যদিও ভর্ত্তৃহরির রচনার মধ্যেই স্থান পাইয়া আছে; কিন্তু উহা শতকাতিরিক্ত বিবিধ শ্লোকের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এ ভিন্ন আরও এক অভিনব সমস্যার বিষয় আছে। বৈরাগ্য-শতক, নীতিশতক প্রভৃতিতে যে সকল শ্লোক দেখিতে পাই, ঐ সকল শ্লোকের অনেক শ্লোক অন্যান্য প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া আছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ নিম্নে চারিটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি,—

"ভবন্তি নম্রাস্তরবঃ ফলোদ্গমৈর্নবাম্বুভির্দূরবিলম্বিনো ঘনাঃ।
অনুদ্ধতাঃ সৎপুরুষাঃ সমৃদ্ধিভিঃ স্বভাব এবৈষ পরোপকারিণাম্॥ ১॥
প্রারভ্যতে ন খলু বিঘ্নভয়েন নীচৈঃ প্রারভ্য বিঘ্নবিহতা বিরমন্তি মধ্যাঃ।
বিঘ্নৈঃ পুনঃপুনরপি প্রতিহন্যমানাঃ প্রারভ্য চোত্তমজনা ন পরিত্যজন্তি॥ ২॥
কিং কূর্ম্মস্য ভরব্যথা ন বপুষি ক্ষ্মাং ন ক্ষিপত্যেষ যৎ
কিং বা নাস্তি পরিশ্রমো দিনপতেরাস্তে ন যন্নিশ্চলঃ।
কিংচাঙ্গীকৃতমুৎসৃজন্ মনসা শ্লাঘ্যো জনো লজ্জতে
নির্ব্বাহঃ প্রতিপন্নবস্তুষু সতামেতদ্ধি গোত্রব্রতম্॥ ৩॥
এতা হসন্তি চ রুদন্তি চ কার্য্যহেতোর্বিশ্বাসয়ন্তি চ পরং ন চ বিশ্বসন্তি।
তস্মান্নরেণ সুশীলসমন্বিতেন নার্য্যঃ শ্মশানঘটিকা ইব বর্জনীয়াঃ॥ ৪॥

উল্লিখিত শ্লোক-চতুষ্টয়ের প্রথমটী কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকে, দ্বিতীয়টী ও তৃতীয়টী বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষসে' এবং চতুর্থটী শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিকে' অবিকল দৃষ্ট হয়। এবম্বিধ সাদৃশ্যের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া পণ্ডিতগণ বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হন। কেহ বলেন,—ঐ শ্লোকগুলি নীতিবাক্যরূপে আবহমানকাল সংসারে চলিয়া আসিতেছে। অধুনা যেমন চাণক্যের বা হিতোপদেশের নীতি-সূত্রগুলি আধুনিক সাহিত্যিক-গণ আপনাদের রচনার মধ্যে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া থাকেন, ঐ শ্লোকগুলিও কালিদাস প্রমুখ কবিগণ সেইভাবে আপন-আপন গ্রন্থ মধ্যে সঙ্কলন করিয়া থাকিবেন। ঐ সকল প্রতিভাবান্ মহাকবি আপনাদের রচনার মধ্যে অপরের রচনা গ্রহণ করিয়া সাহিত্য-সংসারে যে চৌর্য্য-বিদ্যার আদর্শ রাখিয়া যাইবেন, তাহা কখনই মনে করা যায় না। সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপ সিদ্ধান্তই এ বিষয়ে এক হিসাবে সমীচীন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। অন্য হিসাবে, ভর্ত্তৃহরির কৃতিত্বের অপলাপ করিতে হয়। বলিতে হয়,—ভর্ত্তৃহরি কেবল সংগ্রহকর্ত্তা ছিলেন, তিনি শ্লোকগুলির রচয়িতা ছিলেন না। ভর্ত্তৃহরির ন্যায় কবি, বৈয়াকরণ ও দার্শনিকের সম্বন্ধে

এবম্বিধ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও সমীচীন বলিয়া মনে করি না। তবে কি বলিয়া এ সমস্তার মীমাংসা করা যাইতে পারে? এক মীমাংসা—এক সিদ্ধান্ত—ভর্তৃহরির রচনার মধ্যে পরবর্ত্তিকালে লিপিকারগণ অন্তের রচনা সংযোজন করিয়া রাখিয়াছেন। শতক নামে প্রচারিত তাঁহার নীতি-শতকের ও বৈরাগ্য-শতকের সঙ্গে পরিশিষ্ট-রূপে বিবিধ শ্লোকাবলী সংগৃহীত হইয়া থাকে। তাহাতে এক এক শতকের মধ্যে প্রায় দেড় শত শ্লোক স্থান পাইয়াছে, দেখিতে পাই। এইরূপে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে; তাই সত্য-তত্ত্ব-নিরূপণে সংশয় উপস্থিত হয়। ভর্তৃহরির জন্ম, সম্বন্ধ-তত্ত্ব ও সংসার-ত্যাগ প্রভৃতি বিষয়ে নানা উপাখ্যান প্রচলিত আছে। তাঁহার গৃহত্যাগের বিবরণ সর্ব্বাপেক্ষা কৌতুকপ্রদ। নীতিশতকের দ্বিতীয় শ্লোকে তাঁহার গৃহ-ত্যাগের কারণ অনেকটা অনুভব করিতে পারা যায়; সেই শ্লোকটী এই,—

"যাং চিন্তয়ামি সততং ময়ি সা বিরক্তা সাপ্যন্যমিচ্ছতি জনং স জনোঽন্যসক্তঃ।
তস্মৎকৃতে চ পরিতুষ্যতি কাচিদন্যাধিক্তাং চ তং চ মদনং চ ইমাং চ মাং চ॥"

ভর্তৃহরি যখন রাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত, একজন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে একটী ফল প্রদান করিয়াছিলেন। † সেই ফল ভক্ষণ করিলে অমরত্ব লাভ হয়। ভর্তৃহরি সেই ফলটী আপন প্রাণস্বরূপিণী প্রণয়িনীকে ভক্ষণ করিতে দেন। প্রণয়িনী চরিত্রহীনা ছিলেন; তিনি সেই ফলটী আপনার উপপতিকে প্রদান করেন। সেই উপপতির আর এক প্রণয়-পাত্রী ছিল; সে আবার তাহাকে সেই ফলটী খাইতে দেয়। শেষোক্তা রমণীর নিকট হইতে ফলটী পুনরায় ভর্তৃহরির নিকট আসিয়া পৌঁছে। তখন সন্ধান লইয়া তিনি সকল রহস্য অবগত হন। সংসারে বিতৃষ্ণা জন্মে; প্রণয়িনী সহধর্ম্মিণীর আর মুখদর্শন করিতে প্রবৃত্তি হয় না। সেই উপলক্ষেই শ্লোকটী তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল;—সেই উপলক্ষেই তিনি গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন। ভর্তৃহরি, ভট্টি ও ভর্তৃমেন্থ প্রভৃতি সংজ্ঞা লইয়া অনেক সময় অনেক বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছে। কেহ বলিয়াছেন,—ভর্তৃহরি ঐ তিন নামেই অভিহিত হইতেন। কোনও কোনও মতে প্রকাশ,—উহারা তিন জন স্বতন্ত্র ব্যক্তি এবং ভর্তৃহরি নামে দুই জন গ্রন্থকার বিদ্যমান ছিলেন। বিভিন্ন বিক্রমাদিত্য, বিভিন্ন ভর্তৃহরি প্রভৃতির বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া একের স্কন্ধে অপরের পল্লব আসিয়া সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে। দুই একটী মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। একজন গ্রন্থকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—চন্দ্রগুপ্ত নামক এক ব্রাহ্মণের চারি স্ত্রী ছিল। সেই স্ত্রী-চতুষ্টয়ের নাম—ব্রাহ্মণী, ভানুমতী, ভাগ্যবতী,

---

রজার নামক একজন খৃষ্টান মিশনরী ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে কর্ণাট প্রদেশে আসিয়া বাস করেন। তিনি ভর্তৃহরির শতক রচনা সম্বন্ধে একটা যদৃচ্ছা মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। রজার বলেন,—'ভর্তৃহরির তিন শত স্ত্রী ছিল, আর ভর্তৃহরি বড়ই উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন। সেই জন্ম তাঁহার পিতা তাঁহাকে গুরুতররূপে ভর্ৎসনা করেন। সেই উপলক্ষে মনে বৈরাগ্য উপস্থিত হওয়ায় ভর্তৃহরি স্ত্রীদিগকে পরিত্যাগ করেন এবং ঐ সকল শ্লোক সংগ্রহ করিয়া বিবেক-বৈরাগ্যমূলক শতক-গ্রন্থাবলী গ্রথিত করিয়া যান। শ্লোকগুলি তাঁহার রচিত নহে; উহা প্রাচীন গ্রন্থকারগণের গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। *Vide,* Bohlen's *Prefactio.*

† মতান্তরে প্রকাশ,—ফলটী প্রথমে বিক্রমাদিত্য পাইয়াছিলেন। তিনি এক ব্রাহ্মণকে উহা দান করেন। প্রকৃতিপুঞ্জের পালনকর্ত্তা ভর্তৃহরির স্তায় গুণী-জ্ঞানী নৃপতির অমরত্ব-লাভই বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া, ব্রাহ্মণ সেই ফলটী ভর্তৃহরিকে দিয়াছিলেন। তার পর ফল পূর্ব্বোক্তরূপে হস্তান্তরিত হয়।

সিন্ধুমতী। চারি স্ত্রীর চারিটী পুত্র-সন্তান জন্মে। প্রথমা ব্রাহ্মণীর গর্ভে বররুচির, দ্বিতীয়া ক্ষত্রিয়া ভানুমতীর গর্ভে বিক্রমার্কের, তৃতীয়া বৈশ্যা ভাগ্যবতীর গর্ভে ভট্টির এবং চতুর্থা শূদ্রা সিন্ধুমতীর গর্ভে ভর্ত্তৃহরির জন্ম হয়। বিক্রম রাজা হইয়াছিলেন; ভট্টি মন্ত্রিত্ব-পদ লাভ করিয়াছিলেন।* এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া কেহ কেহ রাজা চন্দ্রগুপ্তকে উঁহাদের পিতা বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছেন।† আর একজন পণ্ডিত আবার ভট্টিকে ভর্ত্তৃহরির পুত্র বলিয়া স্থির করিয়া লইয়ছেন।‡ কিন্তু ভর্ত্তৃহরির ও বিক্রমাদিত্যের সম্বন্ধ সম্বন্ধে যে মত সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধিসম্পন্ন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি।†† প্রাচীন উজ্জয়িনী নগরীর ভগ্নাবশেষ মধ্যে 'ভর্ত্তৃহরির গুম্ফ' নামে একটি পরিত্যক্ত গুহা প্রদর্শিত হয়। কথিত আছে, সেই গুহায় বসিয়া ভর্ত্তৃহরি তপস্যা করিয়াছিলেন; আর সেই গুহায় একটি সুরঙ্গ ছিল; সেই সুরঙ্গ দিয়া কাশীধামে পৌছান যাইত। ভগ্নপ্রায় একখণ্ড প্রস্তর কড়ির আকারে সেই গুহায় অবস্থিত ছিল এবং তদ্দ্বারা গুহার ছাদ রক্ষিত হইত। গুহার মধ্যস্থিত ছাদের নিম্ন দিয়া যে গহ্বর ছিল, এখন তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত; তবে লোকে এখনও তৎপ্রদর্শনে সুরঙ্গের কাহিনী কহিয়া থাকে। বিহার প্রদেশে গয়ার সন্নিকটেও এইরূপ এক গুহা প্রদর্শিত হয়। সে গুহার নাম—বরাবর গুহা। উহা ভর্ত্তৃহরির গুহা বলিয়াই অধিকতর প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। বরাবর গুহা সপ্ততল। সংসার-ত্যাগের পর, ভর্ত্তৃহরি ঐ গুহায় বসিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রচার আছে। এ সকল বিষয় বড়ই রহস্যপূর্ণ। প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের নামের সহিত সম্বন্ধ রক্ষায় অনেকেরই আকাঙ্ক্ষা হয়। কালিদাসের জন্মভূমি বলিয়া বিভিন্ন স্থানের কল্পনা এবং ভর্ত্তৃহরির সাধনা-ক্ষেত্র বলিয়া বিভিন্ন গিরি-গুহার উল্লেখ,—তদ্বিধা আকাঙ্ক্ষারই ফল। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য যে বেদান্ত-মত প্রচার করিয়া যান, ভর্ত্তৃহরির শতক-গ্রন্থে সে মতের আভাষ পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা বেশ প্রতিপন্ন হয়, অদ্বৈত-বাদ ভারতবর্ষে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা নহে; অতি প্রাচীনকাল হইতেই ঐ মত ভারতবর্ষে প্রচারিত ছিল। শঙ্করাচার্য্য তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া যান।

ভর্ত্তৃহরি ভিন্ন আর আর যে সকল কবি খণ্ডকাব্য-রচনায় প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ঘটকর্পর, বিহ্লণ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঘটকর্পর—বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের একতম রত্নমধ্যে পরিগণিত। 'ঘটকর্পর' নামে দ্বাবিংশ শ্লোকযুক্ত তাঁহার এক কবিতা-গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি উদ্ভট শ্লোক ঘটকর্পরের রচিত বলিয়া প্রচারিত আছে।

ঘটকর্পর।

কালিদাস 'কুমারসম্ভবে' লিখিয়াছেন,—অনেক গুণের মধ্যে একটীমাত্র দোষ থাকিলে,

---

* Mr. Sheshagiri Shastri in the *Indian Antiquary*, Vol. I., P. 314.

† *Vide*, Bohlen's *Praefactio*.

§ Dr. Bhau Daji in the *Journal of the Royal Asiatic Society*, Bombay Branch, January, 1862.

†† এই খণ্ডের ২৮০ম পৃষ্ঠায় এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ড দ্রষ্টব্য।

সে দোষ ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। উপমাস্বরূপ তিনি উল্লেখ করিয়াছেন,— 'চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণ-রাশির মধ্যে তাঁহার কলঙ্ক-দোষ স্বতঃই বিলীন হইয়া আছে। (শ্লোকটী এই খণ্ডের ৩০০ম পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে)। ঘটকর্পরের ইহা সহ্য হয় নাই। কালিদাসের এই উক্তির প্রতিবাদে তিনি একটী কবিতা লিখিয়াছেন। ঘটকর্পর বিরচিত সেই কবিতাটী এই,—

"একো হি দোষা গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোরীতি যো বভাষে।
নূনং ন দৃষ্টং কবিনাপি তেন দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশি ॥"

এই উত্তরে ঘটকর্পর কালিদাসকে বেশ একটু বিদ্রূপ করিয়াছেন; বলিয়াছেন,—যে কবি বহুগুণের মধ্যে একটী মাত্র দোষ থাকিলে, সে দোষ গুণের মধ্যে লোপ পাইয়া যায় বলিয়াছেন, সে কবির সূক্ষ্ম-দর্শন অতি কম। কারণ, তিনি জানেন না যে, একমাত্র দারিদ্র্য-দোষে সকল গুণ নষ্ট হইতে পারে। উত্তরটী বড়ই সমীচীন। ঘটকর্পরের এবং কালিদাসের মধ্যে বাদ-প্রতিবাদের এমন প্রসঙ্গ আরও অনেক আছে। পূর্ব্বে যে বিহ্লণ কবির নাম উল্লেখ করিয়াছি, কাশ্মীর-রাজ্যে তাঁহার বসতি ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার প্রধান খণ্ডকাব্য—'বিহ্লণ-পঞ্চাশিকা' বা 'চোরপঞ্চাশৎ'। ঐ গ্রন্থে পঞ্চাশটী শ্লোক আছে। সেই শ্লোকে তাঁহার প্রণয়িনীর বিষয় পরিবর্ণিত। কিংবদন্তী এই যে, তিনি গুর্জ্জরাধিপতি বীরসিংহের কন্যা চন্দ্রলেখার (মতান্তরে শশিলেখার) শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শিক্ষাদান-কালে চন্দ্রলেখার সহিত তাঁহার প্রণয় জন্মে। রাজা তাহা জানিতে পারেন। পণ্ডিতের এই ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা পণ্ডিত বিহ্লণের শিরশ্ছেদের আদেশ দেন। বধ্য-ভূমিতে উপস্থিত হইয়া বিহ্লণ ঐ পঞ্চাশটি কবিতার দ্বারা আপনার মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ইহাতে বিহ্লণ প্রণয়িনী চন্দ্রলেখার প্রণয়ে কি আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন, তাহাই পরিবর্ণিত আছে। বধ্য-ভূমে কবিতাছন্দে ঐরূপে মনোভাব প্রকাশ করিলে, সেই সংবাদ রাজার নিকট উপস্থিত হয়। রাজা তাহাতে কবির প্রতি দয়ার্দ্র হন। তখন রাজানুকম্পায় বিহ্লণের প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা রহিত হয়। রাজা রাজকুমারীর সহিত বিহ্লণের বিবাহ দেন। বিহ্লণ কবি এবং তাঁহার 'চোরপঞ্চাশৎ' খণ্ড-কাব্য সম্বন্ধে এই গল্প বিশেষ প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ বলেন,—চোরপঞ্চাশৎ খণ্ড-কাব্যের রচয়িতা বিহ্লণ নহেন। চোরকবি নামক কোনও কবি ঐ শ্লোকটি রচনা করিয়াছিলেন। কথিত হয়, সেই কবি কালিদাসের সমসাময়িক ছিলেন। আরও কথিত হয়, কালিদাস ঐ কবির প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। একটি উদ্ভট শ্লোক কালিদাসের রচিত বলিয়া প্রচারিত আছে।

বিদ্যাপতি বিহ্লণ।

"কবিরমরুঃ কবিরমরঃ কবী চোরময়ূরকৌ।
অন্যে কবয়ঃ কপয়ঃ কপিজাতিত্বাচ্চঞ্চলমতয়ঃ ॥"

এ হিসাবে চোর-পঞ্চাশিকার (চোর-পঞ্চাশতের) রচয়িতা চোরকবি বলিয়াই প্রতিপন্ন হন। ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দরে' 'চোরপঞ্চাশৎ' শীর্ষক কবিতায় 'চৌরপঞ্চাশিকার' ন্যায় কাহিনীই বিবৃত আছে। সুতরাং এ রহস্য চিরদিনই অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিবে। যাহা হউক, সাধারণতঃ এখন স্থির হয়, বিহ্লণ কবিই সংস্কৃত-ভাষার 'চোরপঞ্চাশৎ' খণ্ড-কাব্যের রচয়িতা। এই বিহ্লণ-রচিত 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিত' নামক একখানি মহা-কাব্য এবং 'রামস্তুতি' নামক এক

খানি কাব্য-গ্রন্থ অধুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে। রচনায় কিছু অহমিকার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে।

"সহস্রশঃ সন্তু বিশারদানাং বৈদর্ভলীলানিধয়ঃ প্রবন্ধাঃ,
তথাপি বৈচিত্র্যরহস্যলুব্ধাঃ শ্রদ্ধাং বিধাস্যন্তি সচেতসোঽত্র॥
রসধ্বনেরধ্বনি যে চরন্তি সংক্রান্ত বক্রোক্তিরহস্যমুদ্রাঃ।
তেঽস্মৎ প্রবন্ধানবধারয়ন্তু কুর্ব্বন্তু শেষাঃ শুকবাক্যপাঠম্॥"

'সহস্র প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন গ্রন্থকারের রচনা আছে। কিন্তু যাঁহারা রহস্যজ্ঞ ও বুদ্ধিমান, তাঁহারা আমার রচনায় নিশ্চয়ই শ্রদ্ধান্বিত হইবেন। ভাবজ্ঞ রসজ্ঞ ব্যক্তিগণই আমার গ্রন্থের গুণানুসন্ধানে রহস্যোদ্ভেদে সমর্থ হইবেন। অরসজ্ঞ জনের এ গ্রন্থ পাঠ, শুক-পক্ষীর আবৃত্তি মাত্র। চৌলুক্য-রাজ ত্রিভুবনমল্লদেব এই বিহ্লণ পণ্ডিতকে 'বিদ্যাপতি' উপাধি দান করিয়াছিলেন। রাজতরঙ্গিণীতে এই বিহ্লণের উল্লেখ আছে। তদনুসারে তিনি শেষ-জীবনে সংসার-ত্যাগী হইয়াছিলেন বলিয়া বুঝা যায়।

খণ্ড-কাব্যের মধ্যে আর এক প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন গ্রন্থ—বাণভট্ট বিরচিত কাদম্বরী। উহা একাধারে কাব্য ও উপন্যাস। বাণভট্ট—মহাকবি বলিয়া প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন। কাদম্বরী, হর্ষচরিত ও চণ্ডিকাশতক গ্রন্থত্রয় তাঁহার যশ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।

বাণভট্ট।

কাদম্বরীর প্রথমে কবি একটু আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে প্রকাশ,— তিনি যাগযজ্ঞপরায়ণ বাৎসায়ন-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম চিত্রভানু, মাতার নাম রাজদেবী; তাঁহার পিতামহ অর্থপতি, প্রপিতামহ কুবের। কান্যকুব্জের অধিপতি হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে তিনি রাজসংসারে বিশেষ সম্মানের আসন লাভ করিয়াছিলেন। তদনুসারে, রাজার গুণে মুগ্ধ হইয়া তিনি 'হর্ষচরিত' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কাদম্বরী তাঁহার প্রধান রচনা। উহার পর তিনি 'হর্ষচরিত' ও 'চণ্ডিকাশতক' গ্রন্থদ্বয় প্রণয়ন করিয়াছিলেন। রত্নাবলী নাটিকার রচয়িতা বলিয়াও তাঁহার নাম উল্লিখিত হয়। কাদম্বরী—নানা অলৌকিক উপাখ্যানে পরিপূর্ণ। রাজা শূদ্রকের নিকট এক শুক পক্ষী আত্ম-বিবরণ-বর্ণন-ব্যপদেশে কতকগুলি গল্প বলে। তাহা লইয়াই এই কাদম্বরী সংগ্রথিত। গল্পে চন্দ্রাপীড়ের সহিত কাদম্বরীর এবং বৈশম্পায়নের সহিত মহাশ্বেতার মিলনের কাহিনী বিবৃত আছে। রোহিণীপতি চন্দ্র ব্রহ্মশাপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার নাম হয়—চন্দ্রাপীড়। তাঁহার পিতার নাম—তারাপীড়, মাতা—বিলাসবতী। চন্দ্রাপীড় এক দিন হিমালয়ের আরণ্য-প্রদেশে ভ্রমণ করিতে গিয়া মহাশ্বেতার আশ্রমে উপনীত হন। সেখানে গন্ধর্ব্ব-রাজকুমারী কাদম্বরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সেই সাক্ষাতে পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হন। এই সময় মহাশ্বেতার শাপে বৈশম্পায়নের মৃত্যু ঘটে। বৈশম্পায়ন—চন্দ্রাপীড়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। বন্ধুর মৃত্যুতে, বন্ধুর শোকে, চন্দ্রাপীড়ও তনুত্যাগ করেন। পরজন্মে চন্দ্রাপীড় শূদ্রক নৃপতিরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেই ঘটনা বর্ণন উপলক্ষেই শুকমুখে কাদম্বরীর কাহিনী শূদ্রক সমক্ষে কীর্ত্তিত হয়। যাহা হউক, চন্দ্রাপীড় বন্ধু-শোকে প্রাণত্যাগ করিলে দৈববাণী ক্রমে তাঁহার মৃতদেহ রক্ষিত হইয়াছিল। মৃতদেহে দেবানুগ্রহে পুনর্জ্জীবন সঞ্চারিত হইলে, চন্দ্রাপীড়ের সহিত কাদম্বরীর

এবং বৈশম্পায়নের সহিত মহাশ্বেতার মিলন হয়। কাদম্বরী পূর্ব্বভাগ ও উত্তরভাগ—দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্ব্ব ভাগের নাম—'বাণভাগ', এবং উত্তর ভাগের নাম—'তত্তনয়ভাগ'। কথিত আছে, গ্রন্থের প্রথমার্দ্ধ রচনার পরই বাণভট্টের মৃত্যু হয় এবং পরিশেষে তাঁহার পুত্র গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। কাদম্বরী—গদ্য-সাহিত্যের এক উৎকৃষ্ট আদর্শ। এই কাদম্বরী-গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া, 'কাদম্বরী-কথাসার' নামে একখানি কাব্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। অনেকে সেই গ্রন্থকে বাণভট্ট-বিরচিত কাদম্বরী মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হন। কাদম্বরী-রচয়িতার অপর গ্রন্থ—হর্ষচরিত। হর্ষচরিত আট সর্গে বিভক্ত। বড় বড় সমস্তপদবিশিষ্ট ভাষায় হর্ষবর্দ্ধনের চরিত্র-কথা উহাতে বিবৃত আছে।' * চণ্ডিকাশতক, শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে লিখিত। দেবী-মাহাত্ম্য চণ্ডী হইতে উহার আখ্যান-ভাগ পরিগৃহীত। হর্ষচরিতে ভাষার আড়ম্বর, বর্ণনার বাহুল্য অতিমাত্রায় দৃষ্ট হয়। আট সর্গে (প্রায় পঁচিশ পৃষ্ঠার মধ্যে) পাঁচটী বিষয়ের বর্ণনায় প্রায় দশ পৃষ্ঠা স্থান অধিকার করিয়া আছে। কবি দাসত্বের দুর্দ্দশা বর্ণনা করিতেছেন; লিখিতেছেন,—'ভৃত্য বংবঞ্জিত ধনুর ন্যায়। তাহার নিজের কোনও শক্তি নাই। অপরের কাল্পনিক গুণালাখ্যারূপ গুণ দ্বারা সে কেবল অবনমিত হইয়া আছে।' এই ভাবে বিবিধ উপমায় দাসত্বের দুর্দ্দশা পরিবর্ণিত। তার পর অরণ্যের বর্ণনা এবং সেই অরণ্যে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সংক্রান্ত উপদেশ-গ্রহণে উৎসুক হইয়া ছাত্রগণের জনতা। উপদেশ-প্রার্থী ছাত্রের মধ্যে, বানর আছেন, পেচক আছেন, শুকপক্ষী আছেন, এমন কি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে জীবহিংসায় বিরত ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুও বিরাজ করিতেছেন। ইহার পর শিক্ষক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর বেশভূষার বর্ণনা। তিনি মসৃণ সুকোমল রক্তাম্বর পরিধান করিয়া আছেন; তাহাতে বোধ হইতেছে যেন নবারুণকিরণে পূর্ব্বদিক উদ্ভাসিত হইতেছে, এবং অন্যান্য দিকেও সে জ্যোতিঃ প্রতিফলিত দেখিয়া তিনি যেন অপরাপর দিককেও তাঁহার ন্যায় রক্তিম বৌদ্ধ-বেশভূষায় বিভূষিত হইতে উপদেশ দিতেছেন। এইরূপ আর এক স্থলে এক শোকসন্তপ্তা রাজকুমারীর বর্ণনা আছে। কুমারী হতাশে অরণ্যের ধূলি-শয্যায় শায়িত আছেন। তিনি কি ভাবে কেমন অবস্থায় দিন অতিবাহিত করিতেছেন, অনুপ্রাসের ঘনঘটায় কবি তাহার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সে বর্ণনা বড়ই কৌশলপূর্ণ। হর্ষ-চরিতে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। কাদম্বরীতে সমসাময়িক রাজসংসারের এবং স্থানাদির প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত দেখি। এই সকল বিষয় অনুধাবন করিলে হর্ষ চরিত সাহিত্যে ও জীবনবৃত্তে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে, স্বীকার করিতে হয়।

দণ্ডী-প্রণীত 'দশকুমারচরিত'—একখানি প্রসিদ্ধ গদ্য কাব্য। এই কাব্যে দশ জন রাজ-কুমারের চরিত্র-চিত্র অঙ্কিত আছে। কত প্রকার কৌশলে, কত গর্হিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে

মহাকবি দণ্ডী ও দশকুমারচরিত।

কুমারেরা রাজপদ লাভ করেন ও সমাজে প্রতিষ্ঠান্বিত হন, দশকুমারচরিতে গদ্য কাব্যে তদ্বিষয় পরিবর্ণিত। তাঁহাদের সাহস, বীরত্ব, বিদ্যা, বুদ্ধি এবং কর্ম্মাকর্ম্ম প্রভৃতির চিত্র এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। যে দশ জন কুমারের বিষয় এই গ্রন্থে পরিবর্ণিত, তাঁহাদের নাম—রাজবাহন, সোমদত্ত, পুষ্পোদ্ভব, অপহারবর্ম্মা, উপহার-বর্ম্মা, অর্থপাল, প্রমতি, মিত্রগুপ্ত, মন্ত্রগুপ্ত এবং বিশ্রুত। দশ কুমার এক সঙ্গে প্রতিপালিত হন,

* এই বাণভট্ট ও হর্ষচরিত সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা এই খণ্ডের ২৭১ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

এক ভাবে শিক্ষা লাভ করেন, এক সঙ্গে পরিবর্দ্ধিত হন। কিন্তু সংসার-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের চরিত্র বিভিন্ন পথে প্রধাবিত হয়। মহাকবি দণ্ডাচার্য্য এই গদ্য কাব্যে উপাখ্যান ছলে দশ কুমারের সেই দশবিধ চরিত্র-কাহিনী কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই গ্রন্থে কূট-রাজনীতির শিক্ষাই বিশেষভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। ছলনা প্রভৃতি কৌশল-জাল-বিস্তারে কি প্রকারে রাজৈশ্বর্য্য বৃদ্ধি পায়, এ গ্রন্থের তাহাই প্রধান শিক্ষা। এই গ্রন্থ-রচনার একটু ইতিহাস আছে। দণ্ডাচার্য্য আকুমার সন্ন্যাসব্রতধারী ছিলেন। বিভিন্নদেশে পরিভ্রমণানন্তর একদা তিনি মালবরাজ্যে উপস্থিত হন। সেই সময়ে দণ্ডাচার্য্যের উপর মালবাধিপতি আপনার পুত্রকন্যাগণের সুশিক্ষার ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন। কুমার-কুমারীগণকে শিক্ষাদান ব্যপদেশে তিনি 'কাব্যাদর্শ' নামক অলঙ্কার-গ্রন্থ এবং 'দশকুমারচরিত' নামক সাহিত্য-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী কি করিয়া সংসারের নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইলেন, কেমন করিয়া দশকুমারচরিতে রাজকুমারগণের প্রণয়-কাহিনী ও কৌশলকলা বিবৃত করিলেন,—তাহা বুঝিবার জন্য রাজার মনে বড়ই কৌতূহল জন্মে। দণ্ডাচার্য্য সন্ন্যাসী কি ছদ্মবেশী,—রাজা বিবিধ বিধানে তাহার সন্ধান লইতে প্রবৃত্ত হন। সংসারের সহিত সর্ব্বতোভাবে লিপ্ত না থাকিলে এ সকল রাজসংসারের চক্রান্ত ষড়যন্ত্র কেমন করিয়া মানুষের আয়ত্তাধীন হইতে পারে,—রাজা যখন এইরূপ সংশয়ান্বিত; দণ্ডাচার্য্য তাহা বুঝিতে পারিলেন। রাজাও একজন কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। সেই সূত্রে কৌশলক্রমে দণ্ডাচার্য্য রাজাকে দারিদ্র্য-সম্বন্ধে একটি কবিতা রচনা করিতে অনুরোধ করেন। রাজা 'দরিদ্রাষ্টক' নামে আটটি শ্লোক রচনা করিয়া দণ্ডাচার্য্যকে উপহার দেন। সেই শ্লোকে দারিদ্র্যের বিষয় অতি স্বভাবসঙ্গতরূপে বিবৃত হইয়াছিল। সেই শ্লোকাষ্টকের একটি শ্লোক,—

> "মদ্‌গৃহে মুষলীব মূষিকবধূর্ম্মূষীব মার্জ্জারিকা
> মার্জ্জারীব শুনী শুনীব গৃহিণী বাচ্যাঃ কিমন্যে জনাঃ।
> মূর্চ্ছাপন্নশিশূনসূন্ বিজহতঃ সম্প্রেক্ষ্য ঝিল্লীরবৈঃ
> লূতাতন্তুবিতান-সংবৃতমুখী চুল্লী চিরং রোদিতি॥"

নিরন্ন দরিদ্রের গৃহে ইঁদুর বিড়াল কুকুর প্রভৃতি প্রাণিগণের, এমন কি—উনুনের পর্য্যন্ত কিরূপ শোচনীয় অবস্থা হয়, কবি এই শ্লোকে তাহারই বর্ণনা করিয়াছেন। নিরন্ন দরিদ্রের গৃহে ইঁদুর যেন টিকটিকির ন্যায় কৃশ হয়; বিড়াল ইঁদুরের ন্যায় হইয়া পড়ে; কুকুর বিড়ালের আকার প্রাপ্ত হয়; গৃহিণী অনাহারী কুক্কুরীর ন্যায় কৃশা হইয়া পড়েন। মূর্চ্ছাবস্থায় শিশু-সন্তানগুলি মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে; তাহ দেখিয়াই যেন চুল্লী লূতাতন্তুবিতানে মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া ঝিল্লীরবছলে ক্রন্দন করিতেছে।' এবম্বিধ কবিতা রচনায় রাজা যখন সমর্থ হইলেন,—দারিদ্র্যের সংস্রবে না আসিয়াও তিনি যখন এরূপভাবে দারিদ্র্য-সম্বন্ধে কবিতা রচনা করিতে সমর্থ হইলেন, তখন দণ্ডাচার্য্যই বা কেন সন্ন্যাসাশ্রমে থাকিয়াও সংসার-রহস্য না জানিতে পারিবেন? কবির—ভাবুকের সূক্ষ্মদর্শন ভূয়োদর্শন স্বভাবজ। প্রকৃতি-বশেই তাঁহারা সূক্ষ্ম-দর্শন-শক্তি লাভ করেন। রাজার ভ্রম ঘুচিল; দণ্ডাচার্য্য রাজসংসারে সম্মানের উচ্চ আসন লাভ করিলেন। বোধ হয় সেই সময় হইতেই নিম্নোদ্ধৃত উদ্ভট শ্লোকটি জগতে দণ্ডাচার্য্যের মহিমা-প্রচারে প্রযুক্ত হইয়াছিল। শ্লোকটি এই—"জাতে জগতি বাল্মীকৌ

কবিরিত্যভিধাভবৎ। কবীতৈ তু ততো ব্যাসে কবয়স্ত্বয়ি দণ্ডিনি॥" বাল্মীকির জন্ম-গ্রহণের পর 'কবি' এই একবচনান্ত শব্দটির উৎপত্তি হয়। ইহার পর ব্যাস যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন দুই জন কবির অভ্যুদয়ে দ্বিবচনান্ত 'কবী' শব্দের উদ্ভব ঘটে। পরিশেষে দণ্ডীর আবির্ভাবে বহুবচনান্ত 'কবয়ঃ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। এইরূপ আরও নানা শ্লোক আছে। শার্ঙ্গধর-পদ্ধতিতে দণ্ডীর প্রশংসা-বাদ সম্বন্ধে এইরূপ আর একটি উক্তি দৃষ্ট হয়। সেই উক্তি,—

"ত্রয়োঽগ্নয়স্ত্রয়োবেদাস্ত্রয়োদেবাস্ত্রয়োগুণাঃ।
ত্রয়ো দণ্ডি-প্রবন্ধাশ্চ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতাঃ॥"

অগ্নিত্রয়, বেদত্রয়, দেবত্রয়, গুণত্রয় যেমন সর্ব্ববিদিত; দণ্ডীর রচনাও তদ্রূপ ত্রিলোকবিখ্যাত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মৃচ্ছকটিকের এবং কাব্যাদর্শের শ্লোক-বিশেষের সাদৃশ্য দেখিয়া, কেহ কেহ দণ্ডীকে মৃচ্ছকটিক রচয়িতা বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। এদিকে আবার দণ্ডী-রচিত 'ছন্দোবিচীতি' ও 'কলাপরিচ্ছেদ' নামক দুইখানি অলঙ্কার বিষয়ক গ্রন্থ পাওয়া যায়। মৃচ্ছ-কটিকের সহিত 'দশকুমার' রচয়িতার নাম-সংযোগের অন্য যে সকল কারণ প্রদর্শিত হয়, তদপেক্ষা এক যুক্তিযুক্ত কারণ আমরা অনুধাবন করিতে পারি। দশকুমারচরিতে যেমন রাজনীতির কূট-কল্পনা, মৃচ্ছকটিকে সেইরূপ সমাজ-নীতির কূট-কল্পনা। তাহাতে দণ্ডীর রচনা না হইলেও, মৃচ্ছকটিকের সহিত দশকুমারচরিত-রচয়িতার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ যে কিছু ছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়। দণ্ডী এক এক সময় চাণক্যের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে কূট-নীতির-অনুসরণকারী বলিয়া মনে হয়। দণ্ডীর রচনা-প্রণালী বিশুদ্ধ; উপাখ্যানগুলি মৌলিক না হইলেও তাঁহার রচনা-নৈপুণ্য উহাকে অশেষ সৌন্দর্য্যে সঞ্জীভূত করিয়া রাখিয়াছে। এখন যে দশকুমারচরিত প্রচলিত আছে, তাহার সকল অংশ দণ্ডাচার্য্যের রচিত বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। কথিত হয়, দশকুমারচরিতের প্রথম অংশ ও শেষাংশ লোপ পাইয়াছিল; পরবর্ত্তিকালে অপর গ্রন্থকারগণ কর্ত্তৃক তাহা সংযোজিত হইয়াছে। তাহা হইলেও দশকুমারচরিত সংস্কৃত-ভাষায় যে একখানি উৎকৃষ্ট গদ্য-কাব্য, তদ্বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। দণ্ডী-প্রণীত কাব্যাদর্শ অলঙ্কার গ্রন্থ বটে; কিন্তু উহার মধ্যেও তাঁহার কবিত্ব-প্রভা বিচ্ছুরিত দেখি। তাহাতে কেহ কেহ কাদম্বরীর কোনও কোনও অংশে দণ্ডাচার্য্যের অনুস্মৃতির বিষয় অনুমান করেন। একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। কাব্যাদর্শে আছে,—"অরত্নালোক সংহার্য্যমবার্য্যং সূর্য্যরশ্মিভিঃ। দৃষ্টিরোধকরং যূনাং যৌবনপ্রভবং তমঃ॥" কাদম্বরীতে এই ভাবেরই কথা ভাষান্তরে দৃষ্ট হয়। যথা,—"কেবলং চ নিসর্গত এব অভানুভেদ্যম্ অরত্নালোকোচ্ছেদ্যম্ অপ্রদীপ প্রভাপনেয়ম্ অতি গহনং তমো যৌবনপ্রভবম্।" দুয়েরই ভাব এক বটে; উভয়ত্রই যুবকগণের যৌবনকালীন তমের বিষয় উপমা দ্বারা বুঝান হইয়াছে বটে; উভয়ত্রই সূর্য্যকিরণে, রত্নালোকে বা প্রদীপ-শিখায় যৌবন-সুলভ প্রগাঢ় তম দূর হয় না বলিয়াই খ্যাপন করা হইয়াছে বটে; কিন্তু তাহা হইলেও কেহ কাহারও যে অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা মনে হয় না। একই ভাব-কুসুম যখন দূর-দূরান্তরে দেশ-দেশান্তরে স্বাধীনভাবে প্রস্ফুটিত হইতে দেখি, তখন একই দেশের দুই জন প্রতিভাবান কবির মধ্যে ঐ ভাব আপনা-আপনিই সে সঞ্জাত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? দণ্ডীর দশকুমারচরিতে সমসাময়িক নানাচিত্র চিত্র প্রকটিত।

সুবন্ধু-প্রণীত বাসবদত্তা—গদ্য-কাব্যের এক অভিনব নিদর্শন। অতি প্রাচীনকালে ভারত-বর্ষে যে পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় কাল্পনিক উপন্যাস প্রচলিত ছিল, সুবন্ধু-প্রণীত এই 'বাসবদত্তা' তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—ভাস-প্রণীত 'স্বপ্নবাসবদত্তা' নাটকের উপাখ্যান-ভাগ-গ্রহণে এই নাটক রচিত হইয়াছে। তাহা হইলেও এই বাসবদত্তা উপন্যাসের অভিনবত্ব কথনই লোপ পাইবার নহে। এই উপন্যাসের বর্ণনীয় বিষয়—যুবরাজ কন্দর্পকেতুর সহিত বাসব-দত্তার প্রণয়। নায়ক-নায়িকা পরস্পর স্বপ্নে পরস্পরের রূপ দর্শন করেন। সেই স্বপ্ন-দর্শন হইতে পরস্পর পরস্পরের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়েন। স্বপ্ন-দর্শনের পর যুবরাজ কন্দর্প-কেতু কুসুমপুর নগরে গমন করিয়া কৌশলে বাসবদত্তার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতের পর বিমানগামী ঘোটকে আরোহণ করিয়া বাসবদত্তাকে লইয়া কন্দর্পকেতু বিন্ধ্য-পর্ব্বত অভিমুখে পলায়ন করেন। সেখানে সহসা কন্দর্পকেতু নিদ্রাভিভূত হন। জাগরণের পর তিনি আর বাসবদত্তাকে দেখিতে পান না। তথন শোকে অধীর হইয়া কন্দর্পকেতু আত্মহত্যায় প্রয়াসী হন। দৈববাণী তাঁহাকে আত্মহত্যায় প্রতিনিবৃত্ত করে। দৈববাণীতে কন্দর্পকেতু আশ্বস্ত হন। তাঁহার সহিত বাসবদত্তার পুনর্ম্মিলন ঘটিবে,—দৈববাণীতে তাহা জানিতে পারেন। বহুদিন বনে বনে পরিভ্রমণের পর এক দিন সহসা একটি প্রস্তর-মূর্ত্তি কন্দর্পকেতুর দৃষ্টিপথে পতিত হয়। সে প্রস্তর-মূর্ত্তিতে তাঁহার সেই চির-আকাঙ্ক্ষিত প্রণয়িনীর প্রতি-কৃতি প্রত্যক্ষ করেন। প্রস্তর-মূর্ত্তিতে বাসবদত্তার প্রতিকৃতি দেখিয়া কন্দর্পকেতু আবেগভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন। কন্দর্পকেতুর স্পর্শমাত্র প্রস্তরে নবজীবন সঞ্চার হয়। বাসব-দত্তার সহিত কন্দর্পকেতুর মিলন ঘটে। এক সন্ন্যাসীর অভিসম্পাতে বাসবদত্তা পাষাণে পরিণত হইয়াছিলেন। অভিসম্পাত-প্রদানের পর সন্ন্যাসী একটু অনুগ্রহ প্রকাশ করেন। সে অনুগ্রহ,—যদি কখনও তাঁহার স্বামী আসিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করেন, তাহা হইলে তিনি অভিশাপমুক্ত হইয়া পুনরায় মানবী-দেহ প্রাপ্ত হইবেন। এই উপাখ্যানই বাসবদত্তা উপন্যাসের স্থূল কাহিনী। স্বপ্নদর্শনই এই উপন্যাসের প্রাণভূত। অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করেন,—প্রণয়ী-প্রণয়িনীর এইরূপ স্বপ্নদর্শনের ও তাহার ফলে মিলনের কল্পনা বাসবদত্তা উপন্যাসেই প্রথম দৃষ্ট হয়। ইহার পূর্ব্বে ভাস প্রণীত স্বপ্নবাসবদত্তা নাটকে এবম্বিধ কল্পনার সমাবেশ ছিল। বিদ্ধশালভঞ্জিকায় এবং কর্পূরমঞ্জরীতে পরবর্ত্তিকালে এবম্বিধ কল্পনা স্থান পাইয়াছিল বটে; কিন্তু স্বপ্নবাসবদত্তার পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও নাটকে বা বাসবদত্তা উপন্যাসের পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও উপাখ্যানের মধ্যে এরূপ কল্পনা কোথাও দৃষ্ট হয় না। স্বপ্নবাসবদত্তার পঞ্চম অঙ্কে বৎস-রাজ বাসবদত্তার স্বপ্ন দেখেন। তাহার পূর্ব্বে বাসবদত্তার সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। লাবাণক গ্রামে অগ্নিদাহে বাসবদত্তা জীবন-বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন বলিয়া রাষ্ট ছিল; রাজা যথন স্বপ্নে 'হা বাসবদত্তা' বলিয়া শোক-প্রকাশ করিতেছেন, সেই সময়ে বাসবদত্তা আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। স্বপ্নবাসবদত্তার গ্রন্থকারই মিলনের পূর্ব্বে এবম্বিধ স্বপ্নদর্শন-কল্পনার মৌলিকত্বের একমাত্র অধিকারী। * হর্ষবর্দ্ধন বা দ্বিতীয় শিলাদিত্যের রাজত্বকালে

সুবন্ধুপ্রণীত বাসবদত্তা।

* অনুসন্ধিৎসু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সংস্কৃত-ভাষার নাট্য-সাহিত্যের ও আখ্যানাদির আলোচনায় এই সিদ্ধান্তেই

সুবন্ধু বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু সুবন্ধু অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকার বলিয়াই প্রতিপন্ন হন।

সংস্কৃত সাহিত্যের আর এক প্রধান রত্ন—পঞ্চতন্ত্র। এমন নীতিগর্ভ হিতোপদেশ-পূর্ণ উপাখ্যান কোনও দেশের কোনও ভাষার পরিদৃষ্ট হয় না। পরবর্ত্তিকালে অন্যান্য দেশের সাহিত্যে নীতিমূলক যে সকল উপাখ্যান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার মূলে পঞ্চতন্ত্রের ছায়াপাত ঘটিয়াছে, সন্দেহ নাই। ঈশপের গল্প, আরব্যোপন্যাস বা পারসিক কাহিনী—সকলেরই মূলে পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতির প্রভাব পরিদৃশ্যমান। *

পঞ্চতন্ত্র।

পঞ্চতন্ত্র রচনার একটি ইতিহাস আছে। মহিলারোপ্য নগরের অধিপতি রাজা অমরশক্তি, আপনার তিনটি অলস ও নির্ব্বোধ পুত্রের শিক্ষাদানের জন্য, বিষ্ণুশর্ম্মা নামক জনৈক শিক্ষককে নিযুক্ত করেন। সেই নির্ব্বোধ অলস রাজকুমারগণের শিক্ষাদানের পক্ষে বিষ্ণুশর্ম্মা অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থ রচিত হয়। নীতি-শিক্ষাদানই এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি গল্পচ্ছলে এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। পাঁচ ভাগে এই গ্রন্থ বিভক্ত; সেই জন্যই ইহার নাম—পঞ্চতন্ত্র। প্রথম অংশের নাম—মিত্রভেদ। এই অংশে এক সিংহের ও ষণ্ডের মিত্রতা-ভঙ্গের কাহিনী বর্ণিত আছে। শৃগালদ্বয়ের মধ্যস্থতায় সিংহের ও ষণ্ডের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হয়। তাহাতে শৃগালদ্বয় ও উহাদের সহিত মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ থাকে। অল্পদিন, পরে একটি শৃগালের মনে কিছু ঈর্ষার ভাব উদয় হয়। বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সিংহ ও ষণ্ড যেন তাহার সহিত সদ্ব্যবহার করিতেছে না,—ইহাই তাহার ধারণা জন্মে। ফলে, শৃগাল ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তার করে; সিংহকে এবং ষণ্ডকে—উভয়কেই উভয়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে

উপনীত হইয়াছেন। যথা,—"The dream as a novelistic device in India first occurs in Subandhu; though in the drama it is found in the first act of *Biddhasalabhanjica* and the third of the *Karpurmanjari* (both written by Rajsekhara, who was acquianted with Bhasa's work), as well as in the first of Visvanath Vatta's *Srngaravatika*" —Vasavadatta, A Sanskrit Romance by Subandhu (Columbia University, Indo-Iranian series, Vol. VIII).

* এই পঞ্চতন্ত্র কোন্ দেশের কোন্ ভাষায় কোন্ সময়ে অনুবাদিত হইয়াছিল, তাহার একটু সন্ধান লইলে পঞ্চতন্ত্রের প্রাচীনত্বের এবং অন্য দেশে উহার প্রভাবের বিষয় উপলব্ধি হইতে পারে। পারস্য-রাজ নৌশারোয়ান পারস্য-ভাষায় পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ করাইয়াছিলেন। ৫৩১ খৃষ্টাব্দ—৫৭২ খৃষ্টাব্দ তাঁহার রাজত্ব-কাল। সুতরাং খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে পঞ্চতন্ত্র বিদেশে গিয়াছিল, প্রতিপন্ন হয়। পারস্য-ভাষার অনুবাদ হইতে আরবী ভাষায় উহার অনুবাদ হইয়াছিল। সেই আরবী হইতে উহা গ্রীকভাষায় অনূদিত হয়। ১০৮০ খৃষ্টাব্দে 'সে মিয়ন সেথ' গ্রীক-ভাষায় উহার অনুবাদ কার্য্য শেষ করেন। গ্রীক-ভাষা হইতে পসিনাস কর্ত্তৃক উহা লাটীন-ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়াছিল। ১২৫০ খৃষ্টাব্দে রাব্বি জোয়েস হিব্রু-ভাষায় উহার অনুবাদ করেন। পঞ্চতন্ত্রের আরবী-ভাষার অনুবাদ হইতে ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে স্পেনীয় ভাষায় উহার অনুবাদ হয়। জর্ম্মণ-ভাষায় উহার প্রথম অনুবাদ—পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। তদবধি ইউরোপের প্রায় প্রতিভাষায় পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ পরিলক্ষিত হয়।—Tawney's translation of *Kathasarit Sagara* Vol II.

থাকে। তাহারা পরস্পরে যেন পরস্পরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইয়াছে,—এই কথা গোপনে সে পরস্পরকে জানাইয়া দেয়। ইহাতে সিংহে ও ষণ্ডে ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। যুদ্ধে ষণ্ড পঞ্চত্ব লাভ করে। শৃগাল সিংহের মন্ত্রিত্ব-পদ প্রাপ্ত হয়। মিত্রভেদ নামক প্রথম অংশের ইহাই স্থূল আখ্যায়িকা। পঞ্চতন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের নাম—মিত্র-সংপ্রাপ্তি। কচ্ছপ, হরিণ, বায়স এবং মূষিকের প্রসঙ্গে পরস্পর মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় সুফল প্রদর্শিত হইয়াছে। পঞ্চ-তন্ত্রের তৃতীয় অংশ—কাকোলূকীয়। পুরাতন শত্রুর সহিত মিত্রতা করার বিষময় ফলের বিষয় এই অংশে বায়সপেচকবিগ্রহে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। পঞ্চতন্ত্রের চতুর্থ অংশের নাম —লব্ধ-প্রণাশ। বানরের ও কুম্ভীরের উপাখ্যানে, চাটুকারিতার বশবর্ত্তী হওয়ায় প্রাপ্তধন-নাশের বিষয় পরিব্যক্ত হইয়াছে। পঞ্চতন্ত্রের পঞ্চম অংশের নাম—অপরীক্ষিতকারক। এই অংশে অবিমৃষ্যকারিতার বিষময় ফল পরিবর্ণিত আছে। বুদ্ধির দোষে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করায়, ক্ষৌরকারের অবস্থা-বিপর্য্যয়-প্রসঙ্গে এই তত্ত্ব বিশদীকৃত করা হইয়াছে। পঞ্চতন্ত্রের গল্প-সমূহে বিভিন্ন জীবজন্তুকে মনুষ্যের ন্যায় শক্তিসম্পন্ন কল্পনা করিয়া লইয়া কবি আখ্যায়িকা-সমূহ বিবৃত করিয়াছেন। পঞ্চতন্ত্রে যে সকল গল্পের ও নীতি-কথার অবতারণা আছে, কেহ কেহ মনে করেন, সেগুলি বৌদ্ধদিগের জাতক-গ্রন্থ-সমূহের ভাব অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। জাতক-গ্রন্থে বুদ্ধদেবের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের বিবরণ গল্পচ্ছলে বিবৃত আছে; আর সেই সকল গল্পে সন্নীতি-খ্যাপন উদ্দেশ্যে পশুপক্ষিকীটপতঙ্গ প্রভৃতির মনুষ্যোচিত কার্য্যকারিতার বিষয় পরিবর্ণিত হইয়াছে। ৩৮০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে বৈশালী নগরে বৌদ্ধ-সম্মিলনে জাতক-গ্রন্থের বহু গল্প সংগৃহীত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই সকল কাহিনী পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে বা মধ্যভাগে পালি-ভাষায় 'সুত্তপিটক' গ্রন্থের অন্তর্নিবিষ্ট হয়। চীনা-ভাষার একখানি প্রাচীনতম কোষ গ্রন্থে (এনসাইক্লোপিডিয়া) ভারতবর্ষে প্রচারিত এইরূপ অনেক গল্প অনুবাদিত আছে। ঐ কোষ-গ্রন্থ ৬৬৮ খৃষ্টাব্দে চীনা-ভাষায় সঙ্কলিত হয়। তাহাতে প্রকাশ,—দুই শত দুই খানি বৌদ্ধ-গ্রন্থ হইতে ঐ প্রকার গল্প সংগ্রহ করা হইয়াছিল। এই সকল হেতুবাদে অর্থাৎ ঐ প্রকার গল্প অনেক প্রাচীনকালে বৌদ্ধগ্রন্থের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল বলিয়া পঞ্চতন্ত্রকে বৌদ্ধগ্রন্থ-সমূহের অনুসরণ বলা হইয়া থাকে। পঞ্চতন্ত্রকার গল্পের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে স্থান-বিশেষ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন এবং অংশ-বিশেষ নূতন সংযোগ করিয়াছেন বলিয়াই উহা অভিনব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছে। কিন্তু এ সকল কল্পনা মাত্র। ইহাই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। পঞ্চতন্ত্র এখন যদিও পাঁচ ভাগে বিভক্ত; কিন্তু বহু পূর্ব্বে উহা বার ভাগে বিভক্ত ছিল। আরও, এই গ্রন্থের নাম প্রথমে পঞ্চতন্ত্র ছিল কি না,—তদ্বিষয়ে নানা সংশয়-প্রশ্ন উঠিয়া থাকে। করতক ও দমনক শৃগালদ্বয়ের নামানু-সারে ঐরূপ একটা কিছু নাম থাকার বিষয় কেহ কেহ অনুমান করেন। তাঁহাদের যুক্তির প্রধান ভিত্তি—সিরীয়া-দেশের ভাষায় ঐ গ্রন্থ 'কালীয়াগ ও দমনাগ' নামে এবং আরবী-ভাষায় 'কালিলা-উদিম্না' নামে পরিচিত আছে। বৈদেশিক ভাষায় পঞ্চতন্ত্রের অংশ-বিশেষ প্রোক্ত নামে প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়াই যে উহার পঞ্চতন্ত্র নাম লোপ করিয়া

দিতে হইবে, আমরা সে মতের পোষকতা করি না। পঞ্চতন্ত্রের প্রথম অংশে করটক ও দমনকের গল্প ছিল বলিয়া অনুবাদকগণ আপন আপন গ্রন্থের ঐরূপ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে পারেন; কিন্তু তাহাতে মূল গ্রন্থের নামান্তরের বিষয় কল্পনা করা যাইতে পারে না। এ বিষয়ে আমাদের একটী প্রধান যুক্তি—হিতোপদেশ-রচনার ইতিহাস। হিতোপদেশও বিষ্ণু শর্ম্মার রচিত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। হিতোপদেশের রচনা সম্বন্ধে কিংবদন্তী এই যে, পাটলি-পুত্রের রাজা সুদর্শন, নির্ব্বোধ ও অসচ্চরিত্র কুমারদিগের শিক্ষার জন্য, বিষ্ণুশর্ম্মাকে শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কুমারদিগের চরিত্র সংশোধন ও সুশিক্ষাদান জন্য বিষ্ণুশর্ম্মা হিতোপদেশের ঐ নীতিমূলক অখ্যায়িকাগুলি বর্ণন করেন। পঞ্চতন্ত্র-বচয়িতা বিষ্ণুশর্ম্মা এবং হিতোপদেশ-বচয়িতা বিষ্ণুশর্ম্মা অভিন্ন ব্যক্তি কি না, বলা যায় না; তবে পঞ্চতন্ত্রের আখ্যানাংশ যে হিতোপদেশে গৃহীত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। হিতোপদেশ-প্রণেতা নিজেও এ কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থারম্ভেই লিখিত আছে,—"পঞ্চতন্ত্রান্তথান্যস্মাদ্‌গ্রন্থাদাকৃষ্য লিখ্যতে।" ইহা দ্বারা পঞ্চ-তন্ত্রের অস্তিত্বের এবং তদন্তর্গত আখ্যান-বস্তু লইয়াই হিতোপদেশ-বচনার প্রমাণ পাওয়া যায়। অপিচ, পঞ্চতন্ত্রের ত্রিচত্বারিংশ আখ্যায়িকার মধ্যে পঞ্চবিংশতি আখ্যায়িকা হিতোপদেশে গ্রহণ কবা হইয়াছে। পঞ্চতন্ত্রের প্রথম তিন তন্ত্রের অধিকাংশ উপাখ্যান এবং চতুর্থ তন্ত্রের একটী ও পঞ্চম তন্ত্রের তিনটী উপাখ্যান হিতোপদেশে সন্নিবিষ্ট আছে। হিতোপদেশ চারি ভাগে বিভক্ত,—মিত্রলাভ, সুহৃদ্ভেদ, বিগ্রহ ও সন্ধি। হিতোপদেশের প্রথম দুই অংশ—পঞ্চতন্ত্রের প্রথম দুই অংশের সহিত সম্পূর্ণ সাদৃশ্য-সম্পন্ন। পার্থক্য এই যে, পঞ্চতন্ত্রের প্রথম অংশ হিতোপদেশে দ্বিতীয় অংশের স্থান অধিকার করিয়াছে এবং পঞ্চতন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ হিতোপদেশের প্রথমাংশ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। হিতোপদেশের শেষ দুই অংশে বিগ্রহ ও সন্ধি প্রসঙ্গে রাজহংসের ও ময়ূরের দ্বন্দ্ব ও মিলনের বিষয় বিবৃত আছে। যেমন পঞ্চতন্ত্র, তেমনই হিতোপদেশ—উভয় গ্রন্থই গদ্যের সহিত কবিতায় সংগ্রথিত। পঞ্চতন্ত্রে গদ্যাংশের ভাগ অধিক। সে তুলনায় হিতোপদেশে কবিতার অংশ অধিক। এক একটী কবিতা সূত্ররূপে আবৃত্তি করিয়া উদাহরণ স্বরূপ কবি এক একটী কাহিনী বিবৃত করিতেছেন। সেই এক একটী কাহিনীর মধ্যে আবার অপর কাহিনী আসিয়াও স্থান পাইয়াছে। এইরূপে কাহিনীর অবয়ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, পঞ্চতন্ত্র-রচয়িতা এবং হিতোপদেশে-প্রণেতা অভিন্ন ব্যক্তি নহেন। পঞ্চতন্ত্রের আদর্শ লইয়া পরবর্ত্তিকালে অন্য কোনও পণ্ডিত হিতোপদেশ সঙ্কলন করিয়া থাকিবেন। প্রণেতার নাম—তাহাতেও বিষ্ণুশর্ম্মাই রহিয়া গিয়াছে। সংস্কৃত-সাহিত্যের দূর অতীতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত তো থাকিবারই কথা! বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাসেই দেখিতে পাই,—কয়েক শত বৎসরের ব্যবধানে একের রচনা অন্যের দ্বারা রূপান্তরিত হইয়া পূর্ব্ব-রচয়িতার নামেই চলিয়া আসিয়াছে। কৃত্তিবাস যে রামায়ণ রচনা করিয়া যান, তাঁহার সে আদি-রচনা এখন লোপ পাইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু তাঁহার রচনার অনুসরণে প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দী অতীত হইল পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার যে রামায়ণ লিখিয়া যান, তাহাই এখন

হিতোপদেশ।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ বলিয়া চলিয়া আসিতেছে। পঞ্চতন্ত্র এবং হিতোপদেশ সম্বন্ধে সেইরূপ ঘটিয়াছিল বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে। হিতোপদেশ কোন্ সময় সঙ্কলিত হয়, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন; তবে ১৩৭৩ খৃষ্টাব্দের একখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হিতোপদেশের প্রবর্ত্তনার বিষয় অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়া লন। নীতিমূলক সারগর্ভ অনেক রচনা পঞ্চতন্ত্রে এবং হিতোপদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। সূত্রাকারে লিখিত উহার কবিতাগুলি এক একটি অমূল্য রত্নবিশেষ। কয়েকটি দৃষ্টান্ত,—

"অর্থেন হি বিহীনস্য পুরুষস্যাল্পমেধসঃ। ক্রিয়া সর্ব্বা বিনশ্যন্তি গ্রীষ্মে কুসরিতো যথা॥
যস্যার্থাস্তস্য মিত্রানি যস্যার্থাস্তস্যবান্ধবঃ। যস্যার্থাঃ স পুমান্ লোকে যস্যার্থাঃ স হি পণ্ডিতঃ॥
অপুত্রস্য গৃহং শূন্যং সন্মিত্ররহিতস্য চ। মূর্খস্য চ দিশঃ শূন্যাঃ সর্ব্বশূন্যা দরিদ্রতা॥
মনস্বী ম্রিয়তে কামং কার্পণ্যং নতুগচ্ছতি। অপিনির্ব্বাণমায়াতি নানলো যাতি শীততাম্॥
কুসুমস্তবকস্যেব দ্বে বৃত্তী তু মনস্বিনঃ। সর্বেষাং মূর্দ্ধ্নি বা তিষ্ঠেদ্ বিশীর্য্যেত বনেঽথবা॥
তানিন্দ্রিয়াণ্যবিকলানি তদেব নাম সা বুদ্ধিরপ্রতিহতা বচনং তদেব।
অর্থোষ্মণা বিরহিতঃ পুরুষঃ স এব ত্বন্যঃ ক্ষণেন ভবতীতি বিচিত্রমেতৎ॥
ধনেন কিং যো ন দদাতি নাশ্নুতে বলেন কিং যশ্চ রিপূন্ ন বাধতে।
শ্রুতেন কিং যো ন চ ধর্ম্মমাচরেৎ কিমাত্মনা যো ন জিতেন্দ্রিয়ো ভবেৎ॥"

দৃষ্টান্ত সহ এইরূপ অসংখ্য নীতি উপদেশ সংগ্রথিত। পঞ্চতন্ত্র হইতে গৃহীত হইলেও হিতোপদেশে গল্পের ও নীতির কিছু উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চতন্ত্র হইতে হিতোপদেশে যে যে অংশ গৃহীত হইয়াছে, তাহার গল্পাংশ প্রায় একই আছে; বর্ণনায় কোথাও একটু সামান্য ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে মাত্র। হিতোপদেশে পঞ্চতন্ত্রের গল্প কিছু সংক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং শ্লোকের ভাগ কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। নীতিপূর্ণ ঐ শ্লোকগুলি যে বিষ্ণুশর্ম্মার রচিত, তাহা মনে হয় না। কারণ, নীতিসার-রূপে ঐ নীতিকথাগুলি অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আখ্যানের অবতারণা উপলক্ষে দুই একটী শ্লোকের সামান্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বটে; কিন্তু প্রধানতঃ সকল নীতি-শ্লোকই প্রাচীন ভারতের সম্পত্তি। পঞ্চতন্ত্রের প্রারম্ভে যে শ্লোক আছে, কবি উপক্রমণিকায় যে শ্লোকটী লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেও এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায়। ব্রহ্মা, রুদ্র, কার্ত্তিকেয় প্রভৃতি দেবগণের নিকট মঙ্গল-প্রার্থনা করিয়া, মনু, বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য্য, সপুত্র পরাশর, চাণক্য এবং নীতিশাস্ত্রকারদিগের উদ্দেশ্যে পঞ্চতন্ত্র-প্রণেতা নমস্কার করিয়াছেন। তাহাতেই বুঝা যায়, বিভিন্ন নীতি-গ্রন্থের অনুসরণে গ্রন্থকার পঞ্চতন্ত্রের গল্পমালা গ্রথিত করিয়াছিলেন। পঞ্চতন্ত্রে বা হিতোপদেশে উদ্ধৃত নীতিগুলি প্রায় সমস্তই গরুড়-পুরাণান্তর্গত নীতিসার-মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। গরুড়-পুরাণান্তর্গত নীতিসার—আটটী অধ্যায়ে তিন শত নব্বইটী শ্লোকে সম্পূর্ণ। চাণক্য-শতকেও ঐ শ্লোকগুলিই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। কামন্দক একজন নীতিশাস্ত্রবেত্তা বলিয়া পরিচিত। তাঁহার নীতিসার-মধ্যেও উহার অনেক শ্লোক পরিদৃষ্ট হয়। এইরূপে বেশ বুঝিতে পারা যায়, হিতোপদেশপূর্ণ শ্লোকগুলি নানা স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়া পঞ্চতন্ত্রের ও হিতোপদেশের অঙ্গ পুষ্ট করিয়াছিল।

পঞ্চতন্ত্রের ও হিতোপদেশের পর, বেতাল-পঞ্চবিংশতি, কথাসরিৎসাগর, শুকসপ্ততি, বৃহৎকথা, প্রভৃতি গল্প-গ্রন্থ-সমূহের নাম উল্লেখযোগ্য। বেতাল-পঞ্চবিংশতি বিক্রমাদিত্যের সিদ্ধিলাভ-বিষয়ক উপাখ্যান-মূলক। ঐ গ্রন্থ অনুসারে অবগত হওয়া যায়,—বিক্রমা-

বেতাল-পঞ্চবিংশতি।

দিত্যের পূর্ব্বে উজ্জয়িনীর যিনি রাজা ছিলেন, তাঁহার নাম—শঙ্কু। শঙ্কুর মৃত্যুর পর বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর সিংহাসন অধিকার করেন। সেই সময় একজন যোগী আসিয়া তাঁহাকে সিদ্ধি-লাভের পথ দেখাইবার লোভে প্রলুব্ধ করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসীর একটী নির্দ্দিষ্ট সাধনা-স্থান ছিল। দুই ক্রোশ দূরস্থিত শিরিষ-বৃক্ষে লম্বিত একটী শব আনয়ন করিবার জন্য সন্ন্যাসী বিক্রমাদিত্যকে আদেশ করেন। শব-আনয়ন-কালে বিক্রমাদিত্য কোনরূপ বাক্য উচ্চারণ না করেন, তাঁহার প্রতি সন্ন্যাসীর এইরূপ উপদেশ থাকে। কিন্তু একটী বেতাল সেই শবটি অধিকার করিয়া ছিল। বিক্রমাদিত্য বৃক্ষ হইতে শবটীকে নামাইয়া লইয়া যখন যোগীর নিকট আসিতেছিলেন, সেই সময়ে বেতাল তাঁহার অনুসরণ করে এবং নানারূপ গল্প ফাঁদিয়া বসে। এক একটী গল্প বলিয়া গল্পচ্ছলে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া, বিক্রমাদিত্যের নিকট বেতাল উত্তর-প্রার্থী হয়। বিক্রমাদিত্য যেই প্রশ্নের উত্তর দেন, শব তাঁহার হস্তস্খলিত হইয়া, পুনরায় সেই বৃক্ষে গিয়া সংলগ্ন হয়। এইরূপে বেতাল, পঞ্চবিংশতি গল্পের অবতারণা করে এবং বিক্রমাদিত্য তাহার যথাযথ উত্তর দেন। তখন সন্তুষ্ট হইয়া বেতাল তাঁহাকে সন্ন্যাসীর নিগূঢ় উদ্দেশ্যের বিষয় বিবৃত করে। সন্ন্যাসী তাঁহাকে হত্যা করিয়া স্বয়ং সিদ্ধিলাভ করিবেন, সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। বেতালের নিকট সেই সন্ন্যাসীর নিগূঢ় অভি-প্রায় জানিতে পারিয়া বিক্রমাদিত্য খড়্গাঘাতে সন্ন্যাসীকে নিহত করেন। তাহাতে, বেতালের উপদেশ অনুসারে, বিক্রমাদিত্যের সিদ্ধিলাভ ঘটে। স্থূলতঃ, ইহাই বেতাল-পঞ্চবিংশতির বর্ণনীয় বিষয়। তবে বেতাল-কথিত গল্পে ও প্রশ্নে অনেক নীতিশিক্ষা পাওয়া যায়। এরূপ সরল শিক্ষাপ্রদ কৌতূহলোদ্দীপক গল্প অতি অল্পই আছে; তাই এই গ্রন্থ বহু বৈদেশিক ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। বেতাল পঞ্চবিংশতি গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া তিন জন গ্রন্থকারের নাম উল্লিখিত হইয়া থাকে;—বেতালভট্ট, শিবদাস, জম্ভলদত্ত। ইঁহাদের মধ্যে শিবদাসভট্টের নামই বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়। বেতাল পঞ্চবিংশতি গ্রন্থে একটা বিশেষ সময়ের রীতি-নীতির ও আচার-ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। বেতাল-পঞ্চবিংশতির পরই কথাসরিৎসাগরের প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য। কথাসরিৎসাগর—কাশ্মীর-দেশীয় পণ্ডিত সোমদেব কর্তৃক সংস্কৃত ভষায় লিখিত হয়। পৌত্র হর্ষদেবের অকাল-মৃত্যুতে রাজ্ঞী সূর্য্যবতী অধৈর্য্য হন। তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য পণ্ডিত সোমদেব ঐ গল্পগুলি লিপিবদ্ধ করেন। কথিত হয়, কথাসরিৎসাগরের গল্পাংশ, দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত পৈশাচী ভাষায় লিখিত বৃহৎকথা নামক গ্রন্থের সার-সঙ্কলনে গ্রথিত হইয়াছিল। গ্রন্থের উপক্রমণিকায়

কথাসরিৎসাগর।

লিখিত আছে,—পাণিনির সমালোচক ও চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী কাত্যায়ন এই কথাসরিৎসাগরের গল্পগুলির প্রবর্ত্তয়িতা। তাঁহার নিকট হইতে একজন পিশাচ কর্তৃক ঐ গল্পগুলি দাক্ষিণাত্যে প্রচারিত হয়। গুণাঢ্য উহা পৈশাচী-ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। রামায়ণ-মহাভারতের গল্প, পুরাণের বহু গল্প, পঞ্চতন্ত্রের অনেক উপাখ্যান, বেতাল-

পঞ্চবিংশতির পঁচিশটী গল্প এবং বিক্রমাদিত্যের সংক্রান্ত বহু কাহিনী এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। বিক্রমাদিত্যের জন্ম-সম্বন্ধে এই গ্রন্থে একটু পরিচয় পাওয়া যায়। তদনুসারে বিক্রমাদিত্যের পিতার নাম মহেন্দ্রাদিত্য এবং মাতার নাম সৌম্যদর্শনা; বিক্রমাদিত্য—ভীমশীল নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। সেই সময়ে ভারতবর্ষে ম্লেচ্ছগণের উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছিল। সেই উপদ্রব দমন জন্য বিক্রমাদিত্যের জন্ম হয়,—এই গ্রন্থে তাহাই প্রকাশ। এই কথা-সরিৎসাগরে বৌদ্ধ জাতক-গ্রন্থেরও বহু উপাখ্যান ও ভাব স্থান পাইয়াছে। এই কথাসরিৎ-সাগর ১০৭০ খৃষ্টাব্দে সঙ্কলিত হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। সোমদেবের কথাসরিৎসাগর রচনার প্রায় তেত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে (১০৩৭ খৃষ্টাব্দে) ক্ষেমেন্দ্র ব্যাসদাস নামক কাশ্মীর-দেশীয় অপর এক পণ্ডিত বৃহৎকথামঞ্জরী নামে এক গল্প-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সে গ্রন্থ কথাসরিৎসাগর অপেক্ষা ক্ষুদ্র;—উহার এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। ঐ গ্রন্থে কথাসরিৎসাগরের গল্প ক্ষেমেন্দ্র স্বতন্ত্র-ভাবে পৈশাচী ভাষা হইতে সংস্কৃত-ভাষায় রূপান্তরে লিখিয়াছিলেন। কথাসরিৎসাগরের ৬০ম—৬৪ম তরঙ্গে পঞ্চতন্ত্রের প্রথম তিন ভাগ যথাযথ স্থান পাইয়াছে। ৫৭০ খৃষ্টাব্দে পহ্লবী-ভাষায় পঞ্চতন্ত্রের যে অনুবাদ হইয়াছিল, সেই অনুবাদ-অংশের সহিত কথাসরিৎসাগরের অন্তর্নিহিত পঞ্চতন্ত্রের গল্পাংশের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। সেইজন্য ঐ গ্রন্থ হইতেই পহ্লবী-ভাষায় পঞ্চতন্ত্রাংশ অনুবাদিত হইয়াছিল বলিয়াও কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন। পারাবতের প্রাণরক্ষার জন্য শিবি রাজার প্রাণদানের বিবরণ প্রথম মহাভারতে ও পুরাণে দৃষ্ট হয়। জাতক-গ্রন্থেও ঐ গল্প আছে। চীনাদিগের এবং মুসলমানদিগের সাহিত্যের মধ্যেও ঐ আখ্যান রূপান্তরে দৃষ্ট হয়। সোমদেবের কথাসরিৎসাগরেও ঐ আখ্যান স্থান পাইয়াছে। ফলতঃ, অদ্ভুত অলৌকিক বিবিধ গল্পকথার সমবায়ে কথাসরিৎসাগর বিরচিত হয়। কথা-সরিৎসাগর প্রকাণ্ড গ্রন্থ; মহাভারতের প্রায় এক-চতুর্থাংশ। ইহা অষ্টাদশ লম্বকে বা খণ্ডে বিভক্ত। ইহাতে চতুর্ব্বিংশত্যধিক শততম তরঙ্গ বা পরিচ্ছেদ আছে। কথাসরিৎসাগর এবং বৃহৎকথামঞ্জরী উভয়ই শ্লোকে নিবদ্ধ। কথাসরিৎসাগরের শ্লোকসংখ্যা দ্বাবিংশ সহস্রের কম নহে। কথাসরিৎসাগর ও বৃহৎকথামঞ্জরীর সহিত গুণাঢ্যের সম্বন্ধের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তিনিই প্রথমে বৃহৎকথা নামে পৈশাচী-ভাষায় এক বিস্তৃত গ্রন্থ লিখিয়া-ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।* সেই গ্রন্থের অংশবিশেষ অবলম্বনে কথাসরিৎসাগর প্রভৃতি বিরচিত হইয়াছিল। এ বিষয়েও একটী গল্প আছে। দাক্ষিণাত্যে সাতবাহন নামে এক নৃপতি ছিলেন। ভাষাজ্ঞান-লাভের জন্য তিনি ব্যাকরণ-শিক্ষায় প্রবৃত্ত হন। গুণাঢ্য ব্যাকরণ-শিক্ষার বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। 'ব্যাকরণ শিখিতেই জীবন কাটিয়া গেলে, কবে আর আপনি ভাষা শিক্ষা করিবেন?'—রাজাকে গুণাঢ্য এইরূপ উপদেশ দেওয়ায়, মন্ত্রী প্রভৃতির পরামর্শে গুণাঢ্যের প্রতি রাজা বিরূপ হন। সর্ব্ববর্ম্মা নামক জনৈক পণ্ডিত কলাপ-ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়া

---

* বাণভট্টের হর্ষচরিত, দণ্ডীর কাব্যাদর্শ এবং সুবন্ধুর বাসবদত্তা গ্রন্থে এই বৃহৎকথার উল্লেখ আছে। হর্ষচরিতে যথা,—"সমুদ্দীপিত কন্দর্পা কৃতগৌরী প্রসাধনা। হরলীলেব নো কস্য বিস্ময়ায় বৃহৎকথা॥" কাব্যাদর্শে যথা,—"কথা হি সর্ব্বভাষাভিঃ সংস্কৃতেন চ বধ্যতে। ভূতভাষাময়ীং প্রাহুরদ্ভুতার্থাং বৃহৎকথাম্॥" বাসবদত্তায় যথা,—"কেচিৎ বৃহৎকথানুবন্ধিনো গুণাঢ্যাঃ।"

রাজাকে ভাষাশিক্ষা-দানে প্রবৃত্ত হন। গুণাঢ্যকে রাজ্য হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। গুণাঢ্য কিছুকাল মৌনীভাবে দিনযাপন করিয়া, পরিশেষে কোনও ব্যাকরণের সাহায্য ব্যতিরেকে, বৃহৎকথা নামক বৃহত্তম গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কিন্তু রাজা বিরূপ; সুতরাং রাজমধ্যে সে গ্রন্থের আদর হয় না। মনঃক্ষোভে গুণাঢ্য গ্রন্থখানিকে অনলে ভস্মীভূত করিতে প্রবৃত্ত হন। গ্রন্থের পঞ্চমাংশ মাত্র যখন ভস্মীভূত হইতে অবশিষ্ট ছিল, সেই সময় রাজা আসিয়া গ্রন্থ-রক্ষাকল্পে যত্নবান হন। এইরূপে গ্রন্থের যে অংশটুকু রক্ষা পাইয়াছিল, তাহাই অবলম্বনে কথাসরিৎ-সাগর প্রভৃতি রচিত হয়। সাতবাহন রাজার রাজত্বকাল খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং বৃহৎকথা কোন্ সময় রচিত হইয়াছিল এবং গুণাঢ্য কোন্ সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, এই উপাখ্যানে তাহার আভাষ পাওয়া যায়। শুকসপ্ততি গ্রন্থে, পতির বিদেশ-গমনে পত্যন্তর-গ্রহণাভিলাষিণী রমণীর প্রতি গল্পচ্ছলে শুক পক্ষীর উপদেশ বিবৃত আছে। পরপুরুষের সঙ্গলাভাভিলাষিণী হইয়া রমণী শুক পক্ষীর পরামর্শপ্রার্থী হয়। শুক মৌখিক সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া গল্পচ্ছলে কয়েকটী প্রশ্ন উত্থাপন করে। প্রশ্ন সকলের স্থূল মর্ম্ম এই যে, যদি এরূপ অবস্থা ঘটে, তবে সে কি করিবে? রমণী প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। পররাত্রে সেই বিষয়ের আলোচনা হইবে বলিয়া শুক রমণীকে প্রতীক্ষা করিতে কহে। এইরূপে সত্তর দিন কাটিয়া যায়। ইতিমধ্যে রমণীর স্বামী বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসেন। ইহাই শুকসপ্ততি গ্রন্থের মূল উপাখ্যান। ভোজ-প্রবন্ধ, সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা প্রভৃতিও এই শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট। সিংহাসন-দ্বাত্রিংশিকারই অপর নাম—দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা। দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ভোজ-প্রবন্ধ ভোজরাজের সময় রচিত হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। উহার রচয়িতা—বল্লাল কবি। ঐ গ্রন্থে উদ্ভট শ্লোকের সঙ্গে সঙ্গে গল্পচ্ছলে অনেক সমসাময়িক বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। যদিও উহা গল্প-গ্রন্থ, কিন্তু বহু ঐতিহাসিক তত্ত্ব উহার অন্তর্নিবিষ্ট আছে বলিয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন। এইরূপ-ভাবে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, সংস্কৃত-সাহিত্য উপাখ্যানাদি সম্বন্ধেও পৃথিবীর কোনও সাহিত্য অপেক্ষা হীন নহে। আর তাহা হইতে বৈদেশিকগণ বহু উপাদান প্রাপ্ত হইয়াছেন। সাধারণতঃ সংস্কৃত ভাষায় গদ্য-সাহিত্যের সংখ্যা কিছু অল্প বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু কাব্য, মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য প্রভৃতির তুলনায় গদ্য সাহিত্যের সংখ্যা সংস্কৃত-ভাষায় অল্প বলিয়া গদ্য-সাহিত্য যে সংস্কৃত-ভাষায় সর্ব্বথা পরিপুষ্ট হয় নাই, তাহা বলিতে পারা যায় না। কাব্য, মহাকাব্য, খণ্ড-কাব্য প্রভৃতি অনেক সময় অনেকের কণ্ঠস্থ হইয়া থাকে; সুতরাং সহজে লোপপ্রাপ্ত হয় না। কিন্তু গদ্য-সাহিত্য কণ্ঠস্থ থাকে না; সুতরাং লোপ পাইয়া যায়। কেবল যে গল্পমূলক ও নীতিমূলক গদ্য-সাহিত্য অধুনা দেখিতে পাইতেছি, উহাই সংস্কৃত-ভাষায় গদ্য-সাহিত্যের প্রকৃষ্ট সম্পদ বলিয়া তাই মনে হয় না। মনে হয়,—গদ্য-সাহিত্যের অত্যুৎকৃষ্ট অনেক রত্ন লোপ পাইয়াছে; কেবল উপাখ্যান-মূলে যেগুলি স্থান পাইয়াছিল, সেই গুলিই জীবিত আছে। অপিচ, ধর্ম্মের সহিত—নীতির সহিত ঐ গুলির সম্বন্ধ আছে বলিয়াই উহারা অমর হইয়া থাকিবে।

শুকসপ্ততি, ভোজপ্রবন্ধ প্রভৃতি।

ধর্ম্মের সহিত—নীতির সহিত সংস্রব রাখিয়া কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন বলিয়াই ভারতের অনেক কবি অমর হইয়া আছেন। খণ্ড-কাব্য, মহাকাব্য প্রভৃতির আলোচনায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রসঙ্গে যাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছি, যে বিষয়েই তাঁহারা কবিতা রচনা করিয়াছেন, অসাধারণ প্রতিভা-প্রভাবে সেই বিষয়েই তাঁহারা চির-যশস্বী হইয়া আছেন। কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মপ্রাণতার জন্য —নীতিপরায়ণতার জন্য আরও অসংখ্য কবি যে অমর হইয়া থাকিবেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। খণ্ড-কাব্য রচনায় কৃতিত্ব-প্রদর্শন প্রসঙ্গে পূর্ব্বে ভর্তৃহরির নাম উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার অধিক প্রতিভাসম্পন্ন আর এক মহাপুরুষের নাম খণ্ড-কাব্য প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। সে মহাপুরুষ—শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য। তিনি যেমন দর্শন-শাস্ত্রালোচনায় অলৌকিক প্রতিভা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তত্ত্বকথামূলক খণ্ড-কবিতা রচনায়ও তাঁহার সেইরূপ অসাধারণ শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। ভর্তৃহরি যে সুরে যে গান গাহিয়াছিলেন, সে বিবেক-বৈরাগ্য-মূলক সঙ্গীতে শঙ্করাচার্য্যের সমকক্ষ বোধ হয় দ্বিতীয় দৃষ্ট হয় না। তাঁহার মোহমুদ্গার—সংসার-মোহ-নাশের অমোঘ অস্ত্র-স্বরূপ। ভর্তৃহরির বৈরাগ্য-শতকে যে ভাব অঙ্কুরিত মুকুলিত, মোহমুদ্গারে তাহা পূর্ণ প্রস্ফুটিত। ভর্তৃহরি স্ত্রীর প্রতি বিরাগ-বশতঃ বলিয়াছিলেন,—'তাহার কথা স্মরণ করিতেও হৃদয় যাতনায় অস্থির হয়; তাহার দর্শনে উন্মত্ততা বৃদ্ধি পায়; তাহার স্পর্শে জ্ঞান লোপপ্রাপ্ত হয়। জানি-না, কেমন করিয়া তাহার প্রতি ভালবাসা আসে?' কিন্তু শঙ্করাচার্য্য কহিলেন,—'কেই বা স্ত্রী, কেই বা পুত্র!—এ সংসারে কেহ তোমার আপনার নয়! এই বুঝিয়া তত্ত্ব-চিন্তায় রত হও।' ভর্তৃহরি স্ত্রীর ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন; শঙ্করাচার্য্য সংসারের আত্মীয়-স্বজনের ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া, ঐ বৈরাগ্য-বাণী ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আত্মীয়-স্বজন তাঁহার প্রতি কি দুর্ব্ব্যবহারই না করিয়াছিলেন! দায়াদগণের চক্রান্তে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া শঙ্করাচার্য্যকে গৃহত্যাগী হইতে হয়। সংসারে একমাত্র জননী তাঁহার আশাপথ চাহিয়া দিনযাপন করিতেছিলেন। সহসা জননী পীড়িতা হইলেন। প্রতিবেশিগণ আত্মীয়-স্বজনগণ কেহই চাহিয়া দেখিলেন না। জননীর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে, কি জানি প্রাণ কেমন করিয়া উঠিয়াছিল; তাই শঙ্করাচার্য্য গৃহে ফিরিয়া আসেন। গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যে দৃশ্য অবলোকন করেন, তাহাতে প্রাণে মর্ম্মন্তুদ যাতনা অনুভূত হয়। জননী একাকিনী আসন্নমৃত্যুশয্যাশায়িনী!—নিকটে গণ্ডুষ-জল-প্রদানের কেহই নাই। আত্মীয়গণ দূর হইতে উপেক্ষার হাসি হাসিতেছেন। এইরূপ অবস্থায় পুত্রের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শঙ্কর-জননী লোকান্তর-গামিনী হইলেন। ক্ষোভে, বিষাদে, বিষম আত্মগ্লানিতে শঙ্করের হৃদয় সন্তপ্ত হইল। অসহায়ে একাকী আপন গৃহ-প্রাঙ্গণে তিনি জননীর সৎকার-কার্য্য সমাপন করিলেন। তার পর সাশ্রুনয়নে জননী জন্মভূমির নিকট চিরতরে বিদায় লইলেন। আত্মীয়-স্বজনের প্রতি বিরক্তি-বশতঃ নহে;—কিসে জীবের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিতে পারেন, কিসে মানুষের আত্মপর-ভেদ জ্ঞানের অবসান হয়,—তাহারই উপায় অনুসন্ধানে শঙ্কর সংসার ত্যাগ করিলেন। যে সময়ে এই বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, সেই সময়ই তিনি মোহমুদ্গর

শঙ্করাচার্য্য।
(জীবন-কথা)

রচনা করিয়াছিলেন। সংসার-ত্যাগী হইয়া দেশ-দেশান্তরে পরিভ্রমণানন্তর শঙ্কর বেদান্ত-ভাষ্য, গীতাভাষ্য প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। জ্যোতিষ-শাস্ত্রেও তিনি অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় কাশীধামে এক মহাপুরুষের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। মহাপুরুষ বুঝিতে পারেন, শঙ্কর উন্নতির মার্গে উপস্থিত হইয়াছেন বটে ; কিন্তু শ্রেষ্ঠ-স্থান লাভ করিবার পক্ষে তখনও সামান্য অন্তরায় আছে। এই বুঝিয়া, জ্যোতিষ সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্যের একটু অহমিকার ভাব দেখিয়া, মহাপুরুষ জ্যোতিষ-সংক্রান্ত প্রশ্নের সমাধানে শঙ্করচার্য্যকে এক সমস্যায় ফেলেন। মহাপুরুষ আপনার একজন শিষ্যের ভাগ্য-গণনা জন্য শঙ্করাচার্য্যকে অনুরোধ করেন ; শঙ্করাচার্য্য, শিষ্যের মৃত্যুর দিন নির্দ্ধারণ করিয়া বজ্রাঘাতে মৃত্যু হইবে বলিয়া দেন। মহাপুরুষ সেই নির্দ্দিষ্ট দিনে যোগবলে শিষ্যের চৈতন্য হরণ করেন, এবং তাহাকে মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখেন। শঙ্করের গণনা-মতে বজ্র যথানির্দ্দিষ্ট কালে যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে শিষ্যের উপর পতিত হয়। কিন্তু চৈতন্যহীন দেহে বজ্রের ক্রিয়া হয় না। মহাপুরুষ পরিশেষে যোগ-বলে শিষ্যকে জাগাইয়া তুলেন। এই ঘটনায় শঙ্করাচার্য্য বিস্মিত হন। অঙ্গীকার-মতে শঙ্করা-চার্য্যের গ্রন্থ-সমূহ গঙ্গার জলে নিক্ষিপ্ত হয়। সঞ্চিত-ধন গ্রন্থরত্ন বিসর্জ্জন দিয়া, শঙ্করাচার্য্য বড়ই ম্রিয়মাণ হন। মহাপুরুষ তাহা বুঝিতে পারিয়া, শঙ্করাচার্য্যকে গঙ্গাতীরে গিয়া গঙ্গাদেবীর নিকট প্রার্থনা জানাইতে বলেন। সেই প্রার্থনার ফলে গ্রন্থগুলি তরঙ্গের সহিত তীরে উপ-নীত হয়। শঙ্করাচার্য্যের বিস্ময়ের অবধি থাকে না। মহাপুরুষ তখন শঙ্করাচার্য্যকে কর্ম্ম ও আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে উপদেশ দেন। শঙ্করাচার্য্য তাহাতে বুঝিতে পারেন, মায়াই সকল অনিষ্টের মূলাধার। তখন গ্রন্থগুলি পুনরায় আপনিই জলমধ্যে নিক্ষেপ করেন ; বিদ্যার অভিমান, জ্ঞানের অভিমান, ধর্ম্মের অভিমান—সকলই সেই সঙ্গে সঙ্গে বিসর্জ্জিত হয়। ইহার পরই শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈত-জ্ঞান লাভ করেন। বত্রিশ বর্ষ বয়সে কেদারনাথ তীর্থে শঙ্করাচার্য্য দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। কেরল-দেশের অন্তর্গত চিদম্বর তাঁহার জন্মস্থান বলিয়া পরিচিত। পণ্ডিতগণের গবেষণা অনুসারে ৭৮৮ খৃষ্টাব্দ তাঁহার জন্ম-বর্ষ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অল্পদিন মাত্র ইহসংসারে অবস্থান করিয়া শঙ্করাচার্য্য অবিনশ্বর কীর্ত্তি-স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন। বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্মের কবল হইতে তিনি ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার সাধন করেন। কর্ম্ম মধ্যে তাঁহার বিভূতি প্রকাশ পায় ; তিনি শঙ্করাবতার শঙ্কর বলিয়া সম্পূজিত হন। শঙ্করাচার্য্যের জীবনী-সম্বন্ধে সাধারণ দৃষ্টিতে এবম্বিধ মত প্রচারিত আছে। কিন্তু একটু অনুসন্ধান করিলে তাঁহার জীবনের নানা রহস্যময় কাহিনী অবগত হইতে পারা যায়। শঙ্করা-চার্য্যের জীবন-কাহিনী অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় তাঁহার অসংখ্য জীবনচরিত বিরচিত হইয়াছে। তৎসমুদায়ে লোকোত্তর চরিতের বহু তথ্য নিহিত আছে। দূর অতীত কালে সংস্কৃত-ভাষায় তাঁহার যে সকল জীবনচরিত দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে শঙ্করদিগ্বিজয় (আনন্দগিরি কৃত), শঙ্করবিজয় (চিদ্বিলাস যতি বিরচিত), সংক্ষেপশঙ্করবিজয় (মাধবাচার্য্য কৃত), লঘুশঙ্করবিজয় (নীলকণ্ঠ, সদানন্দ, ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি বিরচিত), শঙ্করাভ্যুদয় (তিরুমল্ল দীক্ষিত প্রণীত), শঙ্করবিজয়-সংগ্রহ (পুরুষোত্তম ভারতী বিরচিত) বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই বিভিন্ন জীবনচরিতের আলোচনায় শঙ্করের জীবনের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ

পরিতুষ্ট হয়। তাঁহার পিতার নাম শিবগুরু, মাতার নাম সতীদেবী (মতান্তরে ভদ্রা)। তাঁহার জন্মস্থান—দাক্ষিণাত্যের কেরল-প্রদেশের কালাদি (কাল্‌টি) গ্রাম। ঐ গ্রাম পূর্ণা-নদীর তীরে অবস্থিত। এই মতই প্রসিদ্ধ; কিন্তু 'শঙ্করবিজয়' অন্য মত প্রকাশ করেন। তদনুসারে শঙ্করের মাতার নাম বিশিষ্টা, পিতা বিশ্বজিৎ। বিশিষ্টা—মহাদেবের আরাধনায় সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহার পতি বিশ্বজিৎ তাহাতে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। এই সময় দেবাদিদেব মহাদেব জ্যোতিঃরূপে মুখবিবর দিয়া বিশিষ্টার উদরে প্রবিষ্ট হন। তাহাতে গর্ভ-সঞ্চার হয়; আর সেই গর্ভে স্বয়ং শঙ্কর শঙ্করাচার্য্য রূপে জন্মগ্রহণ করেন। মহাপুরুষ-গণের আবির্ভাব সম্বন্ধে অনেক স্থলেই এইরূপ অলৌকিক কাহিনী প্রচারিত আছে।

আবির্ভাব-কাল নির্ণয়ে।

জন্মকাল সম্বন্ধেও এবম্বিধ মতান্তরের অবধি নাই। এক প্রকার গণনায় শঙ্করাচার্য্য খৃষ্ট-জন্মের ৪৬৯ বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়; আবার অন্য প্রকার গণনায় খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে তাঁহার আবির্ভাব-কাল নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। সূক্ষ্ম-গণনায় পণ্ডিতগণ কেহ বা ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে, কেহ বা ৬৮৮ খৃষ্টাব্দে শঙ্করাচার্য্যের জন্মকাল নির্দ্দেশ করেন। শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে এইরূপ মতান্তর ঘটার প্রধান কারণ,—শক, সন প্রভৃতির গণনায় গণ্ডগোল। * 'শঙ্করবিজয়' গ্রন্থে তাঁহার জন্ম সন লিখিত নাই; লিখিত আছে,—তাঁহার জন্ম-সময়ে বৃহস্পতি কেন্দ্রে, রবি মেষ রাশিতে, শনি তুলা রাশিতে এবং মঙ্গল মকর রাশিতে সংস্থিত ছিলেন। † এ মন্তব্যে নানারূপ গণনা হইতে পারে। মতান্তরের এই এক প্রধান কারণ। অন্য কারণ,—বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত উদ্ভট-শ্লোকে শঙ্করের আবির্ভাব-কাল-নির্ণয়ের প্রয়াস। একটি উদ্ভট শ্লোক পাওয়া যায়,—

"দুষ্টাচারবিনাশায় প্রাদুর্ভূতো মহীতলে। স এব শঙ্করাচার্য্যঃ সাক্ষাৎ কৈবল্যদায়কঃ॥
নিধিনাগেভবহ্ন্যব্দে বিভবে শঙ্করোদয়ঃ। অষ্টবর্ষে চতুর্ব্বেদান্ দ্বাদশে সর্ব্বশাস্ত্রকৃৎ॥
ষোড়শে কৃতবান্ ভাষ্যং দ্বাত্রিংশে মুনিবভ্যগাৎ॥
কল্যব্দে চন্দ্রনেত্রাঙ্কবহ্ন্যব্দে গুহাপ্রবেশঃ। বৈশাখে পূর্ণিমায়ান্তু শঙ্করঃ শিবতামগাৎ॥

এই শ্লোকটি 'নাস্তিকত্রাস' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। দাক্ষিণাত্যে বেলগ্রামে হস্তলিখিত পুঁথি মধ্যে এই শ্লোকটী প্রাপ্ত হইয়া পণ্ডিতগণ শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের ও তিরোভাবের কাল স্থির করিয়া থাকেন। ‡ ৩৮৮৯ কল্যব্দে (নিধিনাগেভবহ্ন্যব্দে) তাঁহার জন্ম এবং ৩৯২১ কল্যব্দে (চন্দ্রনেত্রাঙ্কবহ্ন্যব্দে) তাঁহার শিবত্ব-প্রাপ্তি নির্দ্দিষ্ট হয়। এই মতের উপরই অধিকাংশ

---

* শঙ্করাচার্য্য-লিখিত গ্রন্থ-মধ্যে ভাষ্যবিচারকালে কতকগুলি দার্শনিক পণ্ডিতের মত আলোচিত হইয়াছে। তাঁহাদের নাম—ঈশ্বরকৃষ্ণ, উদ্দ্যোৎকর, উপবর্ষ, কুমারিল ভট্ট, দ্রবিড়াচার্য্য, প্রভাকর, প্রশস্তপাদ, ভর্তৃপ্রপঞ্চ, বৃত্তিকার, শবরস্বামী। ইঁহাদের সময় নির্দ্ধারণ দ্বারা শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব-কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতেও যে সঠিক বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা মনে করা যায় না।

† শঙ্করাচার্য্যের জন্মকালে গ্রহ-সংস্থান সম্বন্ধে মাধবাচার্য্য কৃত শঙ্করবিজয়-গ্রন্থে এই শ্লোকটী দৃষ্ট হয়,—"জায়াসতী শিবগুরোজর্নতুঙ্গসংস্থে। সূর্য্যে কুজে রবিসুতে চ গুরৌ চ কেন্দ্রে॥"

‡ ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারী পত্রে (Indian Antiquary, Vol. XI.) পত্রে, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে, এই মত প্রথমে প্রচারিত হয়। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে দ্বারাবতী মঠের লিপি আবিষ্কৃত হয়।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত আস্থা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহা অপেক্ষা প্রবল যুক্তিপূর্ণ যে মত, সে মতের ভিত্তিস্থান দ্বারাবতী মঠের পিণাকী-চিহ্নিত লিপি। সে লিপির কিয়দংশ এই,—

"যুধিষ্ঠিরশকে ২৬৩১ বৈশাখশুক্লপঞ্চম্যাং শ্রীমচ্ছঙ্করাবতারঃ।
যুধিষ্ঠিরশকে ২৬৩৬ চৈত্রশুক্লনবম্যাং ভিথাবুপনয়নম্।
" " ২৬৩৯ কার্ত্তিকশুক্লৈকাদশ্যাং চতুর্থাশ্রমস্বীকারঃ।
" " ২৬৪০ ফাল্গুনশুক্লদ্বিতীয়ায়াং গোবিন্দপাদাদুপদেশঃ।
তত আরভ্য ২৬৪৬ জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণ ৩০ পর্য্যন্তং বদর্য্যাশ্রমে ষোড়শভাষ্যপ্রণয়নম্।
যুধিষ্ঠিরশকে ২৬৪৭ মার্গকৃষ্ণদ্বিতীয়ায়াং মণ্ডনেন সহ বাদারম্ভঃ।
" " ২৬৪৮ চৈ, শু, ৪ মণ্ডনপরাজয়ঃ।
" " ২৬৪৯ চৈ, শু, ৯ মণ্ডনমিশ্রস্যোত্তমাশ্রমগ্রহণম্।
" " ২৬৫০ চৈ, শু, ৩ দিগ্বিজয়মহোৎসবারম্ভঃ।
" " ২৬৫৪ পৌ, শু, ১৫ হস্তামলকাচার্য্যস্য শৃঙ্গপুরপীঠেঽভিষেচনম্।
" " ২৬৬৩ কা, শু, ২৫ নিখিলজগদুদ্ধারকো ভগবান্ শঙ্করো ব্রহ্মাস্ত-তীর্থে নিজ শরীরেণৈব বিমানমাস্থায় কৈলাসং জগাম।"

এ হিসাবে, ২৬৩১ যুধিষ্ঠিরাব্দে আবির্ভাব এবং ২৬৬৩ যুধিষ্ঠিরাব্দে তিরোভাব। এতদনুসারে শঙ্করাচার্য্য খৃষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। জন্ম-গ্রহণানন্তর জাতকর্ম্ম সমাপন মাত্র শিশু শঙ্করাচার্য্য চারিটি মহাবাক্য উচ্চারণ করেন। সেই মহাকাব্য-চতুষ্টয়,—'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'তত্ত্বমসি', 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম,' 'আয়মাত্মা ব্রহ্ম'। পিতা শিবগুরু এই শ্রুতিসার মহাকাব্য-চতুষ্টয় সদ্যোজাত শিশুর মুখে উচ্চারিত হইতে শুনিয়া বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। শিশুর অপূর্ব্ব কান্তি—মনোহর রূপ! দেশ-দেশান্তর হইতে সাধুসন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণগণ দলে দলে শিশুকে দেখিতে আসিলেন। একাদশ দিবসে শুভলগ্নে শিশুর নামকরণ হইল। দশ দিনের শিশু শঙ্করাচার্য্য, দুই বৎসরের বালক অপেক্ষাও হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিমান্ হইয়া উঠিলেন। প্রথম বর্ষে শঙ্করের ভাষা-শিক্ষা সমাপন হইল। পঞ্চম বর্ষের মধ্যেই শঙ্করাচার্য্য, ব্যাকরণ, পুরাণ, অলঙ্কার প্রভৃতিতে পারদর্শিতা লাভ করিলেন। উপনয়নের পূর্ব্বেই শঙ্করের পিতৃবিয়োগ ঘটিল। জননী ভদ্রাদেবী পতির পারলৌকিক কার্য্য সমাপন করিয়া, কিছুদিন পরে পুত্রের উপনয়নের ব্যবস্থা করিলেন। পঞ্চম বর্ষে উপনয়নান্তে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে শঙ্কর গুরুগৃহে শাস্ত্রানুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন। অল্পদিনেই বেদ, বেদাঙ্গ, দর্শন, শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতিতে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি প্রকাশ পাইল। গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনানন্তর শঙ্কর কিছুদিন জননীর সেবা-পরিচর্য্যায় এবং ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠান যাগযজ্ঞাদিতে ব্রতী হন। সেই সময় বহু বিদ্যার্থী শঙ্করের নিকট শিক্ষালাভের জন্য আগমন করেন। উপ-নয়নের পর হইতেই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের জন্য শঙ্করের চিত্ত একান্ত উৎসুক হয়; কিন্তু জননীর আপত্তি-বশতঃ কিছু দিন তাঁহার সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয় না। এই সময়ে এক দিন নদীতে স্নান করিতে যাইলে, এক বৃহদাকার কুম্ভীর শঙ্করকে আক্রমণ করে। শঙ্কর-জননী কোনরূপেই কুম্ভীরের গ্রাস হইতে সন্তানকে মুক্ত করিতে সমর্থ হন না।

শঙ্কর তখন জননীকে বলেন,—'আমায় সন্ন্যাস-গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিলে কুম্ভীর আমায় পরিত্যাগ করিতে পারে।' কুম্ভীররূপী মহেশ্বর যেন শঙ্করকে বিশ্ব-সংসারের কার্য্যে নিযুক্ত হইবার জন্য আহ্বান করিতেছেন,—শঙ্করের উক্তিতে এই ভাব প্রকাশ পায়। পুত্রের প্রাণের মায়ায় জননী শঙ্করের সন্ন্যাস-গ্রহণে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। ইহার পর একজন আত্মীয়ের পরিচর্য্যাধীনে জননীর সেবার ব্যবস্থা করিয়া শঙ্কর সংসারত্যাগী হন। তখন ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ে নাস্তিকতার বিজয়-দুন্দুভি নিনাদিত হইতেছিল। চার্ব্বাক, শূন্যবাদী, নাস্তিক, বৌদ্ধ প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ে তখন বেদ-বিহিত ধর্ম্ম-কর্ম্ম লোপ পাইতে বসিয়াছিল। শঙ্করাচার্য্য সেই সকল ধর্ম্ম-মতের কুজ্ঝটিকা-জাল অপসরণ করিয়া সনাতন ধর্ম্মের দিব্য জ্যোতিঃ প্রকাশ করিলেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে পুনরায় মঠ-মন্দির-সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইল। নির্ব্বাপিত-প্রায় অগ্নি-কণা পুনরায় লকলক শিখা বিস্তার করিল; সনাতন হিন্দুধর্ম্মের জয়নিনাদে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। শঙ্করাচার্য্য ধর্ম্ম-জগতে এক যুগান্তর উপস্থিত করিলেন। তাঁহার সেই ধর্ম্মজীবনের আলোচনায় এ প্রসঙ্গে বিরত থাকিয়া, তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের অংশ-বিশেষের বিষয় উত্থাপন করিতেছি। সংস্কৃত-সাহিত্যে খণ্ড-কাব্যের মধ্যে তিনি যে অনুপম রত্নরাজি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরদিন তাঁহার স্মৃতি জাগরূক করিয়া রাখিবে। 'মোহমুদ্গর' তাঁহার প্রধান রচনা। 'কাল্যপরাধক্ষমাপনস্তোত্রম্', 'আনন্দলহরীস্তোত্রম্', 'গঙ্গা-স্তোত্রম্', 'বেদসারশিবস্তোত্রম্, 'হরগৌরীস্তোত্রম্' প্রভৃতি খণ্ডকবিতাগুলি এক একটী অমূল্য অনুপম রত্নবিশেষ। হরগৌরীস্তোত্রম্ নামক শ্লোকাষ্টকে কি সুন্দরভাবেই তিনি হরগৌরীর স্তুতিবাদ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন! শ্লোকের পাদাংশে গৌরীর ও পাদাংশে মহেশ্বরের বন্দনা—একাধারে কবিত্বের, ভাবুকতার, ও ভক্তিপ্রাণতার নিদর্শন। যথা,—

খণ্ডকাব্যে শঙ্করাচার্য্য।

কস্তূরিকাচন্দনলেপনায়ৈ, শ্মশানভস্মাঙ্গবিলেপনায়।
সৎকুণ্ডলায়ৈ ফণিকুণ্ডলায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ১ ॥
মন্দারমালাপরিশোভিতায়ৈ কপালমালাপরিশোভিতায়।
দিব্যাম্বরায়ৈ চ দিগম্বরায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ২ ॥
চলৎকণৎ কঙ্কণ-নূপুরায়ৈ বিলসৎফণাভাস্বরনূপুরায়।
হেমাঙ্গদায়ৈ চ ফণাঙ্গদায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৩ ॥
বিলোলনীলোৎপল লোচনায়ৈ বিকাশপঙ্কেরুহলোচনায়।
ত্রিলোচনায়ৈ বিষমেক্ষণায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৪ ॥
প্রপঞ্চসৃষ্ট্যে সুখদাশ্রয়ায়ৈ ত্রৈলোক্যসংহারক তাণ্ডবায়।
কৃতস্মরায়ৈ বিকৃতস্মরায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৫ ॥
চাম্পেয়গৌরার্দ্ধশরীরকায়ৈ কর্পূরগৌরার্দ্ধশরীরকায়।
ধম্মিল্লবত্যৈ চ জটাধরায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৬ ॥
অম্ভোধর শ্যামলকুন্তলায়ৈ বিভূতিভূষাঙ্গ জটাধরায়।
জগজ্জনন্যৈ জগদেকপিত্রে নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৭ ॥

সদাশিবানাং পরিভূষণায়ৈ সদাশিবানাং পরিভূষণায়।
শিবান্বিতায়ৈ চ শিবান্বিতায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥৮॥

প্রথম শ্লোকের প্রথম চরণের প্রথমার্দ্ধে 'কস্তূরিকাচন্দনলেপনায়ৈ' এবং দ্বিতীয় চরণের 'সৎকুণ্ডলায়ৈ' ও 'শিবায়ৈ' শব্দদ্বয়, কস্তূরীচন্দনবিলেপিত কনককুণ্ডলবিভূষিত অর্থে, দেবী গৌরীর বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'শ্মশানভস্মাঙ্গবিলেপনায়', 'ফণিকুণ্ডলায়' ও 'শিবায়' শব্দত্রয়ে মহাদেবের চিতাভস্মের বিষয় ও ফণিকুণ্ডলীর বিষয় বুঝা যাইতেছে। এইরূপ প্রতি শ্লোকের অর্দ্ধেকে মহাদেবের বিষয় বলা হইয়াছে। হরগৌরী-স্তোত্রে হরগৌরীর ভেদ-ভাবের মধ্যে যে অভেদ-ভাবের বীজ নিহিত রহিয়াছে, 'ভবানী-স্তোত্রে' সে ভাব পূর্ণতা-প্রাপ্ত হইয়াছে। ভবানী-স্তোত্রে ভাববিভোর শঙ্কর তাই গাহিতেছেন,—

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুর্ন দাতা ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্ত্তা।
ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তির্মমৈব গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥
ভবাব্ধিপারে মহাদুঃখভিরৌ পপাত প্রকামী প্রলোভী প্রমত্তঃ।
সংসার-পাশ-প্রবদ্ধঃ সদাহং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥
ন জানামি দানং ন চ ধ্যানযোগম্ ন জানামি তন্ত্রং ন চ স্তোত্রমন্ত্রম্।
ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাসযোগম্ গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥
ন জানামি পুণ্যং ন জানামি তীর্থম্ ন জানামি মুক্তিং লয়ং বা কদাচিৎ।
ন জানামি ভক্তিং ব্রতং বাপি মাতর্গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥
কুকর্ম্মী কুসঙ্গী কুবুদ্ধিঃ কুদাসঃ কুলাচারহীনঃ কদাচারলীনঃ।
কুদৃষ্টি কুবাক্যপ্রবদ্ধঃ সদাহম্ গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥
প্রজেশং রমেশং মহেশং সুরেশম্ দীনেশং নিশীথেশ্বরং বা কদাচিৎ।
ন জানামি চান্যৎ সদাহং শরণ্যে গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥
বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে জলে চানলে পর্ব্বতে শত্রুমধ্যে।
অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥
অনাথো দরিদ্রো জরারোগযুক্তো মহাক্ষীণদীনঃ সদা জাড্যবক্ত্রঃ।
বিপত্তৌ প্রবিষ্টঃ প্রনষ্টঃ সদাহম্ গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥

এ আর এক স্তর! কেহ পিতা নয়, কেহ মাতা নয়, কেহ বন্ধু নয়, কেহ পুত্র নয়, কেহ পুত্রী নয়,—একমাত্র জগদম্বাই সকলের সারভূত! এখানে মায়ার বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে। মরীচিকা দূরে সরিয়া গিয়াছে। তবে এখানেও তিনি আমি—জননী আর তনয়—এটুকু যেন ভেদ-ভাব রহিয়াছে! মোহমুদ্গরে এই ভেদ-ভাব বিচূর্ণীকৃত ;—মোহকুঠারে এ ভাব ছিন্নবিচ্ছিন্ন। মোহ-নাশের জন্য—চৈতন্য-শক্তি-সঞ্চারের জন্য মোহমুদ্গর ও মোহকুঠার। এই দুইটী রচনার একটু ইতিহাসও আছে। শঙ্করাচার্য্যের সহিত বিচারে মণ্ডনমিশ্র পরাজিত হইলে, মণ্ডনমিশ্রের পত্নী 'উভয়ভারতী' শঙ্করাচার্য্যের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন। সকল শাস্ত্রে শঙ্করাচার্য্য সুপণ্ডিত ছিলেন; কিন্তু রতিশাস্ত্রে তাঁহার আদৌ অভিজ্ঞতা ছিল না। সেই বিষয় বুঝিতে পারিয়া, উভয়ভারতী শঙ্করাচার্য্যকে তদ্বিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে শঙ্করাচার্য্যকে

সন্ন্যাসগ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু সেই অবস্থায় উপনীত হইবার পূর্ব্বে শঙ্করাচার্য্য মোহমুদ্গর ও মোহকুঠার রচনা করিয়া যান। শিষ্যগণকে উপদেশ দেন,—এই মোহমুদ্গর ও মোহকুঠার আমায় শ্রবণ করাইতে পারিলে সকল মোহ দূর হইবে। আমি মুক্ত হইয়া নবজীবন লাভ করিব। রতিশাস্ত্রালাপন প্রসঙ্গে পাছে মনোবিকার সংঘটিত হয়, মহাপুরুষ সে বিকার নিবারণের জন্ম তাই ঐ অমোঘ ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া রাখেন। সংসার-মোহমুগ্ধ মানবের মোহ-পাশ ছিন্ন করার পক্ষে মোহমুদ্গর পরম সহায়। শঙ্করাচার্য্য-কৃত মোহমুদ্গর—

মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং কুরু তনুবুদ্ধে মনসি বিতৃষ্ণাম্।
যল্লভসে নিজকর্ম্মোপাত্তং বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্॥ ১॥

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্।
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ সর্ব্বত্রৈষা কথিতা রীতিঃ॥ ২॥

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ সংসারোঽয়মতীববিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতস্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥ ৩॥

মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥ ৪॥

নলিনীদলগতজলমতিতরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্।
বিদ্ধি ব্যাধিব্যালগ্রস্তং লোকং শোকহতঞ্চ সমস্তম্॥ ৫॥

তত্ত্বং চিন্তয় সততং চিত্তে পরিহর চিন্তাং নশ্বরবিত্তে।
ক্ষণমপি সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥ ৬॥

অষ্টকুলাচলসপ্তসমুদ্রাঃ ব্রহ্মপুরন্দরদিনকররুদ্রাঃ।
নত্বং নাহং নায়ং লোকস্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ॥

যাবদ্বিত্তোপার্জ্জনশক্তস্তাবন্নিজপরিবারো রক্তঃ।
তদনু চ জরয়া জর্জ্জরদেহে বার্ত্তাং কোঽপি ন পৃচ্ছতি গেহে॥ ৮॥

কামং ক্রোধং লোভং মোহং ত্যক্ত্বাত্মানং ভাবয় কোঽহম্।
আত্মজ্ঞানবিহীনা মূঢাস্তে পচ্যন্তে নরক-নিগূঢ়াঃ॥ ৯॥

সুরবরমন্দিরতরুতলবাসঃ শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ।
সর্ব্বপরিগ্রহভোগত্যাগঃ কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ॥ ১০॥

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ তরুণস্তাবৎ তরুণী-রক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ॥ ১১॥

শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ মা কুরু যত্নং কলহে সন্ধৌ।
ভব সমচিত্তঃ সর্ব্বত্র ত্বং বাঞ্ছস্যচিরাদ্ যদি বিষ্ণুত্বম্॥ ১২॥

যাবজ্জননং তাবন্মরণং তাবজ্জননী-জঠরে শয়নম্।
ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ, কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ।

দিনযামিন্যৌ সায়ং প্রাতঃ শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ॥ ১৪॥

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডম্।
করধৃতকম্পিতশোভিতদণ্ডং তদপি ন মুঞ্চত্যাশাভাণ্ডম্॥ ১৫॥
ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুর্ব্যর্থং কুপ্যসি ময্যসহিষ্ণুঃ।
সর্ব্বং পশ্যাত্মন্যাত্মানং, সর্ব্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানম্॥ ১৬॥
ষোড়শ পজ্‌ঝটিকাভিরশেষঃ, শিষ্যাণাং কথিতোহভ্যুপদেশঃ।
যেষাং নৈষ করোতি বিবেকং, তেষাং কঃ কুরুতামতিরেকম্॥ ১৭॥

যেমন মোহমুদ্গরে তেমনই মোহকুঠারে সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিবার উপদেশ দৃষ্ট হয়। সাধন-পঞ্চক, ধ্যানাষ্টক, কৌপীনপঞ্চক প্রভৃতি শঙ্করাচার্য্য-বিরচিত খণ্ড-কবিতাগুলি সংসার-সমুদ্র-তরণের তরণী-স্বরূপ। ধ্যানাষ্টকে এবং কৌপীন-পঞ্চকে পরম-পদার্থের স্বরূপ তত্ত্ব তিনি কি ভাবে বুঝিয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া গিয়াছিলেন। দেহাদি অহঙ্কারভাব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যাঁহারা আত্মাতে সেই আত্মাবলোকন করেন, তাঁহারাই ভাগ্যবান,—এই শিক্ষাই শঙ্করাচার্য্যের সার-শিক্ষা। তাঁহার শিক্ষা,—অজ্ঞান-পঙ্ক-পরিমগ্ন দুঃখের নিদানভূত জন্ম-জরা-মরণ-সমাকুল এই অসার নশ্বর সংসারের মায়াবন্ধন যিনি জ্ঞান-অসি দ্বারা ছিন্ন করিতে পারেন, তিনিই ধন্য।

"অজ্ঞানপঙ্কপরিমগ্নমপেতসারং দুঃখালয়ং মরণ-জন্ম-জরাবসক্তম্।
সংসারবন্ধনমনিত্যমবেক্ষ্য ধন্যা জ্ঞানাসিনা তদবশীর্য্য বিনিশ্চরন্তি॥"

শঙ্করাচার্য্য ও ভর্তৃহরি প্রভৃতির নামে প্রচলিত খণ্ডকবিতা-সমূহকে কেহ কেহ আবার অন্যের রচনা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কবি শিহ্লণ প্রভৃতির নাম এই উপলক্ষে উক্ত হইয়া থাকে। শিহ্লণ—কাশ্মীর-দেশীয় পণ্ডিত। 'শান্তিশতক' গ্রন্থ তাঁহার রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ধর্ম্মভাবোদ্দীপক নীতিসূত্রমূলক কবিতা-রচনায় ভারতে যে কত কবির কবিত্ব-প্রভা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। অনেক কবির কবিত্ব-কুসুম চির-প্রস্ফুটিত রহিয়াছে; কিন্তু তাঁহাদের পরিচয় লোপ পাইয়া গিয়াছে। উদ্ভট আখ্যায় কত খণ্ড-কবিতা আজিও মুখে মুখে প্রচারিত রহিয়াছে; কিন্তু তৎসমুদায়ের রচয়িতার সন্ধান কে করিবে? একমাত্র এই বঙ্গদেশে খণ্ড-কবিতা-রচনায় সংস্কৃত-সাহিত্যে কত কবি যশস্বী হইয়াছিলেন, তাহাও নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। মুসলমানগণের বঙ্গদেশে আগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে 'সাধুক্তিকর্ণামৃত' নামে সংস্কৃত-ভাষায় একখানি খণ্ড-কবিতা গ্রন্থ সঙ্কলিত হয়। ১২০৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীধর দাস সেই গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। ঐ গ্রন্থে ৪৪৬ জন কবির কবিতার কিছু কিছু উদ্ধৃত হইয়াছিল। সেই কবিগণের অধিকাংশই বঙ্গদেশীয়। 'শার্ঙ্গধরপদ্ধতি' নামক আর এক সংগ্রহ-গ্রন্থে ছয় সহস্রাধিক শ্লোক সংগৃহীত হয়। সেই শ্লোকগুলি ২৬৪ জন কবির লিখিত। এই সংগ্রহ-কার্য্য খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সম্পন্ন হইয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। ইহার পর 'সুভাষিতাবলী' নামক সংগ্রহ-গ্রন্থে বল্লভদেব ৩৫০ জন কবির ৩৫০০ শ্লোক সংগ্রহ করেন। এ সকল সংগ্রহ ভিন্ন, ইংরেজ-রাজত্বের প্রারম্ভে একজন জর্ম্মাণ পণ্ডিত, ডক্টর বোথলিং, কতকগুলি বাছাই বাছাই নীতিমূলক শ্লোক সংগ্রহ করিয়া জর্ম্মাণ ভাষায় অনুবাদিত করেন। তাঁহার সংগ্রহের অধিকাংশই অবশ্য পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সংগ্রহ-গ্রন্থ-সমূহ

খণ্ডকাব্যে অসংখ্য কবি।

ভারতের যে অসংখ্য কবির অস্তিত্ব-পরিচয় প্রদান করিতেছে, তাহা বলাই বাহুল্য। সেই সকল খণ্ড-কবিতার মধ্যে যে অসংখ্য ভাবকুসুম প্রকটিত আছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? সৎসঙ্গের মাহাত্ম্য-বিষয়ে একটী কবিতায় আছে,—'পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দু চন্দ্রকিরণসম্পাতে মুক্তার ন্যায় প্রতিভাত হয়; সৎসঙ্গের এমনই মহিমা!' নম্রতা সম্বন্ধে একটী কবিতায় লিখিত হইয়াছে,—'ফলভারাবনত বৃক্ষ আপনিই অবনত হইয়া পড়ে। জলভারাক্রান্ত মেঘ আপনিই অবনমিত থাকে। সেই ব্যক্তিই মহৎ,—যিনি ধনৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন হইয়াও কখনও অহঙ্কারে প্রমত্ত নহেন।' অন্য আর একটি শ্লোকে দেখি,—'অগাধ-জলসঞ্চারী রোহিৎ মৎস্য বিচলিত হয় না; কিন্তু গণ্ডূষ-পরিমিত জলে শফরী ফড় ফড় করিয়া ঘুরে।' দৃষ্টান্ত কত দেখাইব! ভাবিতে গেলে, বুঝিতে গেলে, খণ্ড-কাব্যের এবং নীতিমূলক উপাখ্যান-সমূহের মধ্যে কি অমূল্য শিক্ষাই নিহিত আছে! জীবনের গন্তব্য-পথ প্রদর্শন কবাব পক্ষে ঐ দুই সামগ্রী অপূর্ব্ব সহায়-স্বরূপ। উহার সকলগুলির মধ্যেই কি যেন সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত আছে! প্রণয়ি-প্রণয়িনীর প্রণয় হইতে প্রেমময়ের প্রতি প্রেমসঞ্চার অধিকাংশ খণ্ড-কাব্যেরই লক্ষীভূত। এ পক্ষে ভর্তৃহরির শতক-গ্রন্থ-সমূহের এবং শ্রীশ্রী-গীতগোবিন্দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। শতকে প্রেমের প্রথম স্তর। আবিলতা আছে,—মলিনতা আছে,—সম্পূর্ণরূপ স্বচ্ছতা আসে নাই; সে প্রেম সলিলের স্বচ্ছতা-সম্পাদনে বৈবাগ্য রূপ নির্ম্মাল্য-সংযোগ ঘটিয়াছিল; যে প্রেম কলুষিত, যে প্রেম অবিশুদ্ধ, সে প্রেমের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ অনাবিল প্রেমের সন্ধান জন্য শতক-গ্রন্থ সমূহ শিক্ষা দিলেন। শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দে সেই শিক্ষার চরম পরিণতি। সংসার যখন সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া, সেই প্রেমময়ের প্রেমে আত্মলীনে সমর্থ হইবে, তখনই প্রেমের প্রকৃত আস্বাদন লাভ করিবে; যে আনন্দের জন্য সারাজীবন উদ্ভ্রান্ত হইয়া ঘুরিতেছে, সেখানে মানুষ সেই আনন্দের আস্বাদ পাইবে। শতক-গ্রন্থসমূহ ও গীতগোবিন্দ পাশাপাশি রাখিয়া যদি কোনও ভাবুক ভক্ত জীবন-গতি-নির্ণয়ে প্রয়াস পান, তিনি যে চিরসুখের অনন্ত-সুখের অধিকারী হইবেন, তদ্বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। বারাঙ্গনা চিন্তামণির কলুষ-প্রেমে বিল্বমঙ্গল যখন আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন, চিন্তামণি তাঁহাকে যে উপদেশ দিয়াছিল, প্রণয়ি-প্রণয়িনীর প্রণয়-ব্যাপারে সেই উক্তিই সর্ব্বথা স্মরণীয়। চিন্তামণি বলিয়াছিল,—'যে প্রেম যে ভাল-বাসা আমার প্রতি দেখিতে পাইতেছি, সেই প্রেম সেই ভালবাসা যদি ভগবানের পাদপদ্মে ন্যস্ত করিতে, না জানি তুমি কত সুখেই সুখী হইতে পারিতে!' চিন্তামণির এবম্বিধ উপদেশেই বিল্বমঙ্গলের জ্ঞানসঞ্চার হয়। চিন্তামণির ঐ উপদেশ-রূপ যে ক্ষীণ অগ্নিশিখা বিল্বমঙ্গলের হৃদয়ে প্রবেশ করে, সেই শিখাই ক্রমশঃ সকল কামাগ্নি ভস্মীভূত করিয়া দিয়া অনাবিল উজ্জ্বল জ্ঞানালোকে পরিণত হয়। সংস্কৃত-সাহিত্যের খণ্ড-কাব্য-সমূহে প্রেম-প্রবাহের মধ্যে এই শিক্ষাই প্রকট হইয়া আছে। এই শিক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে পারিলেই শিক্ষা সার্থক হয়। খণ্ড-কাব্যের মধ্যে এই যে এক গভীর ভাব নিহিত রহিয়াছে, পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন জনের দৃষ্টিতে তাহা আপাতঃ প্রতীয়মান নহে। ভারতের অধিবাসিগণের—সনাতন-

প্রণয়ি-শিক্ষা।

ধর্ম্মাবলম্বিগণের—প্রকৃতির এবং অন্য জাতির প্রকৃতির মধ্যে ঘোর পার্থক্য আছে। অস্মদ্দেশীয় সুধিসজ্জনের দৃষ্টিতে যাহা শুভ-সঙ্কল্প সদনুষ্ঠান, অন্যদীয় জনের নিকট তাহা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ অপকর্ম্ম বলিয়া নিন্দিত হইয়া থাকে। অস্মদ্দেশে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রের বনগমনে, রাজ্যাধিকারী হইয়াও, অনুজ ভরত অনুসরণ করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন, এবং জ্যেষ্ঠ কর্ত্তৃক প্রতিনিবৃত্ত হওয়ায় জ্যেষ্ঠের পাদুকা সিংহাসনে রক্ষা করিয়া জ্যেষ্ঠের ক্রীতদাসরূপে রাজ্য-শাসন প্রজাপালন করিতে প্রবৃত্ত হন। ইউরোপীয়গণের দৃষ্টিতে এ প্রকার জ্যেষ্ঠানুগত্য মানুষের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। দৃষ্টি-বিভ্রম এইরূপই ঘটিয়া থাকে। তাই একরূপ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, শতক-গ্রন্থের পার্শ্বে গীতগোবিন্দের সমাবেশে এক স্বর্গীয় সামগ্রী দৃষ্টিগোচর হয়; এবং ভিন্ন-দৃষ্টিতে দেখিলে উহাতে কলুষিতা, আবিলতা, অশ্লীলতা প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ সংস্কৃত-সাহিত্যের অন্তর্গত উপাখ্যানগুলিতেও দ্বিবিধ ভাবের উৎপত্তি ঘটে। বিরুদ্ধ কথা যাহাই থাকুক; কিন্তু নীতিমূলক ঐ গল্পগুলি জনসমাজের শিক্ষার আধার, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। সংসারীর জীবনগতি-নির্ণয়ে ঐ উপাখ্যান-গুলি অন্ধকারে আলোক-রশ্মির কার্য্য করে। ঐ নীতিগর্ভ উপাখ্যানগুলির উপযোগিতার বিষয় এবং ঐ গুলির অনুকরণে যে অন্যান্য দেশ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন তদ্বিষয় ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ-অনেকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ঐ উপাখ্যানগুলির শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে অধ্যাপক উইলসনের মত এই যে,—'রাজকার্য্যের সুপরিচালনা সম্বন্ধে এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনগতি নির্ণয় পক্ষে ঐ উপাখ্যানগুলির উপযোগিতা কখনই অস্বীকার করা যায় না।' * এল্‌ফিনষ্টোন বলিয়াছেন,—'এই গল্পের ও উপাখ্যানগুলির রচনায় হিন্দুগণ পৃথিবীর সকল জনগণের শিক্ষকের আসন অধিকার করিয়া আছেন।' † হাণ্টার বলিয়াছেন,—'পাশ্চাত্য-দেশের জীবজন্তু-সম্বলিত যত কিছু গল্পের, এমন কি ঈশপের গল্প পর্য্যন্তের, আদি-স্থান ভারতবর্ষ।' ‡ আরব্যোপন্যাস এবং একাধিক-সহস্র-রজনী প্রভৃতির গল্পাবলী ভারত-বর্ষ হইতেই পাশ্চাত্য-দেশে প্রচারিত হইয়াছিল;—পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ উপাখ্যান প্রভৃতির মধ্য দিয়াও আরবে, পারস্যে, রোমে, গ্রীসে—সর্ব্বত্র ভারতের নীতিশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কাব্য-মহাকাব্য-খণ্ডকাব্য-সমূহের মধ্যে যে গভীর জ্ঞান—নিগূঢ় শিক্ষা নিহিত আছে, তাহার ধ্যান-ধারণা সাধনা-সাপেক্ষ। সুতরাং তৎসমুদায়ের মর্ম্মকথা—ভর্ত্তৃহরির, জয়দেবের বা শঙ্করাচার্য্যের তত্ত্বোপদেশ—অন্যদেশ সহসা ধারণা করিতে পারেন না। তাই উপাখ্যানগুলির মধ্য দিয়াই তত্তদ্দেশে নীতি-শিক্ষা-প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছে। একটু উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে পারিলে, মাহমুদগরাদির মোহনীয় ভাব উপলব্ধ হয়।

---

* Wilson's *Essays on Sanskrit Literature*, Vol II.

† "In the comparison of tales and fables they (Hindus) appear to have been the instructors of the rest of mankind"—Elphinstone's *History of India*.

‡ "The fables of animals, familar to the Western world from the time of Esop downwards, had their original home in India."—W. W. Hunter, *Imperial Gazetteer, India*. "The Arabian knights, entertainments are of Hindu origin"—*Vide* Prof. Lassen and the *Theogony of the Hindus by* Bjornstjerna.

সংসার যতই মায়ামোহে প্রলুব্ধ হয়, পাপ-পঙ্কে নিমজ্জিত হইতে যায়, মহাত্মগণের মহাবাণী তাহাকে ততই সাবধান করিয়া দেয়,—মোহ-পঙ্ক হইতে উত্তোলন করিবার চেষ্টা পায়। শঙ্করাচার্য্য প্রমুখ মহাপুরুষগণের মহাবাণী সংসারে যতই বিঘোষিত হইবে,—হৃদয়ে প্রবেশ করিবে, সংসার ততই পাপ-তাপ হইতে মুক্ত হইয়া শান্তিলাভে সমর্থ হইবে।

সংস্কৃত-ভাষার অন্যান্য বিবিধ গ্রন্থ।

কেবল কাব্য-মহাকাব্য-নাটক-উপাখ্যান প্রভৃতিতে সংস্কৃত-সাহিত্য যে পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিয়া আছে, তাহা নহে; সাহিত্যের সকল অঙ্গই ভারতবর্ষে পুষ্টিলাভ করিয়াছিল, সংস্কৃত-সাহিত্যের বিলুপ্তপ্রায় স্মৃতির মধ্যে তাহার প্রমাণ দেদীপ্যমান্ রহিয়াছে। ভাষা কিরূপ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সংস্কৃত-সাহিত্যের ব্যাকরণ, অলঙ্কার-শাস্ত্র ও অভিধান-গ্রন্থসমূহ সে নিদর্শন বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। সংস্কৃত-ভাষায় যে প্রণালীতে ব্যাকরণাদি রচিত হইয়াছে, তাহাতে ভাষার সর্ব্বাঙ্গপুষ্টিরই প্রমাণ দিতেছে। ব্যাকরণ, অলঙ্কার-শাস্ত্র প্রভৃতি যদিও ভাষার ভিত্তিস্থান-নির্দ্দেশক; কিন্তু ভাষা উন্নত পরিপুষ্ট হওয়ার পরই ব্যাকরণাদি রচিত হইয়া থাকে। ঐ সকল গ্রন্থমূলেই ভাষার প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃত-ভাষার ব্যাকরণ, অলঙ্কার-শাস্ত্র, অভিধান-সমূহ কত কাল পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান ছিল, কেহই তাহা নির্ণয় করিতে পারেন না। প্রাচীন বৈয়াকরণদিগের মধ্যে এখন পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও বৈয়াকরণের পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু পাণিনির সূত্রেই প্রকাশ আছে,—তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী আরও চৌষট্টি জন বৈয়াকরণের বিষয় তিনি অবগত ছিলেন। সে চৌষট্টি জন বৈয়াকরণের গ্রন্থের সন্ধান পাইলে, হয় তো তাঁহাদেরও পূর্ব্ববর্ত্তী আরও কত বৈয়াকরণের সন্ধান পাওয়া যাইত। পাণিনির কাল-নির্ণয়েই এখন নানা জনের মস্তিষ্ক নানারূপে বিঘূর্ণিত হইতেছে। তদুল্লিখিত পূর্ব্ববর্ত্তী চৌষট্টি জনের নাম-পরিচয় পাইলে, না-জানি তাঁহাদের কাল-নির্দ্দেশে মস্তিষ্ক আরও কতদূর বিঘূর্ণিত হইত! পাণিনির "অষ্টাধ্যায়ী সূত্রে" তাঁহার পূর্ব্বতন নিম্নলিখিত আচার্য্যগণের নামোল্লেখ আছে; যথা,—"অত্রি, আঙ্গিরস, আপিশলি, কঠ, কলাপী, কাশ্যপ, কুৎস, কৌণ্ডিন্য, কৌরব্য, কৌশিক, গালব, গৌতম, চরক, চাক্রবর্ম্ম, ছাগলি, জাবাল, তিত্তিরী, পারাশর্য্য, পীলা, বভ্রু, ভারদ্বাজ, ভৃগু, মণ্ডুক, মধুক, যস্ক, বড়বা, বরতন্তু, বশিষ্ঠ, বৈশম্পায়ন, শাকটায়ন, শাকল্য, শিলালী, শৌনক, স্ফোটায়ন।" এখন কেবল ইঁহাদের নাম মাত্রই প্রাপ্ত হই; কিন্তু শব্দালঙ্কার বিষয়ে ইঁহারা কি পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার কোনই তথ্য অবগত হওয়া যায় না। পাণিনির ব্যাকরণে বৈদিক ভাষার পরিবর্ত্তন দেখা যায়। সুতরাং তাঁহার ব্যাকরণ-রচনার পূর্ব্বে বৈদিক বৈয়াকরণগণের বিদ্যমানতার বিষয়ও প্রতীত হয়। কিন্তু এখন পাণিনির সম্বন্ধেই নানা বিতর্ক উঠে; সুতরাং উঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণ যে অন্ধকারে বিলীন হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী-সূত্র রচনা সম্বন্ধেই কত গল্প—কত কিংবদন্তী কত ভাবে প্রচলিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। মহেশ্বরের অনুগ্রহে পাণিনি অষ্টাধ্যায়ী-সূত্র-রচনায় সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, ইহাই সাধারণ মত। এক মতে প্রকাশ,—পঞ্জাব-

সংস্কৃত-ভাষার ব্যাকরণ।

প্রদেশের শলাতুর গ্রাম তাঁহার জন্মস্থান; তাঁহার মাতার নাম—দাক্ষী-দেবী। পাটলিপুত্র নগরে বর্ষ উপাধ্যায়ের নিকট তিনি বিদ্যাশিক্ষা করিতে আসেন। কিন্তু গুরুগৃহে দীর্ঘকাল বাস করিয়াও কোনও সুফল লাভ হয় না। সুতরাং তিনি হিমালয় প্রদেশে গমন করিয়া দেবাদিদেব মহাদেবের তপস্যায় রত হন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব তাঁহাকে বিদ্যাদান করেন। পতঞ্জলির মহাভাষ্য, নন্দিকেশ্বর কৃত কারিকা ও পাণিনীয়-শিক্ষা প্রভৃতি বহু প্রাচীন গ্রন্থে তাঁহার এই দেবানুগ্রহলাভের বিষয় লিখিত আছে। আট অধ্যায়ে বিভক্ত বলিয়া পাণিনির ব্যাকরণ অষ্টাধ্যায়ী-সূত্র নামে প্রসিদ্ধ। প্রতি অধ্যায় চারি ভাগে বা পাদে বিভক্ত। গ্রন্থে প্রায় চারি সহস্র সূত্র আছে। ম্যাক্সমুলার, বোথ্‌লিং, লাসেন, বুলার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পাণিনিকে খৃষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর গ্রন্থকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গোল্ড-ষ্টুকারের মতে তিনি খৃষ্ট-জন্মের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু সূক্ষ্ম-গণনা-ক্রমে পাণিনির বিদ্যমান-কাল খৃষ্টজন্মের সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হয়। ডক্টর ভাণ্ডারকর পাণিনিকে খৃষ্ট-পূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীর বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।* পাণিনির ব্যাকরণ সূত্রাকারে গ্রথিত। সুতরাং পরবর্ত্তিকালে টীকা ব্যাখ্যা প্রভৃতির দ্বারা উহার সূত্রসমূহ বিশদীকৃত করা হইয়াছে। বার্ত্তিক, মহাভাষ্য, পরিভাষা প্রভৃতি নামে সেই সকল ব্যাখ্যা পরিচিত। পাণিনি-সূত্রের প্রথম ব্যাখ্যাকর্ত্তা বলিয়া কাত্যায়ন প্রসিদ্ধ। কাত্যায়নের ব্যাখার নাম—বার্ত্তিক। সেই বার্ত্তিক ব্যাখ্যার উপর, পতঞ্জলি মহাভাষ্য রচনা করেন। এই কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি সম্বন্ধে নানা মতান্তর আছে এবং তাঁহাদের বিভিন্ন নাম পরিকল্পিত হইয়া থাকে। পতঞ্জলিকে গোনর্দ্দ এবং কাত্যায়নকে বররুচি, মেধাজিৎ ও পুনর্ব্বসু প্রভৃতি নামেও অভিহিত করা হইয়াছে। সূত্র, বার্ত্তিক ও মহাভাষ্য—এক হিসাবে এই তিন লইয়াই পাণিনির ব্যাকরণ। পতঞ্জলির মহাভাষ্যের 'ভাষ্যপ্রদীপ' নামে একটী টীকা আছে। কৈয়ট নামক জনৈক পণ্ডিত ঐ টীকা রচনা করেন। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ, কৈয়টকে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর পণ্ডিত ও কাশ্মীরদেশের অধিবাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কৈয়ট যে 'ভাষ্য-প্রদীপ' রচনা করিয়া যান, নাগোজী ভট্ট এবং ঈশ্বরানন্দ তাহার টীকা প্রণয়ন করেন। নাগোজী ভট্টের টীকার নাম—পরিভাষেন্দুশেখর; ঈশ্বরানন্দের টীকার নাম—ভাষ্যপ্রদীপবিবরণ। পতঞ্জলির মহাভাষ্যের উপর ভর্ত্তৃহরি যে টীকা লিখিয়া যান, তাহার নাম—বাক্যপদীয়। তিনি শ্লোকে ঐ টীকা লিখিয়াছিলেন। এই সকল এবং অন্যান্য বহু টীকা, ভাষ্য, উপটীকা, উপভাষ্য প্রভৃতির বিষয় আলোচনা করিলে, ব্যাকরণের বিষয়ে কিরূপ গবেষণা চলিয়াছিল, তাহা বেশ প্রতীত হয়। অষ্টাধ্যায়ী ভিন্ন পাণিনি আরও দুই তিন খানি গ্রন্থ রচনা করেন। সেই গ্রন্থ কয়েক খানির নাম—ধাতুপাঠ, লিঙ্গানুশাসন, শিক্ষা-গ্রন্থ প্রভৃতি। পাণিনির ব্যাকরণ অবলম্বনে যে সকল গ্রন্থ পরবর্ত্তিকালে রচিত হয়, তন্মধ্যে পুরুষোত্তমদেবের 'ভাষাবৃত্তি', ভট্টজী দীক্ষিতের 'শব্দকৌস্তুভ' ও 'সিদ্ধান্তকৌমুদী', নাগেশ

* Max Muller's *Ancient Sanscrit Literature*, Dr. Bothlingk's *Panini*, Prof. Lassen's *Indische Alterthumskunde*, Goldstucker's *Panini*, Dr. Bhandarker's Article in the *Journal* of the Bombay Braneh of the Royal Asiatic Society, 1885.

ভট্টের 'পরিভাষাসংগ্রহ', রামচন্দ্র আচার্য্যের 'প্রক্রিয়াকৌমুদী' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। পাণিনীয় দর্শন নামে এক দর্শন-গ্রন্থের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সেই গ্রন্থে সমস্ত শব্দের উৎপত্তি-তত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। 'সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ'কার এই দর্শনের পরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—'শব্দই ব্রহ্ম; সুতরাং শব্দশাস্ত্র আলোচনা করিতে করিতেই মুক্তিলাভ হয়। পাণিনীয় দর্শনের ইহাই প্রতিপাদ্য।' পাণিনির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী, উপবর্ষ, ভাগুড়ী, মাহেশ প্রভৃতি বহু প্রাচীন বৈয়াকরণের নামোল্লেখ হইয়া থাকে। উদ্ভট শ্লোকে প্রকাশ,—মাহেশের ব্যাকরণ-প্রকরণের তুলনায় পাণিনির ব্যাকরণ যেন সমুদ্রের নিকট গোষ্পদতুল্য। বাড়ীর ব্যাকরণে লক্ষাধিক শ্লোকে ব্যাকরণের সূত্রাদি লিপিবদ্ধ ছিল। সে ব্যাকরণও অতি প্রসিদ্ধ। ভাগুড়ী নামক আর এক বৈয়াকরণ ঐ সময়ে যশস্বী হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের সকলেরই স্মৃতি লোপ পাইয়াছে। একমাত্র পাণিনিই এখন প্রাচীন বৈয়াকরণগণের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিতেছেন। অধুনা-প্রচলিত আর আর প্রাচীন ব্যাকরণের মধ্যে কলাপ ও মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বঙ্গদেশে, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে, কলাপ-ব্যাকরণের বিশেষ প্রচলন আছে। পাণিনির ব্যাকরণের পরেই কলাপের আসন নির্দ্দিষ্ট হয়। এই ব্যাকরণের উৎপত্তি সম্বন্ধেও বিবিধ উপাখ্যান প্রচলিত আছে। এক মতে, সর্ব্ববর্ম্মা নামক জনৈক পণ্ডিত এই ব্যাকরণের প্রবর্ত্তয়িতা; অন্য মতে, কুমার কার্ত্তিকেয় হইতে কলাপ-ব্যাকরণের সূত্র-সমূহ তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কুমার হইতে প্রাপ্ত বলিয়া এই ব্যাকরণ 'কুমার-ব্যাকরণ' নামেও অভিহিত হয়। কলাপ-ব্যাকরণের অপর নাম—কাতন্ত্র। ঈষৎ তন্ত্র অর্থাৎ অল্প-সূত্র দ্বারা লিখিত বলিয়াই ইহার নাম কাতন্ত্র (ঈষত্তন্ত্রং কাতন্ত্রম্। ঈষদর্থেঽল্পার্থে বা কঃ)। কলাপ ব্যাকরণের সৃষ্টি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উপাখ্যানটী সর্ব্বপ্রসিদ্ধ। "রাজা শালিবাহন কোনও মহিষীর সঙ্গে জলক্রীড়া করিতেছিলেন। জলসিঞ্চনে সেই রাণী রতিরসে আত্মহারা হইয়া রাজাকে বলিলেন,—'মোদকং দেহি দেবঃ!' অর্থাৎ,—হে দেব! আমাকে উদক (জল) দিও না। মূর্খতাবশতঃ রাজা সেই স্বরঘটিত পদ বুঝিতে না পারিয়া রাণীকে একটী মোদক (মোয়া) প্রদান করিলেন। তাহাতে সেই বুদ্ধিমতী রাণী 'আমার পতি রাজা হইলেও মূর্খ'—এই বলিয়া নিন্দা করিলেন। শালিবাহন, ভার্য্যার সমুদায় কথা গুরু সর্ব্ববর্ম্মার নিকট জ্ঞাপন করিলেন। তখন সর্ব্ববর্ম্মা তাঁহার শিক্ষার জন্য কাতন্ত্র রচনা করিলেন।" এই ব্যাকরণ রচনায় সর্ব্ববর্ম্মাকে কুমার কার্ত্তিকেয়ের আরাধনা করিতে হইয়াছিল। কার্ত্তিকেয়ের ময়ূর দৃষ্টে "সিদ্ধোবর্ণসমাম্নায়োঃ" এই সূত্রটী তাঁহার মুখ হইতে বিনির্গত হয়। কলাপব্যাকরণের বহু বৃত্তি ও টীকা আছে। তন্মধ্যে দুর্গাসিংহ কৃত বৃত্তি প্রসিদ্ধ। সেই বৃত্তি না থাকিলে বোধ হয় কলাপ ব্যাকরণ লোপ প্রাপ্ত হইত। এতদ্দেশ-প্রচলিত কলাপ ব্যাকরণের টীকা ও ব্যাখ্যার মধ্যে রঘুনাথ শিরোমণির ব্যাখ্যা এবং শ্রীপতি, ত্রিলোচন ও কবিরাজ প্রভৃতির কৃত টীকা সাধারণতঃ সমাদৃত। কলাপ ব্যাকরণের পরই মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। অধুনা বঙ্গদেশে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের বিশেষ প্রচলন। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের রচয়িতার নাম—বোপদেব। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করেন। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল ব্যাকরণ প্রচলিত ছিল,

তাহা অপেক্ষা সংক্ষেপ করিয়া বোপদেব মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। পাণিনির সূত্রগুলির ছুই তিনটীকে তিনি এক একটি ক্ষুদ্র সূত্রে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সংক্ষেপের জন্ম তাঁহার সূত্রগুলি উচ্চারণে এবং বুঝিবার পক্ষে কিছু কঠোর হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে দেবগিরি নগরের রাজার সভাসদ বলিয়া বোপদেব পরিচিত। তাঁহার পিতার নাম কেশব এবং তিনি ধনেশ মিশ্রের শিষ্য বলিয়া অভিহিত। তাঁহার সমসাময়িক হেমাদ্রি তাঁহার যে গুণ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি ব্যাকরণ সম্বন্ধে দশটি, সাহিত্য সম্বন্ধে তিনটি, বৈত্তক গ্রন্থ সম্বন্ধে নয়টি এবং স্মৃতিশাস্ত্র বিষয়ে বিবিধ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। বোপদেবের টীকাকারগণের মধ্যে দুর্গাদাস, রামতর্কবাগীশ প্রভৃতির টীকা বিশেষ প্রসিদ্ধ। ব্যাকরণ সম্বন্ধে আরও অনেক গ্রন্থ আছে। সেই সকল গ্রন্থের কতক পাণিনির অনুসরণে, কতক কলাপের অনুসরণে, কতক মুগ্ধবোধের অনুসরণে লিখিত। সুপদ্মব্যাকরণ, সংক্ষিপ্তসারব্যাকরণ, সিদ্ধান্তকৌমুদী, লঘুকৌমুদী প্রভৃতির নাম ব্যাকরণ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

অভিধান
ও
অলঙ্কার-গ্রন্থ।

অভিধান এবং অলঙ্কার-শাস্ত্র সম্বন্ধে সংস্কৃত-ভাষায় বহু গ্রন্থ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে কয়েকখানির সামান্য পরিচয় নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে। অভিধান ও অলঙ্কার-গ্রন্থ-সমূহ প্রায়ই কবিতাছন্দে সংগ্রথিত। ইহাতে মনে হয়, আধুনিক প্রণালীতে লিখিত সাধারণ কোষ-গ্রন্থ সমূহ লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং শ্লোকবদ্ধ-হেতু কয়েকখানি মাত্র অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে। অভিধান বা কোষ-গ্রন্থ সমূহের মধ্যে অমরকোষ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। অমরসিংহ—ঐ অভিধান প্রণয়ন করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এই অমরসিংহ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম রত্ন মধ্যে পরিগণিত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ৫০০ খৃষ্টাব্দে অমরকোষের রচনা-কাল নির্দ্ধারণ করেন; কিন্তু বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন অমরসিংহ, খৃষ্ট-পূর্ব্ব শতাব্দীতে যে বিত্তমান ছিলেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। অমরকোষের আদি নাম—'নানার্থবর্গযুক্তনামলিঙ্গানুশাসন'। কিন্তু সাধারণতঃ উহা 'অমরকোষ' নামেই পরিচিত। এই অভিধান কণ্ঠস্থ করিবার উপযোগী করিয়া লিখিত। অষ্টাদশ বর্গে ইহা বিভক্ত; এক এক বর্গে এক এক ভাবের শব্দ-সমূহ সংকলিত। যেমন, স্বর্গবর্গ, পাতালবর্গ, ভূমিবর্গ, পুরবর্গ, শৈলবর্গ, বনৌষধিবর্গ, সিংহাদিবর্গ, মনুষ্যবর্গ, ব্রহ্মবর্গ, ক্ষত্রিয়বর্গ, বৈশ্যবর্গ, শূদ্রবর্গ, প্রাণিবর্গ, বিশেষ্যনিঘ্নবর্গ, সঙ্কীর্ণবর্গ, নানার্থবর্গ, অব্যয়বর্গ, লিঙ্গাদিসংগ্রহবর্গ। এই অভিধানের মধ্যে বেশ একটি সমসাময়িক ঐতিহাসিক চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এক এক বর্গের বিষয় অনুধাবন করিলে কিরূপ লোক, কিরূপ পশুপক্ষী, কিরূপ ভাষাভাব ছিল, উপলব্ধি হইতে পারে না কি? অমরকোষে প্রায় দশ সহস্রাধিক শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অমরকোষ বিশেষভাবে এ দেশে প্রচলিত। অমরকোষের পর হলায়ুধ প্রণীত অভিধানরত্নমালা (বা রত্নাবলী) সমধিক প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। ৯৫০ খৃষ্টাব্দে এই অভিধান রচিত হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। অন্য মতে, হলায়ুধ পণ্ডিত গৌড়াধিপতি মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সভাসদ ছিলেন বলিয়া পরিচিত আছেন। তাহা হইলে, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে তাঁহার বিত্তমানকাল প্রতিপন্ন হয়। তৃতীয়,—বিশ্বপ্রকাশ বা বিশ্ব নামক অভিধানের নাম উল্লিখিত হয়। মহেশ্বর নামক জনৈক কবি, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে (১১১১

খৃষ্টাব্দে) 'বিশ্বপ্রকাশ' অভিধান রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। একাক্ষর, দ্ব্যক্ষর, ত্র্যক্ষর, অন্তপ্রত্যয়, প্রত্যয় প্রভৃতি ছন্দে এই অভিধান সংগ্রথিত। চতুর্থতঃ—অভিধান-চিন্তামণি, অনেকার্থসংগ্রহ, দেশীনামমালা, নিঘণ্টুশেষ। হেমচন্দ্র নামক জনৈক পণ্ডিত দ্বাদশ শতাব্দীতে এই অভিধান-চতুষ্টয় রচনা করেন। প্রথম অভিধানে প্রতিশব্দ, দ্বিতীয় অভিধানে দ্ব্যর্থার্থসূচক শব্দ, তৃতীয় অভিধানে প্রাকৃত-শব্দ-সমূহ, চতুর্থ অভিধানে উদ্ভিজ্জ-সংক্রান্ত নির্ঘণ্ট প্রদত্ত হইয়াছে। হেমচন্দ্র ১০৮৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন। হেমচন্দ্রের অভিধানে জৈনধর্ম্মের অনেক পারিভাষিক শব্দ দৃষ্ট হয়। তজ্জন্য এই হেমচন্দ্রকে শ্বেতাম্বর জৈনসম্প্রদায়ভুক্ত আচার্য্য হেমচন্দ্র বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। পঞ্চম, অনেকার্থ-সমুচ্চয়—আর একখানি প্রাচীন অভিধান-গ্রন্থ। শাশ্বত নামক জনৈক পণ্ডিত ঐ অভিধান সঙ্কলন করেন। শাশ্বতকে কেহ কেহ অমরসিংহেরও পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ষষ্ঠ,—পুরুষোত্তম-প্রণীত ত্রিকাণ্ডশেষ। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে পুরুষোত্তমের বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন হয়। ইনি হলায়ুধের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ত্রিকাণ্ডশেষ অমরসিংহের কোষগ্রন্থের পরিশিষ্ট মধ্যে পরিগণিত। পুরুষোত্তমের রচিত 'হারাবলী' নামে আর একখানি কোষ গ্রন্থও প্রচলিত আছে। অষ্টম,—নানার্থশব্দ-কোষ বা মেদিনী। গ্রন্থকারের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন,—মেদিনীই তাঁহার নাম ছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই অভিধান সঙ্কলিত হয় বলিয়া অনেক নির্দ্দেশ করেন; কিন্তু অভিধানের শব্দ সমষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে উহাকে আরও পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই মনে হয়। এই সকল কোষগ্রন্থ ভিন্ন, যাদবপ্রকাশ প্রণীত বৈজয়ন্তী, কেশবরচিত কল্পদ্রুমকোষ এবং অন্যান্য গ্রন্থকারগণ প্রণীত ধরণীকোষ, একাক্ষরকোষ, উনাদি কোষ, শব্দার্ণব, মঙ্খকোষ প্রভৃতি বিবিধ অভিধানের নাম এতৎপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। অলঙ্কার-শাস্ত্রের মধ্যে ভরতমুনি প্রণীত নাট্যশাস্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। উহার মূল গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে বটে; তবে কাব্য-মালা প্রভৃতিতে সেই মূল গ্রন্থের কিছু কিছু আভাষ পাওয়া যায় মাত্র। দ্বিতীয় গ্রন্থ—দণ্ডি-প্রণীত কাব্যাদর্শ। প্রায় ৬৫০টী শ্লোকে কাব্যাদর্শ সংগ্রথিত। অলঙ্কার-শাস্ত্রের তৃতীয় গ্রন্থ—কাব্যালঙ্কারবৃত্তি। উহার প্রণেতার নাম—বামন। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের নির্দ্দেশ ক্রমে তিনি অষ্টম শতাব্দীর কবি বলিয়া প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। চতুর্থ গ্রন্থ,—শৃঙ্গারতিলক। নবম শতাব্দীতে কাশ্মীরদেশীয় রুদ্র ভট্ট ঐ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। পঞ্চম—কাব্যালঙ্কার। রুদ্রত শতানন্দ এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তিনি নবম শতাব্দীর গ্রন্থকার বলিয়া পরিচিত। ষষ্ঠ—দশরূপ; ধনঞ্জয় উহার প্রণেতা। দশবিধ নাটকের লক্ষণ উহাতে পরিবর্ণিত। দশম শতাব্দীতে ঐ গ্রন্থ রচিত হয় বলিয়া প্রকাশ আছে। সপ্তম,—কাব্যপ্রকাশ; মম্মট ভট্ট বা মম্মটাচার্য্য এই গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এক সময়ে বঙ্গদেশে এ গ্রন্থের বিশেষ প্রচলন ছিল। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল বলিয়া বিঘোষিত হয়। কিন্তু কাব্য-প্রকাশের মূল বা কারিকা—ভরতমুনির রচিত এবং বৃত্তি বা ব্যাখ্যা মম্মটাচার্য্যের রচিত বলিয়াই প্রসিদ্ধি আছে। অষ্টম—সাহিত্য-দর্পণ। বিশ্বনাথ কবিরাজ ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে উহা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি। সাহিত্য-

দর্পণ অধুনা বিশেষভাব প্রচলিত। এখন সাধারণতঃ অলঙ্কার-শাস্ত্রের দৃষ্টান্তে সাহিত্য-দর্পণের নামই উল্লিখিত হইয়া থাকে। কিন্তু চারি শত বৎসর পূর্ব্বে এ দেশে কাব্য-প্রকাশেরই প্রাধান্ত অপ্রতিহত ছিল। তখন কাব্য-প্রকাশ অধ্যাপনার জন্ত চতুষ্পাঠী ছিল এবং শ্রীচৈতন্তদেব প্রমুখ মনীষিগণ কাব্যপ্রকাশ পাঠে প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। কাব্য-প্রকাশের একটী শ্লোক শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভু প্রায়ই আবৃত্তি করিতেন এবং সে তাঁহার প্রাণের সামগ্রী ছিল। তাঁহার জীবনের প্রতিচ্ছবি যেন সেই শ্লোকটীতে পরিদৃশ্যমান! শ্লোকটী এই,—

"যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপাঃ।
তে চোন্মীলিত-মালতী-সুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কাদম্বানিলাঃ॥
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ।
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥"

এই শ্লোকে প্রেমময়ের প্রেমের বিষয় পরিবর্ণিত হইয়াছে। সেই তিনি, সেই প্রেমিক পুরুষ বিগ্ন-মান রহিয়াছেন; সেই প্রাণেশ্বর মূর্ত্তিমান আছেন, সেই চৈত্ররজনী উপস্থিত হইয়াছে, সেই প্রস্ফুট মালতীর সৌরভ বহন করিয়া গন্ধবহ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছে; আমিও সেই রহিয়াছি; তবে কেন সেই পূর্ব্ব স্থানের বিষয়—সেই প্রেমরসের কথা প্রাণে কেবলই জাগিয়া উঠিতেছে? কেন সেই বেতসতরুতলে রেবাতটে যাইবার জন্ত প্রাণ আবার উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতেছে?' এইখানে রাধাভাবের বিকাশ দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণবিরহে শ্রীরাধার যে অবস্থা হইয়াছিল, এখানে সেই ভাব প্রকটিত। শ্রীচৈতন্ত রাধাভাবের ভাবুক ছিলেন, কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়াছিলেন; তাই বুঝি ঐ শ্লোকটী তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপে সর্ব্বত্র বিরাজমান আছেন; তথাপি যেন প্রাণ তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। কোথা তিনি, কোথা প্রেমময়!—তাঁহার সন্ধানের জন্য ব্যাকুলতাই বৃদ্ধি পাইয়াছে! তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বঘটে বিরাজমান বুঝিয়াও তাঁহার সহিত সম্মিলনের প্রবল আকাঙ্ক্ষাই এখানে ব্যক্ত হইতেছে। তাই শ্রীচৈতন্যদেব এই শ্লোকটীকে প্রাণের সামগ্রী বলিয়া মনে করিতেন। কাব্য প্রকাশ এক হিসাবে দার্শনিক গ্রন্থ। উহার মূলে এবং ব্যাখ্যায় বহু দর্শন-তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। উহার প্রথম শ্লোকে বলা হইয়াছে,—কবি অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন। তাঁহার প্রতিভা-প্রভাবে অঘটন সংঘটন হয়। ব্রহ্মার সৃষ্টি বরং নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত; কিন্তু কবির সৃষ্টি স্বভাবসঙ্গত। ব্রহ্মার সৃষ্টি কর্ম্মজনিত অদৃষ্ট দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু কবির কল্পনা যথেচ্ছ বিচরণ করিতে সমর্থ। এই মর্ম্মে গ্রন্থকার কবির জয় ঘোষণা করিয়াছেন,—

"নিয়তিকৃতনিয়মরহিতাং হ্লাদৈকময়ীমনন্যপরতন্ত্রাম্
নবরসরুচিরাং নির্ম্মিতিমাদধতী ভারতী কবের্জয়তি।"

কেহ কেহ বলেন, অলঙ্কার-শাস্ত্র প্রণেতা মম্মটাচার্য্যের প্রকৃত নাম—মহিমন্ ভট্ট। কাব্যপ্রকাশ ভিন্ন তিনি শব্দব্যাপারবিচার, কাব্যামৃততরঙ্গিণী, সঙ্গীতরত্নমালা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বামন ও রঘুনাথ প্রমুখ অলঙ্কারশাস্ত্রবিদগণ যে মত প্রচার করিয়া যান, মম্মট সে মতের প্রতিবাদ করিয়া অভিনব মত প্রচারের চেষ্টা পান। বিশ্বনাথ কবিরাজ সাহিত্য-দর্পণে আবার মম্মটের মতের প্রতিবাদ করেন। সাহিত্য-দর্পণ এখন

বঙ্গদেশে বিশেষভাবে প্রচলিত। কাব্যপ্রকাশের প্রায় পঞ্চাশ জন টীকাকারের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল অলঙ্কার-গ্রন্থ সংস্কৃত-সাহিত্যের বিজয়-বৈজয়ন্তী স্বরূপ।

সভ্য-সমুন্নত সমাজের সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন সাহিত্যে আর আর যে সকল সম্পৎ থাকা আবশ্যক, ভারতবর্ষের সংস্কৃত-সাহিত্য মধ্যে তৎসমুদায়েরও অসদ্ভাব নাই। ব্যবহার-বিধি—স্মৃতি-শাস্ত্রের মধ্যে দেদীপ্যমান্। শারীর-বিজ্ঞান, ভৈষজ্য-বিজ্ঞান—আয়ুর্ব্বেদের অন্তর্নিহিত। ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি রামায়ণ-মহাভারতে ও পুরাণাদি শাস্ত্র মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ-সমূহ প্রকটিত আছে। ঐ সকল গ্রন্থের অনেকগুলিরই পরিচয় ইতিপূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে উত্থাপন করা হইয়াছে। ব্যবহার-বিধি সম্বন্ধে আর্য্য-মহর্ষিগণ যে সংহিতা-শাস্ত্র-সমূহ রাখিয়া গিয়াছেন, সমাজের শৃঙ্খলা-রক্ষার পক্ষে তাহার অধিক বিধিবিধান আবশ্যক হয় না। এ পর্য্যন্ত যে দেশে যে নিয়মই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, অভিনবত্বে তাহার কোনও বিধি-বিধানই সংহিতা-শাস্ত্রসমূহকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষেও প্রাচীন সংহিতা-শাস্ত্রের টীকা ও ব্যাখ্যা প্রভৃতির দ্বারাই সাময়িক অভাব পূরণ হইয়া আসিতেছে। মনু যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, যাজ্ঞবল্ক্য যাহা বলিয়া গিয়াছেন, বিষ্ণু-স্মৃতি প্রভৃতিতে যাহার বিধান আছে, তাহার উপর ব্যবহার-বিধি কে কি প্রবর্ত্তন করিতে পারে! অধুনা বহু বিধি বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ও হইতেছে বটে; কিন্তু সকলেরই মূলে পূর্ব্বোক্তের প্রভাব পরিদৃশ্যমান্। শাখা-পল্লব পরিবর্ত্তিত হইতে পারে; কিন্তু মূল একই রহিয়াছে। দুই একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। যাজ্ঞবল্ক্যের অনুসরণে তাঁহার ব্যাখ্যা-স্বরূপে বিজ্ঞানেশ্বর ভট্টারক 'মিতাক্ষরা' প্রণয়ন করেন। ১১০০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে বিজ্ঞানেশ্বরের প্রাদুর্ভাবকাল প্রতিপন্ন হয়। যাজ্ঞবল্ক্যের অনুসরণে মিতাক্ষরায় তিনি যে মত প্রকাশ করেন, এক সময়ে তাহাই সমগ্র ভারতের প্রামাণ্য গ্রন্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে, বারাণসী প্রদেশে এবং উত্তর ভারতের অনেক স্থানে আজিও ঐ মত প্রচলিত আছে। কোল্‌ব্রুক ঐ মিতাক্ষরার অনুবাদ প্রকাশ করেন। উত্তরাধিকার-বিধির মধ্যে আজিও মিতাক্ষরা সমাদৃত হয়। 'ধর্ম্মনিবন্ধ' নামে ব্যবহারবিধি সংক্রান্ত বহু সংগ্রহ-গ্রন্থ ১০০০ খৃষ্টাব্দের সমসময়ে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। আনুমানিক ১৩০০ খৃষ্টাব্দে হেমাদ্রি কর্ত্তৃক "চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি" নামে ব্যবহারবিধির এক গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছিল। ঐ গ্রন্থে স্মৃতি-পুরাণের অশেষ মূল্যবান সামগ্রী সংগৃহীত হয়। "ধর্ম্মরত্ন" নামে ব্যবহারবিধির এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ জীমূতবাহন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছিল। সেই গ্রন্থেরই অংশবিশেষ 'দায়ভাগ' নামে পরিচিত। ঐ দায়ভাগও ইংরাজি ভাষায় কোলব্রুক অনুবাদ করেন। উত্তরাধিকার-বিচারে ঐ গ্রন্থ বঙ্গদেশে প্রামাণ্য। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে জীমূতবাহনের বিদ্যমানকাল নির্দ্দেশ করেন। ঐ সকল আইনের গ্রন্থ ভিন্ন সমাজের নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের ও জীবনগতি-নির্ণয়ের পক্ষে রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশ সংহিতা বিদ্যমান রহিয়াছে। তিথিতত্ত্ব, শ্রাদ্ধতত্ত্ব প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব প্রভৃতির মধ্যে রূপান্তরে ব্যবহারবিধির সকল কথাই নিহিত আছে। জ্যোতিষ সম্বন্ধে সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি নবসিদ্ধান্ত বহুদিন হইতে প্রচলিত ছিল। বহু জ্যোতির্ব্বিদ্ ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইয়া-

স্মৃতি, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি।

ছিলেন। আর্য্যভট্ট প্রভৃতি পরবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদ্গণ ও গণিতাচার্য্যগণ সেই প্রাচীনেরই অনুসরণে যশস্বী হইয়া আছেন। বরাহমিহিরাচার্য্য 'বৃহৎসংহিতা', 'বৃহজ্জাতক', 'লঘুজাতক', 'পঞ্চ-সিদ্ধান্ত' প্রভৃতি দ্বারা জ্যোতিষের অঙ্গ অনেক পরিমাণে পরিপুষ্ট করিয়া যান। ভাস্করাচার্য্যের 'সিদ্ধান্তশিরোমণি' প্রভৃতিও এ পক্ষের উন্নতির প্রধান নিদর্শন। গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতির প্রসঙ্গে (পৃথিবীর ইতিহাস তৃতীয় খণ্ডে) এ সকল বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বিজ্ঞান বিষয়ে চরক, সুশ্রুত, বাগভট, অষ্টাঙ্গহৃদয় প্রভৃতি গ্রন্থ-সমূহ দেদীপ্যমান। আয়ুর্ব্বেদ-প্রসঙ্গে সে আলোচনাও (তৃতীয় খণ্ড পৃথিবীর ইতিহাসে) প্রত্যক্ষ করুন। কলাবিদ্যার তথ্যানুসন্ধান করিলে, নৃত্য, নাট্য, সঙ্গীত প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে স্থাপত্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইতিহাস, জীবনচরিত প্রভৃতির বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি; তথাপি আরও দুই একটি প্রসঙ্গের উত্থাপন করিতেছি। যাঁহারা বলেন,—একমাত্র 'রাজতরঙ্গিণীই' এ দেশের ইতিহাসের চরম আদর্শ, তাঁহারা নিশ্চয়ই সংস্কৃত-সাহিত্যের গ্রন্থ-সমুদ্র আলোড়ন করিবার অবসর পান নাই। অষ্টাদশ-পুরাণের প্রত্যেক পুরাণেই ইতিহাসের জন্য বিশেষ বিশেষ কয়েকটী পরিচ্ছেদ নির্দ্দিষ্ট আছে। 'রাজাবলী' নামে প্রায় প্রতি রাজবংশেরই বিবরণ লিপিবদ্ধ ছিল, প্রমাণ পাওয়া যায়। সিংহলের 'মহাবংশ' কি পরিচয় প্রদান করিতেছে?' জীবনচরিত বিষয়ে রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণাদি ভিন্ন যে অনেক গ্রন্থ ছিল, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে। এক শঙ্করাচার্য্যেরই কত জীবনচরিত কত ভাবে লিখিত হইয়াছিল! শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনচরিতেরও অবধি নাই। বিক্রমাদিত্যের ও শালিবাহনের জীবনচরিত পাওয়া যায়। জৈনদিগের ও বৌদ্ধদিগের আচার্য্যগণের পরিচয়মূলক গ্রন্থ আছে। হর্ষচরিত প্রভৃতির বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এইরূপ দেখিতে গেলে,—এইরূপ অনুসন্ধান করিলে, দেখিতে পাওয়া যায়,—ভারতবর্ষে সংস্কৃত-সাহিত্যের জ্যোতিঃতে সকল দিকই উদ্ভাসিত হইয়া আছে। কেবল এ দেশে নহে; সংস্কৃত-সাহিত্যের সেই জ্যোতিঃ অন্য দেশকেও জ্যোতিষ্মান্ করিয়া রাখিয়াছে। রাশিচক্রের আবিষ্কার—ভারতবর্ষের, ইহা আমরা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি। গ্রীসে সেই রাশিচক্র অনুসৃত। এমন কি, অনেক শব্দ পর্য্যন্ত সামান্য রূপান্তরে সেখানে পরিগৃহীত হইয়াছে। গ্রীসের কেন্ত্রন (Kentron)—সংস্কৃত 'কেন্দ্র' শব্দের রূপান্তর; 'ডায়ামেট্রন' (Diametron) সংস্কৃত 'যামিত্র' শব্দ হইতেই পরিগৃহীত হইয়াছে। কেহ কেহ 'রোমকসিদ্ধান্ত, ও 'হোরাশাস্ত্র' নাম দেখিয়া ভারতবর্ষকে রোমের ও গ্রীসের অনুসরণকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষ হইতেই 'রোম' নামের উৎপত্তি এবং এ দেশেরই হোরা শব্দ পাশ্চাত্যে পরিগৃহীত,—এ সকল বিষয় আমরা পূর্ব্বেই প্রমাণ করিয়াছি। 'শুল্ভ-সূত্রে' জ্যামিতির বীজ অন্য দেশে রোপিত হওয়ার বিষয় এবং লীলাবতী হইতে বীজগণিত, আর্য্য-ভটীয় হইতে গণিত-তত্ত্ব বিভিন্ন দেশে প্রচারিত হইয়াছিল, সপ্রমাণ হয়। ফলতঃ, ভারতের সাহিত্য-সম্পদের নিকট কোনও দেশ কখনই প্রতিযোগিতায় সমর্থ হয় নাই; ভারতবর্ষ সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্ব সময়ে সকলেরই গুরুস্থানীয় ছিল।

* * *

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—— * ——

সাহিত্যে—ইতিহাস।

[কাব্য-মহাকাব্য-নাটক প্রভৃতি সাহিত্যে সমাজ-চিত্র ;—ভাষার বিস্তৃতিতে রাজশক্তির পরিচয়,—এক সময়ের লিখিত-ভাষা ও কথিত-ভাষা,—সংস্কৃত-ভাষা ও প্রাকৃত-ভাষা ;— কাব্য-মহাকাব্য-নাটকাদির মধ্যে সমসাময়িক চিত্র,—রাজকীয় সাহায্যে কলা-বিদ্যার উৎকর্ষ সাধন ;—রাজধর্ম্ম—প্রজাপালন, প্রজার তুষ্টি সম্পাদন প্রভৃতির উজ্জ্বল উদাহরণ,—বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম-রক্ষায় রাজার প্রয়াস ; সামাজিক আচার-ব্যবহার,—সমাজের শৃঙ্খলার ও বিশৃঙ্খলার দৃষ্টান্ত,—রাজধানীর চিত্র,—ব্যবসায়-বাণিজ্য —ধর্ম্ম-কর্ম্ম প্রভৃতি।]

সাহিত্য—সমাজের আলেখ্য। সেই আলেখ্যে অতীতের ইতিহাস প্রতিফলিত। বিভিন্ন সময়ের অতীত ইতিহাসের প্রতিচ্ছবি তাহাতেই দেখিতে পাই। শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-দর্শন—ভারতের বিভিন্ন সময়ের ইতিহাস বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্য-সমূহে এক এক সময়ের ইতিহাস প্রকটিত রহিয়াছে। আবার কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতির কাব্য-মহাকাব্য-নাটক প্রভৃতিতে ভারতের ইতিহাসের আর এক স্তর গ্রথিত দেখিতে পাই। ইতিহাস লোপ পাইতে পারে; কিন্তু ধর্ম্ম-গ্রন্থ-সমূহ একেবারে বিলুপ্ত হইবার নহে;—কাব্য-মহাকাব্য প্রভৃতিও বিপ্লবের ঝঞ্ঝাবাত কিয়ৎপরিমাণে সহ্য করিতে সমর্থ হয়। যাহা সাধারণ, তাহা সহজেই লোপ পায়; যাহা অসাধারণ, তাহার বিলোপ-সাধনে কালের অঙ্কুশ অনেক সময় অবসন্ন হইয়া পড়ে। বেদাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে যে অনন্তের চিত্র প্রতিফলিত আছে, সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া মস্তিষ্কের ধ্যান-ধারণায় ক্লেশ-উৎপাদনের আবশ্যক নাই। রামায়ণ-মহাভারতের বা পুরাণ-পরম্পরার অন্তর্নিহিত ইতিকথার অনুসন্ধান করিয়াও এ প্রসঙ্গে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইবার বাসনা করি না। পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদত্রিতয়ে কাব্য-মহাকাব্য-নাটক প্রভৃতির আলোচনায় ভারতীয় সমাজের অতীত ইতিহাসের কি চিত্র দেখিতে পাইলাম, এখানে তদ্বিষয়ে দুই একটি তথ্য অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার আকাঙ্ক্ষা করি। ঐ সকল কাব্য-মহাকাব্য-নাটকের মধ্যে, ভারতের একটী প্রাচীন ইতিহাস—ভারতের সমাজের একটী জীবন্ত চিত্র—ভারতের প্রভাব-প্রতিপত্তির একটা অভিনব উজ্জ্বল আলেখ্য প্রত্যক্ষীভূত হয় না কি? এ প্রসঙ্গে তাহারই দুই এক কথার আলোচনা করিতেছি।

সাহিত্যে সমাজ-চিত্র।

প্রথমে ভাষার বিষয় আলোচনা করা যাউক। যে সকল কাব্য-মহাকাব্য-নাটক সংস্কৃত-সাহিত্যের উজ্জ্বল রত্ন মধ্যে পরিগণিত, তাহার প্রায় সকলগুলিই ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সমাদৃত। দূর দক্ষিণে দ্রাবিড়ে যাও, দেখিবে—ঐ সকল কাব্য-মহাকাব্য-নাটকের সমাদর। পশ্চিমে এক দিকে গুর্জ্জরে মহারাষ্ট্রে, অন্য দিকে পঞ্চনদ প্রদেশে, শুনিবে—সেই একই বাণী একই মন্ত্রে বিঘোষিত হইতেছে। কি মধ্য-ভারতে, কি মদ্রদেশে, কি হিমাচল-শিখরে—কাশ্মীরে, নেপালে, আর কি এই শস্যশ্যামলা স্নিগ্ধোজ্জ্বলা বঙ্গভূমিতে,—সর্ব্বত্রই ঐ সকল কাব্য-মহাকাব্য-নাটকাদির

ভাষায় রাজশক্তি।

সমাদর দেখিতে পাই। এ দৃশ্য-দর্শনে—এ ভাব স্মরণে, আমরা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি? এতদ্বিষয় অনুধাবন করিলে, অতীত ইতিহাসের অতি প্রয়োজনীয় দ্বিবিধ উপাদান প্রাপ্ত হই না কি? ভারতবর্ষের আধুনিক সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া, অনেকে সিদ্ধান্ত করেন যে, ভারতবর্ষ বুঝি বা বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদে বিভক্ত ছিল, ক্ষুদ্র-শক্তি-সম্পন্ন এক এক রাজা সেই সেই জনপদে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, আর সেই সকল জনপদে বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত ছিল; এক প্রদেশের জনগণের সহিত অন্য প্রদেশের জনগণের বড় একটা সম্বন্ধ-সংস্রব ছিল না। কিন্তু সংস্কৃত-সাহিত্যের এবম্বিধ বিকাশের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে, সে সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপ ভিত্তিহীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। রাজ্যে সার্ব্বভৌম সম্রাটের আধিপত্য বিস্তৃত না থাকিলে, এমনভাবে এক ভাষার সর্ব্বত্র সমাদর কখনই সম্ভবপর নহে। হইতে পারে, ভারতে বহু বিভিন্ন ভাষার অস্তিত্ব ছিল; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীতে বিভিন্ন রাজশক্তির বিদ্যমানতার বিষয়ও অননুভাব্য নহে; কিন্তু যে সময়ে সংস্কৃত-সাহিত্যে ঐ সকল কাব্য-মহাকাব্য ও নাট্য-কলা বিকাশ পাইয়াছিল, তখন সর্ব্বত্রই এক সার্ব্বভৌম রাজশক্তির প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল এবং সকল ভাষার উপর সংস্কৃত-ভাষা আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল,—ইহা নিঃসংশয়ে মনে করা যাইতে পারে। সংস্কৃত-ভাষার নাট্য-সাহিত্যের দৃষ্টান্তে বিষয়টী বেশ বিশদীকৃত হয়। সাধারণ ভদ্রলোকের মধ্যে প্রচলিত ভাষাতেই নাটকাদি লিখিত হইয়া থাকে। উহার মধ্যে পাত্র-পাত্রীর প্রবর্ত্তনার আবশ্যক অনুসারে সাধারণ কথিত-ভাষাও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যে ভাষা অধিকাংশ শ্রোতার বোধগম্য নহে, তাহা কচিৎ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। ফলতঃ, নাটকে ব্যবহৃত ভাষা দেশ-প্রচলিত সাহিত্যের ভাষার এবং দেশ-প্রচলিত কথিত-ভাষার আদর্শ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। সকল দেশের সকল নাট্য-সাহিত্যে এ প্রমাণ প্রত্যক্ষীভূত। আধুনিক বাঙ্গালা-সাহিত্যের নাটকাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই এ তথ্য অবগত হওয়া যায়। দেশের লিখিত-ভাষার এবং কথিত-ভাষার আদর্শ প্রকৃষ্ট নাটক মাত্রেই পরিলক্ষিত হইবে। ইহাই প্রধান লক্ষণ; কোথাও কচিৎ সাধারণ কথিত-ভাষার—রাজধানীর পারিপার্শ্বিক স্থানের কথিত-ভাষার পরিবর্ত্তে প্রাদেশিক ভাষার ও অন্য দেশের ভাষার ব্যবহারও দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সে দৃষ্টান্ত বিরল। ফলতঃ, সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে দেখিলে, বেশ দেখিতে পাই, বেশ বুঝিতে পারি—দেশ-প্রচলিত লিখিত-ভাষার এবং দেশ-প্রচলিত সাধারণ কথিত-ভাষার সমবায়েই নাট্য-সাহিত্য সংগঠিত হয়। তবেই বুঝা যাইতেছে, ভারতে যখন অভিজ্ঞান-শকুন্তল প্রভৃতি নাট্য-সাহিত্যের বিকাশ হইয়াছিল, তখন দেশের লিখিত-ভাষা সংস্কৃত ছিল এবং কথিত ভাষা প্রাকৃত ছিল। এখানে 'দেশ' শব্দে—বঙ্গদেশ অথবা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ অথবা কোনও বিশেষ প্রদেশ অর্থ সূচিত হয় না; এখানে 'দেশ' শব্দে সমগ্র ভারতবর্ষকেই বুঝাইতে পারে। কারণ, এই নাট্য-সাহিত্য ভারতের কোনও প্রদেশ-বিশেষের সম্পত্তি নহে;—উহা সমগ্র ভারতে সমভাবে সমাদৃত। এক সার্ব্বভৌম সম্রাট এবং এক সার্ব্বভৌম সাহিত্য না হইলে কখনই এরূপ ঘটিতে পারে না। সুতরাং বলিতে হয়,—কালিদাস প্রভৃতির

লিখিত-ভাষা ও কথিত-ভাষা।

পৃষ্ঠপোষক রাজা বিক্রমাদিত্য সসাগরা ভারত-ভূমির অধীশ্বর হইয়াছিলেন এবং সে সময়ে সংস্কৃত ভাষা ভারতবাসীর লিখিত-ভাষা মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। সংস্কৃত-ভাষার সহিত প্রাকৃত-ভাষার সম্বন্ধ-তত্ত্ব আলোচনা করিলেও এই ভাব উপলব্ধি হইতে পারে। বর্ত্তমানকাল-প্রচলিত লিখিত ও কথিত বঙ্গভাষার সম্বন্ধ-তত্ত্ব বিচার করিয়া দেখুন, স্বরূপ-তত্ত্ব বোধগম্য হইবে। আমরা লিখিত ভাষায় বলি,—'শীঘ্র যাইতেছি'; কথিত-ভাষায় আবার উহাই 'শিগ্‌গির যাচ্ছি'। যাঁহারা মূল-তত্ত্ব অবগত নহেন, তাঁহারা ঐ দুই উক্তিকে কখনই বিভিন্ন বলিয়া বুঝিতে পারিবেন না। পরদেশের ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে, এ অন্তরায় বেশ উপলব্ধি হয়। সেখানে কেবল লিখিত-ভাষা শিক্ষা করিলেই কথিত-ভাষার মর্ম্মানুধাবন করিতে পারা যায় না। পণ্ডিতগণের কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, পালি-ভাষা সংস্কৃত ভাষার প্রথম সন্ততি; প্রাকৃত তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু আমরা সর্ব্বথা সে মত অনুমোদন করি না। বরং আমাদের মনে হয়, পালি-ভাষার অপেক্ষাও প্রাকৃত-ভাষা সংস্কৃত ভাষার সহিত অধিকতর দৃঢ় সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ ও অধিকতর নিকটবর্ত্তী। বৈয়াকরণগণও এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন। প্রাকৃত-ব্যাকরণে হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন,—"প্রকৃতিঃ সংস্কৃতং তত্র ভবঃ তত্র আগতং বা প্রাকৃতং।" প্রাকৃত-চন্দ্রিকায় কৃষ্ণপণ্ডিতের মতেও ঐ কথাই প্রকাশিত;—"প্রকৃতিঃ সংস্কৃতং তত্র ভবত্বাৎ প্রাকৃতং স্মৃতম্। তদ্ভবং তৎসমং দেশীত্যেবমেতৎ ত্রিধামতং॥" সংস্কৃত নাটকের ভাষাতত্ত্বের বিষয় অনুধাবন করিলে সংস্কৃতের ও প্রাকৃতের নিকট-সম্বন্ধ বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। নিম্নে একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি;—

প্রাকৃত।	সংস্কৃত।
হা অজ্জউত্ত! হা কুমার লক্ষ্মণ! এআইণীং মন্দভাইণীং অসরণং অরণে আসণপ্পসববেঅণং হদাসং সাবদা মং অহিলসন্তি, সাহং দাণিং মন্দভাইণী ভাইরধীত্র অত্তাণং নিক্খিবেমি।	হা আর্য্যপুত্র! হা কুমার লক্ষ্মণ! একাকিনীং মন্দভাগিনীমশরণামরণ্যে আসন্নপ্রসববেদনাং হতাশাং শ্বাপদামামভিলষন্তি, সাহমীদানীং মন্দভাগিনী ভাগীরথ্যামাত্মানং নিক্ষিপামি।

উত্তররামচরিতে মহর্ষি বাল্মীকির কৌশলে লবকুশ যখন রামায়ণ গান করেন, রামচরিত নাট্যাভিনয়ের সময়ে নেপথ্যে ঐরূপ ক্রন্দন স্বর উত্থিত হইয়াছিল। সীতাদেবী যেন বনবাসে বিসর্জ্জিত হওয়ার পর বলিতেছিলেন,—'হা আর্য্যপুত্র! হা কুমার লক্ষ্মণ! সহায়হীনা আসন্ন-প্রসববেদনাক্লিষ্টা, হতাশা মন্দভাগিনীকে একাকিনী পাইয়া শ্বাপদগণ ভক্ষণ করিতে আসিতেছে। তাই সেই মন্দভাগিনী এক্ষণে ভাগীরথী গর্ভে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতেছে।' উপরি-উদ্ধৃত কয়েক পংক্তিতেই স্থূলভাবে সংস্কৃত-ভাষার সহিত প্রাকৃত-ভাষার সাদৃশ্য বুঝা যায়।* পালি-ভাষার সহিতও সংস্কৃত-ভাষার সাদৃশ্য অনেকটা এই রকমই বটে; কিন্তু পালি-ভাষা ব্যবহৃত না হইয়া যখন প্রাকৃত-ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছিল, তখন সে সময়ে প্রাকৃত-ভাষাই জনসাধারণের ভাষা ছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। সাহিত্য-দর্পণে নাটকের ভাষা পরিচয়ে নানা স্থানের ভাষার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে বটে; কিন্তু ব্যবহার প্রধানতঃ প্রাকৃত-ভাষারই দেখিতে পাই; সুতরাং প্রাকৃত-ভাষাই তখন কথিত-ভাষার মধ্যে প্রধান স্থান

* এই সাদৃশ্য-তত্ত্ব "পৃথিবীর ইতিহাস", দ্বিতীয় খণ্ডে, ভাষা-প্রসঙ্গে, ৩৬৮ম—৩৭২ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অধিকার করিয়া ছিল বলিতে হয়। এক রাজা এক ভাষা না হইলে এমনটী কখনই হইতে পারে না। সুতরাং ভাষা-তত্ত্বালোচনায় বেশ প্রতীত হয়,—বহু করদমিত্র রাজ্য-সমন্বিত এক বিশাল সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সেই সম্রাজ্যে এক ভাষা এক ভাবপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল। তবে কোন্ কালে কোন্ শতাব্দীতে এই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা সঠিক নির্ণয় করা সুকঠিন। কিন্তু আনুমানিক একটা সময়ের চিত্র মানস-পটে প্রতিফলিত হইতে পারে। পালি-ভাষার সৃষ্টি-পরিপুষ্টির ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারি, ঐ ভাষা গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের পরবর্ত্তিকালে প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিল। গৌতম বুদ্ধ প্রচারিত মতপরম্পরা প্রধানতঃ পালি-ভাষাতেই লিখিত হয়। কোনও কোনও মতে, পালি-ভাষারই অপর নাম—মাগধী। মগধ প্রদেশে অথবা বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অভ্যুদয় ক্ষেত্রে সেই সময়ে পালি-ভাষা সম্প্রদায়বিশেষের আদরণীয় ছিল। গৌতম বুদ্ধের মতসমূহ সেই পালি-ভাষায় প্রচারিত হয়। পরে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ও বৌদ্ধ নৃপতিগণের প্রভাবপ্রতিপত্তি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পালি-ভাষা সুদূর সিংহল-দ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। পালি-ভাষার এবম্বিধ প্রতিপত্তির সময়েও পালি-ভাষা যে জন-সাধারণের কথিত ভাষা ছিল, তাহা মনে হয় না। কারণ, তাহা হইলে, নাটকসমূহে পালি-ভাষা অধিকমাত্রায় স্থান প্রাপ্ত হইত। ইহাতে কেহ হয় তো বলিতে পারেন, যে সময়ে পালি-ভাষার এবম্বিধ প্রভাব, সে সময়ে সংস্কৃতে ও প্রাকৃত ভাষায় সংগ্রথিত নাটকসমূহ রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না; অথবা, ভারতবর্ষের যে অংশে পালি-ভাষার প্রাধান্য ছিল, সেই সকল প্রদেশ হইতেও ঐ সকল নাটকের সৃষ্টি-পরিপুষ্টি সাধিত হয় নাই। কিন্তু আমরা তাহা মনে করি না। আমাদের মনে হয়,—পালিভাষায় বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রন্থ-সমূহ বিরচিত হইলেও লিখিত-ভাষারূপে সংস্কৃতের এবং কথিত-ভাষারূপে প্রাকৃতের প্রাধান্য সকল সময়েই অব্যাহত ছিল, এবং তদ্দ্বারা রাজার একছত্র প্রভাব ঘোষিত হইত।

সমসাময়িক চিত্র।

বিবিধ বিদ্যার উৎকর্ষ সাধনে।

যেমন শাস্ত্র-গ্রন্থাদির মধ্যে তেমনি কাব্য মহাকাব্য-নাটকাদির মধ্যেও রাজা-প্রজার সম্বন্ধ-বিষয়ক—রাজধর্ম্ম ও প্রজার কর্ত্তব্য সংক্রান্ত—বিবিধ তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। কাব্য-মহাকাব্য-নাটকাদিতে পৌরাণিক বৃত্তান্ত বিবৃত হইলেও, সমসাময়িক ঘটনাবলীর ও চরিত্রের বিবিধ চিত্র তন্মধ্যে স্বতঃই প্রতিভাত হয়। এই জন্য কালিদাসের দুষ্মন্তে কেহ কেহ বিক্রমাদিত্যের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পান; রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে সমুদ্রগুপ্তের বা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের ছায়াপাত অনেকেই যে প্রত্যক্ষ করেন, সে বিষয় আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। রাজা বিদ্যার উৎসাহদাতা ছিলেন,—ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের রক্ষক ছিলেন,—প্রতি কাব্য-মহাকাব্য-নাটকে তাহার উজ্জ্বল উদাহরণ দেখিতে পাই। বিদ্যার্থী ব্রাহ্মণ-সন্তানের গুরুদক্ষিণার উপযোগী অর্থ সংগ্রহের জন্য নৃপকুলতিলক রঘু কিরূপ দায়িত্ব-পূর্ণ দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হন, পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি (এই খণ্ডের ২৯৭ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। নৃপতি লোকশিক্ষার জন্য কিরূপ আন্তরিক যত্ন লইতেন, ঐরূপ বিবিধ দৃষ্টান্তে তাহা উপলব্ধি হয়। কলা-বিদ্যার উৎকর্ষ-সাধন বিষয়ে নৃপতিগণ কিরূপ উৎসাহ দান করিতেন, নানা স্থানে তাহার প্রমাণ আছে। রাজকীয়

চিত্রশালায় চিত্র-শিল্পিগণের চিত্রশিল্প-সমূহ রক্ষিত হইত,—এতদ্বিবরণে রাজা চিত্রশিল্পের অকৃত্রিম উৎসাহদাতা ছিলেন, তাহা প্রতীয়মান হয়। মালবিকাগ্নিমিত্রে রাজচিত্রশালায় রাজা অগ্নিমিত্র মালবিকার চিত্রপট দেখিয়াছিলেন। সেই চিত্রপট দর্শনে রাজার চিত্ত মালবিকার প্রতি আকৃষ্ট হয়। উত্তররামচরিতে সীতাদেবীকে ও শ্রীরামচন্দ্রকে চিত্রপট প্রদর্শন কালে লক্ষ্মণ বলিয়াছিলেন,—'সেই চিত্রকর এই চিত্রগুলি দিয়া গিয়াছে।' লক্ষ্মণের উক্তিতে রাজার নিয়োজিত রাজ-সাহায্যপ্রাপ্ত চিত্রকরের কথাই মনে আসে। কথাসরিৎসাগরে দেখিতে পাই, রাজা বিক্রমাদিত্যের দরবারে নগরস্বামী নামে একজন রাজচিত্রকর ছিলেন। সেই রাজচিত্রকর রাজা বিক্রমাদিত্যের নিকট রমণী-সৌন্দর্য্যের বিভিন্ন প্রকার আলেখ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সঙ্গীত-বিদ্যার চর্চ্চার জন্য রাজধানীতে ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত ছিল এবং রাজা নাট্যাভিনয়ে উৎসাহ-প্রদান করিতেন,—এ দৃষ্টান্তও নানা স্থানে দেখিতে পাই। মালবিকাগ্নি-মিত্রে রাজকীয় নাট্য-শালার এবং রাজসাহায্যপ্রাপ্ত নাট্যাচার্য্যগণের প্রসঙ্গ পরিদৃষ্ট হয়। রাজা নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন, রাজধানীতে সেই নাটকের অভিনয় হইতেছে, নাট্যকলাবিশারদগণ নাট্যাভিনয়ে যোগদান করিয়াছেন,—এ সকল বিবরণেও নাট্যকলার বিকাশে রাজার উৎসাহ-দানের পরিচয় দেদীপ্যমান্। রত্নাবলীর, মৃচ্ছকটিকের এবং প্রবোধচন্দ্রোদয়ের প্রস্তাবনাংশ পাঠ করিলে, এ বিষয় বেশ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। এখন যেমন সমাজ-বিশেষে সঙ্গীত-বিদ্যালোচনায়—নৃত্য-গীত-বাদ্যে—রমণীগণের নৈপুণ্য প্রকাশ পায়, নাট্য-সাহিত্যের ও উপাখ্যানাদির মধ্যে সে প্রমাণও নানা স্থানে প্রাপ্ত হই। মালবিকা মৃদঙ্গ-বাদনে যশস্বিনী হইয়াছিলেন, আর অগ্নিমিত্র সে মৃদঙ্গবাদনশ্রবণে মালবিকার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন,—মালবিকাগ্নিমিত্রে এই চিত্র দেখিতে পাই। নাগানন্দে দেখি, রাজকুমারী মলয়াবতী সঙ্গীতে ও বাদ্যে অসাধারণ শক্তিশালিনী ছিলেন; সুর-তান-লয়ে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। কথাসরিৎসাগরে দেখিতে পাই, রাজকুমারী মৃগবতী বিবাহের পূর্ব্বে সঙ্গীতে ও নৃত্যে সুশিক্ষিতা হইয়াছিলেন। এ সকল দৃষ্টান্তে সমাজের এক স্তরে রমণীগণের নৃত্য-গীতাদি আলোচনার বিষয় মনে আসে বটে; কিন্তু তাই বলিয়া সমাজের সকলের মধ্যেই এ শিক্ষা কখনই প্রচার হয় নাই। অধুনা কোনও কোনও রাজপরিবারের রমণীগণকে নৃত্য-গীতাদি শিক্ষা দেওয়া হয় বটে; কিন্তু তাহা যেমন বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ; পূর্ব্বোক্ত ঘটনাবলীর উল্লেখেও সেই ভাবই মনে আসে। স্থাপত্যের নিদর্শন—মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থিত গুপ্তপথ সুরঙ্গ প্রভৃতিতে সপ্রমাণ হয়। কর্পূরমঞ্জরীতে যে সুরঙ্গ-পথের বিবরণ অবগত হই, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের সুরঙ্গ-পথের ন্যায় সে সুরঙ্গ-পথ কৌতূহলোদ্দীপক। ভর্তৃহরির গুহা প্রভৃতির প্রসঙ্গে, উজ্জয়িনী হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ সুরঙ্গ-পথের এবং কর্পূর-মঞ্জরীতে রাজবাড়ীর রক্ষা-গৃহ হইতে চামুণ্ডা-মন্দির পর্য্যন্ত সুরঙ্গ-পথের বিষয় অনুধাবন করিলে, স্থপতিগণের নৈপুণ্যের বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। রাজকীয় উৎসাহ-সাহায্যেই যে স্থাপত্যের এবম্বিধ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টই অনুভূত হয়। বাসবদত্তার প্রস্তর-মূর্ত্তির প্রসঙ্গে কারুকার্য্য কতদূর উৎকর্ষ-লাভ করিয়াছিল, বুঝিতে পারি। ঐন্দ্রজালিক বিদ্যার চরমোৎকর্ষের পরিচয় 'রত্নাবলী' নাটকে, রাজ-অট্টালিকায় অগ্নিসংযোগ-ব্যাপারে,

প্রাপ্ত হই। ব্যোম-পথে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গতিবিধির বিষয় অনুধাবন করিলে, ব্যোমপথগামী কোনও যান-বাহনের প্রচলন ছিল, তাহা উপলব্ধি হয়। কেহ কেহ এ সকল কল্পনামূলক বলিয়া মনে করিতে পারেন; কিন্তু যাহার অস্তিত্ব ছিল না বা নাই,—কল্পনায় তাহা স্থান পাওয়ার পক্ষে সংশয় আছে। পক্ষিরাজ ঘোটক প্রভৃতির প্রসঙ্গে ব্যোমগামী কোনও জন্তুর অস্তিত্ব মনে আসিতে পারে। কোনও কোনও পক্ষীর উপর আরোহণ করিয়া মনুষ্যের গতিবিধির প্রমাণ আজিও পাওয়া যাইতেছে। সেরূপ ক্ষেত্রে বিমানবিহারী কোনও জীবের সাহায্যে পুরাকালে বিমান-পথে গতিবিধি চলিত, ইহাও মনে করা যাইতে পারে। রাজগণের মধ্যেই বিমান-পথে গতিবিধির অধিক পরিচয় প্রাপ্ত হই। সুতরাং বিমানগামী যান-বাহনের সংরক্ষণ-পক্ষে তাঁহাদের কৃতিত্ব-কাহিনীই ঘোষণা করিতেছে।

রাজধর্ম—প্রজা-পালন।

প্রজাপালনে ও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-রক্ষার পক্ষে ভারতীয় নৃপতিগণ আবহমানকাল যশস্বী ছিলেন। কব্য-নাটকের কোথাও সে আদর্শের ব্যতিক্রম দেখি না। নৃপচরিত্রে পরবর্ত্তিকালে নানা কলুষ-কলঙ্কের ছায়াপাত দেখিতে পাই বটে; কিন্তু বর্ণধর্ম্ম-রক্ষায় বা প্রজাপালনে তাঁহাদিগকে কখনই উদাসীন দেখি না। ঋটকে দুষ্মন্তকে, অগ্নিমিত্রকে, উদয়ন প্রভৃতিকে কামাসক্ত দেখিতে পাই; প্রাচীন-কালের শ্রীরামচন্দ্রাদির পবিত্র প্রণয়ের আদর্শ এখানে লোপ পাইয়াছে, প্রত্যক্ষ করি বটে; কিন্তু তাহা হইলেও রাজধর্ম্ম-পালনে, প্রজার শুভসাধনে, প্রজার তুষ্টি-সম্পাদনে, প্রজার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানে, তাঁহারা কখনই পরাঙ্মুখ হন নাই। দুই একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে দেখিয়া শকুন্তলার রূপমোহে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন; সহসা তপোবনবাসী ঋষিগণের আর্ত্তনাদ তাঁহার :কর্ণপটহে প্রতিধ্বনিত হইল। দুষ্মন্ত আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। আকর্ষণের প্রাধান সামগ্রী—প্রণয়ের প্রস্ফুট কুসুম—একান্তে পড়িয়া রহিল; দুষ্মন্ত ব্রাহ্মণগণের বিপদুদ্ধারের জন্য বনান্তরে প্রস্থান করিলেন। তপোবনের বিঘ্নবিনাশন জন্য দুষ্মন্তের প্রয়াসের বিষয় অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ অংশে এবং তৃতীয় অঙ্কের বিষ্কম্ভকে ও উপসংহারে দেখিতে পাই। এই ভাবের চরমোৎকর্ষ—ভবভূতির উত্তররামচরিতে। প্রজাপালনের জন্য জানকীকে বিসর্জ্জন—রামায়ণের অনুসরণ বলিতে পারি; কিন্তু সীতাদেবীকে পরিত্যাগ করিয়া ঋষিগণের যজ্ঞরক্ষা-কল্পে শ্রীরামচন্দ্রের গৃহ-ত্যাগ—কি স্মৃতি জাগরূক করে? কালিদাসের দুষ্মন্তের এবং ভবভূতির শ্রীরামচন্দ্রের বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মরক্ষার পক্ষে এবম্বিধ উৎসাহের বিষয় অনুধাবন করিলে, এক অভিনব ভাব-প্রবাহ মনোমধ্যে প্রবাহিত হয় না কি? ঐ ঘটনার সহিত সমসাময়িক রাজন্যবর্গের চরিত্র চিত্রের সমতা রক্ষা করিয়া বিচার করিতে গেলে বুঝিতে পারি, ঐ সময়ে রাজন্যবর্গের চরিত্র কতকটা কলুষিত হইয়া পড়িয়াছিল বটে; কিন্তু তাঁহারা বর্ণধর্ম্ম-রক্ষায় কখনই উদাসীন ছিলেন না। রাক্ষসের উপদ্রব-নিবারণে, দস্যুভীতি-দূরীকরণ—দেশ-মধ্যে শান্তি-স্থাপন অর্থই সূচিত হয়। মন্বাদি-সংহিতা-শাস্ত্রের অনুসরণে রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত, তাহার ভূয়োভূয়ঃ প্রমাণ প্রাপ্ত হই। মৃচ্ছকটিকে বিচারক স্পষ্টতঃ সে বিষয়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বিচারালয়ের সুব্যবস্থার আভাষও সেইখানে প্রাপ্ত হই। প্রজা

চিরদিনই রাজাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিয়া আসিয়াছিল, রাজার সুখেই প্রজার সুখ, রাজার শান্তিতেই প্রজার শান্তি—এ দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্রই দেদীপ্যমান্। প্রজাবর্গ রাজাকে উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠ ভাগ করস্বরূপ প্রদান করিত; কিন্তু তপঃপরায়ণ ঋষিগণকে কোনরূপ কর প্রদান করিতে হইত না। অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকে বিদূষকের এবং দুষ্মন্তের কথোপকথনে এই ভাব পরিব্যক্ত। বিদূষক তপস্বিগণের নিকট কর-গ্রহণের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে, দুষ্মন্ত উত্তর দিয়াছিলেন,—"যদুত্তিষ্ঠতি বর্ণেভ্যো নৃপাণাং ক্ষয়ি তদ্ধনম্। তপঃষড়ভাগ মক্ষয্যং দদত্যারণ্যকা হি নঃ॥" অর্থাৎ,—'বর্ণ-চতুষ্টয় রাজাকে যে ষষ্ঠাংশ কর প্রদান করেন, সে কর নশ্বর; কিন্তু ঋষিগণের তপস্যা হইতে রাজা যে উপকার প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ ধর্ম্মাচরণের ফলে রাজ্যে যে শান্তি স্থাপিত হয়, তাহাতে অক্ষয় কর লাভ হইয়া থাকে।' দুষ্মন্তে যদি বিক্রমাদিত্যের চরিত্রের ছায়াপাত হইয়া থাকে (যেমন পণ্ডিতগণ অনুমান করেন), তাহা হইলে বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মরক্ষার পক্ষে ব্রাহ্মণগণের যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে রাজা কিরূপ উৎসাহ প্রদান করিতেন,—এই একমাত্র উক্তিতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। ঐ উক্তিতেই আরও বুঝা যায়, সমাজের নেতৃ-স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ, সুতরাং তাঁহাদের অনুসরণকারী ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাদি বিভিন্ন বর্ণের জনগণ, রাজার কিরূপ হিতাভিলাষী শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। প্রজার এবম্বিধ শুভাকাঙ্ক্ষা-বশতঃই রাজার একছত্র প্রভাব বিস্তৃত হয়। প্রজার শুভাকাঙ্ক্ষার ফলেই—রাজার সার্ব্বভৌমত্ব।

সাহিত্যে সমাজ-চিত্র।

প্রাচীন-ভারতের সমাজ-রূপ কল্প-পাদপের নিকট যিনিই যে ফল প্রার্থনা করিবেন, তিনি সেই ফলই প্রাপ্ত হইবেন। আমরা পুনঃপুনঃ বলিয়া আসিতেছি,—ভারতের বিশাল সমাজ-দেহে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চিরদিনই বিদ্যমান আছে। সেই বিশাল দেহের সকল অঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করিবার যাঁহার অবসর না ঘটিবে, অথবা যিনি আপনার আবশ্যকানুরূপ বস্তুর সন্ধান করিয়াই প্রত্যাবৃত্ত হইবেন, তাঁহার সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই একদেশদর্শিতা-দোষ-দুষ্ট বলিতে বাধ্য হইব। সংস্কৃত-সাহিত্যের কাব্য-নাটকাদির আলোচনা করিয়া পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ একটী বিষম সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—ঐ সময়ে সমাজ অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল ছিল, অসবর্ণ বিবাহ, অবাধ প্রণয় পূর্ণ-মাত্রায় চলিয়াছিল। রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে দেখিলেন; অমনি তাহার হৃদয়ে প্রেম-সঞ্চার হইল। জীমূতবাহন মলয়াবতীকে দেখিলেন; আর তাঁহার প্রেমে আত্মবিসর্জ্জন দিলেন। আবার শকুন্তলা ও মলয়াবতী উভয়েই অজ্ঞাত-কুলশীল অপরিচিত রাজাকে বা রাজকুমারকে দেখিয়াও সঙ্কুচিত হইলেন না,—সরিয়া গেলেন না। এই দুই দৃষ্টান্তের উল্লেখে সমাজে অবাধ-প্রণয়ের এবং যদৃচ্ছা-বিবাহের ভাব মনে আসিতে পারে। এই দুই চরিত্র-সৃষ্টি দেখিয়াই যদি কেহ সিদ্ধান্ত করেন,—পাশ্চাত্য-দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও বিবাহ-বন্ধন শিথিল ছিল, তিনি নিশ্চয়ই ভ্রমে পড়িবেন। অনেকে এইরূপ সিদ্ধান্তই করিয়া গিয়াছেন; তাই এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যাইতেছে। মালতীমাধবে দেখি, মালতী গজারোহণে বসন্তোৎসবে যাত্রা করিয়াছিলেন; সেই অবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়া মাধব তাঁহার প্রেমে আবদ্ধ হন। এই দৃষ্টান্তে যদি কেহ বলেন,—সকল সম্ভ্রান্ত পুরমহিলা

গজারোহণে প্রকাশ্য রাজপথে পরিভ্রমণ করিতেন, আর সেই পথে পথেই তাঁহাদের প্রেম-সঞ্চার হইত; তাহা হইলে সে সিদ্ধান্ত অবশ্যই প্রমাদপূর্ণ বলিতে হইবে। একটী বা দুইটী দৃষ্টান্ত দেখিয়া সমগ্র সমাজকে সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণকারী বলিয়া কখনই ঘোষণা করিতে পারা যায় না। এ সকল দৃষ্টান্ত সমাজের এক স্তরে চিরদিনই আছে, চিরদিনই থাকিবে। কিন্তু অপর স্তরে যে বাঁধাবাঁধি নিয়ম আজিও দেখিতে পাই, সে নিয়মও চিরদিনই বর্ত্তমান আছে এবং চিরদিনই বিদ্যমান থাকিবে। বিদূষকরূপে রাজার সহিত দুই চারি জন ব্রাহ্মণ-কুমারকে পরিভ্রমণ করিতে দেখি বলিয়া সকল ব্রাহ্মণেই যে বিদূষকত্ব ঘটিয়াছিল, তাহা কখনই বলিতে পারি না। শকুন্তলা নাটকে বিদূষকও ছিলেন, আবার কণ্ব-ঋষিও ছিলেন। দুই চরিত্রে ব্রাহ্মণের দুই দিক প্রদর্শিত। ব্রাহ্মণের অধঃপতন ঘটিলে ব্রাহ্মণ কিরূপ দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হন, বিদূষকে সেই চিত্র প্রকটিত; আর ঋষি-মহর্ষির চরিত্রে তপঃসিদ্ধ কর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত। এক দিক দেখিয়াই ব্রাহ্মণের অধঃপতন ঘটিয়াছিল বলিলে চলিবে না। দুই দিক দেখিতে হইবে; দুই দিক দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, ব্রাহ্মণে যেমন মলিনতাও আশ্রয় করিয়াছিল; ব্রাহ্মণ তেমনই জ্যোতিষ্মান্‌ও ছিলেন। মৃচ্ছকটিকে চারুদত্তে—ব্রাহ্মণের অধঃপতনের চরম চিত্র। কিন্তু সে চিত্রেও দেখিতে পাই,—ব্রাহ্মণ-সমাজে সকল ব্রাহ্মণ তখনও ব্রাহ্মণত্ব বর্জ্জিত হন নাই। চারুদত্তের গার্হস্থ্য-জীবনের একটী চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এ বিষয় হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। চারুদত্ত সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন; দারিদ্র্য-যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন; সময়ের সহচর বন্ধু-বান্ধব যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা অনেকেই চারুদত্তকে পরিত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু ব্রাহ্মণের নিত্য-ক্রিয়া তখনও তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। তিনি প্রতিদিন নিত্যনৈমিত্তিক সন্ধ্যাবন্দনা করেন, দেবতার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেন; সাংসারিক দারুণ দুশ্চিন্তার মধ্যেও তাঁহার ক্রিয়া-কর্ম্ম সকলই অক্ষুণ্ণ আছে। বিদূষক তাই তাঁহাকে এক দিন কহিলেন,—"জদো এব্বং পুইজ্জন্তা বিং দেবদা ণ দে পসীদন্তি, তা কো গুণো দেবেসুং অচ্চিদেসুং।" অর্থাৎ,—যদি এত পূজা-অর্চ্চনাতেও দেবতা প্রসন্ন নহেন, তবে কি জন্য আর আপনি দেবতার অর্চ্চনা করেন?' কিন্তু চারুদত্ত তাহাতে কি উত্তর দিয়াছিলেন, অনুধাবন করিয়া দেখুন। চারুদত্ত বলিয়াছিলেন,—"বয়স্য মা মৈবং গৃহস্থস্য নিত্যোঽয়ং বিধিঃ।" 'বয়স্য! ওরূপ কথা বলিতে নাই। ইহা গৃহস্থ মাত্রেরই নিত্য কর্ম্ম।' এই উপলক্ষে চারুদত্ত আরও বলেন,—"তপসা মনসা বাগ্‌ভিঃ পূজিতা বলিকর্ম্মভিঃ। তুষ্যন্তি শমিনাং নিত্যং দেবতাঃ কিং বিচারিতৈঃ॥" নিত্যকর্ম্ম সম্বন্ধে বিচার করিবার আর কি আছে? নিত্যকর্ম্মে দেবতা প্রসন্ন হন;—এ বিষয়ে তর্ক করিতেই নাই। চারুদত্তের ন্যায় ব্রাহ্মণের গৃহেও নিত্য-কর্ম্মানুষ্ঠানের এই পদ্ধতি দেখিয়া ব্রাহ্মণ-সমাজে নিষ্ঠাচরণ কিরূপ ছিল, সহজেই বুঝিতে পারা যায় না কি? হইতে পারে, ব্রাহ্মণের মধ্যে অনেকে নীতিভ্রষ্ট আচারভ্রষ্ট হইয়াছিলেন; তাই বলিয়া সকলেরই যে সেই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, তাহা কোনক্রমেই মনে করিতে পারি না। চারুদত্ত গণিকার প্রেমে আবদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া সকল ব্রাহ্মণ-সন্তানই যে তদ্রূপ হইবেন, তাহা কখনই মনে করা যায় না। একজন ব্রাহ্মণ-সন্তান, শর্ব্বিলক, বেশ্যার প্রেমে পাগল হইয়া চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া-

ছিল বলিয়া ব্রাহ্মণ-মাত্রেরই চরিত্রে সে কলঙ্ক কখনই আরোপ করা যায় না। তার পর অন্তঃপুরের চিত্র দেখুন। সমালোচকগণ বলেন,—যে সময়ের চিত্র নাটকাদিতে প্রদত্ত হইয়াছে, তখন অন্তঃপুরমহিলারা যথেচ্ছভাবে পতির বন্ধু-বান্ধবগণের অর্থাৎ পরপুরুষ গণের সহিত আলাপ-পরিচয় করিতে পারিতেন। দৃষ্টান্তস্থলে, মৃচ্ছকটিক, রত্নাবলী, নাগানন্দ-প্রভৃতি নাটকের এবং কাদম্বরী, কথাসরিৎসাগর প্রভৃতি গল্প গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে নায়িকার সহিত অন্য পুরুষের কথোপকথনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। কথাসরিৎসাগরের একটী উপাখ্যান প্রধানভাবে উল্লেখ দেখিতে পাই। রাজ্ঞী রত্নপ্রভার সহিত নরবাহনদত্তের মন্ত্রীরা সাক্ষাৎ করিতে আসেন। রাজ্ঞীকে সেই সমাচার পূর্ব্বে জানান হইয়াছিল। রাজ্ঞী তাহাতে উত্তর দিয়াছিলেন,—'পতির বন্ধু-বান্ধবগণ সাক্ষাৎ করিবেন, তাহাতে আর এত আদব-কায়দা কেন? পতির যাঁহারা প্রিয়পাত্র, তাঁহারা আমারও প্রিয়পাত্র।' এবম্প্রকার উপাখ্যানাদি দেখিয়া সমাজে যে স্ত্রী-স্বাধীনতা অব্যাহতভাবে প্রচলিত ছিল, তাহা কখনই নির্দ্ধারণ করা যায় না। প্রথমতঃ, কি উপলক্ষে কি ঘটনায় নাটকে এবং উপাখ্যানে ঐরূপ প্রসঙ্গ উত্থাপিত করা হইয়াছে, তাহা বিচার করা কর্ত্তব্য। বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্নরূপ আচার-ব্যবহার আছে। কোনও এক বিশেষ স্থলে বিশেষ ঘটনাক্রমে কোনও নায়িকার পরপুরুষের সহিত আলাপ হইয়াছিল বলিয়া ঐ প্রথা যে সর্ব্বত্র অব্যাহত ছিল, তাহা কখনই মনে করিতে পারি না। বর্ত্তমানের অবস্থা বিষয়ে বিবেচনা করিয়া দেখিলেও যে ভাব মনে আসে, অতীতের ঘটনাতেও সেই ভাবই মনে আসিতে পারে। এখনও যেমন এই সমাজের কোথাও অন্তঃপুরাচার আছে, কোথাও বা ব্যভিচার ঘটিয়াছে, কোথাও অবগুণ্ঠন আছে, কোথাও অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হইয়াছে; সে সময়েও সমাজে এই দুই ভাবেরই সমাবেশ ছিল,—ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতে পারে। আর এক কথা,—রাজারাজরার দৃষ্টান্ত সাধারণ গৃহস্থের মধ্যে সর্ব্বথা প্রযুক্ত হইতে পারে না। চারুদত্তের অন্তঃপুরে অবরোধ-প্রথার বিষয় অনুধাবন করিলেও এ বিষয় অনেকটা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। শর্ব্বিলক চুরি করিতে যাইবার সময় কত চত্বর কি ভাবে পার হইয়া অন্দর-মহলে প্রবেশ করিয়াছিল, এ প্রসঙ্গে তাহাও বিবেচনার বিষয়। দুই একটী ব্যভিচারের দৃষ্টান্ত যেমন দেখিতে পাই, তেমনই হিন্দু-রমণীগণের—সতী-সাধ্বীগণের পতিপ্রাণতার জীবন্ত চিত্র প্রোক্ত কাব্য মহাকাব্য ও নাটক সমূহের অঙ্গ উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে। সীতাদেবীর সম্বন্ধে আক্ষেপ করিবার সময় শ্রীরামচন্দ্র বলিয়াছিলেন,—"রামৈক জীবিতে", বর্ণে বর্ণে এ উক্তির সার্থকতা জানকীর চরিত্রে দেখিতে পাই। কেহ বলিতে পারেন,—সে রামায়ণের দূর অতীতের কথা। কিন্তু পরবর্ত্তী চিত্রেও দেখুন,—পতির সুখকামনায় বাসবদত্তা সপত্নী-গ্রহণেও আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। জীমূতবাহনের জন্য মলয়াবতী প্রাণবিসর্জ্জন দিতেও প্রস্তুত হইয়াছেন। আরও একটু নিকটে দৃষ্টিপাত করুন; গৃহস্থ চারুদত্তের সংসারে তাঁহার গৃহলক্ষ্মী সহধর্ম্মিণী, বেশ্যাসক্ত পতির সম্মান-রক্ষার জন্য কি করিতেছেন? চারুদত্ত ধার্ম্মিক ও নির্লোভ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। বারাঙ্গনা বসন্তসেনা চারুদত্তকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার নিকট আপনার কতকগুলি অলঙ্কার গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছিলেন। চারুদত্তের গৃহে

চুরি করিতে প্রবেশ করিয়া শর্ব্বিলক সেই গহনাগুলি অপহরণ করে। গহনাগুলি অপহৃত হইলে চারুদত্ত প্রমাদ গণিলেন। তাঁহার বড়ই ভাবনা হইল,—পাছে তিনি লোক-সমাজে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া নিন্দিত হন। সেই সময় চারুদত্তের উদ্বেগ অপেক্ষা তাঁহার সহধর্ম্মিণীর উদ্বেগ যেন অধিকমাত্রায় বৃদ্ধি পাইল। পতির পাছে দুর্নাম হয়,—এই আশঙ্কায় চারুদত্তের পত্নী আপনার গাত্রালঙ্কার উন্মোচন করিয়া চারুদত্তের হস্তে প্রদান করিলেন। বসন্তসেনার অপহৃত অলঙ্কারের পরিবর্ত্তে তাঁহার কণ্ঠহার রত্নমালা বসন্তসেনাকে প্রদান করিবার জন্য পতিকে অনুরোধ করিলেন। উপায়ান্তর নাই দেখিয়া চারুদত্ত অগত্যা পত্নীর অলঙ্কার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। বসন্তসেনার অলঙ্কার অপেক্ষা মূল্যবান হইলেও সেই অলঙ্কার বসন্তসেনার নিকট প্রেরণ করা হইল। পতির সম্মান-রক্ষার জন্য হিন্দু-রমণীর গাত্রালঙ্কার-দানের এবম্বিধ দৃষ্টান্ত তখনও ছিল, এখনও বিরল নহে। আবার ইহার বিরুদ্ধাচারও কি দেখিতে পাই না? এ সংসারে তাহাও আছে,—চিরদিনই আছে। তবে আদর্শ হিন্দু-রমণী বলিতে সীতা-সাবিত্রীর আদর্শই মনে আসে; আর, তাঁহাদের অনুসরণকারিণী পতিগতপ্রাণা সাধ্বী মহিলাগণের প্রসঙ্গই উত্থাপিত হয়। কোথাও কোনও প্রসঙ্গে কোনও দুশ্চারিণী রমণীর চরিত্র-কথা বিবৃত হইলে, সমাজের সকল রমণীই যে সেইরূপ চরিত্রহীনা হইবেন, তাহা মনে করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। এইরূপ বারাঙ্গনা যদি কোথাও নির্লোভ বা এক-পুরুষে আসক্ত-প্রাণ হয়, তাহা দেখিয়াও বারাঙ্গনা-শ্রেণীর সকলকেই কখনও সেরূপ মনে করা যাইতে পারে না। দৃষ্টান্ত-স্থলে মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনার কথাই উল্লেখ করিতেছি। বসন্তসেনা চরুদত্তগতপ্রাণা; চারুদত্তের জন্য সে সকলই করিতে পারে। চারুদত্তের পুত্র রোহসেনের প্রতি তাহার পুত্রের অধিক স্নেহ যত্ন। মৃচ্ছকটিকে ষষ্ঠ অঙ্কের সেই প্রসিদ্ধ ঘটনাটীতে—যে ঘটনার অনুসরণে নাটকের নাম মৃচ্ছকটিক হইল—রোহসেনের প্রতি বসন্তসেনার স্নেহ-ভালবাসার পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাই; রোহসেন প্রতিবেশী এক ধনীর পুত্রের সহিত খেলা করিতেছিল। ধনিপুত্রের একখানি সুবর্ণ শকট ছিল। সেই শকট লইয়া রোহসেন ধনিপুত্রের সহিত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়। পরে, ধনিপুত্র আপন শকটখানি লইয়া যখন চলিয়া যায়, রোহসেন তখন কাঁদিতে আরম্ভ করে। পরিচারিকা রদনিকা রোহসেনকে ভুলাইবার জন্য একখানি মৃৎশকট কিনিয়া দেয়। কিন্তু রোহসেনের সে শকট পছন্দ হয় না। সে সুবর্ণ শকটের জন্য জিদ করিতে থাকে। বসন্তসেনা তাহা জানিতে পারিয়া আপনার গাত্রালঙ্কারগুলি বিক্রয় করিয়া রোহসেনের জন্য সুবর্ণ শকট কিনিয়া দেয়। উপপতির পুত্রের জন্য বারাঙ্গনার এবম্বিধ স্নেহ-ভালবাসা বসন্তসেনাতে দৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া সকল বারাঙ্গনাই যে সেই প্রকৃতির, তাহা কখনই বলা যায় না। শর্ব্বিলক যখন চারুদত্তের গৃহ হইতে অলঙ্কারগুলি চুরি করিয়া আনিয়া মদনিকার মুক্তির জন্য প্রদান করে, মদনিকা তখন শর্ব্বিলককে যাহা বলিয়াছিল, তাহাও সাধারণ বারাঙ্গনার মত কথা নহে। মদনিকা যখন দেখিল, চারুদত্তের গৃহ হইতে বসন্তসেনার গচ্ছিত অলঙ্কারগুলি শর্ব্বিলক চুরি করিয়া আনিয়াছে, সে তখন বলিল,—'তুমি এক কাজ কর; যাও,—বসন্তসেনার নিকট এই অলঙ্কারগুলি প্রদান কর; আর তাঁহাকে

গিয়া বল, চারুদত্ত তোমার দ্বারা এ অলঙ্কারগুলি তাঁহাকে দিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন।' এইরূপ আর এক কাহিনী আছে। চারুদত্তের পত্নীর রত্নমালা প্রভৃতি অলঙ্কারগুলি বসন্তসেনা যেরূপ কৌশলে প্রত্যর্পণ করিয়াছিল, তাহাই কি সচরাচর দৃষ্ট হয়! যাহারা শোষণের জন্য প্রখ্যাত, তাহাদের মধ্যে কচিৎ দুই একটী বিপরীত দৃষ্টান্ত যেমন থাকিতে পারে; তেমনি সমাজ-শরীরের অঙ্গ-বিশেষে সমাজদ্রোহিরূপ দুই চারিটী বিস্ফোটকের সঞ্চার দৃষ্ট হওয়াও অসম্ভব নয়। সুতরাং তাহা দেখিয়া, সমাজের আচার-বিশেষ সম্বন্ধে কোনরূপ সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কখনই সমীচীন নহে। আমরা তাই বলি, সমাজে সকল অবস্থাতে সকল ভাবেরই অস্তিত্ব ছিল; সৎ, অসৎ, সু, কু, শৃঙ্খলা, বিশৃঙ্খলা, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক,—সকলই আবহমানকাল সমাজে বিদ্যমান আছে, ছিল ও থাকিবে। তবে কখনও কোনও ভাবের আধিক্য বা কোনও ভাবের হ্রস্বতা ঘটিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া কোনও ভাবের সম্পূর্ণ বিলোপ-সাধন কদাচ সম্ভবপর হয় না।

সমাজ দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, কি অবনতির দিকে চলিয়াছে?—এ বিষয়ে দ্বিবিধ মত প্রচলিত আছে। এক মতে দিন দিন সমাজের উন্নতি হইতেছে, অন্য মতে সমাজ অধঃপাতের দিকে চলিয়াছে। যাঁহারা শাস্ত্র-বাক্যে শ্রদ্ধাবান, তাঁহারা শেষোক্ত মতেই আস্থা স্থাপন করেন; কিন্তু শাস্ত্র-বাক্যে যাঁহাদের সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস নাই, তাঁহারা অন্য মত প্রকাশ করেন। তাঁহাদের মতে, অসভ্য বর্ব্বর অবস্থা হইতে সমাজ দিন দিন সভ্যতার সোপানে আরোহণ করিতেছে। সেই সিদ্ধান্তের বশবর্ত্তী হইয়াই তাঁহারা পূর্ব্বতন প্রাচীন সমাজের যত কিছু দোষই অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। সেই দৃষ্টিতে দেখিতে গিয়াই তাঁহারা কাব্য-মহাকাব্য-নাটকাদির মধ্যেও সমাজের কলুষ-কলঙ্ক প্রত্যক্ষ করেন। এই দৃষ্টিতে দেখেন বলিয়াই তাঁহারা ঘোষণা করেন,—ভারতে দাস-প্রথা প্রচলিত ছিল; দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন,—রাজা হরিশ্চন্দ্র চণ্ডালের নিকট আত্মবিক্রীত হইয়াছিলেন এবং আপনার স্ত্রী-পুত্রকে বিক্রয় করিয়াছিলেন। পুরাণেতিহাসের এই কাহিনীতে, মৃচ্ছকটিকের মদনিকার মুক্তির জন্য শর্ব্বিলকের অর্থসংগ্রহ প্রসঙ্গে এবং দ্যূত-ক্রীড়াসক্তের আত্ম-বিক্রয়ের চেষ্টায়, সমাজে দাস-বিক্রয়-প্রথার প্রচলন বিষয়ে অনেকে সিদ্ধান্ত করেন। এইরূপ, পুরাণে লক্ষহীরার প্রসঙ্গ দৃষ্টে, মৃচ্ছকটিকে বসন্তসেনার কাহিনীতে এবং লিচ্ছবি-রাজ্যে অম্বাপলীর প্রাধান্যের বিষয় স্মরণে, সেকালে সমাজে বারাঙ্গনার প্রতিপত্তির বিষয় সিদ্ধান্ত হইয়া যায়। অম্বাপলীর গৃহে ঘটনা-বিশেষে বুদ্ধদেব আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। উজ্জয়িনীতে বসন্তসেনার রাজ-অট্টালিকা-সদৃশ ভবনে নগরের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দ্যূতক্রীড়া সূত্রে গতিবিধি করিতেন। কথাসরিৎসাগরে লিখিত আছে,—দক্ষিণ-ভারতের রাজধানী প্রতিষ্ঠান নগরে মদনমালা নাম্নী এক বারাঙ্গনার বসতি ছিল। প্রাসাদতুল্য তাহার বাস-ভবনে অশ্বারোহী, গজারোহী ও পদাতিক সৈন্যগণ প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিল; রাজা বিক্রমাদিত্য ছদ্মবেশে তাহার গৃহে গমন করিয়া সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রচার আছে। দেবদত্তা নাম্নী উজ্জয়িনীর আর এক বারাঙ্গনা রাজা-রাজারার ন্যায় সম্ভ্রমের সহিত অবস্থান করিত। এই সকল কাহিনীর উল্লেখে, প্রাচীন ভারতের সমাজের এক বীভৎস চিত্র লোক-

সমাজ কোন্ পথে?

সমাজে প্রদর্শন করা হয়; এবং তদ্দ্বারা সেই সমাজের কলঙ্ক খ্যাপিত হইয়া থাকে। এইরূপ সহমরণ প্রভৃতির দৃষ্টান্তের উল্লেখে আত্মহত্যার প্রভাব খ্যাপন করা হয়। বরাহমিহিরের 'বৃহৎসংহিতায়' সহমৃতা রমণীর ভূয়সী প্রশংসা আছে। বরাহমিহির—নবরত্নের একটী রত্ন মধ্যে পরিগণিত; সুতরাং ঐ সময়ে সতীদাহ-প্রথার প্রচলন ছিল, প্রতিপন্ন হয়। কেবল সহমরণ বলিয়া নহে, মালতীমাধবে মালতীর পিতা পুত্রশোকে অগ্নিমধ্যে আত্মবিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন বলিয়া এবং নাগানন্দে জীমূতবাহনের পিতা মাতা ও পত্নী জীমূতবাহনের সহিত চিতারোহণে সঙ্কল্পবদ্ধ হন বলিয়া, লোকে কথায় কথায় আত্মহত্যায় প্রস্তুত হইত,—এইরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হয়। কথাসরিৎসাগরে এক কুমারী, প্রেমে হতাশ হইয়া, চিতাপ্রবেশে প্রস্তুত হইয়াছিল,—এ কাহিনীও এ প্রসঙ্গে উত্থাপিত হইয়া থাকে। রাজা এবং রাজপুরুষগণ যুদ্ধে পরাজিত হইলে, আত্মহত্যাই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিতেন,—গজনীর মামুদের ভারতাক্রমণ সময়ের ইতিহাসে এবম্বিধ ঘটনার উল্লেখ আছে। ইহা দেখিয়াও প্রাচীন ভারতে অসভ্য-সমাজোচিত রীতি-পদ্ধতির অস্তিত্ব সপ্রমাণ করা হয়। এখন এ সকল কু-প্রথার পরিবর্ত্তন হইয়াছে;—সুতরাং সমাজ উন্নত হইতেছে। ইহাই উন্নতিবাদিগণের মন্তব্য। যাঁহারা স্ত্রীলোকের পুরুষান্তর-গ্রহণের পক্ষপাতী, তাঁহারা সংহিতা শাস্ত্রে 'পুনর্ভূ' প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ দেখিয়া আপনাদের মতের পোষকতার প্রমাণ পান। কথাসরিৎসাগরে একটী উপাখ্যানে আছে,—মালব দেশের একটী স্ত্রীলোক পর্য্যায়ক্রমে একাদশ পুরুষকে পতিরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। সেই দৃষ্টান্তের উল্লেখে অথবা কোনও পার্ব্বতীয় বন্যজাতির স্ত্রীগণের আচার-ব্যবহার দৃষ্টে সমাজে স্ত্রীলোকের বহু-বিবাহের কথাও বিঘোষিত হইয়া থাকে। 'ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ', একই বিষয়ে কেহ উন্নতি দেখেন, আবার কেহ বা তাহাতে অবনতির কথা ঘোষণা করেন। যাহা হউক, যে সমাজে ধর্ম্মভাব হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, আমরা সেই সমাজকেই কলুষিত সমাজ বলিয়া মনে করি, সেই সমাজের নীতিও বিকৃত ভাব ধারণ করে। সত্য-ত্রেতা দ্বাপর-কলির সম্বন্ধ-তত্ত্ব-বিচারে যে কলিকালের সমাজকে কলুষিত ও ঘৃণিত সমাজ বলিয়া ঘোষণা করা হয়, তাহার কারণ—কলিকালের সমাজে ধর্ম্ম-ভাবের হ্রস্বতায় নীতি ও সমাজ-বন্ধন অতিমাত্রায় কলুষিত হইয়া পড়ে। পূর্ব্বের সমাজ অপেক্ষা আধুনিক সমাজের রীতি-নীতি যে অনেকাংশে দোষযুক্ত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ অন্বেষণ-পক্ষে, রামায়ণ কথিত সমাজের এবং মহাভারত-বর্ণিত সমাজের ও তাহার পরবর্ত্তী কালের বর্ত্তমান সমাজের তুলনা করিয়া দেখিলেই এতদ্বিষয় বোধগম্য হইতে পারে। পুনঃপুনঃই বলিতেছি, পাপ কখনও পৃথিবী হইতে একেবারে বিদূরিত হয় না। তবে কখনও পাপের প্রভাব কম হয়, কখনও বৃদ্ধি পায়। আর তাহা দেখিয়াই সমাজের উন্নতি-অবনতি নির্দ্ধারণ করিতে হয়। পাপ-পুণ্য সম্বন্ধে মতান্তর থাকিলেও, কোন্‌টী পাপ-কর্ম্ম—কোন্‌টী পুণ্য-কর্ম্ম বুঝিবার সম্বন্ধে অনেক সময় গণ্ডগোল বাধিলেও, স্বরূপ-তত্ত্ব আপনিই অধিগত হইয়া থাকে। সে প্রসঙ্গ আমরা পূর্ব্বেও উত্থাপন করিয়াছি। সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে, সংসারের সুখ-দুঃখের ন্যূনাধিক্য দ্বারাই পুণ্য-পাপের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা যায়। সংসারে সুখের ও কষ্টের তারতম্য অনুধাবন করিলেই এই ভাব হৃদয়ঙ্গম হয়। ধর্ম্মপ্রাণতাই সুখের নিদানভূত;

ধর্ম্মহারা হইয়াই দুঃখের দহনে দগ্ধীভূত হইতে হইতেছে। একটু স্থির চিত্তে চিন্তা করিলে সকলেই ইহা বুঝিতে পারেন; আর তাহা হইতেই সমাজ কি ভাবে পরিচালিত হইলে সমাজের সুখ-সাধনে দুঃখবিনাশন হয়, বুঝা যায়। ফলতঃ, সমাজের সকল ভাব সকল অবস্থা চিরদিনই আছে। আলোর পার্শ্বে আঁধার আর আঁধারের মধ্যে বিজলী-বিকাশ চিরদিনই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং সমাজে এ ভাব ছিল, আর সে ভাব ছিল না,—ইহা কখনই সিদ্ধান্ত হয় না।

সমাজ সম্বন্ধে যাহা দেখি, রাজা, রাজ্য, রাজনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধেও তাহাই দেখিতে পাই। কূটরাজনীতিজ্ঞগণ চিরদিনই কূটনীতির অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন। পুরাণ-পরম্পরায়ও যুদ্ধ-বিগ্রহ ব্যাপারে কূটনীতির অনুসরণ দেখিতে পাই; আবার, কাব্য মহাকাব্য নাটক উপাখ্যান প্রভৃতির মধ্যেও তদ্বিধ চরিত্রে সেই ভাবই বিকাশমান। শকটারের ও চাণক্যের ষড়যন্ত্রে নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন হয়। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের উহা এক জীবন্ত উদাহরণ। মুদ্রারাক্ষসে ঐতিহাসিক চরিত্রের অবতারণায় যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের চিত্র অঙ্কিত দেখিতে পাই, পঞ্চতন্ত্রে, হিতোপদেশে, জীবজন্তুর উপাখ্যানে, সেই ছবিই প্রস্ফুট হইয়া আছে। স্বার্থের জন্য সংসার চিরদিনই যে লীলাখেলা খেলিতেছে, ঐ সকল বিবরণে তাহারই আভাষ প্রাপ্ত হই। রাজধানীর বর্ণনায় আধুনিক রাজধানীর বা প্রধান নগরের একটা প্রতিচ্ছবি প্রকটিত দেখি। নানা দেশের বণিকগণ বাণিজ্য-ব্যপদেশে রাজধানীতে সমবেত হইয়াছেন, বড় বড় জহুরী ও শিল্পিগণ রাজধানীতে ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন; হীরা, মাণিক, মুক্তা, সূর্য্যকান্ত, অয়স্কান্ত প্রভৃতির ব্যবসায় চলিয়াছে; বহুমূল্য প্রস্তরখচিত সুবর্ণালঙ্কার প্রভৃতি প্রস্তুত ও বিক্রয় হইতেছে; চন্দন, আতর প্রভৃতি সুগন্ধী দ্রব্যের বিপণী বসিয়াছে; এবং কত দেশের কত সামগ্রী বিক্রয়ার্থ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এ সকল বিবরণ সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগরের পরিচায়ক নহে কি? নাটকে 'শ্রেষ্ঠি-চত্বর' নামক এক পণ্যশালার উল্লেখ দেখা যায়। সেখানে বণিকগণ সম্মিলিত হইয়া পণ্যাদির বিলিবন্দোবস্ত করিতেন। উহাকে কেহ কেহ বর্ত্তমানকালের 'এক্সচেঞ্জের' সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। টাকা সরবরাহের অর্থাৎ আধুনিক 'ব্যাঙ্কারের' কাজও সে সময়ে নির্ব্বাহিত হইত। রাজপথে জনতার অবধি ছিল না। দিবসে ফেরওয়ালাগণ ফেরি করিয়া ফিরিতেছে; রাত্রে বারাঙ্গনাগণ রাজপথে বাহার দিয়া বসিয়াছে। এ সকল বর্ত্তমানের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। অথচ, এ সকল সে কালের প্রতিচিত্র। উজ্জয়িনী রাজধানীর বর্ণনায় মৃচ্ছকটিকে এক সন্ধ্যাকালের কি বীভৎস চিত্রই দেখিতে পাই! সে বর্ণনা আধুনিক রাজধানীর বারাঙ্গনা-পল্লীর বীভৎসতাকেও হারি মানাইয়া দেয়। সহরে জুয়ার আড্ডা আছে, শৌণ্ডিকালয় আছে; রাজপথে ধনিগণ গাড়ীঘোড়া চড়িয়া বেড়াইতেছেন;—এবম্বিধ বিবিধ চিত্রই তত্তৎস্থানে দেখিতে পাই। আবার তুরস্ক সুলতানের রাজ্যে, পারস্যে ও চীনে ব্যবসা-বাণিজ্য চলিয়াছে; বিদেশের পণ্য এদেশে আসিতেছে, এদেশের পণ্য বিদেশে যাইতেছে,—এবম্বিধ বিবরণেরও অসদ্ভাব নাই। ফলতঃ, আধুনিক সভ্য-সমুন্নত রাজধানী-সমূহে যে সকল ব্যাপার প্রতিনিয়ত সঙ্ঘটিত হয়, তাহার প্রায় সকলই সমসাময়িক চিত্রে দেখিতে পাই। কেবলই যে কর্ম্মকোলাহলে জনসাধারণ

রাজধানীর চিত্র।

বিবৃত ছিল, শুধুই যে ষড়যন্ত্র ব্যবসা-বুদ্ধি বা কলুষকলঙ্কে সমাজ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাও নহে; ঐ সকলের মধ্যে ধর্ম্মালোচনায় ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানেও কেহ কেহ ব্রতী ছিলেন, দেখিতে পাই। রাজগণ এবং বণিকগণ দেবায়তনাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছিলেন; পূজা-উৎসবে অনেক স্থলেই ধুমধাম হইত। ধর্ম্মভাবোদ্দীপক নাট্যাভিনয়ে ধর্ম্মালোচনার আভাষ পাওয়া যায়। প্রবোধচন্দ্রোদয় প্রভৃতি নাটক রচনা ও তাহার ভাবগ্রহণ ধর্ম্মপ্রাণতার এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন বলা যাইতে পারে। কাব্য-মহাকাব্য এবং খণ্ডকবিতা সমূহের মধ্যে এই ধর্ম্মভাবের বিকাশ সর্ব্বথা পরিলক্ষিত হয়। যজ্ঞানুষ্ঠান, যজ্ঞের বিঘ্ন-বিদূরণ—প্রতি কাব্যে মহাকাব্যে এবং নাটকে উল্লিখিত হইয়াছে। খণ্ড-কবিতার মধ্যে ভর্ত্তৃহরি, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির রচনার যে ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনা আছে, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। খণ্ড-কবিতার অঙ্গীভূত স্তোত্রাদিতে ধর্ম্মভাবের পরিচয় সর্ব্বত্র প্রকাশমান।

পাশ্চাত্যে ভারতীয় সাহিত্যের প্রভাব।

পুরাণ ইতিহাস কাব্য-মহাকাব্য-নাটক প্রভৃতির মধ্য দিয়া যেমন সমাজের, ধর্ম্মের, রাজনীতির বিবিধ অবস্থা অবলোকন করি; তেমনই এই সাহিত্যের মধ্য দিয়াই বিদেশের সহিত ভারতের সম্বন্ধ-সংস্রব দেখিতে পাই। এই সংস্কৃত-সাহিত্যের শব্দ-তত্ত্ব আলোচনা করিয়াই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এখন ভারতীয় আর্য্যগণের সহিত আপনাদের সম্বন্ধ-তত্ত্ব নিরূপণ করিতেছেন। এই সংস্কৃত-সাহিত্যের মধ্য দিয়াই জ্ঞানবিজ্ঞানের রশ্মিরেখা দিকে দিকে বিচ্ছুরিত হইয়া আছে। যতই অনুসন্ধান করি, ততই দেখিতে পাই,—দূর অতীত কাল হইতে সে দিন পর্য্যন্ত ভারতের সাহিত্য ভারতের জ্ঞানের প্রভাব দেশে দেশে বিস্তার করিয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ডে এ বিষয় কিছু কিছু আলোচনা করা হইয়াছে; বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গেও কিছু কিছু আলোচনা করার আবশ্যক মনে করি। পূর্ব্বে যে সকল কাব্য-মহাকাব্য-নাটকাদির প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হইয়াছে, তাহার সকলগুলিই ভারতবর্ষের সহিত বৈদেশিক সংস্রব-সংঘটনের পূর্ব্ববর্ত্তিকালের সম্পৎ। অথচ, আশ্চর্য্যের বিষয়, কেহ কেহ প্রমাণ করেন, ভারতের কাব্য মহাকাব্য ও নাটকাদিতে কোনও কোনও স্থলে গ্রীকদিগের প্রভাব বিদ্যমান আছে। কিন্তু সূক্ষ্ম-অনুসন্ধান করিলে বিপরীত ব্যাপারই প্রত্যক্ষীভূত হয়। আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইয়া ভারতবর্ষের সহিত কিছুদিন ঐ সব সম্বন্ধ-সংস্রবের একটু সূত্রপাত করিয়া দিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাহাকে ভারতবর্ষের সহিত বৈদেশিক সংস্রব বলা যায় না। কারণ, তদ্দ্বারা ভারতের ভাষা, ভাব, রীতিনীতি বা আচার-পদ্ধতির কোনরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই;—তখনও পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ নিজস্ব ভ্রষ্ট হয় নাই। তাই কাব্য-মহাকাব্য-নাটকাদির মধ্যে বৈদেশিক সংস্রবের কোনরূপ আভাষ পাওয়া যায় না। প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতে মুসলমান-সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাই বৈদেশিক সংস্রবের নিদানভূত। মুসলমানগণের ভারতাগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ভাষা-ভাব-রীতিনীতি আচার-ব্যবহার কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হয়। এ হিসাবে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে, ঐ সকল সাহিত্য-সম্পৎ যে মুসলমানগণের ভারতাগমনের পূর্ব্ববর্ত্তিকালের, তদ্বিষয়ে কোনই সংশয় থাকিতে পারে না। অধুনা পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করেন, ভারতীয় আর্য্যগণ

বৈদেশিক সংস্রব।

খৃষ্টপূর্ব্ব শতাব্দীতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বৈদেশিক শক্তির অধীনতা-পাশে আবদ্ধ ছিলেন, এবং বিভিন্নভাবে ভারতের উপর পাশ্চাত্য-জাতির প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। এ বিষয়ে নানা জনে নানা মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে আমরা কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি। অধ্যাপক বুলার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—খৃষ্ট-পূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীতে লিপির প্রবর্ত্তনা-মূলে পাশ্চাত্যের প্রভাব ভারতবর্ষে প্রথম পতিত হইয়াছিল; অর্থাৎ, সেমিটিক বর্ণমালার আদর্শে ভারতের বর্ণমালা সংগঠিত হয়, ইহাই তাঁহার মত। বুলার বলেন,—অশোকের খোদিত-লিপিই ভারতবর্ষের প্রাচীনতম লিপির নিদর্শন;* আর ঐ লিপির সাদৃশ্য-তত্ত্বের আলোচনা করিলে, উহা প্রাচীনতম 'উত্তর-সেমিটিক' বা ফিনিসীয়ান লিপির অনুকৃতি বলিয়া বুঝা যায়। ৮৯০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের সমসময়ে ঐ লিপি আসিরীয়া দেশে ওজন করিবার দ্রব্যে এবং 'মোয়াবাইট' জাতির খোদিত প্রস্তরে আবিষ্কৃত হয়। মেসোপোটামিয়া হইতে যে সকল বণিক ভারতবর্ষে আসিত, তাহাদের দ্বারাই ঐ লিপি ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু এবম্বিধ মত যে প্রমাদপূর্ণ, তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রমাণ করিয়াছি।† তথাপি একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। পাণিনির আবির্ভাব-কাল—খৃষ্ট-জন্মের সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে সপ্রমাণ হয়। পাণিনি, 'গ্রন্থ', 'লিপি' প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। তদ্দ্বারা পাণিনির সময়ে ভারতীয় লিপি কতদূর পরিপুষ্ট ছিল, বেশ বুঝা যায়। বেদাদি শাস্ত্র-গ্রন্থের প্রমাণ অনুসন্ধান করিলে, ভারতে লিপির বিদ্যমানতা আরও কত পূর্ব্বেই অবগত হই! সুতরাং বলিতে হয়,—অন্য দেশের আদিস্তরের দৃষ্টান্তে ভারতের পরিপুষ্টির স্তরকে খর্ব্ব করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। এইরূপ, আরও যে কয়েকটী যুক্তিতে ভারতের উপর অন্য দেশের প্রভাবের বিষয় প্রতিপন্ন করা হয়, সেগুলিও একান্ত ভিত্তিহীন। তাহারও কয়েকটীর উল্লেখ করিতেছি। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন,—৫০০পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে হইতে ৩৩১ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ পারস্যের 'একিমিনাইড' রাজবংশের শাসনাধীন ছিল। গান্ধারের এবং অশ্বকের অধিবাসীদিগকে (প্রথম) সাইরস আপনার করদরাজ্য মধ্যে পরিগণিত করিয়াছিলেন। বেহিস্থানে এবং পার্সিপোলিসে প্রাপ্ত পারস্য-ভাষার পুরাতন লিপিতে আরও প্রকাশ আছে,—সাইরসের বংশধর দরিয়াস হিষ্টাস্পিস গান্ধার হইতে সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী প্রদেশ পর্য্যন্ত আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। দরিয়াসের আদেশ অনুসারে স্কাইলাক্স নামক জনৈক গ্রীক ভারতবর্ষ পরিভ্রমণে আগমন করেন। ৫০৯ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে তিনি সিন্ধুনদ মধ্যে পোতচালনা করিয়াছিলেন। স্কাইলাক্সের ভ্রমণ-বৃত্তান্তকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিয়া হেরোডোটাস প্রমুখ গ্রীসদেশীয় ঐতিহাসিকগণ ভারতবর্ষের বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষের বহু অর্থ রাজকররূপে

---

* বুলার দুই প্রকার লিপির উল্লেখ করেন। এক প্রকার লিপির নাম—খারষ্টি; অন্য প্রকার লিপির নাম—ব্রাহ্মী। খারষ্টি-লিপি গান্ধার দেশে (পূর্ব্ব আফগানিস্থানে ও পঞ্জাবের উত্তরাংশে) প্রচলিত ছিল; ব্রাহ্মী লিপি ভারতবর্ষের সর্ব্ববিধ লিপির মূলীভূত। খারষ্টি-লিপির বিশেষত্ব—উহা বামাবর্ত্ত, অর্থাৎ দক্ষিণভাগ হইতে বামভাগে এবং ব্রাহ্মী লিপি দক্ষিণাবর্ত্ত অর্থাৎ বামভাগ হইতে দক্ষিণ ভাগে লিখিত হয়।

† "পৃথিবীর ইতিহাস", দ্বিতীয় খণ্ডে, 'ভারতের বর্ণমালা' প্রসঙ্গে, এ সকল বিষয় দ্রষ্টব্য।

পারস্য-সম্রাটের ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিত,—এবম্বিধ উল্লেখও সেই ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। কিন্তু এ সকল বৃত্তান্ত যে আদৌ ভ্রমসঙ্কুল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই সপ্রমাণ করিয়াছি। ভারতবর্ষ বলিতে পূর্ব্বকালে কত বহুবিস্তৃত সাম্রাজ্যকে বুঝাইত এবং তাহার কতটুকু অংশ পারসিকগণের বা গ্রীকগণের অধিকারে আসিয়াছিল, তাহা অনুধাবন করিলেই এ তথ্য নির্ণীত হয়। * ফলতঃ, ভারত-সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত ভাগের যে সামান্য অংশের সহিত তাঁহাদের সংস্রব ঘটিয়াছিল, তাহাও ভারতের উপর তাঁহাদের প্রভাব কোনরূপেই বিস্তৃত হয় নাই, পরন্তু ভারতবর্ষের জ্ঞান গৌরব বিভব-ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির দ্বারাই তাঁহারা লাভবান হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে ইতিহাসেরই একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি। পারস্য সম্রাট জারাক্সেস ৪৮০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে বিপুল বাহিনী সহ যখন গ্রীসদেশ আক্রমণে অগ্রসর হন, তখন গান্ধার দেশ হইতে এবং ভারতবর্ষ হইতে তিনি সৈন্য সংগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। † হেরোডোটাস সেই সকল সৈন্যের পোষাক-পরিচ্ছদের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষের নিকট অন্য দেশ সৈন্য সাহায্যাদি পাইয়াছিল—এরূপ দৃষ্টান্ত নানা স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। চীন সাম্রাজ্যও এইরূপ সৈন্য-সাহায্য প্রার্থনা করিয়া সে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, চীনের ইতিহাসে প্রকাশ আছে। কিন্তু ভারতবর্ষ যে কখনও অন্য দেশের সাহায্য লইয়া আত্মরক্ষায় বা দেশ বিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। ইতিহাসে এ সকল ঘটনার উল্লেখে নিশ্চয়ই প্রতিপন্ন হয়, অন্য দেশের প্রভাব ভারতে বিস্তৃত হওয়া অপেক্ষা ভারতের প্রভাবই অন্য দেশে অধিক মাত্রায় বিস্তৃত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের সহিত পাশ্চাত্য-দেশের আর আর যে সম্বন্ধ-সংস্রবের বিষয় বর্ণিত হয়, তাহারও কয়েকটীর উল্লেখ করিতেছি। গ্রীস-দেশীয় চিকিৎসক টেসিয়াস, পারস্যের সম্রাট দ্বিতীয় আর্টাজারাক্সেসের শাসন সময়ে পারস্যের রাজধানীতে অবস্থান পূর্ব্বক এবং ভারতবর্ষের ব্যক্তি-বিশেষের সহিত আলাপ-পরিচয়ে, ভারতবর্ষের বিবরণ কিছু কিছু সংগ্রহ করেন। ৩৯৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে টেসিয়াস গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া যান। তাঁহার সেই গ্রন্থ যদিও এখন বিলুপ্ত হইয়াছে; কিন্তু ভারতবর্ষ যে বিদেশ হইতে কোনও প্রকার জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল, তিনি তাহার উল্লেখ করেন নাই। এই সকল বিচ্ছিন্ন বিবরণে ভারতবর্ষের সহিত পাশ্চাত্য-দেশের যে সম্বন্ধ-সূত্র দেখিতে পাই, আলেকজাণ্ডারের ভারত-আগমন উপলক্ষে সেই সূত্র একটু দৃঢ় হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় বটে; কিন্তু তাহা হইলেও আলেকজাণ্ডার বা তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ ভারতবর্ষের ভাষায়, ভাবে বা চিন্তাস্রোতে কোনরূপ গত্যন্তর ঘটাইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া উপলব্ধি হয় না। আলেকজাণ্ডারের ভারতাগমনের বিবরণ সংক্ষেপে একটু আলোচনা করিয়াই দেখা যাউক না কেন! পারস্য সাম্রাজ্যকে বিধ্বস্ত করিয়া আলেকজাণ্ডার ৩২৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে হিন্দুকুশ পর্ব্বত অতিক্রম করেন। ঐ সময়

* এই খণ্ড "পৃথিবীর ইতিহাসের" ২৬১ম পৃষ্ঠা হইতে ২৬৩ম পৃষ্ঠায় এ বিষয়ের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

† "In the army which Xerxes led against Greece in 480 B. C. there were divisions of Gandharians and Indians, whose dress and equipment are described by Herodotus."—*History of Sanskrit Literature.*

তাঁহার সঙ্গে এক লক্ষ কুড়ি হাজার পদাতিক এবং ত্রিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্ত যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল। হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া আলেকজাণ্ডার যে নগর প্রথম অধিকার করেন, সে নগরের নাম—পুষ্কলাবতী; গ্রীকগণের উচ্চারণে ঐ নগর 'পিউকেলাওতিস' (Peukelaotis) রূপ পরিগ্রহ করিয়া আছে। কাবুল ও সিন্ধু নদদ্বয়ের সম্মিলন-স্থলে ঐ নগর অবস্থিত ছিল। পুষ্কলাবতী অতিক্রম করিয়া আলেকজাণ্ডার যে দেশে উপনীত হন, সে দেশে 'অশ্বক' জাতি বসতি করিত। গ্রীস-দেশীয় ঐতিহাসিকগণ অশ্বক-জাতির দেশকে 'আশ্বাকনৈ' (Assakanoi), আস্পাসিওই (Aspasioi), হিপ্পাসিওই (Hippasioi) প্রভৃতি রূপে উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন। ঐ দেশ কাবুল নদীর উত্তরে অবস্থিত ছিল। উহার পর আলেকজাণ্ডার কাবুল নদীর দক্ষিণস্থিত গান্ধারদিগের দেশে উপনীত হইয়াছিলেন। ঐ দেশ কান্দাহার বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থান বলিয়া উল্লিখিত হয়। ইহার পর তিনি আনুমানিক ৩২৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়াছিলেন। আলেকজাণ্ডার সিন্ধুনদের শাখাবিশেষ অতিক্রম করিয়াছিলেম বটে; কিন্তু তিনি কতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন বা আধিপত্য-বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইতিহাস-পাঠকের তাহা অবিদিত নাই। আলেকজাণ্ডার বা তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ পঞ্চনদ প্রদেশের সীমানার মধ্যেই সামান্ত-রূপ অধিকার-বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন। তক্ষশীলা নগরে গ্রীকগণ প্রবেশ করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তদ্দ্বারা ভারতবর্ষের উপর তাঁহাদের বিশেষ কোনও প্রভাব যে বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। পরন্তু ঐ সময় গ্রীকগণ ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ যোগীদিগকে প্রথম দেখিতে পান। তাঁহাদের যোগবল ও শিক্ষার প্রভাব দেখিয়া গ্রীকগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন, এই প্রমাণই পাওয়া যায়। ফলতঃ, গ্রীকদিগের দ্বারা কোনরূপ শিক্ষার প্রভাব এ দেশে বিস্তৃত হইবার পূর্ব্বে জ্ঞানের গৌরবে শিক্ষার বিভবে এ দেশ গৌরবান্বিত ছিল। সমসাময়িক বিবরণে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। আলেকজাণ্ডার পৌরবগণের দেশ অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। গ্রীকদিগের বর্ণনায় সেই দেশের রাজার নাম পোরাস। তিনি পঞ্চাশ সহস্র পদাতিক, চারি সহস্র অশ্বারোহী, দুই শত গজারোহী এবং চারি শত রথী সৈন্ত সহ আলেকজাণ্ডারের আক্রমণে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। ঝিলাম নদীর তীরে ঘোর যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধে আলেকজাণ্ডার জয়লাভ করেন। ইহার পর আলেকজাণ্ডার শতদ্রু নদীর (গ্রীকদিগের উচ্চারণে জাডাড্রাস—Zadadras) তীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়াও উক্ত আছে। কিন্তু সেখানে তিনি যে বিষম বাধা প্রাপ্ত হন, তাহাতে তাঁহার গতি একেবারে পরিবর্ত্তিত হয়। গ্রীকদিগের বর্ণনায় প্রকাশ,—'প্রাসিঐ' (Prasioi) বা 'প্রাসী' দেশের রাজা তাঁহাদিগকে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। মগধ-দেশ গ্রীকদিগের নিকট ঐ নামে অভিহিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করেন। সেই বাধা প্রাপ্ত হইয়া, পঞ্চনদ প্রদেশের অধিকৃত অংশে একজন শাসনকর্ত্তা নির্দ্দেশ করিয়া আলেকজাণ্ডার জেড্রোসিয়ার পথ দিয়া পারস্য-অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হন। আলেকজাণ্ডারের এই অভিযানের যে সকল বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার কোনও বিবরণেই ভারতবর্ষের উপর গ্রীসের প্রভাবের পরিচয় পাই না। পরন্তু পৃথিবী-বিজয়ী আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষে আসিয়া ভারতবাসীর বাহুবলের নিকট বিপর্য্যস্ত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হন,—এ ঘটনায় তাহাই বুঝিতে

পারি। আলেকজাণ্ডার প্রত্যাবৃত্ত হইলে তাঁহার প্রতিনিধি-শাসনকর্ত্তা ইউডেমাস কর্ত্তৃক পৌরবদেশের বৃদ্ধ রাজা পোরাসের হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়। তাহাতে ঐ দেশের অধিবাসীরা উত্তেজিত হইয়া উঠে। এই সময় চন্দ্রগুপ্ত সেই উত্তেজিত জনসাধারণের সহিত যোগদান করেন। ফলে গ্রীসের সম্বন্ধ-সূত্র একেবারে ছিন্ন হইয়া যায়। ৩১৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ হইতে গ্রীকদিগের উচ্ছেদ-সাধন হইয়াছিল। ফলতঃ, সামান্য কয়েক বৎসর মাত্র পঞ্চনদ প্রদেশের একটা অংশবিশেষে সামান্যরূপ আধিপত্য রাখিয়া গ্রীকগণ সে অধিকার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহাতে এই সময়ে গ্রীকগণের কোনও জ্ঞানের অনুসরণ ভারতবর্ষ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। মৌর্য্য রাজবংশের প্রতিষ্ঠার দিনে ভারতের সহিত গ্রীসের কতকটা সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল বটে; কিন্তু সে সম্বন্ধ-সূত্রে গ্রীস লাভবান হইয়াছিল ভিন্ন, ভারতবর্ষ কখনই লাভবান হয় নাই। মন্বাদি সংহিতা-শাস্ত্র তখন ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত ছিল; ব্রাহ্মণগণ, যোগিগণ, শ্রমণগণ ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে ব্রতী ছিলেন; কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতির পূজা-পদ্ধতি গ্রীকগণ এ দেশে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; অদ্বিতীয় নীতিশাস্ত্রবেত্তা চাণক্য, চন্দ্রগুপ্তের দক্ষিণ-হস্ত রূপে রাজদণ্ড নিয়ন্ত্রিত করিতেছিলেন। সুতরাং বেশ বুঝিতে পারা যায়, তখনও ভারতের কাহারও নিকট কিছু গ্রহণের আবশ্যক হয় নাই।

এতাদৃশ জীবন্ত প্রমাণ-পরম্পরা সত্ত্বেও যাঁহারা ভারতের কাব্য, মহাকাব্য বা নাট্য-সাহিত্যে পাশ্চাত্যের প্রভাব দেখিতে পান, তাঁহারা নিশ্চয়ই ভ্রান্ত পথে পরিচালিত, অথবা অযথা আত্ম-প্রাধান্য-খ্যাপনে প্রযত্নপর। এ ভ্রান্তি—এ আত্ম-প্রাধান্য-খ্যাপনের প্রয়াস যে অধুনা সংঘটিত হইয়াছে, তাহা নহে। ডাইয়োক্রাইসো-ষ্টোমস (Dio Chrysostomos)—গ্রীসদেশের একজন প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ অলঙ্কার-শাস্ত্রবিৎ। ৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার বিদ্যমানকাল প্রতিপন্ন হয়। তিনি কিনা লিখিয়া গিয়াছেন,—'ভারতবাসীরা হোমারের আদর্শে কাব্য-মহাকাব্য প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন!' আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, মহাভারতের সহিত 'ইলিয়াড' মহাকাব্যের ঘটনা-বিশেষের ও চরিত্র-বিশেষের সাদৃশ্য আছে। ইহাতে কোথায় মনে করা উচিত,—ইলিয়াডে মহাভারতের ছায়াপাত ঘটিয়াছে; কিন্তু তাহা না মনে করিয়া মহাভারতই ইলিয়াডের আদর্শে লিখিত,—এইরূপ ঘোষণা করা হইয়া থাকে। ইহা কতদূর অযৌক্তিক, সহজেই বুঝা যায় না কি? গ্রীসের সহিত সম্বন্ধ হইল কবে, আর মহাভারত রচিত হইয়াছিল কবে,—এই তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলেই সকল তথ্য নিষ্কাষিত হয় না কি? যে সময়ে ইলিয়াড মহাকাব্য রচিত হয়, তাহার পূর্ব্বে এ দেশের সম্পৎ সে দেশে পৌঁছানরই প্রমাণ পাওয়া যায়; পরন্তু সে দেশের সম্পৎ এ দেশে কেহ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন বলিয়া কেহই প্রমাণ প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন না। অধ্যাপক ওয়েবার তুলনায় কল্যকার লোক; তিনি আবার রামায়ণে গ্রীসের প্রভাব দেখিতে পাইয়াছেন। ওয়েবারের যুক্তি এই যে,—ট্রোজান যুদ্ধে হেলেন অপহৃত হইয়াছিলেন; লঙ্কাসমরে সীতা অপহৃতা হন। ইউলিসিসের অলৌকিক কার্য্যাবলীর মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের হরধনুর্ভঙ্গের স্মৃতি জাগরূক হয়। রামায়ণের দুই স্থানে (প্রথম আদিকাণ্ডে এবং চতুর্থ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে) দুই বার 'যবন' শব্দের উল্লেখ আছে।

সাদৃশ্যের কথা।

গ্রীকগণকে হিন্দুরা 'যবন' বলিয়া অভিহিত করেন। সুতবাং গ্রীকদিগেব সহিত সম্বন্ধের পর রামায়ণের রচনা হইয়াছিল। অধ্যাপক জ্যাকবি ইহার একটা উত্তর দিয়াছেন বটে; তিনি বলিয়াছেন,—'যবন' শব্দ প্রক্ষিপ্ত এবং ৩০০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দের পব রামায়ণে ঐ শব্দ সংযোজিত হইয়াছে। কিন্তু আমবা বলি,—'যবন' শব্দ গ্রীকদিগের সহিত সম্বন্ধের পূর্ব্বেও এ দেশে প্রচলিত ছিল, আচার-ভ্রষ্ট হওয়ায় যাহারা এদেশ হইতে বিতারিত হয়, যবন তাহাদেরই একতমের সংজ্ঞা, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই রামায়ণে 'যবন' শব্দেব প্রয়োগ হওয়া অসম্ভব নহে। অথচ, এই লইয়া ভাবতের উপর গ্রীসেব প্রভাব প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা দেখিতে পাই। কেবল বামায়ণ-মহাভাবত প্রসঙ্গে নহে, শ্রীকৃষ্ণ যীশুখৃষ্টের প্রতিরূপ,—এ কথা বলিতেও কাহাবও কাহারও স্পর্দ্ধা দেখিতে পাই। * কিন্তু ইহা যে বাতুলোচিত উক্তি, তাহা বলাই বাহুল্য। পাশ্চাত্য জাতির গবেষণা প্রভাবেই সপ্রমাণ হয়,—খৃষ্ট-জন্মের বহু পূর্ব্বে এ দেশে মহাভারতের অস্তিত্ব ছিল; মেগাস্থিনীস ৩০০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে ভাবতবর্ষ সংক্রান্ত যে বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে সেই সময়ে মহাভাবতেব অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়। শ্রীকৃষ্ণ—মহাভাবতের এক প্রধান নায়ক। সুতবাং শ্রীকৃষ্ণে যীশুখৃষ্টের ছায়াপাত কোনও প্রকাবেই সপ্রমাণ হয় না। আরও, খৃষ্ট পূর্ব্ব প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণই মহাভাষ্যের কাল নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু মহাভাষ্যে প্রমাণ পাওয়া যায়—মহাভাষ্য রচনার পূর্ব্বে কৃষ্ণচরিত্র লইয়া নাটকাদি রচিত হইয়াছিল। এ সকল ব্যাপারে কি মনে আসে? বরং মনে আসিতে পারে, যীশু-খৃষ্টেই শ্রীকৃষ্ণের ছায়াপাত ঘটিয়াছিল। † ভারতে নাট্যকলাব বিকাশ সম্বন্ধেও ওয়েবার, ইব্রাণ্ডিস ও উইণ্ডিস প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ গ্রীসের অনুসরণ বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রধান কয়েকটী যুক্তির উল্লেখ করিতেছি। আলেকজাণ্ডার যখন ভারতবর্ষে আসেন, তখন তাঁহার সঙ্গে শিল্পিগণ আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অভিনেতা বা নাট্যাভিনয়-পারদর্শী ব্যক্তিগণেব বিদ্যমানতা অসম্ভব নহে। সেলিউকাস, চন্দ্রগুপ্তকে আপনার কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। সেই সূত্রে সেলিউকাসের সহিত এবং দ্বিতীয় টলেমির সহিত পাটলিপুত্রের রাজগণের নানারূপ সম্বন্ধ ছিল। ভাবতের পশ্চিম প্রান্তে গ্রীক-বংশীয় রাজগণ (ইউথিডেমস, ডেমিত্রিয়স, ইউক্রেটাইডস্, হেলিওক্লেস, মিনাণ্ডার প্রভৃতি ‡) প্রায় দুই শতাব্দী-কাল আধিপত্য রাখিয়াছিলেন। বাবিগাজার (বরোচের) সহিত আলেকজান্দ্রিয়াব বাণিজ্য-

---

* ডাক্তার সেক্স (L. A. Sakes, M. D.) প্রথম নির্দ্ধারণ করেন,—খৃষ্টধর্ম্ম হইতে হিন্দুধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে এবং কৃষ্ণে খৃষ্টের ছায়াপাত ঘটিয়াছে।

† "অনুসন্ধান" পত্রে, ১৩০০ সালের (সপ্তম বর্ষ, সপ্তদশ ও বিংশ সংখ্যায়) পৌষ ও ফাল্গুন মাসে, এ সম্বন্ধে প্রমাণ-পরম্পরা দ্রষ্টব্য।

‡ রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের মৃত্যুর পর, আনুমানিক ২০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, বাকত্রিয়ায় উপনিবিষ্ট গ্রীকগণ পশ্চিম-ভারতের প্রান্তভাগ অতিক্রম করেন। ইউথিডেমস (Euthydemos) ঐ সময়ে ঝিলাম নদীর তীর পর্য্যন্ত আপনার রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ডেমিত্রিয়স (Demetrios) খৃষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে সিন্ধুনদের মোহানা পর্য্যন্ত এবং মালবে, গুজরাটে ও সম্ভবতঃ কাশ্মীরেও আপনার প্রভাব কিছুকাল বিস্তার করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে বসবাস হেতুই তিনি ভারতীয় নৃপতির মধ্যে গণ্য হন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত

সম্বন্ধ ছিল ; আর উজ্জয়িনীর সমৃদ্ধির দিনে উজ্জয়িনীর সহিত বারিগাজার বাণিজ্য-সম্বন্ধও প্রতিপন্ন হয়। এপোলোনিয়াসের জীবন-বৃত্তান্তে ফিলাষ্ট্রেটাস লিখিয়া গিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় ৫০ অব্দে এপোলোনিয়াস ভারতবর্ষে আসিয়া, ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক গ্রীস-দেশের সাহিত্য সমাদৃত হইতে দেখিয়াছিলেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের খোদিত লিপিতে প্রকাশ,—'যবনী' বা গ্রীক কুমারীগণ ভারতীয় রাজগণের নিকট উপহার-স্বরূপ প্রেরিত হইতেন ; কালিদাসের রচনার মধ্যেও যবনকুমারীগণের রাজপরিচর্য্যার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল কারণে নাট্য-সাহিত্যে গ্রীসের প্রভাব সূচিত হইয়া থাকে। আরও, অধ্যাপক ওয়েবার সিদ্ধান্ত করেন,—ভারতে কামদেবের পরিচয়-চিহ্ন রূপে তাঁহার পতাকায় মকর-মূর্ত্তি অঙ্কিত হয়। উহা গ্রীসের 'এরোস' (Eros) দেবতার অনুকৃতি। বাকৃত্রিয়ায়, পঞ্জাবে, গুজরাটে, গ্রীস-দেশের নাটক সমূহের অভিনয় হওয়ার বিষয়ও ওয়েবার কল্পনা করিয়াছেন ; আর, তাহা হইতে ভারতবাসীরা অনুকরণ করিয়াছিল, ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। ভারতের নাট্য-সাহিত্যে 'যবনিকা' শব্দ দৃষ্টে উহাও যবন (গ্রীক) দিগের অনুস্মৃতি বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে। ওয়েবার আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ-সূত্রের বিশেষ কোনও পরিচয় দিবার চেষ্টা না পাইয়া, উপর উপর আভাষে ভারতীয় নাট্য-সাহিত্যে গ্রীসের ছায়াপাতের বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ডেনিস পণ্ডিত ইব্রাণ্ডিস এবং তাঁহার অনুসরণকারী জর্ম্মণ পণ্ডিত উইণ্ডিস গ্রীক-নাট্যের সহিত ভারতীয় নাট্যের আভ্যন্তরীণ রচনা-প্রণালীর সদৃশ্য-তত্ত্বও অনুভব করিয়াছেন। ইব্রাণ্ডিসের মত এই যে,—'নিউ আটিক কমেডির' (New Attic Comedy) অনুসরণ করিয়া রোমদেশীয় নাট্যকার প্লোটাস ও টেরেন্স নাটক রচনা করেন, সেই নাটকের অনুসরণে হিন্দুরা নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। উইণ্ডিস স্পষ্টতঃই ভারতের নাটককে সেই নকলের নকল বলিয়া গিয়াছেন। প্লোটাসের ও টেরেন্সের নাটকে যেমন অঙ্ক-বিভাগ আছে এবং অঙ্কারম্ভের পূর্ব্বে 'প্রোলোগ' বা প্রস্তাবনা আছে ; সংস্কৃত নাটকে সেইরূপ প্রস্তাবনা, অঙ্কবিভাগ ও বিষ্কম্ভক প্রভৃতি রহিয়াছে। প্রধানতঃ মৃচ্ছকটি.কর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া উইণ্ডিস প্রতিপন্ন করিয়াছেন,—উহা 'আটিক কমেডির' অনুসরণ না হইয়া যায় না। কারণ, আটিক কমেডিতে যেমন সার্ভাস করেন্স (Servus currence), প্যারাসাইটাস এডাস (Parasitus edas) এবং মাইলস্ গ্লোরিয়সাস (Miles gloriosus) প্রভৃতি নাটকীয় পাত্র দৃষ্ট হয়, মৃচ্ছকটিকে সেইরূপ বিদূষক, বিট ও শকার আছে। আটিক কমেডি সমূহ ৩০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে মেনাণ্ডারের সমসময়ে তাঁহার দ্বারা এবং অন্যান্য নাটককারের দ্বারা উৎকর্ষের চরম সীমায় উপনীত হইয়া-

---

মুদ্রার একদিকে গ্রীক ভাষার বর্ণমালা এবং অন্য দিকে খারষ্টি বর্ণমালার লিপি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ইউক্রেটা-ইডস (Eukretides) ১১০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন। তিনি ডেমিট্রিয়াসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিতাচরণ করিয়া, পঞ্চনদ প্রদেশে বিপাশা নদীর পূর্ব্বতীর পর্য্যন্ত আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার পর হেলিওক্লেস (Heliokles) ১৬০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ১২০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি বাকৃত্রিয়ার সহিত সকল সম্বন্ধ রহিত করিয়া দেন। এই হইতে বাকৃত্রিয়-গ্রীক নৃপতিগণ সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় নৃপতি বলিয়া গণ্য হন। এই বংশীয় নৃপতিদিগের মধ্যে মিনাণ্ডার (Menander) সমধিক প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন। ১৫০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন হয়। তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া 'মিলিন্দ' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন বলিয়াও কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন। এ হিসাবে ২০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে গ্রীকরাজবংশের লোপপ্রাপ্তি ঘটে।

ছিল; সুতরাং ঐ সময়ে ভারতে ঐ সকলের অনুকরণ হওয়াই সম্ভবপর। ভারতের নাট্যে গ্রীসের প্রভাব পড়িয়াছে বলিয়া যাঁহারা ঘোষণা করেন, তাঁহারা প্রধানতঃ পূর্ব্বোক্ত যুক্তি-জালই বিস্তার করিয়া থাকেন। কিন্তু একটু অনুসন্ধান করিলে ঐ সকল যুক্তি যে একান্তই ভিত্তিহীন, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। প্রথম,—ভারতের নাট্যকলার বিকাশের সময়-নির্দ্দেশে এবং গ্রীসের সভ্যতার কাল-নির্দ্দেশে অনেক ব্যবধান দেখা যায়। আমরা পুনঃপুনঃ প্রমাণ করিয়াছি, ভারতের সভ্যতা সকল দেশের সভ্যতার আদিভূত। প্রাচীন গ্রীস—ভারতের সভ্যতার নিকট সে দিনের। দ্বিতীয়তঃ,—নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর সাদৃশ্য বিষয়ে গ্রীকেরাই ভারতের অনুসরণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কারণ, গ্রীসের সহিত ভারতের সম্বন্ধ-সূত্রের বহু পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে সকল গ্রন্থাদির অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়, সেই সকল গ্রন্থে নাটকের বিদূষকাদি পাত্রের বিষয় লিখিত আছে। হরিবংশে দৈত্যরাজ বজ্রনাভের নিকট নাট্যাভিনয়ের বিবরণ বিবৃত দেখি। তাহাতে বিদূষক প্রভৃতির প্রসঙ্গ আছে। মৃচ্ছকটিক নাটকে 'আটিক কমেডির' অনুসরণরূপ যুক্তির পোষকতা পক্ষে পণ্ডিতগণ যে বলেন,—'ভবভূতির নাটকে বিদূষকাদি নাই, সুতরাং উহা পূর্ব্বের রচিত হইতে পারে; কিন্তু মৃচ্ছকটিক গ্রীসের বা রোমের অনুসরণ;' তাহার উত্তর এই যে, যাঁহারা এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন, নাটকের লক্ষণাদির বিষয় তাঁহারা অবগত নহেন। প্রণয়মূলক নাটকে হাস্যরসের অবতারণার জন্য ঐরূপ চরিত্রের প্রবর্ত্তনা আবশ্যক। তাই বীররসাত্মক ও করুণরসাত্মক নাটক-সমূহে ঐরূপ চরিত্র স্থান পায় নাই। ফলতঃ, নাটকে অঙ্কাদির বিভাগ এবং ঐ সকল পাত্রপাত্রীর সমাবেশ আধুনিক নহে; গ্রীসের অভ্যুদয়ের অনেক পূর্ব্ব হইতেই ভারতে ঐ সকলের প্রবর্ত্তনা ছিল। আরও, এ প্রকার সাদৃশ্য দেখিয়া অনুকরণের বিষয় মনে করিতে গেলে, ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান কবি-নাট্যকার সেক্সপিয়ারকে ভারতীয় নাট্যকারগণের অনুকরণকারী বলিয়াই সর্ব্বপ্রথম ঘোষণা করিতে হয়। কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি নাট্য-কারগণ সেক্সপিয়ারের আবির্ভাবের সে বহু শত বর্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী, তদ্বিষয়ে আদৌ মতান্তর নাই। যে দিক দিয়াই গণনা করুন, কাল-নির্ণয়ে কালিদাস প্রভৃতি সেক্সপিয়ারের সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বের বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন। কালিদাস প্রভৃতির রচনার সহিত সেক্সপিয়ারের রচনার সাদৃশ্যের বিষয় পূর্ব্বেও কিছু উল্লেখ করিয়াছি। পুনশ্চ আর একটি বিশেষ উদাহরণের উল্লেখ করিতেছি। নাটকের অভ্যন্তরে নাটকের অভিনয়—ভবভূতির উত্তররামচরিতে, লবকুশের রামায়ণ-গান উপলক্ষে, প্রথম দৃষ্ট হয়। সেক্সপিয়ারের 'হ্যামলেট' নাটকের মধ্যে সেইরূপ এক নাট্যাভিনয় আছে। এ সাদৃশ্য সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর সাদৃশ্য। সেক্সপিয়ারের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য বলিতেছি না; কিন্তু তর্কপ্রসঙ্গে বলিতে পারি,—সেক্সপিয়ার এ সম্বন্ধে ভবভূতির অনুসরণ করিয়াছেন। তার পর গ্রীকগণের কোনও নাটকের অভিনয় এদেশে হইয়াছিল বলিয়াও প্রমাণ পাওয়া যায় না। না হওয়াই সম্ভব; কারণ, যে ভাষা সকলের বোধগম্য নয়, সে ভাষায় নাট্যাভিনয় হইতে সচরাচর দেখা যায় না। গ্রীক-নৃপতিগণ ভারতবর্ষের প্রান্তভাগে কিছুকাল আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়া সপ্রমাণ হয় বটে; কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহাদের প্রভাব কোনক্রমেই সূচিত হয় না। অধিক বলিব কি? আজিও এমন একটা খোদিত লিপি আবিষ্কৃত হয়

নাই, যাহাতে এ দেশের কোনও অংশে বাক্ট্রিয়-গ্রীক নৃপতিগণের প্রভাব প্রতিপন্ন হয়। এইরূপ বিচার করিয়া দেখিতে গেলে, ভারতবর্ষের নাট্য সাহিত্যের উপর গ্রীসের প্রভাব তো প্রতিপন্ন হয়ই না, পরন্তু পাশ্চাত্য-দেশে ভারতের নাট্য-সাহিত্যের প্রভাবের দুই একটা প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট প্রমাণ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। "প্রত্যক্ষ দৃষ্ট" বলিবার কারণ এই যে, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডে শকুন্তলা নাটকের অনুকরণে প্রস্তাবনার প্রবর্ত্তনা হইয়াছিল, প্রমাণ পাওয়া যায়। ইংরাজী ভাষায় শকুন্তলা নাটক অনুবাদিত হইলে, পাশ্চাত্যে অনেকে বিস্ময়ান্বিত হন। শকুন্তলা নাটকের উপলক্ষে গেটে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। শকুন্তলা নাটকের প্রস্তাবনাংশ দেখিয়াই তিনি আপনার 'ফষ্ট' নাটকের 'প্রবোগ' বা প্রস্তাবনাংশ লিখিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ফরষ্টার জর্ম্মণ-ভাষায় শকুন্তলার অনুবাদ করেন, আর, ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে 'ফষ্ট' নাটকে প্রথম প্রস্তাবনাংশ প্রকাশ পায়। ইহার পূর্ব্বে ইউরোপের কোনও নাটকে ঐরূপভাবের প্রস্তাবনার সমাবেশ ছিল না। এ অনুসরণ সে দিনের ঘটনা, নহিলে, কেহ হয় তো বলিতেন,— 'ফষ্ট' নাটক হইতেই কালিদাস শকুন্তলার প্রস্তাবনা প্রভৃতি অংশের উদ্বোধনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ আর একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সার উইলিয়ম জোন্স যখন অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকের অনুবাদ প্রকাশ করেন, সেই অনুবাদ দৃষ্টে জর্ম্মণীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শেজেল সেই অনুবাদ-গ্রন্থকে সেক্সপিয়ারের অনুসরণ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে উহা মূল সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ বলিয়া প্রমাণ পাওয়ায়, তাঁহার সে ভ্রম-ধারণা দূরীভূত হয়। সেক্সপিয়ারের উপর ভারতীয় নাট্য সাহিত্যের অনুকরণের অভিযোগ আসিবার আশঙ্কায় উভয় দেশের নাট্যসাহিত্য, কেহ কাহারও সাহায্য না লইয়া, স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বিকাশ-প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া, কোনও কোনও সমালোচক সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন।* যাহা হউক, ভারতবর্ষ যে এ সকল বিষয়ে অন্য দেশের মুখাপেক্ষী ছিল, তাহা কোনক্রমেই সপ্রমাণ হয় না; পরন্তু অন্য দেশকে ভারতের মুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছিল, তাহারই নানাবিধ প্রমাণ পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের নীতিমূলক আখ্যায়িকা-সমূহ রূপান্তরে যে পাশ্চাত্য-দেশে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে, এ বিষয় পূর্ব্বেই একটু উল্লেখ করিয়াছি। জীবজন্তুকে মনুষ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যে সকল উপাখ্যান ভারতবর্ষে বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে, তাহারই কতকগুলি উপাখ্যান—সাসানীয় নৃপতি খসরু অনুসীরভান (৫৩১ খৃষ্টাব্দ—৫৭৯ খৃষ্টাব্দ) অনুবাদ করাইয়াছিলেন। বারজোই নামক জনৈক পারস্যদেশীয় চিকিৎসক পহ্লবী ভাষায় উহার প্রথম অনুবাদ সম্পন্ন করেন। সেই অনুবাদ ও মূল এখন লোপ পাইয়াছে। কিন্তু সেই অনুবাদ হইতে ঐ সময়ে (৫৭০ খৃষ্টাব্দে) সিরীয় ভাষায় যে অনুবাদ হয়, তাহা ক্রমশঃ বিভিন্ন দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

অনুকরণের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত।

---

* এ বিষয়ে ম্যাকডোনালের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি; তাহাতেই বিষয়টি বোধগম্য হইতে পারে। যথা,— "The improbability of the theory is emphasised by the still greater affinity of the Indian drama to that of Shakespeare. It is doubtful whether Greek plays were ever

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে সিরীয় ভাষার অনুবাদের এক পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে উহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। 'কালিয়াগ দমনগ', 'কালিলা দিমনা' প্রভৃতি নামে উহা প্রচারিত হয়। পহ্লবী ভাষা হইতে আরবী ভাষায় ঐ সকল গল্পের অনুবাদ অষ্টম শতাব্দীতে সম্পন্ন হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। তখন উহা 'পিল্‌পের (Pilpay) গল্প'—ইত্যাকার একটা সংজ্ঞা পরিগ্রহ করিয়াছিল। ঐ 'পিল্‌পে' নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটু ইতিহাসও আছে। 'বিদ্যাপতি' শব্দের অপভ্রংশে প্রথমে 'বিদ্‌বা', ক্রমশঃ 'বিদপাই' ও পরে 'পিল্‌পে' হইয়া পড়ে। 'বিদ্যাপতি' অর্থাৎ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ, রাজপুত্রদিগকে সৎপথে আনয়ন জন্য শিক্ষা দিতে-ছিলেন,—ইহাই সূত্র। বিষ্ণুশর্ম্মা বা ভারতের কোনও পণ্ডিত প্রথমে 'বিদ্যাপতি' নামে পরিচিত হন; শেষে 'বিদপাই' ও 'পিল্‌পে' রূপ পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যাহা হউক, আরবী ভাষায় অনূদিত হওয়ার পর, উহা পরবর্ত্তিকালে যথাক্রমে (১০০০ খৃষ্টাব্দে) পুনরায় সিরীয় ভাষায়, (১১৮০ খৃষ্টাব্দে) গ্রীক-ভাষায়, পারস্য-ভাষায় (১১৩০ খৃষ্টাব্দে ও পরে ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে), প্রাচীন স্পেনীয় ভাষায় (১২৫১ খৃষ্টাব্দে), হিব্রুভাষায় (১২৫০ খৃষ্টাব্দে) অনূদিত হইয়াছিল। হিব্রু হইতে ১২৭০ খৃষ্টাব্দে লাটিন ভাষায় ঐ গ্রন্থের অনুবাদ হয়। সে অনুবাদ ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পরে ক্রমশঃ জর্ম্মণীতে, ইতালীতে, এবং ফরাসী দেশে উহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইতিমধ্যে অনেকে মূল সম্বন্ধ লোপ করিবার পক্ষে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসী ভাষায় যখন দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তখন লা'ফন্টেন স্বীকার করেন যে, ভারতের 'পিল্‌পে' নামক জনৈক পণ্ডিতের রচনার অনুসরণে ঐ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। কি ভাবে কোন্ সামগ্রী কি অবস্থা প্রাপ্ত হয়, বিদপাই বা পিল্‌পে নামের সৃষ্টিতে তাহা বুঝা যায়। ভাষান্তর-কালে শৃগাল স্থলে ব্যাঘ্র প্রভৃতির উল্লেখে দুই একটী ঘটনার সামান্য পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে বটে, কিন্তু মূল আখ্যান যে ভারতবর্ষ হইতেই গৃহীত হইয়াছিল, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। এই সকল গল্পের মধ্য দিয়া পাশ্চাত্য দেশে কিরূপ ভাবে ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠিত ও ধর্ম্ম সম্প্রদায় সংগঠিত হইয়াছিল, তাহারও দুই একটী উদাহরণ পাওয়া যায়। 'বারলাম্ ও জোসাফাট' (Barlaam and Josaphat) নামক একটী উপাখ্যান খৃষ্টানদিগের প্রাথমিক ধর্ম্মপুস্তক মধ্যে পরিগণিত হইয়া আছে। ঐ গ্রন্থের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিলে বিষয়টী বেশ উপলব্ধি হইতে পারিবে। কালিফ আল্‌মনসুর (৭৫৩ খৃষ্টাব্দ—৭৭৪ খৃষ্টাব্দ) যখন 'কালিলা দিমনা' গল্প আরবী ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন, সেই সময়ে 'জন' নামক দামাস্কসের একজন খৃষ্টান সেখানে অবস্থিতি করিতেন। সেই সময় তিনি বুদ্ধদেব সংক্রান্ত জাতক গ্রন্থের গল্প অবলম্বন করিয়া গ্রীক ভাষায় 'বারলাম ও জোসাফাট' লিখিয়া বসেন। যে সকল গল্পসমষ্টিতে উহা

---

actually performed in India; at any rate, no references to such performances have been preserved. The earliest Sanskrit plays extant are, moreover, separated from the Greek period by at least four hundred years. The Indian drama has had a thoroughly national development, and even its origin, though obscure, easily admits of an indigenous explanation."

গ্রথিত, তাহার সকলগুলিই ভারতের সম্পত্তি। যিনি ঐ গল্পের নায়ক (প্রিন্স জোসাফাট), তাঁহাকে বুদ্ধদেবের প্রতিকৃতি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জোসাফাট নামটী পর্য্যন্ত বোধিসত্ব নামের অপভ্রংশ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এই জোসাফাট ক্রমশঃ গ্রীকদিগের এবং রোমকদিগের 'সেণ্ট' অর্থাৎ দেবতার মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন। ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের ইতিহাসে প্রাচ্যের-প্রভাব পাশ্চাত্যে বিস্তৃত হওয়ার এ দৃষ্টান্ত—অনুকৃতির চরম চিত্র নহে কি? * এমন দৃষ্টান্ত অনেক আছে। অনুকরণের আর এক জীবন্ত প্রমাণ সতরঞ্জ (চতুরঙ্গ বা দাবা) ক্রীড়ায় পরিলক্ষিত হয়। কতকাল হইতে চতুরঙ্গ ক্রীড়া ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৯২ সূক্তের একাদশ ঋকে চতুরঙ্গ শব্দের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদে 'চতুরঙ্গ' শব্দের উল্লেখে চতুরঙ্গ-ক্রীড়ার অস্তিত্ব কত পূর্ব্বের, সহজেই অনুভূত হয়। মহাভারতে চতুরঙ্গের এবং চতুরঙ্গ-ক্রীড়ার পরিচয় দেদীপ্যমান। কি ভাবে কোথায় কোন্ বল সন্নিবিষ্ট হয়, তিথিতত্ত্বে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাই। বাণভট্টের গ্রন্থ মধ্যে চতুরঙ্গ ক্রীড়ার উল্লেখ এবং কাশ্মীর-দেশীয় পণ্ডিত রুদ্রত প্রণীত কাব্যালঙ্কারে চতুরঙ্গের প্রসঙ্গ আছে। কাশ্মীরী কবি রুদ্রত নবম শতাব্দীর কবি বলিয়া পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে কবিতাছন্দে প্রহেলিকায় দাবাখেলা-সংক্রান্ত প্রশ্ন আছে। ভারতবর্ষ হইতে ষষ্ঠ শতাব্দীতে চতুরঙ্গ-ক্রীড়া পারস্য-দেশে প্রবর্ত্তিত হয়; সেখান হইতে আরবগণ কর্তৃক উহা ইউরোপে গিয়াছিল। ইউরোপে একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে চতুরঙ্গ-ক্রীড়ার অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয় না। এইরূপ দেখিতে গেলে নানা বিষয়েই ইউরোপে প্রাচীন ভারতের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যতই দিন যাইবে, ভারতবর্ষের জ্ঞান-ভাণ্ডারের মধ্যে ইউরোপ যতই প্রবেশ-লাভ করিবে, ইউরোপের জ্ঞান-গরিমা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, ভারতের অতীত গৌরবের ঐশ্বর্য্য-বিভব সন্দর্শন করিয়া, সংসার ততই চমৎকৃত হইবে।

ইংরেজ-শাসনে সাহিত্য-প্রসঙ্গ।

ইংলণ্ডের সহিত ভারতের সম্বন্ধ-সূত্রের পূর্ব্বে, ভারতবর্ষের জ্ঞান-বিজ্ঞান—ভারতবর্ষের কাব্য-মহাকাব্য, দর্শনশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বিজ্ঞান, গল্প-উপাখ্যান প্রভৃতি—বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পথে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সে সময়ে ভারতবর্ষ সর্ব্ব বিষয়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মধ্যে বরেণ্য আসন অধিকার করিয়া ছিলেন। সুতরাং তৎকালে ভারতবর্ষের যে সকল সম্পৎ অন্যান্য দেশে গিয়াছিল, তাহা ভারতবাসীর দ্বারাই সেই সকল দেশে বিতরিত হইয়াছিল। দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনায়, আয়ুর্ব্বেদ-

* এ অনুকরণের বিষয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মুখেই প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং এ সম্বন্ধে তাঁহাদের উক্তিই উদ্ধৃত করিতেছি,—"The very hero of the story, Prince Josaphat, has an Indian origin, being, in fact, no other than Buddha. The name has been shown to be a corruption of *Bodhisattva*, a well-known designation of the Indian reformer. Josaphat rose to the rank of a saint both in the Greek and the Roman Church, his day, in the former being August 26, in the latter November 27. That the founder of an atheistic Oriental religion should have developed into a Christian saint is one of the most astounding facts in religious history".

শাস্ত্রের অবতারণায় এবং অন্যান্য বিভিন্ন প্রসঙ্গে আমরা সংক্ষেপে সে সকল বিষয়ের আভাস প্রদান করিয়াছি।* এক্ষণে, ইংরেজদিগের সহিত ভারতের সংস্রব হওয়ার পর, ভারতের সাহিত্য-সম্পৎ লইয়া পাশ্চাত্য দেশে কি ভাবে আলোচনা চলিয়াছে, উপসংহারে তাহারই একটু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। আলেকজাণ্ডারের অভিযানের পর ভারতের সাহিত্য-সম্পদের বিষয় ইউরোপীয়গণ কিছু কিছু অবগত হইয়াছিলেন, প্রমাণ পাওয়া যায়। আরবগণের অভ্যুদয়-কালে মুরগণের মধ্য দিয়া ভারতের বিজ্ঞান শাস্ত্র পাশ্চাত্য দেশে সংবাহিত হয়। এ সকল দূর অতীতের কথা। ইহার পর ষোড়শ শতাব্দীতে ভাস্কো-ডি-গামার ভারতাগমনের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় ধর্ম্মযাজক মিশনরিগণ ভারতবর্ষে আসিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা ভারতের জ্ঞান-ভাণ্ডারের সামান্যরূপ পরিচয় পাইয়াছিলেন। সেই সময়েই আব্রাহাম রজার নামক জনৈক দিনেমার ভর্তৃহরি-বিরচিত সংস্কৃত-কবিতা দিনেমার ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে সেই অনুবাদ সম্পন্ন হয়। তাহার পর প্রায় এক শত কুড়ি বৎসর কাল ভারতে সংস্কৃত-ভাষার বিদ্যমানতা বিষয়ে ইউরোপে আর কোনও বিশেষ উচ্চ-বাচ্য দেখা যায় না। ফরাসী দেশের প্রসিদ্ধ লেখক ভল্টেয়ার একটী প্রবন্ধে ভারতের সংস্কৃত-সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করেন। কিন্তু 'জে-সুইট' সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক ধর্ম্মপ্রচারক তদ্বিষয়ে তাঁহাকে প্রতারিত করিয়াছিলেন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। যাহা হউক, প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতের সাহিত্য সম্পৎ সম্বন্ধে ইউরোপে আলোচনা আরম্ভ হয় বলিতে পারি, 'ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর' বঙ্গদেশ অধিকারের পর হইতে। ভারতবর্ষ শাসন করিতে হইলে—হিন্দুগণের হৃদয় অধিকার করিতে হইলে—ভারতের ভাষা বিষয়ে অভিজ্ঞতা প্রথম প্রয়োজন। ওয়ারেণ হেষ্টিংস প্রথমে এই তত্ত্ব উপলব্ধি করেন। তখন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের সহিত পরামর্শ করিয়া হিন্দুগণের আচার-ব্যবহার সংক্রান্ত গ্রন্থাদির আলোচনা আরম্ভ হয়। সেই সময়ে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের সাহায্যে হিন্দুগণের প্রাচীন ব্যবহার বিধির সার-সংগ্রহ করা হইয়াছিল। মুসলমানগণের শাসনাধীনে এ দেশে পারসী ভাষার বিশেষ প্রচলন ছিল। সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকেই তখন পারসী ভাষা শিখিতে হইত। সুতরাং পণ্ডিতগণের সংগৃহীত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বিধি বিধান প্রথমে পারসী-ভাষায় অনুবাদ করান হয়। তাহা হইতে পরিশেষে ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ হইয়াছিল। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হিন্দুগণের ব্যবহার বিধির ইংরাজী ভাষায় সেই প্রথম অনুবাদ প্রকাশিত হয়। সেই অনুবাদের ভূমিকায় প্রদেশ বিশেষে প্রচলিত সংস্কৃত বর্ণমালার আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছিল এবং ভারতের সাহিত্য সম্বন্ধে দুই চারি কথার আলোচনা চলিয়াছিল। চার্লস্ উইলকিন্সের সাহায্যে সর্ব্বপ্রথমে ইউরোপকে সংস্কৃত ভাষার পরিচয় প্রদান করা হয়। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের উদ্যোগে বারাণসীধামে গমন করিয়া উইলকিন্স সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। তাহার পর ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ভগবদ্গীতার ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। উহার দুই বৎসর পরে 'হিতোপদেশ' ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছিল। সমসময়েই সার উইলিয়ম জোন্স বঙ্গদেশে আগমন করেন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহারই উদ্যোগে

* "পৃথিবীর ইতিহাস", প্রথম খণ্ডে ষড়দর্শন ও রামায়ণ মহাভারত প্রসঙ্গে, এবং তৃতীয় খণ্ডের আয়ুর্ব্বেদ ও গণিত জ্যোতিষ যুদ্ধবিদ্যা প্রভৃতির প্রসঙ্গে এতদ্বিষয়ের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

বাঙ্গালার 'এসিয়াটিক সোসাইটী' সাহিত্য-সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ দেশে আসিয়া, সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া, ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে সার উইলিয়ম জোন্স অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকের অনুবাদ প্রকাশ করেন। তাঁহার সেই অনুবাদ দেখিয়া ইউরোপ বিমুগ্ধ হইয়াছিল। শকুন্তলার অনুবাদের পর তিনি মনুসংহিতার অনুবাদ করেন। ঋতুসংহারের সংস্কৃত মূলাংশ প্রকাশ করার জন্যও তিনিই প্রথম সংস্কৃত-সাহিত্য প্রকাশ করিলেন বলিয়া প্রতিষ্ঠান্বিত হন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সেই ঋতুসংহার প্রকাশিত হয়। সার উইলিয়ম জোন্সের অব্যবহিত পরে, (হেনরি টমাস) কোল্‌ব্রুক সংস্কৃত সাহিত্যের গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। তিনিই প্রথমে বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে সংস্কৃত-ভাষা আলোচনা করিয়াছিলেন। অনেক সংস্কৃত-গ্রন্থের মূল, অনুবাদ এবং তৎসংক্রান্ত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া তিনি যশস্বী হন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে বেদ সম্বন্ধে তাঁহার এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বোধ হয় তাহাই বেদ সম্বন্ধে ইউরোপের প্রথম পরিচয়। কোলব্রুকের ভারতবর্ষে অবস্থিতি-কালে আলেকজাণ্ডার হ্যামিণ্টন নামক জনৈক ইংরেজ সংস্কৃত-ভাষা শিক্ষা করেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিলেন। সেই সময় ফরাসীর সহিত ইংরেজের বিবাদ বাধিয়াছিল। সেই বিবাদ-সূত্রে, স্বদেশ-গমনের পথে, হ্যামিণ্টন ফ্রান্সে আবদ্ধ হন। নেপোলিয়নের আদেশ ছিল,—ইংরেজ-মাত্রকেই বন্দী করিতে হইবে। সেই আদেশ অনুসারেই হ্যামিণ্টনকে কিছুকাল বন্দিভাবে পারিস-নগরে অবস্থান করিতে হয়। সেই সময় কয়েকজন ফরাসী পণ্ডিত এবং জর্ম্মণীর প্রসিদ্ধ কবি (ফ্রেডরিক) শ্লেজেল তাঁহার নিকট সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। ফলে, ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ভারতের ভাষা ও জ্ঞান সম্বন্ধে শ্লেজেলের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাহাতে, সাহিত্য-জগতে এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল; বিভিন্ন ভাষার সাদৃশ্য-তত্ত্ব-নিরূপণের পথ প্রশস্ত হইয়া আসিয়াছিল। এই সময়েই (ফ্রাঞ্জ) বোপ—গ্রীক, লাটিন, পারসিক, জর্ম্মণ প্রভৃতি ভাষার সহিত সংস্কৃত-ভাষার ধাতু-রূপ প্রভৃতির সাদৃশ্য-তত্ত্ব প্রকাশ করেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে বোপের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ভারতবর্ষের ভাষা ও অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে শ্লেজেলের গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর, জর্ম্মণ-দেশে সংস্কৃত-সাহিত্যালোচনার ধূম পড়িয়া যায়। জর্ম্মণ পণ্ডিত এফ রোসেন, ইউরোপকে প্রাচীন ভারতের সাহিত্য-সম্পৎ প্রদর্শন করিবার জন্য উদ্‌বুদ্ধ হন। 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া হাউসের' সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি হইতে সংগ্রহ করিয়া তিনি লাটিন ভাষায় অনুবাদ সহ ঋগ্বেদের প্রথম অষ্টক প্রকাশ করেন। * এইরূপে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে ঋগ্বেদ প্রচারিত হয়। ইহার পর (রাডল্‌ফ্‌) রোথ ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে বেদের ইতিবৃত্ত ও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাহাতে এক নূতন চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হয়;—বৈদিক সাহিত্যের অধ্যয়ন ও প্রচার জন্য জর্ম্মণগণের প্রবল স্পৃহা প্রকাশ পায়। ফলে, সেই হইতে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে শ্রুতি-স্মৃতির অধিকাংশ গ্রন্থ জর্ম্মণ-ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে ফরাসী পণ্ডিত বার্নুফের নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। বার্নুফই প্রথম জেন্দ-ভাষার সহিত বৈদিক-সংস্কৃতের সম্বন্ধ-তত্ত্ব নিরূপণ করেন। তিনিই প্রথম জেন্দ-ভাষার ধর্ম্মগ্রন্থাদির পাঠোদ্ধারে

* এই রোসেন রাজা রামমোহন রায়ের সমসাময়িক ও বন্ধু বলিয়া পরিচিত। বেদ-প্রচারে তিনি রাজা রামমোহন রায়ের সহায়তা পাইয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ আছে।

সমর্থ হন। তিনিই প্রথম বৈদিক সংস্কৃতকে ইউরোপের জনসাধারণের বোধগম্য করিয়া প্রকাশ করেন। তাঁহারই আদর্শের অনুবর্ত্তী হইয়া জর্ম্মণ পণ্ডিতগণ বিভিন্ন ভাষার সাদৃশ্য তত্ত্ব-নিরূপণে প্রবৃদ্ধ হইয়াছিলেন। রোথ এবং ম্যাক্সমূলার প্রমুখ পণ্ডিতগণ তাঁহারই ছাত্র বলিয়া পরিচিত। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বার্ন্‌ফ বৈদিক সাহিত্যালোচনায় যশস্বী হইয়াছিলেন। এই বার্ন্‌ফেরই সমসময়ে ডক্টর (হোরেস হেম্যান) উইলসন সংস্কৃত-ভাষার চর্চ্চায় প্রসিদ্ধি-লাভ করেন। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সংস্কৃত-সাহিত্যের অধ্যাপক। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি ঋগ্বেদের অনুবাদ-কার্য্যে ব্রতী হন। বিষ্ণুপুরাণের ইংরাজী অনুবাদে এবং কতকগুলি সংস্কৃত-গ্রন্থের ও মেঘদূতের অনুবাদে তিনি যশস্বী হইয়া আছেন। ইহার পর যাঁহারা সংস্কৃত-সাহিত্যের আলোচনায় ইউরোপে প্রসিদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে গ্রিম, হামবোল্ট, হুইটনে, বোথ্‌লিং, লাসেন, বেন্‌ফি, মুইর, কুন, বুলার, কেলহর্ণ, প্রিন্সেপ, হৌগ, বার্ণেল প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। বোপ, গ্রিম, হামবোল্ট প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ভারতীয় ও ইউরোপীয় ভাষা-সমূহের সাদৃশ্য প্রদর্শন ব্যপদেশে সংস্কৃত, জেন্দ, গ্রীক, লাটিন, শ্লাব, টিউটন ও কেল্টিক ভাষার বহু শব্দ আলোড়ন করিয়া, একই আদি-ভাষা হইতে ঐ সকলের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন। প্রথমে ইউরোপের জন-সাধারণের মনে বিশ্বাস ছিল, ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা হইতেই অন্যান্য ভাষার উৎপত্তি। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতগণের গবেষণা প্রভাবে তাঁহাদের সে ধারণা অন্তর্হিত হয়। হুইটনে এবং বোথলিং সংস্কৃত ভাষার অভিধান-সঙ্কলনে প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন হন। লাসেন তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে ভারতবর্ষের সাহিত্য সম্বন্ধে বিবিধ গবেষণা প্রকাশ করেন। তাঁহার পর ব্রাহ্মণ ও সূত্র সহ শুক্লযজুর্ব্বেদ প্রকাশে ওয়েবার যশস্বী হন। বেন্‌ফি অনুবাদ সহ সামবেদ প্রকাশে, মুইর বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থের মূলাংশ প্রকাশে প্রসিদ্ধি-লাভ করেন। পরিশেষে ম্যাক্সমূলার সংস্কৃত সাহিত্যালোচনার জন্য অশেষ যশোভাজন হন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের পৌর্ব্বাপৌর্য্যের পরিচয় প্রদান করেন। সায়ণের টীকা সহ ঋগ্বেদ-সংহিতা-প্রকাশে এবং ভাষা, ধর্ম্ম ও পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে গবেষণায় তিনি অদ্বিতীয় খ্যাতিলাভ করিয়া আছেন। এই সকল পণ্ডিতের দ্বারাই এখন সংস্কৃত সাহিত্যের আদর বহুগুণে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। ফলতঃ, এখন ইউরোপে সংস্কৃত-সাহিত্যের যেরূপভাবে আলোচনা হইয়াছে, সংস্কৃত-সাহিত্যের জন্মভূমি এই ভারতবর্ষে উহার সেরূপ চর্চ্চা আর দেখিতে পাই না। এমন অনেক সংস্কৃত-গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় ও জর্ম্মণ ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে, ভারতবর্ষে যাহার মূল গ্রন্থ পর্য্যন্ত লোকলোচনের অন্তরালে রহিয়া গিয়াছে। শুভক্ষণে এ দেশে ইংরেজের আগমন হইয়াছিল! তাহা না হইলে, যে একটু ধূলি-গুঁড়া এখন কুড়াইয়া পাইতেছি, তাহাও হয় তো খুঁজিয়া পাইতাম না। ভারতের কোথায় কি আছে, কি ভাবে লোপ পাইতে বসিয়াছে,—এ কালের মধ্যে ইংরেজই প্রথমে তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তাহার পর অন্যান্য বৈদেশিক-জাতির দৃষ্টি পড়ে। তাঁহাদের অনুসরণে এখন আমাদের তৎপ্রতি একটু একটু দৃষ্টি পড়িয়াছে। এই দৃষ্টি একটু তীক্ষ্ণ না হইলে,—অতীত গৌরবের স্মৃতি উজ্জ্বল করিয়া রাখিবার জন্য প্রাণ না কাঁদিলে, শ্রেয়ঃ নাই—মঙ্গল নাই।

* * *

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব।

[ধর্ম্ম-ভাবের বিকাশে অভিনব সাহিত্য-সম্পদের সৃষ্টি-পরিপুষ্টি।—শিক্ষাষ্টকে নাম সঙ্কীর্ত্তনের নিগূঢ় তত্ত্ব ;—শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে সাহিত্যের অভিনব স্ফূর্ত্তি ;—সংস্কৃত ভাষার কাব্য, দর্শন, নাটক প্রভৃতির উন্মেষের শেষ স্তর ;—সংস্কৃত ভাষায় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ;—মহাপ্রভুর নবধর্ম্মে নবজীবন সঞ্চার।]

স্বর্গের আলোক-রশ্মি।

সময়ে সময়ে সংসারের দিকে স্বর্গ হইতে আলোক-রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। সে আলোকে সংসারের অন্ধ-তামস দূর হইয়া যায় ;—যেন নবারুণ-কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া প্রকৃতি পুলক-প্রফুল্ল হয়। সংসারে মহাপুরুষগণের আবির্ভাব,—স্বর্গের সেই আলোক-রশ্মি। তাঁহাদের শুভাগমনে সংসারে অভিনব আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত হয় ; সে হিল্লোলে, দিকে দিকে অভিনব ভাবকুসুম ফুটিয়া উঠে,—আর সে কুসুমের সুবাস-সৌরভে ভূত-ভবিষ্য-বর্ত্তমান ত্রিকাল আমোদিত করিয়া রাখে। পুণ্যভূমি ভারতে, পাপীর উদ্ধারের জন্য, যুগে যুগে ভগবান কি খেলাই খেলিয়া আসিতেছেন! তিনিও নরদেহ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন ; সঙ্গে সঙ্গে নবীন আলোকে দিক পরিপূর্ণ হইয়াছে। সে আলোকে, সমাজের কত কলুষ-কলঙ্ক দূরে সরিয়া গিয়াছে ;—সে প্রভাবে, পাপ-প্রবৃত্তি বিমর্দ্দিত হইয়া প্রাণে কত ধর্ম্মভাবের বিকাশ পাইয়াছে! কোন্ দিকে—কোথায় না তাঁহার সে লীলা প্রত্যক্ষীভূত! ঐ যে সাহিত্য-কাননে অনুপম কুসুম-সম্ভারে শোভার ছটা বিকশিত, ঐ যে মলয়-সমীরে মৃদুল হিল্লোলে সৌরভ-সুষমায় দিক আমোদিত উল্লসিত, তাহার মূল-তত্ত্ব কি? ধরণীর পাপভার হরণ জন্য শ্রীরামচন্দ্র আবির্ভূত হইলেন ; তাঁহার পাদমূলে রামায়ণ-রূপ কল্প-পাদপের উদ্ভব হইল। অধর্ম্মের অভ্যুত্থানে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া, দুষ্কৃতনাশের জন্য—ধর্ম্ম-সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের উদয় হইল ; সঙ্গে সঙ্গে মহাভারত-রূপ রত্নভাণ্ডার প্রকাশ পাইল ; ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি সাহিত্য-সংসারের কোহিনুরমণি-সমূহ সংসার প্রাপ্ত হইল। এইরূপ, জৈন-তীর্থঙ্করগণের পদরেণুরূপ পরশমণি স্পর্শে কত অয়স কাঞ্চনে পরিণত হইয়াছিল। অহিংসা পরমোধর্ম্মরূপ ব্রত শিক্ষাদানের জন্য বোধিসত্ত্ব বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কত কুসুমই প্রস্ফুটিত হইয়া সৌরভ বিতরণ করিয়াছিল! শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্য 'শিবোঽহং' বাণী ঘোষণা করিয়া কি অমূল্য জ্ঞান-রত্নই দিকে দিকে বিকীর্ণ করিয়া গেলেন! সাহিত্যের ইতিহাসের এ সকল এক একটী অক্ষয় অনন্ত সুবর্ণ স্তর। সে স্তরের শেষ নিদর্শন—পতিতপাবন শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের কলি-কলুষনাশন নামসঙ্কীর্ত্তন। সংস্কৃত-সাহিত্যের বিকাশের যে সকল স্তর পরিদৃষ্ট হয়, ইহাই শেষ স্তর—সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক। প্রাকৃত, পালি প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার প্রতিঘাত সহ্য করিয়া, বিষম প্রতিবন্ধক-পরম্পরা উল্লঙ্ঘন করিয়া, শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব-কালে সংস্কৃত-সাহিত্য এক অভিনব জ্যোতিঃ প্রকাশ করিয়াছিল। সংস্কৃত-সাহিত্যে সে এক নবজীবন-

সঞ্চারের দিন বলিলেও বলা যাইতে পারে। এক দিকে বাসুদেব রঘুনাথ প্রমুখ দার্শনিক-গণের আবির্ভাবে দর্শন-শাস্ত্র আলোচনায় যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল; অন্য দিকে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন স্মৃতিশাস্ত্র-মূলে হিন্দুসমাজের বিরাট দেহ আবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; আর এক দিকে জীবের গতিমুক্তির সরল সুগম পথ প্রদর্শন করিয়া দিয়া শ্রীচৈতন্যদেব নবধর্ম্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গ বিভিন্ন দিক হইতে পরিপুষ্ট হইয়াছিল। এই সময়ের সাহিত্যে লক্ষ্য করিবার বিষয়,—দর্শন স্মৃতি প্রভৃতির উন্মেষণ;—এই সময়ের সাহিত্যে লক্ষ্য করিবার বিষয়,—বৈষ্ণব-ধর্ম্মের চিত্ত-বিমোহন চিত্র!—বঙ্গের গৌরবের এক অভিনব স্তর।

জন্ম-জরা-মৃত্যুর আধি-ব্যাধি-শোক-তাপে সংসার মুহ্যমান্। তাপতপ্ত জীবের আকুল ক্রন্দনে গগন প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সুখ কোথায়, শান্তি কোথায়, এ দুঃখের অবসান হয় কি প্রকারে?—পশুপক্ষিকীটপতঙ্গ হইতে সংসারের সকলেই সেই অনুসন্ধানে বিব্রত রহিয়াছে। জীব মাত্রেরই লক্ষ্য এক,—কিসে দুঃখ দূর হয়, কিসে সুখসাধন সম্ভবপর! এ ভিন্ন সংসারে আর অন্য চিন্তা নাই। এই একই লক্ষ্যে অনন্ত কোটী প্রাণী উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু কেহই পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না। পরীক্ষা-পারাবারে নিমজ্জমান হইয়া, আশা-নৈরাশ্যের ঘাত-প্রতিঘাতে পড়িয়া, কত অবাস্তব কল্পনা বাস্তবরূপে পরিণত হইতেছে;—কত বাস্তব সামগ্রী অবাস্তব মধ্যে পরিগণিত হইতে চলিয়াছে। আস্তিক, নাস্তিক, দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী—অসংখ্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায় আশা-নৈরাশ্যের ভীষণ কোলাহল তুলিয়া, সকলকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। সংসারের এই সঙ্কট-সঙ্কুল অবস্থায়, নৈরাশ্যের ভীষণ আর্ত্তনাদের মধ্যে, আশার অভয়-বাণী জীমূত-মন্দ্রে ধ্বনিত হইল,—"ভয় নাই! পাপী তাপী যে যেখানে আছ, আশ্বস্ত হও। ঐ দেখ, সম্মুখে গতি-মুক্তির সরল সুগম পথ!—হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।" কলিপাবন মহাপ্রভু জীবের গতিমুক্তির এই অভিনব পথ প্রদর্শন করিলেন। নাম-সঙ্কীর্ত্তন রূপ সরল সুগম পথ প্রদর্শিত হইল। নাম-সঙ্কীর্ত্তনে মুক্তিলাভ হইবে, ইহার অধিক সরল শিক্ষা আর কি থাকিতে পারে? দয়াল প্রভু, জীবের যন্ত্রণায় যন্ত্রণা অনুভব করিয়া, করুণার এই স্বচ্ছ সুশীতল অনন্ত নির্ঝর উন্মুক্ত করিয়া দিলেন; আচণ্ডাল সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন;—"এস ভাই, পাপী তাপী যে যেখানে শুষ্ককণ্ঠ তৃষার্ত্ত আছ, এই নাম-পীযূষ পান করিয়া শান্তি লাভ কর।" সাহিত্যে এক নূতন ভাব-প্রবাহ প্রবাহিত হইল;—দর্শন-শাস্ত্র এক অভিনব পন্থা পরিগ্রহ করিল;—স্মৃতিশাস্ত্র-মূলে নব নব অঙ্কুর উদ্গত হইতে লাগিল। কত কবি, কত দার্শনিক, কত নাট্যকারের আবির্ভাব হইল;—বাগ্দেবী বীণাপাণি নানা রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা হইলেন। সাহিত্যের এই নবজীবনের প্রবর্ত্তক—শ্রীচৈতন্যদেব। আপন ধর্ম্মমত প্রচারের জন্য শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং কোনও গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন বলিয়া কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না বটে; কিন্তু তিনি যে সকল শ্লোক ও পদাবলী উচ্চারণ করিতেন, তাহার কতকগুলি তাঁহারই রচনা বলিয়া প্রতীত হয়। ভাবরাজ্যের

মুক্তিপথ প্রদর্শনে।

সে অমূল্য রত্নরাজি বিচ্ছিন্নভাবে বৈষ্ণব-সাহিত্যে কিছু কিছু স্থান পাইয়াছে; অবশিষ্ট সমস্তই কালের গর্ভে বিলীন হইয়া আছে। মহাপ্রভুর একটী প্রিয় সামগ্রী—শিক্ষাষ্টক। ঐ শ্লোকাষ্টকে মহাপ্রভুর ধর্ম্মমতের পরিচয় এবং গভীর দার্শনিক তত্ত্ব গূঢ়ভাবে নিহিত রহিয়াছে। যখনই নাম-সঙ্কীর্ত্তনের মহাবাণী বিঘোষিত হয়, তখনই তাহার সঙ্গে সঙ্গে নাম-সঙ্কীর্ত্তনের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝাইবার আবশ্যক হইয়া পড়ে। শিক্ষাষ্টকে সেই তত্ত্ব বিশদীকৃত। নাম-সঙ্কীর্ত্তনরূপ মুক্তির সরল সুগম পথ প্রাপ্ত হইয়া মানুষ কি ভাবে পরিচালিত হইবে, শিক্ষাষ্টকে মহাপ্রভু তাহাই বুঝাইয়া দিলেন। শিক্ষাষ্টকে একাধারে স্মৃতি, দর্শন, কাব্য—সকলই নিহিত রহিয়াছে। শ্রীচৈতন্য-বিরচিত সেই শিক্ষাষ্টকের শ্লোকাষ্টক আমরা প্রথমে উদ্ধৃত করিতেছি ;—

চেতো দর্পণ-মার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপনম্,
শ্রেয়ঃ কৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূ-জীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্,
সর্ব্বাত্ম-স্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥ ১॥

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহা জনিনানুরাগঃ॥ ২॥

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরী বনিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥ ৪॥
অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত ধূলিসদৃশং বিচিন্তয়॥ ৫॥
নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদ রুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ সদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥ ৬॥

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎসর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥ ৭॥

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পৈনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎ প্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥ ৮॥

শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকে নামসঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য বা কার্য্যকারিতা কীর্ত্তিত হইয়াছে। মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—'শ্রীকৃষ্ণের নামসঙ্কীর্ত্তন দ্বারা মনুষ্যের চিত্তরূপ দর্পণ মার্জ্জিত অর্থাৎ পরিষ্কৃত হয়। সংসার-রূপ মহাদাবাগ্নির দহন নির্ব্বাপিত অর্থাৎ শান্ত হয়। শ্রেয়ঃ অর্থাৎ মঙ্গলরূপ কুমুদ-প্রস্ফুটনকারী চন্দ্রিকা অর্থাৎ জ্যোৎস্না বা চন্দ্রকিরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ নামসঙ্কীর্ত্তনই বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ ; অর্থাৎ,—সর্ব্ববিধা বিদ্যা নামসঙ্কীর্ত্তন প্রভাবেই অধিগত হয়। এই নাম-সঙ্কীর্ত্তনে আনন্দ-সমুদ্র উথলিয়া উঠে ; প্রতি পদক্ষেপেই পূর্ণামৃতের আস্বাদন লাভ হয়। নাম-সঙ্কীর্ত্তন সর্ব্বার্থস্নিগ্ধকারী অবগাহন স্বরূপ ; অর্থাৎ,—সুশীতল সলিলে অবগাহন দ্বারা যেরূপ তাপতপ্ত দেহ স্নিগ্ধ হয়, পাপতাপদগ্ধ প্রাণ নামসঙ্কীর্ত্তনে সেই স্নিগ্ধতা লাভ করে।' এই

বলিয়া মহাপ্রভু ঐ.প্র।ম শ্লো:ক নামসঙ্কীর্ত্তনের জয়ঘোষণা করিয়াছেন। নাম, রূপ, গুণ ও লীলা ভেদে শাস্ত্রকারগণ নাম-সঙ্কীর্ত্তনের চতুর্ব্বিধ স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। নাম উচ্চারণ করিতে করিতেই রূপের কথা মনে হয়; রূপের কথা কহিতে কহিতেই গুণের কথা মনে আসে; গুণের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে লীলা-মাহাত্ম্য প্রতিভাত হয়। এই জন্যই নামসঙ্কীর্ত্তনের প্রয়োজন। কিন্তু নামসঙ্কীর্ত্তন বিষয়ে নানা সংশয়-প্রশ্ন উঠিতে পারে। মহাপ্রভু তাই দ্বিতীয় শ্লোকে সেই সমস্যার সমাধান করিয়া দিলেন। কৃষ্ণ, বিষ্ণু, হরি, অচ্যুত, মুরারি—শ্রীভগবান অসংখ্য নামে অভিহিত আছেন। তাঁহার উপাসনা-বিষয়ে সময়ও নানারূপ পরিকল্পিত হইয়া থাকে। সুতরাং ভক্ত তাঁহাকে কোন্ নামে কোন্ সময়ে কি বলিয়া আহ্বান করিবেন—সেই সমস্যা নিরসনের জন্যই দ্বিতীয় শ্লোকের অবতারণা। এই শ্লোকে মহাপ্রভু কহিলেন,—'হে ভগবন্! তোমার সর্ব্বশক্তিপ্রভাবে তুমি বহু নাম গ্রহণ করিয়া আছ, এবং সে নাম-স্মরণে কোনও কালাকালের বাধাও রাখ নাই। আমার প্রতি তোমার এমনই অপরিসীম করুণা! কিন্তু আমার কি বিষম দুর্দ্দৈব যে, তোমার সুধাময় নামে আমার অনুরাগ জন্মিল না।' এই শ্লোকে নামের সংশয় দূর করিলেন; সময়ের সংশয়ও দূরীভূত হইল। তিনি বুঝাইয়া দিলেন,—ভক্ত যে কোনও সময়ে যে কোনও নামে দয়াল ভগবানকে স্মরণ করিতে অধিকারী আছেন। তবে এই শ্লোকে 'দুর্দ্দৈব' শব্দের উল্লেখে মহাপ্রভু যেন বিশেষ-ভাবে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন,—'নামসঙ্কীর্ত্তনের পথে নানা দুর্দ্দৈব বা বিঘ্ন আছে; সেই বিঘ্নগুলি পরিহার পক্ষে প্রযত্নপর হও।' টীকাকারগণ বলিয়া থাকেন,—এই 'দুর্দ্দৈব' শব্দে নামাপরাধজনিত দুদ্দৈবকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। নামাপরাধজনিত দুর্দ্দৈব দশবিধ। * ত.ব সাধারণতঃ সাধুনিন্দা, শিবকৃষ্ণব্রহ্মাদিতে ভেদবুদ্ধি প্রভৃতি দুর্দ্দৈব বলিয়া অভিহিত হয়। সেই সকল দুদ্দৈব পরিহার পূর্ব্বক ভগবানের নামসঙ্কীর্ত্তন করিতে হইবে, ইহাই মহাপ্রভুর উপদেশ। তৃতীয় শ্লোকে কি ভাবে কিরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়া নামসঙ্কীর্ত্তনে ব্রতী হইতে হইবে, শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। এখানে বলা হইতেছে,—'নামসঙ্কীর্ত্তনকারীকে তৃণের ন্যায়

---

* নামাপরাধের বিষয় মহর্ষি নারদের প্রশ্নের উত্তরে সনৎকুমার এইরূপ বর্ণন করিয়া গিয়াছেন,—

"সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে যতঃ খ্যাতিং যাতন্তমুপহসতে গর্হয়তি চ।
তথা বিষ্ণোরিষ্টং য ইহ গুণনামাদি সকলং ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ॥
গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্।
নাম্নাং বলাদ্যস্য হি পাপবুদ্ধির্ন বিদ্যতে তস্য শঠস্য শুদ্ধিঃ॥
দিবৌকসাং গুরোঃ পিত্রোর্স্মরাণাঞ্চ গর্হনম্। নামাপরাধং যত্তৎস্যাদ্বৈষ্ণবানাং তথা নৃণাম্॥
গোঽশ্বত্থতুলসীধাত্রীনৃপান্নিন্দন্তি নারদ। নামাপরাধী স ভবেন্নাম গোবিন্দবৈষ্ণবান্॥
সর্ব্বতীর্থানি ক্ষেত্রাণি চাবমন্যতি নিন্দতি। গঙ্গাসরস্বতীযামীশ্চাপরাধী ভবেন্নরঃ॥
শ্রীমদ্ভাগবতং মহাভারতং ব্রাহ্মণান্ গুরুম্। মন্ত্র মহাপ্রসাদঞ্চ যোঽবমন্যতি নারকী॥
অবতারান্ হরেস্তত্তন্নামভক্তাংশ্চ নিন্দতি। অবমন্যতি দেবধে নারকী স জনোঽধমঃ॥
গোবিন্দস্যার্চ্চনং কুর্য্যাদবমন্যতি বৈষ্ণবান্। নিন্দতীহ চ নামানি স নাম্নোঽপাপরাধকৃৎ॥
বর্ণাশ্রমাদস্যাজ্ঞাংশ্চ জাতিবুদ্ধ্যাবমন্যতি। বৈষ্ণবান্ কুরুতে নিন্দামপরাধী নরাধমঃ॥
দ্বিজবন্ধুং স্ত্রিয়ং শূদ্রং জাতিভেদেন বৈষ্ণবম্। যেঽবমন্যন্তি নিন্দন্তি তে বৈ নিরয়গামিনঃ॥

লঘু হইতে হইবে ; অর্থাৎ, পদদলিত তৃণ অপেক্ষাও নামসঙ্কীর্ত্তনকারী আপনাকে ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করিবেন। তাঁহাকে বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণুতা অবলম্বন শিক্ষা করিতে হইবে ; অর্থাৎ, কুঠার দ্বারা যে জন বৃক্ষের অঙ্গচ্ছেদ করে, বৃক্ষ যেমন সে জনকেও ছায়া-দান বা ফল-দানে কার্পণ্য প্রকাশ করে না, নামসঙ্কীর্ত্তনকারীকে সেইরূপ সহিষ্ণু হইতে হইবে। তৃতীয়তঃ, অমানী জনকে মান দান করিতে হইবে ; অর্থাৎ,—অভিমান-বর্জ্জিত হইয়া, অপরের প্রতি সম্মান দেখাইতে হইবে। যাঁহারা এমন হইয়া নাম-সঙ্কীর্ত্তনে সমর্থ হন, তাঁহাদেরই সঙ্কীর্ত্তন সার্থক।' স্তরে স্তরে কেমন সুন্দরভাবে সার-তত্ত্ব উদ্ঘাটন করা হইয়াছে! চতুর্থ শ্লোকে মহাপ্রভু প্রার্থনার বিষয় নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। মানুষ, সাধারণতঃ 'আমায় ধন দাও, রূপ দাও, ঐশ্বর্য্য দাও, সম্মান দাও',—ইত্যাদি রূপ প্রার্থনাই করিয়া থাকেন। চতুর্থ শ্লোকে মহাপ্রভু তাই বলিতেছেন,—'হে জগদীশ! আমি যেন ধন, জন বা সুন্দরী বনিতার কামনায় বিভোর না হই ; আমি যেন জন্ম-জন্মান্তরে তোমাকেই লাভ করি,—তোমার প্রতি অহৈতুকী ভক্তি দেখাইতে পারি।' এইখানে মহাপ্রভু আর এক মহান্ কথা কহিয়া গেলেন ; প্রার্থনা জানাইলেন,—অহৈতুকী ভক্তি যেন দেখাইতে পারি। অহৈতুকী ভক্তিরই নামান্তর—ঐকান্তিকী ভক্তি—নিষ্কাম ভক্তি। জগতের হিতসাধন-দ্বারাই ভগবানের প্রতি অহৈতুকী ভক্তি প্রকাশ পায় ; ভক্তিতত্ত্ব বিশেষরূপে স্মরণ করাইবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যাহা বলিয়াছিলেন, এতৎপ্রসঙ্গে তাহাই মনে আসে। ভগবান বলিয়াছিলেন,—

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবম্বিধোঽর্জ্জুন!। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপঃ!॥
মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ। নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডবঃ!॥
যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে। সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবং॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ। তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥"

'হে পরন্তপ অর্জ্জুন! জীব কেবল ঐকান্তিকী ভক্তি দ্বারাই বিশ্বরূপী আমাকে যথার্থরূপে জানিতে সক্ষম হয়, প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হয় এবং আমার এই অনন্ত রূপে প্রবেশ পূর্ব্বক বিলীন হইতে সক্ষম হয়। হে পাণ্ডব! যে সাধক কেবল আমার প্রীতির উদ্দেশ্যেই কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, যিনি আমাকেই কেবল একমাত্র প্রাপ্তব্য জ্ঞান করেন, যিনি সর্ব্ববিধ কর্ম্মদ্বারা কেবল আমাকেই ভজনা করেন, যাঁহার বিষয়ে আসক্তি নাই এবং যিনি উপকারী অপকারী ভেদ না করিয়া সর্ব্বভূতেই দ্বেষশূন্য, সেই শ্রেষ্ঠ সাধকই আমায় প্রাপ্ত হন। যাঁহারা শত্রুমিত্র সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া এবং প্রবল ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া, শব্দ যাঁহাকে নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ, যিনি রূপাদি-বিহীন, সর্ব্বব্যাপী, বুদ্ধির অগোচর, যিনি কূটস্থ অর্থাৎ

অর্চ্চে বিষ্ণোঃ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্বিষ্ণোর্ব্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
বিষ্ণোর্নির্ম্মাল্যনাম্নোঃ কলুষদহনয়োরন্যসামান্যবুদ্ধির্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥
পূজ্যাত্তে দেবসামান্যং কৃত্বা নরায়ণং নরঃ। নামাপরাধী স ভবেদ্বৈষ্ণবান্ যো ন সেবতে॥
(নারদ উবাচ) নামাপরাধা হ্যপরাঃ কতি সন্তি তপোধন। তৎ কথ্যতাং মে সকলং যদি যোগ্যো ভবামি তে॥
(সনৎকুমার উবাচ) বৈষ্ণবে শঠতাং বিষ্ণৌ গুরৌ পিত্রোশ্চ ভূসুরে। নিন্দাং চ কুরুতে মোহাদপরাধী স নারকী॥

ইতি পাদ্মোত্তরখণ্ডে ১০২।১০৩ অধ্যায়ঃ।

মায়া-প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান চৈতন্য, চলনাদি ক্রিয়ারহিত এবং নিত্য, সেই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মকে ধ্যান করেন, এবং অখিল বিশ্বে তিনি অবস্থিত জানিয়া সর্ব্বজীবের কল্যাণসাধনে তৎপর হন, সেই সাধকগণ পরমাত্মরূপী আমাকেই প্রাপ্ত হন।' এই ভগবদুক্তির বিষয় অনুধাবন করিলে, 'আমি যেন তোমার প্রতি অহৈতুকী ভক্তি দেখাইতে পারি',—শ্রীচৈতন্যদেবের এই প্রার্থনায় কি উচ্চ অবস্থায় উপনীত হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। শিক্ষাষ্টকের পঞ্চম শ্লোকে জীবের সাধারণ অবস্থার বিষয় এবং ষষ্ঠ শ্লোকে নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রভাবে সে অবস্থার পরিবর্ত্তনের আভাষ দেওয়া হইয়াছে। প্রথমে বলা হইয়াছে,—'হে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ! আমি বিষম সংসার সমুদ্রে নিমজ্জমান। আমার উদ্ধারের আর অন্য উপায় নাই। দয়া করিয়া আমাকে আপনার চরণ-সরোজের ধূলিকণার মধ্যে গণ্য করুন; আমি উদ্ধার পাই।' এই প্রার্থনা জানাইয়া মহাপ্রভু পরিশেষে কহিতেছেন,— 'হে ভগবন্! তোমার নাম গ্রহণে কবে আমার নয়নে প্রেমাশ্রু নির্গত হইবে, তোমার নাম উচ্চারণে কবে আমার গদগদ কণ্ঠ বাক্য-রুদ্ধ হইবে, তোমার মহিমা-কীর্ত্তনে কবে আমার দেহ পুলকে কণ্টকিত হইতে থাকিবে।' ইহাকেই বলে—নামগ্রহণ, ইহাকেই বলে—নামসঙ্কীর্ত্তন! নামসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে যখন দরবিগলিত ধারায় প্রেমাশ্রু-সম্পাতে বক্ষ প্লাবিত হইবে, কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া আসিবে, দেহ পুলকপূর্ণ হইবে, তখনই সার্থক—নামসঙ্কীর্ত্তন। সপ্তম শ্লোকে মহাভাবে বিভোর অবস্থার বিষয় পরিবর্ণিত আছে। ভক্ত যেন আর বিরহ সহ্য করিতে পারিতেছেন না, গোবিন্দের বিরহে কাতর হইয়া কাঁদিতেছেন,—'হে নাথ! তোমার বিরহে নিমেষ যুগ বলিয়া প্রতীত হইতেছে,— চক্ষু বর্ষাকালের ন্যায় ধারা-প্রবাহে ভাসিয়া যাইতেছে,—জগৎ সংসার শূন্যময় দেখিতেছি!' এই শ্লোকে মহাপ্রভু বুঝাইলেন, কেমনভাবে ভাববিভোর হইতে হইবে, কেমনভাবে পূর্ব্বরাগে দেহ-প্রাণ পরিমগ্ন করিতে হইবে। অষ্টম শ্লোকে পরিণতি বা শেষ অবস্থার বিষয় বিবৃত হইয়াছে। তখন প্রার্থনীয় হইবে,—'চরণ ধরিয়া রহিলাম; কৃপা করিয়া আলিঙ্গন করিতে হয়, আলিঙ্গন কর; রাগান্বিত হইয়া পদদলিত করিতে হয়, পদদলন কর; দেখা দিতে হয়, দেখা দেও; অথবা, অদর্শনে মর্ম্মাহত করিতে হয়, মর্ম্মাহত কর।' অর্থাৎ,—যাহাতে তাঁহার সুখ, তাহাই আমার সুখ-সৌভাগ্য; তিনি আমার প্রাণনাথ, তিনি আমার অভিন্ন-হৃদয়,—এখানে এই অভেদ-ভাবের আভাষ দেওয়া হইল। নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবে মানুষ ক্রমশঃ এই অবস্থায় উপনীত হইতে পারে। ইহা বুঝাইবার জন্য ঐ শ্লোকাষ্টক—শিক্ষাষ্টক, মহাপ্রভুর শ্রীমুখ হইতে বিনির্গত হইয়াছিল। বুঝিতে গেলে উহার মধ্যে একাধারে কাব্য, স্মৃতি, দর্শন,— সকলই নিহিত নাই কি? শিক্ষাষ্টক ভিন্ন, শ্রীচৈতন্যের রচিত 'অদ্বৈতাষ্টক' নামে আরও কয়টী শ্লোক পাওয়া যায়। অদ্বৈতাচার্য্য, বিশ্বম্ভর মহাপ্রভুকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া যে দিন তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, সেই দিন মহাপ্রভু যে উত্তর দেন, তাহাই 'অদ্বৈতাষ্টক' নামে অভিহিত। অদ্বৈষ্টাকেও ভগবত্তৎ প্রেম উন্মেষ হয়। জগন্নাথের মন্দির-চূড়া দর্শন করিয়া মহাপ্রভু যে শ্লোক আবৃত্তি করেন, সমুদ্র সন্দর্শনে বিভোর হইয়া যে গাথা উচ্চারণ করেন,— তাহার সকলই সর্ব্বত্র-ব্রহ্মদর্শনের পরিচায়ক।

নামসঙ্কীর্ত্তনের মহিমা প্রচারে মহাপ্রভু যে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র কর্ণে কর্ণে ধ্বনিত করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের অবসন্ন মৃতকল্প প্রাণে কি নবজীবনেরই সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল! ঐ সময়ে এক দিকে সংস্কৃত-সাহিত্য সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া উঠে; অন্য দিকে বাঙ্গালা-সাহিত্যে বৈষ্ণবপদাবলী রূপ অমূল্য রত্নরাজি বিকাশপ্রাপ্ত হয়। বঙ্গভাষা তখন যে অনুপম রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়াছিলেন, যথাস্থানে সে প্রসঙ্গের অবতারণা করা যাইবে। এক্ষণে যে সূত্রে বক্ষ্যমাণ প্রস্তাবের অবতারণা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে দুই চারি কথা কহিয়াই প্রসঙ্গের উপসংহার করা যাইতেছে। বৈষ্ণব-সাহিত্যে ষট্‌গোস্বামীপাদ বা ষট্‌বৈষ্ণবাচার্য্য প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। বৈষ্ণবকবি ভক্তপ্রবর নরোত্তম দাস সেই ষট্‌গোস্বামী সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

সংস্কৃত-সাহিত্যে শেষ স্তরে।

"শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এ ছয় গোসাঞীর করম চরণ বন্দন। যাঁহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট-পূরণ॥"

নরোত্তমদাস—শ্রীচৈতন্যের প্রেমাবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি যে ষট্‌গোস্বামীর পরিচয় দিয়া গেলেন, তাঁহারা কি সম্মানের আসনে সমাসীন ছিলেন, উহাতেই উপলব্ধি হয়। এই ছয় গোস্বামীপাদ সংস্কৃত-সাহিত্যে যে স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন, তদ্দ্বারা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের বিমল বিভা অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। রূপ ও সনাতন—দুই ভাই—ষট্‌গোস্বামীপাদের দুই উজ্জ্বল রত্ন। সনাতন জ্যেষ্ঠ, রূপ কনিষ্ঠ। দুই ভাই-ই গৌড়ের বাদসাহ হোসেনসাহের দরবারে উচ্চ-রাজ-কার্য্যে-ব্রতী ছিলেন। রূপ উজীর, আর সনাতন সচিব। রূপের উপাধি ছিল "দবির খাস," সনাতনের উপাধি ছিল "শাকর মল্লিক"। জ্যেষ্ঠের আবির্ভাব ১৪১০ শকে, কনিষ্ঠের আবির্ভাব ১৪১১ শকে। * সনাতন ৭৬ বৎসর বয়সে (১৪৮৬ শকে) শ্রীবৃন্দাবনধামে দেহরক্ষা করেন; রূপ ৭০ বৎসর বয়সে (১৪৮০ শকে) ইহসংসার হইতে অন্তর্দ্ধান হন। বাদসাহের দরবারে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও, কর্ম্মকোলাহলে বিধর্ম্মীর সম্বন্ধ-সংস্রবে বিবৃত রহিয়াও, দুই ভাই একদিনের জন্যও ইষ্ট-চিন্তায় বিরত হন নাই। নবদ্বীপে যখন চৈতন্যচন্দ্রের উদয় হইল, রূপ-সনাতন দুই ভাই তখন আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না;—প্রেমের বন্যায় তাঁহাদের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিল। রূপ প্রথমে বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেন। বৃন্দাবন গমন উপলক্ষে গৃহনিক্রান্ত হইয়া তিনি রামকেলিতে গিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। সনাতন কিছু দিন সংসারাশ্রমে রহিলেন; কিন্তু কনিষ্ঠের স্মৃতি তাঁহাকে ক্রমেই পাগল করিয়া তুলিল। অপিচ, কনিষ্ঠের রচিত এক উপদেশ-বাণী-রূপ তীক্ষ্ণাস্ত্রে তাঁহার মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিল। জ্যেষ্ঠ সনাতনের প্রতি শ্রীমৎ রূপ গোস্বামীর সেই উপদেশ-বাণী,—

"যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী। রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা॥
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ মনস্থিরং। ন সদিদং জগদিত্যবধারয়॥"

কথিত আছে, সনাতন প্রথমে বড়ই অত্যাচারী ছিলেন। তিনি এক ব্রাহ্মণের ভদ্রাসন আপনার বাস্তুভিটার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন; ব্রাহ্মণ অনুনয়-বিনয় করিলে, তাহাতে কর্ণপাত করেন

* গণনায় সনাতনের ও রূপের আবির্ভাব ও তিরোভাবের কাল,—সনাতনের ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দ ও ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দ এবং রূপের ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দ ও ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দ নির্দ্দিষ্ট হয়।

না। ব্রাহ্মণ শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া রূপগোস্বামীর নিকট তজ্জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেন। রূপ তাহাতে একখানি পত্রে "য-রী, র-মা, ই-রং, ন-অ"—এই আটটী অক্ষর লিখিয়া জ্যেষ্ঠের নিকট প্রেরণ করেন। * সনাতনের তখন চৈতন্য হয়। ঐ অক্ষর কয়টী যে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকদ্বয়ের আত্মক্ষর ও শেষাক্ষর, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন। তখন তাঁহার মনে দারুণ বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। সংসারের কিছুই কিছু নয়—সকলই প্রহেলিকা—সকলই 'অসৎ',—এই বুঝিয়া কাশীধামে গমন করিয়া সনাতন শ্রীচৈতন্যদেবের শরণাপন্ন হন। অধুনা যে বৃন্দাবন তীর্থ দেখিতে পাই, শ্রীচৈতন্যদেবের অভিপ্রায়ক্রমে রূপ-সনাতন কর্ত্তৃক সেই বৃন্দাবন-তীর্থের উদ্ধার-সাধন হইয়াছিল। বৃন্দাবন-তীর্থের প্রকাশ জন্য রূপ-সনাতনের স্মৃতি উজ্জ্বল হইয়া আছে। তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থরত্নগুলিও তাঁহাদিগকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। রূপ গোস্বামীর প্রণীত বা সঙ্কলিত কয়েকখানি গ্রন্থের নাম,—ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু; (এই গ্রন্থে ৩৩২৫টী শ্লোকে ভক্তি, সাধনা প্রভৃতির তত্ত্ব বিবৃত আছে; ১৪৬৩ শকে এই গ্রন্থ প্রণীত হয়), হংসদূত (শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে গোপীগণের অবস্থাবর্ণন বিষয়ক খণ্ড-কাব্য), উদ্ধবদূত বা উদ্ধবসন্দেশ (রাধিকা-বিরহে শ্রীকৃষ্ণের মনোবৃত্তি বর্ণন বিষয়ক খণ্ড-কাব্য), শ্রীরূপচিন্তামণি (ভগবানের রূপবর্ণনা মূলক কাব্য-গ্রন্থ; শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দে লিখিত), ললিতমাধব (নাটক, দশ অঙ্কে বিভক্ত, গদ্যে ও তিন সহস্র শ্লোকে সম্পূর্ণ) বিদগ্ধমাধব (নাটক, দশ অঙ্কে সম্পূর্ণ, রাধাকৃষ্ণের লীলা ও মাহাত্ম্য-বর্ণনোদ্দেশ্যে লিখিত), নন্দনাষ্টক, চাটুপুষ্পাঞ্জলি, তুলস্যষ্টক, বৃন্দাদেবাষ্টক, শ্রীমুকুন্দমুক্তাবলীস্তব, স্তবমালা, পদ্যাবলী প্রভৃতি খণ্ড-কাব্য সমূহ ধর্ম্মভাব বিকাশের উৎসস্বরূপ। হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধুরবিন্দু গ্রন্থে তিনি ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ভাবসমূহ সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন। নাট্যশাস্ত্র ও সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি হইতে সংগ্রহ করিয়া নাটকচন্দ্রিকায় তিনি নাটকের লক্ষণাদি, অভিনব ভাবে সজ্জীকৃত করেন। কৃষ্ণজন্মতিথিবিধি, লঘুগণদেশদীপিকা, প্রেমেন্দ্র-সাগর, প্রযুক্তাক্ষ চন্দ্রিকা, দানকেলিকৌমুদী, ছন্দোঽষ্টাদশ প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ। রূপের রচনা প্রসাদগুণবিশিষ্ট। নিম্নে তাঁহার মুকুন্দমুক্তাবলী-স্তব হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

নবজলধরবর্ণং চম্পকোদ্ভাসিকর্ণং বিকসিত নলিনাস্যং বিস্ফুরন্মন্দহাস্যম্।
কনকরুচিদুকূলং চারুবর্হাবচূলং কমপি নিখিলসারং নৌমি গোপীকুমারম্॥"

সনাতন গোস্বামী রচিত কয়েকখানি গ্রন্থের নাম,—গীতাবলী, রসময়কলিকা, বৈষ্ণবতোষিণী, ভাগবতামৃত, হরিভক্তি-বিলাস ও শ্রীমদ্ভাগবতের দিক্‌প্রদর্শনী টীকা। কথিত হয়, রূপ এবং সনাতনের পূর্ব্ব নাম—যথাক্রমে সন্তোষ ও অমর ছিল। ষটুগোস্বামীপাদের তৃতীয় গোস্বামী—জীব গোস্বামী। ইনি রূপ-সনাতনের বংশেই জন্মগ্রহণ করেন। রূপ-সনাতনের বল্লভ নামে এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। শ্রীজীব গোস্বামী—সেই বল্লভের পুত্র। ১৪৫৫ শকে ইঁহার আবির্ভাব এবং ১৫৪০ শকে তিরোভাব ঘটে। ইনি ৮৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। তন্মধ্যে ২০ বৎসর কাল গৃহবাসে ছিলেন; অবশিষ্ট জীবন শ্রীবৃন্দাবনধামে অতিবাহিত

* সাধকপ্রবর রাজা রামকৃষ্ণের সম্বন্ধে ঐ শ্লোকটী ঐ ভাবেই প্রেরণের কিংবদন্তী আছে। পূর্ব্ব-জন্মের সহযোগী সন্ন্যাসী রামকৃষ্ণের সংসার-মোহ ভাঙ্গিবার জন্য ইঙ্গিতে ঐ অক্ষরাষ্টক লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

করেন। শিশুবয়স হইতেই ইঁহার ভগবদ্ভক্তি প্রকাশ পায়। ইঁহার জ্যেষ্ঠতাতদ্বয় রূপ ও সনাতন যখন গৌড়ে হুসেন সাহের মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত, শিশু শ্রীজীব অশেষ আদরে প্রতিপালিত হইতেছিলেন। রূপ ও সনাতন যখন সংসার ত্যাগ করেন, শ্রীজীবের তখন একান্ত শৈশবাবস্থা। রূপ-সনাতনও সংসারত্যাগী হইলেন, শিশুও বেশভূষা পরিত্যাগ করিল। বৈষ্ণব কবির কবিতায় শ্রীজীব গোস্বামীর তাৎকালিক অবস্থার এইরূপ পরিচয় পরিদৃষ্ট হয়,—

"নানারত্ন ভূষা পরিধেয় সূক্ষ্ম বাস। অপূর্ব্ব শয়ন শয্যা ভোজন বিলাস॥
এ সব ছাড়িল কিছু নাহি ভয় চিতে। রাজ্যাদি বিষয় বার্ত্তা না পারে শুনিতে॥"

ইহার পর বালক শ্রীজীব কৃষ্ণকথায় উন্মত্ত হইয়া রহিলেন। তাঁহার ক্রীড়ায় শ্রীকৃষ্ণ, কৌতুকে শ্রীকৃষ্ণ;—শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন তিনি আর কিছুই জানিতেন না। কবির বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণ শ্রীজীব গোস্বামীর সেই ভাব এইরূপ পরিব্যক্ত দেখিতে পাই,—

"অল্প বয়সেতে অতি গভীর অন্তর। শ্রীমদ্ভাগবত জানে প্রাণের সোসর॥
সদা কৃষ্ণকথা-সুখ-সমুদ্রে সাঁতারে। অন্য কথা কেহ ভয়ে কহিতে না পারে॥
শ্রীজীব বালককালে বালকের সনে। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ ভিন্ন খেলা নাহি জানে॥
কৃষ্ণ বলরাম মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া। করিতেন পূজা পুষ্প চন্দনাদি দিয়া॥
বিবিধ ভূষণ বস্ত্রে শোভা অতিশয়। অনিমিষ নেত্রে দেখি উল্লাস হৃদয়॥
কনক পুতলি প্রায় পড়ি ক্ষিতিতলে। করিতে প্রণাম সিক্ত হইতা নেত্রজলে॥
বিবিধ মিষ্টান্ন অতি যত্নে ভোগ দিয়া। ভুঞ্জিতেন প্রসাদ বালকগণে লইয়া॥
কৃষ্ণ বলরাম বিনা কিছুই না ভায়। একাকীও দোঁহে লইয়া নির্জ্জনে খেলায়॥
শয়ন সময়ে দোঁহে রাখয়ে বক্ষেতে। মাতা পিতা কৌতুকেও না পারে লইতে॥"

বাল্যকালে যিনি এমনভাবে ভগবচ্চিন্তায় বিভোর হন, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সে ভাব কিরূপ পরিস্ফুট হয়, সহজেই বুঝিতে পারা যায়। শৈশবে মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল; শৈশবেই সংসার-বন্ধনের দৃঢ়-শৃঙ্খল জ্যেষ্ঠতাতদ্বয় সংসারত্যাগী হইয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে পিতা বল্লভও গঙ্গালাভ করিলেন। শ্রীজীবের পথ প্রশস্ত হইল। এই সময় স্বপ্নে তিনি গৌর-নিতাইকে দেখিতে পাইলেন;—দেখিলেন, যেন কৃষ্ণ-বলরাম মূর্ত্তিমান্।

"হইলা প্রত্যক্ষ পভু কৃষ্ণ বলরাম। শ্যাম-শুক্ল রূপ দোঁহে আনন্দের ধাম॥
দোঁহার অদ্ভুত বেশ কন্দর্পমোহন। অঙ্গের ভঙ্গিতে মত্ত করে ত্রিভুবন॥
এবে দোঁহে দেখি পুনঃ দেখে গৌরবর্ণ। ঝলমল করয়ে জিনিয়া শুদ্ধ স্বর্ণ॥
দুঁহু অঙ্গ-সৌরভে ব্যাপিল ত্রিভুবন। তাহে ধৈর্য্য ধরে এছে নাহি কোন জন॥
শ্রীজীবের মনে মহা হৈল চমৎকার। অনিমিষ নেত্রে শোভা দেখয়ে দোঁহার॥
ভাসয়ে দীঘল দুটী নয়নের জলে। লোটাইয়া পড়ে দুই প্রভু পদতলে॥
করুণা সমুদ্র গৌর নিত্যানন্দ রায়। পাদপদ্ম দিলেন শ্রীজীবের মাথায়।"

এই স্বপ্ন-দর্শনের পর শ্রীজীব আর গৃহে থাকিতে পারিলেন না;—কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মাদ হইয়া 'হা গৌর—হা কৃষ্ণ' কহিতে কহিতে নবদ্বীপাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। শ্রীধাম নবদ্বীপে গৌরচন্দ্রের সাক্ষাৎলাভ ঘটিল। হৃদয়ের সকল অন্ধকার চৈতন্যচন্দ্রের বিমল বিভায় বিদূরিত হইল।

পিতৃব্যদ্বয় যে পথে গমন করিয়াছিলেন, নবীন বয়সে শ্রীজীব সেই পথের পথিক হইলেন। মস্তক মুণ্ডিত হইল; ছিন্ন কন্থা স্কন্ধে লইলেন; কমণ্ডলু মাত্র সম্বল হইল,—শ্রীজীব শ্রীধাম শ্রীবৃন্দাবনে ব্রজধামে গমন করিলেন। সেখানে অবস্থানকালে গৌরপদাঙ্কানুসরণে ভক্তিগ্রন্থ সমূহ প্রণয়নে শ্রীজীব বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মহিমা দিকে দিকে ঘোষণা করিতে লাগিলেন। শ্রীজীব বহু ভক্তিশাস্ত্রের টীকাটিপ্পনী প্রকাশ করেন, বহু সদ্‌গ্রন্থ লিখিয়া যান। তাঁহার গ্রন্থসমূহের মধ্যে কয়েকখানি গ্রন্থের নাম উল্লিখিত হইল,—কৃপাম্বুধিস্তব, কৃষ্ণপদচিহ্ন, কৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, গোপালবিরুদাবলী, শ্রীগোপালচম্পূ, ধাতুসংগ্রহ, ভাবার্থসূচকচম্পূ, হরিনামামৃত-ব্যাকরণ, সূত্রমালা, রসামৃতশেষ, শ্রীমাধব মহোৎসব, সঙ্কল্পকল্পবৃক্ষ, ষট্‌সন্দর্ভ (প্রীতিসন্দর্ভ, তত্ত্বসন্দর্ভ, ভগবৎসন্দর্ভ, পরমাত্মসন্দর্ভ, কৃষ্ণসন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ নামক শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা), যোগসারস্তবটীকা, রসামৃতটীকা, ব্রহ্মসংহিতা টীকা, উজ্জ্বলনীলমণি টীকা, গায়ত্রীভাষ্য প্রভৃতি। ষট্‌সন্দর্ভ গ্রন্থে শ্রীজীব যে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। পঞ্চদশ সহস্রাধিক শ্লোকে ষট্‌সন্দর্ভ গ্রথিত। ভগবত্তত্ত্বনির্ণয় পক্ষে শ্লোকগুলি অনুপম অতুলনীয়। হরিনামামৃতব্যাকরণে ব্যাকরণের সূত্রের সঙ্গে সঙ্গে হরিকথায় ভগবদ্ভক্তি উদ্রিক্ত করা হইয়াছে। শ্রীজীবগোস্বামী গোপালচম্পূ গ্রন্থে গোপালের লীলামাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। একটি শ্লোক,—

"মদয়তি মনো মদীয়ং তনুজঘনভাবতী রসবিলাস।
কিমু সুতনু নীরবিহারী নহি নহি চম্পূবিহারোঽয়ং॥"

শ্রীজীবরচিত 'লঘুতোষণী' নামে আর একখানি গ্রন্থ আছে। ঐ গ্রন্থে তাঁহার ও তাঁহার পিতৃপুরুষ-গণের, রূপ-সনাতন, প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। উঁহারা যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। * উঁহাদের পূর্ব্বপরিচয় সম্বন্ধে 'লঘুতোষিণীর' কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল;—

উদ্যচ্চারু পদক্রমাশ্রিতবতী যস্যামৃতস্রাবিণী
জিহ্বা কল্পলতাত্রয়ী মধুকরী ভূয়ো নরী নৃত্যতে।
রেজে রাজসভা সভাজিতপদঃ কর্ণাট-ভূমিপতি
শ্রীসর্ব্বজ্ঞ জগদ্‌গুরুর্ভুবি ভরদ্বাজান্বয় গ্রামণীঃ। ১।
পুত্রস্তস্য নৃপস্য কম্পতুলামারোহতো রোহিণী
কান্তস্পর্দ্ধি যশোভরঃ সুরপতেস্তুল্য প্রভাবোঽভবৎ।
সর্ব্বক্ষ্মাপতি পূজিতোঽখিল যজুর্ব্বেদিক বিশ্রামভূ-
র্লক্ষ্মীবান নিরুদ্ধদেব ইতি যঃ খ্যাতিং ক্ষিতৌ যগ্মিবান॥ ২॥"

ষট্‌গোস্বামীপাদের চতুর্থ—রঘুনাথ ভট্ট। ইঁহার পিতার নাম তপনমিশ্র, বারাণসীধামে ইঁহাদের বসতি ছিল। ১৪২৭ শকে ইঁহার জন্ম; ১৫০১ শকে ইঁহার অন্তর্দ্ধান। ৭৪ বৎসর বয়সের

* রূপ-সনাতনের 'দবিরখাস' ও 'শকর মল্লিক' নাম দেখিয়া কেহ কেহ উঁহাদিগকে 'যবন' বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। উঁহাদের আত্ম-পরিচয়ে 'আমরা যবন-সংসর্গে অতি হীন হইয়াছি' এইরূপ ভাবের কথা ছিল, তাহাতেই ঐরূপ সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে। কিন্তু উঁহারা যে উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, শ্রীজীবকৃত 'লঘু-তোষিণী' গ্রন্থে এবং 'ভক্তিরত্নাকর' প্রভৃতিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভক্তিরত্নাকরে আছে,—"পিতা-পিতামহাদির যৈছে শুদ্ধাচার। তাহা বিচারিতে মনে মানয়ে ধিকার॥ নীচজাতি সঙ্গে সদা নীচ ব্যবহার। এই হেতু নীচজাত্যাদিক উক্তি তার। বিপ্ররাজ হৈয়া মহাখেদযুক্তান্তরে। আপনাকে বিপ্রজ্ঞান কভু নাহি করে॥"

মধ্যে ২৮ বর্ষ মাত্র ইনি গৃহাশ্রমে ছিলেন। চাতুর্ম্মাস্য ব্রত গ্রহণ করিয়া মহাপ্রভু কয়েক মাস ইঁহাদের গৃহে অবস্থান করেন। সেই সময়ে ইঁহার মনে কৃষ্ণ-প্রেমের সঞ্চার হয়। পিতৃ-বিয়োগের পর সংসারত্যাগী হইয়া, নীলাচলে গিয়া, ইনি মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন। মহাপ্রভুর আদেশে ইনি শেষ জীবন বৃন্দাবন-ধামেই অতিবাহিত করেন। ইঁহার রচিত বা সঙ্কলিত গ্রন্থ লোপ পাইয়াছে। ষট্-গোস্বামীর পঞ্চম গোস্বামীপাদ—গোপাল-ভট্ট। ১৪২৫ শকে দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত ভট্টমারি গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়; ১৫০০ শকাব্দে ইনি অপ্রকট হন। ইঁহার পিতার নাম—বেঙ্কট ভট্ট। শ্রীচৈতন্য যখন দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে গমন করেন, সেই সময়ে ইনি গৃহত্যাগী হন। ত্রিংশ বর্ষ বয়সে গৃহত্যাগী হইয়া জীবনের শেষ কয়েক বৎসর ইনি বৃন্দাবন-ধামে অতিবাহিত করেন। ইঁহার সঙ্কলিত একখানি গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার নাম—ভক্তিবিলাস। ঐ গ্রন্থ 'হরিভক্তিবিলাস' নামেও প্রসিদ্ধ। গ্রন্থের শ্লোক-সংখ্যা—আট সহস্র। তাহার মধ্যে কতকগুলি শ্লোক ইঁহার নিজের রচিত, কতকগুলি সংগৃহীত। শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাস—বৈষ্ণবদিগের কর্ত্তব্য-নির্দ্দেশক গ্রন্থ। গ্রন্থের প্রারম্ভ ও পরিসমাপ্তি এইরূপ,—

(প্রারম্ভ)—"চৈতন্যদেবং ভগবন্তমাশ্রয়ে শ্রীবৈষ্ণবানাং প্রমুদেঽহমালিখম্।
আবশ্যকং কর্ম্ম বিচার্য্য সাধুভিঃ সঙ্গং সমাহৃত্য সমস্ত শাস্ত্রতঃ॥"
(সমাপ্তি)—"শ্রীনন্দসুন্দর-মুকুন্দপদারবিন্দ প্রেমামৃতাব্ধিরসতুন্দিল মানসায়।
নানার্থবৃন্দমনুসন্দধতে নচ স্বং তেষাং পদাব্জমকরন্দমধুব্রতঃ স্যাম্॥"

শ্রীবৃন্দাবনে সনাতনের প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দদেবের এবং শ্রীজীবের প্রতিষ্ঠিত রাধাদামোদরের মন্দির দৃষ্ট হয়। গোপালভট্টও তাহারই সন্নিকটে রাধারমণের মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ সেই বিগ্রহের সেবায় ব্রতী হন। ষট্‌গোস্বামীপাদের ষষ্ঠ গোস্বামী—রঘুনাথ। ইঁহার সম্বন্ধে নানা মত আছে। কেহ বলিয়াছেন,—ইনি কায়স্থ-বংশোদ্ভব; কেহ বলিয়াছেন,—ইনি গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ। কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিলে, ইঁহাকে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কিছুই বলা যায় না।* ১৪২৮ শকে ইনি জন্মগ্রহণ করেন; ১৫০৪ শকে ইঁহার তিরোধান হয়। ইঁহার পিতার নাম হিরণ্যদাস, সপ্তগ্রাম ইঁহাদের বাসস্থান এবং ইঁহারা জমীদার ছিলেন বলিয়া উক্ত আছে। উনিশ বৎসর বয়সে গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া, ষোল বৎসর-কাল ইনি নীলাচলে বাস করেন এবং পরিশেষে মহাপ্রভুর আদেশে রূপ-সনাতন প্রভৃতির পদাঙ্কানুসরণে শ্রীবৃন্দাবনধামে জীবনের শেষাংশ

---

* বৈষ্ণব কবিগণ দীনতা প্রকাশ জন্য অনেক সময় 'দাস' বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সেই জন্য, রঘুনাথ দাস গোস্বামী নাম দেখিয়া, ইঁহাকেও কেহ কেহ কায়স্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। 'হরিভক্তিবিলাসের' একটি টীকায় 'শ্রীরঘুনাথ দাস নাম গৌড়কায়স্থকুলাব্জভাস্করঃ' এইরূপ একটি উক্তি দৃষ্ট হয় বলিয়া প্রধানতঃ ঐ মত প্রচারিত। কিন্তু ঐ মত যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, তাহা নানারূপে প্রতিপন্ন হয়। 'হরিভক্তিবিলাস'—গোপাল ভট্ট কর্ত্তৃক সংগৃহীত হয়। গোপাল ভট্ট ও রঘুনাথ গোস্বামী সমসাময়িক। সমসাময়িক ব্যক্তি কর্ত্তৃক সংগৃহীত গ্রন্থের টীকা-রচনা প্রায়ই পরিদৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ, গোপাল ভট্ট আপনার সঙ্কলিত গ্রন্থের নিজেই একটা টীকা রচনা করিয়া-ছিলেন। সে অবস্থায় সেই সংগৃহীত গ্রন্থের পুনরায় টীকা রচনার কখনই আবশ্যক দেখা যায় না। পরবর্ত্তী টীকাকার, রঘুনাথ দাস, গৌড়ীয় কায়স্থকুলোদ্ভব কেহ হইতে পারেন। কিন্তু তিনি যে রঘুনাথ গোস্বামী নহেন, বলাই বাহুল্য।

অতিবাহিত করিয়াছিলেন। শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত ইনি প্রথম মিলিত হইয়াছিলেন। ইনি যেরূপ কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনায় প্রবৃত্ত হন, সে সাধনার তুলনা নাই। ইনি বিপুল পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন; এমন কি, ইঁহাদের নয় লক্ষ টাকার সম্পত্তি ছিল। কিন্তু ইনি সে সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া উঠেন। রঘুনাথ গোস্বামীর গৃহত্যাগ ও সাধনা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,—

"শ্রীচৈতন্য কৃপা হৈতে, রঘুনাথ দাস চিতে, পরম বৈরাগ্য উপজিল।
দয়া গৃহ সম্পদ, নিজ-রাজ্য অধিপদ, মল প্রায় সকল তেজিল॥
ছেঁড়া কম্বল পরিধান, বক্তকল গব্য খান, অন্ন আদি না করে আহার।
তিন সন্ধ্যা স্নান করি, স্মরণ কীর্ত্তন করি, রাধাপদ ভজন তাঁহার॥
ছাপ্পান্ন দণ্ড রাত্রিদিনে, রাধাকৃষ্ণ গুণগানে, স্মরণেতে সদাই গোঁয়ায়।
চারি দণ্ড শুতি থাকে, স্বপনে রাধাকৃষ্ণ দেখে, এক তিল ব্যর্থ নাহি যায়॥
হা হা রাধাকৃষ্ণ কোথা, কোথা বিশাখা ললিতা, কৃপা করি দেহ দরশন।
হা চৈতন্য মহাপ্রভু, হা স্বরূপ মোর প্রভু, হা হা প্রভু রূপসনাতন॥
কাঁদে গোসাঞী রাত্রিদিনে, ছাঁড়ি যায় তনুমনে, ক্ষণে অঙ্গ ধূলায় ধূসর।
চক্ষু অন্ধ অনাহার, আপনার দেহভার, বিরহে হইল জরজর॥
রাধাকুণ্ড তটে পড়ি, সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি, মুখে বাক্য না হয় স্ফুরণ।
মন্দ মন্দ জিহ্বা নড়ে, প্রেমে অশ্রু নেত্রে পড়ে, মনে কৃষ্ণ করয়ে স্মরণ॥"

এইরূপ কৃচ্ছ্র-কঠোর সাধনার পর রঘুনাথ মোক্ষলাভ করেন। এই সাধনার ফলেই তিনি ষট্‌গোস্বামীপাদ রূপে সম্পূজিত হইয়া থাকেন। রঘুনাথ গোস্বামী বিরচিত 'বিলাপকুসুমাঞ্জলি স্তোত্র' ও 'মনঃশিক্ষা' কাব্যদ্বয় বিশেষ প্রসিদ্ধ। বিবিধ ছন্দে কৃষ্ণলীলা ও কৃষ্ণপ্রেম বর্ণনই ঐ দুই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ষট্‌গোস্বামীপাদের আবির্ভাবে সংসারে ভগবৎপ্রেমের যে বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল, সে বন্যা-প্রবাহে অসংখ্য পাপী তাপীর পাপমলা প্রক্ষালিত হইয়া গিয়াছে। এখনও তাই সংসার তারস্বরে ষট্‌গোস্বামীপাদের বন্দনা-গীতি কীর্ত্তন করিয়া থাকেন,—

"কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনগাননর্ত্তনপরৌ প্রেমামৃতাম্ভোনিধী
ধীরৌ ধীরজনপ্রিয়ৌ প্রিয়করৌ নির্ম্মৎসরৌ পূজিতৌ।
শ্রীচৈতন্যকৃপাভরৌ ভুবি ভরৌ ভাবাবহন্তারৌ
বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীবগোপালকৌ॥"

বিশেষতঃ, যে সময়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, তখন ব্রাহ্মণেতর বর্ণের আচার্য্য-পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় না। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসেই স্পষ্টতঃ লিখিত আছে,—"বর্ণাশ্রম ক্রিয়াতীতাম্ দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ।" অর্থাৎ,—বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যাঁহারা না মানেন, তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। তার পর, ব্রাহ্মণই গুরুর আসন গ্রহণের যোগ্য বলিয়া সর্ব্বত্র বিঘোষিত আছে। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর বর্ণধর্ম্ম সম্বন্ধে এক সময়ে বড়ই বিতর্ক উপস্থিত হয়। তখন এই সকল কথার মীমাংসা হইয়াছিল। "অনুসন্ধান" পত্রে, ত্রয়োদশ বর্ষে, দশম সংখ্যায় (১৩০৬ সাল, ১২ই শ্রাবণ) এতৎসংক্রান্ত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। শ্রীচৈতন্যদেব জাতিবিচার করিয়া কার্য্য করিতেন,—তাহার প্রমাণ বহুল দৃষ্ট হয়। উইলসন এবং অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতিরও সিদ্ধান্ত—রঘুনাথ ব্রাহ্মণ ছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে, ষট্‌গোস্বামীপাদের পদাঙ্কানুসরণে, আরও বহু মহাজন সংস্কৃত-সাহিত্যের সেবায় ব্রতী হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের লীলা-মাহাত্ম্য-বর্ণনই তাঁহাদের অধিকাংশের লক্ষ্য ছিল। চৈতন্যচরিত বর্ণন-ব্যপদেশে ভগবদ্ভক্তির প্রবাহ তাঁহারা দেশমধ্যে প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত-সাহিত্যের সেই সকল সেবকগণের মধ্যে কবি কর্ণপুর, প্রদ্যুম্নমিশ্র, প্রবোধানন্দ স্বরস্বতী এবং মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। কবি কর্ণপুর 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্য রচনা করেন, 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক রচনা করেন, 'আনন্দ-বৃন্দাবন' নামক চম্পূকাব্য ও 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা' নামক খণ্ড-কাব্য প্রণয়ন করেন এবং 'অলঙ্কারকৌস্তুভ' নামক অলঙ্কার-গ্রন্থ রচনা করেন। নদীয়া জেলার কাঞ্চনপল্লী গ্রামে সেন-বংশে শিবানন্দ নামে এক পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি নীলাচলে মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে যান। সেই সময়ে মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তাঁহার এক পরম ভক্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। পত্নী গর্ভবতী ছিলেন; গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শিবানন্দ নব-কুমারের মুখ দর্শন করিলেন। মহাপ্রভুর নির্দেশানুসারে পুত্রের নাম রাখা হইয়াছিল—পরমানন্দ দাস। সেই পরমানন্দই পরিশেষে কবি কর্ণপুর নামে প্রতিষ্ঠান্বিত হন। মহাপ্রভুই তাঁহার ঐ নাম রাখিয়াছিলেন;—আনন্দবৃন্দাবনের একটী শ্লোকে ইহা প্রকাশ আছে।

সংস্কৃত-সাহিত্যে বৈষ্ণবকবিগণ।

"বৎসাস্বাদ্য মুহুঃ স্বয়া রসনয়া প্রাপয্য সৎকাব্যতাম্।
দেবং ভক্তজনেষু ভাবিষু সুরৈর্দুষ্প্রাপ্যমেতৎ ত্বয়া॥"

কথিত হয়,—পরমানন্দ যখন পঞ্চমবর্ষীয়, সেই সময় পরমানন্দকে সঙ্গে করিয়া সস্ত্রীক শিবানন্দ আর একবার নীলাচলে মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে যান। মহাপ্রভু পার্শ্বদগণ পরিবেষ্টিত হইয়া দূরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। শিশু ব্যাকুল-কণ্ঠে পিতাকে কহিল,—"প্রভু কোথায়?—আমায় দেখাইয়া দেন।' সেই সময় শ্রীচৈতন্যদেবের চরণতলে শিবানন্দ শিশুকে রক্ষা করেন। শিশু, চরণতলে পতিত হইয়া, চরণধারণে চরণচোষণ করিতে আরম্ভ করে। সেই সময়ই মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—'তুমি সৎকবি হইবে। তোমার দেবদুর্লভ কবিত্ব ভক্তজনের মন হরণ করিবে।' আনন্দবৃন্দাবনের ঐ কবিতায় সেই কথারই অভিব্যক্তি আছে। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে পিতার সঙ্গে শিশুর চৈতন্যদেবকে দর্শনের একটি চিত্র দেখি। বালক যখন চৈতন্যচন্দ্রের দর্শনে আগ্রহান্বিত, পিতা বলিতেছেন,—'ঐ দেখ,—সেই বিদ্যুদ্দামকান্তি; ঐ দেখ,—তাঁহার উৎকণ্ঠিত মৃগেন্দ্রগতি; ঐ দেখ,—স্বর্ণপরিঘসম তাঁহার দীর্ঘোদ্দাম বাহু; ঐ দেখ,—সেই সিংহগ্রীব নবারুণ-কিরণদ্যুতিসম্পন্ন গৌরচন্দ্র। ঐ দেখ তিনি!—ঐ শ্রীগৌরাঙ্গদেব পুরোভাগে জ্যোতিষ্মান্ রহিয়াছেন। প্রণত হও—প্রনাম কর।' * চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক দশ অঙ্কে বিভক্ত। মহাপ্রভুও তাঁহার পার্শ্বদগণের লীলা মাহাত্ম্য পরিবর্ণনই ঐ নাটকের উদ্দেশ্যে। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের ন্যায় এ

---

* চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে শিবানন্দের উক্তি,—

"বিদ্যুদ্দামদ্যুতিরতিশয়োৎকণ্ঠকণ্ঠীরবেন্দ্রক্রীড়াগামী কনকপরিঘশ্লাঘিদোর্দ্দামবাহুঃ।
সিংহগ্রীবো নবদিনকরজ্যোতিবিদ্যোতিবাসাঃ শ্রীগৌরাঙ্গঃ স্ফুরতি পুরতো বন্দ্যতাং বন্দ্যতাং ভোঃ॥"

নাটক ধর্ম্মভাবোদ্দীপক। দশ অঙ্কে (পরিচ্ছেদে) বা অভিনয়ে এই নাটক সম্পূর্ণ। নাটকের উপসংহারে, মহামহোৎসব নামক দশম অঙ্কে, এইরূপ লিখিত আছে,—

"আকল্প কবয়স্তু নাম কবয়ো যুষ্মাদ্বিলাসাবলীং,
তামেবাভিনয়ন্তু নর্ত্তকগণাঃ শৃণ্বন্তু পশ্যন্তু তাং।
সন্তো মৎসবতাং ত্যজন্তু কুজনাঃ সন্তোষবন্তঃ সদা,
সন্তু ক্ষৌণিভুজো ভবচ্চরণয়োর্ভক্তাঃ প্রজা পান্তু চ॥"

মুরারিগুপ্ত—শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক। শ্রীহট্ট তাঁহার আদি বাস। নবদ্বীপে বিদ্যাধ্যয়নের জন্য আগমন করিয়া বাল্যকালে একই চতুষ্পাঠীতে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। বয়সে তিনি শ্রীচৈতন্যের কিছু বড় ছিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি বালক বয়স হইতেই শ্রীগৌরাঙ্গকে সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। ১৪৩৫ শকে মুরারিগুপ্ত সংস্কৃত-ভাষায় 'চৈতন্য-চরিত' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি সর্ব্বদা মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকিতেন, সুতরাং তাঁহার গ্রন্থে বহু সমসাময়িক কথাই কীর্ত্তিত আছে। শ্রীচৈতন্যদেবের বয়ঃক্রম যখন আটাইশ বৎসর, সেই সময়ে ঐ গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল, সুতরাং উহাতে শ্রীচৈতন্যের বাল্য-লীলার বিষয়ই বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। মুরারিগুপ্ত বাঙ্গালা-ভাষায় 'গৌরপদাবলী' রচনা করিয়াও প্রসিদ্ধিসম্পন্ন আছেন। প্রদ্যুম্নমিশ্র সংস্কৃত-ভাষায় চৈতন্যোদয়াবলী প্রণয়ন করেন। প্রদ্যুম্ন-মিশ্র—সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যের জ্যেষ্ঠতাত পুত্র এবং সমসাময়িক বলিয়া প্রতিপন্ন হন। শ্রীচৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম—কংসারি, কংসারির পুত্রের নাম—প্রদ্যুম্ন মিশ্র। প্রদ্যুম্নমিশ্র শ্রীহট্টবাসী ছিলেন। তিনিও বিদ্যাশিক্ষার্থ নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। তাঁহার চৈতন্যোদয়াবলী গ্রন্থে, বিভিন্ন সর্গে, ধারাবাহিকরূপে শ্রীচৈতন্যের জীবনবৃত্তান্ত পরিবর্ণিত আছে। সেই চৈতন্যোদয়াবলীর মধ্য হইতে কয়েকটী শ্লোক প্রদান করিতেছি, তাহাতে শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বপুরুষগণের ও জন্মবিবরণের একটু একটু আভাষ পাওয়া যায়,—

"আসীৎ শ্রীহট্টমধ্যস্থো মিশ্রোমধুকরাভিধঃ। পাশ্চাত্যবৈদিকশ্চৈব তপস্বী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥
চত্বারস্তস্য পুত্রাস্তু সর্ব্বৈকেণ চ পঞ্চকৈ। বভূবুর্গুণসংযুক্তাঃ সুব্রাহ্মণাঃ প্রতাপিনঃ॥
তস্য মধ্যৈস্থৈক পুত্রো হিত্বাদেশস্য পৈতৃকং। শ্রীমদুপেন্দ্রমিশ্রাখ্যঃ প্রধানং স্থানমাগমৎ॥
শোভয়া ভার্য্যয়া যুক্তোপ্যাশ্চর্য্য গুণযুক্তয়া। বভূবুঃ সপ্তপুত্রাশ্চ তস্য বিপ্রস্য ধীমতঃ॥
ধীমন্তং সসুতং বীক্ষ্য জগন্নাথ গুণার্ণবম্। কাতন্ত্রাদীনি শাস্ত্রানি পাঠয়ামাস সদ্দ্বিজঃ॥
আবেশং তস্য তত্রৈব দৃষ্ট্বা মিশ্রঃ প্রতাপবান্। প্রস্থাপয়ামাস চ তং নবদ্বীপে মনোরমে॥
কৃত্বা পাণিগ্রহং শচ্যা নবদ্বীপে দ্বিজোত্তমঃ। জগন্নাথোঽবসৎ প্রীত্যা কান্তয়া শৌর্য্যয়াবৃতঃ॥
পুণে গর্ভেতু সম্ভূতে শ্রীচৈতন্যো হরিঃ স্বয়ং। তারণায়স্য জগতঃ করুণাসাগরঃ কলৌ।
শৈলথোদধিভূমানে শাকে ত্রৈলোক্যকেতনঃ। ফাল্গুন্যাং পৌর্ণমাস্যাস্তু নিশীথে দৈবভাবিতঃ॥"

চৈতন্যোদয়াবলী—শ্রীচৈতন্যের জ্যেষ্ঠতাতপুত্র কর্ত্তৃক লিখিত। সুতরাং উহার মধ্যে যে পূর্ব্ব পরিচয় আছে, তাহা সঠিক বলিয়াই প্রতীত হয়। প্রবোধানন্দ সরস্বতী—পরমহংস নামে অভিহিত। তিনি গোপাল ভট্টের খুল্লতাত বলিয়া পরিচিত হন। চৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থে সংস্কৃত ভাষায় ইনি বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিষয় আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থ, শ্রীচৈতন্যের

আবির্ভাবের পর, শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ ও খণ্ড-কবিতা রচিত হইয়াছে। সংহিতা এবং তন্ত্র নামে পরিচিত হইয়াও বহু গ্রন্থ ঐ সময় সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত হয়। চৈতন্য-ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থে মহাপ্রভুর সম্বন্ধে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার কতকগুলি সমসময়ে রচিত হইয়াছিল বলিয়াই প্রতীত হয়। ঐ সকল গ্রন্থের প্রারম্ভিক শ্লোক মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে গ্রন্থরচনার সময় রচিত হইয়াছিল, তাহা তো স্পষ্টই লিখিত আছে। ফলতঃ, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের আবির্ভাবে সংস্কৃত সাহিত্যে ভক্তিশাস্ত্রের বহু অঙ্গ পরিপুষ্ট হইয়াছিল; এবং তদ্দ্বারা সংস্কৃত-সাহিত্যের একটি নূতন স্তর—শেষ স্তর সংগ্রথিত হইয়া আছে। জানি-না,—ঐ স্তরই শেষ স্তর কি না! জানি-না,—উহাই নির্গলিতাম্বু-গর্ভ শরদ্ঘনের বিদ্যুদ্বিকাশ কি না! জানি-না,—তৈলহীন দীপের উহাই শেষ শিখা কি না!

জানি-না—আবার কবে সে শুভদিন আসিবে। জানি-না—আবার কবে দুষ্কৃতের দমনে, ধর্ম্মের সংস্থাপনে, শ্রীভগবান নবদেহ ধারণ করিবেন! জানি না—আবার কবে শ্রীরামচন্দ্রের পুণ্য-পূত চরণস্পর্শে পাষাণে-পরিণত সংসার পাপ-নির্ম্মুক্ত হইয়া দিব্যদেহ প্রাপ্ত হইবে! জানি না,—আবার কবে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাবে শাস্ত্রে অমৃতনিঃস্যন্দিনী বাণী বিঘোষিত হইবে! জানি-না—আবার কবে গৌতম-বুদ্ধ আসিয়া তাপতপ্ত সন্ত্রস্ত জীবকে অহিংসার অভয়বাণী শুনাইয়া নির্ব্বাণ-মোক্ষের পথে আকর্ষণ করিবেন! জানি-না—আবার কবে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে নাম-সঙ্কীর্ত্তন রূপ সরল সুগম পথ প্রাপ্ত হইয়া পাপী তাপী মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে! জানি-না—আবার কবে তাঁহাদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ভাষা ভাবে নব-জীবন সঞ্চার হইবে। জানি-না—আবার কবে সেই উদ্বোধনায় উদ্বোধিত হইয়া, সংসার কর্ম্মের মহান্ ক্ষেত্রে দেখিতে পাইবে!—সদ্বৃত্তিরূপ ক্ষুদ্র-জলবিম্বসমূহ সেই অনন্ত মহাসমুদ্রে সম্মিলিত হইবার জন্য প্রধাবিত হইবে! এই যে অবিদ্যার মোহে সংসারকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে, এই যে আত্মসুখানুসন্ধানে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া মানুষ কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, তখনই এ মোহ ঘুচিবে,—তখনই কর্ত্তব্যের পথ দৃষ্টিগোচর হইবে! শাস্ত্রে আছে,—ধরিত্রীর পাপ-ভার অসহ্য হইলে, নরনারায়ণ সেই পাপভার মোচন জন্য আবির্ভূত হন। পাপের ভার পূর্ণ হইয়াছে; কিন্তু তিনি আসিলেন কৈ? তিনি না আসিলে,—তিনি আসিয়া সম্মুখের বাধা বিঘ্ন অপসারণ না করিয়া দিলে, সদ্বৃত্তি-প্রবাহ অগ্রসর হইতে পারিতেছে কৈ? যে বিদ্যা—যে জ্ঞান কুজ্ঝটিকা-জালে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, জ্ঞানসূর্য্য তিনি,—তাঁহার উদয় হইলেই সে কুজ্ঝটিকা-জাল অপসৃত হইবে। জানি-না—আবার কবে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, কৃতাপরাধের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া, সংসার তারস্বরে গাহিতে পারিবে,—

উপসংহার।

"পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব॥
তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যং।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব! সোঢ়ুং॥

নির্ঘণ্ট।

খ।

গ।

দ।

ধ।

ন।

প।

ফ।

ব।

য।

র।

ষ।

স।

সম্পূর্ণ।